সাহিত্য-পরিষদ্-গ্রন্থাবলী—সং ৬৩

গৌতমসূত্র

বা

ন্যায়দর্শন

ও

বাৎস্যায়ন ভাষ্য

(বিস্তৃত অনুবাদ, বিবৃতি, টিপ্পনী প্রভৃতি সহিত)

চতুর্থ খণ্ড

মহামহোপাধ্যায়

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ তর্কবাগীশ

কর্ত্তৃক অনূদিত, ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত

কলিকাতা, ২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড,

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ মন্দির হইতে

শ্রীরামকমল সিংহ কর্ত্তৃক

প্রকাশিত

১৩৩৩ বঙ্গাব্দ

মূল্য—সদস্য পক্ষে —১।০, শাখাসভার সদস্য পক্ষে —১৮০,

সাধারণ পক্ষে—২৲

সূত্র ও ভাষ্যোক্ত বিষয়ের সূচী।

—০—

টিপ্পনী ও পাদটীকায় লিখিত কতিপয় বিষয়ের সূচী।

বিষয় | পৃষ্ঠা

টিপ্পনী ও পাদটীকায় লিখিত কতিপয় বিষয়ের সূচী।

বিষয় | পৃষ্ঠা

বিষয় পৃষ্ঠা

—০—

ন্যায়দর্শন

বাৎস্যায়ন ভাষ্য

চতুর্থ অধ্যায়

ভাষ্য। মনসোঽনন্তরং প্রবৃত্তিঃ পরীক্ষিতব্যা, তত্র খলু যাবদ্ধর্ম্মা-ধর্ম্মাশ্রয়শরীরাদি পরীক্ষিতং, সর্ব্বা সা প্রবৃত্তেঃ পরীক্ষা, ইত্যাহ—

অনুবাদ। মনের অনন্তর অর্থাৎ মহর্ষির পূর্ব্বোক্ত ষষ্ঠ প্রমেয় মনের পরীক্ষার অনন্তর এখন "প্রবৃত্তি" (পূর্ব্বোক্ত সপ্তম প্রমেয়) পরীক্ষণীয়, তদ্বিষয়ে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের আশ্রয়, অর্থাৎ আত্মা ও শরীরাদি যে পর্য্যন্ত পরীক্ষিত হইয়াছে, সেই সমস্ত "প্রবৃত্তি"র পরীক্ষা, ইহা (মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা) বলিতেছেন,—

সূত্র। **প্রবৃত্তির্যথোক্তা ॥১॥৩৪৪॥**

ভাষ্য। তথা পরীক্ষিতেতি।

অনুবাদ। "প্রবৃত্তি" যেরূপ উক্ত হইয়াছে, সেইরূপ পরীক্ষিত হইয়াছে।

ভাষ্য। প্রবৃত্ত্যনন্তরাস্তর্হি দোষাঃ পরীক্ষ্যন্তামিত্যত আহ—

অনুবাদ। তাহা হইলে "প্রবৃত্তি"র অনন্তরোক্ত "দোষ" পরীক্ষিত হউক? এজন্য (মহর্ষি দ্বিতীয় সূত্র) বলিতেছেন—

সূত্র। **তথা দোষাঃ ॥২॥৩৪৫॥**

ভাষ্য। তথা পরীক্ষিতা ইতি।

অনুবাদ। সেইরূপ অর্থাৎ প্রবৃত্তির ন্যায় "দোষ" পরীক্ষিত হইয়াছে।

ভাষ্য। বুদ্ধিসমানাশ্রয়ত্বাদাত্মগুণাঃ, প্রবৃত্তিহেতুত্বাৎ পুনর্ভবপ্রতিসন্ধানসামর্থ্যাচ্চ সংসারহেতবঃ,—সংসারস্যানাদিত্বাদনাদিনা প্রবন্ধেন প্রবর্ত্তন্তে,—মিথ্যাজ্ঞাননিবৃত্তিস্তত্ত্বজ্ঞানাত্তন্নিবৃত্তৌ রাগদ্বেষপ্রবন্ধোচ্ছেদেঽপবর্গ ইতি প্রাদুর্ভাব-তিরোধানধর্ম্মকা, ইত্যেবমাদ্যুক্তং দোষাণামিতি।

অনুবাদ। বুদ্ধির সমানাশ্রয়ত্ববশতঃ অর্থাৎ জ্ঞানের আশ্রয় আত্মাতেই উৎপন্ন হয়, এজন্য [দোষসমূহ] আত্মার গুণ, (এবং) "প্রবৃত্তি"র (ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের) কারণত্ববশতঃ এবং পুনর্জ্জন্ম সৃষ্টির সামর্থ্যবশতঃ সংসারের হেতু, (এবং) সংসারের অনাদিত্ববশতঃ অনাদিপ্রবাহরূপে প্রাদুর্ভূত হইতেছে (এবং) তত্ত্বজ্ঞানজন্য মিথ্যা-জ্ঞানের নিবৃত্তি হয়, তাহার নিবৃত্তিপ্রযুক্ত রাগ ও দ্বেষের প্রবাহের উচ্ছেদ হইলে মোক্ষ হয়, এজন্য (পূর্ব্বোক্ত দোষসমূহ) "প্রাদুর্ভাবতিরোধানধর্ম্মক", অর্থাৎ উৎপত্তি ও বিনাশশালী, দোষসমূহের সম্বন্ধে ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে।

টিপ্পনী। মহর্ষি গোতম প্রথম অধ্যায়ে আত্মা প্রভৃতি যে দ্বাদশ পদার্থকে "প্রমেয়" নামে উল্লেখপূর্ব্বক যথাক্রমে ঐসমস্ত প্রমেয়ের লক্ষণ বলিয়াছেন, তন্মধ্যে তৃতীয় অধ্যায়ে ক্রমানুসারে আত্মা, শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি, ও মন এই ছয়টি প্রমেয়ের পরীক্ষা করিয়াছেন। মনের পরীক্ষার পরে ক্রমানুসারে এখন সপ্তম প্রমেয় "প্রবৃত্তি"র পরীক্ষা কর্ত্তব্য, কিন্তু মহর্ষি তাহা কেন করেন নাই? এইরূপ প্রশ্ন অবশ্যই হইবে। তাই মহর্ষি প্রথম সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, "প্রবৃত্তি" যেরূপ উক্ত হইয়াছে, সেইরূপ পরীক্ষিত হইয়াছে। অর্থাৎ "প্রবৃত্তি"র পরীক্ষা পূর্ব্বেই নিষ্পন্ন হওয়ায়, এখানে আবার উহা করা নিষ্প্রয়োজন। প্রশ্ন হইতে পারে যে, তাহা হইলে "প্রবৃত্তি"র অনন্তর-কথিত সপ্তম প্রমেয় "দোষে"র পরীক্ষা কর্ত্তব্য, মহর্ষি তাহাও কেন করেন নাই? এজন্য মহর্ষি দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, সেইরূপ "দোষ"ও পরীক্ষিত হইয়াছে। অর্থাৎ তৃতীয় অধ্যায়ে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের আশ্রয়—আত্মার পরীক্ষার দ্বারা যেমন "প্রবৃত্তি"র পরীক্ষা হইয়াছে, তদ্রূপ ঐ "প্রবৃত্তি"র পরীক্ষার দ্বারা ঐ "প্রবৃত্তি"র তুল্য "দোষ"-সমূহেরও পরীক্ষা হইয়াছে। ভাষ্যকার প্রথম সূত্রের তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিতে প্রথমে বলিয়াছেন যে, মনের পরে "প্রবৃত্তি"র পরীক্ষা কর্ত্তব্য, কিন্তু মহর্ষি তৃতীয় অধ্যায়ে আত্মা ও শরীরাদি প্রমেয়ের যে পর্য্যন্ত পরীক্ষা করিয়াছেন, অর্থাৎ আত্মাদি প্রমেয়ের যে সমস্ত তত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছেন, সেই সমস্ত "প্রবৃত্তি"র পরীক্ষা। অর্থাৎ সেই পরীক্ষার দ্বারাই "প্রবৃত্তি"র পরীক্ষা নিষ্পন্ন হওয়ায়, এখানে আর পৃথক্ করিয়া "প্রবৃত্তি"র পরীক্ষা করেন নাই। "প্রবৃত্তির্যথোক্তা" এই সূত্রের দ্বারা মহর্ষি ইহাই বলিয়াছেন। ভাষ্যকার পূর্ব্বভাষ্যে "আত্মন্" শব্দের প্রয়োগ না করিয়া, "ধর্ম্মাধর্ম্মাশ্রয়" শব্দের দ্বারা আত্মাকে গ্রহণ করিয়া ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ "প্রবৃত্তি" যে, আত্মাশ্রিত, অর্থাৎ উহা আত্মারই গুণ, ইহা তৃতীয় অধ্যায়ে পরীক্ষিত হইয়াছে, ইহা সূচনা করিয়াছেন।

এখানে স্মরণ করিতে হইবে যে, মহর্ষি প্রথম অধ্যায়ে "প্রবৃত্তির্বাগ্‌বুদ্ধিশরীরারম্ভঃ" (১।১৭) —এই সূত্রের দ্বারা বাচিক, মানসিক ও শারীরিক "আরম্ভ", অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার শুভ ও অশুভ কর্ম্মকেই "প্রবৃত্তি" বলিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ ঐ "প্রবৃত্তি"কে প্রযত্ন-বিশেষ বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেও, ঐ সূত্রে "আরম্ভ" শব্দের দ্বারা কর্ম্ম অর্থই সহজে বুঝা যায়। "তার্কিকরক্ষা"কার বরদরাজও, পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ কর্ম্মকেই "প্রবৃত্তি" বলিয়াছেন[১]। পরন্তু

শুভাশুভ সমস্ত কর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞানও মুমুক্ষুর অত্যাবশ্যক, সুতরাং মহর্ষি গোতম যে, তাঁহার কথিত প্রমেয়ের মধ্যে "প্রবৃত্তি" শব্দের দ্বারা শুভাশুভ কর্ম্মকেও গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা অবশ্য বুঝা যায়। পূর্ব্বোক্ত শুভ ও অশুভ কর্ম্মরূপ "প্রবৃত্তি"জন্য যে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম নামক আত্মগুণ জন্মে, তাহাকেও মহর্ষি প্রথম অধ্যায়ে দ্বিতীয় সূত্রে "প্রবৃত্তি" শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। "ন্যায়বার্ত্তিকে" উদ্দ্যোতকর এখানে মহর্ষির তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, প্রবৃত্তি দ্বিবিধ—(১) কারণরূপ, এবং (২) কার্য্যরূপ। প্রথম অধ্যায়ে "প্রবৃত্তি"র লক্ষণসূত্রে (১।১৭) কারণরূপ "প্রবৃত্তি" কথিত হইয়াছে। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম নামক কার্য্যরূপ "প্রবৃত্তি" "দুঃখজন্মপ্রবৃত্তিদোষ" ইত্যাদি দ্বিতীয় সূত্রে কথিত হইয়াছে। শুভ ও অশুভ কর্ম্ম ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের কারণ, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম উহার কার্য্য। সুতরাং ঐ কর্ম্মরূপ "প্রবৃত্তি"কে কারণরূপ প্রবৃত্তি এবং ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ "প্রবৃত্তি"কে কার্য্যরূপ প্রবৃত্তি বলা হইয়াছে। শুভকর্ম্ম দশ প্রকার এবং অশুভ কর্ম্ম দশ প্রকার কথিত হওয়ায়, ঐ কারণরূপ প্রবৃত্তি বিংশতি প্রকার। ভাষ্যকার প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় সূত্রভাষ্যে ঐ বিংশতি প্রকার কারণরূপ প্রবৃত্তির বর্ণন করিয়াছেন এবং ঐ সূত্রে মহর্ষি যে, "প্রবৃত্তি" শব্দের দ্বারা ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম নামক কার্য্যরূপ প্রবৃত্তিই বলিয়াছেন, ইহাও সেখানে প্রকাশ করিয়াছেন। (১ম খণ্ড, ৮০ পৃষ্ঠা ও ৯৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ফলকথা, বাক্য, মন ও শরীরজন্য যে শুভ ও অশুভ কর্ম্ম এবং ঐ কর্ম্মজন্য ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, এই উভয়ই মহর্ষি গোতমের অভিমত "প্রবৃত্তি"। তৃতীয় অধ্যায়ে আত্মার নিত্যত্ব পরীক্ষিত হইয়াছে, এবং তৃতীয় অধ্যায়ের শেষ প্রকরণে "পূর্ব্বকৃতফলানুবন্ধাত্তদুৎপত্তিঃ" ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা আত্মার পূর্ব্বজন্মকৃত শুভ ও অশুভ কর্ম্মের ফল ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ প্রবৃত্তিজন্যই শরীরের উৎপত্তি হয়, ইহা পরীক্ষিত হইয়াছে। সুতরাং তৃতীয় অধ্যায়ে যে সমস্ত পরীক্ষা হইয়াছে, তদ্দ্বারাই "প্রবৃত্তি"র পরীক্ষা হইয়াছে। অর্থাৎ ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ "প্রবৃত্তি" আত্মারই গুণ, সুতরাং আত্মাই ঐ "প্রবৃত্তির"র কারণ শুভাশুভ কর্ম্মরূপ "প্রবৃত্তি"র কর্ত্তা। আত্মার কৃত ঐ কর্ম্মরূপ "প্রবৃত্তি"জন্য ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ "প্রবৃত্তি"ই আত্মার সংসারের কারণ এবং ঐ "প্রবৃত্তির"র আত্যন্তিক অভাবেই অপবর্গ হয়, ইত্যাদি সিদ্ধান্ত তৃতীয় অধ্যায়ে আত্মাদি প্রমেয়ের পরীক্ষার দ্বারাই প্রতিপন্ন হওয়ায়, মহর্ষির কথিত সপ্তম প্রমেয় "প্রবৃত্তি"র সম্বন্ধে তাঁহার যাহা বক্তব্য, যাহা পরীক্ষণীয়, তাহা তৃতীয় অধ্যায়ে আত্মাদি প্রমেয়ের পরীক্ষার দ্বারাই পরীক্ষিত হইয়াছে। সুতরাং মহর্ষি এখানে পৃথক্‌ভাবে আর "প্রবৃত্তি"র পরীক্ষা করেন নাই। এইরূপ "প্রবৃত্তি"র পরীক্ষার দ্বারা উহার অনন্তরোক্ত অষ্টম প্রমেয় "দোষে"রও পরীক্ষা হইয়াছে। কারণ, রাগ, দ্বেষ ও মোহের নাম "দোষ"। মহর্ষি প্রথম অধ্যায়ে "প্রবর্ত্তনালক্ষণা দোষাঃ" (১।১৮)—এই সূত্রের দ্বারা প্রবৃত্তির জনকত্বই ঐ "দোষে"র সামান্য লক্ষণ বলিয়াছেন। রাগ, দ্বেষ ও মোহই জীবের "প্রবৃত্তি"র জনক। সুতরাং "প্রবৃত্তি"র পরীক্ষার দ্বারা উহার জনক—রাগ, দ্বেষ ও মোহরূপ "দোষে"রও

১। প্রবৃত্তিরত্র রাগাদেঃ পুণ্যাপুণ্যময়ী ক্রিয়া।—তার্কিকরক্ষা।

পরীক্ষা হইয়াছে। দোষসমূহ কিরূপে পরীক্ষিত হইয়াছে, ইহা বুঝাইবার জন্য ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত দ্বিতীয় সূত্রভাষ্যে বলিয়াছেন যে, দোষসমূহ বুদ্ধির সমানাশ্রয়, অর্থাৎ বুদ্ধির আধারই দোষসমূহের আধার, সুতরাং বুদ্ধির ন্যায় দোষসমূহও আত্মারই গুণ, এবং দোষসমূহ প্রবৃত্তির হেতু ও পুনর্জন্ম সৃষ্টিতে সমর্থ, সুতরাং সংসারের কারণ। এবং সংসার অনাদি, সুতরাং সংসারের কারণ দোষসমূহও অনাদিপ্রবাহরূপে উৎপন্ন হইতেছে, এবং তত্ত্বজ্ঞানজন্য ঐ দোষসমূহের অন্তর্গত মোহ বা মিথ্যাজ্ঞানের বিনাশ হইলে, কারণের অভাবে রাগ ও দ্বেষের প্রবাহের উচ্ছেদপ্রযুক্ত অপবর্গ হয়, সুতরাং রাগ, দ্বেষ ও মোহরূপ দোষসমূহের উৎপত্তি ও বিনাশ আছে, দোষসমূহের সম্বন্ধে ইত্যাদি উক্ত হইয়াছে। তাৎপর্য্যটীকাকার ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বিশদ করিয়া বর্ণন করিয়াছেন যে, রাগ, দ্বেষ ও মোহরূপ "দোষ" ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম রূপ "প্রবৃত্তি"র তুল্য। কারণ, অভীষ্ট বিষয়ের অনুচিন্তনরূপ বুদ্ধি হইতে পূর্ব্বোক্ত দোষ সমূহ জন্মে, সুতরাং বুদ্ধির আশ্রয় আত্মাই ঐ দোষসমূহের আশ্রয় বা আধার হওয়ায়, ঐ দোষসমূহও আত্মারই গুণ, ইহা সিদ্ধ হয়। ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ "প্রবৃত্তি" যে, আত্মারই গুণ, ইহা তৃতীয় অধ্যায়ের শেষ প্রকরণের দ্বারা বিচারপূর্ব্বক সমর্থিত হইয়াছে। সুতরাং আত্মগুণত্ব-রূপে দোষসমূহ প্রবৃত্তির তুল্য হওয়ায়, "প্রবৃত্তি"র পরীক্ষার দ্বারাই ঐরূপে দোষসমূহও পরীক্ষিত হইয়াছে। পরন্তু সংসার অনাদি, ইহা তৃতীয় অধ্যায়ে আত্মার নিত্যত্বপরীক্ষা-প্রকরণে "বীতরাগজন্মদর্শনাৎ" (১।২৪)—এই সূত্রের দ্বারা সমর্থিত হইয়াছে। তদ্দ্বারা সংসারের কারণ ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ প্রবৃত্তি এবং উঁহার কারণ রাগ, দ্বেষ ও মোহরূপ দোষও অনাদি, ইহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে। সুতরাং অনাদিত্বরূপেও ঐ দোষসমূহ "প্রবৃত্তি"র তুল্য হওয়ায়, "প্রবৃত্তি"র পরীক্ষার দ্বারাই ঐরূপে দোষসমূহও পরীক্ষিত হইয়াছে। পরন্তু মহর্ষি "দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ" ইত্যাদি (১।২) দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান জন্য মিথ্যা জ্ঞানের বিনাশ হইলে, রাগ ও দ্বেষের প্রবাহের উচ্ছেদ হওয়ায়, যে ক্রমে অপবর্গ হয় বলিয়াছেন, তদ্দ্বারা রাগ, দ্বেষ ও মোহরূপ দোষের উৎপত্তি ও বিনাশ কথিত হইয়াছে। সুতরাং ঐ দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারাও দোষসমূহ যে উৎপত্তি-বিনাশশালী, ইহা পরীক্ষিত হইয়াছে। এইরূপ মহর্ষিকথিত "দোষ" নামক অষ্টম প্রমেয়ের সম্বন্ধে বহু তত্ত্ব পূর্ব্বেই পরীক্ষিত হইয়াছে। যাহা অপরীক্ষিত আছে, তাহাই মহর্ষি পরবর্ত্তী প্রকরণে পরীক্ষা করিয়াছেন।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ পূর্ব্বোক্ত দুই সূত্রের একবাক্যতা গ্রহণ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, "প্রবৃত্তি" যেমন উক্ত লক্ষণবিশিষ্ট, তদ্রূপ দোষসমূহও উক্ত লক্ষণবিশিষ্ট"। অর্থাৎ "প্রবৃত্তি" ও "দোষে"র লক্ষণ সিদ্ধই আছে, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় না হওয়ায়, পরীক্ষা হইতে পারে না। তাই মহর্ষি "প্রবৃত্তি" ও "দোষে"র পূর্ব্বোক্ত লক্ষণের পরীক্ষা করেন নাই। কিন্তু ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনগণ যেভাবে পূর্ব্বোক্ত দুই সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে অধ্যাহার দোষ থাকিলেও "প্রবৃত্তি" ও "দোষে"র সম্বন্ধে যে সকল তত্ত্ব মহর্ষির অবশ্য-বক্তব্য, তাহা যে মহর্ষি পূর্ব্বেই বলিয়াছেন, তৃতীয় অধ্যায়ে আত্মাদি প্রমেয়ের পরীক্ষার দ্বারাই যে ঐ সকল তত্ত্ব পরীক্ষিত হইয়াছে, সুতরাং মহর্ষির অবশ্যকর্ত্তব্য "প্রবৃত্তি" ও "দোষে"র

পরীক্ষা যে পূর্ব্বেই নিষ্পন্ন হইয়াছে, ইহা বলা হইয়াছে। সুতরাং এই ব্যাখ্যায় মহর্ষির বক্তব্যের কোন অংশে ন্যূনতা নাই। পরন্তু ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককার এখানে যেভাবে দ্বিতীয় সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন, তাহাতে প্রথম সূত্রের সহিত দ্বিতীয় সূত্রের সম্বন্ধ প্রকটিত হওয়ায়, প্রকরণভেদের আপত্তিও হইতে পারে না। কারণ, বাক্যভেদ হইলেই প্রকরণভেদ হয় না। তাহা হইলে ন্যায়দর্শনের প্রথম সূত্র ও দ্বিতীয় সূত্রে একটি প্রকরণ কিরূপে হইয়াছে, ইহা চিন্তা করা আবশ্যক। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও সেখানে লিখিয়াছেন, প্রথমদ্বিতীয়সূত্রাভ্যামেকং প্রকরণং ।১।২।

প্রবৃত্তিদোষসামান্যপরীক্ষাপ্রকরণ সমাপ্ত ॥১॥

ভাষ্য। "প্রবর্ত্তনালক্ষণা দোষা" ইত্যুক্তং, তথা চেমে মানের্ষ্যাঽসূয়া-বিচিকিৎসা-মৎসরাদয়ঃ, তে কস্মান্নোপসংখ্যায়ন্ত ইত্যত আহ—

অনুবাদ। "দোষসমূহ প্রবর্ত্তনালক্ষণ" অর্থাৎ প্রবৃত্তিজনকত্ব দোষসমূহের লক্ষণ, ইহা (পূর্ব্বোক্ত দোষলক্ষণসূত্র) উক্ত হইয়াছে। এই মান, ঈর্ষ্যা, অসূয়া, বিচিকিৎসা, (সংশয়) এবং মৎসর প্রভৃতি সেইরূপই, অর্থাৎ মান প্রভৃতিও পূর্ব্বোক্ত দোষলক্ষণাক্রান্ত,—সেই মানাদি কেন কথিত হইতেছে না?—এজন্য মহর্ষি (পরবর্ত্তী সূত্রটি) বলিতেছেন,—

সূত্র। তৎ ত্রৈরাশ্যং রাগ-দ্বেষ-মোহার্থান্তরভাবাৎ॥ ॥৩॥৩৪৬॥

অনুবাদ। সেই দোষের "ত্রৈরাশ্য" অর্থাৎ তিনটি রাশি বা পক্ষ আছে; যে হেতু রাগ, দ্বেষ ও মোহের অর্থান্তরভাব (পরস্পর ভেদ) আছে।

ভাষ্য। তেষাং দোষাণাং ত্রয়ো রাশয়স্ত্রয়ঃ পক্ষাঃ। রাগপক্ষঃ:— কামো মৎসরঃ স্পৃহা তৃষ্ণা লোভ ইতি। দ্বেষপক্ষঃ—ক্রোধ ঈর্ষ্যাঽসূয়া দ্রোহোঽমর্ষ ইতি। মোহপক্ষো—মিথ্যাজ্ঞানং বিচিকিৎসা মানঃ প্রমাদ ইতি। ত্রৈরাশ্যান্নোপসংখ্যায়ন্ত ইতি। লক্ষণস্য তর্হ্যভেদাৎ ত্রিত্বমনুপপন্নং? নানুপপন্নং, রাগদ্বেষমোহার্থান্তরভাবাৎ আসক্তি-

লক্ষণো রাগঃ, অমর্ষলক্ষণো দ্বেষঃ, মিথ্যাপ্রতিপত্তিলক্ষণো মোহ ইতি। **এতৎ প্রত্যাত্মবেদনীয়ং সর্ব্বশরীরিণাং,** বিজানাত্যয়ং শরীরী রাগমুৎপন্নমস্তি মেঽধ্যাত্মং রাগধর্ম্ম ইতি। বিরাগঞ্চ বিজানাতি নাস্তি মেঽধ্যাত্মং রাগধর্ম্ম ইতি। এবমিতরয়োরপীতি। মানের্ষ্যাঽসূয়াপ্রভৃতয়স্তু ত্রৈরাশ্যমনুপতিতা ইতি নোপসংখ্যায়ন্তে।

অনুবাদ। সেই দোষসমূহের তিনটি রাশি (অর্থাৎ) তিনটি পক্ষ আছে। (১) রাগপক্ষ ; যথা—কাম, মৎসর, স্পৃহা, তৃষ্ণা, লোভ। (২) দ্বেষপক্ষ ; যথা—ক্রোধ, ঈর্ষ্যা, অসূয়া, দ্রোহ, অমর্ষ। (৩) মোহপক্ষ ; যথা—মিথ্যাজ্ঞান, বিচিকিৎসা, মান ও প্রমাদ। ত্রৈরাশ্যবশতঃ, অর্থাৎ রাগ, দ্বেষ ও মোহের পূর্ব্বোক্ত পক্ষত্রয় থাকায় (কাম, মৎসর, মান, ঈর্ষ্যা প্রভৃতি) কথিত হয় নাই।

(পূর্ব্বপক্ষ) তাহা হইলে লক্ষণের অভেদপ্রযুক্ত (দোষের) ত্রিত্ব অনুপপন্ন ?—(উত্তর) অনুপপন্ন নহে। যেহেতু, রাগ, দ্বেষ ও মোহের অর্থান্তরভাব অর্থাৎ পরস্পর ভেদ আছে। রাগ আসক্তিস্বরূপ, দ্বেষ অমর্ষস্বরূপ, মোহ মিথ্যাজ্ঞান-স্বরূপ। এই দোষত্রয় সর্ব্বজীবের প্রত্যাত্মবেদনীয়। (বিশদার্থ) —এই জীব "আমার আত্মাতে রাগরূপ ধর্ম্ম আছে" এই প্রকারে উৎপন্ন রাগকে জানে ; "আমার আত্মাতে রাগরূপ ধর্ম্ম নাই" এই প্রকারে "বিরাগ" অর্থাৎ রাগের অভাবকেও জানে। এইরূপ অন্য দুইটির অর্থাৎ দ্বেষ ও মোহের সম্বন্ধেও বুঝিবে,—অর্থাৎ রাগের ন্যায় দ্বেষ ও মোহ এবং উহার অভাবও জীবের মানস-প্রত্যক্ষসিদ্ধ। মান, ঈর্ষ্যা, অসূয়া প্রভৃতি কিন্তু ত্রৈরাশ্যের অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত পক্ষ-ত্রয়ের অন্তর্গত, এজন্য কথিত হয় নাই।

টিপ্পনী। মহর্ষি প্রথম অধ্যায়ে "প্রবর্ত্তনালক্ষণা দোষাঃ" (১।১৮)—এই সূত্রের দ্বারা দোষের লক্ষণ বলিয়াছেন, প্রবৃত্তিজনকত্ব। দোষ ব্যতীত প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে না, সুতরাং দোষসমূহ প্রবৃত্তির জনক। কিন্তু কাম, মৎসর, স্পৃহা, তৃষ্ণা, লোভ, এবং ক্রোধ, ঈর্ষ্যা, অসূয়া, দ্রোহ, অমর্ষ, এবং মিথ্যাজ্ঞান, বিচিকিৎসা, মান, প্রমাদ, এই সমস্ত পদার্থও প্রবৃত্তির জনক। সুতরাং ঐ কাম প্রভৃতি পদার্থও মহর্ষিকথিত দোষলক্ষণাক্রান্ত হওয়ায়, পূর্ব্বোক্ত দোষলক্ষণসূত্রে দোষের ন্যায় পূর্ব্বোক্ত কাম, মৎসর প্রভৃতিও মহর্ষির বক্তব্য, মহর্ষি কেন তাহা বলেন নাই ? এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তর সূচনার জন্য মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা প্রথমে বলিয়াছেন যে, সেই দোষের "ত্রৈরাশ্য" অর্থাৎ তিনটি রাশি বা পক্ষ আছে। "রাশি" শব্দের অর্থ এখানে পক্ষ ; "পক্ষ" বলিতে এখানে প্রকারবিশেষই অভিপ্রেত। রাগ, দ্বেষ ও মোহের-নাম "দোষ"। ঐ দোষের তিনটি পক্ষ, যথা (১) রাগপক্ষ, (২) দ্বেষপক্ষ, (৩)

মোহপক্ষ। কাম, মৎসর, স্পৃহা, তৃষ্ণা, লোভ, এই কএকটি—পদার্থ রাগপক্ষ, অর্থাৎ রাগেরই প্রকারবিশেষ। ক্রোধ, ঈর্ষ্যা, অসূয়া, দ্রোহ, অমর্ষ, এই কএকটি পদার্থ—দ্বেষপক্ষ, অর্থাৎ দ্বেষেরই প্রকারবিশেষ। এবং মিথ্যাজ্ঞান, বিচিকিৎসা, মান, প্রমাদ, এই কএকটি পদার্থ—মোহপক্ষ, অর্থাৎ মোহেরই প্রকার-বিশেষ। সামান্যতঃ যে রাগ, দ্বেষ, ও মোহকে দোষ বলা হইয়াছে, পূর্ব্বোক্ত কাম, মৎসর প্রভৃতি ঐ দোষেরই বিশেষ। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত "প্রবর্ত্তনালক্ষণা দোষাঃ" এই সূত্রে "দোষ" শব্দের দ্বারা এবং ঐ সূত্রোক্ত দোষ-লক্ষণের দ্বারা কাম, মৎসর প্রভৃতিও সংগৃহীত হইয়াছে। অর্থাৎ মহর্ষি প্রথম অধ্যায়ে যে রাগ, দ্বেষ ও মোহকে "দোষ" বলিয়াছেন, ঐ দোষের পূর্ব্বোক্ত পক্ষত্রয়ে "কাম", "মৎসর" প্রভৃতিও অন্তর্ভূত থাকায়, মহর্ষি বিশেষ করিয়া "কাম", "মৎসর" প্রভৃতির উল্লেখ করেন নাই। প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি প্রবৃত্তিজনকত্বই দোষের লক্ষণ হয়, তাহা হইলে, ঐ লক্ষণের ভেদ না থাকায়, দোষকে একই বলিতে হয়; উহার ত্রিত্ব উপপন্ন হয় না। এতদুত্তরে মহর্ষি এই সূত্রে হেতু বলিয়াছেন যে, রাগ, দ্বেষ ও মোহের "অর্থান্তরভাব" অর্থাৎ পরস্পর ভেদ আছে। অর্থাৎ রাগ, দ্বেষ ও মোহ, যাহা "দোষ" বলিয়া কথিত হইয়াছে, উহা পরস্পর ভিন্নপদার্থ। কারণ, বিষয়ে আসক্তি বা অভিলাষ-বিশেষকে "রাগ" বলে। অমর্ষকে "দ্বেষ" বলে। মিথ্যাজ্ঞানকে "মোহ" বলে। সুতরাং ঐ রাগ, দ্বেষ ও মোহের সামান্য লক্ষণ (প্রবৃত্তিজনকত্ব) এক হইলেও উহার লক্ষ্য দোষ একই পদার্থ হইতে পারে না। ঐ দোষের আন্তর্গণিক ভেদক লক্ষণ তিনটি থাকায়, উহার ত্রিত্ব উপপন্ন হয়। ভাষ্যকার ইহা সমর্থন করিতে শেষে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত দোষত্রয় (রাগ, দ্বেষ, মোহ) নিজের আত্মাতেই প্রত্যক্ষসিদ্ধ। আত্মাতে কোন বিষয়ে রাগ উৎপন্ন হইলে, তখন "আমি এই বিষয়ে রাগবিশিষ্ট"—এইরূপে মনের দ্বারা ঐ রাগের প্রত্যক্ষ জন্মে। এইরূপ কোন বিষয়ে রাগ না থাকিলে, মনের দ্বারা ঐ রাগের অভাবেরও প্রত্যক্ষ জন্মে। এইরূপ দ্বেষ ও দ্বেষের অভাব এবং মোহ ও মোহের অভাবেরও মনের দ্বারা প্রত্যক্ষ জন্মে। ফলকথা, রাগ, দ্বেষ ও মোহ নামক দোষ যে, পরস্পর বিভিন্ন পদার্থ, ইহা মানস অনুভবসিদ্ধ, ঐ দোষত্রয়ের ভেদক লক্ষণত্রয়ও (রাগত্ব, দ্বেষত্ব ও মোহত্ব) আত্মার মানসপ্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং দোষের ত্রিত্বই উপপন্ন হয়।

ভাষ্যকারোক্ত কাম, মৎসর প্রভৃতি পদার্থের স্বরূপ ব্যাখ্যায় উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, স্ত্রীবিষয়ে অভিলাষবিশেষ "কাম"। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ বলিয়াছেন যে, পুরুষবিষয়ে স্ত্রীর অভি-লাষ-বিশেষও যখন কাম, তখন স্ত্রীবিষয়ে অভিলাষ বিশেষকেই কাম বলা যায় না। রমণেচ্ছাই "কাম"[১]। নিজের প্রয়োজনজ্ঞান ব্যতীত অপরের অভিমত নিবারণে ইচ্ছা "মৎসর"। যেমন

১। প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদও বলিয়াছেন, "মৈথুনেচ্ছা" কামঃ। সেখানে "ন্যায়কন্দলী"কার লিয়াছেন যে, কেবল "কাম"শব্দ মৈথুনেচ্ছারই বাচক। "স্বর্গকাম" ইত্যাদি বাক্যে অন্য শব্দের সহিত "কাম"শব্দের যোগবশতঃ ইচ্ছা মাত্র অর্থ বুঝা যায়।

কেহ রাজকীয় জলাশয় হইতে জলপানে প্রবৃত্ত হইলে, ব্যক্তিবিশেষের উহা নিবারণ করিতে ইচ্ছা জন্মে। ঐরূপ ইচ্ছাই "মৎসর"। পরকীয় দ্রব্যের গ্রহণবিষয়ে ইচ্ছা "স্পৃহা"। যে ইচ্ছাবশতঃ পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ হয়, সেই ইচ্ছার নাম "তৃষ্ণা"। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ বলিয়াছেন যে, "আমার এই বস্তু নষ্ট না হউক"—এইরূপ ইচ্ছা "তৃষ্ণা"। এবং উচিত ব্যয় না করিয়া ধনরক্ষায় ইচ্ছারূপ কার্পণ্যও তৃষ্ণাবিশেষ। ধর্ম্মবিরুদ্ধ পরদ্রব্যগ্রহণবিষয়ে ইচ্ছা "লোভ"। পূর্ব্বোক্ত "কাম," "মৎসর" প্রভৃতি সমস্তই আসক্তি বা ইচ্ছাবিশেষ, সুতরাং ঐ সমস্ত রাগপক্ষ, অর্থাৎ রাগেরই প্রকারবিশেষ। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এখানে পূর্ব্বোক্ত "কাম" প্রভৃতি হইতে অতিরিক্ত "মায়া" ও "দম্ভ"কেও রাগপক্ষের মধ্যে উল্লেখ করিয়া, পর-প্রতারণার ইচ্ছাকে "মায়া" এবং ধার্ম্মিকত্বাদিরূপে নিজের উৎকর্ষ খ্যাপনের ইচ্ছাকে "দম্ভ" বলিয়াছেন। প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদ "পদার্থধর্ম্মসংগ্রহে" ইচ্ছা পদার্থ নিরূপণ করিয়া, উহার ভেদ বর্ণন করিতে "কাম," "অভিলাষ", "রাগ", "সংকল্প", "কারুণ্য," "বৈরাগ্য", "উপধা", "ভাব" ইত্যাদিকে ইচ্ছাবিশেষ বলিয়াছেন এবং তাঁহার মতে ঐ "কাম" প্রভৃতির স্বরূপও বলিয়াছেন। (কাশী সংস্করণ—২৬১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

শরীর ও ইন্দ্রিয়াদির বিকৃতির কারণ দ্বেষবিশেষই "ক্রোধ"। সাধারণ বস্তুতে অপরেরও স্বত্ব থাকায়, ঐ বস্তুর গ্রহীতার প্রতি দ্বেষবিশেষ "ঈর্ষ্যা"। সাধারণ ধনাধিকারী দুর্দ্দান্ত জ্ঞাতি-বর্গের মধ্যে ঐরূপ দ্বেষবিশেষ অর্থাৎ ঈর্ষ্যা জন্মে। উদ্দ্যোতকরে ভাবানুসারে বৃত্তিকার বিশ্বনাথ "ঈর্ষ্যা"র ঐরূপই স্বরূপ বলিয়াছেন। যেরূপ স্থলেই হউক, "ঈর্ষ্যা" যে, দ্বেষবিশেষ, এবিষয়ে সংশয় নাই। পরের গুণাদি বিষয়ে দ্বেষবিশেষ—"অসূয়া"। বিনাশের জন্য দ্বেষবিশেষ "দ্রোহ"। ঐ দ্রোহজন্যই হিংসা জন্মে। কেহ কেহ হিংসাকেই দ্রোহ বলিয়াছেন। অপকারী ব্যক্তির অপকারে অসমর্থ হইয়া, সেই অপকারী ব্যক্তির প্রতি দ্বেষবিশেষ "অমর্ষ"। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ "অমর্ষের" পরে "অভিমান"কেও দ্বেষপক্ষের মধ্যে উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, অপকারী ব্যক্তির অপকারে অসমর্থ হইলে, নিজের আত্মাতে যে দ্বেষবিশেষ জন্মে, তাহাই "অভিমান"। উদ্দ্যোতকর "ঈর্ষ্যা" ও "দ্রোহ"কে দ্বেষপক্ষের মধ্যে উল্লেখ করিয়াও শেষে —উহার স্বরূপ ব্যাখ্যায় "ঈর্ষ্যা"কে ও "দ্রোহ"কে কেন যে, ইচ্ছাবিশেষ বলিয়াছেন[১], তাহা বুঝিতে পারা যায় না। সুধীগণ ইহা অবশ্য চিন্তা করিবেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ ঐরূপ বলেন নাই।

মোহপক্ষের অন্তর্গত "মিথ্যাজ্ঞান" বলিতে বিপর্য্যয়, অর্থাৎ ভ্রমাত্মক নিশ্চয়। "বিচিকিৎসা" বলিতে সংশয়। গুণবিশেষের আরোপ করিয়া নিজের উৎকর্ষ জ্ঞানের নাম "মান"। কর্ত্তব্য বলিয়া নিশ্চিত বিষয়েও পরে যে, অকর্ত্তব্যত্ব বুদ্ধি এবং অকর্ত্তব্য বলিয়া নিশ্চিত বিষয়েও পরে যে, কর্ত্তব্যত্ব বুদ্ধি তাহার নাম "প্রমাদ"। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এতদ্ব্যতীত "তর্ক", "ভয়" এবং "শোক"কেও মোহপক্ষের মধ্যে উল্লেখ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, ব্যাপ্য পদার্থের

১। সাধারণে বস্তুনি পরাভিনিবেশপ্রতিষেধেচ্ছা ঈর্ষ্যা।" "পরাপকারেচ্ছা দ্রোহঃ।" – ন্যায়বার্ত্তিক –

আরোপপ্রযুক্ত ব্যাপক-পদার্থের আরোপ, অর্থাৎ ভ্রমবিশেষ "তর্ক"। অনিষ্টের হেতু উপস্থিত হইলে, উহার পরিত্যাগে অযোগ্যতা-জ্ঞান "ভয়"। ইষ্ট বস্তুর বিয়োগ হইলে, উহার লাভে অযোগ্যতাজ্ঞান "শোক"। পূর্ব্বোক্ত "মিথ্যাজ্ঞান" ও "বিচিকিৎসা" প্রভৃতি সমস্তই মোহ বা ভ্রমজ্ঞানবিশেষ, সুতরাং ঐসমস্তই মোহপক্ষ।

মহর্ষি এই সূত্রে যে রাগ, দ্বেষ ও মোহের অর্থান্তরভাবকে হেতু বলিয়াছেন, তদ্দ্বারা দোষের ত্রিত্বই সিদ্ধ হইতে পারে। এজন্য ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনগণ ঐ হেতুকে দোষের ত্রিত্বেরই সাধক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বস্তুতঃ দোষের ত্রিত্ব সিদ্ধ হইলেই, পূর্ব্বোক্ত "ত্রৈরাশ্য" সিদ্ধ হইতে পারে। সুতরাং মহর্ষি-সূত্রোক্ত হেতু দোষের ত্রিত্বের সাধক হইয়া পরম্পরায় উহার ত্রৈরাশ্যেরও সাধক হইয়াছে। এই তাৎপর্য্যেই মহর্ষি এই সূত্রে দোষের "ত্রৈরাশ্য"কে সাধ্যরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। মূলকথা, পূর্ব্বোক্ত "কাম", "মৎসর" প্রভৃতি এবং "ক্রোধ", "ঈর্ষ্যা" প্রভৃতি এবং "মিথ্যাজ্ঞান, ও "বিচিকিৎসা" প্রভৃতি যথাক্রমে রাগপক্ষ, দ্বেষপক্ষ ও মোহপক্ষে (ত্রৈরাশ্যে) অন্তর্ভূত থাকায়, মহর্ষি উহাদিগের পৃথক্-উল্লেখ করেন নাই। ইহাই এই সূত্রে মহর্ষির মূল বক্তব্য ॥৩॥

সূত্র। নৈকপ্রত্যনীকভাবাৎ ॥ ৪ ॥ ৩৪৭ ॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) না, অর্থাৎ রাগ, দ্বেষ ও মোহ ভিন্নপদার্থ নহে; কারণ, উহারা "একপ্রত্যনীক" অর্থাৎ একতত্ত্বজ্ঞানই উহাদিগের প্রত্যনীক (বিরোধী)।

ভাষ্য। নার্থান্তরং রাগাদয়ঃ, কস্মাৎ? একপ্রত্যনীকভাবাৎ তত্ত্বজ্ঞানং সম্যঙ্মতিরার্য্যপ্রজ্ঞা সংবোধ ইত্যেকমিদং প্রত্যনীকং ত্রয়াণামিতি।

অনুবাদ। রাগ প্রভৃতি বিভিন্ন পদার্থ নহে। (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) যেহেতু (ঐ রাগাদির) একপ্রত্যনীকত্ব আছে। তত্ত্বজ্ঞান (অর্থাৎ) সম্যক্ মতি আর্য্যপ্রজ্ঞা; সম্যক্ বোধ এই একই তিনটির (রাগ, দ্বেষ ও মোহের) প্রত্যনীক অর্থাৎ বিরোধী।

টিপ্পনী। পূর্ব্বসূত্রোক্ত হেতুর অসিদ্ধতা প্রদর্শনের জন্য মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, রাগ, দ্বেষ ও মোহ বিভিন্ন পদার্থ নহে, উহারা একই পদার্থ। কারণ, এক তত্ত্বজ্ঞানই ঐ রাগ, দ্বেষ ও মোহের "প্রত্যনীক" অর্থাৎ বিরোধী। পূর্ব্বপক্ষবাদীর তাৎপর্য্য এই যে, যাহার বিরোধী বা বিনাশক এক, তাহা একই পদার্থ। যেমন কোন দ্রব্যদ্বয়ের বিভাগ হইলে, ঐ বিভাগ দুই দ্রব্যে বিভিন্ন বিভাগদ্বয় নহে, একসংযোগই ঐ বিভাগের বিরোধী হওয়ায়, ঐ বিভাগ এক, তদ্রূপ এক তত্ত্বজ্ঞানই রাগ, দ্বেষ ও মোহের বিরোধী হওয়ায়, ঐ রাগ, দ্বেষ ও মোহও একই পদার্থ। যাহা একনাশকনাশ্য, তাহা এক, এই নিয়মানুসারে একতত্ত্বজ্ঞাননাশ্যত্ব হেতুর দ্বারা রাগ, দ্বেষ ও মোহের একত্ব সিদ্ধ হয়। ভাষ্যকার "তত্ত্বজ্ঞান"

বলিয়া শেষে "সম্যঙ্‌মতি," "আর্য্যপ্রজ্ঞা" ১ ও "সংবোধ"—এই তিনটি শব্দের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বজ্ঞানেরই বিবরণ বা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যাহা তত্ত্বজ্ঞাননামে প্রসিদ্ধ, তাহাকে কেহ "সম্যঙ্‌-মতি", কেহ "আর্য্যপ্রজ্ঞা", কেহ "সংবোধ" বলিয়াছেন। কিন্তু সকল সম্প্রদায়ের মতেই ঐ তত্ত্বজ্ঞানই রাগ, দ্বেষ ও মোহের বিরোধী বা বিনাশক। মনে হয়, ইহা প্রকাশ করিতেই ভাষ্যকার "সম্যঙ্‌মতি" প্রভৃতি শব্দের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানের বিবরণ করিয়াছেন॥ ৪ ॥

সূত্র। ব্যভিচারাদহেতুঃ ॥৫॥৩৪৮॥

অনুবাদ। (উত্তর) ব্যভিচারবশতঃ অহেতু, অর্থাৎ রাগ, দ্বেষ ও মোহের অভিন্নত্বসাধনে পূর্ব্বসূত্রে যে হেতু বলা হইয়াছে, উহা হেতু নহে, উহা হেত্বাভাস; কারণ, উহা ব্যভিচারী।

ভাষ্য। একপ্রত্যনীকাঃ পৃথিব্যাং শ্যামাদয়োঽগ্নিসংযোগেনৈকেন, একযোনয়শ্চ পাকজা ইতি।

অনুবাদ। পৃথিবীতে শ্যাম প্রভৃতি (শ্যাম, রক্ত, শ্বেত প্রভৃতি রূপ ও নানাবিধ রসাদি) এক অগ্নিসংযোগপ্রযুক্ত "একপ্রত্যনীক" অর্থাৎ এক অগ্নিসংযোগনাশ্য, এবং পাকজন্য শ্যাম প্রভৃতি "একযোনি" অর্থাৎ অগ্নিসংযোগরূপ এককারণজন্য।

টিপ্পনী। পূর্ব্বসূত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন করিতে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বসূত্রোক্ত হেতু ব্যভিচারী, সুতরাং উহা হেতু হয় না। ভাষ্যকার মহর্ষির বুদ্ধিস্থ ব্যভিচার বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, পৃথিবীতে যে শ্যাম, রক্ত প্রভৃতি রূপ ও নানাবিধ রসাদি জন্মে, তাহা ঐ পৃথিবীতে বিলক্ষণ অগ্নিসংযোগ হইলে নষ্ট হয়। সুতরাং এক অগ্নিসংযোগই পৃথিবীর শ্যাম, রক্ত প্রভৃতি রূপ ও রসাদির প্রত্যনীক অর্থাৎ বিরোধী। কিন্তু ঐ রূপ-রসাদি অভিন্ন পদার্থ নহে। সুতরাং যাহার প্রত্যনীক, অর্থাৎ বিরোধী এক, অর্থাৎ যাহা এক বিনাশক-নাশ্য, তাহা অভিন্ন, এইরূপ নিয়মে ব্যভিচারবশতঃ একপ্রত্যনীকত্ব, রাগ, দ্বেষ ও মোহের অভিন্নত্বসাধনে হেতু হয় না। পরন্তু পৃথিবীতে বিলক্ষণ অগ্নিসংযোগরূপ পাকজন্য পূর্ব্বতন রূপাদির বিনাশ হইলে যে নূতন রূপাদির উৎপত্তি হয়, তাহাকে পাকজ রূপাদি বলে। ঐ পাকজ রূপাদি এক অগ্নিসংযোগজন্য। একই অগ্নিসংযোগ, পৃথিবীতে রূপ-রসাদি নানা পদার্থের "যোনি" অর্থাৎ জনক। কিন্তু তাহা হইলেও, ঐ রূপাদি অভিন্ন পদার্থ নহে। সুতরাং এক মিথ্যাজ্ঞানরূপ কারণজন্য রাগ, দ্বেষ ও নানাবিধ মোহের উৎপত্তি হওয়ায়, রাগ, দ্বেষ ও মোহে একযোনিত্ব (এককারণজন্যত্ব) থাকিলেও, তদ্দ্বারা রাগ, দ্বেষ ও মোহের অভিন্নত্ব সিদ্ধ হয় না। কারণ, একনাশকনাশ্যত্বের ন্যায় এককারণজন্যত্বও পদার্থের

১। আর্য্যপ্রজ্ঞেতি ভাষ্যং। আরাৎ তত্ত্বাদ্যাতা আর্য্যা। আর্য্যা চাসৌ প্রজ্ঞা চেতি আর্য্যপ্রজ্ঞা। সম্যক্‌বোধঃ সংবোধঃ।—তাৎপর্য্যটীকা।

অভিন্নত্বসাধনে ব্যভিচারী। পাকজন্য রূপ-রসাদি এককারণজন্য হইলেও ঐ রূপাদি যখন বিভিন্নপদার্থ, তখন এককারণজন্যত্বও রাগাদির অভিন্নত্বসাধক হয় না ॥ ৫ ॥

ভাষ্য। সতি চার্থান্তরভাবে—

সূত্র। তেষাং মোহঃ পাপীয়ান্নামূঢ়স্যেতরোৎপত্তেঃ ॥ ॥৬॥৩৪৯॥

অনুবাদ। অর্থান্তরভাব অর্থাৎ পরস্পর ভেদ থাকাতেই, সেই রাগ, দ্বেষ ও মোহের মধ্যে মোহ পাপীয়ান্, অর্থাৎ অনর্থের মূল বলিয়া সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট; কারণ, মোহশূন্য জীবের "ইতরে"র অর্থাৎ রাগ ও দ্বেষের উৎপত্তি হয় না।

ভাষ্য। মোহঃ পাপঃ, পাপতরো বা, দ্বাবভিপ্রেত্যোক্তং, কস্মাৎ? নামূঢ়স্যেতরোৎপত্তেঃ, অমূঢ়স্য রাগদ্বেষৌ নোৎপদ্যেতে, মূঢ়স্য তু যথাসংকল্পমুৎপত্তিঃ। বিষয়েষু রঞ্জনীয়াঃ সংকল্পা রাগহেতবঃ, কোপনীয়াঃ সংকল্পা দ্বেষহেতবঃ, উভয়ে চ সংকল্পা ন মিথ্যাপ্রতিপত্তিলক্ষণত্বান্মোহাদন্যে, তাবিমৌ মোহযোনী রাগদ্বেষাবিতি। তত্ত্বজ্ঞানাচ্চ মোহনিবৃত্তৌ রাগদ্বেষানুৎপত্তিরিত্যেকপ্রত্যনীকভাবোপপত্তিঃ। এবঞ্চ কৃত্বা তত্ত্বজ্ঞানাদ্-"দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গ" ইতি ব্যাখ্যাতমিতি।

অনুবাদ। মোহ পাপ, অথবা পাপতর, উভয়কে অভিপ্রায় করিয়া ("পাপীয়ান্" এই পদ) উক্ত হইয়াছে [অর্থাৎ রাগ ও মোহ এবং দ্বেষ ও মোহ, এই উভয়ের মধ্যে মোহ পাপতর, এই তাৎপর্য্যে মহর্ষি "তেষাং মোহঃ পাপীয়ান্"—এই বাক্য বলিয়াছেন]। (প্রশ্ন) কেন? অর্থাৎ রাগ, দ্বেষ ও মোহের মধ্যে মোহই সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট কেন? (উত্তর) যেহেতু, মোহশূন্য জীবের ইতরের (রাগ ও দ্বেষের) উৎপত্তি হয় না। বিশদার্থ এই যে,—মোহশূন্য জীবের রাগ ও দ্বেষ উৎপন্ন হয় না, কিন্তু মোহবিশিষ্ট জীবেরই সংকল্পানুরূপ (রাগ ও দ্বেষের) উৎপত্তি হয়। বিষয়সমূহে রঞ্জনীয় সংকল্পসমূহ রাগের হেতু; কোপনীয় সংকল্পসমূহ দ্বেষের হেতু; উভয় সংকল্পই অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত রঞ্জনীয় এবং কোপনীয়—এই দ্বিবিধ সংকল্পই মিথ্যাজ্ঞানস্বরূপ বলিয়া মোহ হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে, সেই জন্য এই রাগ ও দ্বেষ "মোহযোনি" অর্থাৎ মোহরূপকারণজন্য। কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান-প্রযুক্ত মোহের নিবৃত্তি হইলে, রাগ ও দ্বেষের উৎপত্তি হয় না, এজন্য "একপ্রত্যনীকভাবের" অথাৎ এক তত্ত্বজ্ঞাননাশ্যত্বের উপপত্তি হয়। এইরূপ করিয়া অর্থাৎ

পূর্ব্বোক্তপ্রকারে তত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত দুঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তি, দোষ ও মিথ্যাজ্ঞানের উত্তর উত্তরের অপায় হইলে, তদনন্তরের অপায়-প্রযুক্ত অপবর্গ হয়", ইহা ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

টিপ্পনী। রাগ, দ্বেষ ও মোহ বিভিন্ন পদার্থ হইলেই মোহকে রাগ ও দ্বেষের কারণ বলা যাইতে পারে, তাই মহর্ষি ঐ দোষত্রয়ের বিভিন্নপদার্থত্ব প্রকাশ করিয়া শেষে এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, সেই রাগ, দ্বেষ ও মোহের মধ্যে মোহই সর্ব্বাপেক্ষা পাপ, অর্থাৎ অনর্থের মূল। কারণ, মোহশূন্য জীবের রাগ ও দ্বেষ উৎপন্ন হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, মূঢ় জীবেরই যখন রাগ ও দ্বেষ জন্মে, তখন মোহই রাগ ও দ্বেষের মূল-কারণ, ইহা বুঝা যায়। মহর্ষি তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের ২৬শ সূত্রে এবং এই চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের শেষসূত্রে সংকল্পকে রাগাদির কারণ বলিয়াছেন। এই সূত্রে মোহকে রাগ ও দ্বেষের কারণ বলিয়াছেন। এজন্য ভাষ্যকার এখানে বলিয়াছেন যে, বিষয়-সমূহে রঞ্জনীয়[১] সংকল্প রাগের কারণ এবং কোপনীয় সংকল্প দ্বেষের কারণ; ঐ দ্বিবিধ সংকল্পই মিথ্যাজ্ঞানস্বরূপ বলিয়া, মোহ হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে। অর্থাৎ যে সংকল্প রাগ ও দ্বেষের কারণ, উহাও মোহবিশেষ, সুতরাং সংকল্পজন্য রাগ ও দ্বেষ "মোহযোনি" অর্থাৎ মোহজন্য, ইহা বলা যাইতে পারে। কিন্তু "ন্যায়বার্ত্তিকে" উদ্দ্যোতকর পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের প্রার্থনাকেই "সংকল্প" বলিয়াছেন। তাৎপর্য্যটীকাকারও সেখানে ঐরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তদনুসারে তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের ২৬শ সূত্রে "সংকল্প"শব্দের ঐরূপ অর্থই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কিন্তু ভাষ্যকার এখানে স্পষ্ট করিয়া রাগ ও দ্বেষের কারণ "সংকল্প"কে মোহই বলায়, তাঁহার মতে ঐ "সংকল্প" যে ইচ্ছাপদার্থ নহে, জ্ঞানপদার্থ, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিতে মোহপ্রযুক্ত বিষয়ের সুখসাধনত্বের অনুস্মরণ এবং দুঃখসাধনত্বের অনুস্মরণকে "সংকল্প" বলিয়াছেন। সুখসাধনত্বের অনুস্মরণ রঞ্জনীয় সংকল্প, উহা রাগের কারণ। দুঃখসাধনত্বের অনুস্মরণ কোপনীয় সংকল্প, উহা দ্বেষের কারণ। ঐ দ্বিবিধ অনুস্মরণরূপ দ্বিবিধ সংকল্পই মিথ্যাজ্ঞানবিশেষ, সুতরাং উহাও মোহমূলক মোহ, ইহা তাৎপর্য্যটীকাকারের তাৎপর্য্য মনে হয়। এই আহ্নিকের শেষসূত্রের ব্যাখ্যায় এবিষয়ে তাৎপর্য্যটীকাকার যাহা বলিয়াছেন, তাহা এবং এবিষয়ে অন্যান্য কথা সেই সূত্রের ভাষ্য-টিপ্পনীতে দ্রষ্টব্য।

তত্ত্বজ্ঞানজন্য মিথ্যাজ্ঞানরূপ মোহমাত্রের নিবৃত্তি হইলেও, তখন ঐ কারণের অভাবে উহার কার্য্য রাগ ও দ্বেষের উৎপত্তি হয় না; কখনও সাধারণ রাগ ও দ্বেষের উৎপত্তি হইলেও, যে রাগ ও দ্বেষ ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রযোজক, তাদৃশ রাগ, দ্বেষ তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তির কখনই উৎপন্ন হইতে পারে না, সুতরাং একতত্ত্বজ্ঞানই মোহকে বিনষ্ট করিয়া রাগ ও দ্বেষের নিবর্ত্তক হওয়ায়, রাগ, দ্বেষ ও মোহের "একপ্রত্যনীকভাব" উপপন্ন হয়। একতত্ত্বজ্ঞানই সাক্ষাৎ ও পরম্পরায় মোহ

১। "রঞ্জয়তি" এবং "কোপয়তি" এই অর্থে এখানে "রঞ্জনীয়" এবং "কোপনীয়" এই প্রয়োগ সিদ্ধ হইয়াছে। "রঞ্জনীয়াঃ কোপনীয়া ইতি কর্ত্তরি কৃত্যো ভব্যগেয়াদি পাঠাৎ।"—তাৎপর্য্যটীকা

এবং রাগ ও দ্বেষের "প্রত্যনীক" অর্থাৎ বিরোধী বা নিবর্ত্তক, এজন্য ঐ রাগ, দ্বেষ ও মোহ নামক দোষত্রয়ের "একপ্রত্যনীকভাব" অর্থাৎ একপ্রত্যনীকত্ব বা একনাশকনাশ্যত্ব আছে। ভাষ্যকার এই কথার দ্বারা শেষে রাগ, দ্বেষ ও মোহ বিভিন্ন পদার্থ হইলেও পূর্ব্বোক্তরূপে উহাদিগের একপ্রত্যনীকতার উপপাদন করিয়া শেষে ন্যায়দর্শনের প্রথম অধ্যায়ের "দুঃখজন্ম—" ইত্যাদি দ্বিতীয় সূত্রের উদ্ধারপূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে যেরূপে অপবর্গ হয়, তাহা ঐ সূত্রের ভাষ্যেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে,—ইহা বলিয়াছেন। বার্ত্তিককার ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, যেহেতু তত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত মোহের নিবৃত্তি হইলে, রাগ ও দ্বেষ উৎপন্ন হয় না, এই জন্যই রাগ, দ্বেষ ও মোহ এই দোষত্রয় একপ্রত্যনীক, কিন্তু ঐ রাগ, দ্বেষ ও মোহের অভিন্নতাবশতঃই উহারা একপ্রত্যনীক নহে। অর্থাৎ রাগ, দ্বেষ ও মোহ বিভিন্ন পদার্থ হইলেও পূর্ব্বোক্তরূপে উহাদিগের একপ্রত্যনীকতা উপপন্ন হয়, সুতরাং একপ্রত্যনীকত্ব আছে বলিয়াই যে, ঐ রাগ, দ্বেষ ও মোহ অভিন্ন পদার্থ, ইহা বলা যাইতে পারে না। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ অযুক্ত। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ ইহার বিপরীতভাবে এই সূত্রের মূল তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়াছেন যে, তত্ত্বজ্ঞান কেবল মোহেরই নিবর্ত্তক, রাগ ও দ্বেষের নিবর্ত্তক নহে। সুতরাং রাগ, দ্বেষ ও মোহ, এই দোষত্রয়কে একপ্রত্যনীক বলা যাইতে পারে না। ঐ দোষত্রয়ে একতত্ত্বজ্ঞাননাশ্যত্ব না থাকায়, উহাতে "একপ্রত্যনীকভাব"ই নাই। সুতরাং ঐ হেতুর দ্বারা পূর্ব্বপক্ষবাদী তাঁহার সাধ্য সাধন করিতে পারেন না। কারণ, প্রকৃত স্থলে ঐ হেতু যেমন ব্যভিচারী বলিয়া হেতু হয় না, তদ্রূপ উহা ঐ দোষত্রয়ে অসিদ্ধ বলিয়াও হেতু হয় না। মহর্ষির এই সূত্রের দ্বারা কিন্তু তাঁহার উক্তরূপ তাৎপর্য্য সহজে বুঝা যায় না। পূর্ব্বপক্ষবাদীর হেতুকে অসিদ্ধ বলাই মহর্ষির অভিমত হইলে, পূর্ব্বসূত্রে প্রথমে তাহাই স্পষ্ট করিয়া বলিতেন, ইহাই মনে হয়। সুধীগণ বৃত্তিকারের ব্যাখ্যার সমালোচনা করিবেন।

সূত্রে "পাপ" শব্দের উত্তর "ঈয়সুন্" প্রত্যয়সিদ্ধ "পাপীয়স্" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। পদার্থদ্বয়ের মধ্যে একের অতিশয় বিবক্ষা—স্থলেই "তরপ্" ও "ঈয়সুন্" প্রত্যয়ের বিধান আছে [১]। কিন্তু বহু পদার্থের মধ্যে একের অতিশয় বিবক্ষাস্থলে "তমপ্" ও "ইষ্ঠন্" প্রত্যয়েরই বিধান থাকায়, এখানে "পাপতমঃ" অথবা "পাপিষ্ঠঃ" এইরূপ প্রয়োগই মহর্ষির কর্ত্তব্য। কারণ, মহর্ষি এখানে "তেষাং" এই বহুবচনান্ত পদের প্রয়োগ করিয়া দোষত্রয়ের মধ্যে মোহের অতিশয়ই প্রকাশ করিয়াছেন। ভাষ্যকার এইজন্য প্রথমে এখানে "ঈয়সুন্" প্রত্যয়ের অর্থকে মহর্ষির অবিবক্ষিত মনে করিয়া "মোহঃ পাপঃ" এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরে "ঈয়সুন্" প্রত্যয়ের সার্থক্য সম্পাদনের জন্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "পাপতরো বা," এবং ঐ ব্যাখ্যা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, উভয়কে অভিপ্রায় করিয়া ঐরূপ প্রয়োগ হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, রাগ ও মোহের মধ্যে এবং দ্বেষ ও মোহের মধ্যে 'মোহ পাপীয়ান'—এই

১। দ্বিবচনবিভজ্যোপপদে তরবীয়সুনৌ।৫।৩।৫৭।

অতিশায়নে তমবিষ্ঠনৌ। ৫। ৩। ৫৫।—পাণিনি-সূত্র।

তাৎপর্য্যেই মহর্ষি এখানে "তেষাং মোহঃ পাপীয়ান্"—এই বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন। সুতরাং "ঈয়সুন্" প্রত্যয়ের অনুপপত্তি নাই। বার্ত্তিককার ও বৃত্তিকার ঐরূপ ব্যাখ্যা স্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু "ন্যায়সূত্রবিবরণ"কার রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রাচীন ব্যাখ্যা গ্রহণ না করিয়া, এখানে বলিয়াছেন যে, সূত্রে "তেষাং" এই স্থলে ষষ্ঠী বিভক্তির দ্বারাই নির্দ্ধারণ বোধিত হইয়াছে। "ঈয়সুন্" প্রত্যয়ের দ্বারা অতিশয় মাত্র বোধিত হইয়াছে। গোস্বামী ভট্টাচার্য্য ব্যাকরণশাস্ত্রানুসারে এখানে "ঈয়সুন্" প্রত্যয়ের কিরূপে উপপাদন করিয়াছিলেন, তাহা চিন্তনীয়। সূত্রে "নামূঢ়স্যেতরোৎপত্তেঃ" এই স্থলে "নঞ্" শব্দের অর্থের সহিত "উৎপত্তি" শব্দার্থের অন্বয়ই মহর্ষির বিবক্ষিত। মহর্ষিসূত্রে অন্যত্রও ঐরূপ প্রয়োগ আছে। পরবর্ত্তী ১৪শ সূত্র ও সেখানে নিম্নটিপ্পনী দ্রষ্টব্য ॥ ৬ ॥

ভাষ্য। প্রাপ্তস্তর্হি—

সূত্র। নিমিত্তনৈমিত্তিকভাবাদর্থান্তরভাবো দোষেভ্যঃ ॥ ॥৭॥৩৫০॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) তাহা হইলে, অর্থাৎ মোহ, রাগ ও দ্বেষের নিমিত্ত হইলে, "নিমিত্তনৈমিত্তিকভাব"বশতঃ দোষ হইতে (মোহের) অর্থান্তরভাব অর্থাৎ-ভেদ প্রাপ্ত হয়।

ভাষ্য। অন্যদ্ধি নিমিত্তমন্যচ্চ নৈমিত্তিকমিতি দোষনিমিত্তত্বাদদোষো মোহ ইতি।

অনুবাদ। যেহেতু নিমিত্ত অন্য, এবং নৈমিত্তিক অন্য, সুতরাং দোষের নিমিত্ততা-বশতঃ মোহ দোষ হইতে ভিন্ন।

টিপ্পনী। পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা আবার পূর্ব্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, মোহ, রাগ ও দ্বেষের নিমিত্ত হইলে, রাগ ও দ্বেষ ঐ মোহরূপ নিমিত্তজন্য বলিয়া নৈমিত্তিক, এবং মোহ, নিমিত্ত, সুতরাং মোহ এবং রাগ ও দ্বেষের "নিমিত্তনৈমিত্তিকভাব" স্বীকৃত হইতেছে। তাহা হইলে মোহ "দোষ" হইতে পারে না। কারণ, নিমিত্ত ও নৈমিত্তিক ভিন্নপদার্থই হইয়া থাকে। যাহা নিমিত্ত, তাহা নৈমিত্তিক হইতে পারে না। সুতরাং মোহকে দোষের নিমিত্ত বলিলে, উহাকে "দোষ" বলা যায় না। উহাকে দোষ হইতে অর্থান্তর অর্থাৎ ভিন্ন পদার্থই বলিতে হয় ॥ ৭ ॥

সূত্র। ন দোষলক্ষণাবরোধান্মোহস্য ॥৮॥৩৫১॥

অনুবাদ। (উত্তর) না, অর্থাৎ মোহ দোষ নহে, ইহা বলা যায় না কারণ, মোহের দোষলক্ষণের দ্বারা "অবরোধ" (সংগ্রহ) হয়।

ভাষ্য। "প্রবর্ত্তনালক্ষণা দোষা" ইত্যনেন দোষলক্ষণেনাবরুধ্যতে দোষেষু মোহ ইতি।

অনুবাদ। "দোষসমূহ প্রবর্ত্তনালক্ষণ" (অর্থাৎ প্রবৃত্তিজনকত্ব দোষের লক্ষণ) এই দোষলক্ষণের দ্বারা দোষসমূহের মধ্যে মোহ সংগৃহীত হয়।

টিপ্পনী। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বসূত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষের উত্তর বলিয়াছেন যে, দোষের যাহা লক্ষণ (প্রবৃত্তিজনকত্ব), তাহা মোহেও আছে, মোহও সেই দোষলক্ষণের দ্বারা দোষমধ্যে সংগৃহীত হইয়াছে। সুতরাং মোহ দোষ নহে, ইহা বলা যায় না। মোহ দোষান্তরের নিমিত্ত হইলেও নিজেও দোষলক্ষণাক্রান্ত। সুতরাং মোহ ও দোষবিশেষ বলিয়া দোষের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে ॥ ৮ ॥

সূত্র। নিমিত্তনৈমিত্তিকোপপত্তেশ্চ তুল্যজাতীয়ানামপ্রতিষেধঃ ॥৯॥৩৫১॥

অনুবাদ। (উত্তর) পরন্তু তুল্যজাতীয় পদার্থের মধ্যে নিমিত্ত ও নৈমিত্তিকের উপপত্তি (সত্তা)-বশতঃ (পূর্ব্বোক্ত) প্রতিষেধ হয় না।

ভাষ্য। দ্রব্যাণাং গুণানাং বাঽনেকবিধবিকল্পো নিমিত্ত-নৈমিত্তিকভাবে তুল্যজাতীয়ানাং দৃষ্ট ইতি।

অনুবাদ। তুল্যজাতীয় দ্রব্যসমূহ ও গুণসমূহের নিমিত্ত-নৈমিত্তিকভাবপ্রযুক্ত অনেকবিধ বিকল্প (নানাপ্রকার ভেদ) দৃষ্ট হয়।

টিপ্পনী। মোহ দোষ নহে, এই পূর্ব্বপক্ষসাধনে পূর্ব্বপক্ষবাদীর অভিমতহেতু দোষনিমিত্তত্ব। মহর্ষি পূর্ব্বসূত্রের দ্বারা ঐ হেতুর অপ্রযোজকত্ব সূচনা করিয়া, এই সূত্রের দ্বারা ঐ হেতুর ব্যভিচারিত্ব সূচনা করিয়াছেন। মহর্ষির কথা এই যে, একই পদার্থ নিমিত্ত ও নৈমিত্তিক হইতে পারে না বটে, কিন্তু একজাতীয় পদার্থের মধ্যে কেহ নিমিত্ত ও কেহ নৈমিত্তিক হইতে পারে। একজাতীয় দ্রব্য তাহার সজাতীয় দ্রব্যান্তরের নিমিত্ত হইতেছে। একজাতীয় গুণ তাহার সজাতীয় গুণান্তরের নিমিত্ত হইতেছে। এইরূপ দোষত্বরূপে সজাতীয় মোহ, রাগ ও দ্বেষরূপ দোষান্তরের নিমিত্ত হইতে পারে। সুতরাং দোষের নিমিত্ত বলিয়া মোহ দোষ নহে, এই পূর্ব্বপক্ষ সাধন করা যায় না। রাগ ও দ্বেষ, মোহের সজাতীয় দোষ হইলেও, মোহ হইতে ভিন্নপদার্থ, সুতরাং মোহ, রাগ ও দ্বেষের নিমিত্ত হইবার কোন বাধাও নাই ॥ ৯ ॥

দোষত্রৈরাশ্যপ্রকরণ সমাপ্ত ॥ ২ ॥

ভাষ্য। দোষানন্তরং প্রেত্যভাবঃ,—তস্যাসিদ্ধিরাত্মনো নিত্যত্বাৎ, ন খলু নিত্যং কিঞ্চিজ্জায়তে ম্রিয়তে বেতি জন্মমরণয়োর্নিত্যত্বাদাত্মনোঽনুপপত্তিঃ, উভয়ঞ্চ প্রেত্যভাব ইতি। তত্রায়ং সিদ্ধার্থানুবাদঃ।

অনুবাদ। দোষের অনন্তর প্রেত্যভাব (পরীক্ষণীয়)। [পূর্ব্বপক্ষ] আত্মার নিত্যত্ববশতঃ সেই প্রেত্যভাবের সিদ্ধি হয় না, কারণ, নিত্য কোন বস্তু জন্মে না, অথবা মৃত হয় না, অতএব আত্মার নিত্যত্ববশতঃ জন্ম ও মরণের উপপত্তি হয় না, কিন্তু উভয় অর্থাৎ আত্মার জন্ম ও মরণ "প্রেত্যভাব"। তদ্বিষয়ে ইহা অর্থাৎ মহর্ষির পরবর্ত্তী সিদ্ধান্তসূত্র সিদ্ধ অর্থের অনুবাদ।

সূত্র। আত্মনিত্যত্বে প্রেত্যভাব-সিদ্ধিঃ ॥১০॥৩৫২॥

অনুবাদ। (উত্তর) আত্মার নিত্যত্বপ্রযুক্ত প্রেত্যভাবের সিদ্ধি হয়।

ভাষ্য। নিত্যোঽয়মাত্মা প্রৈতি পূর্ব্বশরীরং জহাতি ম্রিয়ত ইতি। প্রেত্য চ পূর্ব্বশরীরং হিত্বা ভবতি জায়তে শরীরান্তরমুপাদত্ত ইতি। তচ্চৈতদুভয়ং "পুনরুৎপত্তিঃ প্রেত্যভাব" ইত্যত্রোক্তং, পূর্ব্বশরীরং হিত্বা শরীরান্তরোপাদানং প্রেত্যভাব ইতি। তচ্চৈতন্নিত্যত্বে সম্ভবতীতি। যস্য তু সত্ত্বোৎপাদঃ সত্ত্ব নিরোধঃ প্রেত্যভাবস্তস্য কৃতহান-মকৃতাভ্যাগমশ্চ দোষঃ। উচ্ছেদহেতুবাদে ঋষ্যুপদেশাশ্চানর্থকা ইতি।

অনুবাদ। নিত্য এই আত্মা প্রেত হয়, (অর্থাৎ) পূর্ব্বশরীর ত্যাগ করে—মৃত হয়। এবং মৃত হইয়া (অর্থাৎ) পূর্ব্বশরীর ত্যাগ করিয়া উৎপন্ন হয়, (অর্থাৎ) জন্মে, শরীরান্তর গ্রহণ করে। সেই এই উভয় অর্থাৎ আত্মার পূর্ব্বশরীর ত্যাগরূপ মরণ এবং শরীরান্তরগ্রহণরূপ পুনর্জ্জন্মই "পুনরুৎপত্তিঃ প্রেত্যভাবঃ"—এই সূত্রে উক্ত হইয়াছে। (ফলিতার্থ)—পূর্ব্বশরীর ত্যাগ করিয়া শরীরান্তর-গ্রহণ "প্রেত্যভাব"। সেই ইহাই অর্থাৎ আত্মার পূর্ব্বোক্তরূপ মরণ ও জন্মই (আত্মার) নিত্যত্বপ্রযুক্ত সম্ভব হয়। কিন্তু যাঁহার (মতে) আত্মার উৎপত্তি ও আত্মার বিনাশ "প্রেত্যভাব", তাঁহার (মতে) কৃতহানি ও অকৃতাভ্যাগম দোষ হয়। "উচ্ছেদবাদ" ও "হেতুবাদে" অর্থাৎ মৃত্যুকালে আত্মারই উচ্ছেদ বা বিনাশ হয় এবং শরীরের সহিত আত্মারও উৎপত্তি হয়, এই মতে ঋষিদিগের উপদেশও ব্যর্থ হয়।

টিপ্পনী। মহর্ষি "দোষ"-পরীক্ষার অনন্তর ক্রমানুসারে "প্রেত্যভাবের" পরীক্ষা করিতে এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, আত্মার নিত্যত্বপ্রযুক্ত "প্রেত্যভাবের" সিদ্ধি হয়। ভাষ্যকার মহর্ষির এই সিদ্ধান্তসূত্রের অবতারণা করিতে প্রথমে পূর্ব্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, আত্মা নিত্য, সুতরাং তাহার প্রেত্যভাব সিদ্ধ হইতে পারে না। অর্থাৎ প্রথম অধ্যায়ে "পুনরুৎপত্তিঃ প্রেত্যভাবঃ" (১। ১৯)—এই সূত্রের দ্বারা মরণের পরে পুনর্জন্মকেই প্রেত্যভাব বলা হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে আত্মার নিত্যত্ব সংস্থাপিত হইয়াছে। মরণের পরে জন্ম, জন্মের পরে মরণ, এইভাবে জন্ম ও মরণই প্রেত্যভাব। কিন্তু নিত্য-পদার্থের জন্ম ও মরণ না থাকায়, আত্মার জন্ম ও মরণরূপ প্রেত্যভাব কোন মতেই সম্ভব নহে। আত্মা অনিত্য হইলে, তাহার প্রেত্যভাব সম্ভব হইতে পারে। তৎপর্য্যটীকাকার পূর্ব্বপক্ষব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে,—বৈনাশিক (বৌদ্ধ)-সম্প্রদায়ের মতে আত্মার উৎপত্তি ও বিনাশ আছে, সুতরাং তাঁহাদিগের মতেই আত্মার জন্ম ও মরণরূপ প্রেত্যভাব সম্ভব হয়। যদি বল, যাহা মৃত বা বিনষ্ট, তাহার আর উৎপত্তি হইতে পারে না, বৌদ্ধমতেও বিনষ্টের পুনরুৎপত্তি হয় না। এতদুত্তরে তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, উৎপত্তির অনন্তর বিনাশই "প্রেত্যভাব" শব্দের দ্বারা বিবক্ষিত। যেমন নিদ্রার অনন্তর মুখব্যাদান করিলেও, "মুখং ব্যাদায় স্বপিতি" অর্থাৎ "মুখব্যাদান করিয়া নিদ্রা যাইতেছে" এইরূপ প্রয়োগ হয়, তদ্রূপ "ভূত্বা প্রায়ণং" অর্থাৎ উৎপত্তির অনন্তর মরণ এই অর্থেই "প্রেত্যভাব" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। নিত্য পদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশের অভাবে "প্রেত্যভাব" অসম্ভব হওয়ায়, যখন অনিত্য পদার্থেরই "প্রেত্যভাব" স্বীকার করিতে হইবে, তখন "প্রেত্যভাব" শব্দের দ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থই অবশ্যস্বীকার্য্য। মূলকথা, নিত্য আত্মার প্রেত্যভাব" অসম্ভব হওয়ায়, উহা অসিদ্ধ, ইহাই পূর্ব্বপক্ষ। মহর্ষি এই পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, আত্মার নিত্যত্বপ্রযুক্তই "প্রেত্যভাবের" সিদ্ধি হয়। মহর্ষির গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, অনাদি কাল হইতে একই আত্মার পুনঃ পুনঃ এক শরীর পরিত্যাগপূর্ব্বক অপর শরীর পরিগ্রহই "প্রেত্যভাব"। শরীরের সহিত আত্মার বিনাশ হইলে, সেই আত্মারই পুনর্ব্বার শরীরান্তর পরিগ্রহ সম্ভব না হওয়ায়, "প্রেত্যভাব" হইতে পারে না। আত্মা অনাদি ও অবিনাশী হইলে, সেই আত্মারই পুনর্ব্বার অভিনব শরীরাদির সহিত সম্বন্ধ হওয়ায়, "প্রেত্য-ভাব" হইতে পারে। তৃতীয় অধ্যায়ে আত্মার নিত্যত্ব সংস্থাপিত হইয়াছে। তদ্দ্বারা আত্মার প্রেত্যভাব ও সিদ্ধ হইয়াছে। কারণ, আত্মার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম সিদ্ধ হইলে, অনাদিত্ব ও পূর্ব্বশরীর পরিত্যাগের পরে অপর শরীরগ্রহণরূপ "প্রেত্যভাব"ই সিদ্ধ হয়। সুতরাং তৃতীয় অধ্যায়ে আত্মার নিত্যত্ব সংস্থাপনের দ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপ প্রেত্যভাবও সিদ্ধ হইয়াছে। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা ঐ পূর্ব্বসিদ্ধ পদার্থেরই অনুবাদ করিয়াছেন। তাই ভাষ্যকার এই সূত্রের অবতারণা করিতে এই সূত্রকে "সিদ্ধার্থানুবাদ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষ্যকার মহর্ষির অভিমত প্রেত্যভাবে"র ব্যাখ্যা করিতে "প্রৈতি" এই বাক্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "পূর্ব্বশরীরং জহাতি, উহারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "ম্রিয়তে"। অর্থাৎ প্র-পূর্ব্বক "ইণ্" ধাতুর অর্থ মরণ। মরণ বলিতে এখানে পূর্ব্বশরীর পরিত্যাগ। প্র-পূর্ব্বক "ইণ্" ধাতুর উত্তর ক্ত্বাচ্ প্রত্যয় হইলে "প্রেত্য"শব্দ সিদ্ধ হয়। ভাষ্যকার এখানে ঐ "প্রেত্য" শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "পূর্ব্ব-শরীরং হিত্বা", পরে "ভবতি" এই বাক্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "জায়তে"; উহারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "শরীরান্তরমুপাদত্তে"। অর্থাৎ "প্রেত্যভাব" শব্দের অন্তর্গত "ভাব" শব্দটি "ভূ" ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। "ভূ" ধাতুর অর্থ এখানে শরীরান্তরগ্রহণরূপ জন্ম। তাহা হইলে

"প্রেত্যভাব" শব্দের দ্বারা বুঝা যায়, পূর্ব্বশরীর পরিত্যাগ করিয়া শরীরান্তর গ্রহণ। আত্মার স্বরূপতঃ বিনাশ ও উৎপত্তি না থাকিলেও, পূর্ব্বশরীর পরিত্যাগরূপ মরণ ও অপর শরীর গ্রহণরূপ জন্ম হইতে পারে। আত্মার নিত্যত্বপক্ষে পূর্ব্বোক্তরূপ মরণ ও জন্ম সম্ভব হয়। সুতরাং "পুনরুৎপত্তিঃ প্রেত্যভাবঃ" ।১।১।১৯।—এই সূত্রে পূর্ব্বোক্তরূপ মরণ ও জন্মকেই মহর্ষি "প্রেত্যভাব" বলিয়াছেন, বুঝিতে হইবে। বৌদ্ধ দার্শনিকগণ নিত্য আত্মা স্বীকার করেন নাই, তাঁহাদিগের মতে আত্মার উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। তাঁহারা "প্রেত্যভাব" শব্দের অন্তর্গত ধাতুদ্বয়ের মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিয়া, আত্মার বিনাশ ও উৎপত্তিকেই "প্রেত্যভাব" বলিয়াছেন। ভাষ্যকার মহর্ষির অভিমত "প্রেত্যভাবে"র ব্যাখ্যা করিয়া শেষে পূর্ব্বোক্ত বৌদ্ধ মতের অনুপপত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন যে, আত্মার স্বরূপতঃ বিনাশ ও উৎপত্তি স্বীকার করিয়া, উহাকেই "প্রেত্যভাব" বলিলে. যে আত্মা, পূর্ব্বে কর্ম্ম করিয়াছে, সেই আত্মা ফলভোগকাল পর্য্যন্ত না থাকায়, তাহার "কৃতহানি" দোষ হয়। এবং যে আত্মা সেই পূর্ব্বকর্ম্মের কর্ত্তা নহে, তাহারই সেই কর্ম্মের ফলভোগ স্বীকার করিতে হইলে, "অকৃতাভ্যাগম" দোষ হয়। স্বকৃত কর্ম্মের ফলভোগ অসম্ভব হইলে, সর্ব্বত্রই আত্মার "কৃতহানি" দোষ অনিবার্য্য। এবং পরকৃত কর্ম্মেরই ফলভোগ হইলে, "অকৃতাভ্যাগম" দোষ অনিবার্য্য। (তৃতীয় অধ্যায়, প্রথম আহ্নিকের চতুর্থ সূত্রভাষ্য ও তৃতীয় খণ্ড, ২৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

ভাষ্যকার শেষে আরও বলিয়াছেন যে, "উচ্ছেদবাদ" ও "হেতুবাদে" ঋষিদিগের উপদেশও ব্যর্থ হয়। ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্ত নাস্তিক-সম্প্রদায়ের এই "উচ্ছেদবাদ" ও "হেতুবাদ" অতি প্রাচীন মত। বৌদ্ধ পালিগ্রন্থ "ব্রহ্মজালসুত্তে"ও এই বাদের উল্লেখ দেখা যায়[১]; "যোগদর্শনে"র ব্যাসভাষ্যেও পৃথগ্‌ভাবে "উচ্ছেদবাদ" ও হেতুবাদে"র উল্লেখ দেখা যায়[২]। মৃত্যুর পরে আত্মা থাকে না, আত্মার বিনাশ হয়, আত্মার উচ্ছেদ অর্থাৎ বিনাশই মৃত্যু, এই মত "উচ্ছেদবাদ" নামে কথিত হইয়াছে। এবং সকল পদার্থেরই হেতু আছে, নির্হেতুক অর্থাৎ কারণশূন্য কিছুই নাই। সুতরাং আত্মারও অবশ্য হেতু আছে, শরীরের সহিত আত্মারও উৎপত্তি হয়, এই মত "হেতুবাদ"-নামে কথিত হইয়াছে। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, আত্মার উচ্ছেদ হইলে, অর্থাৎ মৃত্যুর পরে আত্মা না থাকিলে, আত্মার কর্ম্মজন্য পারলৌকিক ফলভোগ অসম্ভব, এবং আত্মার হেতু থাকিলে, অর্থাৎ শরীরের সহিত আত্মার উৎপত্তি হইলে, ঐ আত্মা পূর্ব্বে না থাকায়, তাহার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলভোগও অসম্ভব। সুতরাং ঋষিগণ কর্ম্মবিশেষের অনুষ্ঠান ও কর্ম্মবিশেষের বর্জ্জন করিতে যে সমস্ত উপদেশ করিয়াছেন, তাহাও নিষ্ফল হয়। সুতরাং আত্মার উৎপত্তি ও বিনাশ কোনরূপেই প্রমাণসিদ্ধ হইতে পারে

১। "সন্তিভিক্খবে একে সমণ ব্রাহ্মণা উচ্ছেদবাদা সত্তস্স উচ্ছেদং বিনাসং বিভবং পঞ্ঞাপেন্তি সত্ত হি বৎথূহি" ইত্যাদি—ব্রহ্মজালসুত্ত, দীঘনিকায়। ১।৩।৯—১০।

২। "তত্র হাতুঃ স্বরূপমুপাদেয়ং হেয়ং বা ন ভবিতুমর্হতীতি, হানে তস্যোচ্ছেদবাদপ্রসঙ্গঃ, উপাদানে চ হেতুবাদঃ।"—যোগদর্শন, সমাধিপাদ, ১৫শ সূত্রভাষ্য।

না। স্বয়ং বুদ্ধদেবও যে, নানাকর্ম্মের উপদেশ করিয়াছেন এবং তাঁহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের অনেক কর্ম্মের বার্ত্তা বলিয়াছেন, তাহাই বা কিরূপে উপপন্ন হইবে? তাঁহার মতে আত্মার উৎপত্তি ও বিনাশ হইলে, তাঁহার ঐ সমস্ত উপদেশ কিরূপে সার্থক হইবে? ইহাও প্রণিধান করা আবশ্যক। আত্মার নিত্যত্ব ও "প্রেত্যভাব"-বিষয়ে নানা যুক্তি তৃতীয় অধ্যায়েই বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয় খণ্ড, ৫৮ পৃষ্ঠা হইতে ৮৫ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য ॥ ১০ ॥

ভাষ্য। কথমুৎপত্তিরিতি চেৎ,—

অনুবাদ। (প্রশ্ন) কিরূপে উৎপত্তি হয়, ইহা যদি বল?—

সূত্র। ব্যক্তাদ্ব্যক্তানাং প্রত্যক্ষপ্রামাণ্যাৎ ॥১১॥৩৫৩॥

অনুবাদ। (উত্তর) প্রত্যক্ষের প্রামাণ্যবশতঃ ব্যক্ত হইতে ব্যক্তসমূহের (উৎপত্তি হয়) অর্থাৎ ব্যক্তই ব্যক্তের উপাদানকারণ, ইহা প্রত্যক্ষপ্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয়।

ভাষ্য। কেন প্রকারেণ কিং ধর্ম্মকাৎ কারণাদ্ব্যক্তং শরীরাদ্যুৎপদ্যত? ইতি,—ব্যক্তাদ্ভূতসমাখ্যাতাৎ পৃথিব্যাদিতঃ পরমসূক্ষ্মান্নিত্যাদ্ব্যক্তং শরীরেন্দ্রিয়বিষয়োপকরণাধারং[১] প্রজ্ঞাতং দ্রব্যমুৎপদ্যতে। ব্যক্তঞ্চ খল্বিন্দ্রিয়গ্রাহ্যং, তৎসামান্যাৎ কারণমপি ব্যক্তং। কিং সামান্যং? রূপাদিগুণযোগঃ। রূপাদিগুণযুক্তেভ্যঃ পৃথিব্যাদিভ্যো নিত্যেভ্যো রূপাদিগুণযুক্তং শরীরাদ্যুৎপদ্যতে। প্রত্যক্ষপ্রামাণ্যাৎ—দৃষ্টো হি রূপাদিগুণযুক্তেভ্যো মৃৎপ্রভৃতিভ্যস্তথাভূতস্য দ্রব্যস্যোৎপাদঃ, তেন চাদৃষ্টস্যানুমানমিতি। রূপাদীনামন্বয়দর্শনাৎ প্রকৃতিবিকারয়োঃ পৃথিব্যাদীনাং নিত্যানামতীন্দ্রিয়াণাং কারণভাবোঽনুমীয়ত ইতি।

অনুবাদ। (প্রশ্ন) কি প্রকারে কি ধর্ম্মবিশিষ্ট কারণ হইতে ব্যক্ত শরীরাদি উৎপন্ন হয়?—(উত্তর) ভূত নামক অতি সূক্ষ্ম নিত্য পৃথিবী প্রভৃতি ব্যক্ত অর্থাৎ ব্যক্তসদৃশ পরমাণু হইতে শরীর, ইন্দ্রিয়, বিষয়, উপকরণ ও আধাররূপ প্রজ্ঞাত (প্রমাণসিদ্ধ) অব্যক্ত দ্রব্য উৎপন্ন হয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যই কিন্তু ব্যক্ত, সেই ব্যক্তের সাদৃশ্যপ্রযুক্ত (তাহার) কারণও অর্থাৎ মূলকারণ পরমাণুও ব্যক্ত। (প্রশ্ন) সাদৃশ্য কি? (উত্তর) রূপাদিগুণবত্তা। রূপাদিগুণবিশিষ্ট নিত্য

১। এখানে সমাহার দ্বন্দ্বসমাস বুঝিতে হইবে। "শরীরেন্দ্রিয়বিষয়োপকরণাধারমিতি একবদ্ভাবেন নপুংসকত্বং।"—তাৎপর্য্যটীকা।

তদ্রূপ উহার মূলকারণ পরমাণুতেও রূপাদি গুণ আছে। কারণের বিশেষ গুণজন্যই কার্য্যদ্রব্যে তাহার সজাতীয় বিশেষ গুণ উৎপন্ন হয়। মূলকারণ পরমাণুতে রূপাদি গুণ না থাকিলে, তাহার কার্য্য "দ্ব্যণুকে" রূপাদি জন্মিতে পারে না। সুতরাং "ত্র্যণুক," প্রভৃতি স্থূল দ্রব্যেও রূপাদি গুণবত্তা অসম্ভব হয়। সুতরাং পার্থিবাদি পরমাণুসমূহেও রূপাদি গুণবত্তা স্বীকৃত হওয়ায়, ঐ পরমাণুসমূহ ব্যক্ত না হইলেও, ব্যক্তসদৃশ, তাই মহর্ষি "ব্যক্তাৎ" এই পদে "ব্যক্ত" শব্দের দ্বারা ঘটাদি ব্যক্তদ্রব্যের সদৃশ অতীন্দ্রিয় পরমাণুকে গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ মহর্ষি এখানে ব্যক্তসদৃশ বা ব্যক্তজাতীয় অর্থে "ব্যক্ত" শব্দের গৌণ প্রয়োগ করিয়াছেন এবং ঐরূপ গৌণপ্রয়োগ করিয়া রূপাদিগুণবিশিষ্ট দ্রব্যই যে, তাদৃশ দ্রব্যের উপাদানকারণ হয়, ইহা সূচনা করিয়াছেন। তাই ভাষ্যকার পরমাণুতে শরীরাদি ব্যক্তদ্রব্যের সাদৃশ্য (রূপাদিগুণবত্তা) বলিয়া মহর্ষির সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, রূপাদিগুণবিশিষ্ট পৃথিব্যাদি নিত্যদ্রব্যসমূহ (পার্থিবাদিপরমাণুসমূহ) হইতে রূপাদিগুণবিশিষ্ট শরীরাদি উৎপন্ন হয়। তাহা হইলে এখানে "ব্যক্তাৎ" এই পদে "ব্যক্ত" শব্দের ফলিতার্থ বুঝা যায়, রূপাদিগুণবিশিষ্ট নিত্যদ্রব্য, অর্থাৎ পার্থিবাদি পরমাণু। উহা ব্যক্ত (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য) না হইলেও, তৎসদৃশ বলিয়া "ব্যক্ত" শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে। এখানে সূত্রার্থে ভ্রম-নিবারণের জন্য উদ্দ্যোতকর শেষে বলিয়াছেন যে, কেবল রূপাদিগুণবিশিষ্ট দ্রব্যবিশেষ হইতেই যে, তাদৃশ দ্রব্যের উৎপত্তি হয়, ইহা সূত্রার্থ নহে। কারণ, রূপাদিশূন্য সংযোগও দ্রব্যের কারণ। কিন্তু ব্যক্ত শরীরাদি-দ্রব্যের উৎপত্তিতে যে সমস্ত কারণ (সামগ্রী) আবশ্যক, তন্মধ্যে রূপাদিগুণবিশিষ্ট পরমাণুই মূলকারণ, ইহাই সূত্রকারের তাৎপর্য্য। দ্বিতীয় আহ্নিকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রকরণে "পরমাণু-কারণবাদে"র আলোচনা দ্রষ্টব্য॥ ১১॥

সূত্র। ন ঘটাদ্‌ঘটানিষ্পত্তেঃ ॥১২॥৩৫৪॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) না, অর্থাৎ ব্যক্তদ্রব্য ব্যক্তদ্রব্যের কারণ নহে। কারণ, ঘট হইতে ঘটের উৎপত্তি হয় না।

ভাষ্য। ইদমপি প্রত্যক্ষং, ন খলু ব্যক্তাদ্‌ঘটাদ্ব্যক্তো ঘট উৎপদ্যমানো দৃশ্যত ইতি। ব্যক্তাদ্‌ব্যক্তস্যানুৎপত্তিদর্শনান্ন ব্যক্তং কারণমিতি।

অনুবাদ। ব্যক্ত ঘট হইতে ব্যক্ত ঘট উৎপদ্যমান দৃষ্ট হয় না, ইহাও প্রত্যক্ষ। ব্যক্ত হইতে ব্যক্তের অনুৎপত্তির দর্শনবশতঃ ব্যক্ত কারণ নহে।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ব্বসূত্রের দ্বারা তাঁহার অভিমত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া, এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বসূত্রের তাৎপর্য্যবিষয়ে ভ্রান্ত ব্যক্তির পূর্ব্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, ঘট হইতে যখন ঘটের উৎপত্তি হয় না, তখন ব্যক্ত হইতে ব্যক্তের উৎপত্তি হয়, ইহা বলা যায় না। যদি ব্যক্ত দ্রব্য হইতে ব্যক্ত দ্রব্যের উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে ঘট হইতে ঘটের উৎপত্তি হউক? কিন্তু তাহা ত হয় না। যেমন মৃত্তিকা প্রভৃতি ব্যক্ত দ্রব্য হইতে ঘটাদি ব্যক্ত দ্রব্যের উৎপত্তি প্রত্যক্ষসিদ্ধ

বলিয়া প্রত্যক্ষের প্রামাণ্যবশতঃ ব্যক্ত ব্যক্তের কারণ—ইহা বলা হইয়াছে, তদ্রূপ ঘটনামক ব্যক্ত দ্রব্য হইতে ঘটনামক ব্যক্ত দ্রব্যের উৎপত্তি হয় না, ইহাও ত প্রত্যক্ষসিদ্ধ, সুতরাং ব্যক্ত (ঘট) হইতে ব্যক্তের (ঘটের) অনুৎপত্তির প্রত্যক্ষ হওয়ায়, ঐ প্রত্যক্ষের প্রামাণ্যবশতঃ ব্যক্ত ব্যক্তের কারণ নহে, ইহা বলিতে পারি। ফলকথা, ঘট হইতে যখন ঘটের উৎপত্তি হয় না, তখন ব্যক্তের কারণ ব্যক্ত, এইরূপ কার্য্যকারণভাবে ব্যভিচারবশতঃ ব্যক্ত ব্যক্তের কারণ নহে, ইহাই পূর্ব্বপক্ষ ॥১২॥

সূত্র। ব্যক্তাদ্‌ঘটনিষ্পত্তেরপ্রতিষেধঃ ॥১৩॥৩৫৫॥

অনুবাদ। (উত্তর) ব্যক্ত (মৃত্তিকা) হইতে ঘটের উৎপত্তি হওয়ায়, প্রতিষেধ (পূর্ব্বসূত্রোক্ত কারণত্বের প্রতিষেধ) নাই।

ভাষ্য। ন ব্রুমঃ সর্ব্বং সর্ব্বস্য কারণমিতি, কিন্তু যদুৎপদ্যতে ব্যক্তং দ্রব্যং তত্তথাভূতাদেবোৎপদ্যত ইতি। ব্যক্তঞ্চ তন্মৃদ্দ্রব্যং কপাল-সংজ্ঞকং, যতো ঘট উৎপদ্যতে। ন চৈতন্নিহ্নুবানঃ ক্বচিদভ্যনুজ্ঞাং লব্ধু-মর্হতীতি। তদেতত্তত্ত্বং।

অনুবাদ। সমস্ত পদার্থ সমস্ত পদার্থের কারণ, ইহা আমরা বলি না, কিন্তু যে ব্যক্তদ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহা তথাভূত অর্থাৎ ব্যক্ত দ্রব্য হইতেই উৎপন্ন হয়, ইহাই আমরা বলি। যাহা হইতে ঘট উৎপন্ন হয়, কপাল নামক সেই মৃত্তিকারূপ দ্রব্য, ব্যক্তই। ইহার অপলাপকারী অর্থাৎ যিনি পূর্ব্বোক্তরূপ প্রত্যক্ষসিদ্ধ কার্য্যকারণভাবকেও স্বীকার করেন না, তিনি কোন বিষয়ে অভ্যনুজ্ঞা লাভ করিতে পারেন না। সেই ইহা অর্থাৎ পার্থিবাদি পরমাণু হইতে শরীরাদি ব্যক্ত দ্রব্যের উৎপত্তি হয়, এই পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তই তত্ত্ব।

টিপ্পনী। পূর্ব্বসূত্রোক্ত ভ্রান্তিমূলক পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করিতে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, ব্যক্ত দ্রব্যে ব্যক্তদ্রব্যের কারণত্বের প্রতিষেধ (অভাব) নাই, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত-রূপ কার্য্যকারণভাবে ব্যভিচার না থাকায়, ব্যক্তদ্রব্যে ব্যক্তদ্রব্যের কারণত্বই সিদ্ধ আছে। অবশ্য ব্যক্ত ঘট হইতে ব্যক্ত ঘটের উৎপত্তি হয় না, ইহা সত্য, কিন্তু আমরা ত সমস্ত ব্যক্তদ্রব্য হইতেই সমস্ত ব্যক্ত দ্রব্যের উৎপত্তি হয়, ইহা বলি নাই। যে ব্যক্ত দ্রব্য উৎপন্ন হয়, তাহা ব্যক্ত দ্রব্য হইতেই উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ রূপাদিগুণবিশিষ্ট দ্রব্যই ঐরূপ দ্রব্যের উপাদান-কারণ, ইহাই আমরা বলিয়াছি। কপাল নামক মৃত্তিকারূপ যে দ্রব্য হইতে ঘটের উৎপত্তি হয়, ঐ দ্রব্য ব্যক্তই ; সুতরাং ব্যক্তদ্রব্যই ব্যক্ত দ্রব্যের উপাদানকারণ, এইরূপ পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ব্যভিচার নাই। কপাল নামক মৃত্তিকাবিশেষ হইতে ঘটের উৎপত্তি হয়, এবং তন্তু প্রভৃতি ব্যক্ত দ্রব্য হইতে বস্ত্রাদির উৎপত্তি হয়, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। যিনি এই প্রত্যক্ষসিদ্ধ কার্য্য

কারণভাবও স্বীকার করেন না, তিনি কোন বিষয়েই অনুজ্ঞা লাভ করিতে পারেন না। অর্থাৎ ঐরূপ প্রত্যক্ষের অপলাপ করিলে, তাঁহার কোন কথাই গ্রাহ্য হইতে পারে না। সার্ব্বজনীন অনুভবের অপলাপ করিলে, তাঁহার বিচারে অধিকারই থাকে না। সুতরাং কপাল ও তন্তু প্রভৃতি ব্যক্ত দ্রব্য যে, ঘট ও বস্ত্র প্রভৃতি ব্যক্ত দ্রব্যের উপাদানকারণ, ইহা সকলেরই অবশ্যস্বীকার্য্য। তাহা হইলে রূপাদিগুণবিশিষ্ট অতীন্দ্রিয় পার্থিবাদি পরমাণুই যে, তথাবিধ ব্যক্ত দ্রব্যের মূলকারণ অর্থাৎ পরমাণু-হইতেই দ্ব্যণুকাদিক্রমে সমস্ত জন্যদ্রব্যের সৃষ্টি হইয়াছে, এই পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত অবশ্যস্বীকার্য্য। মহর্ষি গোতমের মতে ঐ সিদ্ধান্তই তত্ত্ব॥১৩॥

প্রেত্যভাবপরীক্ষাপ্রকরণসমাপ্ত ॥৩॥

ভাষ্য। অতঃপরং প্রাবাদুকানাং দৃষ্টয়ঃ প্রদর্শ্যন্তে—

অনুবাদ। অতঃপর (মহর্ষির নিজ মত প্রদর্শনের অনন্তর) "প্রাবাদুক"গণের (বিভিন্ন বিরুদ্ধমতবাদী দার্শনিকগণের) "দৃষ্টি" অর্থাৎ নানাবিধ দর্শন বা মতান্তর প্রদর্শিত হইতেছে।

সূত্র। অভাবাদ্ভাবোৎপত্তির্নানুপমৃদ্য প্রাদুর্ভাবাৎ ॥ ॥১৪॥৩৫৬॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) অভাব হইতেই ভাব পদার্থের উৎপত্তি হয়। কারণ, (বীজাদির) উপমর্দ্দন (বিনাশ) না করিয়া (অঙ্কুরাদির) প্রাদুর্ভাব হয় না।

ভাষ্য। **অসতঃ সদুৎপদ্যতে** ইত্যয়ং পক্ষঃ, কস্মাৎ? **উপমৃদ্য প্রাদুর্ভাবাৎ**—উপমৃদ্য বীজমঙ্কুর উৎপদ্যতে নানুপমৃদ্য, ন চেদ্বীজোপমর্দ্দোঽঙ্কুরকারণং, অনুপমর্দ্দেঽপি বীজস্যাঙ্কুরোৎপত্তিঃ স্যাদিতি।

অনুবাদ। অসৎ অর্থাৎ অভাব হইতেই সৎ (ভাবপদার্থ) উৎপন্ন হয়, ইহা পক্ষ অর্থাৎ ইহাই সিদ্ধান্ত বা তত্ত্ব, (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) যেহেতু উপমর্দ্দন করিয়াই প্রাদুর্ভাব হয়। বিশদার্থ এই যে, বীজকে উপমর্দ্দন (বিনাশ) করিয়া অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, উপমর্দ্দন না করিয়া, উৎপন্ন হয় না। যদি বীজের বিনাশ অঙ্কুরের কারণ না হয়, তাহা হইলে বীজের বিনাশ না হইলেও অঙ্কুরের উৎপত্তি হউক ?

টিপ্পনী। মহর্ষি "প্রেত্যভাবে"র পরীক্ষাপ্রসঙ্গে "ব্যক্তাদ্ব্যক্তানাং" ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা শরীরাদির মূল কারণ সূচনা করিয়া, তাঁহার মতে পাথিবাদি চতুর্ব্বিধ পরমাণুই জন্যদ্রব্যের মূল কারণ, এই সিদ্ধান্ত সূচনা করিয়াছেন। ভাষ্যকারও পূর্ব্বসূত্রভাষ্যের শেষে "তদেতত্তত্ত্বং" এই কথা বলিয়া মর্হিষ গোতমের মতে উহাই যে, তত্ত্ব, ইহা স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। মহর্ষি এখন তাঁহার পূর্ব্বোক্ত ঐ তত্ত্ব বা সিদ্ধান্ত সুদৃঢ় করিবার জন্যই,এখানে কতিপয় মতান্তরের উল্লেখপূর্ব্বক খণ্ডন করিয়াছেন। বিরুদ্ধ মতের খণ্ডন ব্যতীত নিজ মতের প্রতিষ্ঠা হয় না, এবং প্রকৃত তত্ত্বের পরীক্ষা করিতে হইলে, নানা মতের সমালোচনা করিতেই হইবে। তাই মহর্ষি এখানে অন্যান্য মতেরও প্রদর্শনপূর্ব্বক খণ্ডন করিয়াছেন। ভাষ্যকার ঐ সকল মতকে 'প্রাবাদুক" গণের "দৃষ্টি" বলিয়াছেন। যাঁহারা নানাবিরুদ্ধ মত বলিয়াছেন, যাঁহাদিগের মত কেবল স্বসম্প্রদায়মাত্রসিদ্ধ, অন্য সম্প্রদায়ের অসম্মত, তাঁহারা প্রাচীনকালে "প্রাবাদুক' নামে কথিত হইতেন এবং তাঁহাদিগের ঐ সমস্ত মত "দৃষ্টি" শব্দের দ্বারাও কথিত হইত। তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকের প্রথম সূত্রভাষ্যে ভাষ্যকার সাংখ্যদর্শনতাৎপর্য্যেও "দৃষ্টি" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। সেখানে "দৃষ্টি" শব্দের দ্বারা যে, সাংখ্যশাস্ত্র ও ভাষ্যকারের বিবক্ষিত হইতে পারে, ইহা সেখানে বলিয়াছি। এসম্বন্ধে অন্যান্য কথা এই অধ্যায়ের শেষভাগে দ্রষ্টব্য।

মহর্ষি প্রথমে এই সূত্রের দ্বারা "অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয়," অর্থাৎ অভাবই জগতের উপাদান-কারণ, এই মতকে পূর্ব্বপক্ষরূপে প্রকাশ ও হেতুর দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন। ভাষ্যকার সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করতঃ পূর্ব্বপক্ষ বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, "অভাব হইতে ভাবপদার্থ উৎপন্ন হয়"—ইহাই পক্ষ, অর্থাৎ সিদ্ধান্ত। কারণ, "উপমর্দ্দনের অনন্তর প্রাদুর্ভাব হয়[১]," ভূগর্ভে বীজের উপমর্দ্দন অর্থাৎ বিনাশ না হওয়া পর্য্যন্ত অঙ্কুরের উৎপত্তি হয় না। সুতরাং বীজের বিনাশ অঙ্কুরের কারণ, ইহা স্বীকার্য্য। বীজের বিনাশরূপ

১। সূত্রে হেতুবাক্য বলা হইয়াছে, "নানুপমৃদ্য প্রাদুর্ভাবাৎ"। এই বাক্যের প্রথমোক্ত "নঞ্" শব্দের সহিত শেষোক্ত "প্রাদুর্ভাব" শব্দের যোগই এখানে সূত্রকারের অভিপ্রেত। সুতরাং ঐ বাক্যের দ্বারা উপমর্দ্দন না করিয়া প্রাদুর্ভাবের অভাবই বুঝা যায়। তাহা হইলে উপমর্দ্দন করিয়া প্রাদুর্ভাব, ইহাই ঐ বাক্যের ফলিতার্থ হয়। তাই ভাষ্যকার সূত্রোক্ত হেতুবাক্যের ফলিতার্থ গ্রহণ করিয়াই হেতুবাক্য বলিয়াছেন, "উপমৃদ্য প্রাদুর্ভাবাৎ"। এই সূত্রে দূরস্থ "নঞ্" শব্দার্থ অভাবের সহিত শেষোক্ত "প্রাদুর্ভাব" পদার্থের অন্বয়বোধ হইবে। বক্তার তাৎপর্য্যানুসারে স্থলবিশেষে ঐরূপ অন্বয় বোধও হয়, ইহা নব্য নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি প্রভৃতিও বলিয়াছেন। "পদার্থতত্ত্বনিরূপণ" নামক গ্রন্থের শেষভাগে রঘুনাথ শিরোমণি লিখিয়াছেন, "নানুপমৃদ্য প্রাদুর্ভাবাদিতি সূত্রং। অনুপমৃদ্য প্রাদুর্ভাবাভাবাদিত্যর্থঃ"। "পদার্থতত্ত্বনিরূপণের" দ্বিতীয় টীকাকার রামভদ্র সার্ব্বভৌম পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যা সমর্থনপূর্ব্বক মহর্ষি গোতমের পূর্ব্বোক্ত "নামূর্ত্তস্যেতরোৎপত্তেঃ" এই সূত্রবাক্যেও যে দূরস্থ "নঞ্" শব্দের সহিত শেষোক্ত উৎপত্তি" শব্দের যোগই মহর্ষির অভিমত, ইহাও তিনি সেই সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। "দ্বিতীয়া ব্যুৎপত্তিবাদে" মহানৈয়ায়িক গদাধর ভট্টাচার্য্যও পূর্ব্বোক্ত উভয় বাক্যে পঞ্চমী বিভক্তির অর্থ যে হেতুত্ব, উহার বিশেষণভাবে এবং যথাক্রমে "উৎপত্তি" ও "প্রাদুর্ভাবের" বিশেষ্যভাবে "নঞ্" শব্দার্থ অভাবের অন্বয়বোধ হয়, ইহা লিখিয়াছেন। যথা, 'নামূর্ত্তস্যেতরোৎপত্তেঃ' 'নানুপমৃদ্য প্রাদুর্ভাবা'দিত্যাদৌ নঞর্থমাত্রস্য পঞ্চম্যর্থহেতুতায়াং বিশেষণত্বেন প্রকৃত্যর্থস্য চ বিশেষ্যত্বে- নান্বয়াৎ।"—ব্যুৎপত্তিবাদ।

অভাবকে অঙ্কুরের কারণ বলিয়া স্বীকার না করিলে, বীজবিনাশের পূর্ব্বেও অঙ্কুরের উৎপত্তি হইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত মতবাদীদিগের কথা এই যে, বীজ বিনষ্ট হইলেই যখন অঙ্কুরের উৎপত্তি হয়, তখন বীজের অভাবকে অঙ্কুরের উপাদান-কারণ বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, বীজ বিনষ্ট হইলে, তখন ঐ বীজের কোনরূপ সত্তা থাকে না, উহা অভাব-মাত্রে পর্য্যবসিত হয়। সুতরাং সেই অভাবই তখন অঙ্কুরের উপাদান হইবে, ইহা স্বীকার্য্য। এইরূপ বস্ত্রনির্ম্মাণ করিতে যে সমস্ত তন্তু গ্রহণ করা হয়, তাহাও ঐ বস্ত্রের উৎপত্তির পূর্ব্বক্ষণে বিনষ্ট হয়। সেই পূর্ব্ব তন্তুর বিনাশরূপ অভাব হইতেই বস্ত্রের উৎপত্তি হয়। সেইস্থলে পূর্ব্ব তন্তুর বিনাশ প্রত্যক্ষ না হইলেও, অনুমান-প্রমাণের দ্বারা উহা সিদ্ধ হইবে। কারণ, অঙ্কুর দৃষ্টান্তে সর্ব্বত্রই ভাবমাত্রের উপাদান অভাব, ইহা অনুমানপ্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয়[১]। তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, "নানুপমৃদ্য প্রাদুর্ভাবাৎ"—এই হেতুবাক্য এখানে উপলক্ষণ। উহার দ্বারা এখানে "অসত উৎ-পাদাৎ", এইরূপ হেতুবাক্যও বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ যাহা অসৎ, উৎপত্তির পূর্ব্বে যাহার অভাব থাকে, তাহারই উৎপত্তি হওয়ায়, ঐ অভাব হইতেই ভাবের উৎপত্তি হয়, ঐ অভাবই ভাবের উপাদান, ইহাও পূর্ব্বোক্ত মতবাদিগণের কথা বুঝিতে হইবে। শেষোক্ত যুক্তি অনুসারে কার্য্যের প্রাগভাবই সেই কার্য্যের উপাদান, ইহাই বলা হয়। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত মতবাদীরা যে কার্য্যের প্রাগভাবকে ও কার্য্যের উপাদান বলিয়াছেন, ইহা বুঝিতে পারা যায় না। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও পূর্ব্বোক্ত মতের বর্ণন করিতে ঐরূপ কথা বলেন নাই। তিনি পূর্ব্বোক্ত মতকে বৌদ্ধমত বলিয়া বেদান্তদর্শনের "নাসতোঽদৃষ্টত্বাৎ" ইত্যাদি—(২।২।২৬।২৭) দুইটি সূত্রের দ্বারা শারীরক-ভাষ্যে এই মতের খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, অভাব নিঃস্বরূপ, শশশৃঙ্গ প্রভৃতিও অভাব অর্থাৎ অবস্তু। নিঃস্বরূপ অভাব বা অবস্তু ভাব-পদার্থের উপাদান হইলে, শশশৃঙ্গ প্রভৃতি হইতেও বস্তুর উৎপত্তি হইতে পারে। কারণ, অভাবের কোন বিশেষ নাই। অভাবের বিশেষ স্বীকার করিলে, উহাকে ভাবপদার্থই স্বীকার করিতে হয়। পরন্তু অভাবই ভাবের উপাদান হইলে, ঐ অভাব হইতে উৎপন্ন ভাবমাত্রই অভাবান্বিত বলিয়াই প্রতীত হইত। কিন্তু কার্য্যদ্রব্য ঘট-পটাদি অভাবান্বিত বলিয়া কখনই প্রতীত হয় না। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এইরূপ নানা যুক্তির দ্বারা পূর্ব্বোক্ত বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়া, ইহাও বলিয়াছেন যে, বৈনাশিক বৌদ্ধ-সম্প্রদায় জগতের মূল কারণ বিষয়ে অন্যরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াও শেষে আবার অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি কল্পনা করিয়া স্বীকৃত পূর্ব্বসিদ্ধান্তের অপলাপ করিয়াছেন। কিন্তু নানাবিধ বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মধ্যে কোন সম্প্রদায়বিশেষ অভাবকেই জগতের মূল কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, ইহা বুঝিলে, তাঁহাদিগের নানা মতের পরস্পর বিরোধের সমাধান হইতে পারে। প্রাচীন বৌদ্ধসম্প্রদায়ের অনেক দার্শনিক গ্রন্থ

১। পটাদিকং অভাবোপাদানকং ভাবকার্য্যত্বাৎ অঙ্কুরাদিবৎ।

বহুদিন হইতেই বিলুপ্ত হইয়াছে। সুতরাং তাঁহাদিগের সমস্ত মত ও যুক্তি-বিচারাদি সম্পূর্ণরূপে এখন আর জানিবার উপায় নাই। সে যাহা হউক, "নানুপমৃদ্য প্রাদুর্ভাবাৎ" এইরূপ হেতুবাক্যের দ্বারা কোন বৌদ্ধসম্প্রদায়বিশেষ যে, অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি সমর্থন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের মতে ঐ অভাব শশশৃঙ্গাদির ন্যায় নির্ব্বিশেষ অবস্তু, ইহা আমরা শারীরকভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের কথার দ্বারা স্পষ্ট বুঝিতে পারি। শঙ্করাচার্য্য কল্পনা করিয়া উহা বৌদ্ধ মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। বস্তুতঃ এক অদ্বিতীয় অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হইয়াছে, এই মত উপনিষদেই পূর্ব্বপক্ষরূপে সূচিত আছে[১]। অনাদিকাল হইতেই যে ঐরূপ মতান্তরের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা "একে আহুঃ" এইরূপ বাক্যের দ্বারা উপনিষদেই স্পষ্ট বর্ণিত আছে। ঐ মত পরবর্ত্তী বৌদ্ধবিশেষেরই উদ্ভাবিত নহে। মহর্ষি গোতম এখানে এই মতের খণ্ডন করিয়া, উপনিষদে উহা যে, পূর্ব্বপক্ষরূপেই কথিত হইয়াছে, ইহা বুঝাইয়াছেন। বেদে পূর্ব্বপক্ষরূপেও নানা বিরুদ্ধ মতের বর্ণন আছে। দর্শনকার মহর্ষিগণ অতিদুর্ব্বোধ বেদার্থে ভ্রান্তির সম্ভাবনা বুঝিয়া বিচার দ্বারা সেই সমস্ত পূর্ব্ব-পক্ষের নিরাসপূর্ব্বক বেদের প্রকৃত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী অনেক বৌদ্ধ ও চার্ব্বাক তন্মধ্যে অনেক পূর্ব্বপক্ষকেই সিদ্ধান্তরূপে সমর্থন করিয়াছেন এবং নিজ সিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্য বৈদিক-সম্প্রদায়ের নিকটে পূর্ব্বপক্ষ-বোধক অনেক শ্রুতি ও নিজ মতের প্রমাণরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। মূলকথা, "অসদেবেদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি শ্রুতিই পূর্ব্বোক্ত মতের মূল। তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্রও এখানে পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্ব-পক্ষের সমর্থন করিতে লিখিয়াছেন, "এবং কিল শ্রূয়তে—অসদেবেদমগ্র আসীদিতি"। এবং পরে এই পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডনকালে তিনিও লিখিয়াছেন—"শ্রুতিস্তু পূর্ব্বপক্ষাভিপ্রায়া" ইত্যাদি। পরে ইহা পরিস্ফুট হইবে ॥১৪॥

ভাষ্য। অত্রাভিধীয়তে—

অনুবাদ। এই পূর্ব্বপক্ষে (উত্তর) কথিত হইতেছে—

সূত্র। ব্যাঘাতাদপ্রয়োগঃ ॥১৫॥৩৫৭॥

অনুবাদ। (উত্তর) ব্যাঘাতবশতঃ প্রয়োগ হয় না, অর্থাৎ "উপমর্দ্দন করিয়া প্রাদুর্ভূত হয়"—এইরূপ প্রয়োগই হইতে পারে না।

ভাষ্য। উপমৃদ্য প্রাদুর্ভাবাদিত্যযুক্তঃ প্রয়োগো ব্যাঘাতাৎ। যদুপ-

১। তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং তস্মাদসতঃ সজ্জায়ত।—ছান্দোগ্য।৬।২।১।
অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ ততো বৈ সদজায়ত।—তৈত্তিরীয়, ব্রহ্মবল্লী।৭।১।

মৃদ্‌নাতি ন তদুপমৃদ্য প্রাদুর্ভবিতুমর্হতি, বিদ্যমানত্বাৎ। যচ্চ প্রাদুর্ভবতি ন তেনাপ্রাদুর্ভূতেনাবিদ্যমানেনোপমর্দ্দ ইতি।

অনুবাদ। ব্যাঘাতবশতঃ "উপমৃদ্য প্রাদুর্ভাবাৎ" এই প্রয়োগ অযুক্ত। (ব্যাঘাত বুঝাইতেছেন) যাহা উপমর্দ্দন করে, তাহা (উপমর্দ্দনের পূর্ব্বেই) বিদ্যমান থাকায়, উপমর্দ্দনের অনন্তর প্রাদুর্ভূত হইতে পারে না। এবং যাহা প্রাদুর্ভূত হয়, (পূর্ব্বে) অপ্রাদুর্ভূত (সুতরাং) অবিদ্যমান সেই বস্তু কর্ত্তৃক (কাহারও) উপমর্দ্দন হয় না।

টিপ্পনী। পূর্ব্বসূত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন করিতে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা প্রথমে বলিয়াছেন যে, "অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয়," এই সাধ্য সাধনের জন্য "উপমৃদ্য প্রাদুর্ভাবাৎ" এই যে হেতুবাক্যের প্রয়োগ হইয়াছে, ব্যাঘাতবশতঃ ঐরূপ প্রয়োগই হইতে পারে না। অর্থাৎ ঐ হেতুই অসিদ্ধ হওয়ায়, উহার দ্বারা সাধ্যসিদ্ধি অসম্ভব। সূত্রকারোক্ত "ব্যাঘাত" বুঝাইতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, যে বস্তু উপমর্দ্দনের কর্ত্তা, তাহা উপমর্দ্দনের পূর্ব্বেই বিদ্যমান থাকিবে, সুতরাং তাহা উপমর্দ্দনের অনন্তর প্রাদুর্ভূত হইতে পারে না। এবং যে বস্তু প্রাদুর্ভূত হয়, তাহা প্রাদুর্ভাবের পূর্ব্বে না থাকায়, পূর্ব্বে কাহারও উপমর্দ্দন করিতে পারে না। তাৎপর্য্য এই যে, উপমর্দ্দন বলিতে বিনাশ। প্রাদুর্ভাব বলিতে উৎপত্তি। পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতে বীজের বিনাশ করিয়া উহার পরে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। সুতরাং তাঁহার মতে বীজবিনাশের পূর্ব্বে অঙ্কুরের সত্তা নাই। কারণ, তখন অঙ্কুর জন্মেই নাই, ইহা স্বীকার্য্য। কিন্তু তাঁহার মতে বীজকে বিনষ্ট করিয়া যে অঙ্কুর উৎপন্ন হইবে, তাহা বীজবিনাশের পূর্ব্বে না থাকায়, বীজ বিনাশ করিতে পারে না। যাহা বীজ-বিনাশের পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হয় নাই, সুতরাং যাহা বীজবিনাশের পূর্ব্বে "অবিদ্যমান, তাহা বীজবিনাশক হইতে পারে না। আর যদি বীজবিনাশের জন্য তৎপূর্ব্বেই অঙ্কুরের সত্তা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে, বীজকে উপমর্দ্দন করিয়া, অর্থাৎ বীজবিনাশের অনন্তর অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, ইহা বলা যায় না। কারণ, যাহা বীজবিনাশের পূর্ব্বেই বিদ্যমান আছে, তাহা বীজবিনাশের পরে উৎপন্ন হইবে কিরূপে? পূর্ব্বেই যাহা বিদ্যমান থাকে, পরে তাহারই উৎপত্তি হইতে পারে না। ফলকথা, অঙ্কুরে বীজবিনাশকত্ব এবং বীজ-বিনাশের পরে প্রাদুর্ভাব, ইহা ব্যাহত অর্থাৎ বিরুদ্ধ। বিনাশকত্ব ও বিনাশের পরে প্রাদুর্ভাব, এই উভয় কোন এক পদার্থে থাকিতে পারে না। ঐ উভয়ের পরস্পর বিরোধই সূত্রোক্ত "ব্যাঘাত" শব্দের অর্থ ॥১৫॥

সূত্র। নাতীতানাগতয়োঃ কারকশব্দপ্রয়োগাৎ ॥ ॥১৬॥৩৫৮॥

অনুবাদ। (উত্তর) না, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ প্রয়োগ হইতে পারে। কারণ, অতীত ও ভবিষ্যৎ পদার্থে কারকশব্দের (কর্ত্তৃকর্ম্মাদি কারকবোধক শব্দের) প্রয়োগ হয়।

ভাষ্য। অতীতে চানাগতে চাবিদ্যমানে কারকশব্দাঃ প্রযুজ্যন্তে। পুত্রো জনিষ্যতে, জনিষ্যমাণং পুত্রমভিনন্দতি, পুত্রস্য জনিষ্যমাণস্য নাম করোতি, অভূৎ কুম্ভঃ, ভিন্নং কুম্ভমনুশোচতি, ভিন্নস্য কুম্ভস্য কপালানি, অজাতাঃ পুত্রাঃ পিতরং তাপয়ন্তীতি বহুলং ভাক্তাঃ প্রয়োগা দৃশ্যন্তে। কা পুনরিয়ং ভক্তিঃ? আনন্তর্য্যং ভক্তিঃ। আনন্তর্য্যসামর্থ্যাদুপমৃদ্য প্রাদুর্ভাবার্থঃ, প্রাদুর্ভবিষ্যন্নঙ্কুর উপমৃদ্নাতীতি ভাক্তং কর্ত্তৃত্বমিতি।

অনুবাদ। অবিদ্যমান অতীত এবং ভবিষ্যৎ পদার্থেও কারক শব্দগুলি প্রযুক্ত হয়। যথা—"পুত্র উৎপন্ন হইবে", "ভাবী পুত্রকে অভিনন্দন করিতেছে", "ভাবী পুত্রের নাম করিতেছে",—"কুম্ভ উৎপন্ন হইয়াছিল", "ভগ্ন কুম্ভকে অনুশোচনা করিতেছে",—"ভগ্ন কুম্ভের কপাল", "অনুৎপন্ন পুত্রগণ পিতাকে দুঃখিত করিতেছে" ইত্যাদি ভাক্তপ্রয়োগ বহু দৃষ্ট হয়। (প্রশ্ন) এই ভক্তি কি? অর্থাৎ "বীজকে উপমর্দ্দন করিয়া অঙ্কুর প্রাদুর্ভূত হয়"—এইরূপ ভাক্ত প্রয়োগের মূল "ভক্তি" এখানে কি? (উত্তর) আনন্তর্য্য ভক্তি, অর্থাৎ বীজবিনাশ ও অঙ্কুরোৎপত্তির যে আনন্তর্য্য, তাহাই এখানে ঐরূপ প্রয়োগের মূলীভূত ভক্তি। আনন্তর্য্য-সামর্থ্যপ্রযুক্ত উপমর্দ্দনের অনন্তর প্রাদুর্ভাব রূপ অর্থ, অর্থাৎ উক্ত প্রয়োগের তাৎপর্য্যার্থ (বুঝা যায়)। "ভাবী অঙ্কুর (বীজকে) উপমর্দ্দন করে" এই প্রয়োগে (অঙ্কুরের) ভাক্ত কর্ত্তৃত্ব।

টিপ্পনী। পূর্ব্বসূত্রোক্ত উত্তরের গূঢ় তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া, উহার খণ্ডন করিতে পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিয়াছেন যে,বীজের উপমর্দ্দনের পূর্ব্বে অঙ্কুরের সত্তা না থাকিলেও, ভাবী অঙ্কুর বীজের উপমর্দ্দনের কর্ত্তৃকারক হইতে পারে। সুতরাং পূর্ব্বোক্তরূপ প্রয়োগও হইতে পারে। কারণ, অতীত ও ভবিষ্যৎ পদার্থেও কর্ত্তৃকর্ম্মাদি কারকবোধক শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। অতীত পদার্থে কারকবোধক শব্দের প্রয়োগ, যথা—"কুম্ভ উৎপন্ন হইয়াছিল", "ভগ্ন কুম্ভকে অনুশোচনা করিতেছে", "ভগ্ন কুম্ভের কপাল"। পূর্ব্বোক্ত প্রয়োগদ্বয়ে যথাক্রমে অতীত কুম্ভ ও উৎপত্তিক্রিয়ার কর্ত্তৃকারক এবং অনুশোচনা ক্রিয়ার কর্ম্মকারক হইয়াছে। "ভগ্ন কুম্ভের কপাল" এই প্রয়োগে যদিও "কুম্ভ" শব্দ কোন কারকবোধক নহে, তথাপি "কুম্ভস্য" এই স্থলে ষষ্ঠী বিভক্তির দ্বারা

জনকত্ব সম্বন্ধের বোধ হওয়ায়, কপালে কুম্ভের জনন বা উৎপাদন ক্রিয়ার কর্ত্তৃত্ব বুঝা যায়। সুতরাং কুম্ভের সহিতও ঐ জননক্রিয়ার সম্বন্ধ বোধ হওয়ায়, ঐ স্থলে "কুম্ভ" শব্দও পরম্পরায় কারকবোধক শব্দ হইয়াছে। তাৎপর্য্যটীকাকারও এখানে এই ভাবের কথাই লিখিয়াছেন। ভবিষ্যৎ পদার্থে কারকবোধক শব্দের প্রয়োগ যথা—"পুত্র উৎপন্ন হইবে", "ভাবী পুত্রকে অভিনন্দন করিতেছে", "ভাবী পুত্রের নাম করিতেছে", "অনুৎপন্ন পুত্রগণ পিতাকে দুঃখিত করিতেছে"। যদিও অতীত ও ভবিষ্যৎ পদার্থ ক্রিয়ার পূর্ব্বে বিদ্যমান না থাকায়, ক্রিয়ার নিমিত্ত হইতে পারে না, সুতরাং মুখ্য কারক হয় না, তথাপি অতীত ও ভবিষ্যৎ পদার্থের ভাক্ত কর্ত্তৃত্বাদি গ্রহণ করিয়া, পূর্ব্বোক্ত-ভাক্ত প্রয়োগ হইয়া থাকে; ঐরূপ ভাক্ত প্রয়োগ বহু দৃষ্ট হয়। সুতরাং পূর্ব্বোক্তরূপ প্রয়োগের ন্যায় "ভাবী অঙ্কুর বীজকে উপর্দ্দন করে" এইরূপও ভাক্ত প্রয়োগ হইতে পারে। "ভক্তি"-প্রযুক্ত ভ্রম জ্ঞানকে যেমন ভাক্ত প্রত্যয় বলা হয়, তদ্রূপ "ভক্তি"-প্রযুক্ত প্রয়োগকে ভাক্ত প্রয়োগ বলা যায়। যে পদার্থ তথাভূত নহে, তাহার তথাভূত পদার্থের সহিত যে সাদৃশ্য, তাহাই ভাক্ত প্রত্যয়ের মূলীভূত "ভক্তি"। ঐ সাদৃশ্য উপমান এবং উপমেয়, এই উভয় পদার্থেই থাকে, উহা উভয়ের সমান ধর্ম্ম, এজন্য "উভয়েন ভজ্যতে" এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে প্রাচীনগণ উহাকে 'ভক্তি" বলিয়াছেন। (দ্বিতীয় খণ্ড, ১৮০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) কিন্তু এখানে পূর্ব্বোক্তরূপ ভাক্ত প্রয়োগের মূলীভূত "ভক্তি" কি? এতদুত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, এখানে আনন্তর্য্যই 'ভক্তি"। তাৎপর্য্য এই যে, বীজবিনাশের অনন্তরই অঙ্কুরের উৎপত্তি হওয়ায়, অঙ্কুরের উৎপত্তিতে বীজবিনাশের যে আনন্তর্য্য আছে, উহাই এখানে পূর্ব্বোক্তরূপ প্রয়োগের মূলীভূত "ভক্তি"। ঐ আনন্তর্য্যরূপ "ভক্তি"র সামর্থ্যবশতঃ বীজবিনাশের অনন্তরই অঙ্কুর উৎপন্ন হয় এইরূপ তাৎপর্য্যেই "বীজকে উপমর্দ্দন করিয়া অঙ্কুর উৎপন্ন হয়"—এইরূপ বাক্য প্রয়োগ হইয়াছে। বীজবিনাশের পূর্ব্বে অঙ্কুরের সত্তা না থাকায়, ঐ প্রয়োগে অঙ্কুরে বীজবিনাশের মুখ্য কর্ত্তৃত্ব নাই। উহাকে বলে ভাক্ত কর্ত্তৃত্ব। ফলকথা, বীজবিনাশের অনন্তরই অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, ইহাই পূর্ব্বোক্ত প্রয়োগের তাৎপর্য্যার্থ। ঐ আনন্তর্য্য-বশতঃই পূর্ব্বোক্তরূপ ভাক্ত প্রয়োগ হইয়াছে। ঐ আনন্তর্য্যই পূর্ব্বোক্তরূপ ভাক্ত প্রয়োগের মূলীভূত "ভক্তি"। তাৎপর্য্যটীকাকারের কথার দ্বারা এখানে বুঝা যায় যে, এখানে বিনাশ্য বীজ, ও বিনাশক অঙ্কুর—এই উভয়েরও যে আনন্তর্য্য (অব্যবহিতত্ব) আছে, তাহা ঐ উভয়ের সমান ধর্ম্ম হওয়ায়, পূর্ব্বোক্তরূপ প্রয়োগের মূলীভূত "ভক্তি"। ঐ সামান্য ধর্ম্ম উভয়াশ্রিত বলিয়া উহাকে "ভক্তি" বলা যায়॥১৬॥

সূত্র। ন বিনষ্টেভ্যোঽনিষ্পত্তিঃ॥১৭॥৩৫৯॥

অনুবাদ। (উত্তর) না, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ প্রয়োগ হইতে পারিলেও

অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হইতে পারে না। কারণ, বিনষ্ট (বীজাদি) হইতে (অঙ্কুরাদির) উৎপত্তি হয় না।

ভাষ্য। ন বিনষ্টাদ্বীজাদঙ্কুর উৎপদ্যত ইতি তস্মান্নাভাবাদ্ভাবোৎ-পত্তিরিতি।

অনুবাদ। বিনষ্ট বীজ হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না, অতএব অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয় না।

টিপ্পনী। অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয়, এইমত খণ্ডন করিতে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা মূল যুক্তি বলিয়াছেন যে, বিনষ্ট বীজাদি হইতে অঙ্কুরাদির উৎপত্তি হইতে পারে না এবং বীজাদির বিনাশ হইতেও অঙ্কুরাদির উৎপত্তি হইতে পারে না। সূত্রে চরমপক্ষে "বিনষ্ট" শব্দের দ্বারা বিনাশ অর্থ মহর্ষির বিবক্ষিত, বুঝিতে হইবে। উত্তরবাদী মহর্ষির তাৎপর্য্য এই যে, বীজবিনাশের অনন্তর অঙ্কুর উৎপন্ন হয়, এইরূপ তাৎপর্য্যে "বীজকে উপমর্দ্দন করিয়া অঙ্কুর প্রাদুর্ভূত হয়"—এইরূপ ভাক্ত প্রয়োগ হইতে পারে, ঐরূপ ভাক্ত প্রয়োগের নিষেধ করি না। কিন্তু বিনষ্ট বীজ অথবা বীজের বিনাশ অঙ্কুরের উপাদান-কারণ হইতে পারে না, ইহাই আমার বক্তব্য। কারণ, যাহা বিনষ্ট, কার্য্যের পূর্ব্বে তাহার সত্তা না থাকায়, তাহা কোন কার্য্যের কারণই হইতে পারে না। যদি বল, বীজের বিনাশরূপ অভাবই অঙ্কুরের উপাদান-কারণ, ইহাই আমার মত, ইহাই আমি বলিয়াছি। কিন্তু তাহাও কোনরূপে বলা যায় না। কারণ, বীজের বিনাশরূপ অভাবকে অবস্তু বলিলে, উহা কোন বস্তুর উপাদান-কারণ হইতে পারে না। জগতের মূল কারণ অসৎ বা অবস্তু, কিন্তু জগৎ সৎ বা বাস্তব পদার্থ, ইহা কোন মতেই সম্ভব নহে। কারণ, সজাতীয় পদার্থই সজাতীয় পদার্থের উপাদান-কারণ হইয়া থাকে। যাহা অভাব বা অবস্তু, তাহা উপাদাম-কারণ হইলে, তাহাতে রূপ-রসাদি গুণ না থাকায়, অঙ্কুরাদি কার্য্যে রূপ-রসাদি গুণের উৎপত্তিও হইতে পারে না। পরন্তু, ঐরূপ অভাবের কোন বিশেষ না থাকায়, শালিবীজের বিনাশরূপ অভাব হইতে যবের অঙ্কুরও উৎপন্ন হইতে পারে। কারণের ভেদ না থাকিলে, কার্য্যের ভেদ হইতে পারে না। অবস্তু অভাবকে বস্তুর উপাদানকারণ বলিলে, ঐ কারণের ভেদ না থাকায়, উহার শক্তিভেদও থাকিতে পারে না। সুতরাং বিভিন্ন প্রকার কার্য্যের উৎপত্তি সম্ভব হয় না। বীজের বিনাশরূপ অভাবকে বাস্তব পদার্থ বলিয়া স্বীকার করিলে, উহাও অঙ্কুরের উপাদান-কারণ হইতে পারে না। কারণ, দ্রব্যপদার্থই উপাদান-কারণ হইয়া থাকে। রূপ-রসাদি-গুণশূন্য অভাবপদার্থ কোন দ্রব্যের উপাদান হইলে, ঐ দ্রব্যে রূপ-রসাদি গুণের উৎপত্তিও হইতে পারে না ; সুতরাং অভাবপদার্থকে উপাদান-কারণ বলা যায় না। বীজের

বিনাশরূপ অভাবকে অঙ্কুরের নিমিত্তকারণ বলিলে, তাহা স্বীকার্য্য। পরবর্ত্তী সূত্রে ইহা ব্যক্ত হইবে ॥১৭॥

সূত্র। ক্রমনির্দ্দেশাদপ্রতিষেধঃ ॥১৮॥৩৬০॥

অনুবাদ। ক্রমের নির্দ্দেশবশতঃ, অর্থাৎ প্রথমে বীজের বিনাশ, পরে অঙ্কুরের উৎপত্তি, এইরূপ পৌর্ব্বাপর্য্য নিয়মকে অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তির হেতুরূপে নির্দ্দেশ করায়, (আমাদিগের মতেও ঐ ক্রমের) প্রতিষেধ নাই, অর্থাৎ উহা আমরাও স্বীকার করি, কিন্তু ঐ হেতু অভাবই ভাবের উপাদানকারণ, এই সিদ্ধান্তের সাধক হয় না।

ভাষ্য। উপমর্দ্দপ্রাদুর্ভাবয়োঃ পৌর্ব্বাপর্য্যনিয়মঃ ক্রমঃ,' স খল্বভাবাদ্ভাবোৎপত্তের্হেতু নির্দ্দিশ্যতে, স চ ন প্রতিষিধ্যত ইতি। ব্যাহতব্যূহানামবয়বানাং পূর্ব্বব্যূহনিবৃত্তৌ ব্যূহান্তরাদ্দ্রব্যনিষ্পত্তির্নাভাবাৎ। বীজাবয়বাঃ কুতশ্চিন্নিমিত্তাৎ প্রাদুর্ভূতক্রিয়াঃ পূর্ব্বব্যূহং জহতি, ব্যূহান্তরঞ্চাপদ্যন্তে, ব্যূহান্তরাদঙ্কুর উৎপদ্যতে। দৃশ্যন্তে খলু অবয়বাস্তৎসংযোগাশ্চাঙ্কুরোৎপত্তিহেতবঃ। ন চানিবৃত্তে পূর্ব্বব্যূহে বীজাবয়বানাং শক্যং ব্যূহান্তরেণ ভবিতুমিত্যুপমর্দ্দপ্রাদুর্ভাবয়োঃ পৌর্ব্বাপর্য্যনিয়মঃ ক্রমঃ, তস্মান্নাভাবাদ্ভাবোৎপত্তিরিতি। ন চান্যদ্বীজাবয়বেভ্যোঽঙ্কুরোৎপত্তিকারণমিত্যুপপদ্যতে বীজোপাদাননিয়ম ইতি।

অনুবাদ। উপমর্দ্দ ও প্রাদুর্ভাবের অর্থাৎ বীজাদির বিনাশ ও অঙ্কুরাদির উৎপত্তির পৌর্ব্বাপর্য্যের নিয়ম "ক্রম", সেই "ক্রম"ই অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তির হেতুরূপে নির্দ্দিষ্ট (কথিত) হইয়াছে, কিন্তু সেই "ক্রম" প্রতিষিদ্ধ হইতেছে না, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ "ক্রম" আমরাও স্বীকার করি। (ভাষ্যকার মহর্ষির গূঢ় তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিতেছেন)—"ব্যাহতব্যূহ" অর্থাৎ যাহাদিগের পূর্ব্ব আকৃতি বিনষ্ট হইয়াছে, এমন অবয়বসমূহের পূর্ব্ব আকৃতির বিনাশপ্রযুক্ত অন্য আকৃতি হইতে দ্রব্যের (অঙ্কুরাদির) উৎপত্তি হয়, অভাব হইতে দ্রব্যের উৎপত্তি হয় না। বিশদার্থ এই যে, বীজের অবয়বসমূহ কোন কারণজন্য উৎপন্নক্রিয় হইয়া পূর্ব্ব আকৃতি পরিত্যাগ করে এবং অন্য আকৃতি প্রাপ্ত হয়, অন্য আকৃতি হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। যেহেতু অবয়বসমূহ এবং তাহার সংযোগসমূহ অর্থাৎ বীজের সমস্ত

অবয়ব এবং উহাদিগের পরস্পর সংযোগরূপ অভিনব ব্যূহ বা আকৃতিসমূহ অঙ্কুরোৎপত্তির হেতু দৃষ্ট হয়। কিন্তু বীজের অবয়বসমূহের পূর্ব্ব আকৃতি বিনষ্ট না হইলে, অন্য আকৃতি জন্মিতে পারে না, এজন্য উপমর্দ্দ ও প্রাদুর্ভাবের পৌর্ব্বাপর্য্যের নিয়মরূপ "ক্রম" আছে, অতএব অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয় না। যেহেতু বীজের অবয়বসমূহ হইতে অন্য অর্থাৎ ঐ অবয়ব ভিন্ন অঙ্কুরোৎপত্তির উপাদান-কারণ নাই। এজন্য বীজের উপাদানের (গ্রহণের) নিয়ম অর্থাৎ অঙ্কুরের উৎপাদনে বীজগ্রহণেরই নিয়ম উপপন্ন হয়।

টিপ্পনী। পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করিতে মহর্ষি শেষে এই সূত্রের দ্বারা চরম কথা বলিয়াছেন যে, "নানুপমৃদ্য প্রাদুর্ভাবাৎ" এই বাক্যের দ্বারা বীজের বিনাশ না হইলে, অঙ্কুরের উৎপত্তি হয় না, অর্থাৎ প্রথমে বীজের বিনাশ, পরে অঙ্কুরের উৎপত্তি, এইরূপ যে "ক্রম," অর্থাৎ বীজ বিনাশ ও অঙ্কুরোৎপত্তির পৌর্ব্বাপর্য্যের নিয়ম, তাহাকেই পূর্ব্বপক্ষবাদী অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তির হেতুরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি তাঁহার ঐ সিদ্ধান্তসাধনে আর কোন বিশেষ হেতু বলেন নাই। সুতরাং আমার সিদ্ধান্তেও ঐ "ক্রমে"র প্রতিষেধ বা অভাব নাই। অর্থাৎ আমার মতেও বীজবিনাশের অনন্তর অঙ্কুরের উৎপত্তি হয়, আমিও ঐরূপ ক্রম স্বীকার করি। কিন্তু উহার দ্বারা বীজের বিনাশরূপ অভাবই যে অঙ্কুরের উপাদান-কারণ, ইহা সিদ্ধ হয় না। ভাষ্যকার সূত্রার্থ বর্ণনপূর্ব্বক মহর্ষির এই চরম যুক্তি সুব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, বীজের অবয়বসমূহের পূর্ব্বব্যূহ অর্থাৎ পূর্ব্বজাত পরস্পর সংযোগরূপ আকৃতি বিনষ্ট হইলে, অভিনব যে ব্যূহ বা আকৃতি জন্মে, উহা হইতে অঙ্কুরের উৎপত্তি হয়, বীজের বিনাশরূপ অভাব হইতে অঙ্কুরের উৎপত্তি হয় না। কারণ, বীজের অবয়বসমূহ এবং উহাদিগের পরস্পর বিলক্ষণ-সংযোগসমূহ অঙ্কুরের কারণ, ইহা দৃষ্ট। যে সমস্ত পরমাণু হইতে সেই বীজের সৃষ্টি হইয়াছে, ঐ সমস্ত পরমাণুর পুনর্ব্বার পরস্পর বিলক্ষণ-সংযোগজন্য দ্ব্যণুকাদিক্রমে অঙ্কুরের উৎপত্তি হয়। বীজের বিনাশের পরক্ষণেই অঙ্কুর জন্মে না। পৃথিবী ও জলাদির সংযোগে ক্রমশঃ বীজের অবয়বসমূহে ক্রিয়া জন্মিলে তদ্দ্বারা সেই অবয়বসমূহের পূর্ব্বব্যূহ অর্থাৎ পূর্ব্বজাত পরস্পর বিলক্ষণ-সংযোগ বিনষ্ট হয়, সুতরাং উহার পরেই বীজের বিনাশ হয়। তাহার পরে বীজের সেই পরস্পর বিচ্ছিন্ন পরমাণুসমূহে পুনর্ব্বার অন্য ব্যূহ, অর্থাৎ অভিনব বিলক্ষণ-সংযোগ জন্মিলে, উহা হইতেই দ্ব্যণুকাদিক্রমে অঙ্কুর উৎপন্ন হয়। বীজের সেই সমস্ত অবয়বের অভিনব ব্যূহ না হওয়া পর্য্যন্ত কখনই অঙ্কুর জন্মে না। কেবল বীজবিনাশই অঙ্কুরের কারণ হইলে, বীজচূর্ণ হইতেও অঙ্কুরের উৎপত্তি হইতে পারে। সুতরাং বীজের অবয়বসমূহ ও উহাদের অভিনব ব্যূহ—অঙ্কুরের কারণ, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। তবে বীজের অবয়বসমূহের পূর্ব্বব্যূহের বিনাশ না হইলে, তাহাতে অন্য ব্যূহ জন্মিতেই পারে না, সুতরাং অঙ্কুরের উৎপত্তিস্থলে পূর্ব্বে বীজের অবয়বসমূহের পূর্ব্বব্যূহের বিনাশ ও তজ্জন্য বীজের

বিনাশ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং অঙ্কুরোৎপত্তির পূর্ব্বে.সর্ব্বত্র বীজের বিনাশ হওয়ায়, ঐ বীজ-বিনাশ ও অঙ্কুরোৎপত্তির পৌর্ব্বাপর্য্যনিয়মরূপ যে "ক্রম," তাহা আমাদিগের সিদ্ধান্তেও অব্যাহত আছে। কারণ, আমাদিগের মতেও বীজবিনাশের পূর্ব্বে অঙ্কুরের উৎপত্তি হয় না। বীজবিনাশের অনন্তরই অঙ্কুরের উৎপত্তি হয়। কিন্তু অঙ্কুরের উৎপত্তিতে বীজবিনাশের আনন্তর্য্য থাকিলেও ঐরূপ অনন্তর্য্যবশতঃ বীজ বিনাশে অঙ্কুরের উপাদানত্ব সিদ্ধ হয় না। কারণ, বীজবিনাশের পরে বীজের অবয়বসমূহের অভিনব ব্যূহ উৎপন্ন হইলে, তাহার পরেই অঙ্কুরের উৎপত্তি হইয়া থাকে। সুতরাং বীজের অবয়বকেই অঙ্কুরের উপাদান-কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। বীজের বিনাশব্যতীত বীজের অবয়বসমূহের যে অভিনব ব্যূহ জন্মিতে পারে না, সেই অভিনব ব্যূহের আনন্তর্য্যপ্রযুক্তই অঙ্কুরের উৎপত্তিতে বীজবিনাশের আনন্তর্য্য। কারণ, সেই অভিনব ব্যূহের অনুরোধেই অঙ্কুরোৎপত্তির পূর্ব্বে বীজবিনাশ স্বীকার করিতে হইয়াছে। সুতরাং অঙ্কুরোৎপত্তিতে বীজবিনাশের আনন্তর্য্য অন্যপ্রযুক্ত হওয়ায়, উহার দ্বারা অঙ্কুরে বীজবিনাশের উপাদানত্ব সিদ্ধ হয় না। কিন্তু সেই অঙ্কুরের উৎপত্তিতে বীজবিনাশের সহকারি-কারণত্ব অবশ্যই সিদ্ধ হয়। যেমন, ঘটাদি দ্রব্যে পূর্ব্বরূপাদির বিনাশ না হইলে, পাকজন্য অভিনব রূপাদির উৎপত্তি হইতে পারে না; এজন্য আমরা পাকজন্য অভিনব রূপাদির প্রতি পূর্ব্বরূপাদির বিনাশকে নিমিত্ত-কারণ বলিয়া স্বীকার করি, তদ্রূপ বীজের বিনাশ ব্যতীত অঙ্কুরের উৎপত্তি সম্ভব না হওয়ায়, অঙ্কুরের প্রতি বীজের বিনাশকে নিমিত্ত কারণ বলিয়া স্বীকার করি। আমাদিগের মতে অভাব অবস্তু নহে। ভাবপদার্থের ন্যায় অভাবপদার্থও কারণ হইয়া থাকে। কিন্তু অভাবপদার্থ কাহারও উপাদান-কারণ হইতে পারে না। পরন্তু যাঁহাদিগের মতে অভাব অবস্তু, তাঁহাদিগের মতে উহার কোন বিশেষ না থাকায়, সমস্ত অভাব হইতেই সমস্ত ভাবের উৎপত্তি হইতে পারে। তাৎপর্য্যটীকাকার শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্র "সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী"তে (নবম কারিকার টীকায়) বলিয়াছেন যে, অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হইলে, অভাব সর্ব্বত্র সুলভ বলিয়া সর্ব্বত্র সর্ব্ব-কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে, ইত্যাদি আমি "ন্যায়বার্ত্তিক তাৎপর্য্যটীকা"য় বলিয়াছি। তাৎপর্য্য-টীকায় ইহা বিশদ করিয়া বলিয়াছেন যে, নিঃস্বরূপ বা অবস্তু অভাব, অঙ্কুরের উপাদান হইলে, সর্ব্বথা বিনষ্ট শালিবীজ ও যববীজের কোন বিশেষ না থাকায়, শালিবীজ রোপণ করিলে, শালির অঙ্কুরই হইবে, যববীজ রোপণ করিলে, উহা হইতে শালির অঙ্কুর হইবে না, এইরূপ নিয়ম থাকে না। শালিবীজ রোপণ করিলে, উহার বিনাশরূপ অভাব হইতে যবের অঙ্কুরও উৎপন্ন হইতে পারে। পরন্তু কারণের শক্তিভেদপ্রযুক্তই ভিন্নশক্তিযুক্ত নানা কার্য্যের উৎপত্তি হইয়া থাকে। অসৎ অর্থাৎ অবস্তু অভাবকে উপাদান-কারণ বলিলে, ঐ কারণের ভেদ না থাকায়, তাহার শক্তিভেদ অসম্ভব হওয়ায়, ঐ অভাব হইতে ভিন্নশক্তিযুক্ত নানা কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। পরন্তু উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য অসৎ, এই মতে অসতেরই

উৎপত্তি হইয়া থাকে, সুতরাং কার্য্যের উৎপত্তির পূর্ব্বে তাহার যে অভাব (প্রাগভাব) থাকে, উহাই সেই কার্য্যের উপাদান-কারণ, ইহা বলিলে, সেই কার্য্যের প্রাগভাব অনাদি বলিয়া সেই কার্য্যেরও অনাদিত্ব স্বীকার করিতে হয়। এবং প্রাগভাবসমূহেরও স্বাভাবিক কোন ভেদ না থাকায়, উহা হইতে বিভিন্ন শক্তিযুক্ত বিভিন্ন কার্য্যের উৎপত্তিও হইতে পারে না। সুতরাং বীজের বিনাশ প্রভৃতি এবং অঙ্কুরের প্রাগভাব প্রভৃতি কোন অভাবই অঙ্কুরাদি কার্য্যের উপাদান হইতে পারে না। কিন্তু অভাবকে বস্তু বলিয়া স্বীকার করিলে, উহা কার্য্যের নিমিত্ত কারণ হইতে পারে। তাৎপর্য্যটীকাকার শেষে বলিয়াছেন যে, "অসদেবেদমগ্র আসীৎ"—"অসতঃ সজ্জায়ত" ইত্যাদি শ্রুতিতে যে, "অসৎ" হইতে "সতে"র উৎপত্তি কথিত হইয়াছে, উহা পূর্ব্বপক্ষ, উহা শ্রুতির সিদ্ধান্ত নহে। কারণ, "সদেবসৌম্যেদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি (ছান্দোগ্য ।৬।২।১।) সিদ্ধান্ত শ্রুতির দ্বারা ঐ পূর্ব্বপক্ষ নিরাকৃত হইয়াছে। পরন্তু "অসদেব"—ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা এই বিশ্বপ্রপঞ্চ শূন্যতার বিবর্ত্ত, অর্থাৎ রজ্জুতে কল্পিত সর্পের ন্যায় এই বিশ্বপ্রপঞ্চ শূন্যতায় কল্পিত, উহার সত্তাই নাই, এইরূপ সিদ্ধান্তও সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, যাহার কোন সত্তাই নাই, তাহার কোন জ্ঞান হইতে পারে না। কিন্তু বিশ্বপ্রপঞ্চের যখন জ্ঞান হইতেছে, তখন উহাকে "অসৎ" বলা যায় না। "অসৎ খ্যাতি" আমরা স্বীকার করি না। পরন্তু সর্ব্বশূন্যতা স্বীকার করিলে জ্ঞাতার, অভাবে জ্ঞানেরও অভাব হইয়া পড়ে। জ্ঞানেরও অভাব স্বীকার করিলে, সর্ব্বশূন্যতাবাদী কোন বিচারই করিতে পারেন না। সুতরাং শূন্যতা অর্থাৎ অভাবই জগতের উপাদান-কারণ অথবা জগৎ শূন্যতারই বিবর্ত্ত, এই সিদ্ধান্ত কোনরূপেই সিদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং "অসদেব"—ইত্যাদি শ্রুতি পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত-তাৎপর্য্যে উক্ত হয় নাই। উহা পূর্ব্বপক্ষতাৎপর্য্যেই উক্ত হইয়াছে। শ্রুতিতে "একে আহুঃ' এই বাক্যের দ্বারাও ঐ তাৎপর্য্য স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। এবং পূর্ব্বোক্ত "সদেব" ইত্যাদি শ্রুতিতেই যে প্রকৃত সিদ্ধান্ত বর্ণিত হইয়াছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না।

ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্ত কথায় প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি অঙ্কুরের প্রতি বীজের অবয়ব-সমূহই উপাদান-কারণ হয়, তাহা হইলে অঙ্কুরার্থী কৃষকগণ অঙ্কুরের জন্য নিয়মতঃ বীজকেই কেন গ্রহণ করে? বীজ অঙ্কুরের কারণ না হইলে, অঙ্কুরের জন্য বীজগ্রহণের প্রয়োজন কি? এতদুত্তরে সর্ব্বশেষে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, যখন অঙ্কুরের প্রতি বীজের অবয়বসমূহই উপাদান-কারণ, উহা ভিন্ন অঙ্কুরের উপাদান-কারণ আর কিছুই হইতে পারে না, তখন সেই উপাদান-কারণ লাভের জন্যই অঙ্কুরার্থী ব্যক্তিরা নিয়মতঃ বীজের উপাদান (গ্রহণ) করে। পরস্পর বিচ্ছিন্ন বীজের অবয়বসমূহ পুনর্ব্বার অভিনব সংযোগবিশিষ্ট না হইলে যখন অঙ্কুরের উৎপত্তি হয় না, তখন ঐ কারণ সম্পাদনের জন্য অঙ্কুরার্থীদিগের বীজের উপাদান, অর্থাৎ বীজের গ্রহণ অবশ্যই করিতে হইবে। বীজকে পরিত্যাগ করিয়া

অঙ্কুরের উপাদান-কারণ সেই বীজাবয়ব সমূহকে গ্রহণ করা অসম্ভব। সুতরাং পরম্পরা-সম্বন্ধে বীজও অঙ্কুরের কারণ ॥ ১৮ ॥

শূন্যতোপাদানপ্রকরণ সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

ভাষ্য। অথাপর আহ—

অনুবাদ। অনন্তর অপরে বলেন,—

সূত্র। ঈশ্বরঃ কারণং, পুরুষকর্ম্মাফল্যদর্শনাৎ ॥ ॥ ১৯ ॥ ৩৬১ ॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) ঈশ্বরই (সর্ব্বকার্য্যের) কারণ, যেহেতু পুরুষের (জীবের) কর্ম্মের বৈফল্য দেখা যায়।

ভাষ্য। পুরুষোঽয়ং সমীহমানো নাবশ্যং সমীহাফলং প্রাপ্নোতি, তেনানুমীয়তে পরাধীনং পুরুষস্য কর্ম্মফলারাধনমিতি, যদধীনং স ঈশ্বরঃ, তস্মাদীশ্বরঃ কারণমিতি।

অনুবাদ। "সমীহমান" অর্থাৎ কর্ম্মকারী এই জীব, অবশ্যই (নিয়মতঃ) কর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হয় না, তদ্দ্বারা জীবের কর্ম্মফলপ্রাপ্তি পরাধীন, ইহা অনুমিত হয়,—যাহার অধীন, তিনি ঈশ্বর, অতএব ঈশ্বরই কারণ।

টিপ্পনী। মহর্ষি "অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয়"—এই মত খণ্ডন করিয়া, এখন আর একটি মতের খণ্ডন করিতে এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষরূপে সেই মতের উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনগণের মতে এই সূত্রটি পূর্ব্বপক্ষ-সূত্র। ভাষ্যকার প্রথমে "অপর আহ" এই বাক্যের উল্লেখপূর্ব্বক এই সূত্রের অবতারণা করিয়া, "ঈশ্বরঃ কারণং,"—ইহা যে অপরের মত, মহর্ষি গোতমের মত নহে, ইহা স্পষ্টই প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু জগৎ-কর্ত্তা কর্ম্মফলদাতা ঈশ্বর যে, জগতের কারণ, ইহা ত মহর্ষি গোতমেরও সিদ্ধান্ত, উহা মতান্তর বা পূর্ব্বপক্ষরূপে তিনি কিরূপে বলিবেন? পরবর্ত্তী একবিংশ সূত্রের দ্বারা যাহা তিনি তাঁহার নিজেরও সিদ্ধান্তরূপে প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তিনি এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষরূপে প্রকাশ করিতে পারেন না, তাহা কোনমতেই সঙ্গত হইতে পারে না। সুতরাং এই সূত্রে "ঈশ্বরঃ কারণং" এই বাক্যের দ্বারা বুঝিতে হইবে যে, ঈশ্বরই একমাত্র কারণ, জীব বা তাহার কর্ম্মাদি কারণ নহে, ইহাই পূর্ব্বপক্ষ, ইহাই এখানে মহর্ষির খণ্ডনীয় মতান্তর। মহর্ষির "পুরুষ-কর্ম্মাফল্যদর্শনাৎ"—এই হেতুবাক্যের দ্বারাও পূর্ব্বোক্তরূপ পূর্ব্বপক্ষই যে, তাঁহার অভিমত, ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। পুরুষ অর্থাৎ জীব, নানাবিধ ফললাভের জন্য নানাবিধ কর্ম্ম করে, কিন্তু অবশ্যই সেইসমস্ত কর্ম্মের ফললাভ করে না, অর্থাৎ (নিয়মতঃ) সর্ব্বত্র সর্ব্বদাই

সকল কর্ম্মের ফললাভ করে না। অনেক সময়েই অনেক কর্ম্ম বিফল হয়। সুতরাং জীবের কর্ম্মফললাভ নিজের অধীন নহে, নিজের ইচ্ছানুসারেই জীবের কর্ম্মফল লাভ হয় না, ইহা স্বীকার্য্য, ইহা জীবমাত্রেরই পরীক্ষিত সত্য। সুতরাং ইহাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে জীবের কর্ম্মফললাভ পরাধীন। জীব নিজের ইচ্ছানুসারে কর্ম্মফল লাভ করিলে, অর্থাৎ কর্ম্মের সাফল্য তাহার স্বাধীন হইলে, জীবের কোন কর্ম্মই নিষ্ফল হইত না, দুঃখভোগও হইত না। সুতরাং জীবের সর্ব্বকর্ম্মের ফলাফল যাঁহার অধীন, জীবের সুখ ও দুঃখ যাঁহার ইচ্ছানুসারে নিয়মিত, এমন এক সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ পরমপুরুষ আছেন, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। তাঁহারই ইচ্ছানুসারে অনাদিকাল হইতে জীবের সুখ-দুঃখাদি ভোগ এবং জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় হইতেছে, তাঁহারই নাম ঈশ্বর। তিনি জীবের কর্ম্মকে অপেক্ষা করিয়া অর্থাৎ জীবের কর্ম্মানুসারে জীবের সুখদুঃখাদি ফল বিধান করেন না। নিজের ইচ্ছানুসারেই জীবের সুখ-দুঃখাদি ফলবিধান ও জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করেন। তিনি জীবের কর্ম্মকে অপেক্ষা না করিয়া, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়াদি কিছুই করিতে পারেন না—ইহা বলিলে, তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্ত্ব থাকে না, সুতরাং তাঁহাকে জগৎকর্ত্তা ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করা যায় না। সুতরাং জীবের কর্ম্মনিরপেক্ষ ঈশ্বরই জগতের কারণ, জীবের কর্ম্ম বা কর্ম্মসাপেক্ষ ঈশ্বর জগতের কারণ নহেন, ইহাই স্বীকার্য্য। সর্ব্বজীবের প্রভু সেই ইচ্ছাময়ের অবন্ধ্য ইচ্ছানুসারেই সর্ব্বজীবের সুখদুঃখাদি ভোগ হইতেছে, তাঁহার ইচ্ছা নিত্য, ঐ ইচ্ছার কোন কারণ নাই। জীবের সুখদুঃখাদি বিষয়ে তাঁহার কিরূপ ইচ্ছা আছে, তাহা জীবের বুঝিবার শক্তি নাই। সর্ব্বজীবের প্রভু সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় জীবের কোনরূপ অনুযোগও হইতে পারে না। মূলকথা, জীবের কর্ম্মনিরপেক্ষ ঈশ্বরই জগতের কারণ, ইহাই পূর্ব্বপক্ষ।

তাৎপর্য্যটীকাকার শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্র এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে এই জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম, অথবা ব্রহ্মের বিবর্ত্ত, এইরূপ মতভেদে "ঈশ্বরঃ কারণং"—এই বাক্যের দ্বারা ব্রহ্ম জগতের উপাদান-কারণ, ইহাই মহর্ষি গোতমের অভিমত পূর্ব্বপক্ষরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহার মতে মহর্ষি গোতম এই পূর্ব্বপক্ষসূত্রের দ্বারা ব্রহ্ম জগতের উপাদান-কারণ এই মতকেই প্রকাশ করিয়া, পরবর্ত্তী সূত্রের দ্বারা ঐ মতের খণ্ডন করিয়াছেন। তাৎপর্য্য-টীকাকারের এইরূপ তাৎপর্য্যকল্পনার কারণ বুঝা যায় যে,মহর্ষি "প্রেত্যভাবে"র পরীক্ষাপ্রসঙ্গে "ব্যক্তাদ্ব্যক্তানাং"—ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা জগতের উপাদান-কারণবিষয়ে নিজ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া, পরে ঐ নিজ সিদ্ধান্তের দৃঢ় প্রতিষ্ঠার জন্যই ঐ বিষয়ে অন্যান্য প্রাচীন মতের খণ্ডন করিয়াছেন। পূর্ব্বপ্রকরণে অভাবই জগতের উপাদান-কারণ, এই মতের খণ্ডন করায়, এই প্রকরণেও "ঈশ্বরঃ কারণং" ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা মহর্ষি যে জগতের উপাদান-কারণ বিষয়েই অন্য মতের উল্লেখপূর্ব্বক খণ্ডন করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। তাই তাৎপর্য্যটীকাকার পূর্ব্বপ্রকরণের ভাবানুসারে এই প্রকরণেও মহর্ষির পূর্ব্বোক্তরূপ তাৎপর্য্য বা উদ্দেশ্য

বুঝিয়া, মহর্ষির "ঈশ্বরঃ কারণং" এই বাক্যের দ্বারা ঈশ্বর বা ব্রহ্ম (জগতের) কারণ, অর্থাৎ উপাদান-কারণ—এই মতকেই পূর্ব্বপক্ষরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

যাঁহারা বিচারপূর্ব্বক উপনিষদ্ ও বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া ব্রহ্মকে জগতের উপাদান কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে বিবর্ত্তবাদী বৈদান্তিক-সম্প্রদায় ভিন্ন আর সকল সম্প্রদায়ই এই জগৎকে ব্রহ্মের পরিণাম বলিয়া ব্রহ্মের উপাদানত্ব সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে মৃত্তিকা যেমন ঘটাদিরূপে পরিণত হয়, দুগ্ধ যেমন দধিরূপে পরিণত হয়, সুবর্ণ যেমন কুণ্ডলাদিরূপে পরিণত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মও জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন। অন্যথা আর কোনরূপেই ব্রহ্ম জগতের উপাদান-কারণ হইতে পারেন না। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"—ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা ব্রহ্মের যে জগদুপাদানত্ব সিদ্ধ হইয়াছে, তাহা আর কোনরূপেই উপপন্ন হইতে পারে না। বিবর্ত্তবাদী ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও শারীরক ভাষ্যে ব্রহ্মের জগদুপাদানত্ব সমর্থন করিতে অনেক স্থানে মৃত্তিকা যেমন ঘটাদিরূপে পরিণত হয়, দুগ্ধ যেমন দধিরূপে পরিণত হয়, সুবর্ণ যেমন কুণ্ডলাদিরূপে পরিণত হয়, এইরূপ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার মতে ঐ সমস্ত পরিণাম মিথ্যা। কারণই সত্য, কার্য্য মিথ্যা, সুতরাং ব্রহ্ম সত্য, তাঁহার কার্য্য জগৎ মিথ্যা। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত পরিণামবাদী সমস্ত সম্প্রদায়ের মতেই ব্রহ্মের পরিণাম জগৎ সত্য। "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে" (বৃহদারণ্যক, ২।৫।১৯) ইত্যাদি শ্রুতিতে যে "মায়া" শব্দ আছে, উহার অর্থ ব্রহ্মের শক্তি, উহা মিথ্যা পদার্থ নহে। ব্রহ্মের অচিন্ত্য শক্তিবশতঃ তাঁহার জগদাকারে পরিণাম হইলেও, তাঁহার স্বরূপের কিছুমাত্র হানি হয় না, সুতরাং নিত্যতারও ব্যাঘাত হয় না, ব্রহ্ম, পরিণামী নিত্য। ইহাদিগের বিশেষ কথা এই যে, বেদান্তসূত্রে পূর্ব্বোক্ত পরিণামবাদই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। কারণ, "উপসংহারদর্শনান্নেতিচেন্ন ক্ষীরবদ্ধি" এবং দেবাদিবদপি লোকে (২।১।২৪।২৫) এই দুই সূত্রের দ্বারা যেরূপে ব্রহ্মের পরিণাম সমর্থিত হইয়াছে, এবং উহার পরেই "কৃৎস্ন-প্রসক্তির্নিরবয়বত্বশব্দকোপো বা" (২।১।২৬)—এই সূত্রের দ্বারা ব্রহ্মের পরিণামের অনুপপত্তি সমর্থনপূর্ব্বক পূর্ব্বপক্ষ সূচনা করিয়া "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ" (২।১।২৭) —এই সূত্রের দ্বারা যেরূপে ঐ পূর্ব্বপক্ষের নিরাস করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম (বিবর্ত্ত নহে), এই সিদ্ধান্তই স্পষ্ট বুঝা যায়। যেমন দুগ্ধের পরিণাম দধি, তদ্রূপ জগৎ ব্রহ্মের বাস্তব পরিণাম, ইহাই বাদরায়ণের সিদ্ধান্ত না হইলে, তাঁহার পূর্ব্বোক্ত সূত্রে "ক্ষীর" দৃষ্টান্ত সুসঙ্গত হয় না এবং পরে "কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়বত্বশব্দ-কোপো বা"—এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষপ্রকাশও কোনরূপে উপপন্ন হইতে পারে না। কারণ জগৎ ব্রহ্মের তত্ত্বতঃ পরিণাম না হইলে, অর্থাৎ জগৎ অবিদ্যাকল্পিত হইলে, "ব্রহ্মের আংশিক পরিণাম হইলে, তাঁহার নিরবয়বত্ব বা নিরংশত্ববোধক শাস্ত্রের ব্যাঘাত হয়, এজন্য সম্পূর্ণ ব্রহ্মেরই পরিণাম স্বীকার করিতে হইলে, দুগ্ধের ন্যায় তাঁহার স্বরূপের হানি হয়, মূলোচ্ছেদ হইয়া পড়ে," এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের অবকাশই হয় না। ব্রহ্মের বাস্তব পরিণাম হইলেই, ঐরূপ

পূর্ব্বপক্ষ ও তাহার উত্তর উপপন্ন হয়। পূর্ব্বোক্ত পরিণামবাদী সকল সম্প্রদায়ই নানাপ্রকারে নিজ সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছেন। শ্রীভাষ্যকার রামানুজ এবিষয়ে বহু বিচার করিয়া "বিবর্ত্তবাদ" খণ্ডন করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দার্শনিক প্রভুপাদ শ্রীজীব গোস্বামী "সর্ব্ব-সংবাদিনী" গ্রন্থে পূর্ব্বোক্ত বেদান্তসূত্রগুলির ব্যাখ্যা করিয়া "পরিণামবাদ"ই যে, বেদান্তের সিদ্ধান্ত, ইহা বিচারপূর্ব্বক সমর্থন করিয়াছেন। ব্রহ্ম জগৎরূপে পরিণত হইলেও, তাঁহার অচিন্ত্য শক্তিবশতঃ কিছুমাত্র বিকার হয় না, তিনি সর্ব্বথা অবিকৃত থাকিয়াই জগৎ প্রসব করেন, এই বিষয়ে তিনি চিন্তামণিকে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, "চিন্তামণি"নামে মণিবিশেষ নিজে অবিকৃত থাকিয়াই নানাদ্রব্য প্রসব করে, ইহা লোকে এবং শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ আছে[১]। "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"গ্রন্থেও আমরা পূর্ব্বোক্ত পরিণামবাদ-সমর্থনে "মণি" দৃষ্টান্তের উল্লেখ দেখিতে পাই[২]। সে যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত "পরিণামবাদ" যে সুপ্রাচীন কাল হইতেই নানাপ্রকারে সমর্থিত হইয়াছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিবর্ত্তবাদ-বিদ্বেষী মহাদার্শনিক রামানুজ শ্রীভাষ্যে নিজ সিদ্ধান্তের অতিপ্রাচীনত্ব ও প্রামাণিকত্ব সমর্থন করিবার জন্য অনেক স্থানে বেদান্তসূত্রের যে বোধায়নকৃত বৃত্তির উল্লেখ করিয়াছেন, ঐ বোধায়ন অতিপ্রাচীন, তাঁহার গ্রন্থও এখন অতি দুর্ল্লভ হইয়াছে। ভাস্করাচার্য্য ব্রহ্মের পরিণাম-বাদ সমর্থন করিয়াই বেদান্তসূত্রের ভাষ্য করিয়াছেন। এই ভাস্করাচার্য্যও অতি প্রাচীন। প্রাচীন নৈয়ায়িকবর্য্য উদয়নাচার্য্যও "ন্যায়কুসুমাঞ্জলি" গ্রন্থে ব্রহ্মপরিণামবাদী ঐ ভাস্করাচার্য্যের নামোল্লেখ করিয়াছেন[৩]। কিন্তু ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যং"—ইত্যাদি অনেক শ্রুতির দ্বারা এবং

১। প্রসিদ্ধিশ্চ লোকশাস্ত্রয়োঃ, চিন্তামণিঃ স্বয়মবিকৃত এব নানাদ্রব্যাণি প্রসূতে ইতি।—সর্ব্বসংবাদিনী।

২। অবিচিন্ত্য শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্‌
স্বেচ্ছায় জগৎরূপে পায় পরিণাম।
তথাপি অচিন্ত্য শক্ত্যে হয় অবিকারী।
প্রাকৃত মণি তাহে দৃষ্টান্ত যে ধরি।
নানারত্নরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে।
তথাপিহ মণি রহে স্বরূপ অবিকৃতে।
প্রাকৃত বস্তুতে যদি অচিন্ত্য শক্তি হয়।
ঈশ্বরের অচিন্ত্য শক্তি ইথে কি বিস্ময়?।—চৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা—৭ম প°।

৩। "ব্রহ্ম পরিণতেরিতি ভাস্করগোত্রে যুজ্যতে"।
("কুসুমাঞ্জলি" ২য় স্তবকের ৩য় শ্লোকের ব্যাখ্যায় উদয়নকৃত বিচার দ্রষ্টব্য)
ভাস্করমিতি—ত্রিদণ্ডিমতভাষ্যকারঃ।—বর্দ্ধমানকৃত "প্রকাশ" টীকা।

উপাদান-কারণের সত্তা ভিন্ন কার্য্যের কোন বাস্তব সত্তা নাই, কারণই সত্য, কার্য্য মিথ্যা, ইহা যুক্তির দ্বারা সমর্থন করিয়া, সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন যে, এই জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত্ত। অর্থাৎ অজ্ঞানবশতঃ রজ্জুতে সর্পের ন্যায়, শুক্তিতে রজতের ন্যায় এই জগৎ ব্রহ্মে কল্পিত বা আরোপিত। অজ্ঞানবশতঃ রজ্জুতে যেমন মিথ্যা সর্পের সৃষ্টি হয়, শুক্তিতে মিথ্যা রজতের সৃষ্টি হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মে মিথ্যা জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। রজ্জু যেমন মিথ্যাসর্পের অধিষ্ঠানরূপ উপাদান-কারণ, ব্রহ্মও তদ্রূপ এই মিথ্যা জগতের অধিষ্ঠানরূপ উপাদান-কারণ। আর কোন রূপেই ব্রহ্মের জগদুপাদানত্ব সম্ভব হয় না। ব্রহ্মের বাস্তব পরিণাম স্বীকার করিলে, তাঁহার শ্রুতিসিদ্ধ নির্ব্বিকারত্বাদি কোনরূপে উপপন্ন হয় না। ব্রহ্ম জগতের উপাদান-কারণ, কিন্তু ব্রহ্ম অবিকৃত, ব্রহ্মের কিছুমাত্র বিকার হয় নাই, ইহা বলিতে গেলে পূর্ব্বোক্ত "বিবর্ত্তবাদ"কেই আশ্রয় করিতে হইবে। এই মতে জগৎ মিথ্যা বা মায়িক। এই মতই "বিবর্ত্তবাদ," "মায়াবাদ" "একান্তাদ্বৈতবাদ" ও "অনির্ব্বাচ্যবাদ" প্রভৃতি নামে কথিত হইয়াছে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এই মতের বিশেষরূপ সমর্থন ও প্রচার করিলেও, তাঁহার গুরুর গুরু গৌড়পাদ স্বামী "মাণ্ডুক্য কারিকা"য় এই মতের সুপ্রকাশ করিয়াছেন। আরও নানা কারণে এই মত যে অতি প্রাচীন মত, ইহা বুঝিতে পারা যায়। তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যানুসারে পূর্ব্বোক্ত মতদ্বয় যে, ন্যায়সূত্রকার মহর্ষি গোতমের সময়েও প্রতিষ্ঠিত ছিল, ইহাও স্বীকার করিতে হয়। সে যাহা হউক, মূলকথা তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে পূর্ব্বোক্ত মতদ্বয়কে আশ্রয় করিয়া পূর্ব্বপক্ষ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, অভাব জগতের উপাদান-কারণ না হউক, কিন্তু "ঈশ্বরঃ কারণং"—অর্থাৎ ব্রহ্ম জগতের উপাদান-কারণ হইবেন, ব্রহ্মই জগদাকারে পরিণত হইয়াছেন, সুতরাং ব্রহ্ম জগতের উপাদান-কারণ, ইহাই সিদ্ধান্ত বলিব। অথবা এই জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত্ত, অর্থাৎ অনাদি অনির্ব্বচনীয় অবিদ্যা-বশতঃ এই জগৎ ব্রহ্মেই আরোপিত, ব্রহ্মেই এই জগতের মিথ্যা সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্ম জগতের উপাদান-কারণ, ইহা স্বীকার্য্য। কর্ম্মবাদী যদি বলেন যে, চেতন জীবগণ অনাদিকাল হইতে যে শুভাশুভ কর্ম্ম করিতেছে, তাহাদিগের ঐ সমস্ত কর্ম্মজন্যই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে ও হইতেছে। জগতের সৃষ্ট্যাদি কার্য্যে জীবগণের কর্ম্মই কারণ, উহাতে ঈশ্বরের কোন প্রয়োজন নাই, সুতরাং ঈশ্বর জগতের কারণই নহেন। এইজন্য পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষবক্তা মহর্ষি বলিয়াছেন, "পুরুষকর্ম্মাফল্যাদর্শনাৎ"। তাৎপর্য্য এই যে, চেতনের অধিষ্ঠান ব্যতীত জীবের কর্ম্ম, কিছুরই কারণ হইতে পারে না। সুতরাং কর্ম্মের অধিষ্ঠাতা চেতন পদার্থ স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু অসর্ব্বজ্ঞ জীব অনাদি কালের অসংখ্য কর্ম্মের অধিষ্ঠাতা হইতে পারে না এবং জীব যখন নিষ্ফল কর্ম্মও করে এবং নিষ্ফল বুঝিয়াও কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তখন জীবকে কর্ম্মের অধিষ্ঠাতা চেতন বলা যায় না। সর্ব্বজ্ঞ চেতনকেই কর্ম্মের অধিষ্ঠাতা বলা যায়। সৃষ্ট্যাদি কার্য্যের জন্য সর্ব্বজ্ঞ চেতন অর্থাৎ ঈশ্বর স্বীকার্য্য হইলে, তাঁহাকেই জগতের উপাদান-কারণ বলিব। তাই বলিয়াছেন, "ঈশ্বরঃ কারণং"।

তাৎপর্য্যটীকাকার পূর্ব্বোক্তরূপে এই সূত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষের ব্যাখ্যা করিলেও, বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি পরবর্ত্তী নব্যনৈয়ায়িকগণ ঐরূপ ব্যাখ্যাকে প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করেন নাই। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রথমে তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি-সম্প্রদায়ের পূর্ব্বোক্তরূপ পূর্ব্বপক্ষ ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়া, শেষে নিজ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, "বস্তুতঃ জীবের কর্ম্মনিরপেক্ষ ঈশ্বরই এই জগতের নিমিত্তকারণ, এই মত খণ্ডনের জন্যই এখানে মহর্ষির এই প্রকরণ। ঈশ্বর বা ব্রহ্ম জগতের উপাদান-কারণ, এই মত খণ্ডনের জন্যই যে, মহর্ষি এখানে এই প্রকরণটি বলিয়াছেন, এ বিষয়ে কিছুমাত্র প্রমাণ দেখি না"। বৃত্তিকার বিশ্বনাথের অনেক পরবর্ত্তী "ন্যায়সূত্রবিবরণ"কার রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য্যও প্রথমে বাচস্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যানুসারে এই প্রকরণের ব্যাখ্যা করিয়া, পরে বলিয়াছেন যে, "বস্তুতঃ এখানে ঈশ্বরকে জগতের কারণ বলিয়া সিদ্ধ করিবার জন্যই মহর্ষি "ঈশ্বরঃ কারণং" ইত্যাদি সূত্র বলিয়াছেন। অর্থাৎ এই সূত্রটি সিদ্ধান্তসূত্র। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও শেষে "প্রসঙ্গতঃ এখানে জগতের কারণরূপে ঈশ্বরসিদ্ধির জন্যই মহর্ষির এই প্রকরণ," ইহা অন্য সম্প্রদায়ের মত বলিয়া তন্মতানুসারেও তিন সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সে ব্যাখ্যা পরে প্রকটিত হইবে। ফল-কথা, পরবর্ত্তী নব্যনৈয়ায়িকগণ এখানে বাচস্পতি মিশ্রের ব্যাখ্যা গ্রহণ করেন নাই। পরম-প্রাচীন ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন এবং বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকরও ঐরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই। তাঁহাদিগের ব্যাখ্যার দ্বারাও মহর্ষি যে, জীবের কর্ম্মনিরপেক্ষ ঈশ্বর এই জগতের কারণ, এই মতকেই এই সূত্রে পূর্ব্বপক্ষরূপে প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাই সরলভাবে বুঝা যায়। বস্তুতঃ জীবের কর্ম্মনিরপেক্ষ ঈশ্বরই জগতের কারণ, ঈশ্বর নিজের ইচ্ছাবশতঃই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করেন, তিনি স্বেচ্ছাচারী, তাঁহার ইচ্ছায় কোনরূপ অনুযোগই হইতে পারে না, ইহাও অতি প্রাচীন মত। নকুলীশ পাশুপত-সম্প্রদায় এই মতের সমর্থন করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।[১] শৈবাচার্য্য মহামনীষী ভাসর্ব্বজ্ঞের "গণকারিকা" গ্রন্থের রত্নটীকায় এই মতের ব্যাখ্যা আছে। তদনুসারে মাধবাচার্য্য 'সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে"র নকুলীশ পাশুপত-দর্শন"-প্রবন্ধে ঐ মতেরই ব্যাখ্যা করিয়া, পরে "শৈবদর্শন" প্রবন্ধে ঐ মতের দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। জীবের কর্ম্মাদি-নিরপেক্ষ ঈশ্বরই কারণ, এই মত প্রাচীন কালে এক প্রকার "ঈশ্বরবাদ" নামেও কথিত হইত। প্রাচীন পালি বৌদ্ধ গ্রন্থেও পূর্ব্বোক্তরূপ "ঈশ্বরবাদের" উল্লেখ দেখা যায়[২]। বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ও উক্ত মতকে অন্য সম্প্রদায়ের মত বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। "বুদ্ধচরিত"

১। "কর্ম্মাদিনিরপেক্ষস্তু স্বেচ্ছাচারী যতো হ্যয়ং।
অতঃ কারণতঃ শাস্ত্রে সর্ব্বকারণকারণং"॥
("সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে" নকুলীশ পাশুপতদর্শন দ্রষ্টব্য)।

২। "ইস্সরো সব্বলোকস্স সচে কপ্পেতি জীবিতং।
ইদ্ধিব্যসনভাবঞ্চ কম্মং কল্যাণপাপকং।
নিদ্দেসকারী পুরিসো ইস্সরো তেন লিপ্পতি॥
—মহাবোধিজাতক, (জাতক, ৫ম খণ্ড—২৩৮ পৃষ্ঠা)।

গ্রন্থে অশ্বঘোষও উক্ত মতকে অন্য সম্প্রদায়ের মত বলিয়াই স্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন[১]। মহর্ষি গোতম এখানে "ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকর্ম্মাফল্যদর্শনাৎ"—এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপ "ঈশ্বরবাদ"কেই পূর্ব্বপক্ষরূপে সমর্থন করিয়া, ঐ মতের খণ্ডনের দ্বারা জীবের কর্ম্মসাপেক্ষ ঈশ্বর জগতের নিমিত্তকারণ, এই নিজ সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, ইহাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। বৃত্তিকার বিশ্বনাথের মন্তব্য পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে ॥১৯॥

সূত্র। ন পুরুষকর্ম্মাভাবে ফলানিষ্পত্তেঃ ॥২০॥৩৬২॥

অনুবাদ। (উত্তর) না, অর্থাৎ জীবের কর্ম্মনিরপেক্ষ একমাত্র ঈশ্বরই জগতের কারণ নহেন, যেহেতু জীবের কর্ম্মের অভাবে অর্থাৎ জীব কোন কর্ম্ম না করিলে, ফলের উৎপত্তি হয় না।

ভাষ্য। ঈশ্বরাধীনা চেৎ ফলনিষ্পত্তিঃ স্যাদপি, তর্হি পুরুষস্য সমীহামন্তরেণ ফলং নিষ্পদ্যেতেতি।

অনুবাদ। যদি ফলের উৎপত্তি ঈশ্বরের অধীন হয়, তাহা হইলে জীবের কর্ম্মব্যতীতও ফল উৎপন্ন হইতে পারে।

টিপ্পনী। পূর্ব্বসূত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন করিতে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, জীবের কর্ম্মনিরপেক্ষ ঈশ্বরই জগতের কারণ নহেন। কারণ, জীব কর্ম্ম না করিলে, তাহার কোন ফলনিষ্পত্তি হয় না। যদি একমাত্র ঈশ্বরই জীবের সর্ব্বফলের বিধাতা হন, তাহা হইলে, জীব কিছু না করিলেও তাহার সর্ব্বফলপ্রাপ্তি হইতে পারে। সুতরাং জীবের কর্ম্মসাপেক্ষ ঈশ্বরই জগতের কারণ, ইহাই স্বীকার্য্য। জীবের শুভাশুভ কর্ম্মানুসারেই ঈশ্বর তাহার শুভাশুভ ফল বিধান করেন এবং তজ্জন্য জগতের সৃষ্টি করেন। "ন্যায়বার্ত্তিকে" উদ্দ্যোতকরও এই সূত্রের তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, একমাত্র ঈশ্বরই কারণ হইলে, জীবের কর্ম্ম ব্যতিরেকেও সুখ ও দুঃখের উপভোগ হইতে পারে। তাহা হইলে কর্ম্মলোপ ও মোক্ষের অভাবও হইয়া পড়ে, এবং ঈশ্বরের একরূপতাবশতঃ কার্য্যও একরূপই হয়—জগতের বৈচিত্র্য হইতে পারে না। পরবর্ত্তী সূত্রের "বার্ত্তিকে"ও উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, যিনি কর্ম্মনিরপেক্ষ ঈশ্বরকে কারণ বলিয়া স্বীকার করেন, তাঁহার মতে মোক্ষের অভাব প্রভৃতি দোষ হয়। কিন্তু ঈশ্বর কর্ম্মসাপেক্ষ হইলে এ সমস্ত দোষ হয় না। কারণ, জীবের দুঃখ-

---

১। "সর্গং বদন্তীশ্বরতস্তথান্যে তত্র প্রযত্নে পুরুষস্য কোঽর্থঃ।
য এব হেতুর্জগতঃ প্রবৃত্তৌ হেতুর্নিবৃত্তৌ নিয়তঃ স এব" ॥

—বুদ্ধচরিত, ৯ম সর্গ—৫৩ শ শ্লোক ॥

জনক কর্ম্ম বা অদৃষ্টবশতঃই ঈশ্বর জীবের দুঃখ সম্পাদন করেন, ইহা সিদ্ধান্ত হইলে, মুক্ত আত্মার সমস্ত অদৃষ্টের ধ্বংস হওয়ায় আর তাহার কোন দিনই দুঃখের উৎপত্তি হইতে পারে না। সুতরাং মোক্ষ উপপন্ন হইতে পারে। উদ্দ্যোতকরের এই সমস্ত কথার দ্বারা তাঁহার মতেও মহর্ষি যে পূর্ব্বসূত্রে কর্ম্মনিরপেক্ষ ঈশ্বরই জগতের কারণ, এই মতকেই পূর্ব্বপক্ষরূপে প্রকাশ করিয়া, এই সূত্রের দ্বারা ঐ মতের খণ্ডন করিয়াছেন, ইহা বুঝিতে পারা যায়। যথাশ্রুত ভাষ্যের দ্বারা ভাষ্যকারেরও ঐরূপ তাৎপর্য্য স্পষ্ট বুঝা যায়।

সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্র তাৎপর্য্যটীকায় পূর্ব্বোক্তরূপে পূর্ব্বসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া এই সূত্রের অবতারণা করিতে বলিয়াছেন যে, মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত "ব্রহ্ম-পরিণামবাদ" ও "ব্রহ্মবিবর্ত্তবাদে"র নিরাস করিয়াছেন। অবশ্য তাঁহার পূর্ব্বপক্ষ-ব্যাখ্যানুসারে এই সূত্রের দ্বারা মহর্ষির পূর্ব্বোক্ত মতদ্বয় বা ব্রহ্মের জগদুপাদানত্বের খণ্ডনই কর্ত্তব্য। কিন্তু মহর্ষির এই সূত্রে পূর্ব্বোক্ত মতদ্বয় নিরাসের কোন যুক্তি পাওয়া যায় না। তাৎপর্য্যটীকাকারও এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত মতদ্বয় নিরাসের কোন যুক্তির ব্যাখ্যা করেন নাই। তিনি "ইদমত্রাকূতং" এই কথা বলিয়া, এই সূত্রের "আকূত" অর্থাৎ গূঢ় আশয় বর্ণন করিতে নিজেই সংক্ষেপে পূর্ব্বোক্ত "ব্রহ্মপরিণামবাদ" ও "ব্রহ্মবিবর্ত্তবাদে"র অযৌক্তিকতা বর্ণন করিয়া বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর জগতের উপাদান-কারণ হইতেই পারেন না। সুতরাং ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত-কারণ, ইহাই মহর্ষি গোতমের সিদ্ধান্ত। কিন্তু যদি কেহ জীবের কর্ম্মনিরপেক্ষ কেবল ঈশ্বরকেই জগতের নিমিত্ত-কারণ বলেন, এই জন্য মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা উহা খণ্ডন করিয়াছেন। মহর্ষি যে, এই সূত্রের দ্বারা জীবের কর্ম্মনিরপেক্ষ কেবল ঈশ্বরের নিমিত্ত-কারণত্ব মতের খণ্ডন করিয়াছেন, ইহাও কিন্তু তাৎপর্য্যটীকাকার শেষে এখানে বলিয়াছেন। এবং পরবর্ত্তী সূত্রের অবতারণা করিতে তিনি বলিয়াছেন যে, মহর্ষি "ব্রহ্মপরিণামবাদ" ও "ব্রহ্মবিবর্ত্তবাদ" এবং কর্ম্মনিরপেক্ষ কেবল ঈশ্বরের নিমিত্ততাবাদের খণ্ডন করিয়া (পরবর্ত্তী সূত্রের দ্বারা) নিজের অভিমত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা কিরূপে "ব্রহ্মপরিণামবাদ" ও "ব্রহ্মবিবর্ত্তবাদে"র খণ্ডন করিয়াছেন, এই সূত্রোক্ত হেতুর দ্বারা কিরূপে ঐ মতদ্বয়ের নিরাস হয়, ইহা তাৎপর্য্যটীকাকার কিছুই বলেন নাই। "ন্যায়-সূত্রবিবরণ"কার রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রথমে তাৎপর্য্যটীকাকারের ব্যাখ্যানুসারেই পূর্ব্বপক্ষের ব্যাখ্যা করিয়া, এই সূত্রের দ্বারা ঐ পূর্ব্বপক্ষের অর্থাৎ ব্রহ্মই জগতের উপাদান-কারণ, এই মতের খণ্ডনেই মহর্ষি গোতমের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, এই সূত্রে "পুরুষকর্ম্ম" বলিতে দৃষ্ট কারণমাত্রই মহর্ষির বিবক্ষিত। পুরুষের কর্ম্ম এবং দণ্ড, চক্র প্রভৃতি ও মৃত্তিকাদিনির্ম্মিত কপাল ও কপালিকা প্রভৃতি দৃষ্ট কারণের অভাবে ফল নিষ্পত্তি হয় না, অর্থাৎ ঘটাদি কার্য্যের উৎপত্তি হয় না, সুতরাং ঘটাদি কার্য্যে ঐ সমস্ত দৃষ্ট কারণও আবশ্যক, ইহাই এই সূত্রের তাৎপর্য্যার্থ। তাহা হইলে ঘটাদি কার্য্যে মৃত্তিকাদি-নির্ম্মিত কপাল কপালিকা প্রভৃতি দ্রব্যেরই উপাদান-কারণত্ব সিদ্ধ হওয়ায় এবং ঐ দৃষ্টান্তে

দ্ব্যণুকের উৎপত্তিতে ঐ দ্ব্যণুকের অবয়ব পরমাণুরই উপাদান-কারণত্ব সিদ্ধ হওয়ায়, ঈশ্বরের উপাদান-কারণত্ব সিদ্ধ হয় না। অর্থাৎ ঈশ্বর বা ব্রহ্ম জগতের উপাদান-কারণ, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই, ইহাই মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা সূচনা করিয়াছেন বুঝিতে হইবে। গোস্বামী ভট্টাচার্য্য বাচস্পতি মিশ্রের মতানুসারে প্রথমে এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপ তাৎপর্য্য কল্পনা করিলেও, শেষে তিনিও উহা প্রকৃত তাৎপর্য্য বলিয়া বিশ্বাস করেন নাই। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতিও এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপ তাৎপর্য্যের ব্যাখ্যা করেন নাই। এই সূত্রের দ্বারা সরলভাবে পূর্ব্বোক্তরূপ তাৎপর্য্য বুঝাও যায় না। জীব কর্ম্ম না করিলে ঈশ্বর তাহাকে স্বেচ্ছাবশতঃ ফল প্রদান করেন না। ঈশ্বর কেবল স্বেচ্ছাবশতঃই কাহাকে সুখ এবং কাহাকে দুঃখ প্রদান করিলে, তাঁহার পক্ষপাত ও নির্দ্দয়তা দোষের আপত্তি হয়। সুতরাং ঈশ্বর জীবের কর্ম্মানুসারেই জীবকে সুখ ও দুঃখ প্রদান করেন, জীবের কর্ম্মসাপেক্ষ ঈশ্বরই জগতের কারণ, ইহাই বৈদিক সিদ্ধান্ত। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা এই বৈদিক সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়া জীবের কর্ম্মনিরপেক্ষ ঈশ্বর জগতের কারণ, এই অবৈদিক মতের খণ্ডন করিয়াছেন, ইহাই এই সূত্রের দ্বারা সরলভাবে স্পষ্ট বুঝা যায়। পরবর্ত্তী সূত্রে ইহা সুব্যক্ত হইবে ॥২০॥

সূত্র। তৎকারিতত্বাদহেতুঃ ॥ ২১ ॥ ৩৬৩ ॥

অনুবাদ। "তৎকারিতত্ব"বশ অর্থাৎ জীবের কর্ম্মের ফল ঈশ্বরকারিত বা ঈশ্বরজনিত, ঈশ্বরই জীবের কর্ম্মফলের বিধাতা, এজন্য "অহেতু" অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্রোক্ত "জীবের কর্ম্মের অভাবে ফলের উৎপত্তি হয় না" এই হেতু জীবের কর্ম্মই তাহার সমস্ত ফলের কারণ ঈশ্বর কারণ নহেন, এই বিষয়ে হেতু (সাধক) হয় না।

ভাষ্য। পুরুষকারমীশ্বরোঽনুগৃহ্লাতি, ফলায় পুরুষস্য যতমানস্যেশ্বরঃ ফলং সম্পাদয়তীতি। যদা ন সম্পাদয়তি, তদা পুরুষকর্ম্মাফলং ভবতীতি। তস্মাদীশ্বরকারিতত্বাদহেতুঃ "পুরুষকর্ম্মাভাবে ফলানিষ্পত্তে"-রিতি।

অনুবাদ। ঈশ্বর পুরুষকারকে অর্থাৎ জীবের কর্ম্মকে অনুগ্রহ করেন, (অর্থাৎ) ঈশ্বর ফলের নিমিত্ত প্রযত্নকারী জীবের ফল সম্পাদন করেন। যে সময়ে সম্পাদন করেন না, সেই সময়ে জীবের কর্ম্ম নিষ্ফল হয়। অতএব "ঈশ্বরকারিতত্ব'বশতঃ "জীবের কর্ম্মের অভাবে ফলের উৎপত্তি হয় না", ইহা অহেতু, [অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্রোক্ত ঐ হেতুর দ্বারা জীবের কর্ম্মই তাহার সমস্ত ফলের কারণ, ঈশ্বর নহেন, ইহা সিদ্ধ হয় না, ঐ হেতু কেবল জীবের কর্ম্মেরই ফলজনকত্বের সাধক হয় না]।

টিপ্পনী। "জীবের কর্ম্মের অভাবে ফলনিষ্পত্তি হয় না", এই হেতুর দ্বারা মহর্ষি পূর্ব্বসূত্রে জীবের কর্ম্মের কারণত্ব সিদ্ধ করিয়া, কর্ম্মনিরপেক্ষ ঈশ্বর জগতের কারণ নহেন, ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এখন পূর্ব্বপক্ষবাদী মহর্ষির পূর্ব্বসূত্রোক্ত হেতুর উল্লেখ করিয়া বলিতে পারেন যে, তাহা হইলে কেবল জীবের কর্ম্মকেই জগতের কারণ বলা যাইতে পারে, অর্থাৎ জীবের কর্ম্মানুসারেই তাহার সুখ-দুঃখাদি ফলভোগ এবং তজ্জন্য জগতের সৃষ্টি হয়। ইহাতে ঈশ্বরের কারণত্ব স্বীকার অনাবশ্যক। মীমাংসক-সম্প্রদায়বিশেষও ইহাই সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন। ফল-কথা, পূর্ব্বসূত্রে যে হেতুর দ্বারা জীবের কর্ম্মের কারণত্ব সিদ্ধ করা হইয়াছে, ঐ হেতুর দ্বারা কেবল জীবের কর্ম্মই কারণ, ইহাই সিদ্ধ হইবে। সুতরাং মহর্ষি গোতমের সিদ্ধান্ত যে, কর্ম্মসাপেক্ষ ঈশ্বরের জগৎকারণত্ব, তাহা সিদ্ধ হয় না। এতদুত্তরে মহর্ষি শেষে এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বসূত্রে যে হেতু বলিয়াছি, উহা জীবের কর্ম্মই কারণ, ঈশ্বর কারণ নহেন, এই বিষয়ে হেতু হয় না। অর্থাৎ ঐ হেতুর দ্বারা জীবের কর্ম্মও কারণ, ইহাই সিদ্ধ হয়; কেবল জীবের কর্ম্মই কারণ, ঈশ্বর কারণ নহেন, ইহা সিদ্ধ হয় না। কারণ, জীবের কর্ম্মের ফল ঈশ্বরকারিত। ভাষ্যকার এই সূত্রস্থ "তৎ" শব্দের দ্বারা প্রথম সূত্রোক্ত ঈশ্বরকেই গ্রহণ করিয়া, এই সূত্রের "তৎকারিতত্বাৎ" এই হেতুবাক্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"ঈশ্বর-কারিতত্বাৎ"। এবং ঐ "ঈশ্বরকারিতত্ব" বুঝাইবার জন্যই ভাষ্যকার প্রথমে বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর জীবের কর্ম্মকে অনুগ্রহ করেন, অর্থাৎ কোন ফলের জন্য কর্ম্মকারী জীবের ঐ ফল সম্পাদন করেন। ঈশ্বর যে সময়ে ফল সম্পাদন করেন না, সে সময়ে ঐ কর্ম্ম নিষ্ফল হয়। অর্থাৎ জীবের কিরূপ কর্ম্ম আছে এবং কোন্ সময়ে ঐ কর্ম্মের কিরূপ ফলভোগ হইবে, ইহা ঈশ্বরই জানেন, তদনুসারে ঈশ্বরই জীবের কর্ম্মফল সম্পাদন করেন, তিনি জীবের কর্ম্মফল সম্পাদন না করিলে, জীবের কর্ম্ম নিষ্ফল হয়। সুতরাং অনেক সময়ে জীবের কর্ম্মের বৈফল্য দেখা যায়। ভাষ্যকারের এই ব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহার মতে মহর্ষি "তৎকারিতত্বাৎ" এই হেতু-বাক্যের দ্বারা এখানে জীবের কর্ম্মের ফলকেই ঈশ্বরকারিত বলিয়াছেন, ইহাই বুঝা যায়। সুতরাং জীবের কর্ম্মফলের প্রতি কেবল কর্ম্মই কারণ নহে, কর্ম্মফলবিধাতা ঈশ্বরও কারণ, ইহাই ঐ বাক্যের দ্বারা প্রকটিত হয়। তাহা হইলে পূর্ব্বসূত্রে যে হেতু বলা হইয়াছে, তাহা কেবল জীবের কর্ম্মের কারণত্ব-সাধক হেতু হয় না, ইহাও মহর্ষির "তৎকারিতত্বাৎ" এই হেতু-বাক্যের দ্বারা প্রতিপন্ন হইতে পারে। অবশ্য মহর্ষি যে, পূর্ব্বসূত্রোক্ত হেতুকেই এই সূত্রে "অহেতু" বলিয়াছেন, ইহা ভাষ্যকার স্পষ্ট করিয়া বলিলেও, উহা কোন্ সাধ্যের সাধক হেতু হয় না, তাহা বলেন নাই। কিন্তু ভাষ্যকার যেভাবে জীবের কর্ম্মফলের ঈশ্বরকারিতত্ব বুঝাইয়া, কর্ম্মফললাভে কর্ম্মের ন্যায় ঈশ্বরকেও কারণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিলে, ঈশ্বরনিরপেক্ষ কেবল কর্ম্মই ঐ কর্ম্মফলের কারণ নহে, পূর্ব্বসূত্রোক্ত হেতুর দ্বারা উহা সিদ্ধ হয় না, ইহা এখানে ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বুঝা যাইতে পারে। জৈমিনির মতে ঈশ্বরনিরপেক্ষ কর্ম্মই কর্ম্মফলের কারণ, ইহা বেদান্তদর্শনে ভগবান্ বাদরায়ণও উল্লেখ

করিয়াছেন। মহর্ষি গোতম শেষে এই সূত্রের দ্বারা ঐ মতের খণ্ডন করিয়াও, তাঁহার নিজ সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। কারণ, মহর্ষির নিজের সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে, ঐ মতের খণ্ডন করা এখানে অত্যাবশ্যক।

পরন্তু, পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে,"জীবের কর্ম্মব্যতীত ফলের উৎপত্তি হয় না" এই (পূর্ব্ব-সূত্রোক্ত) হেতুর দ্বারা যদি জীবের কর্ম্মের ফলজনকত্ব সিদ্ধ হয়,তাহা হইলে, জীবের কর্ম্ম সর্ব্বত্রই সফল হইবে। কারণ, যাহা ফলের কারণ বলিয়া সিদ্ধ, তাহা থাকিলে ফল অবশ্যই হইবে, নচেৎ তাহাকে ফলের কারণই বলা যায় না। কিন্তু জীব কর্ম্ম করিলেও যখন অনেক সময়ে ঐ কর্ম্ম নিষ্ফল হয়, তখন জীবের কর্ম্মকে ফলের কারণ বলা যায় না। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা ইহারও উত্তর বলিয়াছেন যে, "জীবের কর্ম্মব্যতীত ফলের উৎপত্তি হয় না", এই হেতু জীবের কর্ম্মের সর্ব্বত্র ফলজনকত্বের সাধক হেতু হয় না। কারণ, জীবের কর্ম্মের ফল ঈশ্বরকারিত। অর্থাৎ ঈশ্বরই জীবের কর্ম্মফলের বিধাতা। তিনি জীবের কর্ম্মের ফল সম্পাদন না করিলে, ঐ কর্ম্ম নিষ্ফল হয়। জীব কর্ম্ম না করিলে, ঈশ্বর তাহার সুখদুঃখাদি ফল বিধান করেন না, এজন্য জীবের ফললাভে তাহার কর্ম্মও কারণ, ইহাই পূর্ব্বসূত্রোক্ত হেতুর দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু জীব কোন ফললাভের জন্য যে কর্ম্ম করে, কেবল সেই কর্ম্মই তাহার সেই ফললাভের কারণ নহে। জীবের পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্ম বা অদৃষ্টবিশেষ এবং সেই ফললাভের প্রতি-বন্ধক দুরদৃষ্টবিশেষের অভাব এবং সেই কর্ম্মের ফলভোগের কাল, এই সমস্তও সেই ফললাভে কারণ। জীবের সেই সমস্ত অদৃষ্ট এবং ফললাভের প্রতিবন্ধক দুরদৃষ্টবিশেষ এবং কোন্ সময়ে কিরূপে কোন্ স্থানে ঐ কর্ম্মের ফল-ভোগ হইবে, ইত্যাদি সেই সর্ব্বজ্ঞ এবং জীবের সর্ব্বকর্ম্মাধ্যক্ষ একমাত্র ঈশ্বরই জানেন, সুতরাং তদনুসারে তিনিই জীবের সর্ব্বকর্ম্মের ফলবিধান করেন। ফললাভের পূর্ব্বোক্ত সমস্ত কারণ না থাকিলে, ঈশ্বর জীবের কর্ম্মের ফলবিধান করেন না। সুতরাং অনেক সময়ে জীবের কর্ম্মের বৈফল্যের উপপত্তি হয়। ফলকথা, জীবের ফললাভে তাহার কর্ম্ম কারণ হইলেও, ঐ কর্ম্ম সর্ব্বত্র ফলজনক হইবে, এ বিষয়ে পূর্ব্বসূত্রোক্ত হেতু অহেতু, অর্থাৎ ঐ হেতু জীবের কর্ম্মের সর্ব্বত্র ফলজনকত্বের সাধক হয় না, ইহাও পক্ষান্তরে এই সূত্রের দ্বারা মহর্ষির বক্তব্য বুঝা যাইতে পারে। ভাষ্যকারের কথার দ্বারাও ঐরূপ তাৎপর্য্যের ব্যাখ্যা করা যায়।

উদ্দ্যোতকর এই সূত্রের অবতারণা করিতে বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর জীবের কর্ম্মকে অপেক্ষা করিয়া জগতের কর্ত্তা হইলে, জীবের সেই কর্ম্মে ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব নাই, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, কর্ত্তা যাহা সহকারী কারণরূপে অবলম্বন করেন, তাহা ঐ কর্ত্তার কৃত পদার্থ নহে, তাহাতে ঐ কর্ত্তার কারণত্ব নাই, ইহা দেখা যায়। সুতরাং ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিকার্য্যে জীবের কর্ম্মকে সহকারী কারণরূপে অবলম্বন করিলে, জীবের ঐ কর্ম্মে ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব থাকে না। তাহা হইলে ঈশ্বরের সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব ও সর্ব্বেশ্বরত্ব সম্ভব হয় না। সুতরাং ঈশ্বর জীবের কর্ম্মকে অপেক্ষা করিয়া কোন কার্য্য করেন না। তিনি জীবের কর্ম্মনিরপেক্ষ জগৎকর্ত্তা,

এই সিদ্ধান্তই স্বীকার্য্য। এতদুত্তরে এই সূত্রের অবতারণা করিয়া উদ্দ্যোতকর মহর্ষির তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, আমরা জীবের কর্ম্মনিরপেক্ষ ঈশ্বর জগতের কারণ, ইহা বলি না। কিন্তু আমরা বলি, ঈশ্বর জীবের কর্ম্মকে অনুগ্রহ করেন। কর্ম্মের অনুগ্রহ কি? এতদুত্তরে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, জীবের যে কর্ম্ম যেরূপ, এবং যে সময়ে উহার ফলভোগ হইবে, সেই সময়ে সেইরূপে ঐ কর্ম্মের বিনিয়োগ করা অর্থাৎ উহার যথাযথ ফল-বিধান করাই কর্ম্মের অনুগ্রহ। উদ্দ্যোতকরের কথার দ্বারা তাঁহার মতে এই সূত্রের তাৎপর্য্যার্থ বুঝা যায় যে, ঈশ্বর জীবের কর্ম্মকে অপেক্ষা করিয়া জগতের কর্ত্তা হইলে, ঐ কর্ম্মে তাঁহার যে কোনরূপ কর্ত্তৃত্ব থাকিবে না—ঐ কর্ম্মে যে, তাঁহার ঈশ্বরত্ব থাকিবে না, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। ঈশ্বর জীবের যে কর্ম্মকে অপেক্ষা করিয়া জগতের সৃষ্ট্যাদি করিতেছেন, ঐ কর্ম্মও ঈশ্বরকারিত। অর্থাৎ ঈশ্বরই ঐ কর্ম্মের প্রয়োজক কর্ত্তা। ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতীত জীবের ঐ কর্ম্ম ও কর্ম্মফলপ্রাপ্তি সম্ভবই হয় না। ঈশ্বরই জীবের কর্ম্মফলের বিধাতা। সুতরাং ঈশ্বর জীবের কর্ম্মকে অপেক্ষা করিয়া জগতের কর্ত্তা হইলেও, ঐ কর্ম্মেও তাঁহার ঈশ্বরত্ব আছে। তাঁহার সর্ব্বেশ্বরত্বের বাধা নাই। তাহা হইলে পূর্ব্বসূত্রে যে হেতু বলা হইয়াছে, উহা জীবের কর্ম্মসাপেক্ষ ঈশ্বর জগতের নিমিত্তকারণ, এই সিদ্ধান্তের খণ্ডনে হেতু হয় না। পরন্তু, জীবের কর্ম্মনিরপেক্ষ ঈশ্বর জগতের নিমিত্তকারণ, এই মতের খণ্ডনেই হেতু হয়। অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্রোক্ত হেতুর দ্বারা জীবের কর্ম্মের সহকারি-কারণত্ব সিদ্ধ হইলে, ঈশ্বর ঐ কর্ম্মের কারণ হইতে পারেন না বলিয়া, উহার দ্বারা জীবের কর্ম্মসাপেক্ষ ঈশ্বর জগতের নিমিত্তকারণ, এই সিদ্ধান্ত খণ্ডন করা যায় না। কারণ, জীবের কর্ম্মও ঈশ্বরনিমিত্তক। তাৎপর্য্যটীকা-কারও এইরূপই তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যকারের কথার দ্বারাও এইরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করা যায়। ফলকথা, আমরা মহর্ষির এই সূত্রের দ্বারা বুঝিতে পারি যে, (১) পূর্ব্ব-সূত্রোক্ত হেতু কেবল (ঈশ্বরনিরপেক্ষ) জীবের কর্ম্মের ফলজনকত্ব বা জগৎকারণত্বের সাধক হেতু হয় না এবং (২) জীবের কর্ম্মের সর্ব্বত্র ফলজনকত্বের সাধক হেতু হয় না, এবং (৩) জীবের কর্ম্মসাপেক্ষ ঈশ্বর জগতের নিমিত্তকারণ, এই সিদ্ধান্তের খণ্ডনেও হেতু হয় না। কারণ, জীবের কর্ম্ম ও কর্ম্মফল ঈশ্বরকারিত। অর্থাৎ ঈশ্বরই জীবের কর্ম্মের কারয়িতা এবং ফলবিধাতা। সূত্রে বহু অর্থের সূচনা থাকে, ইহা সূত্রের লক্ষণেও কথিত আছে[১], সুতরাং এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপ ত্রিবিধ অর্থই সূচিত হইয়াছে, ইহা বলা যাইতে পারে। তাহা হইলে, এই সূত্রের দ্বারা কেবল কর্ম্ম বা কেবল ঈশ্বর এই জগতের নিমিত্তকারণ নহেন, কিন্তু

১। সূত্রঞ্চ বহ্বর্থসূচনাদ্ভবতি। যথাহুঃ—

"লঘূনি সূচিতার্থানি স্বল্পাক্ষরপদানি চ।

সর্ব্বতঃ সারভূতানি সূত্রাণ্যাহুর্মনীষিণঃ"॥ ইতি।

—বেদান্তদর্শনের প্রথম সূত্রভাষ্য, ভামতী।

জীবের কর্ম্মসাপেক্ষ ঈশ্বরই জগতের নিমিত্তকারণ, এই সিদ্ধান্তই সমর্থিত হওয়ায়, জীবের কর্ম্মনিরপেক্ষ ঈশ্বর জগতের নিমিত্তকারণ, এই পূর্ব্বপক্ষ নিরস্ত হইয়াছে।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, জীবের ফললাভে তাহার কর্ম্ম বা পুরুষকার কারণ হইলে, উহা সর্ব্বত্র সফল হউক? পূর্ব্বপক্ষবাদীর এই আপত্তির নিরাসের জন্য মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা শেষে বলিয়াছেন যে, জীব পুরুষকার করিলেও অনেক সময় উহার যে ফল হয় না, ঐ ফলাভাব "তৎকারিত" অর্থাৎ জীবের অদৃষ্টবিশেষের অভাবপ্রযুক্ত। জীব পুরুষকার করিলেও, তাহার ফললাভের কারণান্তর অদৃষ্টবিশেষ না থাকায়, অনেক সময়ে ঐ পুরুষকার সফল হয় না। সুতরাং জীবের পুরুষকার "অহেতু" অর্থাৎ ফলের উপধায়ক নহে—সর্ব্বত্র ফলজনক নহে। বৃত্তিকার এই সূত্রে "তৎ" শব্দের দ্বারা পূর্ব্বসূত্রোক্ত "পুরুষকর্ম্মাভাব"কেই গ্রহণ করিয়া, এখানে উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—পুরুষের (জীবের) কর্ম্মের অর্থাৎ অদৃষ্টবিশেষের অভাব। এবং জীবের ফলাভাবকেই এখানে "তৎকারিত" অর্থাৎ অদৃষ্টবিশেষের অভাবপ্রযুক্ত বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এবং সূত্রোক্ত "অহেতু" শব্দের ব্যাখ্যায় জীবের পুরুষকারকে অহেতু বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুতরাং "অহেতু" শব্দের দ্বারা ফলের অনুপধায়ক এইরূপ অর্থের ব্যাখ্যা করিতে হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বসূত্রে কোন হেতু কথিত হইলে, পরসূত্রে "অহেতু" শব্দের প্রয়োগ করিলে, ঐ "অহেতু" শব্দের দ্বারা পূর্ব্বসূত্রোক্ত হেতুকেই "অহেতু" বলা হইয়াছে, ইহাই সরলভাবে বুঝা যায়। মহর্ষির সূত্রে অন্যত্রও অনেক স্থলে পদার্থপরীক্ষায় পূর্ব্বসূত্রোক্ত হেতুই পরসূত্রে "অহেতু" বলিয়া কথিত হইয়াছে। সুতরাং এই সূত্রে "অহেতু" শব্দের দ্বারা পূর্ব্বসূত্রোক্ত হেতুকেই "অহেতু" বলিয়া ব্যাখ্যা করা গেলে, বৃত্তিকারের ন্যায় অন্যরূপ ব্যাখ্যা করা, অর্থাৎ কষ্টকল্পনা করিয়া "অহেতু" শব্দের দ্বারা "পুরুষকার ফলের অনুপধায়ক" এইরূপ অর্থের ব্যাখ্যা করা সমুচিত মনে হয় না। পরন্তু, বৃত্তিকারের ব্যাখ্যায় এই সূত্রের দ্বারা আপত্তিবিশেষের নিরাস হইলেও, জীবের কর্ম্ম ও কর্ম্ম-ফল ঈশ্বরকারিত, ঈশ্বর জীবের কর্ম্মফলের বিধাতা, সুতরাং জীবের কর্ম্মসাপেক্ষ ঈশ্বর জগতের নিমিত্তকারণ, এই সিদ্ধান্তের সমর্থন হয় না। সুতরাং এই প্রকরণে সিদ্ধান্তবাদী মহর্ষির বক্তব্যের ন্যূনতা হয়। ভাষ্যকার এই সূত্রে "তৎ" শব্দের দ্বারা প্রথম সূত্রোক্ত ঈশ্বরকেই মহর্ষির বুদ্ধিস্থরূপে গ্রহণ করিয়া, "তৎকারিতত্বাৎ"—এই হেতু বাক্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন "ঈশ্বরকারিতত্বাৎ"। সুতরাং তাঁহার ব্যাখ্যায় মহর্ষির বক্তব্যের কোন ন্যূনতা নাই। উদ্দ্যোতকরও শেষে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে, মহর্ষি এই সূত্রে "তৎকারিতত্বাৎ" এই বাক্য বলিয়া, ঈশ্বর জগতের নিমিত্তকারণ, এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। মূলকথা, ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনগণের ব্যাখ্যানুসারে মহর্ষি "ঈশ্বরঃ কারণং" ইত্যাদি প্রথম সূত্রের দ্বারা জীবের কর্ম্মনিরপেক্ষ ঈশ্বর জগতের নিমিত্তকারণ, এই পূর্ব্বপক্ষের প্রকাশ করিয়া, শেষে দুইটি সূত্রের দ্বারা ঐ পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডনপূর্ব্বক জীবের কর্ম্মসাপেক্ষ ঈশ্বর জগতের নিমিত্তকারণ, এই নিজ সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছেন, ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক।

পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষবাদীর মূল-কথা এই যে, জীব কর্ম্ম করিলেও, যখন অনেক সময়ে ঐ কর্ম্ম নিষ্ফল হয়, ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারেই জীবের কর্ম্মের সাফল্য ও বৈফল্য হয়, তখন জীবের সুখ-দুঃখাদি ফললাভে ঈশ্বর বা তাঁহার ইচ্ছাকেই কারণ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। জীবের কর্ম্মকে কারণ বলা যায় না। সুতরাং জীবের কর্ম্মনিরপেক্ষ ঈশ্বরই জগতের নিমিত্ত-কারণ, এই সিদ্ধান্তই স্বীকার্য্য। এতদুত্তরে এখানে সিদ্ধান্তবাদী মহর্ষির মূল বক্তব্য বুঝিতে হইবে যে, জীবের সুখ-দুঃখাদি ফললাভে তাহার কর্ম্ম কারণ না হইলে, অর্থাৎ জীবের কর্ম্মনিরপেক্ষ ঈশ্বরই কারণ হইলে, জীব সুখ দুঃখাদিজনক কোন কর্ম্ম না করিলেও, তাহার সুখ-দুঃখাদি ফললাভ হইতে পারে। পরন্তু, জীবের সুখ-দুঃখাদি ফলের বৈষম্য ও সৃষ্টির বৈচিত্র্য কোন-রূপেই উপপন্ন হইতে পারে না। কারণ, সর্ব্বভূতে সমান পরমকারুণিক পরমেশ্বর কেবল নিজের ইচ্ছাবশতঃ কাহাকে সুখী ও কাহাকে দুঃখী এবং কাহাকে দেবতা, কাহাকে মনুষ্য ও কাহাকে পশু করিয়া সৃষ্টি করিতে পারেন না। তাঁহার রাগ ও দ্বেষমূলক ঐরূপ বিষম সৃষ্টি বলা যায় না। তিনি নিজেই বলিয়াছেন,—"সমোহহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।" (গীতা। ৯। ২৯)। সুতরাং তিনি জীবের বিচিত্র কর্ম্মানুসারেই বিচিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন, এই সিদ্ধান্তই স্বীকার্য্য। জীবের নিজ কর্ম্মানুসারেই শুভাশুভ ফল ও বিচিত্র শরীরাদি লাভ হইতেছে। শ্রুতিও ইহা স্পষ্টই বলিয়াছেন—"যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি, সাধুকারী সাধুর্ভবতি, পাপকারী পাপো ভবতি, পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি, পাপঃ পাপেন"। "যৎ কর্ম্ম কুরুতে তদভিসম্পদ্যতে"। (বৃহদারণ্যক। ৪। ৪। ৫) বেদান্ত-দর্শনে মহর্ষি বাদরায়ণও পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিসিদ্ধ সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করিতে বলিয়াছেন, "বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাত্তথা হি দর্শয়তি"। (২য় অ°, ১ম পা°, ৩৪শ সূত্র)। অর্থাৎ ঈশ্বর জীবের কর্ম্মকে অপেক্ষা করিয়া তদনুসারে দেবতা, মনুষ্য, পশু প্রভৃতি বিচিত্র জীবদেহের সৃষ্টি ও সংহার করায়, তাঁহার বৈষম্য (পক্ষপাত) এবং নৈর্ঘৃণ্য (নির্দ্দয়তা) দোষের আশঙ্কা নাই। শারীরক-ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ইহা দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, মেঘ যেমন ব্রীহি, যব প্রভৃতি শস্যের সৃষ্টিতে সাধারণ কারণ, কিন্তু ঐ ব্রীহি, যব প্রভৃতি শস্যের বৈষম্যে সেই বীজগত অসাধারণ শক্তিবিশেষই কারণ, এইরূপ ঈশ্বরও দেবতা, মনুষ্য ও পশ্বাদির সৃষ্টিতে সাধারণ কারণ, কিন্তু ঐ দেবতা, মনুষ্য ও পশ্বাদির বৈষম্যে সেই সেই জীবগত অসাধারণ কর্ম্ম বা অদৃষ্টবিশেষই কারণ। তাহা হইলে ঈশ্বর—দেবতা, মনুষ্য ও পশ্বাদির সৃষ্টিকার্য্যে সেই সেই জীবের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মসাপেক্ষ হওয়ায়, তাঁহার বৈষম্য অর্থাৎ পক্ষপাতিতা দোষ হয় না এবং জীবের কর্ম্মানুসারেই এক সময়ে জগতের সংহার করায়, তাঁহার নির্দ্দয়তা দোষও হয় না। কিন্তু ঈশ্বর যদি জীবের কর্ম্মকে অপেক্ষা না করিয়া, কেবল স্বেচ্ছাবশতঃই বিষম সৃষ্টি করেন এবং জগতের সংহার করেন, তাহা হইলেই, তাঁহার বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য দোষ অনিবার্য্য হয়। ঐরূপ ঈশ্বর সাধারণ লোকের ন্যায় রাগ ও দ্বেষের অধীন হওয়ায়, তাঁহাকে জগতের কারণও বলা যায় না। তাই বাদরায়ণ ইহার সমাধান করিতে বলিয়াছেন,—"সাপেক্ষত্বাৎ"। ভাষ্যকার

শঙ্কর উহার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, "সাপেক্ষো হীশ্বরো বিষমাং সৃষ্টিং নির্ম্মিমীতে। কিমপেক্ষত ইতি চেৎ ; ধর্ম্মাধর্ম্মাবপেক্ষত ইতি বদামঃ"। ঈশ্বর যে জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ কর্ম্মকে অপেক্ষা করিয়াই বিচিত্র বিষম সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা কিরূপে বুঝিব ? তাই বাদরায়ণ সূত্রশেষে বলিয়াছেন, "তথাহি দর্শয়তি"। অর্থাৎ শ্রুতি ও শ্রুতিমূলক সমস্ত শাস্ত্রই ঐ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। ভাষ্যকার শঙ্কর উহা প্রদর্শন করিতে এখানে "এষ হ্যেবৈনং সাধুকর্ম্ম কারয়তি" ইত্যাদি "কৌষীতকী" শ্রুতি এবং পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি" ইত্যাদি "বৃহদারণ্যক" শ্রুতি এবং "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং" ইত্যাদি ভগবদ্গীতার (৪।১১) বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। মূলকথা, জীবের কর্ম্মসাপেক্ষ ঈশ্বরই জগতের নিমিত্তকারণ, ইহাই শ্রুতি ও যুক্তিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত। ঈশ্বর জীবের কর্ম্মানুসারেই বিষম সৃষ্টি এবং জীবের সুখ দুঃখাদি ফল বিধান করায়, তাঁহার পক্ষপাতিতা দোষের কোন আশঙ্কা হইতে পারে না। কারণ, তিনি নিজে কেবল স্বেচ্ছাবশতঃ অথবা রাগ ও দ্বেষবশতঃ কাহাকে সুখী এবং কাহাকে দুঃখী করিয়া সৃষ্টি করেন না। জীবের পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারেই সেই সেই কর্ম্মের শুভাশুভ ফল প্রদানের জন্যই তিনি ঐরূপ বিষমসৃষ্টি করেন। সুতরাং ইহাতে তাঁহাকে রাগ ও দ্বেষের বশবর্ত্তী বলা যায় না। সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র শারীরক-ভাষ্যের "ভামতী" টীকায় দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, সভাতে নিযুক্ত কোন সভ্য যুক্তবাদীকে যুক্তবাদী বলিলে এবং অযুক্তবাদীকে অযুক্তবাদী বলিলে, অথবা সভাপতি যুক্তবাদীকে অনুগ্রহ করিলে এবং অযুক্তবাদীকে নিগ্রহ করিলে, তাঁহাকে রাগ ও দ্বেষের বশবর্ত্তী বলা যায় না। পরন্তু, তাঁহাকে মধ্যস্থই বলা যায়। এইরূপ ঈশ্বরও পুণ্যকর্ম্মা জীবকে অনুগ্রহ করিয়া এবং পাপকর্ম্মা জীবকে নিগ্রহ করিয়া মধ্যস্থই আছেন। তিনি যদি পুণ্য-কর্ম্মা জীবকে নিগ্রহ করিতেন এবং পাপকর্ম্মা জীবকে অনুগ্রহ করিতেন, তাহা হইলে অবশ্য তাঁহার মাধ্যস্থ থাকিত না ; তাঁহাকে পক্ষপাতী বলা যাইত। কিন্তু তিনি জীবের শুভাশুভ কর্ম্মানুসারেই সুখ-দুঃখাদি ফল বিধান করায়, তাঁহার পক্ষপাত দোষের কোন সম্ভা-বনাই নাই। এবং জগতের সংহার করায়, তাঁহার নির্দ্দয়তা দোষের আশঙ্কাও নাই। কারণ, সমগ্র জীবের অদৃষ্টের বৃত্তি নিরোধের কাল উপস্থিত হইলে, তখন প্রলয় অবশ্যম্ভাবী। সেই সময়কে লঙ্ঘন করিলে, ঈশ্বর অযুক্তকারী হইয়া পড়েন। সুতরাং জীবের সুষুপ্তির ন্যায় সমগ্র জীবের অদৃষ্টানুসারেই সমগ্র জীবের ভোগ নিবৃত্তি বা বিশ্রামের জন্য যে কাল নির্দ্ধারিত আছে, সেই কাল উপস্থিত হইলে, তিনি জীবের অদৃষ্টানুসারেই অবশ্যই জগতের সংহার করিবেন। তাহাতে তাঁহার নির্দ্দয়তা দোষের কোন কারণ নাই। ঈশ্বর সর্ব্বকার্য্যেই জীবের কর্ম্মকে অপেক্ষা করিলে, তাঁহার ঈশ্বরত্বেরও ব্যাঘাত হয় না। কারণ, যিনি প্রভু, তিনি সেবকগণের নানাবিধ সেবাদি কর্ম্মানুসারে নানাবিধ ফল প্রদান করিলে,তাঁহার প্রভুত্বের ব্যাঘাত হয় না। সর্ব্বোত্তম সেবককে তিনি যে ফল প্রদান করেন, ঐ ফল তিনি মধ্যম সেবক বা অধম সেবককে প্রদান না করিলেও, তাঁহার ফল প্রদানের সামর্থ্যের বাধা হয় না।

এইরূপ ঈশ্বর অপক্ষপাতে সর্ব্বজীবের কর্ম্মফলভোগ সম্পাদনের জন্তই জীবের কর্ম্মানুসারেই বিষমসৃষ্টি করিয়া সুখ-দুঃখাদি ফলবিধান করেন। সুতরাং ইহাতে তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তা ও ঈশ্বরত্বের কোন বাধা হয় না।

"ভামতী"কার বাচস্পতি মিশ্র শেষে "এষ হেবৈনং সাধুকর্ম্ম কারয়তি"[১] ইত্যাদি শ্রুতির উল্লেখ করিয়া পূর্ব্বপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন যে,ঈশ্বর যাহাকে এই লোক হইতে উর্দ্ধলোকে লইতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে তিনিই সাধুকর্ম্ম করাইয়া থাকেন এবং যাহাকে অধোলোকে লইতে ইচ্ছা করেন, তাহাকে তিনিই অসাধুকর্ম্ম করাইয়া থাকেন, ইহা শ্রুতিতে স্পষ্ট বর্ণিত আছে। সুতরাং শ্রুতির দ্বারাই তাঁহার দ্বেষ ও পক্ষপাত প্রতিপন্ন হওয়ায়, পূর্ব্ববৎ বৈষম্য দোষের আপত্তিবশতঃ তাঁহাকে জগতের কারণ বলা যায় না। এতদুত্তরে বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর জীবকে কর্ম্ম করাইয়া সুখী ও দুঃখী করিয়া সৃষ্টি করেন,ইহা পূর্ব্বোক্ত শ্রুতির দ্বারা প্রতিপন্ন হওয়ায়, ঐ শ্রুতির দ্বারাই ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন, ইহা কিছুতেই প্রতিপন্ন হইতে পারে না। কারণ, যে শ্রুতির দ্বারা জীবের কর্ম্মানুসারে ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে, উহার দ্বারাই আবার তাঁহার সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বের অভাব কিরূপে প্রতিপন্ন হইবে? শ্রুতির দ্বারা ঐরূপ বিরুদ্ধ অর্থ প্রতিপন্ন হইতেই পারে না। যদি বল, ঐ শ্রুতির দ্বারা ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বের প্রতিষেধ করি না, কিন্তু তাঁহার বৈষম্য মাত্র অর্থাৎ পক্ষপাতিত্বই বক্তব্য। এতদুত্তরে বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত শ্রুতির দ্বারা জীবের কর্ম্মানুসারে ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব যখন স্বীকার করিতেই হইবে, তখন যে সমস্ত শ্রুতির দ্বারা ঈশ্বরের রাগ-দ্বেষাদি কিছুই নাই, ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে, সুতরাং তাহার পক্ষপাত ও নির্দ্দয়তার সম্ভাবনাই নাই, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। সেই সমস্ত বহু শ্রুতির সমন্বয়ের জন্ত পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিতে "উন্নিনীষতে" এবং "অধোনিনীষতে"—এই দুই বাক্যের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে যে, জীবের তজ্জাতীয় পূর্ব্বকর্ম্মের অভ্যাসবশতঃ জীব তজ্জাতীয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। জীবের সর্ব্বকর্ম্মাধ্যক্ষ ঈশ্বর জীবের সেই পূর্ব্বকর্ম্মানুসারেই তাহাকে উর্দ্ধলোকে এবং অধোলোকে লইবার জন্ত তাহাকে সাধু ও অসাধু কর্ম্ম করাইয়া থাকেন। তাৎপর্য্য এই যে, জীব পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মে পুনঃ পুনঃ যে জাতীয় কর্ম্মকলাপ করিয়াছে, তজ্জাতীয় সেই পূর্ব্বকর্ম্মের অভ্যাসবশতঃ ইহজন্মেও তজ্জাতীয় কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়। জীবের অনন্ত কর্ম্মরাশির মধ্যে যে কর্ম্মের ফলেই যে জীব আবার স্বর্গজনক কোন কর্ম্ম করিয়া স্বর্গলাভ করিবে এবং নরকজনক কোন কর্ম্ম করিয়া নরক লাভ করিবে, সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর সেই জীবকে তাহার সেই পূর্ব্বকর্ম্মানুসারেই সাধু ও অসাধু কর্ম্ম করাইয়া তাহার সেই কর্ম্মলভ্য স্বর্গ ও নরকরূপ ফলের বিধান করেন, ইহাতে তাঁহার রাগ ও দ্বেষ প্রতিপন্ন হয় না। কারণ, তিনি জীবের অনাদিকালের সর্ব্বকর্ম্মসাপেক্ষ। তিনি সেই কর্ম্মানুসারেই জীবকে নানাবিধ কর্ম্ম করাইতেছেন,জগতের

১। এষ হ্যেবৈনং সাধু কর্ম্ম কারয়তি, তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষত এষ উ এবৈনমসাধু কর্ম্ম কারয়তি তাং যমধো নিনীষতে।—কৌষীতকী উপনিষৎ, ৩য় অঃ। ৮। শঙ্করাচার্য্য ও বাচস্পতি মিশ্রের উদ্ধৃত শ্রুতি-পাঠে—"এনং" এই পদ নাই।

সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিতেছেন। তাই পূর্ব্বোক্ত বেদান্তসূত্রে ভগবান্ বাদরায়ণও পূর্ব্বোক্তরূপ সমস্ত আপত্তি নিরাসের জন্য একই হেতু বলিয়া গিয়াছেন—"সাপেক্ষত্বাৎ"। জীব যে পূর্ব্বাভ্যাসবশতঃই পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মকৃত কর্ম্মের অনুরূপ কর্ম্ম করিতে বাধ্য হয়, ইহা "ভগবদ্গীতা"তেও কথিত হইয়াছে।[১] বাচস্পতি মিশ্র এ বিষয়ে অন্য শাস্ত্রপ্রমাণও উদ্ধৃত করিয়াছেন।[২]

পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গুরুতর পূর্ব্বপক্ষ আছে যে, জীব রাগ-দ্বেষাদিবশতঃ স্বাধীনভাবেই কর্ম্ম করিতেছে, উহাতে জীবের স্বাধীনকর্তৃত্বই স্বীকার্য্য। কারণ, জীবের যে সমস্ত কর্ম্ম দেখা যায়, তাহাতে ঈশ্বরের কোন অপেক্ষা বা প্রয়োজন বুঝা যায় না। পরন্তু, রাগ-দ্বেষশূন্য পরমকারুণিক পরমেশ্বর জীবকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিলে, তিনি সকল জীবকে ধর্ম্মেই প্রবৃত্ত করিতেন। তাহা হইলে সকল জীবই ধার্ম্মিক হইয়া সুখীই হইত। ঈশ্বর জীবের পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারেই জীবকে সাধু ও অসাধু কর্ম্মে প্রবৃত্ত করেন, সুতরাং তাঁহার বৈষম্য দোষ হয় না, ইহাও বলা যায় না। কারণ, ঈশ্বর জীবের যে কর্ম্মকে অপেক্ষা করিয়া তদনুসারে বিষমসৃষ্টি করেন, জীবকে সাধু ও অসাধু কর্ম্মে প্রবৃত্ত করেন, ইহা বলা হইয়াছে, সেই কর্ম্মও ঈশ্বর করাইয়াছেন, ইহা বলিতে হইবে। এইরূপ হইলে জীবের কর্ম্মে স্বাতন্ত্র্য না থাকায়, তজ্জন্য জীবের দুঃখভোগে ঈশ্বরই মূল এবং জীব কোন পাপকর্ম্ম করিলে, তজ্জন্য তাহার কোন অপরাধও হইতে পারে না, ইহা স্বীকার্য্য। কারণ, জীবের ঐ কর্ম্মে তাহার স্বতন্ত্র ইচ্ছা নাই। জীব সকল কর্ম্মেই ঈশ্বরপরতন্ত্র। ফলকথা, পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে ঈশ্বরের বৈষম্য দোষ অনিবার্য্য! সুতরাং জীবের স্বাধীনকর্তৃত্বই স্বীকার্য্য। তাহা হইলেই ঈশ্বরকে জীবের কর্ম্মসাপেক্ষ বলা যায় এবং তাহাতে বৈষম্য দোষের আপত্তিও নিরস্ত হয়। সুতরাং তাহাকে জগৎকর্ত্তাও বলা যায়। বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে ভগবান্ বাদরায়ণ নিজেই পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের সমাধান করিতে প্রথম সূত্র বলিয়াছেন, "পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ" ।২।৩।৪১। অর্থাৎ জীবের কর্তৃত্ব সেই পরমাত্মা পরমেশ্বরের অধীন। পরমেশ্বরই জীবকে কর্ম্ম করাইতেছেন, তিনি প্রযোজক কর্ত্তা, জীব প্রযোজ্য কর্ত্তা। কারণ, শ্রুতিতে ঐরূপ সিদ্ধান্তই ব্যক্ত আছে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এখানে "এষ হ্যেবৈনং সাধুকর্ম্ম কারয়তি" ইত্যাদি শ্রুতি এবং "য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মানমন্তরো যময়তি" ইত্যাদি শ্রুতিকেই সূত্রোক্ত "শ্রুতি" শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। জীবের কর্ম্মে তাহার স্বাতন্ত্র্য না থাকিলে, অর্থাৎ ঈশ্বরই জীবকে সাধু ও অসাধু কর্ম্ম করাইলে, পূর্ব্বোক্ত বৈষম্যাদি দোষের আপত্তি কিরূপে নিরস্ত হইবে? এতদুত্তরে ভগবান্ বাদরায়ণ উহার পরেই দ্বিতীয় সূত্র বলিয়াছেন, "কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্তু বিহিতপ্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ"। অর্থাৎ জীবের কর্তৃত্ব স্বাধীন না হইলেও, জীবের কর্তৃত্ব আছে,

---

১। পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোপি সঃ॥ —গীতা। ৬।৪৪।

২। "জন্ম জন্ম যদভ্যস্তং দানমধ্যয়নং তপঃ।
তেনৈবাভ্যাসযোগেন তচ্চৈবাভ্যসতে নরঃ॥"

জীব অবশ্যই কর্ম্ম করিতেছে. ঈশ্বর জীবকৃত প্রযত্ন বা ধর্ম্মাধর্ম্মকে অপেক্ষা করিয়াই, তদনুসারে জীবকে সাধু ও অসাধু কর্ম্ম করাইতেছেন, ইহাই শ্রুতির সিদ্ধান্ত। অন্যথা শ্রুতিতে বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্ম্ম ব্যর্থ হয়। জীবের কর্ত্তৃত্ব ও তন্মূলক ফলভোগ না থাকিলে, শ্রুতিতে বিধি ও নিষেধ সার্থক হইতেই পারে না। সুতরাং শ্রুতির প্রামাণ্যই থাকে না। ভগবান্ বাদরায়ণ ইহার পূর্ব্বে "কর্ত্রধিকরণে", "কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ" (২।৩।৩৩)—ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা জীবের কর্ত্তৃত্ব বিশেষরূপে সমর্থন করিয়াছেন। পরে "পরায়ত্তাধিকরণে" পূর্ব্বোক্ত "পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ" ইত্যাদি দুই সূত্রের দ্বারা জীবের ঐ কর্ত্তৃত্ব যে, ঈশ্বরের অধীন, এবং ঈশ্বর জীবকৃত ধর্ম্মাধর্ম্মকে অপেক্ষা করিয়াই জীবকে সাধু ও অসাধু কর্ম্ম করাইতেছেন, ইহা সমর্থন করিয়াছেন। জীবের কর্ত্তৃত্ব ঈশ্বরের অধীন হইলে, জীবের কর্ম্মে তাহার স্বাতন্ত্র্য না থাকায়, ঈশ্বরের জীবকৃত কর্ম্ম-সাপেক্ষতা উপপন্ন হইতে পারে না। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য নিজেই এই প্রশ্নের অবতারণা করিয়া তদুত্তরে বলিয়াছেন যে,[১] জীবের কর্ত্তৃত্ব ঈশ্বরের অধীন হইলেও, জীব যে কর্ম্ম করিতেছে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। কারণ, জীব কর্ম্ম করিতেছে, ঈশ্বর তাহাকে কর্ম্ম করাইতেছেন। জীব প্রযোজ্য কর্ত্তা, ঈশ্বর প্রযোজক কর্ত্তা। প্রযোজ্য কর্ত্তার কর্ত্তৃত্ব না থাকিলে, প্রযোজক কর্ত্তার কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। সুতরাং ঈশ্বরকে কারয়িতা বলিলে, জীবকে কর্ত্তা বলিতেই হইবে। কিন্তু জীবের ঐ কর্ত্তৃত্ব ঈশ্বরের অধীন হইলেও, জীবকৃত কর্ম্মের ফলভোগ জীবেরই হইবে। কারণ, রাগ-দ্বেষাদির বশবর্ত্তী হইয়া জীবই সেই কর্ম্ম করিতেছে। সেই কর্ম্ম-বিষয়ে জীবের ইচ্ছা ও প্রযত্ন অবশ্যই জন্মিতেছে, নচেৎ তাহাকে কর্ত্তাই বলা যায় না। জীবের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিতে হইলে, ভোক্তৃত্বও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। এখানে প্রণিধান করা আবশ্যক যে, প্রভুর অধীন ভৃত্য প্রভুর আদেশানুসারে কোন সাধু ও অসাধু কর্ম্ম করিলেও, তজ্জন্য ঐ ভৃত্যের কি কোন পুরস্কার ও তিরস্কার বা সমুচিত ফলভোগ হয় না? ভৃত্য যখন নিজে সেই কর্ম্ম করিয়াছে, এবং তাহার যখন রাগ-দ্বেষাদি আছে, তখন তাহার ঐ কর্ম্মজন্য ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী। পরন্তু সেখানে প্রযোজক সেই প্রভুরও রাগ-দ্বেষাদি থাকায়, তাঁহারও সেই কর্ম্মের প্রযোজকতাবশতঃ সমুচিত ফলভোগ হইয়া থাকে। কিন্তু ঈশ্বর জীবকে সাধু ও অসাধু কর্ম্ম করাইলেও, তিনি রাগ-দ্বেষাদিবশতঃ কাহাকে সুখী করিবার জন্য সাধু কর্ম্ম এবং কাহাকে দুঃখী করিবার জন্য অসাধু কর্ম্ম করান না। তাঁহার মিথ্যা জ্ঞান না থাকায়, রাগ-দ্বেষাদি নাই। তিনি সর্ব্বভূতে সমান। তিনি বলিয়াছেন, "সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ"। সুতরাং তিনি জীবের পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারেই ঐ কর্ম্মের ফলভোগ সম্পাদনের জন্য জীবকে অন্য কর্ম্ম করাইতেছেন। অতএব পূর্ব্বোক্ত বৈষম্যাদি দোষের আপত্তি হইতে পারে না। সংসার অনাদি, সুতরাং জীবের অনাদি কর্ম্মপরম্পরা গ্রহণ করিয়া ঈশ্বর জীবের পূর্ব্ব পূর্ব্ব

১। ননু কৃতপ্রযত্নাপেক্ষত্বমেব জীবস্য পরায়ত্তে কর্ত্তৃত্বে নোপপদ্যতে, নৈষ দোষঃ, পরায়ত্তেঽপি হি কর্ত্তৃত্বে করোত্যেব জীবঃ। কুর্ব্বন্তং হি তমীশ্বরঃ কারয়তি। অপিচ পূর্ব্বপ্রযত্নমপেক্ষ্যেদানীং কারয়তি, পূর্ব্বতরঞ্চ প্রযত্নমপেক্ষ্য পূর্ব্বমকারয়দিত্যনাদিত্বাৎ সংসারস্যেত্যনবদ্যং।—শারীরক-ভাষ্য।

কর্ম্মানুসারেই জীবকে কর্ম্ম করাইতেছেন, ইহা বুঝিলে, পূর্ব্বোক্ত আপত্তি নিরস্ত হইয়া যায়। "ভামতী"-টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র এখানে ভাষ্যকার শঙ্করের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর প্রবলতর বায়ুর ন্যায় জীবকে একেবারে সর্ব্বথা অধীন করিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত করেন না, কিন্তু জীবের সেই সেই কর্ম্মে রাগাদি উৎপাদন করিয়া তদ্দ্বারাই জীবকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করেন। তখন জীবের নিজের কর্তৃত্বাদিবোধও জন্মে। সুতরাং জীবের কর্তৃত্ব অবশ্যই আছে, এজন্য ইষ্টপ্রাপ্তি ও অহিতপরিহারে ইচ্ছুক জীবের সম্বন্ধে শাস্ত্রে বিধি ও নিষেধ সার্থক হয়। ফলকথা, ঈশ্বরপরতন্ত্র জীবেরই কর্তৃত্ব, স্বতন্ত্র জীবের কর্তৃত্ব নাই, ইহাই সিদ্ধান্ত। বাচস্পতি মিশ্র ইহা সমর্থন করিতে শেষে "এষ হ্যেবৈনং সাধুকর্ম্ম কারয়তি"—ইত্যাদি শ্রুতির সহিত মহাভারতের "অজ্ঞো জন্তুরনীশোঽয়ং" [১] ইত্যাদি বচনও উদ্ধৃত করিয়াছেন।

অবশ্যই আপত্তি হইবে যে, যে সময়ে কোন জীবেরই শরীরাদি সম্বন্ধরূপ জন্মই হয় নাই, সেই সময়ে কোন জীবেরই কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান সম্ভব না হওয়ায়, সর্ব্বপ্রথম সৃষ্টি জীবের বিচিত্র কর্ম্মজন্য হইতেই পারে না, সুতরাং ঈশ্বর যে, জীবের কর্ম্মকে অপেক্ষা না করিয়াও কেবল স্বেচ্ছাবশতঃ সর্ব্বপ্রথম সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। তাহা হইলে সর্ব্বপ্রথম সৃষ্টি সমানই হইবে। উহা বিষম হইতে পারে না। বেদান্তদর্শনে ভগবান্ বাদরায়ণ নিজেই এই আপত্তির সমর্থনপূর্ব্বক উহার সমাধান করিতে বলিয়াছেন, "ন কর্ম্মা বিভাগাদিতি চেন্নানাদিত্বাৎ" ।২।১।৩৫। অর্থাৎ জীবের সংসার অনাদি, সুতরাং সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি। যে সৃষ্টির পূর্ব্বে আর কোন দিনই সৃষ্টি হয় নাই, এমন কোন সৃষ্টি নাই। প্রলয়ের পরে যে আবার নূতন সৃষ্টি হয়, ঐ সৃষ্টিকেই প্রথম সৃষ্টি বলা হইয়াছে। কিন্তু ঐ সৃষ্টির পূর্ব্বেও আরও অসংখ্যবার সৃষ্টি ও প্রলয় হইয়াছে। সুতরাং সমস্ত সৃষ্টির পূর্ব্বেই সমস্ত জীবেরই জন্ম ও কর্ম্ম থাকায়, ঈশ্বরের সমস্ত সৃষ্টিই জীবের বিচিত্র কর্ম্মানুসারে হইয়াছে,ইহা বলা যাইতে পারে। প্রলয়ের পরে যে নূতন সৃষ্টি হইয়াছে (যাহা প্রথম সৃষ্টি বলিয়া শাস্ত্রে কথিত), ঐ সৃষ্টিও জীবের পূর্ব্বজন্মের বিচিত্র কর্ম্মজন্য। অর্থাৎ পূর্ব্বসৃষ্টিতে সংসারী জীবগণ যেসমস্ত বিচিত্র কর্ম্ম করিয়াছে, তাহার ফল ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম ও সেই নূতন সৃষ্টির সহকারী কারণ। ঈশ্বর ঐ সহকারী কারণকে অপেক্ষা করিয়াই বিষমসৃষ্টি করেন, অর্থাৎ সৃষ্টিকার্য্যে তিনি ঐ ধর্ম্মাধর্ম্মকেও কারণরূপে গ্রহণ করেন। তাই তাঁহাকে ধর্ম্মাধর্ম্মসাপেক্ষ বলা হইয়াছে। ঈশ্বর জীবের বিচিত্র কর্ম্ম বা ধর্ম্মাধর্ম্মকে অপেক্ষা না করিয়া, কেবল নিজেই সৃষ্টির কারণ হইলে, যখন সৃষ্টির বৈচিত্র্য উপপন্ন হইতে পারে না, তখন তিনি সমস্ত সৃষ্টিতেই জীবের বিচিত্র ধর্ম্মাধর্ম্মকে সহকারী কারণরূপে অবলম্বন করেন, সুতরাং জীবের সংসার অনাদি, এই সিদ্ধান্ত

১। "অজ্ঞো জন্তুরনীশোঽয়মাত্মনঃ সুখদুঃখয়োঃ।
ঈশ্বরপ্রেরিতো গচ্ছেৎ স্বর্গং বা শ্বভ্রমেব বা।

—মহাভারত, বনপর্ব্ব—৩০ অ°।

অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। ভগবান্ বাদরায়ণ পরে "উপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ"— এই সূত্রের দ্বারা সংসারের অনাদিত্ববিষয়ে যুক্তি এবং শাস্ত্রপ্রমাণ আছে বলিয়া, তাঁহার পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ঐ যুক্তির ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, সংসার সাদি হইলে, অকস্মাৎ সংসারের উদ্ভব হওয়ায়, মুক্ত জীবেরও পুনর্ব্বার সংসারের উদ্ভব হইতে পারে এবং কর্ম্ম না করিয়াও, প্রথম সৃষ্টিতে জীবের বিচিত্র সুখ-দুঃখ ভোগ করিতে হয়। কারণ, তখন ঐ সুখ-দুঃখাদির বৈষম্যের আর কোন হেতু নাই। জীবের কর্ম্ম ব্যতীত তাহার শরীর সৃষ্টি হয় না, শরীর ব্যতীতও কর্ম্ম করিতে পারে না, এজন্য অন্যোন্যাশ্রয় দোষও এইরূপ স্থলে হয় না। কারণ, যেমন বীজ ব্যতীত অঙ্কুর হইতে পারে না এবং অঙ্কুর না হইলেও, বৃক্ষের উৎপত্তি অসম্ভব হওয়ায়, বীজ জন্মিতে পারে না, এজন্য বীজের পূর্ব্বে অঙ্কুরের সত্তা ও ঐ অঙ্কুরের পূর্ব্বেও বীজের সত্তা স্বীকার্য্য, তদ্রূপ জীবের কর্ম্ম ব্যতীত সৃষ্টি হইতে পারে না এবং সৃষ্টি না হইলেও জীব কর্ম্ম করিতে পারে না, এজন্য সৃষ্টি ও কর্ম্মের পূর্ব্বোক্ত বীজ ও অঙ্কুরের ন্যায় কার্য্য-কারণ-ভাব স্বীকার্য্য। জীবের সংসার অনাদি হইলে, ঐরূপ কার্য্য-কারণ-ভাব সম্ভব হইতে পারে এবং সমস্ত সৃষ্টিই জীবের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল ধর্ম্মাধর্ম্মজন্য হইতে পারায়, সমস্ত সৃষ্টিরই বৈষম্য উপপন্ন হইতে পারে। ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য শেষে জীবের সংসারের অনাদিত্ববিষয়ে শাস্ত্রপ্রমাণ প্রকাশ করিতে "সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ" এই শ্রুতি (ঋগ্বেদসংহিতা, ১০।১৯০।৩) এবং "ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে নান্তো ন চাদির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা" এই ভগবদ্গীতা (১৫।৩)-বাক্যও উদ্ধৃত করিয়াছেন।

বস্তুতঃ জীবের সংসার বা সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি, ইহা বেদ এবং বেদমূলক সর্ব্বশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এবং এই সুদৃঢ় সিদ্ধান্তের উপরেই বেদমূলক সমস্ত সিদ্ধান্ত সুপ্রতিষ্ঠিত। জীবাত্মা নিত্য হইলে, ঐ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ প্রদর্শন করা যায় না, জীবাত্মার সংসারের অনাদিত্ব অসম্ভবও বলা যায় না। কোন পদার্থই অনাদি হইতে পারে না, ইহাও কোনরূপে বলা যায় না। কারণ, যিনি ঐ কথা বলিবেন, তাঁহার নিজের বর্ত্তমান শরীরাদির অভাব কতদিন হইতেছিল, ইহা বলিতে হইলে, উহা অনাদি—ইহাই বলিতে হইবে। তাঁহার ঐ শরীরাদির প্রাগভাব (উৎপত্তির পূর্ব্বকালীন অভাব) যেমন অনাদি, তদ্রূপ তাঁহার সংসারও অনাদি হইতে পারে। অভাবের ন্যায় ভাবও অনাদি হইতে পারে। মহর্ষি গোতমও তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে আত্মার নিত্যত্ব সংস্থাপন করিতে আত্মার সংসারের অনাদিত্বও সমর্থন করিয়া গিয়াছেন এবং তৃতীয় অধ্যায়ের শেষ প্রকরণে "পূর্ব্বকৃতফলানুবন্ধাত্তদুৎপত্তিঃ" ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা আত্মার শরীরাদি সৃষ্টি আত্মার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল ধর্ম্মাধর্ম্মজন্য, ইহা সমর্থন করিয়া তদ্দ্বারাও আত্মার সংসারের অনাদিত্ব সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। পরন্তু, ঐ প্রকরণের দ্বারা জীবের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল ধর্ম্মাধর্ম্মজন্যই বিচিত্র শরীরাদির সৃষ্টি সমর্থন করায়, সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মকে অপেক্ষা করিয়াই জগতের সৃষ্টি করেন, তিনি জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মসাপেক্ষ, সুতরাং তাঁহার বৈষম্যাদি দোষের সম্ভাবনা নাই, ইহাও সূচিত হইয়াছে।

মীমাংসক-সম্প্রদায়বিশেষ সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদিগের মতে জীবের কর্ম্মই জগতের নিমিত্তকারণ। কর্ম্ম নিজেই ফল প্রসব করে, উহাতে ঈশ্বরের কোন প্রয়োজন নাই। ঈশ্বর মানিয়া তাঁহাকে জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মসাপেক্ষ বলিলে, ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব থাকে না,—ঐরূপ ঈশ্বর স্বীকারের কোন প্রয়োজনও নাই, তদ্বিষয়ে কোন প্রমাণও নাই। সাংখ্য-সম্প্রদায়-বিশেষও ঐরূপ নানা যুক্তির উল্লেখ করিয়া সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা জড়প্রকৃতিকেই জগতের সৃষ্টিকর্ত্রী বলিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদিগের মতে পূর্ব্বোক্ত বৈষম্যাদি দোষের কোন আশঙ্কাই নাই। কারণ, জড়পদার্থ সৃষ্টির কর্ত্তা হইলে, তাহার পক্ষপাতাদি দোষ বলা যায় না। কিন্তু এই মতদ্বয় যুক্তি ও শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিয়া নৈয়ায়িক প্রভৃতি সম্প্রদায় উহা স্বীকার করেন নাই। কারণ, জীবের কর্ম্ম অথবা সাংখ্যসম্মত প্রকৃতি, জড়পদার্থ বলিয়া, উহা কোন চেতন পুরুষের অধিষ্ঠান বা প্রেরণা ব্যতীত কোন কার্য্য জন্মাইতে পারে না। চেতনের প্রেরণা ব্যতীত কোন জড়পদার্থ কোন কার্য্য জন্মাইয়াছে, ইহার নির্ব্বিবাদ দৃষ্টান্ত নাই। জীবকুলের অসংখ্য বিচিত্র অদৃষ্টের ফলে যে সৃষ্টি হইবে, তাহাতে ঐ সমস্ত অদৃষ্টের অধিষ্ঠাতা কোন চেতন পুরুষ অবশ্য স্বীকার্য্য। অসর্ব্বজ্ঞ জীব নিজেই তাহার অনাদি কালের সঞ্চিত অনন্ত অদৃষ্টের দ্রষ্টা হইতে না পারায়, অধিষ্ঠাতা হইতে পারে না।

পরন্তু, সৃষ্টির অব্যবহিত পূর্ব্বে জীবের শরীরাদি না থাকায়, তখন জীব তাহার অদৃষ্ট অথবা সাংখ্যসম্মত প্রকৃতির প্রেরক হইতে পারে না। এইরূপ নানাযুক্তির দ্বারা নৈয়ায়িক প্রভৃতি সম্প্রদায় সর্ব্বজ্ঞ নিত্য ঈশ্বর স্বীকার করিয়া, তাঁহাকেই জীবের সর্ব্বকর্ম্মের অধিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। মহর্ষি পতঞ্জলিও প্রকৃতির সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব স্বীকার করিয়াও সর্ব্বজ্ঞ নিত্য ঈশ্বরকেই ঐ প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা বলিয়া, ঈশ্বরকেও সৃষ্টির কারণ বলিয়াছেন। পরন্তু, নানা শ্রুতি ও শ্রুতিমূলক নানা শাস্ত্রে ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব এবং জীবের সর্ব্বকর্ম্মের ফলবিধাতৃত্ব[১] বর্ণিত আছে। অনন্ত জীবের অনাদি-কালসঞ্চিত অনন্ত অদৃষ্টের মধ্যে কোন্ সময়ে, কোন স্থানে, কিরূপে কোন্ অদৃষ্টের কিরূপ ফল হইবে, ইত্যাদি সেই একমাত্র সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরই জানেন, সর্ব্বজ্ঞ ব্যতীত আর কেহই অনন্ত জীবের অনন্ত অদৃষ্টের দ্রষ্টা ও অধিষ্ঠাতা হইতে পারে না। সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরই জীবের সর্ব্বকর্ম্মের ফলবিধাতা, এই সিদ্ধান্তই স্বীকার্য্য এবং ইহাই শ্রুতিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত। মহর্ষি গোতম এখানে এই শ্রুতিসিদ্ধ সিদ্ধান্তেরই উপপাদন করিয়াছেন। বেদান্তদর্শনে মহর্ষি বাদরায়ণও "ফলমত উপপত্তেঃ" এবং "শ্রুতত্বাচ্চ"—৩।২।৩৮।৩৯, এই দুই সূত্রের দ্বারা যুক্তি ও শ্রুতিপ্রমাণের সূচনা করিয়া পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তেরই উপপাদন করিয়াছেন। পরে "ধর্ম্মং জৈমিনিরত এব"—এই সূত্রের দ্বারা জৈমিনির মতের উল্লেখ করিয়া

১। "কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ"।—শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ। ৬।১১।
"একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্"।—কঠ। ৫। ০।
"স বা এষ মহানজ আত্মান্নাদো বসুদানঃ"।—বৃহদারণ্যক।৪।৪।২৪।

—"পূর্ব্বন্তু বাদরায়ণো হেতুব্যপদেশাৎ" (৩।২।৪১)—এই সূত্রের দ্বারা ঈশ্বরই জীবের সর্ব্বকর্ম্মের ফলবিধাতা, এই মতই শ্রুতিসিদ্ধ বলিয়া, তাঁহার নিজের সম্মত ইহা প্রকাশ করিয়া জৈমিনির মতের শ্রুতিবিরুদ্ধতা সূচনা করিয়াছেন। ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য ঐ সূত্রে বাদরায়ণের "হেতুব্যপদেশাৎ"—এই বাক্যের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে "এষ হ্যেবৈনং সাধুকর্ম্ম কারয়তি" ইত্যাদি শ্রুতিতে ঈশ্বরই জীবের কর্ম্মের কারয়িতা এবং উহার ফলবিধাতা হেতু বলিয়া ব্যপদিষ্ট (কথিত) হইয়াছেন। সুতরাং জীবের কর্ম্ম নিজেই ফলহেতু, ঈশ্বর ঐ কর্ম্মফলের হেতু নহেন, এই জৈমিনির মত শ্রুতিসিদ্ধ নহে, পরন্তু শ্রুতিবিরুদ্ধ। তাই বাদরায়ণ ঐ মত গ্রহণ করেন নাই। বাদরায়ণের পূর্ব্বোক্ত নিজ সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে শঙ্কর শেষে ভগবদ্গীতার "যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি" (৭।২১) ইত্যাদি ভগবদ্বাক্যও উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র 'ভামতী' টীকায় বাদরায়ণের পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত যুক্তির দ্বারা অতিসুন্দররূপে সমর্থন করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত বেদান্তসূত্রে বাদরায়ণের "হেতুব্যপদেশাৎ"—এই বাক্যের ন্যায় এই সূত্রে মহর্ষি গোতমের "তৎকারিতত্বাৎ" এই বাক্যের দ্বারা জীবের কর্ম্ম ও কর্ম্মফল ঈশ্বরকারিত, ঈশ্বরই জীবের সমস্ত কর্ম্মের কারয়িতা এবং উহার ফলবিধাতা, ইহা বুঝিলে মহর্ষি গোতমও ঐ বাক্যের দ্বারা জীবের কর্ম্ম ঈশ্বরকে অপেক্ষা না করিয়া নিজেই ফল প্রসব করে, এই মতের অপ্রামাণিকতা সূচনা করিয়াছেন, ইহা বুঝা যাইতে পারে। মূলকথা, যে ভাবেই হউক, পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যানুসারে এই প্রকরণের দ্বারা মহর্ষি কর্ম্মনিরপেক্ষ ঈশ্বরই জগতের নিমিত্তকারণ, এই সুপ্রাচীন মতের খণ্ডন করিয়া জীবের কর্ম্মসাপেক্ষ ঈশ্বরই জগতের নিমিত্তকারণ, কেবল কর্ম্ম অথবা কেবল ঈশ্বরও জগতের নিমিত্তকারণ নহেন, কর্ম্ম ও ঈশ্বর পরস্পর সাপেক্ষ, এই সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করিয়াছেন। ইহার দ্বারা সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের যে, পক্ষপাত ও নির্দ্দয়তা দোষের আপত্তি হয় না, ইহাও সমর্থিত হইয়াছে।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ শেষে বলিয়াছেন যে, মহর্ষি গোতম এখানে প্রসঙ্গতঃ জগতের নিমিত্তকারণরূপে ঈশ্বরসিদ্ধির জন্যই পূর্ব্বোক্ত তিন সূত্রে এই প্রকরণটি বলিয়াছেন, ইহা অপর নৈয়ায়িকগণ বলেন। তাঁহাদিগের মতে মহর্ষি প্রথমে "ঈশ্বরঃ কারণং"—এই বাক্যের দ্বারা ঈশ্বর কার্য্যমাত্রের নিমিত্তকারণ, এই সিদ্ধান্তই প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ বাক্যের দ্বারা কোন মতান্তর বা পূর্ব্বপক্ষ প্রকাশ করেন নাই। কার্য্যমাত্রেরই কর্ত্তা আছে, কর্ত্তা ব্যতীত কোন কার্য্য জন্মে না, ইহা ঘটাদি কার্য্য দেখিয়া নিশ্চয় করা যায়। সুতরাং সৃষ্টির প্রথমে যে "দ্ব্যণুক" প্রভৃতি কার্য্য জন্মিয়াছে, তাহারও অবশ্য কর্ত্তা আছে, এইরূপ বহু অনুমানের দ্বারা জগৎকর্ত্তা ঈশ্বরের সিদ্ধি হয়। সুতরাং "ঈশ্বরঃ কারণং", অর্থাৎ ঈশ্বর জগতের কর্ত্তারূপ নিমিত্তকারণ। প্রতিবাদী যদি বলেন যে, জীবই জগতের নিমিত্তকারণ হইবে, জীবই সৃষ্টির প্রথমে দ্ব্যণুকের কর্ত্তা ; ঈশ্বর-স্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই, এজন্য মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্য সূত্রশেষে বলিয়াছেন, "পুরুষকর্ম্মাফল্যদর্শনাৎ"। তাৎপর্য্য এই যে, জীব যখন

নিষ্ফল কর্ম্মেও প্রবৃত্ত হয়, তখন জীবের অজ্ঞতা সর্ব্বসিদ্ধ, সুতরাং জীব "দ্ব্যণুকে"র নিমিত্ত-কারণ হইতেই পারে না। কারণ, যে ব্যক্তির কার্য্যের উপাদানকারণ-বিষয়ক প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে, সেই ব্যক্তিই ঐ কার্য্যের কর্ত্তা হইতে পারে। দ্ব্যণুকের উপাদানকারণ অতীন্দ্রিয় পরমাণু, তদ্বিষয়ে জীবের প্রত্যক্ষ জ্ঞান সম্ভব না হওয়ায়, "দ্ব্যণুকে"র কর্ত্তৃত্ব জীবের পক্ষে অসম্ভব। প্রতিবাদী বলিতে পারেন যে, জীবের কর্ম্ম বা অদৃষ্ট ব্যতীত যখন কোন ফলনিষ্পত্তি (কার্য্যোৎপত্তি) হয় না, তখন অদৃষ্ট দ্বারা জীবগণকেই "দ্ব্যণুকা"দি কার্য্যমাত্রের কর্ত্তা বলা যায়। সুতরাং কার্য্যমাত্রেরই কর্ত্তা আছে, এইরূপ অনুমানের দ্বারা জীব ভিন্ন ঈশ্বর সিদ্ধ হইতে পারে না। মহর্ষি "ন পুরুষকর্ম্মাভাবে ফলানিষ্পত্তেঃ" এই দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপ পূর্ব্বপক্ষেরই সূচনা করিয়া উহার খণ্ডন করিতে তৃতীয় সূত্র বলিয়াছেন—"তৎকারিতত্বাদ-হেতুঃ"। তাৎপর্য্য এই যে, জীবের কর্ম্ম বা অদৃষ্টও "তৎকারিত" অর্থাৎ ঈশ্বরকারিত। অর্থাৎ ঈশ্বর ব্যতীত জীবের কর্ম্ম ও তজ্জন্য অদৃষ্টও জন্মিতে পারে না। পরন্তু, কোন চেতন পুরুষের অধিষ্ঠান ব্যতীত অচেতন পদার্থ কোন কার্য্যের কারণ হয় না। সুতরাং অচেতন অদৃষ্টের অধিষ্ঠাতারূপে কোন চেতন পুরুষ অবশ্য স্বীকার্য্য। তিনিই সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর। কারণ, সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ ব্যতীত আর কোন পুরুষই অনন্ত জীবের অনন্ত অদৃষ্টের জ্ঞাতা ও অধিষ্ঠাতা হইতে পারে না। সুতরাং পূর্ব্বসূত্রে যে হেতুর দ্বারা জীবেরই জগৎকর্ত্তৃত্ব বলা হইয়াছে, উহা ঐ বিষয়ে হেতু হয় না। কারণ, অনন্ত জীবের অনন্ত অদৃষ্টের অধিষ্ঠাতা-রূপে যে সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর স্বীকার করিতেই হইবে, তাঁহাকেই জগৎকর্ত্তা বলিতে হইবে।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ নিজে এই প্রকরণের পূর্ব্বোক্তরূপ ব্যাখ্যা না করিলেও, তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই যে অনেক নৈয়ায়িক ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং মহর্ষি গোতমের "ঈশ্বরঃ কারণং"—এই বাক্যকে অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও জগৎকর্তৃত্ব সমর্থন করিতে নানারূপ অনুমান প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা বৃত্তিকারের কথার দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। বৃত্তিকারের বহুপরবর্ত্তী "ন্যায়সূত্র-বিবরণ"কার রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য্যও শেষে এই প্রকরণকে প্রসঙ্গতঃ ঈশ্বরসাধক বলিয়াই নিজ মতানুসারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং বৃত্তিকার বিশ্বনাথের ন্যায় ব্যাখ্যান্তরও প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ জগতের উপাদান-কারণবিষয়ে যেমন সুপ্রাচীন কাল হইতে নানা বিপ্রতিপত্তি হইয়াছে, জগতের নিমিত্ত-কারণ-বিষয়েও তদ্রূপ নানা বিপ্রতিপত্তি হইয়াছে। উপনিষদেও ঐ বিপ্রতিপত্তির স্পষ্ট প্রকাশ পাওয়া যায়[১]। সুতরাং মহর্ষি তাঁহার "প্রেত্যভাব" নামক প্রমেয়ের পরীক্ষা-প্রসঙ্গে পূর্ব্বোক্ত "ব্যক্তাদ্ব্যক্তানাং প্রত্যক্ষপ্রামাণ্যাৎ" ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা জগতের উপাদান-কারণ-বিষয়ে নিজ সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া এবং ঐ বিষয়ে মতান্তর খণ্ডন করিয়া, পরে "ঈশ্বরঃ কারণং" ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা জগতের নিমিত্তকারণ-বিষয়ে নিজ

১। স্বভাবমেকে কবয়ো বদন্তি কালং তথান্যে পরিমুহ্যমানাঃ।—শ্বেতাশ্বতর।৬।১।

সিদ্ধান্ত সমর্থন করিলে এই প্রকরণের সুসঙ্গতি হয়। কারণ, মহর্ষি পূর্ব্বে পরমাণু-সমূহকে জগতের উপাদান-কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত সূচনা করায়, জগতের নিমিত্ত-কারণ কি? জগতের উপাদানকারণ পরমাণুসমূহের অধিষ্ঠাতা জগৎকর্ত্তা কোন চেতন পুরুষ আছেন কিনা? এবং তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি?—ইত্যাদি প্রশ্ন অবশ্যই হইবে। তদুত্তরে মহর্ষি এই প্রকরণের প্রারম্ভে "ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকর্ম্মাফল্যদর্শনাৎ"—এই সিদ্ধান্ত-সূত্রের দ্বারা স্পষ্ট করিয়া নিজ সিদ্ধান্তের সমর্থন করিলে, তাঁহার বক্তব্যের ন্যূনতা থাকে না। সুতরাং মহর্ষি "ঈশ্বরঃ কারণং" ইত্যাদি প্রথম সূত্রের দ্বারা ঈশ্বর পরামাণুসমূহ ও জীবের অদৃষ্টসমূহের অধিষ্ঠাতা জগৎকর্ত্তা নিমিত্তকারণ, এই সিদ্ধান্তই প্রকাশ করিয়াছেন; ঐ সূত্রের দ্বারা তিনি কোন মতান্তর বা পূর্ব্বপক্ষ প্রকাশ করেন নাই, ইহা বুঝিলে পূর্ব্বপূর্ব্ব প্রকরণের সহিত এই প্রকরণের সুসঙ্গতি হয়। কিন্তু ইহাও প্রণিধান করা আবশ্যক যে, এই সূত্রে মহর্ষির শেষোক্ত "পুরুষকর্ম্মাফল্যদর্শনাৎ"—এই বাক্যের তাৎপর্য্য-বিশেষ ব্যাখ্যা করিয়া প্রথমোক্ত "ঈশ্বরঃ কারণং"—এই বাক্যের দ্বারা ঈশ্বরই কারণ, অর্থাৎ জীবের কর্ম্মনিরপেক্ষ ঈশ্বর জগতের নিমিত্তকারণ, এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের ব্যাখ্যা করিলেও, এই প্রকরণের অসঙ্গতি নাই। কারণ, ভাষ্যকার প্রভৃতির এই ব্যাখ্যা-পক্ষেও এই প্রকরণের দ্বারা পরে জীবের কর্ম্মসাপেক্ষ ঈশ্বর জগতের নিমিত্তকারণ, এই সিদ্ধান্তই সমর্থিত হইয়াছে। সুতরাং মহর্ষি পূর্ব্বে যে পরমাণুসমূহকে জগতের উপাদানকারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত সূচনা করিয়াছেন, ঐ পরমাণুসমূহের অধিষ্ঠাতা জগতের নিমিত্ত কারণ কি? এই প্রশ্নের উত্তরও সূচিত হইয়াছে। পরন্তু এই পক্ষে এই প্রকরণের দ্বারা জীবের কর্ম্ম-নিরপেক্ষ ঈশ্বর জগতের নিমিত্তকারণ, এই অবৈদিক মতও খণ্ডিত হইয়াছে। উদ্দ্যোতকরও ঐরূপ ব্যাখ্যা করিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, মহর্ষি শেষসূত্রে "তৎকারিতত্বাৎ" এই বাক্য বলিয়া ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত কারণ, এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। উদ্দ্যোতকর পরে জগতের নিমিত্তকারণ-বিষয়ে নানা বিপ্রতিপত্তির উল্লেখ করিয়া, তন্মধ্যে ন্যায্য কি? —এই প্রশ্নোত্তরে বলিয়াছেন, "ঈশ্বর ইতি ন্যায্যং"। পরে প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও জগৎ-কর্ত্তৃত্ব সমর্থনপূর্ব্বক নিরীশ্বর সাংখ্যমত খণ্ডন করিয়াছেন। মূলকথা, মহর্ষি গোতমের "ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষকর্ম্মাফল্যদর্শনাৎ" এই সূত্রটি পূর্ব্বপক্ষসূত্রই হউক, আর সিদ্ধান্তসূত্রই হউক, উভয় পক্ষেই মহর্ষির এই প্রকরণের দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও জগৎকর্ত্তৃত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে। সুতরাং ন্যায়দর্শনে ঈশ্বরবাদ নাই, ন্যায়দর্শনকার গোতম মুনি ঈশ্বর ও তাঁহার জগৎকর্ত্তৃত্বাদি সিদ্ধান্তরূপে ব্যক্ত করিয়া বলেন নাই, ইহা কোন মতেই বলা যায় না। তবে প্রশ্ন হয় যে, ঈশ্বর মহর্ষি গোতমের সম্মত পদার্থ হইলে, তিনি সর্ব্বপ্রথম সূত্রে পদার্থের উদ্দেশ করিতে ঈশ্বরের বিশেষ করিয়া উল্লেখ করেন নাই কেন? ন্যায়দর্শনে প্রমাণাদি পদার্থের ন্যায় ঈশ্বরের উদ্দেশ, লক্ষণ ও পরীক্ষা নাই কেন? এতদুত্তরে প্রথম অধ্যায়ে মহর্ষি গোতমের অভিপ্রায় ও সিদ্ধান্ত বিষয়ে কিছু আলোচনা করিয়াছি। (১ম খণ্ড, ৮৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এই

অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকের প্রারম্ভে পুনর্ব্বার সেই সমস্ত কথার আলোচনা হইবে। এখানে পূর্ব্বোক্ত প্রশ্নের উত্তরে ইহাও বলা যায় যে, মহর্ষি গোতম, দ্বাদশবিধ প্রমেয় পদার্থ বলিতে প্রথম অধ্যায়ে "আত্মশরীরেন্দ্রিয়ার্থ" ইত্যাদি (৯ম) সূত্রে "আত্মন্" শব্দের দ্বারা আত্মত্বরূপে জীবাত্মা ও পরমাত্মা—এই উভয়কেই বলিয়াছেন। সুতরাং গোতমোক্ত প্রমেয় পদার্থের মধ্যেই আত্মত্বরূপে ঈশ্বরও কথিত হইয়াছেন। বস্তুতঃ একই আত্মত্ব যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মা, এই উভয়েরই ধর্ম্ম, ঈশ্বরও যে আত্মজাতীয়, ইহা পরবর্ত্তী ভাষ্যে ভাষ্যকারও বলিয়াছেন। সুতরাং ভাষ্যকারের মতেও "আত্মন্" শব্দের দ্বারা আত্মত্বরূপে জীবাত্মাও ঈশ্বর, এই উভয়কেই বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীন ব্যাখ্যাকারগণের ব্যাখ্যায় তাঁহারা যে গোতমোক্ত ঐ "আত্মন্" শব্দের দ্বারা কেবল জীবাত্মাকেই গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মতে গোতমোক্ত প্রথম প্রমেয় জীবাত্মা, ইহাই বুঝা যায়। তাঁহারা গোতমোক্ত প্রথম প্রমেয় আত্মার উদ্দেশ লক্ষণ ও পরীক্ষার ব্যাখ্যায় ঈশ্বরের নামও করেন নাই। কিন্তু নব্যনৈয়ায়িক বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রথম অধ্যায়ে মহর্ষি গোতমের আত্মার (১০ম) লক্ষণসূত্রের ব্যাখ্যার শেষে বলিয়াছেন যে এই সূত্রোক্ত বুদ্ধি, ইচ্ছা ও প্রযত্ন, জীবাত্মা ও পরমাত্মা—উভয়েরই লক্ষণ। সুতরাং তাঁহার মতে মহর্ষি উহার পূর্ব্বসূত্রে যে "আত্মন্" শব্দের দ্বারা আত্মত্বরূপে জীবাত্মা ও পরমাত্মা—উভয়কেই বলিয়াছেন, ইহা তিনি স্পষ্ট করিয়া না বলিলেও, নিঃসন্দেহে বুঝা যায়। তবে প্রশ্ন হয় যে, মহর্ষি "আত্মন্" শব্দের দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মা—উভয়কেই প্রকাশ করিয়া আত্মার লক্ষণ-সূত্রে ঐ উভয় আত্মারই লক্ষণ বলিলে, তিনি তৃতীয় অধ্যায়ে জীবাত্মার পরীক্ষা করিয়া পরমাত্মা ঈশ্বরের কোনরূপ পরীক্ষা করেন নাই কেন? এতদুত্তরে বৃত্তিকার বিশ্বনাথের পক্ষে বলা যায় যে, মহর্ষি তাঁহার কথিত সমস্ত পদার্থেরই পরীক্ষা করেন নাই। যে সমস্ত পদার্থে অন্যের কোনরূপ সংশয় হইয়াছে, সেই সমস্ত পদার্থেরই পরীক্ষা করিয়াছেন। কারণ, সংশয় ব্যতীত পরীক্ষা হইতে পারে না। বিচারমাত্রই সংশয়পূর্ব্বক। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে এ সকল কথা বলা হইয়াছে। ঈশ্বর-বিষয়ে সামান্যতঃ কাহারও কোনরূপ সংশয় নাই। "ন্যায়কুসুমাঞ্জলি" গ্রন্থের প্রারম্ভে উদয়নাচার্য্যও ইহা সমর্থন করিয়াছেন। তবে ঈশ্বর-বিষয়ে কাহারও বিশেষ সংশয় জন্মিলে মহর্ষি গোতমের প্রদর্শিত পরীক্ষার প্রণালী অনুসরণ করিয়া পরীক্ষার দ্বারা ঐ সংশয় নিরাস করিতে হইবে। বৃত্তিকারের মতে দ্বিতীয় অধ্যায়ে "যত্র সংশয়স্তত্রৈবমুত্তরোত্তরপ্রসঙ্গঃ" (১।৭)—এই সূত্রের দ্বারা যে পদার্থে সংশয় হইবে, সেই পদার্থেই পূর্ব্বোক্তরূপ পরীক্ষা করিতে হইবে, ইহা মহর্ষি নিজেই বলিয়াছেন। এইজন্যই মহর্ষি তাঁহার কথিত "প্রয়োজন", "দৃষ্টান্ত" ও "সিদ্ধান্ত" প্রভৃতি পদার্থের পরীক্ষা করেন নাই। পরন্তু ইহাও বলা যায় যে, মহর্ষি এখানে "প্রেত্যভাব" নামক প্রমেয়ের পরীক্ষা-প্রসঙ্গে এই প্রকরণের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ-বিশেষের নিরাস করিয়া যে সিদ্ধান্ত নির্ণয় করিয়াছেন, উহাই তাঁহার পূর্ব্বকথিত ঈশ্বর নামক প্রমেয়-বিষয়ে নিজ কর্ত্তব্য-পরীক্ষা।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ শেষে এই প্রকরণের যে ব্যাখ্যান্তর প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই মহর্ষির অভিমত ব্যাখ্যা বলিয়া গ্রহণ করিলে এই প্রকরণের দ্বারা সরলভাবেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও জগৎকর্তৃত্বাদি সিদ্ধান্ত পরীক্ষিত হইয়াছে। ঈশ্বর-বিষয়ে অন্যান্য কথা পরবর্তী ভাষ্যের ব্যাখ্যায় ব্যক্ত হইবে।

ভাষ্য। **গুণবিশিষ্টমাত্মান্তরমীশ্বরঃ। তস্যাত্মকল্পাৎ[1] কল্পান্তরাণুপপত্তিঃ।** অধর্ম্ম-মিথ্যাজ্ঞান-প্রমাদহান্যা ধর্ম্মজ্ঞান-সমাধি-সম্পদা চ বিশিষ্টমাত্মান্তরমীশ্বরঃ। তস্য চ ধর্ম্মসমাধিফলমণিমাদ্যষ্টবিধমৈশ্বর্য্যং। সংকল্পানুবিধায়ী চাস্য ধর্ম্মঃ[2] প্রত্যাত্মবৃত্তীন্ ধর্ম্মাধর্ম্মসঞ্চয়ান্ পৃথিব্যাদীনি চ ভূতানি প্রবর্ত্তয়তি। এবঞ্চ স্বকৃতাভ্যাগমস্যালোপেন[3] নির্ম্মাণ-প্রাকাম্যমীশ্বরস্য স্বকৃতকর্ম্মফলং বেদিতব্যং। **আপ্তকল্পশ্চায়ং।** যথা পিতাঽপত্যানাং তথা পিতৃভূত ঈশ্বরো ভূতানাং। ন চাত্মকল্পাদন্যঃ কল্পঃ সম্ভবতি। ন তাবদস্য বুদ্ধিং বিনা কশ্চিদ্ধর্ম্মো লিঙ্গভূতঃ শক্য উপপাদয়িতুং। আগমাচ্চ দ্রষ্টা বোদ্ধা সর্ব্বজ্ঞাতা ঈশ্বর ইতি। বুদ্ধ্যাদিভিশ্চাত্মলিঙ্গৈর্নিরুপাখ্যমীশ্বরং প্রত্যক্ষানুমানাগমবিষয়াতীতং কঃ শক্ত উপপাদয়িতুং। স্বকৃতাভ্যাগমলোপেন[4] প্রবর্ত্তমানস্যাস্য যদুক্তং প্রতিষেধজাতমকর্ম্মনিমিত্তে শরীরসর্গে তৎ সর্ব্বং প্রসজ্যত ইতি।

অনুবাদ। গুণবিশিষ্ট আত্মান্তর অর্থাৎ আত্মবিশেষ পরমাত্মা ঈশ্বর। সেই ঈশ্বরের সম্বন্ধে আত্ম-প্রকার হইতে অন্য প্রকারের উপপত্তি হয় না। অধর্ম্ম, মিথ্যাজ্ঞান ও প্রমাদের অভাবের দ্বারা এবং ধর্ম্ম, জ্ঞান, সমাধি ও সম্পদের দ্বারা বিশিষ্ট আত্মান্তর ঈশ্বর। সেই ঈশ্বরেরই ধর্ম্ম ও সমাধির ফল অণিমাদি

১। "আত্মকল্পা"দিত্যত্র আত্মপ্রকারাদাত্মজাতীয়াদিত্যর্থঃ। সংসারবদ্ধা আত্মভ্যো বিশেষমাহ—"অধর্ম্মে'তি।"—তাৎপর্য্যটীকা।

২। নন্বস্য কর্ম্মানুষ্ঠানাভাবাৎ কুতো ধর্ম্মঃ? তথা চাণিমাদিকমৈশ্বর্য্যং কার্য্যরূপং বিনৈব কর্ম্মণা ইত্যকৃতাভ্যাগম প্রসঙ্গ ইত্যত আহ—"সংকল্পানুবিধায়ী চাস্য ধর্ম্ম ইতি।—তাৎপর্য্যটীকা।

৩। প্রবর্ত্তয়তু কিমেতাবতা ইত্যত আহ—"এবঞ্চ স্বকৃতাভ্যাগমস্যালোপেনে"তি। মাভূদ্বাহ্যানুষ্ঠানং, সংকল্পলক্ষণানুষ্ঠানজনিতধর্ম্মফলমৈশ্বর্য্যং জগন্নির্ম্মাণফলমিতি নাকৃতাভ্যাগমপ্রসঙ্গ ইত্যর্থঃ।—তাৎপর্য্যটীকা।

৪। পূর্ব্বৈরেবং কর্ম্ম কৃতং তৎ ফলাভ্যাগমালোপেন প্রবর্ত্তমানস্য ইত্যর্থঃ।—তাৎপর্য্যটীকা।

অষ্ট প্রকার ঐশ্বর্য্য * এই ঈশ্বরের সংকল্পজনিত ধর্ম্মই প্রত্যেক জীবস্থ ধর্ম্মাধর্ম্মসমষ্টিকে এবং পৃথিব্যাদি ভূতবর্গকে (সৃষ্টির জন্য) প্রবৃত্ত করে। এইরূপ হইলেই নিজকৃত কর্ম্মের অভ্যাগমের (ফলপ্রাপ্তির) লোপ না হওয়ায়, অর্থাৎ সৃষ্টি করিবার জন্য ঈশ্বরের নিজকৃত যে সংকল্পরূপ কর্ম্ম, তাহার ফলপ্রাপ্তির অভাব না হওয়ায়, "নির্ম্মাণ প্রাকাম্য" অর্থাৎ ইচ্ছামাত্রে জগন্নির্ম্মাণ ঈশ্বরের নিজকৃত কর্ম্মফল জানিবে। এবং এই ঈশ্বর "আপ্তকল্প" অর্থাৎ অতি বিশ্বস্ত আত্মীয়ের ন্যায় সর্ব্বজীবের নিঃস্বার্থ অনুগ্রাহক। যেমন সন্তানগণের সম্বন্ধে পিতা, তদ্রূপ সমস্ত প্রাণীর সম্বন্ধে ঈশ্বর পিতৃভূত অর্থাৎ পিতৃতুল্য। কিন্তু আত্মার প্রকার হইতে (ঈশ্বরের) অন্য প্রকার সম্ভব হয় না। (কারণ) বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান ব্যতীত এই ঈশ্বরের লিঙ্গভূত (অনুমাপক) কোন ধর্ম্ম উপপাদন করিতে পারা যায় না। আগম অর্থাৎ শাস্ত্রপ্রমাণ হইতেও ঈশ্বর দ্রষ্টা, বোদ্ধা ও সর্ব্বজ্ঞ, ইহা সিদ্ধ হয়। কিন্তু আত্মার লিঙ্গ বুদ্ধি প্রভৃতির দ্বারা নিরুপাখ্য অর্থাৎ নির্ব্বিশেষিত (সুতরাং) প্রত্যক্ষ অনুমান ও আগম-প্রমাণের বিষয়াতীত ঈশ্বরকে অর্থাৎ নির্গুণ ঈশ্বরকে কে উপপাদন করিতে সমর্থ হয়? [অর্থাৎ ঈশ্বরকে নির্গুণ বলিলে, তিনি প্রমাণসিদ্ধই হইতে পারেন না, সুতরাং ঈশ্বর বুদ্ধ্যাদিগুণবিশিষ্ট আত্মবিশেষ, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য।]

---

* (১) অণিমা, (২) লঘিমা, (৩) মহিমা, (৪) প্রাপ্তি, (৫) প্রাকাম্য, (৬) বশিত্ব, (৭) ঈশিত্ব, (৮) যত্রকামাবসায়িত্ব,—এই আট প্রকার ঐশ্বর্য্য শাস্ত্রে কথিত আছে এবং ঐগুলি প্রযত্নবিশেষ বলিয়াও অনেকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন; যে ঐশ্বর্য্যের ফলে পরমাণুর ন্যায় সূক্ষ্ম হওয়া যায়, মহান্ দেহকেও ঐরূপ সূক্ষ্ম করা যায়, তাহার নাম—(১) "অণিমা"। যে ঐশ্বর্য্যের ফলে অতি গুরু দেহকেও এমন লঘু করা যায় যে, সূর্য্যকিরণ আশ্রয় করিয়াও ঊর্দ্ধে উঠিতে পারা যায়, তাহার নাম—(২) লঘিমা। যে ঐশ্বর্য্যের ফলে সূক্ষ্মকেও মহান্ করা যায়, তাহার নাম—(৩) মহিমা। যে ঐশ্বর্য্যের ফলে অঙ্গুলির অগ্রভাগের দ্বারাও চন্দ্রস্পর্শ করিতে পারে, তাহার নাম—(৪) প্রাপ্তি। যে ঐশ্বর্য্যের ফলে জলের ন্যায় সমান ভূমিতেও নিমজ্জন করিতে পারে অর্থাৎ ডুব দিয়া উঠিতে পারে, তাহার নাম—(৫) প্রাকাম্য। "প্রাকাম্য" বলিতে ইচ্ছার অভিঘাত না হওয়া অর্থাৎ অব্যর্থ ইচ্ছা। যে ঐশ্বর্য্যের ফলে ভূত ও ভৌতিক সমস্তই বশীভূত হয় এবং নিজে অপর কাহারও বশীভূত হয় না, তাহার নাম—(৬) বশিত্ব। যে ঐশ্বর্য্যের ফলে ভূত ও ভৌতিক সমস্ত পদার্থেরই সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারে সামর্থ্য জন্মে তাহার নাম—(৭) ঈশিত্ব। (৮) "যত্রকামাবসায়িত্ব" বলিতে সত্যসংকল্পতা। ঐ অষ্টম ঐশ্বর্য্যের ফলে যখন যেরূপ সংকল্প জন্মে, ভূতপ্রকৃতিসমূহের সেইরূপেই অবস্থান হয়। যোগদর্শন, বিভূতিপাদের ৪৫শ সূত্রের ব্যাসভাষ্যে পূর্ব্বোক্ত অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য এইরূপেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তদনুসারেই "সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদীতে (২৩শ কারিকার টীকায়) শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্রও পূর্ব্বোক্ত অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যের ঐরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যোগীদিগের "ভূত জয়" হইলে পূর্ব্বোক্ত অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্যের প্রাদুর্ভাব হয়। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের মতে ঈশ্বরের ঐ অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য তাঁহার ধর্ম্ম ও সমাধির ফল।

"স্বকৃতাভ্যাগমে"র (জীবের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফলপ্রাপ্তির) লোপ করিয়া অর্থাৎ জীবগণের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল ধর্ম্মাধর্ম্মসমূহকে অপেক্ষা না করিয়া (সৃষ্টিকার্য্যে) প্রবর্ত্তমান এই ঈশ্বরের সম্বন্ধে শরীরসৃষ্টি কর্ম্মনিমিত্তক না হইলে, যে সমস্ত দোষ উক্ত হইয়াছে, সেই সমস্ত দোষ প্রসক্ত হয়।

টিপনী। মহর্ষি গোতম পূর্ব্বে পার্থিবাদি চতুর্ব্বিধ পরমাণুসমূহকে জগতের উপদান-কারণ বলিয়া নিজ সিদ্ধান্ত সূচনা করিয়া পরে, অভাবই জগতের উপাদানকারণ, এই মতের খণ্ডনের দ্বারা তাঁহার পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থনপূর্ব্বক এই প্রকরণের দ্বারা শেষে যে ঈশ্বরকে জগতের নিমিত্ত-কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত সূচনা করিয়াছেন, তাঁহার মতে ঐ ঈশ্বরের স্বরূপ কি? ঈশ্বর সগুণ, কি নির্গুণ? জীবাত্মা হইতে ভিন্ন কি অভিন্ন? ভিন্ন হইলে জীবাত্মা হইতে বিজাতীয় অথবা সজাতীয়? সজাতীয় হইলে জীবাত্মা হইতে ঈশ্বরের বিশেষ কি?—ইত্যাদি প্রশ্ন অবশ্যই হইবে। তাই ভাষ্যকার সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, গুণবিশিষ্ট আত্মান্তর ঈশ্বর। অর্থাৎ ঈশ্বর সগুণ এবং আত্মজাতীয় অর্থাৎ জীবাত্মা হইতে ভিন্ন হইলেও বিজাতীয় দ্রব্যান্তর নহেন, ঈশ্বরও আত্মবিশেষ। তাই তাঁহাকে পরমাত্মা বলা হয়। মহর্ষি পতঞ্জলিও "পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ",—এই কথা বলিয়া ঈশ্বরকে আত্মবিশেষই বলিয়াছেন। ঈশ্বর যে, আত্মান্তর অর্থাৎ আত্মবিশেষ, ইহা সমর্থন করিতে ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে আত্মপ্রকার হইতে সেই ঈশ্বরের আর কোন প্রকারের উপপত্তি হয় না। অর্থাৎ ঈশ্বর আত্মজাতীয় ভিন্ন আর কোন পদার্থ, ইহা প্রমাণসিদ্ধ হয় না। প্রশ্ন হইতে পারে যে, জীবাত্মার জ্ঞান অনিত্য ঈশ্বরের জ্ঞান নিত্য, সুতরাং ঈশ্বর জীবাত্মা হইতে বিজাতীয় পুরুষ। তিনি জীবাত্মার সজাতীয় হইতে পারেন না। এজন্য ভাষ্যকার পরে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত ঐ সিদ্ধান্তের যুক্তি প্রদর্শনের জন্য বলিয়াছেন যে, "আত্মকল্প" (আত্মার প্রকার) হইতে ঈশ্বরের "অন্যকল্প" (অন্য প্রকার) সম্ভবই নহে। তাৎপর্য্য এই যে, আত্মা দুই প্রকার, জীবাত্মা ও পরমাত্মা। ঈশ্বরই পরমাত্মা, তিনিও আত্মজাতীয় অর্থাৎ আত্মত্ববিশিষ্ট। একই আত্মত্ব জীবাত্মা ও পরমাত্মা—এই দ্বিবিধ আত্মারই ধর্ম্ম। কারণ, আত্মা ভিন্ন আর কোন পদার্থই বুদ্ধিমান্ অর্থাৎ চেতন হইতে পারে না। বুদ্ধি (জ্ঞান) যখন জীবাত্মার ন্যায় ঈশ্বরেরও বিশেষ গুণ বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে, তখন ঈশ্বরকেও আত্ম-বিশেষই বলিতে হইবে। ঈশ্বরের বুদ্ধি নিত্য বলিয়া তিনি জীবাত্মা হইতে বিজাতীয় হইতে পারেন না। তাৎপর্য্যটীকাকার ইহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরের বুদ্ধ্যাদি গুণবত্তা-বশতঃ তিনিও আত্মজাতীয়। ঈশ্বরের বুদ্ধ্যাদি গুণের নিত্যতাবশতঃ তিনি জীবাত্মা হইতে বিজাতীয়, ইহা বলা যায় না। কারণ, তাহা হইলে জলীয় ও তৈজস পরমাণুর রূপাদি নিত্য, তদ্ভিন্ন জল ও তেজের রূপাদি অনিত্য, সুতরাং জলীয় ও তৈজস পরমাণু জল ও তেজ হইতে বিজাতীয়, ইহাও স্বীকার করিতে হয়। অতএব গুণের নিত্যত্ব ও অনিত্যতা-প্রযুক্ত ঐ

গুণাশ্রয় দ্রব্যের বিভিন্ন জাতীয়তা সিদ্ধ হয় না। একই আত্মত্ব জাতি যে, জীবাত্মা ও ঈশ্বর —এই উভয়েই আছে ইহা "সিদ্ধান্তমুক্তাবলী" গ্রন্থে নব্যনৈয়ায়িক বিশ্বনাথও সমর্থন করিয়াছেন। যাঁহারা ঈশ্বরে ঐ আত্মত্ব জাতি স্বীকার করেন নাই, তাঁহাদিগের মতের উল্লেখ করিয়াও তিনি ঐ মত গ্রহণ করেন নাই। কারণ, শ্রুতিতে বহুস্থানে জীবাত্মার ন্যায় পরমাত্মা বুঝাইতেও কেবল "আত্মন্" শব্দের প্রয়োগ আছে। কিন্তু ঈশ্বরে আত্মত্ব না থাকিলে, শ্রুতিতে ঐরূপ মুখ্য প্রয়োগ হইতে পারে না। আত্মত্বরূপে জীবাত্মাও ঈশ্বর, এই উভয়ই "আত্মন্" শব্দের বাচ্য হইলে, 'আত্মন্' শব্দের দ্বারা ঐ দ্বিবিধ আত্মাই বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু রঘুনাথ শিরোমণির "দীধিতি"র মঙ্গলাচরণ শ্লোকের "পরমাত্মনে" এই বাক্যের ব্যাখ্যা করিতে টীকাকার গদাধর ভট্টাচার্য্য শেষে বলিয়াছেন যে, "আত্মন্" শব্দ জ্ঞানবিশিষ্ট অর্থাৎ চেতন, এই অর্থেরই বাচক। তিনি ঈশ্বরে আত্মত্বজাতি স্বীকার করেন নাই, ঐ জাতি-বিষয়ে যুক্তিও দুর্লভ বলিয়াছেন। জ্ঞানবিশিষ্ট বা চেতনই "আত্মন্" শব্দের বাচ্য হইলেও, ঈশ্বরও "আত্মন্" শব্দের বাচ্য হইতে পারেন। কারণ, জীবাত্মার ন্যায় ঈশ্বরও জ্ঞানবিশিষ্ট। তাহা হইলে এই প্রসঙ্গে ইহাও বলিতে পারি যে, মহর্ষি কণাদ নববিধ দ্রব্যের উদ্দেশ করিতে বৈশেষিক-দর্শনের পঞ্চম সূত্রে যে "আত্মন্" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন এবং মহর্ষি গোতম দ্বাদশবিধ "প্রমেয়" পদার্থের উদ্দেশ করিতে ন্যায়দর্শনের প্রথম অধ্যায়ের নবম সূত্রে যে, "আত্মন্" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তদ্দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মা, এই দ্বিবিধ আত্মাকেই গ্রহণ করা যাইতে পারে। প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদও কণাদসম্মত নববিধ দ্রব্যের উদ্দেশ করিতে "আত্মন্" শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন। সেখানে "ন্যায়কন্দলী" কার শ্রীধর ভট্ট লিখিয়াছেন, "ঈশ্বরোঽপি বুদ্ধিগুণত্বাদাত্মৈব"—ইত্যাদি। সুতরাং শ্রীধর ভট্টও যে বৈশেষিক-দর্শনে ঐ "আত্মন্"শব্দের দ্বারা জীবাত্মা ও ঈশ্বর— এই উভয়কেই গ্রহণ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ ঈশ্বরও কণাদের স্বীকৃত দ্রব্যপদার্থ। সুতরাং তিনি দ্রব্যপদার্থের বিভাগ করিতে ঈশ্বরকে পরিত্যাগ করিবেন কেন? ইহাও চিন্তা করা আবশ্যক। মহর্ষি কণাদ ও গোতম "আত্মন্" শব্দের প্রয়োগ করিয়া জীবাত্মা ও ঈশ্বর এই উভয়কে গ্রহণ করিলেও, আত্মবিচার-স্থলে জীবাত্মবিষয়েই সংশয়মূলক বিচারের কর্ত্তব্যতা বুঝিয়া তাহাই করিয়া গিয়াছেন, ইহাও বুঝা যাইতে পারে। সে যাহা হউক, প্রকৃত বিষয়ে এখানে ভাষ্যকারের কথা এই যে বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান যখন জীবাত্মার ন্যায় পরমাত্মা ঈশ্বরেরও গুণ, তখন ঈশ্বর জীবাত্মা হইতে বিজাতীয় পুরুষ নহেন, তিনিও আত্মজাতীয় বা আত্মবিশেষ। যোগদর্শনে মহর্ষি পতঞ্জলিও ঈশ্বরকে "পুরুষবিশেষ" বলিয়াছেন। বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান যে, জীবাত্মার ন্যায় ঈশ্বরেরও গুণ বলিয়া অবশ্য স্বীকার্য্য,— ইহা সমর্থন করিতে ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন, যে বুদ্ধি ব্যতীত আর কোন পদার্থকেই ঈশ্বরের "লিঙ্গ" অর্থাৎ সাধক বা অনুমাপক বলিয়া উপপাদন করিতে পারা যায় না। ভাষ্যকারের গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, জড়পদার্থ কখনও কোন চেতনের সাহায্য ব্যতীত কার্য্যজনক হয় না। কুম্ভকারের

প্রযত্নাদি ব্যতীত কেবল মৃত্তিকাদি কারণ, ঘটের উৎপাদক হয় না, ইহা সকলেরই স্বীকৃত সত্য। সুতরাং পরমাণু প্রভৃতি জড়পদার্থও অবশ্য কোন বুদ্ধিমান্ অর্থাৎ চেতন পদার্থের সাহায্যেই জগৎ সৃষ্টি করে, ইহাও স্বীকার্য্য। কিন্তু সৃষ্টির পূর্ব্বে জীবাত্মার দেহাদি না থাকায়, তাহার বুদ্ধি বা জ্ঞানের উৎপত্তি সম্ভব না হওয়ায় এবং জীবাত্মার অসর্ব্বজ্ঞতা-বশতঃ জীবাত্মা পরমাণু প্রভৃতির অধিষ্ঠাতা হইতে পারে না। সুতরাং নিত্যবুদ্ধিসম্পন্ন সর্ব্বজ্ঞ কোন আত্মবিশেষই পরমাণু প্রভৃতির অধিষ্ঠাতা, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। অর্থাৎ যেহেতু পরমাণু প্রভৃতি অচেতন পদার্থ হইয়াও জগতের কারণ, অতএব ঐ পরমাণু প্রভৃতি কোন বুদ্ধিমান্ পুরুষ কর্তৃক অধিষ্ঠিত, এইরূপ অনুমানের দ্বারা নিত্যবুদ্ধিসম্পন্ন জগৎকর্ত্তা ঈশ্বরেরই সিদ্ধি হয়। কিন্তু ঐরূপ নিত্যবুদ্ধি স্বীকার না করিলে, কোন হেতুর দ্বারাই ঈশ্বরের সিদ্ধি হইতে পারে না। সুতরাং জগৎকর্ত্তা ঈশ্বর সিদ্ধ করিতে হইলে, তাঁহার বুদ্ধিরূপ গুণ অবশ্যই সিদ্ধ হইবে। পূর্ব্বোক্তরূপেই বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান নামক গুণ ঈশ্বরের লিঙ্গ বা অনুমাপক হয়। তাই পূর্ব্বোক্ত তাৎপর্য্যেই ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, বুদ্ধি ব্যতীত আর কোন পদার্থই ঈশ্বরের লিঙ্গ বা অনুমাপকরূপে উপপাদন করিতে পারা যায় না। অবশ্যই আপত্তি হইবে যে, "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি বহু শ্রুতিতে ঈশ্বর জ্ঞানস্বরূপ (জ্ঞানবান্ নহেন) ইহাই কথিত হইয়াছে। সুতরাং শ্রুতিবিরুদ্ধ কোন অনুমানের দ্বারা ঈশ্বর জ্ঞানবান্, ইহা সিদ্ধ হইতে পারে না। শ্রুতিবিরুদ্ধ অনুমানের যে প্রামাণ্য নাই, ইহা মহর্ষি গোতমেরও সিদ্ধান্ত। শ্রুতিবিরুদ্ধ অনুমান যে, "ন্যায়াভাস," উহা ন্যায়ই নহে, তাহা ভাষ্যকারও প্রথম অধ্যায়ে প্রথম সূত্রের ভাষ্যে স্পষ্ট বলিয়াছেন। এজন্য ভাষ্যকার এখানে পরেই আবার বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর দ্রষ্টা, বোদ্ধা, ও সর্ব্বজ্ঞাতা অর্থাৎ সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানবান্, ইহা শ্রুতির দ্বারাও সিদ্ধ হয়। ভাষ্যকারের বিবক্ষা এই যে, "পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ, স বেত্তি বেদ্যং", এই (শ্বেতাশ্বতর, ৩।১৯) শ্রুতিবাক্যের দ্বারা ঈশ্বর দ্রষ্টা, বোদ্ধা অর্থাৎ জ্ঞানের আশ্রয় এবং "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" এই (মুণ্ডক, ২।২।৭) শ্রুতিবাক্যের দ্বারা ঈশ্বর সামান্যতঃ ও বিশেষতঃ সর্ব্ববিষয়ক জ্ঞানবান্, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। পরন্তু বায়ুপুরাণে ঈশ্বরের যে ছয়টি অঙ্গ কথিত হইয়াছে[১] তন্মধ্যেও সর্ব্বজ্ঞতা এবং

১। বায়ুপুরাণের দ্বাদশ অধ্যায়ে "বিদিত্বা সপ্তসূক্ষ্মাণি ষড়ঙ্গঞ্চ মহেশ্বরং" এই শ্লোকের পরেই ঈশ্বরের ষড়ঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে, যথা—

"সর্ব্বজ্ঞতা তৃপ্তিরনাদিবোধঃ স্বতন্ত্রতা নিত্যমলুপ্তশক্তিঃ।
অনন্তশক্তিশ্চ বিভোর্বিধিজ্ঞাঃ ষড়াহুরঙ্গানি মহেশ্বরস্য"।—১২অঃ, ৩৩শ শ্লোক।

সর্ব্বজ্ঞতা প্রভৃতি ঈশ্বরের সহিত নিত্য সম্বন্ধ বলিয়া অঙ্গের তুল্য হওয়ায়, অঙ্গ বলিয়া কথিত হইয়াছে। 'ন্যায়কুসুমাঞ্জলি'র "প্রকাশ" টীকায় বর্দ্ধমান উপাধ্যায় এবং "বৌদ্ধাধিকারে"র টিপ্পনীতে নব্যনৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি ঈশ্বরের বায়ুপুরাণোক্ত ষড়ঙ্গের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র যোগভাষ্যের টীকায় ঈশ্বরের ষড়ঙ্গতা-বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া, পরে দশাব্যয়তা-বিষয়েও প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা—

"জ্ঞানং বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যং তপঃ সত্যং ক্ষমা ধৃতিঃ।
স্রষ্টৃত্বমাত্মসংবোধো হ্যধিষ্ঠাতৃত্বমেব চ।
অব্যয়ানি দশৈতানি নিত্যং তিষ্ঠন্তি শঙ্করে"॥

অনাদিবুদ্ধি ঈশ্বরের অঙ্গ বলিয়া কথিত হওয়ায়, ঈশ্বর যে জ্ঞানবান্ জ্ঞানস্বরূপ নহেন, ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। পরন্তু বায়ুপুরাণে ঈশ্বরে জ্ঞান প্রভৃতি দশটি অব্যয় অর্থাৎ নিত্য পদার্থ সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছে, ইহাও কথিত হওয়ায়, নিত্য জ্ঞান যে ঈশ্বরের ধর্ম্ম অর্থাৎ ঈশ্বর নিত্যজ্ঞানবান্, ইহাও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। যোগদর্শনের সমাধিপাদের "তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞবীজং"—এই (২৫শ) সূত্রের ভাষ্যটীকায় শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্র বায়ুপুরাণের ঐ বচন উদ্ধৃত করিয়া ঈশ্বরের ষড়ঙ্গতা ও দশাব্যয়তা শাস্ত্রসিদ্ধ, ইহা প্রদর্শন করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত যোগসূত্রের ভাষ্যেও "সর্ব্বজ্ঞ"-পদার্থের ব্যাখ্যায় কথিত হইয়াছে, "যত্র কাষ্ঠাপ্রাপ্তির্জ্ঞানস্য স সর্ব্বজ্ঞঃ"। অর্থাৎ যাহাতে জ্ঞানের চরম উৎকর্ষ, যাহা হইতে অধিক জ্ঞানবান্ আর কেহই নাই, তিনিই সর্ব্বজ্ঞ। ফলকথা, পূর্ব্বোক্ত অনুমান-প্রমাণ বা যুক্তির সাহায্যে আগম-প্রমাণের দ্বারা ঈশ্বরের যে জ্ঞানরূপ গুণবত্তা বা জ্ঞানাশ্রয়ত্ব সিদ্ধ হইতেছে, ইহাই প্রকৃত তত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং শ্রুতিতে যেখানে ঈশ্বরকে "জ্ঞান" বলা হইয়াছে, সেখানে এই "জ্ঞান" শব্দের দ্বারা জ্ঞাতা বা জ্ঞানাশ্রয়, এই অর্থই বুঝিতে হইবে এবং যেখানে "বিজ্ঞান" বলা হইয়াছে, সেখানে যাহার বিশিষ্ট জ্ঞান অর্থাৎ সর্ব্ববিষয়ক যথার্থ জ্ঞান আছে, এইরূপ অর্থই উহার দ্বারা বুঝিতে হইবে। যেমন প্রমাতা অর্থেও "প্রমাণ" শব্দের প্রয়োগ করিয়া, ঐ অর্থে ঈশ্বরকেও "প্রমাণ" বলা হইয়াছে, তদ্রূপ জ্ঞাতা বা জ্ঞানবান্ এই অর্থেও শ্রুতিতে ঈশ্বরকে "জ্ঞান" ও "বিজ্ঞান" বলা হইতে পারে। 'জ্ঞান" ও "বিজ্ঞান" শব্দের দ্বারা ব্যাকরণ-শাস্ত্রানুসারে জ্ঞানবান্—এই অর্থ বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু শ্রুতির "সর্ব্বজ্ঞ" ও "সর্ব্ববিৎ" প্রভৃতি শব্দের দ্বারা জ্ঞানস্বরূপ—এই অর্থ বুঝা যাইতে পারে না। কেহ বলিয়াছেন যে, শ্রুতিতে যে ব্রহ্মকে "জ্ঞান," "বিজ্ঞান" ও "আনন্দ" বলা হইয়াছে, ঐগুলি ব্রহ্মের নামই কথিত হইয়াছে। ব্রহ্ম, জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ, ইহা ঐ সমস্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য নহে। সে যাহা হউক, মূলকথা জ্ঞান যে ঈশ্বরের গুণ, ইহা অনুমান ও আগম-প্রমাণসিদ্ধ, ইহাই এখানে ভাষ্যকারের মূল বক্তব্য।

ভাষ্যকার শেষে আবার তাঁহার পূর্ব্বোক্ত কথার সুদৃঢ় সমর্থনের জন্য বলিয়াছেন যে, বুদ্ধি প্রভৃতি গুণের দ্বারা যিনি "নিরুপাখ্য" অর্থাৎ উপাখ্যাত বা বিশেষিত নহেন, এমন ঈশ্বর প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম-প্রমাণের অতীত বিষয়। অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি কোন প্রমাণের দ্বারাই নির্গুণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সিদ্ধি হইতেই পারে না। সুতরাং তাদৃশ ঈশ্বরে কোন প্রমাণ না থাকায়, কোন ব্যক্তিই তাদৃশ ঈশ্বরকে উপপাদন করিতে পারেন না। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, বুদ্ধি, ইচ্ছা ও প্রযত্ন, এই তিনটি বিশেষ গুণ, যাহা আত্মার লিঙ্গ বা সাধক বলিয়া কথিত হইয়াছে, ঐ তিনটি বিশেষ গুণ পরমাত্মা ঈশ্বরেরও লিঙ্গ। ঈশ্বরও যখন আত্ম-বিশেষ, এবং জড় পরমাণু প্রভৃতির অধিষ্ঠাতা জগৎকর্ত্তা বলিয়া প্রমাণসিদ্ধ, তখন তাহাতেও জীবাত্মার ন্যায় বুদ্ধি, ইচ্ছা ও প্রযত্ন, এই তিনটি বিশেষ গুণ অবশ্য আছে, ইহা স্বীকার্য্য। কারণ, আত্মলিঙ্গ ঐ তিনটি বিশেষ গুণের দ্বারা নিরুপাখ্য হইলে, অর্থাৎ ঈশ্বর ঐ গুণত্রয়ের

দ্বারা বস্তুতঃ উপাখ্যাত বা বিশেষিত নহেন, তিনি বস্তুতঃ নির্গুণ, ইহা বলিলে প্রমাণাভাবে ঐ ঈশ্বরের সিদ্ধিই হয় না। কারণ, তাদৃশ নির্গুণ নির্ব্বিশেষ ঈশ্বরে প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। অনুমান-প্রমাণের দ্বারাও ঐরূপ ঈশ্বরের সিদ্ধি হইতে পারে না। কারণ, যে অনুমান-প্রমাণের দ্বারা ঈশ্বরের সিদ্ধি হয়, উহার দ্বারা বুদ্ধ্যাদি গুণবিশিষ্ট জগৎকর্ত্তা ঈশ্বরেরই সিদ্ধি হয়। আগম-প্রমাণের দ্বারাও বুদ্ধ্যাদি গুণবিশিষ্ট ঈশ্বরেরই সিদ্ধি হওয়ায়, নির্গুণ-নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম আগমের প্রতিপাদ্য নহেন। কারণ, একই ঈশ্বরের সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব—এই উভয়ই শাস্ত্রার্থ হইতে পারে না। ফলকথা, বুদ্ধ্যাদি গুণশূন্য ঈশ্বরে কোন প্রমাণ না থাকায়, যিনি ঈশ্বর স্বীকার করিয়া, তাঁহাকে বুদ্ধ্যাদি গুণশূন্য বলিবেন, তাঁহার মতে ঈশ্বরের সিদ্ধিই হইতে পারে না, ইহাই এখানে ভাষ্যকারের গূঢ় তাৎপর্য্য। এই তাৎপর্য্য বুঝিতে ভাষ্যকারোক্ত "নিরুপাখ্য" এবং "প্রত্যক্ষানুমানাগমবিষয়াতীত" এই দুইটি শব্দের সার্থক্য বুঝা আবশ্যক। ঈশ্বর অনুমান-প্রমাণ বা তর্কের বিষয়ই নহেন, ইহাই ভাষ্যকারের বক্তব্য হইলে, ঐ দুইটি শব্দের কোন সার্থক্য থাকে না এবং ভাষ্যকার প্রথমে যে অনুমান-প্রমাণের দ্বারা বুদ্ধ্যাদি-গুণবিশিষ্ট ঈশ্বরের সিদ্ধি সমর্থন করিয়া পরে "আগমাচ্চ" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা আগম প্রমাণ হইতেও ঐরূপ ঈশ্বরের সিদ্ধি হয় বলিয়া তাঁহার পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করিয়াছেন, তাহা বিরুদ্ধ হয়। ভাষ্যকার "আগমাচ্চ" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরকে আগমের বিষয় বলিয়া পরেই আবার তাঁহাকে কিরূপে প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সহিত আগমেরও অবিষয় বলিবেন, ভাষ্যকারের ঐ কথা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে, ইহাও প্রণিধানপূর্ব্বক বুঝা আবশ্যক। ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্তরূপ তাৎপর্য্য বুঝিলে কোন বিরোধ বা অসঙ্গতি নাই। তাৎপর্য্য-টীকাকারের কথার[১] দ্বারাও ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্তরূপ তাৎপর্য্যই বুঝা যায়।

পরন্তু এখানে ইহাও বলা আবশ্যক যে, যে ঈশ্বরকে অনুমান বা যুক্তির দ্বারা মনন করিতে হইবে, শ্রবণের পরে যাহার মননও শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে, তিনি যে, একেবারে অনুমান বা তর্কের বিষয়ই নহেন, ইহাই বা কিরূপে বলা যায়। ঈশ্বর শাস্ত্রবিরোধী বা বুদ্ধিমাত্র কল্পিত কেবল তর্কের বিষয় নহেন, ইহাই সিদ্ধান্ত। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" ইত্যাদি বেদান্তসূত্রের ভাষ্যে শেষে তর্কমাত্রেরই অপ্রতিষ্ঠা বলিতে পারেন নাই। তিনিও বুদ্ধিমাত্র কল্পিত কুতর্কেরই অপ্রতিষ্ঠা বলিয়াছেন।[২] কিন্তু নৈয়ায়িকগণও শাস্ত্রনিরপেক্ষ কেবল তর্কের দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধ করেন না। তাঁহারাও এ বিষয়ে অনুকূল শাস্ত্রও প্রমাণরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু নৈয়ায়িক মতে বেদ পৌরুষেয়, ঈশ্বরের বাক্য বলিয়াই বেদ প্রমাণ, নচেৎ আর কোনরূপেই তাঁহাদিগের মতে বেদের প্রামাণ্য সম্ভবই হয় না। সুতরাং তাঁহারা, ঈশ্বর সিদ্ধ করিতে প্রথমেই ঈশ্বরবাক্য বেদকে প্রমাণরূপে প্রদর্শন করিতে পারেন

১। যদি চায়ং বুদ্ধ্যাদিগুণৈর্নোপাখ্যায়েত, প্রমাণাভাবাদনুপপন্ন এব স্যাদিত্যাহ, বুদ্ধ্যাদিভিশ্চেতি। —তাৎপর্য্যটীকা।

২। প্রথম খণ্ডের ভূমিকা, ১৬শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

না। কারণ, ঈশ্বরসিদ্ধির পূর্ব্বে ঈশ্বরবাক্য বলিয়া বেদকে প্রমাণরূপে উপস্থিত করা যায় না। এই কারণেই নৈয়ায়িকগণ প্রথমে অনুমান-প্রমাণের দ্বারাই ঈশ্বর সিদ্ধ করিয়া, পরে ঐ সমস্ত অনুমান যে বেদবিরুদ্ধ বা শাস্ত্রবিরুদ্ধ নহে, ঈশ্বরসাধক সমস্ত তর্ক যে কেবল বুদ্ধিমাত্র-কল্পিত কুতর্ক নহে, ইহা প্রদর্শন করিতে উহার অনুকূল শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রপ্রমাণও প্রদর্শন করিয়াছেন। মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য "ন্যায়কুসুমাঞ্জলি" গ্রন্থের পঞ্চম স্তবকে ঈশ্বরসাধক অনেক অনুমান প্রদর্শন ও বিচার দ্বারা উহার সমর্থনপূর্ব্বক শেষে শ্রুতির দ্বারা উহা সমর্থন করিতে "বিশ্বতশ্চক্ষুরুত বিশ্বতো মুখো" ইত্যাদি (শ্বেতাশ্বতর, ৩।৩) শ্রুতির উল্লেখ করিয়া কিরূপে যে উহার দ্বারা তাঁহার প্রদর্শিত অনুমান-প্রমাণসিদ্ধ ঈশ্বরের স্বরূপ সিদ্ধ হয়, তাহা বুঝাইয়াছেন। তিনি শ্রুতির "মন্তব্যঃ" এই বিধি অনুসারেই শ্রুতিসিদ্ধরূপেই ঈশ্বরের মনন নির্ব্বাহের জন্য ঈশ্বরবিষয়ে অনেকপ্রকার অনুমান প্রদর্শন করিয়াছেন। স্বাধীন বুদ্ধি বা শাস্ত্রনিরপেক্ষ কেবল তর্কের দ্বারা তিনি ঈশ্বরসিদ্ধি করিতে যান নাই। কারণ, শাস্ত্রকে একেবারে অপেক্ষা না করিয়া অথবা শাস্ত্রবিরোধী কোন তর্কের দ্বারা ঈশ্বরের সিদ্ধি হইতে পারে না, ইহা নৈয়ায়িকেরও সিদ্ধান্ত। কিন্তু ইহাও বক্তব্য যে, কেবল শাস্ত্র দ্বারাও নির্ব্বিবাদে জগৎকর্ত্তা নিত্য ঈশ্বর সিদ্ধ করা যায় না। তাহা হইলে সাংখ্য ও মীমাংসক-সম্প্রদায়বিশেষ সকলশাস্ত্রবিশ্বাসী হইয়াও জগৎকর্ত্তা নিত্যসর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের অস্তিত্ববিষয়ে বিবাদ করিতে পারিতেন না। বেদনিষ্ণাত ভট্টকুমারিলের "শ্লোকবার্ত্তিকে" জগৎকর্ত্তা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের অস্তিত্ব-বিষয়ে অপূর্ব্ব তীব্র প্রতিবাদের উদ্ভব হইত না। তাঁহারা জগৎকর্ত্তা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের সাধক বেদাদি শাস্ত্রের অন্যরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুতরাং বেদাদি শাস্ত্রের অতিদুর্ব্বোধ তাৎপর্য্যে যে সুচিরকাল হইতেই নানা মতভেদ হইয়াছে এবং উহা অবশ্যম্ভাবী, ইহা স্বীকার্য্য। সুতরাং প্রকৃত বেদার্থ নির্দ্ধারণের জন্য জগৎকর্ত্তা ঈশ্বর-বিষয়েও ন্যায় প্রয়োগ কর্ত্তব্য। গোতমোক্ত ন্যায় প্রয়োগ করিয়া তদ্দ্বারা যে তত্ত্ব নির্ণীত হইবে, তাহাই শ্রুতিসিদ্ধ তত্ত্ব বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। অর্থাৎ শ্রুতির ঐরূপই তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। ন্যায়াচার্য্যগণ এইরূপেই সত্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। পরন্তু যে পর্য্যন্ত শাস্ত্রার্থ নির্ণীত না হইবে, সে পর্য্যন্ত কেহ কোন তর্ককেই শাস্ত্রবিরোধী বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারিবেন না। কিন্তু একেবারে তর্ক পরিত্যাগ করিয়াও কেহ কোন শাস্ত্রার্থ নির্ণয় করিতে পারেন না। বিশেষতঃ জগৎকর্ত্তা ঈশ্বরের অস্তিত্ব-বিষয়ে অনেক শাস্ত্রজ্ঞ আস্তিকগণও বিবাদ করিয়াছেন। সুতরাং জগৎকর্ত্তা ঈশ্বর যে, বস্তুতঃই বেদাদিশাস্ত্রসিদ্ধ, বেদাদি শাস্ত্রের ঐ বিষয়ে অন্যরূপ তাৎপর্য্য যে প্রকৃত নহে, ইহা প্রতিপন্ন করিতেও নৈয়ায়িকগণ ঈশ্বরবিষয়ে বহু অনুমান প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের মতে জগৎকর্ত্তা নিত্য ঈশ্বর জগতের নিমিত্তকারণ মাত্র, উপাদানকারণ নহেন এবং তিনি বুদ্ধ্যাদিগুণবিশিষ্ট, নির্গুণ নহেন। ন্যায়াচার্য্য মহর্ষি গোতম তৃতীয় অধ্যায়ে জীবাত্মার জ্ঞানাদি গুণবত্তা সমর্থন করায়, জীবাত্মার সজাতীয় ঈশ্বরও যে, তাঁহার মতে সগুণ, ইহা বুঝা যায়। বিশেষতঃ এই প্রকরণের শেষসূত্রে (তৎকারিতত্বাৎ"

এই বাক্যের দ্বারা) ঈশ্বরের নিমিত্তকারণত্ব ও জগৎকর্তৃত্ব সিদ্ধান্ত সূচনা করায়, তাঁহার মতে ঈশ্বর যে, বুদ্ধ্যাদি-গুণবিশিষ্ট, তিনি নির্গুণ নহেন, ইহাও বুঝা যায়।

অবশ্য সাংখ্য-সম্প্রদায় আত্মার নির্গুণত্বই বাস্তব তত্ত্ব বলিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে আত্মা চৈতন্যস্বরূপ, চৈতন্য তাহার ধর্ম্ম বা গুণ নহে। "নির্গুণত্বান্নচিদ্ধর্ম্মা" এই (১।১৪৬) সাংখ্যসূত্রের ভাষ্যে এবং উহার পরবর্ত্তিসূত্রের ভাষ্যে সাংখ্যাচার্য্য বিজ্ঞানভিক্ষু শাস্ত্র ও যুক্তির দ্বারা উক্ত সাংখ্যমত সমর্থন করিয়াছেন। বেদাদি অনেক শাস্ত্রবাক্যের দ্বারা যে আত্মার নির্গুণত্ব ও চৈতন্যস্বরূপত্বও বুঝা যায়, ইহাও অস্বীকার করা যায় না। এইরূপ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি যে. উপনিষদের বিচার করিয়া, নির্গুণ ব্রহ্মবাদ সমর্থন করিয়াছেন, তাহাও অসিদ্ধান্ত বলিয়া সহসা উপেক্ষা করা যায় না। কিন্তু জীবাত্মা ও পরমাত্মার নির্গুণত্ব-পক্ষে যেমন শাস্ত্র ও যুক্তি আছে, সগুণত্ব-পক্ষেও ঐরূপ শাস্ত্র ও যুক্তি আছে। নির্গুণত্ববাদীরা যেমন তাঁহাদিগের বিরুদ্ধ পক্ষের শাস্ত্রবাক্যের অন্যরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া "আমি জানি," "আমি সুখী", "আমি দুঃখী" -ইত্যাদি প্রকার সার্ব্বজনীন প্রতীতিকে ভ্রম বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তদ্রূপ আত্মার সগুণত্ববাদীরাও ঐ সমস্ত প্রতীতিকে ভ্রম না বলিয়া নির্গুণত্ববোধক শাস্ত্রের অন্যরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তন্মধ্যে নৈয়ায়িক-সম্প্রদায়ের কথা এই যে, জীবাত্মার জ্ঞানাদিগুণবত্তা যখন প্রত্যক্ষসিদ্ধ ও অনুমান-প্রমাণসিদ্ধ, এবং "এষ হি দ্রষ্টা শ্রোতা ঘ্রাতা রসয়িতা" ইত্যাদি (প্রশ্ন উপনিষৎ)-শ্রুতিপ্রমাণসিদ্ধ, তখন যে সকল শ্রুতিতে আত্মাকে নির্গুণ বলা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য বুঝা যায় যে, মুমুক্ষু আত্মাকে নির্গুণ বলিয়া ধ্যান করিবেন। ঐ সমস্ত শ্রুতি ও তন্মূলক নানা শাস্ত্রবাক্যে আত্মবিষয়ক ধ্যান-বিশেষের প্রকারই কথিত হইয়াছে। জীবাত্মার অভিমান-নিবৃত্তির দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভের সহায়তার জন্যই এইরূপ ধ্যান উপদিষ্ট হইয়াছে। বস্তুতঃ আত্মার নির্গুণত্ব অবাস্তব আরোপিত,—সগুণত্বই বাস্তবতত্ত্ব। এইরূপ যে সমস্ত শ্রুতি ও তন্মূলক নানাশাস্ত্রবাক্যে ব্রহ্মকে নির্গুণ বলা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, মুমুক্ষু ব্রহ্মকে নির্গুণ বলিয়া ধ্যান করিবেন। ব্রহ্মের সর্ব্বৈশ্বর্য্য ও সর্ব্বকামদাতৃত্ব এবং অন্যান্য গুণবত্তা চিন্তা করিলে, মুমুক্ষুর তাঁহার নিকটে ঐশ্বর্য্যাদি লাভে কামনা জন্মিতে পারে। সর্ব্বকামপ্রদ ঈশ্বরের নিকটে তাহার অভ্যুদয়লাভে কামনা উপস্থিত হইয়া তাহাকে যোগভ্রষ্ট করিতে পারে; তাহা হইলে মুমুক্ষুর নির্ব্বাণলাভ সুদূরপরাহত হয়। সুতরাং উচ্চাধিকারী মুমুক্ষু ব্রহ্মের বাস্তব গুণরাশি ভুলিয়া যাইয়া ব্রহ্মকে নির্গুণ বলিয়াই ধ্যান করিবেন। ঐরূপ ধ্যান তাঁহার নির্ব্বাণলাভে সহায়তা করিবে। শাস্ত্রে অনেক স্থানে ব্রহ্মের ঐরূপ ধ্যানের প্রকারই কথিত হইয়াছে। বস্তুতঃ ব্রহ্মের সগুণত্বই সত্য, নির্গুণত্ব অবাস্তব হইলেও, উহা অধিকারিবিশেষের পক্ষে ধ্যেয়। নৈয়ায়িক মতে আত্মার নির্গুণত্বাদি-বোধক শাস্ত্রবাক্যের যে পূর্ব্বোক্তরূপই তাৎপর্য্য, ইহা "ন্যায়কুসুমাঞ্জলি" গ্রন্থে মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্যও বলিয়াছেন।[১]

১। "নিরঞ্জনাববোধার্থো ন চ সন্নপি তৎপরঃ"।৩।১৭।

আত্মনো যন্নিরঞ্জনত্বং বিশেষগুণশূন্যত্বং তদ্ধ্যেয়মিত্যেবম্পরো নত্বকর্তৃত্ববোধনপর ইত্যর্থঃ।—প্রকাশটীকা।

সেখানে "প্রকাশ" টীকাকার বর্দ্ধমান উপাধ্যায়ও উদয়নাচার্য্যের ঐরূপ তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন। আত্মার অন্যান্য রূপেও অরোপাত্মক ধ্যান বা উপাসনা-বিশেষ উপনিষদেও বহু স্থানে উপদিষ্ট হইয়াছে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও সেই সমস্ত উপাসনাকে অরোপাত্মক উপাসনা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সেই রূপ নিগু'ণত্বাদিরূপে আত্মোপাসনাই উপনিষদের তাৎপর্য্যার্থ বলিয়া নৈয়ায়িক-সম্প্রদায় নিগু'ণ ব্রহ্মবাদ একেবারেই স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদিগের মতে নিগু'ণ ব্রহ্মবিষয়ে কিছুমাত্র প্রমাণ নাই। তাই ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বিশ্বাসের সহিত বলিয়া গিয়াছেন যে, নিগু'ণ ব্রহ্ম প্রত্যক্ষাদি সকল প্রমাণের অতীত বিষয়, ঐরূপ ব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে কে উপপাদন করিতে পারে? অর্থাৎ ঈশ্বর নিগু'ণ হইলে, প্রমাণাভাবে ঈশ্বরের সিদ্ধিই হয় না।

পরন্তু এখানে ইহাও বক্তব্য যে, জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে নিগু'ণ বলিলেও, একেবারে সমস্ত গুণশূন্য বলা যাইতে পারে না। বৈশেষিক-শাস্ত্রোক্ত গুণকেই ঐ "গুণ" শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিলে সংখ্যা, পরিমাণ ও সংযোগ প্রভৃতি সামান্য গুণ যে, আত্মাতে আছে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। সাংখ্যাচার্য্য বিজ্ঞানভিক্ষুও পূর্ব্বোক্ত সাংখ্যসূত্রের ভাষ্যে এবং অন্যত্রও—"সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নিগু'ণশ্চ" ইত্যাদি শ্রুতিস্থ "নিগু'ণ" শব্দের অন্তর্গত "গুণ" শব্দের অর্থ যে বিশেষগুণ—গুণমাত্র নহে, ইহা স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। তাহা হইলে, ঐ "গুণ" শব্দের দ্বারা বিশিষ্ট গুণবিশেষের ব্যাখ্যা করিয়া, আত্মার সগুণত্ববাদীরাও নিগু'ণত্ব-বোধক শ্রুতির উপপত্তি করিতে পারেন। ঐ রূপ কোন ব্যাখ্যা করিলে নিগু'ণত্ব ও সগুণত্ববোধক দ্বিবিধ শ্রুতির কোন বিরোধ থাকে না। নিগু'ণ ব্রহ্মবাদের বিস্তৃতপ্রতিবাদ-কারী বৈষ্ণবাচার্য্য রামানুজ নিগু'ণত্ববোধক শ্রুতির সেইরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের ন্যায় আচার্য্য রামানুজও বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর বুদ্ধ্যাদিগুণশূন্য হইতেই পারেন না। তাদৃশ ঈশ্বরে কোন প্রমাণ নাই। রামানুজ অন্যভাবে তাঁহার ঐ সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, সমস্ত প্রমাণই সবিশেষ বস্তুবিষয়ক। নির্ব্বিশেষ বস্তু কোন প্রমাণের বিষয়ই হয় না। যাহাকে "নির্ব্বিকল্পক" প্রত্যক্ষ বলা হইয়াছে, তাহাতেও সবিশেষ বস্তুই বিষয় হয়। সুতরাং প্রমাণাভাবে নিগু'ণ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সিদ্ধি হইতেই পারে না। শ্রুতি ও তন্মূলক নানা শাস্ত্রে ব্রহ্মের নিগু'ণত্ববোধক যে সমস্ত বাক্য আছে, তাঁহার তাৎপর্য্য এই যে, ব্রহ্ম সমস্ত প্রাকৃত-হেয়গুণশূন্য। ব্রহ্ম সর্ব্বপ্রকার গুণশূন্য, ইহা ঐ সমস্ত শাস্ত্রবাক্যের তাৎপর্য্য নহে।[২] কারণ, পরব্রহ্ম বাসুদেব, অপ্রাকৃত অশেষকল্যাণগুণের আকর। তিনি সর্ব্বথা নিগু'ণ হইতেই পারেন না। যে শাস্ত্র নানা স্থানে পরব্রহ্মের নানাগুণ বর্ণন করিয়াছেন, সেই শাস্ত্রই আবার তাঁহাকে সর্ব্বথা গুণশূন্য বলিতে পারেন

২। কিঞ্চ সর্ব্বপ্রমাণস্য সবিশেষবিষয়তয়া নির্ব্বিশেষবস্তুনি ন কিমপি প্রমাণং সমস্তি। নির্ব্বিকল্পক-প্রত্যক্ষেঽপি সবিশেষমেব প্রতীয়তে—ইত্যাদি।

"নিগু'ণবাদাশ্চ প্রাকৃতহেয়গুণনিষেধবিষয়তয়া ব্যবস্থিতাঃ"। ইত্যাদি।—সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে "রামানুজদর্শন"।

না। পরব্রহ্মের সগুণত্ব ও নির্গুণত্ববোধক শাস্ত্রদ্বারা সগুণ ও নির্গুণভেদে ব্রহ্ম দ্বিবিধ, এইরূপ কল্পনারও কোন কারণ নাই। রামানুজ নানা প্রমাণের দ্বারা ইহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, একই ব্রহ্ম দিব্য কল্যাণযোগে সগুণ, এবং প্রাকৃত হেয়গুণশূন্য বলিয়া নির্গুণ, এইরূপ বিষয়ভেদে একই ব্রহ্মের সগুণত্ব ও নির্গুণত্ব শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, ইহাই বুঝা যায়। সুতরাং শঙ্করের ন্যায় সগুণ ও নির্গুণভেদে ব্রহ্মের দ্বৈবিধ্য কল্পনা সঙ্গত নহে।[১] বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী রামানুজ শ্রীভাষ্যে নৈয়ায়িকের ন্যায় বলিয়াছেন, "চেতনত্বং নাম চৈতন্যগুণযোগঃ। অত ঈক্ষণগুণবিরহিণঃ প্রধানতুল্যত্বমেবেতি"। অর্থাৎ চৈতন্যরূপ গুণবত্তাই চেতনত্ব, চৈতন্যরূপ গুণবিশিষ্ট হইলেই, চেতন বলা যায়। সুতরাং "তদৈক্ষত", ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মের যে ঈক্ষণ কথিত হইয়াছে, যে ঈক্ষণ চেতনের ধর্ম্ম বলিয়া উহা সাংখ্যসম্মত জড়-প্রকৃতির পক্ষে সম্ভব না হওয়ায়, বেদান্তদর্শনে "ঈক্ষতের্না শব্দং" এই সূত্রের দ্বারা সাংখ্য-সম্মত প্রকৃতির জগৎকারণত্ব খণ্ডিত হইয়াছে, সেই ঈক্ষণরূপ গুণ অর্থাৎ চৈতন্যরূপ গুণ, ব্রহ্মে না থাকিলে, ব্রহ্মও সাংখ্যসম্মত প্রকৃতির তুল্য অর্থাৎ জড় হইয়া পড়েন। ব্রহ্ম চৈতন্যস্বরূপ; তিনি জ্ঞানস্বভাব, ইহাও নানা শাস্ত্রবাক্যের দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়। বৈষ্ণব দার্শনিকগণ তদনুসারে ব্রহ্মকে অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেও, তাঁহারা ব্রহ্মের গুণবত্তাও সমর্থন করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামীও "সর্ব্বসংবাদিনী" গ্রন্থে রামানুজের উক্তির প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন যে,[২] যে সমস্ত শ্রুতিদ্বারা ব্রহ্মের উপাধি বা গুণের প্রতিষেধ করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা ব্রহ্মের প্রাকৃত সত্ত্বাদি গুণেরই প্রতিষেধ করিয়া "নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং" ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা ব্রহ্মের নিত্যত্ব ও বিভুত্ব প্রভৃতি কল্যাণ-গুণবত্তাই কথিত হইয়াছে। এইরূপ "নির্গুণং নিরঞ্জনং" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের ও ব্রহ্মের প্রাকৃত হেয়গুণ নিষেধেই তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। অন্যথা ব্রহ্ম সর্ব্বপ্রকার গুণশূন্য, ধর্ম্মশূন্য হইলে তাহাতে নির্গুণব্রহ্মবাদীর নিজ সম্মত নিত্যত্ব ও বিভুত্বাদিও নাই বলিতে হয়। শ্রীজীব গোস্বামী "ভগবৎসন্দর্ভে"ও শাস্ত্রবিচারপূর্ব্বক ব্রহ্মের সগুণত্ব সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন এবং ঐ সিদ্ধান্তের সমর্থক শাস্ত্রপ্রমাণও তিনি সেখানে প্রদর্শন করিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণও তাঁহার "সিদ্ধান্তরত্ন" গ্রন্থের চতুর্থ পাদে বিচারপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত মতের সমর্থন করিয়াছেন। তিনি সেখানে সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন—"তস্মাদপ্রাকৃতানন্তগুণরত্নাকরো হরিঃ সর্ব্ববেদবাচ্যঃ"। "নির্গুণচিন্মাত্রন্তু অলীকমেব"। মূলকথা, বৈষ্ণব-দার্শনিকগণ ব্রহ্ম বা

১। "দিব্যকল্যাণগুণযোগেন সগুণত্বং প্রাকৃতহেয়গুণরহিতত্বেন নির্গুণত্বমিতি বিষয়ভেদবর্ণনে-নৈকস্যৈবাগমাদ্ ব্রহ্মদ্বৈবিধ্যং দুর্ব্বচনমিতি দিক্।—বেদান্ততত্ত্বসার।

২। তথোপাধিপ্রতিষেধবাক্যে "অথ পরা, যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে। যত্তদদৃশ্যমগ্রাহ্যং" ইত্যাদৌ প্রাকৃতহেয়-গুণান্ প্রতিষিধ্য নিত্যত্ববিভুত্বাদি কল্যাণগুণযোগো ব্রহ্মণঃ প্রতিপাদ্যতে "নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং" ইত্যাদিনা। "নির্গুণং নিরঞ্জনং" ইত্যাদীনামপি প্রাকৃতহেয়গুণনিষেধবিষয়ত্বমেব। সর্ব্বতো নিষেধে স্বাভ্যুপগতাঃ সিসাধয়িষিতা নিত্যতাদয়শ্চ নিষিদ্ধাঃ স্যুঃ।—সর্ব্বসংবাদিনী।

ঈশ্বরকে জ্ঞানস্বরূপ বলিয়া স্বীকার করিলেও, তাঁহারাও ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের ন্যায় নির্গুণ ব্রহ্ম অলীক, উহা প্রমাণসিদ্ধ হইতে পারে না, ইহা বিচারপূর্ব্বক বলিয়াছেন। কিন্তু কোন কোন বৈষ্ণবগ্রন্থে নির্ব্বিশেষ পরব্রহ্মের কথাও পাওয়া যায়।

ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন যে ঈশ্বরকে "গুণবিশিষ্ট" বলিয়াছেন, ইহাতে অনেক সম্প্রদায়ের মতভেদ না থাকিলেও, ঈশ্বরে কি কি গুণ আছে, এ বিষয়ে ন্যায় ও বৈশেষিক-সম্প্রদায়ের মতভেদ পাওয়া যায়। বৈশেষিক শাস্ত্রোক্ত চতুর্ব্বিংশতি গুণের মধ্যে সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিভাগ, (সামান্য গুণ) এবং জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রযত্ন (বিশেষ গুণ)—এই অষ্ট গুণ ঈশ্বরে আছে, ইহা "তর্কামৃত" গ্রন্থে নব্যনৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কার এবং "ভাষাপরিচ্ছেদে" বিশ্বনাথ পঞ্চানন লিখিয়াছেন। কিন্তু বৈশেষিকাচার্য্য শ্রীধর ভট্ট ইহা মতান্তর বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। অপর প্রাচীন বৈশেষিক-সম্প্রদায়ের মতে ঈশ্বরে ইচ্ছা ও প্রযত্ন নাই, ঈশ্বরের জ্ঞানই তাঁহার অব্যাহত ক্রিয়া-শক্তি, তদ্দ্বারাই ইচ্ছা ও প্রযত্নের কার্য্য সিদ্ধি হয়। সুতরাং ইচ্ছা ও প্রযত্ন ভিন্ন পূর্ব্বোক্ত ছয়টি গুণ ঈশ্বরে আছে। ইহাও অপর সম্প্রদায়ের মত বলিয়াই শ্রীধর ভট্ট ঐ স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি পূর্ব্বে অন্য প্রসঙ্গে ঈশ্বরকে ষড়্‌গুণের আধার এবং জীবাত্মাকে চতুর্দ্দশ গুণের আধার বলিয়া প্রকাশ করায়, তাঁহার নিজের মতেও ঈশ্বরের ইচ্ছা ও প্রযত্ন নাই, ইহা বুঝিতে পারা যায়। ("ন্যায়কন্দলী," কাশী-সংস্করণ, ১০ম পৃষ্ঠা ও ৫৭শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদ কিন্তু "সৃষ্টি-সংহার-বিধি" (৪৮শ পৃষ্ঠা) বলিতে ঈশ্বরের সৃষ্টি ও সংহার-বিষয়ে ইচ্ছা স্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন। সেখানে "ন্যায়কন্দলী"কার শ্রীধরভট্টও ঈশ্বরের ক্রিয়াশক্তিরূপ ইচ্ছাও স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীধর ভট্টের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী প্রাচীন ন্যায়াচার্য্য উদ্দ্যোতকরও প্রথমে পূর্ব্বোক্ত মতানুসারে ঈশ্বরকে "ষড়্‌গুণ" বলিয়া শেষে আবার বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরে অব্যাহত নিত্য বুদ্ধির ন্যায় অব্যাহত নিত্য ইচ্ছাও আছে। তিনি ঈশ্বরে "প্রযত্ন"গুণের উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র, উদয়নাচার্য্য ও জয়ন্ত ভট্ট প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণ সকলেই ঈশ্বরের জগৎকর্তৃত্ব সমর্থন করিতে ঈশ্বরের সর্ব্ববিষয়ক নিত্য জ্ঞানের ন্যায় সর্ব্ববিষয়ক নিত্য ইচ্ছা ও নিত্য প্রযত্ন সমর্থন করিয়াছেন [১]। তাঁহাদিগের যুক্তি এই যে, ঈশ্বরের ইচ্ছা ও প্রযত্ন না থাকিলে, তিনি কর্ত্তা হইতে পারেন না। যিনি যে বিষয়ের কর্ত্তা, তদ্বিষয়ে তাঁহার জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রযত্ন থাকা আবশ্যক। ঈশ্বর জগতের কর্ত্তারূপে সিদ্ধ হইলে, তাঁহার সর্ব্ববিষয়ক নিত্য জ্ঞান, নিত্য ইচ্ছা ও নিত্য প্রযত্ন সেই ঈশ্বরসাধক প্রমাণের দ্বারাই সিদ্ধ হয়। বস্তুতঃ যিনি শ্রুতিতে "সত্যকাম" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, এবং শ্রুতি যাহাকে "বিশ্বস্য কর্ত্তা ভুবনস্য গোপ্তা" বলিয়াছেন, তাঁহার যে, নিত্য ইচ্ছা ও নিত্য প্রযত্ন আছে এ বিষয়ে সংশয় হইতে পারে না। "কৃ" ধাতুর অর্থ কৃতি অর্থাৎ "প্রযত্ন" নামক গুণ। যিনি "কৃতিমান্" অর্থাৎ যাহার "প্রযত্ন"

১। বুদ্ধিবদিচ্ছা প্রযত্নাবপি তস্য নিত্যৌ সকর্তৃকত্বসাধনান্তর্গতৌ বেদিতব্যৌ ইত্যাদি।—তাৎপর্য্যটীকা। সকলগোচরে জ্ঞানে সিদ্ধে চিকীর্ষা প্রযত্নয়োরপি তথাভাবঃ ইত্যাদি।—আত্মতত্ত্ববিবেক।

নামক গুণ আছে, তাঁহাকেই কর্ত্তা বলা যায়। প্রযত্নবান্ পুরুষই কর্ত্তৃ-শব্দের মুখ্য অর্থ। ঈশ্বরের নিত্য ইচ্ছা ও নিত্য প্রযত্ন সমর্থন করিতে জয়ন্ত ভট্ট শেষে ইহাও বলিয়াছেন যে, "সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ" এই শ্রুতিতে "কাম" শব্দের অর্থ ইচ্ছা, "সংকল্প" শব্দের অর্থ প্রযত্ন। ঈশ্বরের প্রযত্ন সংকল্পবিশেষাত্মক। জয়ন্ত ভট্ট ঈশ্বরের ইচ্ছাকে নিত্য বলিয়া সমর্থন করিয়াও, শেষে ইহাও বলিয়াছেন যে, সৃষ্টি ও প্রলয়ের অন্তরালে জগতের স্থিতিকালে "এই কর্ম্ম হইতে এই পুরুষের এই ফল হউক" এইরূপ ইচ্ছা ঈশ্বরের জন্মে। জয়ন্ত ভট্টের কথার দ্বারা তাঁহার মতে ঈশ্বরের ইচ্ছাবিশেষের যে উৎপত্তিও হয়, ইহা বুঝা যায়। "ন্যায়কন্দলী"কার শ্রীধরভট্ট ও প্রশস্তপাদ বাক্যের "মহেশ্বরস্য সিসৃক্ষা সর্জ্জনেচ্ছা জায়তে" এইরূপ ব্যাখ্যার দ্বারা ঈশ্বরের যে সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা জন্মে, ইহা স্পষ্ট প্রকাশ করিয়া পরেই বলিয়াছেন যে, যদিও যুগপৎ অসংখ্য কার্য্যোৎপত্তিতে ব্যাপ্রিয়মাণ ঈশ্বরেচ্ছা একই, তথাপি ঐ ইচ্ছা কদাচিৎ সংহারার্থ ও কদাচিৎ সৃষ্ট্যর্থ হয়। জয়ন্ত ভট্টও এইরূপ কথাই বলিয়াছেন। তাহা হইলে শ্রীধর ভট্ট ও জয়ন্ত ভট্টের মত বুঝা যায় যে, ঈশ্বরেচ্ছা নিত্য হইলেও, উহার সৃষ্টি-সংহার প্রভৃতি কার্য্যবিষয়কত্ব নিত্য নহে, উহা কালবিশেষ-সাপেক্ষ। এই জন্যই শাস্ত্রে ঈশ্বরের সৃষ্টিবিষয়ক ইচ্ছা ও সংহারবিষয়ক ইচ্ছার উৎপত্তি কথিত হইয়াছে। কারণ, ঈশ্বরের ইচ্ছা নিত্য হইলেও, উহা সর্ব্বদা সর্ব্ববিষয়কত্ববিশিষ্ট হইয়া বর্ত্তমান নাই। ("ন্যায়কন্দলী," ৫২ পৃষ্ঠা ও "ন্যায়মঞ্জরী," ২০১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

জয়ন্ত ভট্ট ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের ন্যায় ঈশ্বরের ধর্ম্মও স্বীকার করিয়াছেন, পরন্তু তিনি ঈশ্বরের নিত্যসুখও স্বীকার করিয়াছেন[১]। তিনি বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর নিত্যসুখবিশিষ্ট, ইহা শ্রুতিসিদ্ধ, পরন্তু তিনি উহার যুক্তিও বলিয়াছেন যে, যিনি সুখী নহেন, তাঁহার এতাদৃশ সৃষ্টিকার্য্যারম্ভের যোগ্যতাই থাকিতে পারে না। জয়ন্ত ভট্টের এই যুক্তি প্রণিধান-যোগ্য। কিন্তু ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন, উদ্দ্যোতকর, উদয়নাচার্য্য ও গঙ্গেশ প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণ নিত্যসুখে কিছুমাত্র প্রমাণ নাই, ইহাই সমর্থন করিয়াছেন। "আনন্দং ব্রহ্ম" এই শ্রুতিতে আনন্দ শব্দের অর্থ সুখ নহে, উহার লাক্ষণিক অর্থ দুঃখাভাব, ইহাই তাঁহারা বলিয়াছেন (১ম খণ্ড, ২০০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। "তত্ত্বচিন্তামণি"কার গঙ্গেশ "ঈশ্বরানুমানচিন্তামণি"র শেষভাগে মুক্তি-বিচারে নিত্যসুখে প্রমাণাভাব সমর্থন করিতে শেষে বলিয়াছেন যে, "আনন্দং ব্রহ্ম" এই শ্রুতিতে "আনন্দ" শব্দের ক্লীবলিঙ্গ প্রয়োগবশতঃ উহার দ্বারা ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ, এই অর্থ বুঝা যায় না। কারণ, আনন্দস্বরূপ অর্থে "আনন্দ" শব্দ নিত্য পুংলিঙ্গ। সুতরাং "আনন্দং" এই বাক্যের দ্বারা আনন্দবিশিষ্ট এই অর্থই বুঝিতে হইবে। কিন্তু গঙ্গেশ উপাধ্যায় ও বাৎস্যায়নের ন্যায় নিত্যসুখের অস্তিত্ব অস্বীকার করায়, তাঁহার মতেও পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিতে "আনন্দ" শব্দের দ্বারা আত্যন্তিক দুঃখাভাব বুঝিয়া ব্রহ্ম আনন্দবিশিষ্ট অর্থাৎ দুঃখাভাববিশিষ্ট

১। ধর্ম্মস্তু ভূতানুগ্রহবতো বস্তুস্বাভাব্যাদ্ ভবন্ন বার্যাতে, তস্য চ ফলং পরমার্থনিষ্পত্তিরেব। সুখন্তস্য নিত্যমেব, নিত্যানন্দত্বেনাগমাৎ প্রতীতেঃ। অসুখিতস্য চৈবম্বিধকার্য্যারম্ভযোগ্যতাঽভাবাৎ।—ন্যায়মঞ্জরী, ২০১ পৃষ্ঠা।

(সুখবিশিষ্ট নহেন) ইহাই তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের কথানুসারে পরবর্ত্তী অনেক নব্যনৈয়ায়িকও ঐ শ্রুতির ঐরূপই তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" এই প্রসিদ্ধ শ্রুতিবাক্যে যে, "আনন্দ" শব্দের পুংলিঙ্গ প্রয়োগই আছে, ইহাও দেখা আবশ্যক। সুতরাং বৈদিক প্রয়োগে "আনন্দ" শব্দের ক্লীবলিঙ্গ প্রয়োগ দেখিয়া উহার দ্বারা কোন তত্ত্ব নির্ণয় করা যায় না। "সিদ্ধান্তমুক্তাবলী" গ্রন্থে নব্যনৈয়ায়িক বিশ্বনাথ পঞ্চানন, ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ নহেন, ইহা সমর্থন করিতে "অসুখং" এইরূপ শ্রুতিবাক্যেরও উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তিনিও সেখানে ঈশ্বরের নিত্যসুখ স্বীকার করিতে আপত্তি করেন নাই। পরন্তু তিনি শেষে অদৃষ্ট-বিচার-স্থলে বিষ্ণুপ্রীতির ব্যাখ্যা করিতে ঈশ্বরে জন্যসুখ নাই, এই কথা বলায়, তিনি শেষে যে, ঈশ্বরে নিত্যসুখও স্বীকার করিয়াছেন, ইহাও আমরা বুঝিতে পারি। অর্থাৎ ঈশ্বর নিত্যসুখস্বরূপ নহেন, কিন্তু নিত্যসুখের আশ্রয়। "তর্কসংগ্রহ"-দীপিকার টীকাকার নীলকণ্ঠ নিজে পূর্ব্বোক্ত প্রচলিত মতেরই ব্যাখ্যা করিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, নব্যনৈয়ায়িকগণ ঈশ্বরে নিত্যসুখ স্বীকার করিয়া, নিত্যসুখের আশ্রয়ত্বই ঈশ্বরের লক্ষণ বলিয়াছেন। "দিনকরী" প্রভৃতি কোন কোন টীকাগ্রন্থেও নব্যমত বলিয়া ঈশ্বরের নিত্যসুখের কথা পাওয়া যায়। কিন্তু এই নব্যনৈয়ায়িকগণের পরিচয় ঐসকল গ্রন্থের টীকাকারও বলেন নাই। নব্যনৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণির "দীধিতি"র মঙ্গলাচরণ-শ্লোকে "অখণ্ডানন্দবোধায়" এই বাক্যের ন্যায়-মতানুসারে ব্যাখ্যা করিতে টীকাকার গদাধর ভট্টাচার্য্য কিন্তু স্পষ্টই বলিয়াছেন যে [১] নৈয়ায়িকগণ নিত্যসুখ স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে কোন নৈয়ায়িকই যেমন আত্মাকে জ্ঞান ও সুখস্বরূপ স্বীকার করেন না, তদ্রূপ নিত্যসুখও স্বীকার করেন না। কিন্তু গঙ্গেশের পূর্ব্ববর্ত্তী মহানৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্ট যে, পরমাত্মা ঈশ্বরের নিত্যসুখ স্বীকার করিয়া, উহা সমর্থন করিয়াছেন, ইহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পরন্তু গদাধর ভট্টাচার্য্য শেষে বলিয়াছেন যে, অথবা রঘুনাথ শিরোমণি "নিত্যসুখের অভি-ব্যক্তি মোক্ষ", এই ভট্ট মতের পরিষ্কার করায়, ঐ মতাবলম্বনেই তিনি এখানে পরমাত্মাকে "অখণ্ডানন্দবোধ" বলিয়াছেন। যাঁহা হইতে অর্থাৎ যাঁহার উপাসনার দ্বারা অখণ্ড আনন্দের বোধ অর্থাৎ নিত্যসুখের সাক্ষাৎকার হয়, ইহাই ঐ বাক্যের অর্থ। বস্তুতঃ রঘুনাথ শিরোমণি "বৌদ্ধাধিকার-টিপ্পনী"তে (শেষে) নিত্যসুখের অভিব্যক্তি মোক্ষ, এই মতের সমর্থন করিয়া ঐ মতের প্রকর্ষ-খ্যাপন করিয়াছেন। সুতরাং তিনি নিজেও ঐ মত গ্রহণ করিলে, তাঁহার মতেও যে, আত্মার নিত্যসুখ আছে, উহা অপ্রামাণিক নহে, ইহা গদাধর ভট্টাচার্য্যেরও স্বীকার্য্য। কিন্তু রঘুনাথ শিরোমণি "বৌদ্ধাধিকারটিপ্পনী"র শেষে জীবাত্মা ও পরমাত্মা জ্ঞান ও সুখস্বরূপ নহেন, কিন্তু পরমাত্মাতে নিত্যজ্ঞান ও নিত্যসুখ আছে, ইহাই সিদ্ধান্ত

১। অত্র নিত্যসুখজ্ঞানবতে নিত্যসুখজ্ঞানাত্মকায় ইতি বা ব্যাখ্যানং বেদান্তিনামেব শোভতে, ন তু নৈয়ায়িকানাং, তৈর্নিত্যসুখস্যাত্মনি জ্ঞানসুখাভেদস্য বাঽনভ্যুপগমাৎ" ইত্যাদি।—গদাধর টীকা।

প্রকাশ করায়,[১] তিনি যে, ঈশ্বরের নিত্যসুখ স্বীকার করিতেন—ঈশ্বরকে নিত্যসুখস্বরূপ বলিতেন না, ইহাই বুঝা যায়। তাহা হইলে এই প্রসঙ্গে এখানে ইহাও অবশ্য বক্তব্য এই যে, এখন অদ্বৈত-মতানুরাগী কেহ কেহ যে, রঘুনাথ শিরোমণির মঙ্গলাচরণ-শ্লোকে "অখণ্ডানন্দবোধায়" এই বাক্য দেখিয়া নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণিকেও অদ্বৈতমতনিষ্ঠ বলিয়া নিশ্চয় করিয়া ঘোষণা করিতেছেন, উহা পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য। কারণ, রঘুনাথ শিরোমণির নিজ সিদ্ধান্তানুসারে তাঁহার কথিত "অখণ্ডানন্দবোধ" শব্দের দ্বারা নিত্যানন্দ ও নিত্যবোধস্বরূপ—এই অর্থ বুঝা যাইতে পারে না। কিন্তু যাহাতে অখণ্ড (নিত্য) আনন্দ ও অখণ্ড জ্ঞান আছে, এইরূপ অর্থই বুঝা যাইতে পারে। রঘুনাথ শিরোমণি শেষে তাঁহার "পদার্থতত্ত্বনিরূপণ" গ্রন্থে ঈশ্বরের পরিমাণ-বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই বলিয়া, উহা অস্বীকার করিয়াছেন এবং "পৃথকত্ব" গুণপদার্থই নহে, এই মত সমর্থন করিয়াছেন। সে যাহা হউক, মূলকথা ঈশ্বরের কি কি গুণ আছে, এ বিষয়ে প্রাচীন কাল হইতেই নানা মতভেদ হইয়াছে। ঈশ্বর সংখ্যা প্রভৃতি পাঁচটি সামান্য গুণ এবং জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রযত্ন—এই তিনটি বিশেষ-গুণ-বিশিষ্ট, (মহেশ্বরেঽষ্টৌ) ইহাই এখন প্রচলিত মত। প্রাচীন নৈয়ায়িকদিগের মধ্যে ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন ঈশ্বরের ধর্ম্মও স্বীকার করিয়াছেন। জয়ন্ত ভট্ট ধর্ম্ম এবং নিত্যসুখও স্বীকার করিয়াছেন। এ বিষয়ে নব্যনৈয়ায়িকদিগের কথাও পূর্ব্বে বলিয়াছি।

ভাষ্যকার ঈশ্বরকে "আত্মান্তর" বলিয়া জীবাত্মা হইতে পরমাত্মা ঈশ্বরের ভেদ প্রকাশ করিয়া, পরে ঐ ভেদ প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর অধর্ম্ম, মিথ্যাজ্ঞান ও প্রমাদশূন্য এবং ধর্ম্ম, জ্ঞান, সমাধি ও সম্পদ্‌বিশিষ্ট আত্মান্তর। অর্থাৎ জীবাত্মার অধর্ম্ম, মিথ্যাজ্ঞান ও প্রমাদ আছে, ঈশ্বরের ঐ সমস্ত কিছুই নাই। কিন্তু ঈশ্বরের ঐ অধর্ম্মের বিপরীত ধর্ম্ম আছে, মিথ্যা-জ্ঞানের বিপরীত জ্ঞান (তত্ত্বজ্ঞান) আছে, এবং প্রমাদের বিপরীত সমাধি অর্থাৎ সর্ব্ববিষয়ে একাগ্রতা বা অপ্রমাদ আছে। এবং সম্পৎ অর্থাৎ অণিমাদি সম্পত্তি (অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য) আছে। জীবাত্মার ঐ সম্পৎ নাই। ভাষ্যকার এখানে "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ' (শ্বেতাশ্বতর, ১।৯) এই শ্রুতি অনুসারেই ঈশ্বর জ্ঞ, জীব অজ্ঞ; ঈশ্বর ঈশ, জীব অনীশ, ইহা বলিয়া পূর্ব্বোক্ত ভেদ সমর্থন করিয়াছেন। পরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরের অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য্য, তাঁহার ধর্ম্ম ও সমাধির ফল, এবং ঈশ্বরের সংকল্পজনিত ধর্ম্ম প্রত্যেক জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্টসমষ্টি এবং পৃথিব্যাদি ভূতবর্গকে সৃষ্টির জন্য প্রবৃত্ত করে। এইরূপ হইলেই ঈশ্বরের নিজকৃত কর্ম্মফলপ্রাপ্তির লোপ না হওয়ায়, "নির্ম্মাণপ্রাকাম্য"

১। জীবাত্মা তাবৎ সুখজ্ঞানবিরুদ্ধস্বভাবো জ্ঞানেচ্ছাপ্রযত্নসুখদুঃখবান্ অনুভববলেন ধর্ম্মাধর্ম্মবাংশ্চ ন্যায়াগমাভ্যাং সিদ্ধঃ। তত্র চ বাধিতে মিথো বিরুদ্ধস্বভাবাভ্যাং জ্ঞানসুখাভ্যামভেদে ন শ্রুতেস্তাৎপর্য্যং পরমাত্মনি তু সার্ব্বজ্ঞ্য-জগৎকর্ত্তৃত্বাদিশালিতয়া ন্যায়াগমাভ্যাং সিদ্ধে "বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম", "আনন্দং ব্রহ্ম" ইত্যাদিকাঃ শ্রুতয়ো মুখ্যার্থাবাধান্নিত্যজ্ঞানানন্দং বোধয়ন্তি, তত্র চ ন বিপ্রতিপদ্যামহে" ইতি।—বৌদ্ধাধিকারটিপ্পনী (শেষভাগ দ্রষ্টব্য)।

অর্থাৎ স্বেচ্ছামাত্রে জগৎসৃষ্টি তাঁহার নিজকৃত কর্ম্মফল জানিবে। তৎপর্য্যটীকাকার এখানে তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, ঈশ্বরের কর্ম্মানুষ্ঠান না থাকায়, তাঁহার ধর্ম্ম হইতে পারে না এবং তাঁহার কর্ম্ম ব্যতীতও অণিমাদি ঐশ্বর্য্য জন্মিলে, তাঁহার অকৃত কর্ম্মের ফল-প্রাপ্তির আপত্তি হয়, এই জন্য ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরের সংকল্পজনিত ধর্ম্ম প্রত্যেক জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মসমষ্টি ও পৃথিব্যাদি ভূতবর্গকে প্রবৃত্ত করে। অর্থাৎ ঈশ্বরের বাহ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান না থাকিলেও, সৃষ্টির পূর্ব্বে "সংকল্প"রূপ যে অনুষ্ঠান বা কর্ম্ম জন্মে, তজ্জন্যই তাঁহার ধর্ম্ম-বিশেষ জন্মে, ঐ ধর্ম্ম-বিশেষের ফল—তাঁহার ঐশ্বর্য্য ; ঐ ঐশ্বর্য্যের ফল তাহার "নির্ম্মাণ-প্রাকাম্য", অর্থাৎ স্বেচ্ছামাত্রে জগন্নির্ম্মাণ। এইরূপ হইলে ঈশ্বরের নিজকৃত কর্ম্ম এবং তজ্জন্য ধর্ম্ম ও তাহার ফলপ্রাপ্তি স্বীকৃত হওয়ায়, পূর্ব্বোক্ত আপত্তির নিরাস হয়। এখানে ভাষ্যকারের কথার দ্বারা বুঝা যায় যে, ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য অনিত্য কিন্তু ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য নিত্য, কি অনিত্য, এই বিচারে উদ্দ্যোতকর ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্যকে নিত্য বলিয়াই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। যোগভাষ্যের টীকায় বাচস্পতি মিশ্রের উদ্ধৃত "জ্ঞানং বৈরাগ্যমৈশ্বর্য্যং" ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য এবং আরও অনেক শাস্ত্র-বাক্যের দ্বারা এবং যুক্তির দ্বারাও ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য যে নিত্য, ইহাই বুঝা যায়। ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য নিত্য হইলে ভাষ্যকার যে ঈশ্বরের ধর্ম্ম স্বীকার করিয়াছেন, তাহা ব্যর্থ হয়, এজন্য উদ্দ্যোতকর প্রথমে ঐ ধর্ম্ম স্বীকার করিয়াই বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরের ধর্ম্ম তাঁহার ঐশ্বর্য্যের জনক নহে। কিন্তু সৃষ্টির সহকারি-কারণ সর্ব্বজীবের অদৃষ্টসমষ্টির প্রবর্ত্তক। সুতরাং ঈশ্বরের ধর্ম্ম ব্যর্থ নহে। উদ্দ্যোতকর শেষে নিজমত বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরের ধর্ম্ম নাই, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষই হয় না। তৎপর্য্যটীকাকার উদ্দ্যোতকরের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ভাষ্যকার ঈশ্বরের ধর্ম্ম স্বীকরি করিয়াই ঐ কথা বলিয়াছেন, বস্তুতঃ ঈশ্বরের যে ধর্ম্ম আছে, ইহার কোন প্রমাণ নাই। ঈশ্বরের জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি নিত্য, ঐ উভয় শক্তির দ্বারাই সমস্ত কার্য্যোৎপত্তি সম্ভব হওয়ায়, ঈশ্বরের ধর্ম্ম স্বীকার অনাবশ্যক। তাৎপর্য্যটীকাকার ইহার পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরের জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি নিত্য, সুতরাং তাঁহার ঐ শক্তিদ্বয়রূপ ঈশনা বা ঐশ্বর্য্য নিত্য, কিন্তু তাঁহার অণিমাদি ঐশ্বর্য্য অনিত্য। ভাষ্যকার সেই অনিত্য ঐশ্বর্য্যকেই ঈশ্বরের ধর্ম্মের ফল বলিয়াছেন। তাৎপর্য্যটীকাকারের এই কথার দ্বারা বুঝা যায় যে, ভাষ্যকারের মতে ঈশ্বরের নিত্য ও অনিত্য দ্বিবিধ ঐশ্বর্য্য আছে, অনিত্য ঐশ্বর্য্য কর্ম্মবিশেষজন্য ধর্ম্মবিশেষের ফল, ইহাই অন্যত্র দেখা যায়। কর্ম্মব্যতীত উহা উৎপন্ন হইতে পারে না, তাহা হইলে অকৃতকর্ম্মের ফলপ্রাপ্তিরও আপত্তি হয়। তাই ভাষ্যকার ঈশ্বরের সেই অনিত্য ঐশ্বর্য্যের কারণরূপে তাঁহার ধর্ম্ম স্বীকার করিয়াছেন, এবং ঈশ্বরের বাহ্যকর্ম্ম না থাকিলেও, "সংকল্প"রূপ কর্ম্মকে ঐ ধর্ম্মের কারণ বলিয়াছেন। ফল-কথা, ভাষ্যকার যখন ঈশ্বরের "সংকল্প"জন্য ধর্ম্ম স্বীকার করিয়া, তাহার অণিমাদি ঐশ্বর্য্যকে ঐ ধর্ম্মের ফল বলিয়াছেন, তখন উদ্দ্যোতকর উহা স্বীকার না করিলেও, তাৎপর্য্যটীকাকারের পূর্ব্বোক্ত কথানুসারে ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্তরূপ মতই বুঝিতে হইবে, নচেৎ অন্য কোনরূপে

ভাষ্যকারের ঐ কথার উপপত্তি হইতে পারে না। ভাষ্যকারের মতে ঈশ্বরের যে ধর্ম্ম জন্মে, উহা তাঁহার স্বর্গাদিজনক নহে, কিন্তু উহা তাঁহার অণিমাদি ঐশ্বর্য্যের জনক হইয়া সৃষ্টির পূর্ব্বে সর্ব্বজীবের অদৃষ্টসমষ্টিও ভূতবর্গকে সৃষ্টির জন্য প্রবৃত্ত করে। সুতরাং ঈশ্বরের স্বেচ্ছামাত্রে জগন্নির্ম্মাণ তাঁহার নিজকৃত কর্ম্মেরই ফল হওয়ায়, "অকৃতাভ্যাগম" দোষের আপত্তি হয় না।

এখানে ভাষ্যকারোক্ত "সংকল্প" শব্দের অর্থ কি, তাহা তাৎপর্য্যটীকাকার ব্যক্ত করেন নাই। "সংকল্প" শব্দের ইচ্ছা অর্থগ্রহণ করিলে[১] উহার দ্বারা ঈশ্বরের সৃষ্টি করিবার ইচ্ছাও বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু এখানে "সংকল্প" শব্দের দ্বারা ঈশ্বরের জ্ঞানবিশেষরূপ তপস্যাও বুঝা যাইতে পারে। 'সোহকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়, স তপোহতপ্যত, স তপস্তপ্‌ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত" ইত্যাদি (তৈত্তিরীয়, উপ° ২।৬) শ্রুতিতে যেমন ঈশ্বরের সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা কথিত হইয়াছে, তদ্রূপ তিনি তপস্যা করিয়া এই সমস্ত সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহাও কথিত হইয়াছে। ঈশ্বরের এই তপস্যা কি? মুণ্ডক উপনিষৎ বলিয়াছেন—"যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ" (১।১।৯) অর্থাৎ জ্ঞানবিশেষই তাঁহার তপস্যা। শ্রীভাষ্যে রামানুজ—"স তপোহতপ্যত" ইত্যাদি শ্রুতিতে "তপস্" শব্দের দ্বারা সিসৃক্ষু পরমেশ্বরের জগতের পূর্ব্বতন আকার পর্য্যালোচনারূপ জ্ঞানবিশেষই গ্রহণ করিয়াছেন। অর্থাৎ ঈশ্বর তাঁহার পূর্ব্বসৃষ্ট জগতের আকারকে চিন্তা করিয়া সেইরূপ আকারবিশিষ্ট জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহাই পূর্ব্বোক্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য[২]। এবং "তপসা চীয়তে ব্রহ্ম"—এই শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে রামানুজ বলিয়াছেন যে, "বহু স্যাং" এইরূপে সংকল্পরূপ জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্ম সৃষ্টির জন্য উন্মুখ হন[৩]। "সংকল্পমূলঃ কামো বৈ যজ্ঞাঃ সংকল্পসম্ভবাঃ"—এই (২।৩) মনুবচনের ব্যাখ্যায় জীবের সর্ব্বক্রিয়ার মূল সংকল্প কি? এইরূপ প্রশ্ন করিয়া ভাষ্যকার মেধাতিথি প্রার্থনা ও অধ্যবসায়ের পূর্ব্বোৎপন্ন পদার্থস্বরূপ-নিরূপণরূপ জ্ঞানবিশেষকেই "সংকল্প" বলিয়াছেন। এইরূপ হইলে ঈশ্বরের জ্ঞানবিশেষকেও তাঁহার "সংকল্প" বলিয়া বুঝা যাইতে পারে। তাহা হইলে এখানে ঈশ্বরে জ্ঞানবিশেষরূপ তপস্যা ও "সঙ্কল্প" শব্দের দ্বারা বুঝিয়া ঐ "সংকল্প"-

---

১। ইচ্ছাবিশেষ অর্থে "সংকল্প" শব্দের প্রয়োগ বহু স্থানেই পাওয়া যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদে "স যদি পিতৃলোককামো ভবতি, সংকল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি" (৮।২।১) ইত্যাদি শ্রুতিতে এবং বেদান্তদর্শনে ঐ শ্রুতিবর্ণিত-সিদ্ধান্ত-ব্যাখ্যায় "সংকল্পাদেব চ তচ্ছ্রুতেঃ" (৪।৪।৮) এই সূত্রে "সংকল্প" শব্দের দ্বারা ইচ্ছা-বিশেষই অভিপ্রেত বুঝা যায়। "সোহভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ" ইত্যাদি (১।৮) মনুবচনে সিসৃক্ষু পরমেশ্বরের যে অভিধ্যান কথিত হইয়াছে, উহাও যে সৃষ্টির পূর্ব্বে ঈশ্বরের ইচ্ছাবিশেষ, ইহা মেধাতিথি ও কুল্লূকভট্টের ব্যাখ্যার দ্বারাও বুঝা যায়। প্রশস্তপাদ ভাষ্যে সৃষ্টিসংহার বিধির বর্ণনায় "মহেশ্বরস্যাভিধ্যানমাত্রাৎ" এই বাক্যের ব্যাখ্যায় ন্যায়কন্দলীকার শ্রীধর ভট্টও বলিয়াছেন, "মহেশ্বরস্যাভিধ্যানমাত্রাৎ সংকল্পমাত্রাৎ"।

২। অত্র 'তপস্' শব্দেন প্রাচীনজগদাকারপর্য্যালোচনরূপং জ্ঞানমভিধীয়তে। "যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। প্রাক্‌সৃষ্টং জগৎসংস্থানমালোচ্য ইদানীমপি তৎসংস্থানং জগদসৃজদিত্যর্থঃ।—শ্রীভাষ্য। ১ম অঃ। ৪।২৭।

৩। "তপসা জ্ঞানেন" .. .. চীয়তে উপচীয়তে। "বহু স্যাং" ইতি সংকল্পরূপেণ জ্ঞানেন ব্রহ্ম সৃষ্ট্যুন্মুখং ভবতীত্যর্থঃ।—শ্রীভাষ্য।১।২।২৭।

জনিত ধর্ম্মবিশেষ সৃষ্টির পূর্ব্বে সর্ব্বজীবের অদৃষ্টসমষ্টি ও সৃষ্টির উপাদান-কারণ ভূতবর্গের প্রবর্ত্তক বা প্রেরক হইয়া সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করে, ইহা ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বুঝা যায়। এবং ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্ত কথার দ্বারা তাঁহার মতে ঈশ্বর বদ্ধও নহেন, মুক্তও নহেন, তিনি মুক্ত ও বদ্ধ হইতে ভিন্ন তৃতীয় প্রকার আত্মা, ইহাও বুঝা যায়। কারণ, ঈশ্বরের মিথ্যাজ্ঞান না থাকায়, তাঁহাকে বদ্ধ বলা যায় না, এবং তাঁহার কর্ম্মজন্য ধর্ম্ম ও তজ্জন্য অণিমাদি ঐশ্বর্য্য উৎপন্ন হয় বলিয়া, তাঁহাকে মুক্তও বলা যায় না। উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, যাঁহার কোন কালেই বন্ধন নাই, তিনি মুক্ত হইতে পারেন না। উদ্দ্যোতকরও ঈশ্বরকে মুক্ত ও বদ্ধ হইতে ভিন্ন তৃতীয় প্রকার বলিয়াছেন। কিন্তু যোগদর্শনের সমাধিপাদের ২৪শ সূত্রের ভাষ্যে ঈশ্বর নিত্যমুক্ত, এই সিদ্ধান্তই কথিত হইয়াছে। আরও অনেক গ্রন্থে ঐ সিদ্ধান্তই পাওয়া যায়। সে যাহা হউক, সাংখ্যসূত্রকার "মুক্তবদ্ধয়োরন্যতরাভাবান্ন তৎসিদ্ধিঃ" (১।৯৩) এই সূত্রের দ্বারা ঈশ্বর মুক্তও নহেন, বদ্ধও নহেন, সুতরাং তৃতীয় প্রকার সম্ভব না হওয়ায়, ঈশ্বরের সিদ্ধি হয় না, এই কথা বলিয়া যে ঈশ্বরের খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা গ্রহণ করা যায় না। কারণ, ঈশ্বর মুক্ত ও বদ্ধ হইতে ভিন্ন তৃতীয় প্রকারও হইতে পারেন; তিনি নিত্য-মুক্তও হইতে পারেন।

যাঁহারা সৃষ্টিকর্ত্তা নিত্য ঈশ্বর স্বীকার করেন নাই, তাঁহাদিগের একটি বিশেষ যুক্তি এই যে, ঐরূপ ঈশ্বরের সৃষ্টিকার্য্যে কোনই স্বার্থ বা প্রয়োজন না থাকায়, সৃষ্টিকার্য্যে তাঁহার প্রবৃত্তি সম্ভব না হওয়ায়, সৃষ্টিকর্তৃস্বরূপে ঈশ্বরের সিদ্ধি হইতে পারে না। কারণ, কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরই প্রয়োজন ব্যতীত কোন কার্য্যে প্রবৃত্তি হয় না, ইহা সর্ব্বসম্মত। কিন্তু সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন পূর্ণকাম ঈশ্বরের অপ্রাপ্ত কিছুই না থাকায়, সৃষ্টিকার্য্যে তাঁহার কোন প্রয়োজনই সম্ভব নহে। সুতরাং প্রয়োজনাভাববশতঃ তাঁহার অকর্তৃত্বই সিদ্ধ হয়। ভাষ্যকার এইজন্য পূর্ব্বে বলিয়াছেন—"আপ্তকল্পশ্চায়ং"। "আপ্ত" শব্দের অর্থ এখানে বিশ্বস্ত বা সুহৃৎ।[১] ঈশ্বর "আপ্তকল্প" অর্থাৎ বিশ্বস্ততুল্য। তাৎপর্য্য এই যে, আপ্ত ব্যক্তি (পিত্রাদি) যেমন নিজের স্বার্থকে অপেক্ষা না করিয়াও, কেবল অপরের (পুত্রাদির) অনুগ্রহের জন্যই কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তদ্রূপ ঈশ্বরও নিজের কিছুমাত্র স্বার্থ না থাকিলেও, কেবল জীবগণের অনুগ্রহার্থ জগতের সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হন। ভাষ্যকার তাঁহার এই তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতেই পরে ইহার দৃষ্টান্ত বলিয়াছেন যে, যেমন অপত্যগণের সম্বন্ধে পিতা, তদ্রূপ ঈশ্বর সর্ব্বজীবের সম্বন্ধে পিতৃসদৃশ। ভাষ্যে "পিতৃভূত" এই বাক্যে "ভূত" শব্দের অর্থ সদৃশ।[২] অর্থাৎ পিতা যেমন তাঁহার অপত্যগণের সম্বন্ধে আপ্ত, অর্থাৎ অতিবিশ্বস্ত বা পরমসুহৃৎ, তিনি নিজের

১। "ব্রীড়ানতৈরাপ্তজনোপনীতঃ"—ইত্যাদি (কিরাতার্জ্জুনীয়, ৩।৪২শ)—শ্লোকে "আপ্ত" শব্দের বিশ্বস্ত অর্থই প্রাচীন ব্যাখ্যাকার-সম্মত বুঝা যায়।

২। "ভূত" শব্দ, সদৃশ অর্থে ত্রিলিঙ্গ। "যুক্তে ক্ষ্মাদাবৃতে ভূতং প্রাণ্যতীতে সমে ত্রিষু"।—অমরকোষ নানার্থবর্গ। ৭১। "বিতানভূতং বিততং পৃথিব্যাং"—কিরাতার্জ্জুনীয়। ৩।৪২॥

স্বার্থের জন্য অপত্যগণকে প্রতারণা করেন না,—নিঃস্বার্থভাবে তাহাদিগের মঙ্গলের জন্যই অনেক কার্য্য করেন, তদ্রূপ জগৎপিতা পরমেশ্বরও সর্ব্বজীবের সম্বন্ধে আপ্ত, সুতরাং তিনি নিজের স্বার্থ না থাকিলেও, সর্ব্বজীবের মঙ্গলের জন্য করুণাবশতঃ জগৎ সৃষ্টি করিতে পারেন। তাৎপর্য্যটীকাকারের কথার দ্বারাও এখানে ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্তরূপ তাৎপর্য্যই বুঝা যায়। অর্থাৎ ঈশ্বরের সৃষ্টিকার্য্যে সর্ব্বজীবের প্রতি অনুগ্রহই প্রয়োজন। সুতরাং প্রয়োজনাভাববশতঃ তাঁহার অকর্তৃত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না, ইহাই এখানে ভাষ্যকারের সিদ্ধান্ত বুঝা যায়। কিন্তু এই সিদ্ধান্তে আপত্তি হয় যে, ঈশ্বর সর্ব্বজীবের প্রতি করুণাবশতঃই সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, তিনি কেবল সুখীই সৃষ্টি করিতেন; দুঃখী সৃষ্টি করিতেন না। অর্থাৎ তিনি জগতে দুঃখের সৃষ্টি করিতেন না। কারণ, যিনি পরমকারুণিক, তাঁহার দুঃখপ্রদানে সামর্থ্যসত্ত্বেও তিনি কাহাকেও দুঃখ প্রদান করেন না। নচেৎ তাঁহাকে পরমকারুণিক বলা যায় না। ঈশ্বর জীবের সুখজনক ধর্ম্ম ও দুঃখজনক অধর্ম্মকে অপেক্ষা করিয়া তদনুসারেই জীবের সুখদুঃখের সৃষ্টি করেন, তিনি সৃষ্টিকার্য্যে জীবের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল-ধর্ম্মাধর্ম্ম-সাপেক্ষ। তাই ঐ কর্ম্মফলের বৈচিত্র্য-বশতঃই সৃষ্টির বৈচিত্র্য হইয়াছে, এই পূর্ব্বোক্ত সমাধানও এখানে গ্রহণ করা যায় না। কারণ, ঐ সিদ্ধান্তে ঈশ্বর সর্ব্বজীবের ধর্ম্মাধর্ম্মসমূহের অধিষ্ঠাতা,—তাঁহার অধিষ্ঠান ব্যতীত ঐ ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, সুখ ও দুঃখরূপ ফলজনক হয় না, ইহাই স্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু ঈশ্বর যদি সর্ব্বজীবের প্রতি করুণাবশতঃই সৃষ্টি করেন, তাহা হইলে তিনি সর্ব্বজীবের দুঃখজনক অধর্ম্মসমূহে অধিষ্ঠান করিবেন কেন? তিনি উহাতে অধিষ্ঠান করিলেই যখন জীবের দুঃখের উৎপত্তি অবশ্যই হইবে, তখন তিনি উহাতে অধিষ্ঠান করিতে পারেন না। কারণ, যিনি পরমকারুণিক, তিনি কাহারও কিছুমাত্র দুঃখের সৃষ্টির জন্য কিছু করেন না। নচেৎ তাঁহাকে পরমকারুণিক বা করুণাময় বলা যায় না। ভাষ্যকার এই আপত্তি খণ্ডনের জন্য সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর জীবের স্বকৃত কর্ম্মফলপ্রাপ্তির লোপ করিয়া সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, "শরীরসৃষ্টি জীবের কর্ম্মনিমিত্তক নহে" এই মতে যেসমস্ত দোষ বলিয়াছি, সেই সমস্ত দোষের প্রসক্তি হয়। তাৎপর্য্য এই যে, শরীরসৃষ্টি জীবের কর্ম্মনিমিত্তক নহে —এই নাস্তিক মতে মহর্ষি গোতম তৃতীয় অধ্যায়ের শেষপ্রকরণে অনেক দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং সেখানে শেষসূত্রে যে "অকৃতাভ্যাগম" দোষ বলিয়াছেন, উহা স্বীকার করিলে, প্রত্যক্ষ-বিরোধ, অনুমানবিরোধ ও আগম-বিরোধ হয় বলিয়া, ভাষ্যকার সেখানে যথাক্রমে ঐ বিরোধত্রয় বুঝাইয়াছেন। (তৃতীয় অধ্যায়ের শেষসূত্রভাষ্য দ্রষ্টব্য)। ঈশ্বর জীবের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলপ্রাপ্তি লোপ করিয়া সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, অর্থাৎ ঈশ্বর করুণাবশতঃ জীবগণের অধর্ম্মসমূহে অধিষ্ঠান না করিয়া, কেবল স্বেচ্ছানুসারে সৃষ্টি করিয়াছেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে, তাহাতে ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্ত প্রত্যক্ষবিরোধ প্রভৃতি দোষেরও প্রসক্তি হয়। তাহা হইলে প্রত্যক্ষসিদ্ধ বিচিত্র শরীরের এবং বিবিধ দুঃখের উৎপত্তিও হইতে

পারে না, জীবগণের সুখের তারতম্যও হইতে পারে না। সুতরাং ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে, ঈশ্বর পরমকারুণিক হইলেও, তিনি জীবগণের শুভাশুভ সমস্ত কর্মের বিচিত্র ফলভোগ সম্পাদনের জন্য জীবগণের সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্মসমূহে অধিষ্ঠান করিয়া অর্থাৎ সমস্ত ধর্ম্মাধর্ম্মকেই সহকারি-কারণরূপে গ্রহণ করিয়া, তদনুসারেই বিশ্বসৃষ্টি করেন; তিনি কোন জীবেরই অবশ্যভোগ্য কর্ম্মফল-ভোগের লোপ করেন না। অবশ্য ঈশ্বর পরমকারুণিক হইলে, তিনি জীবগণের দুঃখজনক অধর্ম্মসমূহে অধিষ্ঠান করিবেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আবশ্যক। তাই তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে ভাষ্যকারের গূঢ় তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, ঈশ্বর পরমকারুণিক হইলেও, তিনি বস্তুর সামর্থ্য অন্যথা করিতে পারেন না। অতএব তিনি বস্তুস্বভাবকে অনুসরণ করতঃ জীবের ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, উভয়কেই সহকারি-কারণ-রূপে গ্রহ করিয়া বিচিত্র জগতের সৃষ্টি করেন। তিনি জীবগণের অনাদিকালসঞ্চিত অধর্ম্মসমূহে অধিষ্ঠান না করিলে, ঐ অধর্ম্মসমূহের কোন দিন বিনাশ হইতে পারে না। কারণ, উহার অবশ্যম্ভাবী ফল দুঃখভোগ সমাপ্ত হইলেই, উহা বিনষ্ট হইবে, ইহাই উহার স্বভাব। যে সমস্ত অধর্ম্ম ফলবিরোধী অর্থাৎ যাহার অবশ্যম্ভাবী ফল দুঃখের ভোগ হইলেই, উহা বিনষ্ট হইবে, সেই সমস্ত অধর্ম্ম, তাহার ফল প্রদান না করিয়া বিনষ্ট হইতে পারে না। ঐ সমস্ত অধর্ম্ম যখন জীবের কর্ম্মজন্য ভাবপদার্থ, তখন উহার কোন দিন বিনাশও অবশ্যম্ভাবী। ঈশ্বরের প্রভাবেও উহা অবিনাশী অর্থাৎ চিরস্থায়ী হইতে পারে না। সুতরাং ঈশ্বর জীবগণের নিয়তি লঙ্ঘন না করিয়া, তাহাদিগের দুঃখজনক অধর্ম্মসমূহেও অধিষ্ঠান করেন, তিনি উহা করিতে বাধ্য। কারণ, তিনি বস্তুর সামর্থ্য বা স্বভাবের অন্যথা করিয়া সৃষ্টি করিলে, বিচিত্র সৃষ্টি হইতে পারে না। জীবের কৃতকর্ম্মের ফলভোগ না হইলে "কৃতহানি" দোষও হয়।

"ন্যায়মঞ্জরী"কার 'মহানৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্টও শেষে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়া বলিয়াছেন যে, পরমেশ্বর জীবের প্রতি করুণাবশতঃই সৃষ্টি ও সংহার করেন। সকল জীবের সংসার অনাদি, সুতরাং অনাদি কাল হইতে সকল জীবই শুভ ও অশুভ নানা কর্ম্মজন্য নানা সংস্কারবিশিষ্ট হইয়া ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ সুদৃঢ় নিগড়বদ্ধ হওয়ায়, মোক্ষ-নগরীর পুরদ্বারে প্রবেশ লাভ করিতে পারে না। অনাদিকাল হইতে জীবগণ অসংখ্য দুঃখভোগ করিতেছে। সুতরাং কৃপাময় পরমেশ্বর তাঁহাদিগকে অবশ্যই কৃপা করিবেন। কিন্তু জীবগণের পূর্ব্বকৃত প্রারব্ধ কর্ম্মফল ভোগ না হইলে, সেই সমস্ত প্রারব্ধ কর্ম্মফলের ক্ষয় হইতে পারে না। সুতরাং জীবের সেই কর্ম্মফলভোগ-নির্ব্বাহের জন্য পরমেশ্বর কৃপা করিয়া জগৎ সৃষ্টি করেন। কর্ম্মবিশেষের ফলভোগ-নির্ব্বাহের জন্য তিনি নরকাদি সৃষ্টিও করেন। এইরূপ সুদীর্ঘকাল নানা কর্ম্মফল ভোগ করিয়া পরিশ্রান্ত জীবগণের বিশ্রামের জন্য তিনি মধ্যে মধ্যে বিশ্বসংহারও করেন। সুতরাং এই সমস্তই তাঁহার কৃপামূলক। বস্তুতঃ জীবের সুখভোগের ন্যায় সর্ব্বপ্রকার দুঃখভোগও সেই কৃপাময় পরমেশ্বরের কৃপামূলক। তিনি জীবগণের প্রতি কৃপাবশতঃই বিশ্বের সৃষ্টি ও সংহার করেন। অজ্ঞ মানব তাঁহার কৃপা বুঝিতে না পারিয়াই নানা কল্পনা করে।

বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদও "সৃষ্টি-সংহার-বিধি"র বর্ণন করিতে বলিয়াছেন যে, সংসারে নানাস্থানে পুনঃ পুনঃ নানাবিধ শরীরপরিগ্রহ করিয়া, নানাবিধ দুঃখপ্রাপ্ত সর্ব্বজীবের রাত্রিতে বিশ্রামের জন্য সকলভুবনপতি মহেশ্বরের সংহারেচ্ছা জন্মে এবং পরে পুনর্ব্বার সর্ব্বজীবের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলভোগ-নির্ব্বাহের জন্য মহেশ্বরের সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা জন্মে। "ন্যায়কন্দলী-কার" শ্রীধরাচার্য্য সেখানে প্রশস্তপাদের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, পরমেশ্বরের কিছুমাত্র স্বার্থ না থাকিলেও, তিনি পরার্থেই সৃষ্টি করেন, তিনি জীবগণের কর্ম্মফল ভোগ-নির্ব্বাহের জন্যই বিশ্বসৃষ্টি করেন। তিনি করুণাবশতঃ সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেও, কেবল সুখময়ী সৃষ্টি করিতে পারেন না। কারণ, তিনি জীবগণের বিচিত্র ধর্ম্মাধর্ম্মসাপেক্ষ হইয়াই সৃষ্টি করেন। পরমেশ্বর যে জীবগণের অধর্ম্মসমূহে অধিষ্ঠান করতঃ দুঃখের সৃষ্টি করেন, ইহাতে তাঁহার কারুণিকত্বেরও হানি হয় না। পরন্তু তাহাতে তাঁহার জীবগণের প্রতি করুণারই পরিচয় পাওয়া যায়। কারণ, দুঃখভোগ ব্যতীত জীবের বৈরাগ্য জন্মিতে পারে না। সুতরাং পরমেশ্বরের দুঃখসৃষ্টি অধিকারি-বিশেষের বৈরাগ্যজনন দ্বারা মোক্ষলাভের সহায় হওয়ায়, উহা তাঁহার জীবের প্রতি করুণারই পরিচায়ক বলা যাইতে পারে। বস্তুতঃ জীবগণ অনাদিকাল হইতে অনাদিকর্ম্মফল-ধর্ম্মাধর্ম্মজন্য পুনঃ পুনঃ বিচিত্র শরীর পরিগ্রহ করিয়া বিচিত্র সুখ-দুঃখ ভোগ করিতেছে। অনাদি পরমেশ্বরও জীবগণের অনাদি কর্ম্ম-ফলভোগ নির্ব্বাহের জন্য অনাদিকাল হইতে বিচিত্র সৃষ্টি করিতেছেন। পরমেশ্বর অনাদি এবং সমস্ত জীবাত্মা ও তাহাদিগের সংসার ও কর্ম্মফল—ধর্ম্মাধর্ম্মও অনাদি। জীবাত্মার ধর্ম্মের ফল সুখ, এবং অধর্ম্মের ফল দুঃখ। জীবগণ অনাদিকাল হইতে ঐ ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল সুখদুঃখ ভোগ করিতেছে এবং শরীরবিশেষ পরিগ্রহ করিয়া শুভাশুভ নানাবিধ কর্ম্মও করিতেছে। তাহার ফলে শরীরবিশেষ লাভ করতঃ মোক্ষলাভে অধিকারী হইয়া, মোক্ষলাভের উপায়ের অনুষ্ঠান করিলে, চিরকালের জন্য দুঃখবিমুক্ত হইবে। বৈরাগ্য ব্যতীত মোক্ষলাভে অধিকারী হওয়া যায় না। সুতরাং সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত নানাবিধ অসংখ্য দুঃখভোগ সম্পাদন করিয়া জীবের বৈরাগ্য-সম্পাদনের জন্য পরমকারুণিক পরমেশ্বর জীবের প্রতি অনুগ্রহ করিয়াই বিশ্বসৃষ্টি করেন, ইহা অবশ্যই বলা যাইতে পারে।

ঈশ্বর কিসের জন্য সৃষ্টি করেন ? তিনি আপ্তকাম, তাঁহার কোন দুঃখ নাই, সুতরাং তাঁহার হেয় ও উপাদেয় কিছু না থাকায়, তাঁহার সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্তি হইতে পারে না। এই পূর্ব্ব-পক্ষের অবতারণা করিয়া "ন্যায়বার্ত্তিকে" উদ্দ্যোতকর প্রথমে বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর ক্রীড়ার জন্য জগতের সৃষ্টি করেন, ইহা এক সম্প্রদায় বলেন এবং ঈশ্বর বিভূতি-খ্যাপনের জন্য জগতের সৃষ্টি করেন, ইহা অপর সম্প্রদায় বলেন। কিন্তু এই উভয় মতই অযুক্ত। কারণ, যাঁহারা ক্রীড়া ব্যতীত আনন্দলাভ করেন না, তাঁহারাই ক্রীড়ার জন্য আনন্দ ভোগ করিতে ক্রীড়া করিয়া থাকেন। যাঁহাদিগের দুঃখ আছে, তাঁহারাই সুখভোগের জন্য ক্রীড়া করেন। কিন্তু পরমেশ্বরের কোন দুঃখ না থাকায়, তিনি সুখের জন্য ক্রীড়া

করিতে পারেন না। তিনি কোন প্রয়োজন ব্যতীতই ক্রীড়া করেন, ইহাও বলা যাইতে পারে না। কারণ, একেবারে প্রয়োজনশূন্য ক্রীড়া হইতে পারে না। এইরূপ বিভূতি-খ্যাপনের জন্যই ঈশ্বর সৃষ্টি করেন, ইহাও বলা যায় না। কারণ, বিভূতি-খ্যাপন করিয়া ঈশ্বরের কোনই উৎকর্ষলাভ হয় না। বিভূতি-খ্যাপন না করিলেও, তাঁহার কোন অপকর্ষ বা ন্যূনতা হয় না। সুতরাং তিনি বিভূতি-খ্যাপনের জন্য কেন প্রবৃত্ত হইবেন? ফলকথা, বিভূতি-খ্যাপনও কোন প্রয়োজন ব্যতীত হইতে পারে না। আপ্তকাম পরমেশ্বরের যখন কিছুমাত্র স্বার্থ বা প্রয়োজন নাই, তখন তিনি বিভূতি-খ্যাপনের জন্যও সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। তবে ঈশ্বর সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হন কেন? উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন, "তৎস্বাভাব্যাৎ প্রবর্ত্তত ইত্যদুষ্টং"। অর্থাৎ ঈশ্বর ঐ প্রবৃত্তি-স্বভাবসম্পন্ন বলিয়াই সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হন, এই পক্ষ নির্দ্দোষ। যেমন ভূমি প্রভৃতি ধারণাদি-ক্রিয়া-স্বভাবসম্পন্ন বলিয়াই, ধারণাদি ক্রিয়া করে, তদ্রূপ ঈশ্বরও প্রবৃত্তিস্বভাব-সম্পন্ন বলিয়াই প্রবৃত্ত হন। প্রবৃত্তি তাঁহার স্বভাব— স্বভাবের উপরে কোন অনুযোগ করা যায় না। ফলকথা, উদ্দ্যোতকরের মতে ঈশ্বরের সৃষ্টিকার্য্যে কিছুই প্রয়োজন নাই। সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্তি তাঁহার স্বভাব বলিয়াই, তিনি সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হন। যদি বল, প্রবৃত্তি তাঁহার স্বভাব হইলে, কখনই তাঁহার নিবৃত্তি হইতে পারে না, সতত প্রবৃত্তিই হইতে পারে। তাহা হইলে ক্রমিক সৃষ্টির উপপত্তি হয় না; অর্থাৎ সর্ব্বদাই সৃষ্টি হইতে পারে। কারণ, প্রবৃত্তি-স্বভাবসম্পন্ন সৃষ্টিকর্ত্তা পরমেশ্বর সতত একরূপই আছেন। একরূপ কারণ হইতে কার্য্যভেদও হইতে পারে না। উদ্দ্যোতকর এই পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিয়া এতদুত্তরে বলিয়াছেন যে, ঈশ্বর সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত প্রবৃত্তিস্বভাবসম্পন্ন প্রকৃতির ন্যায় জড়পদার্থ নহেন, তিনি প্রবৃত্তিস্বভাব সম্পন্ন হইলেও, বুদ্ধিমান্ অর্থাৎ চেতনপদার্থ। সুতরাং তিনি তাঁহার কার্য্যে কারণান্তরসাপেক্ষ হওয়ায়, সতত প্রবৃত্ত হন না। অর্থাৎ তিনি প্রবৃত্তিস্বভাবসম্পন্ন হইলেও, একই সময়ে সকল কার্য্যের সৃষ্টি করেন না। যখন যে কার্য্যে তাঁহার অপেক্ষিত সহকারী কারণগুলি উপস্থিত হয়, তখন তিনি সেই কার্য্য উৎপাদন করেন। সকল কার্য্যের সমস্ত কারণ যুগপৎ উপস্থিত হয় না, তাই যুগপৎ সকল কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। সৃষ্টিকার্য্যে জীবের ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট-সমষ্টি ও উহার ফলভোগকাল প্রভৃতি অনেক কারণই অপেক্ষিত, সুতরাং ঐ সমস্ত কারণ যুগপৎ সম্ভব না হওয়ায়, যুগপৎ সকল কার্য্য জন্মিতে পারে না। "ন্যায়মঞ্জরী"কার জয়ন্ত ভট্টও প্রথমকল্পে বলিয়াছেন যে, পরমেশ্বরের স্বভাবই এই যে, তিনি কোন সময়ে বিশ্বের সৃষ্টি করেন, এবং কোন সময়ে বিশ্বের সংহার করেন। কালবিশেষে উদয় ও কাল-বিশেষে অস্তগমন যেমন সূর্য্যদেবের স্বভাব, এবং উহা জীবগণের কর্ম্মসাপেক্ষ, তদ্রূপ কাল-বিশেষে বিশ্বের সৃষ্টি ও কালবিশেষে বিশ্বের সংহার করাও পরমেশ্বরের স্বভাব এবং তাঁহার ঐ স্বভাবও জীবগণের কর্ম্মসাপেক্ষ। সুতরাং পরমেশ্বরের ঐরূপ স্বভাবের মূল কি? এইরূপ প্রশ্নও নিরুত্তর নহে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের পরমগুরু অদ্বৈতমতাচার্য্য ভগবান্ গৌড়পাদ

স্বামীও "মাণ্ডূক্য-কারিকা"য় বলিয়াছেন যে,[১] এক সম্প্রদায় বলেন, ঈশ্বর ভোগের জন্য সৃষ্টি করেন, অপর সম্প্রদায় বলেন, ঈশ্বর ক্রীড়ার জন্য সৃষ্টি করেন। কিন্তু ইহা ঈশ্বরের স্বভাব; কারণ, তিনি আপ্তকাম, সুতরাং তাঁহার কোন স্পৃহা থাকিতে পারে না। ফলকথা, গৌড়পাদও স্পৃহা ব্যতীত ভোগ ও ক্রীড়া অসম্ভব বলিয়া জগৎসৃষ্টিকে ঈশ্বরের স্বভাবই বলিয়াছেন। কিন্তু উদ্দ্যোতকরের মতে সৃষ্টিপ্রবৃত্তিই ঈশ্বরের স্বভাব। ঈশ্বর সেই স্বভাববশতঃই জগৎ সৃষ্টি করেন। সৃষ্টিকার্য্যে তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই। গৌড়পাদ প্রভৃতি বৈদান্তিকগণের মতেও সৃষ্টিকার্য্যে ঈশ্বরের কোন প্রয়োজন নাই। ঈশ্বর স্বার্থে অথবা পরার্থেও জগৎ সৃষ্টি করেন না। কিন্তু সৃষ্টি তাঁহার স্বভাব। বিবর্ত্তবাদি-গৌড়পাদের মতে ঐ "স্বভাব" তাঁহার সম্মত মায়াই বুঝা যায়।

বস্তুতঃ সৃষ্টিকার্য্যে ঈশ্বরের কোনরূপ প্রয়োজনই সম্ভব হয় না বলিয়া, তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন, এইরূপ মতও সুপ্রাচীন কাল হইতেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সুতরাং সুপ্রাচীন কাল হইতেই ঐ মতের সমর্থন ও নানা প্রকারে উহার খণ্ডনও হইয়াছে। তাই বেদান্তদর্শনে ভগবান্ বাদরায়ণও "ন প্রয়োজনবত্ত্বাৎ"—(২।১।৩২) এই সূত্রের দ্বারা ঐ মতকে পূর্ব্বপক্ষরূপে সমর্থন করিয়া, "লোকবত্তু লীলা-কৈবল্যং" (২।১।৩৩) এই সূত্রের দ্বারা উহার পরিহার করিয়াছেন। বাদরায়ণের ঐ সূত্রের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন যে, যদিও এই বিশ্বসৃষ্টি আমাদিগের পক্ষে অতি গুরুতর ব্যাপার বা অসাধ্য ব্যাপারের ন্যায়ই মনে হয়, তথাপি পরমেশ্বর অপরিমিতশক্তি বলিয়া, ইহা তাঁহার কেবল লীলা মাত্র। তাৎপর্য্য এই যে, তিনি অনায়াসেই স্বেচ্ছামাত্রেই জগতের সৃষ্টি করেন। সুতরাং ইহাতে তাঁহার কোন প্রয়োজনের অপেক্ষা নাই। কারণ, কষ্টসাধ্য কার্য্যই কেহ প্রয়োজন ব্যতীত করেন না। কিন্তু যাঁহার যে কার্য্যে কিছুমাত্র কষ্ট বা পরিশ্রম নাই, এমন অনেক কার্য্য অনেক সময়ে অনেকে প্রয়োজন ব্যতীতও করিয়া থাকেন। "ভামতী"কার বাচস্পতি মিশ্র প্রথমে এই তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, যদি বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের কোন কার্য্যই নিষ্প্রয়োজন না হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরের সৃষ্টিকার্য্যে কোন প্রয়োজন সম্ভব না হওয়ায়, তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা নহেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত বলা যাইতে পারে। কিন্তু কোন প্রয়োজনের অনুসন্ধান ব্যতীতও অনেক সময়ে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের যাদৃচ্ছিক অনেক ক্রিয়াতে প্রবৃত্তি দেখা যায়। সুতরাং জগতে নিষ্প্রয়োজন কার্য্যও আছে, ইহা স্বীকার্য্য। অন্যথা 'ধর্ম্মসূত্র"কারদিগের "ন কুর্ব্বীত বৃথা চেষ্টাং" অর্থাৎ বৃথা চেষ্টা করিবে না, এই নিষেধ নির্ব্বিষয় হইয়া পড়ে। কারণ, বৃথা চেষ্টা অর্থাৎ প্রয়োজনশূন্য ক্রিয়া যদি অলীকই হয়, তাহা হইলে উক্ত ধর্ম্মসূত্রে তাহার নিষেধ হইতে পারে না। এখানে বৈদান্তিকচূড়ামণি মহামনীষী অপ্যয়দীক্ষিত "বেদান্তকল্পতরু"র "পরিমল" টীকায় বলিয়াছেন যে, কাহারও সুখ হইলে, ঐ সুখের অনুভবপ্রযুক্ত নিষ্প্রয়োজন

১। ভোগার্থং সৃষ্টিরিত্যন্যে ক্রীড়ার্থমিতি চাপরে।
দেবস্যৈষ স্বভাবোহয়মাপ্তকামস্য কা স্পৃহা। —মাণ্ডূক্য-কারিকা। ১।৯।

হাস্য ও গানাদিরূপ ক্রিয়া দেখা যায়। সেখানে তাহার ঐ হাস্যাদি ক্রিয়ায় কিছুমাত্র প্রয়োজন সম্ভাবনা করা যায় না। দুঃখের উদ্রেক হইলে যেমন কোন প্রয়োজন উদ্দেশ্য না করিয়াও রোদন করে, তদ্রূপ সুখের উদ্রেক হইলেও, কোন প্রয়োজন উদ্দেশ্য না করিয়াই যে হাস্য-গানাদি করে, ইহা সর্ব্বানুভবসিদ্ধ। এইজন্য ঐ হাস্য-রোদনাদি ক্রিয়ায় লোকে কারণই জিজ্ঞাসা করে, প্রয়োজন জিজ্ঞাসা করে না। অর্থাৎ কারণ ও প্রয়োজন সর্ব্বত্র এক পদার্থ নহে। ঈশ্বরের জগৎসৃষ্টির কারণ আছে, কিন্তু প্রয়োজন নাই। অপ্যয়দীক্ষিত শেষে ইহাও বলিয়াছেন যে, যে ক্রীড়া বা লীলাবিশেষের প্রয়োজন, তাৎকালিক আনন্দ, সেই লীলা-বিশেষরূপ ক্রীড়াই "ক্রীড়ার্থং সৃষ্টিরিত্যন্যে" ইত্যাদি[১] শ্রুতিবাক্যের দ্বারা কথিত হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত হাস্য ও গানাদির ন্যায় প্রয়োজনশূন্য যে "লীলা" বেদান্তসূত্রে কথিত হইয়াছে, তাহা ঐ শ্রুতিতে "ক্রীড়া" শব্দের দ্বারা গৃহীত হয় নাই। অর্থাৎ বেদান্তসূত্রোক্ত "লীলা" ও পূর্ব্বোক্ত "ক্রীড়ার্থং সৃষ্টিরিত্যন্যে" এই শ্রুতিবাক্যোক্ত "ক্রীড়া" একপদার্থ নহে। কারণ, ঐ ক্রীড়ার প্রয়োজন তাৎকালিক আনন্দ,—কিন্তু বেদান্তসূত্রে ঈশ্বরের সৃষ্টিকে যে তাঁহার লীলা বলা হইয়াছে, ঐ লীলার কোন প্রয়োজন নাই। সুতরাং উক্ত শ্রুতি ও বেদান্তসূত্রে কোন বিরোধ নাই। পূর্ব্বোক্ত বেদান্তসূত্রের ভাষ্যে মধ্বাচার্য্যও বাদরায়ণের এইরূপ তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে,[২] যেমন লোকে মত্ত ব্যক্তির সুখের উদ্রেকবশতঃই কোন প্রয়োজনের অপেক্ষা না করিয়াই, নৃত্যগীতাদি লীলা হয়, ঈশ্বরেরও এইরূপই সৃষ্ট্যাদি ক্রিয়ারূপ লীলা হয়। মধ্বাচার্য্য ইহা অন্য প্রমাণের দ্বারা সমর্থন করিতে "নারায়ণ-সংহিতা"র যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তদ্দ্বারাও পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তই স্পষ্ট বুঝা যায়। "ভগবৎ-সন্দর্ভে" শ্রীজীব গোস্বামীও মধ্বাচার্য্যের উক্ত ব্যাখ্যার উল্লেখপূর্ব্বক সমর্থন করিয়াছেন। সৃষ্ট্যাদি-কার্য্য যে, ভগবানের লীলা, চেতন ও অচেতন—সর্ব্ববিধ সমস্ত বস্তুই পরব্রহ্মের সেই লীলার উপকরণ, ইহা শ্রীভাষ্যে আচার্য্য

১। "ক্রীড়ার্থং সৃষ্টিরিত্যন্যে ভোগার্থমিতি চাপরে। দেবস্যৈষ স্বভাবোঽয়মাপ্তকামস্য কা স্পৃহা॥"—এই শ্লোক অপ্যয়দীক্ষিত মাণ্ডুক্য উপনিষৎ বলিয়াই উল্লেখ করিয়া বেদান্তসূত্রের সহিত উক্ত শ্রুতিবিরোধের পরিহার করিয়াছেন। মধ্বাচার্য্যও উক্ত বেদান্তসূত্রের ভাষ্যে এবং "ভগবৎ-সন্দর্ভে" শ্রীজীব গোস্বামীও "দেবস্যৈব (ষ) স্বভাবোঽয়মাপ্তকামস্য কা স্পৃহা"—এই বচন শ্রুতি বলিয়াই উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং কোন মাণ্ডুক্য উপনিষদের মধ্যে ঐরূপ শ্রুতি তাঁহারা পাইয়াছিলেন,ইহা বুঝা যায়। কিন্তু প্রচলিত মাণ্ডুক্য উপনিষদের মধ্যে ঐরূপ শ্রুতি পাওয়া যায় না। প্রচলিত "মাণ্ডুক্য-কারিকা" গৌড়পাদ-বিরচিত গ্রন্থ বলিয়াই প্রসিদ্ধ। তন্মধ্যে "ভোগার্থং সৃষ্টিরিত্যন্যে"—ইত্যাদি কারিকা পাওয়া যায়। সুধীগণ ইহার মূলানুসন্ধান করিবেন।

২। কিন্তু যথা লোকে মত্তস্য সুখোদ্রেকাদেব নৃত্যগানাদিলীলা, ন তু প্রয়োজনাপেক্ষয়া, এবমেবেশ্বরস্য। নারায়ণসংহিতায়াঞ্চ—"সৃষ্ট্যাদিকং হরির্নৈব প্রয়োজনমপেক্ষ্য তু। কুরুতে কেবলানন্দাদ্যথা মত্তস্য নর্ত্তনং॥ পূর্ণানন্দস্য তস্যেহ প্রয়োজনমতিঃ কুতঃ। মুক্তা অপ্যাপ্তকামাঃ স্যুঃ কিমুতাস্যাখিলাত্মনঃ॥"—ইতি, "দেবস্যৈষ স্বভাবোঽয়মাপ্তকামস্য কা স্পৃহেতি শ্রুতিঃ।"—মধ্বভাষ্য।

রামানুজও বলিয়াছেন [১] এবং ঋষি-বাক্যের দ্বারাও উহা সমর্থন করিয়াছেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য শেষে তাঁহার নিজ সিদ্ধান্তানুসারে পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের প্রকৃত পরিহার প্রকাশ করিতে ইহাও বলিয়াছেন যে, ঈশ্বরের সৃষ্টিপ্রতিপাদক যে সমস্ত শ্রুতি আছে, তাহা পরমার্থ-বিষয় নহে। কারণ, ঐ সমস্ত শ্রুতি অবিদ্যাকল্পিত নামরূপব্যবহার-বিষয়ক, এবং ব্রহ্মাত্মভাবপ্রতিপাদনেই উহার তাৎপর্য্য, ইহাও বিস্মৃত হইবে না। তাৎপর্য্য এই যে, পরমেশ্বর হইতে জগতের সত্য সৃষ্টি হয় নাই। অবিদ্যাবশতঃ রজ্জুতে সর্পের মিথ্যাসৃষ্টির ন্যায় ব্রহ্মে এই জগতের মিথ্যাসৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং ঈশ্বরের সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন কি? এইরূপ প্রশ্নই হইতে পারে না। কারণ, যে অনাদি অবিদ্যা এই মিথ্যাসৃষ্টির মূল, উহা স্বভাবতঃই কার্য্যোন্মুখী, উহা নিজ কার্য্যে কোন প্রয়োজন অপেক্ষা করে না। অবিদ্যাবশতঃ রজ্জুতে যে সর্পের মিথ্যাসৃষ্টি হয়, এবং তজ্জন্য তখন ভয়-কম্পাদি জন্মে, তাহা যে কোনই প্রয়োজনকে অপেক্ষা করে না, ইহা সর্ব্বানুভবসিদ্ধ। "ভামতী"কার বাচস্পতি মিশ্র ইহা দৃষ্টান্তাদির দ্বারা সম্যক্ বুঝাইয়াছেন। অবশ্য সৃষ্টি অসত্য হইলে, তাহাতে কোনরূপ প্রয়োজনের অপেক্ষা না থাকায়, ঐ মতে পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের এবং ঈশ্বরের বৈষম্য ও নৈর্ঘৃণ্য দোষের আপত্তির সর্ব্বোত্তম খণ্ডন হয়, ইহা সত্য, কিন্তু বেদান্তসূত্রকার ভগবান্ বাদরায়ণের "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যং" এবং "বৈষম্য-নৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাত্তথাহি দর্শয়তি"— ইত্যাদি অনেক সূত্রের দ্বারা যে, সৃষ্টির সত্যতাই স্পষ্ট বুঝা যায়, ইহাও চিন্তনীয়। "ভামতী"কার শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্র ইহা চিন্তা করিয়া লিখিয়াছেন যে, সৃষ্টির সত্যতা স্বীকার করিয়াই অর্থাৎ সেই পক্ষেই বাদরায়ণ পূর্ব্বোক্ত যুক্তি বলিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার নিজমতে সৃষ্টি সত্য নহে। কিন্তু যদি সৃষ্টির অসত্যতাই বাদরায়ণের নিজের প্রকৃত মত হয়, তাহা হইলে তিনি সেখানে নিজমতানুসারে পৃথক্ সূত্রের দ্বারা শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের প্রকৃত পরিহার বা চরম উত্তর কেন বলেন নাই, ইহাও চিন্তনীয়। তিনি সেখানে নিজের মত প্রকাশ না করিয়া তাঁহার বিপরীত মত (সৃষ্টির সত্যতা) স্বীকার করিয়াই, তাঁহার কথিত পূর্ব্বপক্ষের পরিহার করিলে, তাঁহার নিজের মূলসিদ্ধান্তে যে অপরের সংশয় বা ভ্রম জন্মিতে পারে, ইহাও ত তাঁহার অজ্ঞাত নহে। আচার্য্য রামানুজ প্রভৃতি আর কোন ভাষ্যকারই বেদান্তসূত্রের দ্বারা সৃষ্টির অসত্যতা (বিবর্ত্তবাদ) বুঝেন নাই। পরন্তু "উপসংহারদর্শনান্নেতি চেন্ন ক্ষীরবদ্ধি" (২।১ ২৪) ইত্যাদি অনেক সূত্রের দ্বারা তাঁহারা পরিণামবাদেই বাদরায়ণের তাৎপর্য্য বুঝিয়াছেন। পূর্ব্বে তাহা বলিয়াছি। সে যাহাই হউক, পূর্ব্বোক্ত বেদান্ত

১। সর্ব্বাণি চিদচিদ্বস্তুনি সূক্ষ্মদশাপন্নানি স্থূলদশাপন্নানি চ পরস্য ব্রহ্মণো লীলোপকরণানি, সৃষ্ট্যাদয়শ্চ লীলেতি ভগবদ্দ্বৈপায়নপরাশরাদিভিরুক্তং। "অব্যক্তাদিবিশেষান্তং পরিণামর্দ্ধিসংযুতং। ক্রীড়া হরেরিদং সর্ব্বং ক্ষরমিত্যুপধার্য্যতাং॥" "ক্রীড়তো বালকস্যেব চেষ্টাং তস্য নিশাময়" ।—(বিষ্ণুপুরাণ, ১।২।১৮) "বালঃ ক্রীড়নকৈরিব" —(বায়ুপুরাণ, উত্তর, ৩৬।৯৬) ইত্যাদিভিঃ। বক্ষ্যতি চ "লোকবত্তু লীলাকৈবল্য"মিতি ।—বেদান্ত-দর্শন, ১মঅ০. ৪র্থ পা০, ২৭শ সূত্রের শ্রীভাষ্য।

সূত্রানুসারে বৈদান্তিক-সম্প্রদায় ঈশ্বরের সৃষ্টি ও সংহার-ক্রিয়ার কোনরূপ প্রয়োজন নাই, এই সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়াছেন। এবং উক্ত বিষয়ে উহাই প্রাচীন মত বলিয়া বুঝা যায়। এই মতে ক্রিয়া বা প্রবৃত্তিমাত্রই সপ্রয়োজন নহে। প্রয়োজন ব্যতীতও অনেক সময়ে অনেক ক্রিয়া বা প্রবৃত্তি হইয়া থাকে ও হইতে পারে। বাচস্পতি মিশ্র "ভামতী" টীকায় ইহা সমর্থন করিয়া, পূর্ব্বোক্ত বেদান্তসূত্রের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি "তাৎপর্য্যটীকা"য় এখানে ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের "আপ্তকল্পশ্চায়ং" এই বাক্যের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে ঈশ্বর যে, জীবের প্রতি করুণাবশতঃ অর্থাৎ পরার্থেই সৃষ্ট্যাদি করেন, এই মতই সমর্থন করিয়াছেন। ইহার গূঢ় কারণ এই যে, ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের মতে নিষ্প্রয়োজন কোন কর্ম্ম নাই। সর্ব্বকর্ম্মই সপ্রয়োজন, এই মতই তিনি পূর্ব্বে সমর্থন করিয়াছেন (১ম খণ্ড, ৩৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

বস্তুতঃ কোন প্রয়োজন ব্যতীত কাহারও যে, কোন কর্ম্মে প্রবৃত্তি হয় না (প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে)—এই মতও প্রাচীনকাল হইতে সমর্থিত হইয়াছে। ভট্টকুমারিল প্রভৃতি যুক্তিনিপুণ মীমাংসকগণও ঐ মতই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং ঈশ্বরকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিতে হইলে, পূর্ব্বোক্ত মতানুসারে তিনি যে, পরার্থেই সৃষ্টি করেন, ইহাই বলিতে হইবে। পরন্তু সুধীগণের বিবেচনার জন্য এখানে ইহাও বক্তব্য এই যে, সৃষ্টি ও সংহারের ন্যায় ঈশ্বরের সমস্ত কর্ম্মই ত তাঁহার লীলা, সমস্ত কর্ম্মই ত তিনি অনায়াসেই করিতেছেন। সুতরাং লীলা বলিয়া যদি তাঁহার সৃষ্টি ও সংহারকে নিষ্প্রয়োজন বলিয়া সমর্থন করা যায়, তাহা হইলে তাঁহার অন্যান্য সমস্ত কর্ম্মও নিষ্প্রয়োজন বলা যাইতে পারে। কিন্তু ভগবদ্গীতার তৃতীয় অধ্যায়ে "ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং" ইত্যাদি (২২) শ্লোকের দ্বারা ব্যাসদেব ঈশ্বর যে মানবের মঙ্গলের জন্যই কর্ম্ম করেন, ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন। যোগদর্শন-ভাষ্যেও (সমাধিপাদ, ২৫শ সূত্রভাষ্যে) ঈশ্বরের নিজের প্রয়োজন না থাকিলেও, ভূতানুগ্রহই প্রয়োজন, ইহা কথিত হইয়াছে। সমস্তই ঈশ্বরের লীলা বলিয়া উহার কোন প্রয়োজন নাই, ইহা বলিতে পারিলে, ঐরূপ প্রয়োজন-বর্ণনের কোনই প্রয়োজন থাকে না। সুতরাং শাস্ত্রে যে স্থানে ঈশ্বরের সৃষ্ট্যাদি-কার্য্যে প্রয়োজনের অপেক্ষা নাই, ইহা বলা হইয়াছে, সেখানে ঈশ্বরের নিজের কোন স্বার্থ নাই, এইরূপ তাৎপর্য্যও আমরা বুঝিতে পারি। "আপ্তকামস্ত কা স্পৃহা" এই বাক্যের দ্বারাও আপ্তকামত্ববশতঃ তাঁহার নিজের কোন স্বার্থ না থাকায়, তদ্বিষয়ে স্পৃহা হইতে পারে না, এইরূপ তাৎপর্য্যই বুঝা যায়। ঈশ্বর পরার্থেও সৃষ্টি করেন নাই, তাঁহার পরার্থবিষয়েও স্পৃহা নাই—ইহা ঐ বাক্যের দ্বারা বুঝা যায় না। কারণ, করুণাময় পরমেশ্বরের নিত্যসিদ্ধ করুণাই তাঁহার পরার্থে স্পৃহা, তাহা ত অস্বীকার করা যাইবে না। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবানের অবতারের যে প্রয়োজন বর্ণিত হইয়াছে [১], তাহার ব্যাখ্যায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার "ষট্সন্দর্ভে"র অন্তর্গত "ভগবৎ-সন্দর্ভে"

১। তথায়ঞ্চাবতারস্তে ভুবো ভারজিহীর্ষয়া।
স্বানাঞ্চানন্যভাবানামনুধ্যানায় চাসকৃৎ ॥—ভাগবত, ১।৭।২৫ (এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় "ভগবৎসন্দর্ভ" দ্রষ্টব্য)।

ভক্তগণের ভজন সুখকে ভগবদবতারের প্রয়োজন বলিয়া সমর্থন করিতে ভগবানের করুণাগুণের সমর্থন করিয়াছেন। তিনি সেখানে মধ্বভাষ্যে উদ্ধৃত পূর্ব্বোক্ত বচনের "পূর্ণানন্দস্য তস্যেহ প্রয়োজনমতিঃ কুতঃ" এই অংশ উদ্ধৃত করিয়া পরমেশ্বরের প্রয়োজনান্তর-বুদ্ধি নাই, ইহাই শেষে বলিয়াছেন। মূলকথা, ঈশ্বর অন্যান্য কার্য্যের ন্যায় সৃষ্ট্যাদি কার্য্যও যে পরার্থেই করেন, এই মতও সহসা শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া উপেক্ষা করা যায় না। "ন প্রয়োজনবত্ত্বাৎ" ইত্যাদি বেদান্তসূত্রেরও এই মতানুসারে ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে [১]।

আপত্তি হইতে পারে যে, ঈশ্বর জীবের প্রতি করুণাবশতঃ সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, তাঁহার দুঃখিত্ব স্বীকার করিতে হয়। কারণ, কারুণিক ব্যক্তিগণ পরের দুঃখ বুঝিয়া দুঃখী হইয়াই পরার্থে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, ইহাই দেখা যায়। কিন্তু ঈশ্বরের দুঃখ স্বীকার করিলে, তাঁহার ঈশ্বরত্ব থাকে না। স্বার্থপ্রযুক্ত ঈশ্বর পরার্থে প্রবৃত্ত হন, ইহা বলিলেও, স্বার্থবত্তাবশতঃ তাঁহার ঈশ্বরত্ব থাকে না। ঈশ্বর জীবের পূর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ম্মানুসারেই ঐ কর্ম্মফলভোগ-সম্পাদনের জন্য পরার্থেই সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হন, এই সিদ্ধান্তেও অন্যোন্যাশ্রয়-দোষ হয়। কারণ, জীবের কর্ম্মব্যতীত সৃষ্টি হইতে পারে না, আবার সৃষ্টি ব্যতীতও কর্ম্ম

১। বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথমপাদে "ন প্রয়োজনবত্ত্বাৎ" (৩২)—এই সূত্রকে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি পূর্ব্বপক্ষসূত্ররূপে গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বপক্ষ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, চেতন ঈশ্বরের জগৎকর্তৃত্ব সম্ভব হয় না। কারণ, প্রবৃত্তিমাত্রই সপ্রয়োজন। ঈশ্বরের প্রবৃত্তির কোন প্রয়োজন সম্ভব না হওয়ায়, তাঁহার প্রবৃত্তি নাই। শঙ্করাচার্য্য ঐ সূত্রে "প্রবৃত্তীনাং" এই পদের অধ্যাহার করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত সূত্রকে সিদ্ধান্ত-সূত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়া সূত্রকারের বুদ্ধিস্থ পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডনপক্ষে ঐ সূত্রের দ্বারা ইহাও সরলভাবে বুঝা যাইতে পারে যে, প্রয়োজনাভাববশতঃ ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্তৃত্ব নাই, ইহা বলা যায় না। কেন বলা যায় না? তাই বলিয়াছেন—"প্রয়োজনবত্ত্বাৎ" অর্থাৎ সৃষ্টিকার্য্যে ঈশ্বরের প্রশস্ত প্রয়োজন আছে। স্বার্থ ও পরার্থের মধ্যে পরার্থই অর্থাৎ জীবের প্রতি অনুগ্রহই প্রশস্ত প্রয়োজন। তাই সূত্রকার ঐ প্রশস্ত প্রয়োজন-বোধের জন্য প্রয়োজন না বলিয়া, "প্রয়োজনবত্ত্ব" বলিয়াছেন। ইহার পরবর্ত্তী দুই সূত্রে "ঈশ্বরস্য" এই পদের অধ্যাহার সকল ব্যাখ্যাতেই কর্ত্তব্য, তাহা হইলে "ন প্রয়োজনবত্ত্বাৎ" এই প্রথম সূত্রেও "ঈশ্বরস্য" এই পদের অধ্যাহারই সূত্রকারের বুদ্ধিস্থ বলিয়া বুঝা যায়। আপত্তি হইতে পারে যে, স্বার্থব্যতীত ঈশ্বরের পরার্থেও প্রবৃত্তি হইতে পারে না। তাই আবার দ্বিতীয় সূত্র বলা হইয়াছে, "লোকবত্তু লীলাকৈবল্যং"। অর্থাৎ লোকে ব্যক্তি-বিশেষের স্বার্থব্যতীতও পরার্থে প্রবৃত্তি দেখা যায়। পরন্তু ঈশ্বরের সম্বন্ধে এই সৃষ্টি কেবল লীলামাত্র, অর্থাৎ তিনি অনায়াসেই এই সৃষ্টি করেন। সুতরাং ইহাতে তাঁহার স্বার্থ না থাকিলেও, পরার্থে প্রবৃত্তি হইতে পারে। ইহাতেও আপত্তি হইবে যে, ঈশ্বর পরার্থে সৃষ্টি ও সংহার করিলেও, তাঁহার বৈষম্য ও নির্দ্দয়তা দোষ হয়, এজন্য আবার তৃতীয় সূত্র বলিয়াছেন,—"বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি"—অর্থাৎ সৃষ্টি-সংহার-কার্য্যে ঈশ্বর সর্ব্বজীবের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল ধর্ম্মাধর্ম্মসাপেক্ষ বলিয়া, তাঁহার বৈষম্য ও নির্দ্দয়তা দোষ হয় না। বেদান্তদর্শনের পূর্ব্বোক্ত তিন সূত্রের এইভাবে ব্যাখ্যা করিয়া ঈশ্বর পরার্থেই সৃষ্টি করিয়াছেন, এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করা যায় কিনা, তাহা সুধীগণ উপেক্ষা না করিয়া বিচার করিবেন। "ন প্রয়োজনবত্ত্বাৎ"—এই সূত্রটি পূর্ব্বপক্ষসূত্র না হইলেও, কোন ক্ষতি নাই। বেদান্তদর্শনে ন্যায়দর্শনের ন্যায় অনেকস্থলে পূর্ব্বপক্ষসূত্র না বলিয়াও, সিদ্ধান্তসূত্র বলা হইয়াছে। যথা,—"ঈক্ষতের্নাশব্দং" (১।১।৫) ইত্যাদি

হইতে পারে না। জীবের সংসারের অনাদিত্ব স্বীকার করিতে গেলেও, অন্ধপরম্পরা-দোষবশতঃ অন্যোন্যাশ্রয়দোষ অনিবার্য্য। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য পরে বেদান্তদর্শনের "পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ" (২।২।৩৭)—এই সূত্রের ভাষ্যে ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত-কারণ মাত্র, এই মতে অসামঞ্জস্য বুঝাইতে পূর্ব্বোক্তরূপ দোষ বলিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে বক্তব্য এই যে, ঈশ্বর করুণাময় হইলেও, তাঁহার দুঃখের কারণ দুরদৃষ্ট না থাকায়, তাঁহার দুঃখ হইতে পারে না। তিনি কারুণিক অজ্ঞ মানবাদির ন্যায় দুঃখী হইয়া পরার্থে প্রবৃত্ত হন না। কারুণিক হইলেই যে, পরের দুঃখ বুঝিয়া সকলেই দুঃখী হইবেন, এইরূপ নিয়ম স্বীকার করা যায় না। তাহা হইলে ঈশ্বরের দুঃখ সকলেরই স্বীকার্য্য হওয়ায়, তাঁহার ঈশ্বরত্ব কেহই বলিতে পারেন না। কারণ, ঈশ্বর স্বীকার করিতে হইলে, তাঁহাকে সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকার দুঃখশূন্য ও করুণাময় বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ ঈশ্বর পরার্থে প্রবৃত্ত হইলেও, সাধারণ মানবের ন্যায় তাঁহার কোনরূপ স্বার্থাভিসন্ধিও হইতেই পারে না। কারণ, তিনি আপ্তকাম, তাঁহার কোন স্বার্থই অপ্রাপ্ত নহে। সুতরাং এতাদৃশ অদ্বিতীয় পুরুষবিশেষের সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্তরূপ কোন আপত্তিই হইতে পারে না। পরন্তু ঈশ্বর জগতের সত্য সৃষ্টি করেন, ইহাই স্বীকার করিতে হইলে, তিনি যে জীবের পূর্ব্বকর্ম্মানুসারেই জগতের সৃষ্টি করেন, এবং জীবের সংসার বা সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদি, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। নচেৎ অন্য কোনরূপেই ঈশ্বরের এই বিষম সৃষ্টির উপপত্তি হইতেই পারে না। তাই ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও পূর্ব্বে "বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে" ইত্যাদি বেদান্তসূত্রের ভাষ্যে ঐ সিদ্ধান্ত বিশেষরূপে সমর্থন করিয়াছেন এবং উহার পরে বেদান্তসূত্রানুসারেই জীবের সংসারের অনাদিত্বও শ্রুতি ও যুক্তির দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন। পূর্ব্বে সে সকল কথা লিখিত হইয়াছে। সুতরাং সৃষ্ট্যাদিকার্য্যে ঈশ্বরের ধর্ম্মাধর্ম্ম-সাপেক্ষতা ও জীবের সংসারের অনাদিত্ব, যাহা ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও পূর্ব্বে বেদান্তসূত্রানুসারে শ্রুতি ও যুক্তির দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন, ঐ সিদ্ধান্তে অন্যোন্যাশ্রয় ও অনবস্থা প্রভৃতি প্রামাণিক বলিয়া দোষ হইতে পারে না, ইহাও প্রণিধান করা আবশ্যক। শঙ্করাচার্য্যও পূর্ব্বে বীজাঙ্কুর-ন্যায়ের উল্লেখ করিয়া, ইহা সমর্থন করিয়াছেন। ঈশ্বর জীবের পূর্ব্বকর্ম্মানুসারেই জীবকে সাধু ও অসাধু কর্ম্ম করাইতেছেন, এই সিদ্ধান্তও পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। "এষ হ্যেবৈনং সাধু-কর্ম্ম কারয়তি" ইত্যাদি শ্রুতির তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়া উক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে মধ্বাচার্য্য ঐ বিষয়ে ভবিষ্যপুরাণের একটি বচনও উদ্ধৃত করিয়াছেন[১]।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, জীবের কর্ম্মনিরপেক্ষ ঈশ্বরের জগৎকারণত্ব-মতের খণ্ডন করিয়া জীবের কর্ম্মসাপেক্ষ ঈশ্বরের জগৎকারণত্ব সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করাই মহর্ষির এই প্রকরণের উদ্দেশ্য, ইহাই আমরা বুঝিয়াছি। তাই ভাষ্যকারও সর্ব্বশেষে "স্বকৃতাভ্যাগমলোপেন চ" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা মহর্ষির এই প্রকরণের প্রতিপাদ্য ঐ সিদ্ধান্তই প্রকাশ করিয়াছেন।

১। "তস্যাপি পূর্ব্বকর্ম্মকারণমিত্যনাদিত্বাৎ কর্ম্মণঃ। ভবিষ্যপুরাণে চ—"পুণ্যপাপাদিকং বিষ্ণুঃ কারয়েৎ পূর্ব্বকর্ম্মণঃ। অনাদিত্বাৎ কর্ম্মণশ্চ ন বিরোধঃ কথঞ্চনেতি।—বেদান্তদর্শন, ২য় অঃ, ৩৫ সূত্রের মধ্বভাষ্য।

উদ্দ্যোতকরও ঐরূপ সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া, সর্ব্বশেষে তাঁহার সমর্থিত জগৎকর্ত্তা সর্ব্বনিয়ন্তা ঈশ্বরের অস্তিত্ব শাস্ত্রদ্বারাও সমর্থন করিতে মহাভারত ও মনুসংহিতার বচন[১] উদ্ধৃত করিয়াছেন। "ন্যায়কুসুমাঞ্জলি" গ্রন্থের পঞ্চম স্তবকে উদয়নাচার্য্যও উক্ত বচনদ্বয় উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র এবং ন্যায়মঞ্জরীকার জয়ন্ত ভট্ট প্রভৃতি মনীষিগণও মহাভারতের ঐ বচন ("অজ্ঞো জন্তুরনীশোঽয়ং" ইত্যাদি) উদ্ধৃত করিয়াছেন। মহামনীষী মাধবাচার্য্যও "সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে" "শৈবদর্শনে" নকুলীশ-পাশুপত-সম্প্রদায়ের মতের দোষ প্রদর্শন করিয়া জীবের কর্ম্মসাপেক্ষ ঈশ্বরের জগৎকারণত্বমত সমর্থন করিতে মহাভারতের ঐ বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু আমরা যুধিষ্ঠিরের নিকটে দুঃখিতা দ্রৌপদীর সাক্ষেপ উক্তির মধ্যে মহাভারতের বনপর্ব্বের ৩০শ অধ্যায়ে ঐ শ্লোকটি দেখিতে পাই। সেখানে দ্রৌপদী ঈশ্বরের প্রতি দোষারোপ করিয়াই নানা কথা বলিয়াছেন, ইহাই বর্ণিত হইয়াছে। তাই পরে (৩১শ অধ্যায়ে) যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক দ্রৌপদীর উক্তির যে প্রতিবাদ বর্ণিত হইয়াছে, তাহার প্রারম্ভেই দ্রৌপদীর প্রতি যুধিষ্ঠিরের "নাস্তিক্যন্তু প্রভাষসে" এইরূপ উক্তি পাওয়া যায়। সুতরাং মহাভারতের ঐ বচনের দ্বারা কিরূপে আস্তিক মত সমর্থিত হইবে, ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। সুধীগণ মহাভারতের বনপর্ব্বের ৩০শ ও ৩১শ অধ্যায় পাঠ করিয়া দ্রৌপদীর উক্তি ও যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক উহার প্রতিবাদের তাৎপর্য্য নির্ণয়পূর্ব্বক মহাভারতের ঐ শ্লোক জীবের কর্ম্মসাপেক্ষ ঈশ্বরের জগৎকারণত্ব সিদ্ধান্তের সমর্থক হয় কি না, ইহা নির্ণয় করিবেন। "প্রকৃতেঃ সুকুমারতরং" ইত্যাদি (৬১ম) সাংখ্য-কারিকার ভাষ্যে গৌড়পাদ স্বামী এবং সুশ্রুত-সংহিতার শারীরস্থানের "স্বভাবমীশ্বরং কালং" ইত্যাদি (১০শ) শ্লোকের টীকায় ডল্লনাচার্য্য কিন্তু ঈশ্বরই সর্ব্বকার্য্যের কারণ, এই সম্প্রদায়বিশেষ-সম্মত মতান্তরের প্রমাণ প্রদর্শন করিতেই মহাভারতের "অজ্ঞো জন্তুরনীশোঽয়ং" ইত্যাদি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহারা ঐ বচনের তাৎপর্য্য কিরূপ বুঝিয়াছিলেন, ইহাও অবশ্য চিন্তা করা আবশ্যক। উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি মনীষিগণের উদ্ধৃত ঐ বচনের চতুর্থ পাদে "স্বর্গং বা শ্বভ্রমেব বা" এইরূপ পাঠ আছে। কিন্তু মহাভারতের উক্ত বচনে (মুদ্রিত মহাভারত পুস্তকে) এবং গৌড়পাদের উদ্ধৃত ঐ বচনে চতুর্থ পাদে "স্বর্গং নরকমেব বা" এইরূপ পাঠ দেখা যায়। পাঠান্তর থাকিলেও, উভয় পাঠে অর্থ একই। কিন্তু উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি অন্য কোন শাস্ত্রগ্রন্থ হইতে ঐ বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন কি না, ইহাও দেখা আবশ্যক। যথাশক্তি অনুসন্ধান করিয়াও অন্য শাস্ত্রগ্রন্থে

১। অজ্ঞো জন্তুরনীশোঽয়মাত্মনঃ সুখদুঃখয়োঃ।
ঈশ্বরপ্রেরিতো গচ্ছেৎ স্বর্গং বা শ্বভ্রমেব বা॥
(স্বর্গং নরকমেব বা)—বনপর্ব্ব, ৩০ অ°, ২৮শ শ্লোক।

যদা স দেবো জাগর্ত্তি, তদেদং চেষ্টতে জগৎ।
যদা স্বপিতি শান্তাত্মা, তদা সর্ব্বং নিমীলতি॥—মনুসংহিতা। ১। ৫২।

ঐ বচন দেখিতে পাই নাই। সুধীগণ অনুসন্ধান করিয়া তথ্য নির্ণয় করিবেন। কিন্তু মাধবাচার্য্য উক্ত বচনের দ্বারা কিরূপে জীবের কর্ম্মসাপেক্ষ ঈশ্বরের জগৎকারণত্বমত সমর্থন করিয়াছেন, উক্ত বচনের দ্বারা ঐ সিদ্ধান্ত কিরূপে বুঝা যায়, এবং গৌড়পাদ স্বামী প্রভৃতি মতান্তরের প্রমাণ প্রদর্শন করিতেই ঐ বচন কেন উদ্ধৃত করিয়াছেন, ইহা অবশ্যচিন্তনীয়।

যাঁহারা সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর স্বীকার করেন নাই, তাঁহাদিগের আর একটি বিশেষ কথা এই যে, ঈশ্বর সৃষ্টিকর্ত্তা হইলে, তাঁহার শরীরবত্তা আবশ্যক হয়। কারণ, যাহার শরীর নাই, তাহার কোন কার্য্যেই কর্ত্তৃত্ব সম্ভবই হয় না। শরীরশূন্য ব্যক্তির কোন কার্য্যে কর্ত্তৃত্ব আছে, ইহার দৃষ্টান্ত নাই। পরন্তু আমাদিগের ঘটাদি-কার্য্যকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া কার্য্যমাত্রেরই কর্ত্তা আছে—(ক্ষিতিঃ সকর্ত্তৃকা কার্য্যত্বাৎ ঘটবৎ) ইত্যাদি প্রকার অনুমানের দ্বারা দ্ব্যণুকাদি কার্য্যের কর্ত্তৃরূপে ঈশ্বর সিদ্ধ করিতে গেলে, আমাদিগের ন্যায় শরীরবিশিষ্ট ঈশ্বরই সিদ্ধ হইবেন। কারণ, পরিদৃশ্যমান ঘটাদি-কার্য্য শরীরবিশিষ্ট চেতন কর্ত্তৃক, ইহাই সর্ব্বত্র দেখা যায়। সুতরাং কার্য্যমাত্রের কর্ত্তা আছে, ইহা স্বীকার করিতে হইলে, ঐ কর্ত্তা শরীরবিশিষ্ট, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া যে ঈশ্বর স্বীকৃত হইতেছেন, তাঁহার শরীর না থাকায়, তাঁহার সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব সম্ভবই হয় না। সুতরাং পূর্ব্বোক্তরূপ অনুমান-প্রমাণের দ্বারা ঐ ঈশ্বরের সিদ্ধিও হইতে পারে না। যদি বল, ঈশ্বরের জ্ঞানাদির ন্যায় শরীরও আছে, তাহা হইলে তাঁহার ঐ শরীর নিত্য, কি অনিত্য—ইহা বলিতে হইবে। কিন্তু উহার কোন পক্ষই বলা যায় না। কারণ, নিত্য-শরীরে কিছুমাত্র প্রমাণ না থাকায়, উহা স্বীকার করা যায় না। শরীর কাহারই নিত্য হইতে পারে না। পরন্তু ঐ শরীর পরিচ্ছিন্ন হইলে, সর্ব্বত্র উহার সত্তা না থাকায়, সর্ব্বত্র ঈশ্বরের ঐ শরীরের দ্বারা যুগপৎ নানাকার্য্য-কর্ত্তৃত্বও সম্ভব হয় না। অনিত্য শরীর স্বীকার করিলেও ঐ শরীরের পরিচ্ছিন্নতাবশতঃ পূর্ব্বোক্ত দোষ অনিবার্য্য। পরন্তু ঈশ্বরের ঐ অনিত্য শরীরের স্রষ্টা কে, ইহা বলা আবশ্যক। স্বয়ং ঈশ্বরই তাঁহার ঐ শরীরের স্রষ্টা, ইহা বলা যায় না। কারণ, ঐ শরীরসৃষ্টির পূর্ব্বে তাঁহার শরীরান্তর না থাকায়, তিনি তখন কিছুই সৃষ্টি করিতে পারেন না। ঈশ্বরের ঐ শরীরের স্রষ্টা অন্য ঈশ্বর স্বীকার করিলে, সেই ঈশ্বরের শরীরের স্রষ্টা আবার অন্য ঈশ্বরও স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপে অনন্ত ঈশ্বর স্বীকার করিতে হইলে, অনবস্থা-দোষ অপরিহার্য্য এবং উহা প্রমাণবিরুদ্ধ ও সকল সম্প্রদায়েরই সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ। ফলকথা, ঈশ্বরকে যখন কোনরূপেই শরীরী বলা যাইবে না, তখন তাঁহাকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করা যায় না। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত অনুমানের দ্বারা ঈশ্বরের সিদ্ধি হইতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত-প্রকার যুক্তি অবলম্বনে নাস্তিক সম্প্রদায় নৈয়ায়িকের "ক্ষিতিঃ সকর্ত্তৃকা কার্য্যত্বাৎ" ইত্যাদি প্রকার অনুমানে "ঈশ্বরো যদি কর্ত্তা স্যাৎ তদা শরীরী স্যাৎ" ইত্যাদি প্রকারে প্রতিকূল তর্কের এবং "শরীরজন্যত্ব" উপাধির উদ্ভাবন করিয়া, ঐ অনুমানের খণ্ডন করিয়াছেন। "তাৎপর্য্যটীকা"য় বাচস্পতি মিশ্র এবং "আত্মতত্ত্ববিবেক" ও "ন্যায়কুসুমাঞ্জলি" গ্রন্থে

উদয়নাচার্য্য, "ন্যায়কন্দলী" গ্রন্থে শ্রীধরাচার্য্য, "ন্যায়মঞ্জরী" গ্রন্থে জয়ন্ত ভট্ট এবং "ঈশ্বরানুমান-চিন্তামণি" গ্রন্থে গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রভৃতি মহানৈয়ায়িকগণ বিস্তৃত বিচারপূর্ব্বক নাস্তিক-সম্প্রদায়ের সমস্ত যুক্তির খণ্ডন করিয়াছেন। ঈশ্বরের শরীর না থাকিলেও, সৃষ্টি-কর্তৃত্ব সম্ভব হইতে পারে, ইহা তাঁহারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের সমস্ত বিচার প্রকাশ করা এখানে সম্ভব নহে। সংক্ষেপে বক্তব্য এই যে, শরীরবত্তাই কর্তৃত্ব নহে। তাহা হইলে মৃত ও সুপ্ত ব্যক্তিরও কর্তৃত্ব থাকিতে পারে। কিন্তু কার্য্যানুকূল নিজ প্রযত্নের দ্বারা কার্য্যের অন্যান্য কারকসমূহের প্রেরকত্ব অথবা ক্রিয়ার অনুকূল প্রযত্নবত্বই কর্তৃত্ব। ঈশ্বরের শরীর না থাকিলেও, তাঁহার ঐ কর্তৃত্ব থাকিতে পারে। আমরা শরীর ব্যতীত কোন কার্য্য করিতে না পারিলেও, সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর অশরীর হইয়াও ইচ্ছামাত্রে জগৎ সৃষ্টি করিতে পারেন। আমাদিগের অনিত্য প্রযত্ন শরীরসাপেক্ষ হইলেও, ঈশ্বরের নিত্যপ্রযত্নরূপ কর্তৃত্ব শরীরসাপেক্ষ নহে। পরন্তু শরীরের ব্যাপার ব্যতীত যে কোন ক্রিয়ারই উৎপাদন করা যায় না, ইহাও বলা যায় না। কারণ, জীবাত্মা তাহার নিজ প্রযত্নের দ্বারা নিজ শরীরে যখন চেষ্টারূপ ক্রিয়ার উৎপাদন করে, তখন ঐ শরীরের দ্বারাই ঐ শরীরে ঐ ক্রিয়ার উৎপাদন করে না। তৎপূর্ব্বে তাহার শরীরের কোন ব্যাপার বা ক্রিয়া থাকে না। জীবাত্মার জ্ঞান-বিশেষজন্য ইচ্ছাবিশেষ জন্মিলে, তজ্জন্য প্রযত্নবিশেষের অনন্তরই শরীরে চেষ্টারূপ ক্রিয়া জন্মে। এইরূপ ঈশ্বরের জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রযত্নজন্য কার্য্যদ্রব্যের মূলকারণ পরমাণুসমূহে প্রথম ক্রিয়াবিশেষ জন্মে। তাহার ফলে পরমাণুদ্বয়ের সংযোগে দ্ব্যণুকাদি-ক্রমে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয়। ইহাতে প্রথমেই তাঁহার শরীরের কোন অপেক্ষা নাই। পরন্তু ঘটাদি দৃষ্টান্তে কার্য্যত্বহেতুতে সামান্যতঃ কর্তৃজন্যত্বেরই ব্যাপ্তিনিশ্চয় হইয়া থাকে। শরীর-বিশিষ্ট-কর্তৃজন্যত্বের ব্যাপ্তিনিশ্চয় হয় না। সুতরাং ঐ ব্যাপ্তিনিশ্চয়প্রযুক্ত সৃষ্টির প্রথমে উৎপন্ন দ্ব্যণুকাদি কার্য্য সামান্যতঃ কর্তৃজন্য, এইরূপই অনুমান হয়। সেই দ্ব্যণুকাদির কর্তা শরীরী, ইহা ঐ অনুমানের দ্বারা সিদ্ধ হয় না। কিন্তু সেই দ্ব্যণুকাদি-কার্য্যের যিনি কর্তা, তিনি উহার উপাদান-কারণের দ্রষ্টা ও অধিষ্ঠাতা, ইহা সিদ্ধ হয়। তাহা হইলে তিনি যে দ্ব্যণুকের উপাদান-কারণ অতীন্দ্রিয় পরমাণুর দ্রষ্টা, সুতরাং অতীন্দ্রিয়দর্শী, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। কারণ, উপাদান-কারণের দ্রষ্টা না হইলে, তাঁহার কর্তৃত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। জগৎস্রষ্টা পরমেশ্বরের অতীন্দ্রিয়দর্শিত্ব সিদ্ধ হইলে তিনি যে শরীর ব্যতীত সৃষ্টি করিতে পারেন, সৃষ্টিকার্য্যে তাঁহার যে আমাদিগের ন্যায় শরীরাদির অপেক্ষা নাই, ইহাও সিদ্ধ হইবে। অবশ্য আমাদিগের পরিদৃষ্ট সমস্ত কার্য্যের কর্তাই শরীরী; শরীর ব্যতীত কেহ কিছু করিতে পারেন, ইহা আমরা দেখি না, কিন্তু সমস্ত কর্তাই যে একরূপ, ইহাও, ত দেখি না। কেহ দুই হস্তের দ্বারা যে ভার উত্তোলন করেন, অপরে এক হস্তের দ্বারাও সেই ভার উত্তোলন করেন, এবং কোন অসাধারণ শক্তিশালী পুরুষ এক অঙ্গুলি দ্বারাই ঐ ভার উত্তোলন করেন, ইহাও ত দেখা যায়। সুতরাং কর্তার শক্তির তারতম্যপ্রযুক্ত নানা কর্তার নানারূপে কার্য্যকারিতা সম্ভব হয়, ইহা

স্বীকার্য্য। তাহা হইলে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিমান্, যেখানে শক্তি পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত, সেই সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর যে, শরীর ব্যতীত ও ইচ্ছামাত্রে জগৎসৃষ্টি করিবেন, ইহা কোন মতেই অসম্ভব নহে। কিন্তু কর্ত্তা ব্যতীত দ্ব্যণুকাদি কার্য্যের সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা অসম্ভব। কারণ, কার্য্যমাত্রই কারণজন্য। বিনা কারণে কার্য্য জন্মিতে পারিলে, সর্ব্বত্র সর্ব্বদা কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে। কার্য্যের কারণের মধ্যে কর্ত্তা অন্যতম নিমিত্তকারণ। উহার অভাবে কোন কার্য্য জন্মিতে পারে না। অন্য সমস্ত কারণ উপস্থিত হইলেও, কর্ত্তার অভাবে যে, কার্য্য জন্মে না, ইহা সকলেরই পরিদৃষ্ট সত্য। সুতরাং সৃষ্টির প্রথমে দ্ব্যণুকাদির কর্ত্তা কেহ আছেন, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে সেই কর্ত্তা যে অতীন্দ্রিয়দর্শী, সর্ব্বজীবের অনাদি কর্ম্মাধ্যক্ষ, সর্ব্বজ্ঞ, সুতরাং তিনি অস্মদাদি হইতে বিলক্ষণ সর্ব্বশক্তিমান্ পরমপুরুষ, ইহাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। নচেৎ তিনি জগৎকর্ত্তা হইতে পারেন না। সুতরাং ঐরূপ ঈশ্বর যে, শরীর ব্যতীতও কার্য্য করিতে পারেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ হইতে পারে না। বস্তুতঃ ঈশ্বরসাধক পূর্ব্বোক্ত অনুমানের দ্বারা ঈশ্বরের জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রযত্নের নিত্যত্বও সিদ্ধ হয়, তাঁহার কর্তৃত্ব শরীরসাপেক্ষ হইতেই পারে না। কিন্তু লোকশিক্ষার জন্য মধ্যে মধ্যে তাঁহার শরীরপরিগ্রহও আবশ্যক হয়। কারণ, শরীরসাধ্য কর্ম্ম-বিশেষ ব্যতীত লোকশিক্ষা সম্ভব হয় না। তাই উদয়নাচার্য্যও অশরীর ঈশ্বরের সৃষ্টিকর্তৃত্ব সমর্থন করিয়াও, সৃষ্টির পরে ব্যবহারাদি শিক্ষার জন্য ঈশ্বর যে শরীরবিশেষ পরিগ্রহ করেন, ইহা বলিয়াছেন[১]। ঈশ্বরের নিজের ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট না থাকিলেও, জীবগণের অদৃষ্টবশতঃই তাঁহার ঐ শরীরের উৎপত্তি হয়, ইহা সেখানে "প্রকাশ" টীকাকার বর্দ্ধমান উপাধ্যায় বলিয়াছেন। ঈশ্বর যে বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনবশতঃ সময়বিশেষে শরীরপরিগ্রহ করেন, ইহা "ভগবদ্গীতা" প্রভৃতি নানা শাস্ত্রেও বর্ণিত হইয়াছে। উদয়নাচার্য্যও তাঁহার ঐ সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে "ভগবদ্গীতা" হইতে ভগবদ্বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। বস্তুতঃ করুণাময় পরমেশ্বর যে ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করিতেও কত বার কত প্রকার শরীরপরিগ্রহ করিয়াছেন ও করিবেন, এ বিষয়ে সংশয় হইতে পারে না। কিন্তু সৃষ্টি-সংহার-কার্য্যে তাঁহার শরীরের কোন অপেক্ষা নাই, তিনি স্বেচ্ছামাত্রেই সৃষ্টি ও সংহার করেন এবং করিতে পারেন, ইহাই নৈয়ায়িক প্রভৃতি দার্শনিকগণের সিদ্ধান্ত। বেদান্তদর্শনে ভগবান্ বাদরায়ণও "বিকরণত্বান্নেতি চেত্তদুক্তং" (২।১।৩১)—এই সূত্রের দ্বারা দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিশূন্য ঈশ্বরের যে সৃষ্টিসামর্থ্য আছে, ইহা সিদ্ধান্তরূপে সূচনা করিয়াছেন। বস্তুতঃ "অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ" ইত্যাদি (শ্বেতাশ্বতর, ৩। ৯) শ্রুতিতে দেহেন্দ্রিয়াদিশূন্য ঈশ্বরেরও তত্তৎ-কার্য্যসামর্থ্য বর্ণিত হইয়াছে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য পূর্ব্বোক্ত বেদান্তসূত্রের ভাষ্যে উক্ত শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া, সূত্রকার বাদরায়ণের উক্ত সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়াছেন।

১। গৃহ্ণাতি হীশ্বরোঽপি কার্য্যবশাৎ শরীরমন্তরান্তরা দর্শয়তি চ বিভূতিমিতি।—"ন্যায়কুসুমাঞ্জলি" পঞ্চম স্তবকের পঞ্চম কারিকার এবং দ্বিতীয় স্তবকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় কারিকার উদয়নকৃত গদ্য ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

কিন্তু মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি বৈষ্ণব দার্শনিকগণ ঈশ্বরের অপ্রাকৃত নিত্য দেহ স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদিগের কথা এই যে, শ্রুতি-স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্রে ঈশ্বরের প্রাকৃত হস্ত-পাদাদি ও প্রাকৃত চক্ষুরাদি নাই, ইহাই কথিত হইয়াছে। ঈশ্বরের যে কোনরূপ শরীরাদিই নাই, ইহা ঐ সমস্ত শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নহে। কারণ, পরব্রহ্ম বা ঈশ্বর যে জ্যোতীরূপ, ইহা "জ্যোতির্দীব্যতে" (ছান্দোগ্য, ৩।১৩।৭) এবং "তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ" (মুণ্ডক, ২।২।৯) ইত্যাদি বহুতর শ্রুতির দ্বারা বুঝা যায়। শ্রুতির ঐ "জ্যোতিষ্" শব্দের মুখ্যার্থ ত্যাগ করার কোন কারণ নাই। সুতরাং ঈশ্বর জ্যোতিঃপদার্থ হইলে, তাঁহার রূপের সত্তাও অবশ্য স্বীকার্য্য। কারণ, জ্যোতিঃপদার্থ একেবারে রূপশূন্য হইতে পারে না। তবে ঈশ্বরের ঐ রূপ অপ্রাকৃত; প্রাকৃত চক্ষুর দ্বারা উহা দেখা যায় না। তাই শ্রুতিও অন্যত্র বলিয়াছেন,— "ন চক্ষুষা পশ্যতি রূপমস্য"। ঈশ্বরের কোন প্রকার রূপ না থাকিলে চক্ষুর দ্বারা উহার দর্শনের কোন প্রসক্তিই হয় না, সুতরাং "ন চক্ষুষা পশ্যতি" এই নিষেধই উপপন্ন হয় না। পরন্তু "যদাপশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং", "বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপং", "বিবৃণুতে তনুং স্বাং"—ইত্যাদি (মুণ্ডক, ৩।১।৩।৭। এবং ৩।২।৩) শ্রুতিবাক্যের দ্বারা ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের রূপ ও তনু আছে, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। অবশ্য "অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং" এইরূপ শ্রুতি আছে, কিন্তু "সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ" এইরূপ শ্রুতিও আছে এবং যেমন "অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা" ইত্যাদি শ্রুতি আছে, তদ্রূপ "সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং" ইত্যাদি শ্রুতিও আছে এবং "অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি" ইত্যাদি বহুতর শাস্ত্রবাক্যও আছে। সুতরাং সমস্ত শ্রুতি ও অন্যান্য শাস্ত্রবাক্যের সমন্বয় করিতে গেলে ইহাই বুঝা যায় যে, ব্রহ্মের প্রাকৃত দেহাদি নাই, কিন্তু অপ্রাকৃত দেহাদি আছে। ব্রহ্মের রূপাদির অভাববোধক শাস্ত্র-বাক্যের ঐরূপ তাৎপর্য্য না বুঝিলে, আর কোনরূপেই তাঁহার রূপাদি-বোধক শাস্ত্রের সহিত উহার বিরোধপরিহার বা সমন্বয় হইতে পারে না। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য প্রভুপাদ শ্রীজীব গোস্বামী "ভগবৎসন্দর্ভ"ও উহার অনুব্যাখ্যা "সর্ব্বসংবাদিনী" গ্রন্থে পূর্ব্বোক্তরূপে আরও বহুতর প্রমাণাদির উল্লেখ ও বিচারপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। শ্রীভাষ্যকার পরমবৈষ্ণব রামানুজও অশেষকল্যাণগুণগণনিধি ভগবান্ বাসুদেবের দিব্যদেহ ও অপ্রাকৃত রূপাদি সমর্থন করিয়াছেন। বেদান্তদর্শনের "অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ" (১।১।২১) এই সূত্রের শ্রীভাষ্য দ্রষ্টব্য। মধ্বাচার্য্যও "রূপোপন্যাসাচ্চ" (১।১।২৩) এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রুতির দ্বারা ব্রহ্মের অপ্রাকৃত রূপের অস্তিত্ব সমর্থন করিয়া, পরে "অন্তবত্ত্বমসর্ব্বজ্ঞতা বা" (২।২।৪১) এই সূত্রের ভাষ্যে ব্রহ্মের যে বুদ্ধি, মন ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আছে, ইহাও শাস্ত্র-প্রমাণের দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন। এইরূপ অন্যান্য বৈষ্ণব দার্শনিকগণও সকলেই শ্রীভগবানের অপ্রাকৃত-রূপাদি ও তাঁহার অপ্রাকৃত দেহ স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীজীব গোস্বামী অনুমান-প্রমাণের দ্বারাও উক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে অনুমান প্রয়োগ প্রদর্শন করিয়াছেন যে,[১] যেহেতু ঈশ্বর জ্ঞান, ইচ্ছা ও প্রযত্ন-বিশিষ্ট কর্ত্তা, অতএব তিনি সবিগ্রহ অর্থাৎ

১। তথাচ প্রয়োগঃ, ঈশ্বরঃ সবিগ্রহঃ, জ্ঞানেচ্ছাপ্রযত্নবৎকর্তৃত্বাৎ কুলালাদিবৎ। স চ বিগ্রহো নিত্যঃ, ঈশ্বর-কর্তৃকত্বাৎ তজ্জ্ঞানাদিবদিতি।—ভগবৎসন্দর্ভ।

দেহবিশিষ্ট, দেহ ব্যতীত কেহ কর্ত্তা হইতে পারেন না, কর্ত্তা হইলেই তিনি অবশ্য দেহী হইবেন। ঘটাদি কার্য্যের কর্ত্তা কুম্ভকার প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত। পরন্ত ঈশ্বরের ঐ দেহ নিত্য; কারণ, তাঁহার জ্ঞানাদির ন্যায় তাঁহার দেহও তাঁহার কার্য্যের করণ অর্থাৎ সাধন। সুতরাং তাঁহার দেহ অনিত্য হইলে, উহা অনাদি সৃষ্টিপ্রবাহের সাধন হইতে পারে না। কিন্তু ঈশ্বরের ঐ দেহ পরিচ্ছিন্ন হইলেও, অপরিচ্ছিন্ন। শ্রীজীব গোস্বামী "সর্ব্বসংবাদিনী" গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"তস্য শ্রীবিগ্রহস্য পরিচ্ছিন্নত্বেঽপি অপরিচ্ছিন্নত্বং শ্রূয়তে, তচ্চ যুক্তং, অচিন্ত্যশক্তিত্বাৎ"। এই মতে ঈশ্বরের ঐ শ্রীবিগ্রহ ও হস্তপদাদি সমস্তই সচ্চিদানন্দস্বরূপ, উহা ঈশ্বর হইতে ভিন্ন পদার্থ নহেন, ঐ বিগ্রহই ঈশ্বর, তাহাতে দেহ ও দেহীর ভেদ নাই; তাঁহার বিগ্রহ বা দেহই তিনি, এবং তিনিই ঐ বিগ্রহ।

উক্ত মতে বক্তব্য এই যে, যদি ভক্তগণের অনুভবই উক্ত সিদ্ধান্তের প্রমাণ হয়, তাহা হইলে আর কোন বিচার বা বিতর্ক নাই। কিন্তু ভক্ত বৈষ্ণব দার্শনিক শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতিও যখন বহু বিচার করিয়া পরমত খণ্ডনপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন, তখন তাঁহাদিগের মতেও উক্ত বিচারের কর্ত্তব্যতা আছে, বুঝা যায়। সুতরাং উক্ত সিদ্ধান্ত বুঝিতে আরও অনেক বিচার আবশ্যক মনে হয়। প্রথম বিচার্য্য এই যে, ঈশ্বরের বিগ্রহ ও ঈশ্বর একই পদার্থ হইলে, ঈশ্বর যখন অপরিচ্ছিন্ন, তখন বিগ্রহরূপ তিনিই আবার পরিচ্ছিন্ন হইবেন কিরূপে? যদি তাঁহার অচিন্ত্য শক্তির মহিমায় তাঁহার শ্রীবিগ্রহ পরিচ্ছিন্ন হইয়াও অপরিচ্ছিন্ন হইতে পারেন, তাহা হইলে তিনি ঐ অচিন্ত্য শক্তির মহিমায় দেহ ব্যতীতও সৃষ্ট্যাদি কার্য্যের কর্ত্তা হইতে পারেন। সুতরাং শ্রীজীব গোস্বামী যে তাঁহার কর্ত্তৃত্বকেই হেতুরূপে গ্রহণ করিয়া, ঘটাদি কার্য্যের কর্ত্তা কুম্ভকার প্রভৃতির ন্যায় ঈশ্বরেরও বিগ্রহবত্তা বা দেহবত্তার অনুমান করিয়াছেন, তাহা কিরূপে গ্রহণ করা যায়? যদি অচিন্ত্য শক্তিবশতঃ দেহ ব্যতীতও তাঁহার কর্ত্তৃত্ব অসম্ভব নহে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য হয়, তাহা হইলে কর্ত্তৃত্বহেতুর দ্বারা তাঁহার দেহের সিদ্ধি হইতে পারে না। পরন্ত কুম্ভকার প্রভৃতি কর্ত্তার ন্যায় জগৎকর্ত্তা ঈশ্বরের দেহের অনুমান করিতে গেলে, তাঁহার আত্মা বা স্বরূপ হইতে ভিন্ন জড়দেহই সিদ্ধ হইতে পারে। কারণ, কর্ত্তৃত্ব-নির্ব্বাহের জন্য যে দেহ আবশ্যক, তাহা কর্ত্তা হইতে ভিন্নই হইয়া থাকে। সুতরাং কর্ত্তৃত্ব হেতুর দ্বারা কর্ত্তার স্ব-স্বরূপ দেহ সিদ্ধ হইতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত মতে ঈশ্বরের দেহ তাঁহা হইতে অভিন্ন হইলেও, তাঁহার কার্য্যের করণ। কিন্তু তাহা হইলে ঈশ্বরের যে অপ্রাকৃত চক্ষুরাদি ও হস্ত-পদাদি আছে, যাহা ঈশ্বরের স্বরূপ বলিয়াই স্বীকৃত হইয়াছে, সেই সমস্তই ঈশ্বরের দর্শনাদি কার্য্যের সাধন থাকায়, "পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের কিরূপে উপপত্তি হইবে, ইহাও বিচার্য্য। উক্ত শ্রুতি-বাক্যের দ্বারা বুঝা যায় যে, ঈশ্বরের দর্শনাদি-কার্য্যের কোন সাধন বা করণ না থাকিলেও, তিনি তাঁহার সর্ব্বশক্তিমত্তাবশতঃই দর্শনাদি করেন। কিন্তু যদি তাঁহার কোন প্রকার চক্ষুরাদিও থাকে এবং তাহার সর্ব্বাঙ্গই

সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তিবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে তাঁহার দর্শনাদি কার্য্যের কোন সাধন নাই, ইহা বলা যায় না। শ্রীজীব গোস্বামীও ঈশ্বরের দেহকে তাঁহার করণ বলিয়া ঐ দেহের নিত্যত্বানুমান করিয়াছেন। পরন্তু ঈশ্বরের স্ব-স্বরূপ দেহে তাঁহার যে অপ্রাকৃত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় এবং অপ্রাকৃত হস্তপদাদি আছে, তাহাও যখন পূর্ব্বোক্ত মতে ঈশ্বরেরই স্বরূপ, ঐ সমস্তই সচ্চিদানন্দময়, তখন উহাতে দেহ,ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সংজ্ঞার প্রয়োজন কি? এবং উহাতে দেহ প্রভৃতির কি লক্ষণ আছে, ইহাও বিচার্য্য। পরন্তু পূর্ব্বোক্ত মতে ভক্তগণ সেই সচ্চিদানন্দময় ভগবানের যে চরণসেবাই পরমপুরুষার্থ মনে করিয়া, সাধনার দ্বারা তাঁহার পার্ষদ হইয়া, ঐ চরণসেবাই করেন; সেই চরণও যখন তাঁহারই স্বরূপ—উহা মানবাদির চরণের ন্যায় সংবাহনাদি সেবার যোগ্যই নহে, তখন কিরূপে যে সেই পার্ষদ ভক্তগণ তাঁহার চরণসেবা করেন, ইহাও বিশেষরূপে বিচার্য্য। যদি বলা যায় যে, সেই আনন্দময়ের সেবাই তাঁহার চরণসেবা বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহা হইলে ঐ চরণসেবা কিরূপ, তাহা বক্তব্য। সেই আনন্দময় বিগ্রহে পরম-প্রেমসম্পন্ন হইয়া থাকাই যদি তাঁহার চরণসেবা বলিতে হয়, তাহা হইলে ঐ "চরণ" শব্দের মুখ্য অর্থ পরিত্যাগ করিতেই হইবে। তাহা হইলে ভক্ত অধিকারি-বিশেষের সাধনা-বিশেষের জন্যই এবং তাঁহাদিগের বাঞ্ছনায় প্রেমলাভের জন্যই শাস্ত্রাংশেষে ভগবানের দেহাদি বর্ণিত হইয়াছে; ঐ সকল শাস্ত্রের মুখ্য অর্থে তাৎপর্য্য নাই, ইহাও বুঝা যাইতে পারে। শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতিও ত ঐ সকল শাস্ত্র-বাক্যের সর্ব্বাংশে মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তাঁহারাও আদিকর্ত্তা পরমেশ্বরের দেহাদি স্বীকার করিয়া, উহাকে সচ্চিদানন্দস্বরূপই বলিয়াছেন। তাঁহার অপ্রাকৃত হস্তপদাদি স্বীকার করিয়াও ঐ সমস্তকে তাঁহা হইতে ভিন্নপদার্থ বলেন নাই। তাঁহারাও উক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে শাস্ত্রের নানাবাক্যের গৌণ বা লাক্ষণিক অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। তাই বলিয়াছি, শাস্ত্র-বিচার করিয়া উক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে হইলে এবং বুঝিতে হইলে আরও অনেক বিচার করা আবশ্যক। বৈষ্ণব-দার্শনিকগণ সে বিচার করিবেন। আমরা এখন জীব ও ব্রহ্মের ভেদ ও অভেদবাদ-সম্বন্ধে যথাশক্তি কিছু আলোচনা করিব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ভাষ্যকার গোতম সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতেই, ঈশ্বরকে "আত্মান্তর" বলিয়া এবং পরে উহার ব্যাখ্যা করিয়া ঈশ্বর যে জীবাত্মা হইতে ভিন্ন আত্মা, এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। বস্তুতঃ মহর্ষি গোতমের যে উহাই সিদ্ধান্ত, ইহা বুঝিতে পারা যায়। কারণ, তিনি তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে যে সমস্ত যুক্তির দ্বারা জীবাত্মার দেহাদিভিন্নত্ব ও নিত্যত্ব সমর্থন করিয়াছেন এবং দ্বিতীয় আহ্নিকের ৬৬ম ও ৬৭ম সূত্রে যেরূপ যুক্তির দ্বারা তাঁহার নিজ সিদ্ধান্তে দোষ পরিহার করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহার মতে জীবাত্মা প্রতি শরীরে ভিন্ন ইহাই বুঝা যায়। পরন্তু একই আত্মা সর্ব্বশরীরবর্ত্তী হইলে, একের সুখাদি জন্মিলে তখন সর্ব্বশরীরেই সুখাদির অনুভব হয় না কেন? এতদুত্তরে আত্মার একত্ববাদি-সম্প্রদায় বলিয়াছেন যে, জ্ঞান ও সুখাদি আত্মার ধর্ম্ম নহে—উহা আত্মার উপাধি—অন্তঃকরণেরই ধর্ম্ম; অন্তঃ

করণেই ঐ সমস্ত উৎপন্ন হয়। সুতরাং আত্মা এক হইলেও, প্রতি শরীরে অন্তঃকরণের ভেদ থাকায়, কোন এক অন্তঃকরণে সুখাদি জন্মিলেও, তখন উহা অন্য অন্তঃকরণে উৎপন্ন না হওয়ায়, অন্য অন্তঃকরণে উহার অনুভব হয় না। কিন্তু মহর্ষি গোতম তৃতীয় অধ্যায়ে যখন জ্ঞান, ইচ্ছা ও সুখ-দুঃখাদি গুণকে জীবাত্মারই নিজের গুণ বলিয়া সমর্থন করিতে, ঐ সমস্ত মনের গুণ নহে, ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন, তখন তাঁহার মতে প্রতি শরীরে জীবাত্মার বাস্তব-ভেদ ব্যতীত পূর্ব্বোক্ত সুখ-দুঃখাদি ব্যবস্থা কোনরূপেই উপপন্ন হয় না, কোন এক শরীরে জীবাত্মার সুখ-দুঃখাদি জন্মিলে অপর শরীরে উহার উৎপত্তি ও অনুভবের আপত্তির নিরাস হইতে পারে না। সুতরাং গোতম-মতে জীবাত্মা যে প্রতি শরীরে বস্তুতঃই ভিন্ন, অতএব অসংখ্য, এ বিষয়ে সংশয় নাই। তাহা হইলে বিভিন্ন অসংখ্য জীবাত্মা হইতে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের বাস্তব অভেদ কোনরূপেই সম্ভব না হওয়ায়, গোতম মতে জীবাত্মা ও ঈশ্বর যে বস্তুতঃই ভিন্ন পদার্থ, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। এ বিষয়ে তৃতীয় অধ্যায়ে আত্মতত্ত্ব-বিচারে অনেক কথা বলা হইয়াছে। (তৃতীয় খণ্ড, ৮৬—৮৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

জীবাত্মা ও ব্রহ্মের বাস্তব অভেদবাদ বা অদ্বৈতবাদ সমর্থন করিতে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি বলিয়াছেন যে, জীবাত্মা ও ব্রহ্মের যে, কোনরূপ ভেদই নাই, ইহা নহে। ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার না হওয়া পর্য্যন্ত জীবাত্মা ও ব্রহ্মের ভেদ অবশ্যই আছে। কিন্তু ঐ ভেদ অবিদ্যাকৃত ঔপাধিক, সুতরাং উহা বাস্তব-ভেদ নহে। যেমন আকাশ বস্তুতঃ এক হইলেও, ঘটাকাশ পটাকাশ প্রভৃতি নামে বিভিন্ন আকাশের কল্পনা করা হয়, ঘটাকাশ হইতে পটাকাশের বাস্তব কোন ভেদ না থাকিলেও যেমন ঘট ও পটরূপ উপাধিদ্বয়ের ভেদপ্রযুক্তই উহার ভেদ-ব্যবহার হয়, তদ্রূপ জীব ও ব্রহ্মের বাস্তব কোন ভেদ না থাকিলেও, অবিদ্যাদি উপাধিপ্রযুক্তই উহার ভেদ-ব্যবহার হয়। জীবাত্মার সংসারকালে অবিদ্যাকৃত ঐ ভেদজ্ঞানবশতঃই ভেদমূলক উপাসনাদি কার্য্য চলিতেছে। ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইলে, তখন অবিদ্যার নাশ হওয়ায়, অবিদ্যাকৃত ঐ ভেদও বিনষ্ট হয়। অনেক শ্রুতি ও স্মৃতির দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের যে ভেদ বুঝা যায়, তাহা ঐ অবিদ্যাকৃত অবাস্তব ভেদ। উহার দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের বাস্তব-ভেদই সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করা যায় না। কারণ, "তত্ত্বমসি", "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" "সোঽহং", "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই চারি বেদের চারিটি মহাবাক্যের দ্বারা এবং আরও অনেক শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতি প্রমাণের দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের বাস্তব অভেদই প্রকৃত তত্ত্বরূপে সুস্পষ্ট বুঝা যায়। উপনিষদে যে যে স্থানে জীব ও ব্রহ্মের অভেদের উপদেশ আছে, তাহার উপক্রম উপসংহারাদি পর্য্যালোচনা করিলেও, জীব ও ব্রহ্মের বাস্তব অভেদেই যে, উপনিষদের তাৎপর্য্য, ইহা নিশ্চয় করা যায়। এবং উপনিষদে জীব ও ব্রহ্মের অভেদদর্শনই অবিদ্যানিবৃত্তি বা মোক্ষের কারণ-রূপে কথিত হওয়ায়, জীব ও ব্রহ্মের অভেদই বাস্তবতত্ত্ব, ভেদ মিথ্যা কল্পিত, ইহা নিশ্চয় করা যায়।

জীব ও ব্রহ্মের বাস্তব-ভেদবাদী অন্যান্য সকল সম্প্রদায়ই পূর্ব্বোক্তরূপ অদ্বৈতবাদ স্বীকার করেন নাই। তাঁহারা উপনিষদের তাৎপর্য্য বিচার করিয়া জীব ও ব্রহ্মের বাস্তব-ভেদ

সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের কথা এই যে, মুণ্ডক উপনিষদের তৃতীয় মুণ্ডকের প্রারম্ভে "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া" ইত্যাদি প্রথম শ্রুতিতে দেহরূপ এক বৃক্ষে যে দুইটি পক্ষীর কথা বলিয়া, তন্মধ্যে একটি কর্ম্মফলের ভোক্তা এবং অপরটি কর্ম্মফলের ভোক্তা নহে, কিন্তু, কেবল দ্রষ্টা, ইহা বলা হইয়াছে, তদ্দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মাই ঐ শ্রুতিতে বিভিন্ন দুইটি পক্ষিরূপে কল্পিত এবং ঐ উভয় বস্তুতঃই ভিন্ন, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়[১]। ঐ শ্রুতির পরার্দ্ধে দুইটি "অন্য" শব্দের দ্বারাও ঐ উভয়ের বাস্তব-ভেদ সুস্পষ্ট বুঝা যায়। নচেৎ ঐ "অন্য" শব্দদ্বয়ের সার্থকতা থাকে না। তাহার পরে মুণ্ডক উপনিষদের ঐ স্থানেই দ্বিতীয় শ্রুতির পরার্দ্ধে "জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ" এই বাক্যের দ্বারা ঈশ্বর যে জীবাত্মা হইতে "অন্য", ইহাও আবার বলা হইয়াছে। ঐ শ্রুতিতেও "অন্য" শব্দের সার্থকতা কিরূপে হয়, তাহা চিন্তা করা আবশ্যক। তাহার পরে তৃতীয় শ্রুতি বলা হইয়াছে, "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং, কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্য-মুপৈতি॥"—এই শ্রুতিতে ব্রহ্মদর্শী ব্রহ্মের সহিত পরমসাম্য (সাদৃশ্য) লাভ করেন, ইহাই শেষে কথিত হওয়ায়, জীব ও ব্রহ্মের যে বাস্তব-ভেদ আছে, এবং পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিদ্বয়েও "অন্য" শব্দের দ্বারা সেই বাস্তব-ভেদই প্রকাশিত হইয়াছে, ইহা সুস্পষ্ট বুঝা যায়। কারণ, শেষোক্ত শ্রুতিতে যে "সাম্য" শব্দ আছে, উহার মুখ্য অর্থ সাদৃশ্য। উহার দ্বারা অভিন্নতা অর্থ বুঝিলে লক্ষণা স্বীকার করিতে হয়। পরন্তু, "সাম্য" শব্দের অভিন্নতা অর্থে লক্ষণা স্বীকার সঙ্গতও হয় না। কারণ, তাহা হইলে "সাম্য" শব্দ প্রয়োগের কোন সার্থকতা থাকে না। রাজ-সদৃশ ব্যক্তিকে রাজা বলিলে লক্ষণার দ্বারা রাজসদৃশ, এইরূপ অর্থ বুঝা যায় এবং ঐরূপ প্রয়োগও হইয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত রাজাকে রাজসম বলিলে, লক্ষণার দ্বারা রাজা, এইরূপ অর্থ বুঝা যায় না, এবং ঐরূপ প্রয়োগও কেহ করেন না। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত

১। "দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥—মুণ্ডক, ৩।১।১। শ্বেতাশ্বতর, ৪।৬।

জীব ও ব্রহ্মের বাস্তব-ভেদ সমর্থন করিতে রামানুজ প্রভৃতি সকলেই উক্ত শ্রুতি প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি বলিয়াছেন যে, "পৈঙ্গিরহস্য-ব্রাহ্মণ" নামক শ্রুতিতে উক্ত শ্রুতির যে ব্যাখ্যা পাওয়া যায়, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, উক্ত শ্রুতিতে অন্তঃকরণ ও জীবাত্মাই যথাক্রমে কর্ম্মফলের ভোক্তা ও দ্রষ্টা, দুইটী পক্ষিরূপে কথিত। কারণ, উহাতে শেষে স্পষ্ট করিয়াই ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে, "তাবেতৌ সত্ত্বক্ষেত্রজ্ঞৌ"। সুতরাং উক্ত "দ্বা সুপর্ণা" ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার বাস্তব-ভেদ বুঝিবার কোন সম্ভাবনা নাই। রামানুজ প্রভৃতি ও শ্রীজীব গোস্বামী এই কথার উত্থাপন করিয়া বলিয়াছেন যে, "পৈঙ্গিরহস্য ব্রাহ্মণে" "তাবেতৌ সত্ত্বক্ষেত্রজ্ঞৌ" এই বাক্যে "সত্ত্ব" শব্দের অর্থ জীবাত্মা, এবং ক্ষেত্রজ্ঞ শব্দের অর্থ পরমাত্মা। কারণ, জীবাত্মা কর্ম্মফল ভোগ করেন না, তিনি ভোক্তা নহেন, ইহা বলা যায় না। সুতরাং এখানে "ক্ষেত্রজ্ঞ" শব্দের দ্বারা জীবাত্মা বুঝা যায় না; পরমাত্মাই বুঝিতে হইবে। "সত্ত্ব" শব্দের জীবাত্মা অর্থ অভিধানেও কথিত হইয়াছে এবং ঐ অর্থে "সত্ত্ব" শব্দের প্রয়োগও প্রচুর আছে। "ক্ষেত্রজ্ঞ" শব্দের দ্বারাও পরমাত্মা বুঝা যায়। "ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি"—গীতা।

শ্রুতিতে "সাম্য" শব্দের মুখ্য অর্থ সাদৃশ্যই বুঝিতে হইলে, জীব ও ব্রহ্মের ভেদ যে বাস্তব, ইহা অবশ্যই বুঝা যায়। কারণ, বাস্তব-ভেদ না থাকিলে, সাম্য বা সাদৃশ্য বলা যায় না। পরন্তু ব্রহ্মদর্শী ব্যক্তি ব্রহ্মের সাদৃশ্যই লাভ করেন এবং উহাই পূর্ব্বোক্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য, ইহা "ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ। সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ॥" (গীতা, ১৪।২)—এই ভগবদ্‌বাক্যে "সাধর্ম্ম্য" শব্দের দ্বারাও সুস্পষ্ট বুঝা যায়। কারণ, "সাধর্ম্ম্য" শব্দের মুখ্য অর্থ সমান-ধর্ম্মতা, অভিন্নতা নহে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও ইহা স্বীকার করিয়া গীতার ঐ শ্লোকের ভাষ্যে তাঁহার নিজমতানুসারে "সাধর্ম্ম্য' শব্দের যে মুখ্য অর্থ গ্রহণ করা যায় না, ইহার হেতু বলিয়াছেন। কিন্তু, ঐ "সাধর্ম্ম্য" শব্দের মুখ্য অর্থ গ্রহণ না করিলে, ঐ শ্লোকে সাধর্ম্ম্য শব্দ প্রয়োগের কোন সার্থক্য থাকে না। পরন্তু, ব্রহ্মদর্শী ব্যক্তি একেবারে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলে, ঐ শ্লোকের "সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ"—এই পরার্দ্ধের সার্থক্য থাকে না। কিন্তু ঐ সাধর্ম্ম্য শব্দের মুখ্য অর্থে প্রয়োগ হইলেই, ঐ শ্লোকের পরার্দ্ধ সম্যক্‌রূপে সার্থক হয়। কারণ, ব্রহ্মদর্শী মুক্ত পুরুষ ব্রহ্মের সহিত কিরূপ সাধর্ম্ম্য লাভ করেন? ইহা বলিবার জন্যই ঐ শ্লোকের পরার্দ্ধ বলা হইয়াছে—"সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ"॥ অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শী মুক্ত পুরুষ পুনঃ সৃষ্টিতেও দেহাদি লাভ করেন না এবং তিনি প্রলয়েও ব্যথিত হন না। ব্রহ্মদর্শনের ফলে তাঁহার সমস্ত অদৃষ্টের ক্ষয় হওয়ায় তাঁহার আর জন্মাদি হইতে পারে না, ইহাই তাঁহার ব্রহ্মের সহিত সাধর্ম্ম্য। কিন্তু ব্রহ্মের সহিত তাঁহার তত্ত্বতঃ ভেদ থাকায় তিনি তখন জগৎস্রষ্ট্র্যাদির কর্ত্তা হইতে পারেন না। এখন যদি পূর্ব্বোক্ত মুণ্ডক উপনিষদে "সাম্য" শব্দ এবং ভগবদ্‌গীতার পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে "সাধর্ম্ম্য" শব্দের দ্বারা মুক্তিকালেও জীব ও ব্রহ্মের বাস্তব ভেদ বুঝা যায়, তাহা হইলে "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রহ্মজ্ঞানী মুক্ত পুরুষের পূর্ব্বোক্তরূপ ব্রহ্মসাদৃশ্য-প্রাপ্তিই কথিত হইয়াছে, ইহা বুঝিতে হইবে। ব্রহ্মের সহিত বিশেষ সাদৃশ্য প্রকাশ করিতেই শ্রুতি বলিয়াছেন, "ব্রহ্মৈব ভবতি"। যেমন কোন ব্যক্তির রাজার ন্যায় প্রভূত ধনসম্পত্তি ও প্রভুত্ব লাভ হইলে তাঁহাকে "রাজৈব" এইরূপ কথাও বলা হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞানী মুক্ত পুরুষকে শ্রুতি বলিয়াছেন, "ব্রহ্মৈব"। বিশেষ সাদৃশ্য প্রকাশ করিতেই ঐরূপ প্রয়োগ সুচিরকাল হইতেই হইতেছে। কিন্তু কোন প্রকৃত রাজাকে লক্ষ্য করিয়া "রাজসাধর্ম্ম্যমাগতঃ" এইরূপ প্রয়োগ হয় না। মীমাংসাচার্য্য পার্থসারথি মিশ্রও "শাস্ত্রদীপিকা"র তর্কপাদে সাংখ্যমতের ব্যাখ্যান করিতে এবং অন্যত্র নিজ মত সমর্থন করিতে পূর্ব্বোক্ত "নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" এই শ্রুতি এবং ভগবদ্‌গীতার "মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ" এই ভগবদ্‌বাক্যে সাম্য ও সাধর্ম্ম্য শব্দের মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিয়াই উহার দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার বাস্তব ভেদই সমর্থন করিয়াছেন এবং তিনি উহা সমর্থন করিতে "উত্তমঃ পুরুষস্তন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ" (গীতা, ১৫।১৭) ইত্যাদি ভগবদ্বাক্যও প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। উক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে রামানুজ প্রভৃতি

আচার্য্যগণও উক্ত ভগবদ্‌বাক্যকে প্রমাণরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন। পার্থসারথি মিশ্র আরও বলিয়াছেন যে, ভগবদ্‌গীতায়—"মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" (১৫।৭) এই শ্লোকে যে, জীবকে ঈশ্বরের অংশ বলা হইয়াছে, উহার দ্বারা জীব ও ঈশ্বরের বাস্তব ভেদ নাই, ইহা বিবক্ষিত নহে। ঐ বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, ঈশ্বর স্বামী, জীব তাঁহার কার্য্যকারক ভৃত্য। যেমন রাজার কার্য্যকারী অমাত্যদিকে রাজার অংশ বলা হয়, তদ্রূপ ঈশ্বরের অভিমতকারী জীবকে ঈশ্বরের অংশ বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ, অখণ্ড অদ্বিতীয় ঈশ্বরের খণ্ড বা অংশ হইতে পারে না। সুতরাং ভগবদ্গীতার ঐ শ্লোকে "অংশ" শব্দের মুখ্য অর্থ কেহই গ্রহণ করিতে পারেন না। উহার গৌণার্থই সকলের গ্রাহ্য। মূলকথা, জীব ও ব্রহ্মের বাস্তব-ভেদবাদী সম্প্রদায়ও উপনিষৎ, গীতা ও ব্রহ্মসূত্রের বিচার করিয়া, নিজ মত সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই নিজ মত সমর্থন করিতে পূর্ব্বোক্ত "দ্বা সুপর্ণা" ইত্যাদি—(মুণ্ডক ও শ্বেতাশ্বতর) শ্রুতি এবং 'ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে" ইত্যাদি (কঠ, ৩।১)—শ্রুতি এবং "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ" ইত্যাদি (শ্বেতাশ্বতর, ১।৯)—শ্রুতি এবং "জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য" এবং "নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" এই (মুণ্ডক) শ্রুতি এবং "পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি" এই (শ্বেতাশ্বতর) শ্রুতি এবং "উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ" এবং "ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ" এই ভগবদ্গীতাবাক্য এবং "ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ" (১।১।২১), "অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ" (২।১।২২) ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্র এবং আরও বহু শাস্ত্রবাক্য প্রমাণরূপে প্রদর্শন করিয়াছেন।

জীব ও ব্রহ্মের ভেদই সত্য হইলে "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শ্রুতিতে জীব ও ব্রহ্মের যে অভেদ উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা কিরূপে উপপন্ন হইবে এবং "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতি-বর্ণিত সমগ্র জগতের ব্রহ্মাত্মকতাই বা কিরূপে উপপন্ন হইবে? এতদুত্তরে নৈয়ায়িক-সম্প্রদায়ের কথা এই যে, জীব ও জগৎ ব্রহ্মাত্মক না হইলেও ব্রহ্ম বলিয়া ভাবনারূপ উপাসনাবিশেষের জন্যই "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শ্রুতি এবং "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতি কথিত হইয়াছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত"—(৩।১৪) এই শ্রুতিতে "উপাসীত" এই ক্রিয়া পদের দ্বারা ঐরূপে উপাসনাই বিহিত হইয়াছে। যাহা ব্রহ্ম নহে,তাহাকে ব্রহ্ম বলিয়া ভাবনারূপ উপাসনা ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ে এবং আরও অন্যত্র বহু স্থানে বিহিত হইয়াছে, ইহা অদ্বৈতবাদী সম্প্রদায়ও স্বীকার করেন। "মনো ব্রহ্ম ইত্যুপাসীত", "আদিত্যো ব্রহ্ম ইত্যুপাসীত" ইত্যাদি শ্রুতিতে যাহা বস্তুতঃ ব্রহ্ম নহে, তাহাকে ব্রহ্ম বলিয়া ভাবনারূপ উপাসনার বিধান স্পষ্টই বুঝা যায়। বৃহদারণ্যক উপনিষদেরও প্রারম্ভ হইতে ঐরূপ ভাবনাবিশেষরূপ বহুবিধ উপাসনার বিধান বুঝা যায়। সুতরাং ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদের উপক্রম ও উপসংহারের দ্বারাও "তত্ত্বমসি," "অহং ব্রহ্মাস্মি," "অয়মাত্মা ব্রহ্ম," "সোঽহং" এবং "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিতে পূর্ব্বোক্তরূপে উপাসনা-বিশেষের প্রকারই উপদিষ্ট হইয়াছে, বাস্তব তত্ত্ব উপদিষ্ট হয় নাই, ইহাই বুঝা যায়। বেদান্ত-

দর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম পাদের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ সূত্রে পূর্ব্বোক্তরূপ উপাসনা-বিশেষের বিচার হইয়াছে। ফলকথা, "তত্ত্বমসি", "অহং ব্রহ্মাস্মি", "সোঽহং" ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যে আত্মগ্রহ উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে। তবে অদ্বৈতবাদি-সম্প্রদায়ের মতে জীব ও ব্রহ্মের অভেদই সত্য, ভেদ আরোপিত। কিন্তু নৈয়ায়িক-সম্প্রদায়ের মতে জীব ও ব্রহ্মের ভেদই সত্য, অভেদই আরোপিত। সুতরাং তাঁহাদিগের মতে নিজের আত্মাতে ব্রহ্মের বাস্তব অভেদ না থাকিলেও মুমুক্ষু সাধক নিজের আত্মাতে ব্রহ্মের অভেদের আরোপ করিয়াই "অহং ব্রহ্মাস্মি," "সোঽহং" এইরূপ ভাবনা করিবেন। তাঁহার ঐ ভাবনারূপ উপাসনা এবং ঐরূপ সর্ব্ববস্তুতে ব্রহ্মভাবনারূপ উপাসনা,রাগদ্বেষাদির ক্ষীণতা সম্পাদন দ্বারা, চিত্তশুদ্ধির বিশেষ সাহায্য করিয়া, মোক্ষলাভের বিশেষ সাহায্য করিবে। এই জন্যই শ্রুতিতে পূর্ব্বোক্তরূপ উপাসনাবিশেষ বিহিত হইয়াছে। মীমাংসক সম্প্রদায়বিশেষও "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে উপাসনার প্রকারই কথিত হইয়াছে, ইহাই বলিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে ঐ সমস্ত শ্রুতি উপাসনা-বিধির শেষ অর্থবাদ। বিধিবাক্যের সহিত একবাক্যতাবশতঃই "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি ভূতার্থবাদের প্রামাণ্য। নচেৎ ঐ সকল বাক্যের প্রামাণ্যই হইতে পারে না। মৈত্রেয়ী উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রারম্ভে "সোঽহংভাবেন পূজয়েৎ" এই বিধিবাক্যের দ্বারা এবং "ইত্যেবমাচরেদ্ধীমান্" এই বিধিবাক্যের দ্বারাও পূর্ব্বোক্তরূপে উপাসনারই কর্ত্তব্যতা বুঝা যায়। সুতরাং জীব ও ব্রহ্মের অভেদ সেখানে বাস্তব তত্ত্বের ন্যায় উপদিষ্ট হইলেও উহা বাস্তব তত্ত্ব বলিয়া নিশ্চয় করা যায় না। ফলকথা, নৈয়ায়িক-সম্প্রদায়ের মতে জীব ও ব্রহ্মের বাস্তব অভেদ না থাকিলেও মুমুক্ষু সাধক নিজের আত্মাতে ব্রহ্মের অভেদের আরোপ করিয়া "সোঽহং" ইত্যাদি প্রকারে ভাবনারূপ উপাসনা করিবেন। ঐরূপ উপাসনার ফলে সময়ে তাঁহার নিজের আত্মাতে এবং অন্যান্য সর্ব্ববস্তুতে ব্রহ্মদর্শন হইবে। তাহার ফলে পরমেশ্বরে পরাভক্তি লাভ হইবে। তাহার ফলে প্রকৃত ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইলে মোক্ষ লাভ হইবে। এই মতে ভগবদ্গীতার "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাং॥ ভক্ত্যা মা-মভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরং"॥ (১৮শ অঃ, ৫৪।৫৫) এই দুই শ্লোকের দ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপ তাৎপর্য্যই বুঝিতে হইবে। বস্তুতঃ মুমুক্ষু সাধকের ত্রিবিধ উপাসনাবিশেষ শাস্ত্রদ্বারা বুঝিতে পারা যায়। প্রথম, জগৎকে ব্রহ্মরূপে ভাবনা, দ্বিতীয়, জীবকে ব্রহ্মরূপে ভাবনা, তৃতীয়, জীব ও জগৎ হইতে ভিন্ন সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বাশ্রয়রূপে ব্রহ্মের ধ্যান। পূর্ব্বোক্ত দ্বিবিধ উপাসনার দ্বারা সাধকের চিত্তশুদ্ধি হয়। তৃতীয় প্রকার উপাসনার দ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হয়। জগৎকে ব্রহ্মরূপে ভাবনা এবং জীবকে ব্রহ্মরূপে ভাবনা, এই দ্বিবিধ উপাসনার ফলে রাগদ্বেষাদি-জনক ভেদবুদ্ধি এবং অসূয়াদিশূন্য হইয়া শুদ্ধচিত্ত হইলে, তখন পরমেশ্বরে সম্যক্ নিষ্ঠার উদয় হয়, ইহাই পরাভক্তি। বেদান্তদর্শনের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের শেষ সূত্রে "উপাসা-ত্রৈবিধ্যাৎ"

এই বাক্যের দ্বারা ভগবান্ বাদরায়ণও পূর্ব্বোক্তরূপ ত্রিবিধ উপাসনারই সূচনা করিয়াছেন। পরন্তু পরব্রহ্মকে জীব ও জগৎ হইতে ভিন্ন বলিয়া সাক্ষাৎকার করিলেই মোক্ষলাভ হয়, অর্থাৎ ভেদদর্শনই মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ,—ইহাই "পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্ব-মেতি"—এই শ্বেতাশ্বতর (১।৬)—শ্রুতির দ্বারা সরল ভাবে বুঝা যায়। আত্মা অর্থাৎ জীবাত্মা এবং প্রেরয়িতা অর্থাৎ সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরকে পৃথক্ অর্থাৎ ভিন্ন বলিয়া বুঝিলে অমৃতত্ব (মোক্ষ) লাভ করে, ইহা বলিলে জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদই যে সত্য এবং ভেদ দর্শনই মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ, ইহা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয়। শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতিও "পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা" ইত্যাদি শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া জীব ও ব্রহ্মের ভেদের সত্যতা সমর্থন করিয়াছেন। জীব ও ব্রহ্মের ভেদ দর্শন মোক্ষের সাক্ষাৎকারণ বলিয়া শ্রুতিসিদ্ধ হইলে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ দর্শনকে আর মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করা যায় না। সুতরাং জীব ও ব্রহ্মের অভেদ দর্শন বা সমগ্র জগতের ব্রহ্মাত্মকতা দর্শন মোক্ষের কারণ-রূপে কোন শ্রুতির দ্বারা বুঝা গেলে, উহা পূর্ব্বোক্তরূপ উপাসনাবিশেষের ফলে চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন দ্বারা মোক্ষলাভের সহায় হয়, ইহাই ঐ শ্রুতির তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। এইরূপ মোক্ষলাভের পরম্পরা কারণ বা প্রযোজকমাত্রকেও শাস্ত্র অনেক স্থানে মোক্ষলাভের সাক্ষাৎ কারণের ন্যায় উল্লেখ করিয়াছেন। বিচার দ্বারা ঐ সমস্ত শাস্ত্রবাক্যের তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে হইবে। নচেৎ মোক্ষলাভের সাক্ষাৎকারণ অর্থাৎ চরম কারণ নির্ণয় করা যাইবে না। মূলকথা, নৈয়ায়িক-সম্প্রদায়ের মতে "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা মুমুক্ষুর মোক্ষলাভের সহায় উপাসনাবিশেষের প্রকারই উপদিষ্ট হইয়াছে,—জীব ও ব্রহ্মের বাস্তব অভেদ তত্ত্বরূপে উপদিষ্ট হয় নাই। নব্য নৈয়ায়িক বিশ্বনাথ পঞ্চানন "সিদ্ধান্তমুক্তাবলী" গ্রন্থে নৈয়ায়িক-সম্প্রদায়ের পরম্পরাগত পূর্ব্বোক্তরূপ মতেরই সূচনা করিয়াছেন। "বৌদ্ধাধিকারটিপ্পনী"তে নব্য নৈয়ায়িক-শিরোমণি রঘুনাথ শিরোমণিরও এই ভাবের কথা পাওয়া যায়। গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের পূর্ব্ববর্ত্তী মহানৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্টও বিস্তৃত বিচারপূর্ব্বক শঙ্করাচার্য্য-সমর্থিত অদ্বৈতবাদের অনুপপত্তি সমর্থন করিয়াছেন। "তাৎপর্য্যটীকা"কার সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র বাচস্পতি মিশ্রও ন্যায়মত সমর্থন করিতে অনেক কথা বলিয়াছেন। অনেকে অদ্বৈতবাদের মূল মায়া বা অবিদ্যার খণ্ডন করিয়াই অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিয়াছেন। বস্তুতঃ ঐ মায়া বা অবিদ্যা কি? উহা কোথায় থাকে? উহা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, কি অভিন্ন? ইত্যাদি সম্যক্ না বুঝিলে অদ্বৈতবাদ বুঝা যায় না। অদ্বৈতবাদের মূল ঐ অবিদ্যার খণ্ডন করিতে পারিলেই এ বিষয়ে সকল বিবাদের অবসান হইতে পারে।

দ্বৈতাদ্বৈতবাদী নিম্বার্ক প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণবাচার্য্য জীব ও ঈশ্বরের ভেদবোধক ও অভেদবোধক দ্বিবিধ শাস্ত্রকে আশ্রয় করিয়া, জীব ও ঈশ্বরের ভেদ ও অভেদ, এই উভয়কেই বাস্তব তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে ঈশ্বরে জীবের ভেদ ও অভেদ উভয়ই আছে, ঈশ্বরে জীবের ভেদ ও অভেদ বিরুদ্ধ নহে, ঐ

ভেদ ও অভেদ উভয়ই সত্য। জীবের সহিত ঈশ্বরের ভেদাভেদ সম্বন্ধ অনাদি-সিদ্ধ। তাঁহারা "অংশো নানাব্যপদেশাৎ" ইত্যাদি (২।৩।৪২)—ব্রহ্মসূত্রের দ্বারা এবং "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ" ইত্যাদি ভগবদ্গীতা (১৫।৭)—বাক্যের দ্বারা ব্রহ্ম অংশী, জীব তাঁহার অংশ, সুতরাং অগ্নি ও অগ্নিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় জীব ও ব্রহ্মের অংশাংশি-ভাবে বাস্তব ভেদ ও অভেদ উভয়ই আছে, ইহা সমর্থন করিয়াছেন এবং উহা সমর্থন করিতে জীব ও ঈশ্বরের ভেদবোধক ও অভেদবোধক দ্বিবিধ শ্রুতিকেই প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন[১]। অণু জীব ব্রহ্মের অংশ; ব্রহ্ম পূর্ণদর্শী, জীব অপূর্ণদর্শী, ব্রহ্ম বা ঈশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্, সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তা, জীব মুক্ত হইলেও সর্ব্বশক্তিমান্ নহে। জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মের অংশ; সুতরাং মুক্ত হইলেও তাহার সেই স্বরূপই থাকে। কারণ, কোন নিত্য বস্তুর স্বরূপের ঐকান্তিক বিনাশ হইতে পারে না। সুতরাং মুক্ত জীবও তখন জীবই থাকে, তাহার পূর্ণব্রহ্মতা হয় না—সর্ব্বশক্তিমত্তাও হয় না। কিন্তু জীব ব্রহ্মের অংশ বলিয়া জীবে, ব্রহ্মের অভেদও স্বীকার্য্য। এই ভেদাভেদবাদ বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদও অতি প্রাচীন মত। ব্রহ্মার প্রথম মানস পুত্র (১) সনক, (২) সনন্দ, (৩) সনাতন ও (৪) সনৎকুমার ঋষি এই মতের প্রথম আচার্য্য বলিয়া ইহাঁদিগের নামানুসারে এই মতের সম্প্রদায় "চতুঃসন" সম্প্রদায় নামে কথিত হইয়াছেন এবং বৈষ্ণবাগ্রণী নারদ মুনি পূর্ব্বোক্ত সনকাদি আচার্য্যের প্রথম শিষ্য বলিয়া কথিত হইয়াছেন। নারদ-শিষ্য নিয়মানন্দাচার্য্যই পরে "নিম্বার্ক" অথবা "নিম্বাদিত্য" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি কোন সময়ে নিজের আশ্রমস্থ নিম্ববৃক্ষে আরোহণ করিয়া সূর্য্যদেবকে ধারণ করায় তখন হইতে তাঁহার ঐ নামে প্রসিদ্ধি হয়, এইরূপ জনশ্রুতি প্রসিদ্ধ আছে। এই নিম্বার্ক স্বামী বেদান্তদর্শনের এক সংক্ষিপ্ত ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, তাহার নাম "বেদান্তপারিজাত-সৌরভ"। নিম্বার্কের শিষ্য শ্রীনিবাসাচার্য্য "বেদান্ত-কৌস্তুভ" নামে অপর এক ভাষ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। পরে ঐ ভাষ্যের অনেক টীকা বিরচিত হইয়াছে। বঙ্গদেশে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবকালে কেশবাচার্য্য নামে উক্ত সম্প্রদায়ের একজন প্রধান আচার্য্য ঐ ভাষ্যের এক টীকা প্রকাশ করেন, তাহাও অদ্যাপি প্রচলিত আছে। দ্বৈতাদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠাতা নিম্বার্ক স্বামী যে, নারদের উপদিষ্ট মতেরই ব্যাখ্যাতা, নারদ মুনিই তাঁহার গুরু, ইহা বেদান্তদর্শনের প্রথম অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের অষ্টম সূত্রের ভাষ্যে তিনি নিজেই বলিয়া গিয়াছেন[২]।

শ্রীসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক বৈষ্ণবাচার্য্য অনন্তাবতার শ্রীমান্ রামানুজ বেদান্তদর্শনের শ্রীভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের সমর্থিত অদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদের বিস্তৃত সমালোচনা করিয়া, ঐ মতের

১। "অংশো নানাব্যপদেশাৎ" ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে নিম্বার্ক লিখিয়াছেন,—"অংশাংশিভাবাজ্জীবপরমাত্মনোর্ভেদাভেদৌ দর্শয়তি। পরমাত্মনো জীবোহংশঃ "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশা"বিত্যাদিভেদব্যপদেশাৎ, "তত্ত্বমসী"ত্যাদ্যভেদব্যপদেশাচ্চ" ইত্যাদি।

২। পরমাচার্য্যৈঃ শ্রীকুমারৈরস্মদ্গুরবে শ্রীমন্নারদায়োপদিষ্টো "ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য" ইত্যত্র ইত্যাদি। নিম্বার্কভাষ্য।

খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি "সুবালোপনিষদে"র সপ্তম খণ্ডের "যস্ত পৃথিবী শরীরং" ইত্যাদি শ্রুতি-সমূহ ও যুক্তির দ্বারা জীব ও জগৎ পরব্রহ্মের শরীর, ইহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, শরীর ও আত্মার যেমন স্বরূপতঃ অভেদ হইতেই পারে না, তদ্রূপ ব্রহ্মের সহিত জগৎ ও জীবের স্বরূপতঃ অভেদ হইতেই পারে না[১]। কিন্তু প্রলয়কালে সূক্ষ্মভাবাপন্ন জীব ও জড় জগৎ ব্রহ্মে বিলীন থাকায় তখন ঐ জগৎ ও জীবকে ব্রহ্মের শরীর বলিয়াও পৃথক্‌ভাবে উপলব্ধি করা যায় না, সুতরাং তখন সেই জগৎ ও জীববিশিষ্ট ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই থাকে না। তখন ঐ জগৎ ও জীববিশিষ্ট ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব প্রকাশ করিতেই শ্রুতি বলিয়াছেন,—"একমেবাদ্বিতীয়ং", "একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম, নেহ নানাস্তি কিঞ্চন"। রামানুজ এই ভাবে জগৎ ও জীব-বিশিষ্ট ব্রহ্মেরই অদ্বিতীয়ত্ব সমর্থন করায় তাঁহার মত "বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদ" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। রামানুজ বলিয়াছেন, "আত্মা বা ইদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা প্রলয়কালে সমগ্র জীব ও জগৎ স্থূল রূপ পরিত্যাগ করিয়া, সূক্ষ্মরূপে ব্রহ্মেই অবস্থিত ছিল অর্থাৎ ব্রহ্মে একীভূত ছিল, ইহাই বুঝা যায়। তখন জগতের স্বরূপ-নিবৃত্তি বা একেবারে অভাব বুঝা যায় না। "তমঃ পরে দেবে একীভবতি" এই শ্রুতিবাক্যে ঐ একীভাবই কথিত হইয়াছে। যে অবস্থায় বিভিন্ন বস্তুরও পৃথক্‌রূপে জ্ঞান সম্ভব হয় না, তাহাকে একীভাব বলা যায়। প্রলয়কালে সূক্ষ্ম জীব ও সূক্ষ্ম জড়বিশিষ্ট ব্রহ্মে সমগ্র জীব ও জগতের ঐ একীভাব হয় বলিয়া তাদৃশ বিশিষ্ট ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রুতি বলিয়াছেন, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"। বস্তুতঃ, ব্রহ্মের সত্তা ভিন্ন আর কিছুরই বাস্তব সত্তা নাই, ইহা ঐ শ্রুতির তাৎপর্য্য নহে। পূর্ব্বোক্তরূপ বিশিষ্ট ব্রহ্মই জগতের উপাদান, জগৎ ঐ ব্রহ্মেরই পরিণাম (বিবর্ত্ত নহে) এবং সমগ্র জীব ও জগৎ ব্রহ্ম হইতে বস্তুতঃ ভিন্ন হইলেও ব্রহ্মের প্রকার বা বিশেষণ, এ জন্য ব্রহ্মের শরীর বলিয়া শাস্ত্রে কথিত[২]। সুতরাং ঐ বিশিষ্ট ব্রহ্মকে জানিলে যে সমস্তই জানা যাইবে,এ বিষয়ে সন্দেহ কি ? বিশিষ্ট ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হইলে তাঁহার বিশেষণ সমগ্র জীব ও সমগ্র জগতেরও অবশ্য সাক্ষাৎকার হইবে। অতএব শ্রুতিতে যে, এক ব্রহ্মজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের কথা আছে, তাহার অনুপপত্তি নাই। উহার দ্বারা এক ব্রহ্মই সত্য, আর সমস্তই তাহাতে কল্পিত মিথ্যা, ইহা বুঝিবারও কোন কারণ নাই। সমগ্র জীব ও জগৎ ব্রহ্ম হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন হইলেও তদ্বিশিষ্ট ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়, ইহাই শ্রুতির তাৎপর্য্য। পূর্ব্বোক্তরূপ বিশিষ্টাদ্বৈতই পূর্ব্বোক্ত "একমেবাদ্বিতীয়ং" ইত্যাদি শ্রুতির অভিমত তত্ত্ব। "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে জীব ও ব্রহ্মের যে অভেদ কথিত হইয়াছে,

১। জীবপরয়োরপি স্বরূপৈক্যং দেহাত্মনোরিব ন সম্ভবতি। তথাচ শ্রুতিঃ,—"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া" ......ইত্যাদি গ্রন্থের দ্বারা রামানুজ নানা শ্রুতি, স্মৃতি ও ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখপূর্ব্বক বিশেষ বিচার দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপতঃ বাস্তব ভেদ সমর্থন করিয়াছেন। বেদান্তদর্শনের প্রথম সূত্রের শ্রীভাষ্যে রামানুজের ঐ সমস্ত কথা দ্রষ্টব্য।

২। "জগৎ সর্ব্বং শরীরং তে", "যদম্বু বৈষ্ণবঃ কায়ঃ", "তৎ সর্ব্বং বৈ হরেস্তনুঃ", "তানি সর্ব্বাণি তদ্বপুঃ" "সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ"।

উহার তাৎপর্য্য এই যে, জীব ব্রহ্মের ব্যাপ্য, ব্রহ্ম জীবের ব্যাপক, জীব ব্রহ্মের শরীর[১]। জীব যে স্বরূপতঃই ব্রহ্ম, ইহা ঐ শ্রুতির তাৎপর্য্য নহে। কারণ, জীব যে, ব্রহ্ম হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন, ব্রহ্মের শরীরবিশেষ, এ বিষয়ে প্রচুর প্রমাণ আছে। পরন্তু জীবাত্মা অণু, ইহা শ্রুতির দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়। জীবাত্মা অণু হইলে একই জীবাত্মা সর্ব্বশরীরে অধিষ্ঠিত হইতে পারে না, সুতরাং জীবাত্মা প্রতি শরীরে ভিন্ন ভিন্ন বহু, ইহা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে এক ব্রহ্মের সহিত তাহার অভেদ সম্ভবই নহে। অণু জীব, বিভু (বিশ্বব্যাপী) ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইতেও পারে না। নিম্বার্ক প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্য্যগণ জীবাত্মাকে অণু বলিয়া স্বীকার করিয়াও বিভু ব্রহ্মের সহিত তাহার স্বরূপতঃই ভেদ ও অভেদ, এই উভয়ই স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু রামানুজ উহা স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে একই পদার্থে স্বরূপতঃ ভেদ ও অভেদ, উভয়ই বাস্তব তত্ত্ব হইতে পারে না। কারণ, ঐরূপ ভেদ ও অভেদ বিরুদ্ধ পদার্থ। "অংশো নানাব্যপদেশাৎ" ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রে জীবকে যে ব্রহ্মের অংশ বলা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য ইহা নহে যে, জীব ব্রহ্মের খণ্ড। কারণ, ব্রহ্ম অখণ্ড বস্তু, তাঁহার খণ্ড হইতে পারে না, উহা বলাই যায় না। সুতরাং, উহার তাৎপর্য্য এই যে, জীব ব্রহ্মের বিভূতি বা বিশেষণ। "প্রকাশাদিবত্তু নৈবং পরঃ" (২।৩।৪৫)—এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে রামানুজ বলিয়াছেন যে, যেমন অগ্নি ও সূর্য্য প্রভৃতির প্রভাকে উহার অংশ বলা হয়, এবং যেমন দেব মনুষ্যাদির দেহকে দেহীর অংশ বলা হয়, তদ্রূপ জীবকে ব্রহ্মের অংশ বলা হইয়াছে। কিন্তু দেহ ও দেহীর ন্যায় জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপতঃ ভেদ অবশ্যই আছে। পরন্তু "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের বাস্তব অভেদ বুঝাই যায় না। কারণ, "তত্ত্বমসি", "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ইত্যাদি শ্রুতিতে "ত্বং" "অয়ং" ও "আত্মা" এই সমস্ত পদ জীবাত্মা বুঝাইতে প্রযুক্ত হয় নাই। ঐ সমস্ত পদের অর্থ ব্রহ্ম। রামানুজের মতে "তত্ত্বমসি" এই শ্রুতিবাক্যে "তৎ" পদের দ্বারা সর্ব্বদোষশূন্য, সকলকল্যাণগুণাধার, সৃষ্টিস্থিতিলয়কারী ব্রহ্মই বুঝা যায়। কারণ, ঐ শ্রুতির পূর্ব্বে "তদৈক্ষত" ইত্যাদি শ্রুতিতে "তৎ" শব্দের দ্বারা ঐরূপ ব্রহ্মই কথিত হইয়াছেন। এবং "তত্ত্বমসি" এই বাক্যে "ত্বং" পদের দ্বারাও যিনি চিদ্বিশিষ্ট, (চিৎ অর্থাৎ জীব যাঁহার বিশেষণ বা শরীর)—সেই ব্রহ্মই বুঝা যায়। তাহা হইলে ঐ বাক্যের দ্বারা বুঝা যায় যে, চিদ্বিশিষ্ট অর্থাৎ জীব যাঁহার বিশেষণ বা শরীর, সেই ব্রহ্ম, সর্ব্বদোষশূন্য, সকলগুণাধার, সৃষ্টিস্থিতিলয়কারী ব্রহ্ম। সুতরাং "তত্ত্বমসি" এই বাক্যে "তৎ" ও "ত্বং" পদের এক ব্রহ্মই অর্থ হওয়ায় ঐরূপ অভেদনির্দ্দেশের অনুপপত্তি নাই এবং উহার দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের অভেদও প্রতিপন্ন হয় না। "সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে" "রামানুজদর্শন" প্রবন্ধে মাধবাচার্য্যও "তত্ত্বমসি" এই বাক্যের অর্থ ব্যাখ্যায় পূর্ব্বোক্তরূপ কথাই বলিয়াছেন।

১। ততশ্চ জীবব্যাপিত্বেনাভেদো ব্যপদিশ্যতে। "তত্ত্বমসি" "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" ইত্যাদিষু তচ্ছব্দব্রহ্মশব্দবৎ "ত্বং অয়ং আত্মা' শব্দস্যাপি জীবশরীরব্রহ্মবাচকত্বেন একার্থাভিধায়িত্বাৎ। বেদান্ত-তত্ত্বসার।

বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মধ্যে বায়ুর অবতার পরমবৈষ্ণব শ্রীমান্ আনন্দতীর্থ বা মধ্বাচার্য্য একান্ত দ্বৈতবাদের প্রবর্ত্তক। তাঁহার অপর নাম পূর্ণপ্রজ্ঞ। তিনি বেদান্তদর্শনের ভাষ্য করিয়া অন্য সম্প্রদায়ের অনুল্লিখিত অনেক শ্রুতি ও অনেক পুরাণবচনের দ্বারা একান্ত দ্বৈতবাদ সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার ঐ ভাষ্য মধ্বভাষ্য ও পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন নামে প্রসিদ্ধ। মাধবাচার্য্য "সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে" "রামানুজদর্শনে"র পরে "পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন"ও প্রকাশ করিয়াছেন। আনন্দতীর্থ বা মধ্বাচার্য্য বেদান্তদর্শনের "বিশেষণাচ্চ" (১।২।১২) এই সূত্রের ভাষ্যে তাঁহার নিজমত সমর্থনের জন্য জীব ও ব্রহ্মের ভেদের সত্যতা-বোধক যে শ্রুতি প্রদর্শন করিয়াছেন, মাধবাচার্য্য "পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনে" ঐ শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন। "সর্ব্বসম্বাদিনী" গ্রন্থে শ্রীজীব গোস্বামী মধ্বভাষ্যের নাম করিয়াই মধ্বাচার্য্যের প্রদর্শিত ঐ শ্রুতি ও স্মৃতি উভয়ই উদ্ধৃত করিয়াছেন[১]। মধ্বাচার্য্য বা আনন্দতীর্থের মতে জীব ও ব্রহ্মের বাস্তব অত্যন্ত ভেদই শ্রুতিসম্মত সিদ্ধান্ত এবং বিষ্ণুই পরম তত্ত্ব। তাঁহার মতে "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের সহিত জীবের সাদৃশ্যবিশেষই প্রকটিত হইয়াছে; জীব ও ব্রহ্মের বাস্তব অভেদ প্রকটিত হয় নাই। কারণ, অন্যান্য বহু শ্রুতি ও স্মৃতিতে জীব ও ব্রহ্মের বাস্তব ভেদই সুস্পষ্টরূপে কথিত হইয়াছে। সুতরাং "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্যের "আদিত্যো যূপঃ" এই বেদবাক্যের ন্যায় সাদৃশ্যবিশেষ-বোধেই তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ যেমন যজ্ঞীয় যূপ আদিত্য না হইলেও উহাকে আদিত্যের সদৃশ বলিবার জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন,—"আদিত্যো যূপঃ", তদ্রূপ জীব ব্রহ্ম না হইলেও তাহাকে ব্রহ্মসদৃশ বলিবার জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন, "তত্ত্বমসি", "অয়মাত্মা ব্রহ্ম"। পরন্তু মুণ্ডক উপনিষদে যখন "নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" এই বাক্যের দ্বারা পূর্ব্বে ব্রহ্মদর্শী ব্রহ্মের পরম সাদৃশ্য লাভ করেন, ইহাই কথিত হইয়াছে, তখন পরবর্ত্তী "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" এই (মুণ্ডক ৩।২।৩) শ্রুতিবাক্যেও ব্রহ্মদর্শী ব্রহ্মের সদৃশ হন, ব্রহ্মস্বরূপ হন না, ইহাই তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে[২]। কারণ, ব্রহ্মদর্শী ব্রহ্মস্বরূপ হইলে তাঁহার সম্বন্ধে ব্রহ্মের সাম্যলাভের কথা সংগত হয় না। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার "সিদ্ধান্তরত্ন" গ্রন্থে

১। "সত্য আত্মা সত্যো জীবঃ সত্যং ভিদা, সত্যং ভিদা সত্যং ভিদা মৈবারুবণ্যো মৈবারুবণ্যো মৈবারুবণ্যঃ।" মধ্বভাষ্যে উদ্ধৃত পৈঙ্গীশ্রুতি। "আত্মা হি পরমস্বতন্ত্রোঽধিগুণো জীবোঽল্পশক্তিরস্বতন্ত্রোঽবরঃ।" মধ্বভাষ্যে উদ্ধৃত ভাল্লবেয় শ্রুতি।

> যথেশ্বরস্য জীবস্য ভেদঃ সত্যো বিনিশ্চয়াৎ।
> এবমেবহি মে বাচং সত্যাং কর্ত্তুমিহার্হসি।
> যথেশ্বরশ্চ জীবশ্চ সত্যভেদৌ পরস্পরং।
> তেন সত্যেন মাং দেবাস্ত্রায়স্ত সহ কেশবাঃ —মধ্বভাষ্যে উদ্ধৃত স্মৃতিবচন।

২। "নচ ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতীতি শ্রুতিবলাজ্জীবস্য পারমৈশ্বর্য্যং শক্যশঙ্কং, "সম্পূজ্য ব্রাহ্মণং ভক্ত্যা শূদ্রোঽপি ব্রাহ্মণো ভবে"দিতিবদ্বৃংহিতো ভবতীত্যর্থপরত্বাৎ।" — সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন।

"ব্রহ্মৈব ভবতি" এই শ্রুতিবাক্যে "এব" শব্দেরই সাদৃশ্য অর্থের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি অমরকোষের অব্যয়বর্গের 'বদ্বা যথা তথৈবৈবং সাম্যে" এই প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া "এব" শব্দের সাদৃশ্য অর্থ সমর্থন করিয়াছেন।

"সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে" মাধবাচার্য্য মধ্বমতের বর্ণন করিতে শেষে কল্পান্তরে বলিয়াছেন যে[১], অথবা "স আত্মা তত্ত্বমসি" এই শ্রুতিবাক্যে "অতত্ত্বমসি" এইরূপ বাক্যই গ্রহণ করিয়া "ত্বং তন্ন ভবসি" অর্থাৎ তুমি সেই ব্রহ্ম নহ, তুমি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, এইরূপ অর্থই বুঝিতে হইবে। কিন্তু বৈষ্ণবাচার্য্য মহামনীষী মাধবমুকুন্দ "পরপক্ষগিরিবজ্র" নামক গ্রন্থের শেষে পক্ষান্তরে "অতত্ত্বমসি" এইরূপ পাঠ গ্রহণ করিয়া "অতৎ" এই বাক্যে "নঞ্" শব্দের অর্থ সাদৃশ্য, ইহাই বলিয়াছেন[২]। অর্থাৎ যেমন "অব্রাহ্মণঃ" এই বাক্যে "নঞ্" শব্দের অর্থ সাদৃশ্য, সুতরাং "অব্রাহ্মণ" শব্দের দ্বারা ব্রাহ্মণ-সদৃশ, এই অর্থ বুঝা যায়, তদ্রূপ "অতৎ ত্বমসি" এই বাক্যে "অতৎ" শব্দের দ্বারা তৎসদৃশ অর্থাৎ ব্রহ্মসদৃশ, এইরূপ অর্থ বুঝা যায়। বস্তুতঃ ছান্দোগ্যোপনিষদে যদি "স আত্মা অতত্ত্বমসি" এইরূপ সন্ধিবিচ্ছেদই বুঝিতে হয়, যে কারণেই হউক, যদি কষ্ট কল্পনা করিয়া ঐ বাক্যে "অতত্ত্বমসি" এইরূপ পাঠই গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে ঐ পক্ষে মাধ্বমতানুসারে নঞ্ শব্দের দ্বারা সাদৃশ্য অর্থ গ্রহণ করাই সমীচীন, সন্দেহ নাই। মাধবাচার্য্য "পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শনে" মাধ্বমতের বর্ণনা করিতে শেষে ঐ পক্ষে কেন যে, ঐরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই, তাহা চিন্তনীয়। মাধবাচার্য্য মাধ্বমতের সমর্থন করিতে "মহোপনিষৎ" বলিয়া যে সমস্ত শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং নয়টি দৃষ্টান্তের কথা বলিয়াছেন, পূর্ব্বোক্ত "পরপক্ষগিরিবজ্র" গ্রন্থে ঐ সমস্ত শ্রুতি অনুসারে সেই নব দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যা পাওয়ায় এবং ঐ গ্রন্থে দ্বৈতবাদ পক্ষে উপনিষদের উপক্রম উপসংহার প্রভৃতি ষড়্‌বিধ লিঙ্গ প্রদর্শনপূর্ব্বক উপনিষদের দ্বারাই দ্বৈতবাদের বিশেষ সমর্থন পাওয়া যায়। ঐ সমস্ত কথা এখানে সংক্ষেপে প্রকাশ করা অসম্ভব। যাঁহারা উপনিষদের ব্যাখ্যার দ্বারা দ্বৈতবাদ বুঝিতে চাহেন, তাঁহারা ঐ গ্রন্থ পাঠ করিলে বিশেষ উপকার পাইবেন এবং অদ্বৈতবাদের সম্যক্ সমালোচনা করিতে পারিবেন। ঐ গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ের "অথশব্দার্থাধিকরণ" প্রকরণের পরেই "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শ্রুতির ব্যাখ্যায় লক্ষণা বিচারেও বহু নূতন কথা পাওয়া যায়। কিন্তু সেখানে প্রথমে পক্ষান্তরে "তত্ত্বমসি" এই বাক্যে লক্ষণা ত্যাগ করিয়া "তৎ" শব্দের উত্তর তৃতীয়াদি বিভক্তির লোপ স্বীকারপূর্ব্বক "তত্ত্বমসি"

১। অথবা "তত্ত্বমসীত্যত্র স এবাত্মা, স্বাতন্ত্র্যাদিগুণোপেতত্বাৎ। অতত্ত্বমসি ত্বং তন্ন ভবসি, তদ্রহিতত্বা-দিত্যেবমদ্বৈতশ্রুতেন নিরাকৃতং। তদাহ অতত্ত্বমিতি বা ছেদস্তেনৈক্যং সুনিরাকৃতমিতি।"—সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন।

২। যদ্বা "স আত্মা তত্ত্বমসি" এতদ্বাক্যে "অতত্ত্বমসীতি" পদচ্ছেদ ইত্যত্র যথাদৃষ্টস্থানুসারাদনিত্য ইতি পদচ্ছেদস্তথা ভেদবোধক-নবদৃষ্টান্তানুসারাৎ অতত্ত্বমসীতি পদচ্ছেদঃ কিন্তু তত্ত্বপূর্ণজ্ঞানানন্দত্বাদিনা নঞা সাদৃশ্যবোধনাৎ ইত্যাদি।"—পরপক্ষ-গিরিবজ্র, ১ম অধ্যায়, ৭ম প্রকরণ।

এই বাক্যের (১) "তেন ত্বং তিষ্ঠসি", (২) "তস্মৈ ত্বং তিষ্ঠসি", (৩) "ততঃ সঞ্জাতঃ," (৪) "তস্য ত্বং," (৫) "তস্মিন্ ত্বং," এই পাঁচ প্রকার অর্থেরও ব্যাখ্যা করা হইয়াছে[1]। মধ্বাচার্য্য নিজে পূর্ব্বোক্তরূপ নানাবিধ ব্যাখ্যা না করিলেও তাঁহার সম্প্রদায়ের মধ্যে পরবর্ত্তী অনেক মহাত্মা অদ্বৈতবাদিসম্প্রদায়ের সহিত বিচার করিয়া মাধ্বমত সমর্থন করিবার জন্য "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্যের কষ্টকল্পনা করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ নানাবিধ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "পরপক্ষগিরিবজ্র"কার নিম্বার্ক সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াও অদ্বৈতবাদ খণ্ডনের জন্যই পূর্ব্বোক্ত নানাবিধ ব্যাখ্যা করিতে গিয়াছেন। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় মাধ্বমতের সমর্থন করিতেও "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের পূর্ব্বোক্তরূপ কোন ব্যাখ্যা করেন নাই। মাধ্বভাষ্যেও ঐরূপ কোন ব্যাখ্যা দেখিতে পাই না। সাম্প্রদায়িক বিবাদের ফলে এবং নিশ্চিন্তচিত্তে সতত শাস্ত্রচর্চ্চার ফলে ক্রমশঃ ঐরূপ আরও যে কত প্রকার কাল্পনিক ব্যাখ্যার উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা কে বলিতে পারে? তবে নৈয়ায়িক ও মীমাংসক-সম্প্রদায়ের পূর্ব্বাচার্য্যগণ দ্বৈতবাদ সমর্থন করিতে "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের পূর্ব্বোক্তরূপ কোন ব্যাখ্যা করেন নাই।

সে যাহা হউক, প্রকৃত কথা এই যে, মধ্বাচার্য্য জীবকে ঈশ্বরের অংশ বলিয়া স্বীকার করিয়াও তিনি নিম্বার্কস্বামীর ন্যায় জীব ও ঈশ্বরের ভেদাভেদবাদ স্বীকার করেন নাই। মধ্বাচার্য্য বেদান্তদর্শনের "অংশো নানাব্যপদেশাৎ" (২।৩।৪৩) ইত্যাদি সূত্রের ভাষ্যে প্রথমে জীব ঈশ্বরের অংশ, এ বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া, পরে জীব ঈশ্বরের অংশ নহে, এ বিষয়েও শ্রুতিপ্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া পূর্ব্বপক্ষ সূচনা করতঃ পরে অন্যান্য শ্রুতি ও বরাহপুরাণের বচন প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়া,জীব ঈশ্বরের অংশ, ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কিন্তু জীব ঈশ্বরের অংশ হইলে জীব ঈশ্বরের অংশ নহে, এ বিষয়ে তাঁহার উদ্ধৃত শ্রুতিপ্রমাণের কিরূপে উপপত্তি হইবে? এবং তাহা হইলে মৎস্য, কূর্ম্ম প্রভৃতি অবতার যেমন ঈশ্বরের অংশ বলিয়া ঈশ্বর হইতে বস্তুতঃই অভিন্ন, তদ্রূপ ঈশ্বরের অংশ জীবও ঈশ্বর হইতে বস্তুতঃ অভিন্ন, ইহা স্বীকার করিতে হয় এবং মৎস্য, কূর্ম্ম প্রভৃতি অবতারের সহিত জীবের তুল্যতার আপত্তি হয়। মধ্বাচার্য্য পরে "প্রকাশাদিবন্নৈবংপরঃ" (২।৩।৪৬) ইত্যাদি কতিপয় বেদান্তসূত্রের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত আপত্তির নিরাস করিয়াছেন। তাঁহার সারকথা এই যে, মৎস্য, কূর্ম্ম প্রভৃতি অবতারগণ ঈশ্বরের স্বাংশ, অর্থাৎ স্বরূপাংশ, এবং জীব ঈশ্বরের বিভিন্নাংশ। অংশ দ্বিবিধ—(১) স্বাংশ ও (২) বিভিন্নাংশ। মধ্বাচার্য্য 'স্বাংশশ্চাথ বিভিন্নাংশ ইতি দ্বেধাংশ ইষ্যতে" ইত্যাদি বরাহপুরাণবচন উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার ঐ সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। মাধ্বভাষ্যের "তত্ত্বপ্রকাশিকা"

১। অস্তু বা তচ্ছব্দাৎ পরত্র তৃতীয়াদিবিভক্তেঃ 'সুপাং সুলুগিত্যাদিনা প্রথমৈকবচনাদেশো বা লুগ্ বা, তথাচ তেন ত্বং তিষ্ঠসি, তস্মৈ ত্বং তিষ্ঠসীতি বা, ততঃ সঞ্জাত ইতি বা তস্য ত্বমিতি বা, তস্মিংস্ত্বমিতি বা বাক্যার্থঃ, অনেন জীবেনাত্মনাহনুভূতঃ, পেপীয়মানো মোদমানস্তিষ্ঠতি। সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সংপ্রতিষ্ঠাঃ ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বমিতি বাক্যশেষ ইত্যাদি।—পরপক্ষগিরিবজ্র, ১ম অ, ৭।

টীকাকার জয়তীর্থ মুনি মধ্বাচার্য্যের তাৎপর্য্য বর্ণন করিতে বলিয়াছেন যে, জীব ঈশ্বরের অংশ নহে, এ বিষয়ে যে শ্রুতিপ্রমাণ আছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, জীব, মৎস্য কূর্ম্ম প্রভৃতি অবতারগণের ন্যায় ঈশ্বরের স্বাংশ বা স্বরূপাংশ নহে এবং জীব ঈশ্বরের অংশ, এ বিষয়ে যে শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণ আছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, জীব ঈশ্বরের বিভিন্নাংশ। নচেৎ উক্ত দ্বিবিধ শ্রুতির অন্য কোনরূপে বিরোধ পরিহার হইতে পারে না। সুতরাং মধ্বাচার্য্যের উদ্ধৃত দ্বিবিধ শ্রুতির অন্যরূপে উপপত্তি সম্ভব না হওয়ায় জীব ও ঈশ্বরের ভেদ স্বীকার করিয়া, শাস্ত্রে যেখানে অভেদ কথিত হইয়াছে, তাহার অর্থ বুঝিতে হইবে অংশত্ব। অর্থাৎ জীবে ঈশ্বরের অংশত্ব আছে, বাস্তব অভেদ নাই। মধ্বাচার্য্য পরে "আভাস এব চ" (২।৩।৫০) এই বেদান্তসূত্রের দ্বারা জীব যে, ঈশ্বরের প্রতিবিম্বাংশ, ইহাও সমর্থন করিয়া, মৎস্য কূর্ম্ম প্রভৃতি অবতারগণ ঈশ্বরের প্রতিবিম্বাংশ নহেন বলিয়া জীবের সহিত উহাঁদিগের তুল্যত্বাপত্তির নিরাস করিয়াছেন। সেখানে তিনি ঈশ্বরের যে প্রতিবিম্বাংশ এবং স্বরূপাংশ, এই দ্বিবিধ অংশ আছে, এ বিষয়েও বরাহপুরাণের বচন উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। সেই প্রমাণে "প্রতিবিম্বে স্বল্পসাম্যং" এই বাক্যের দ্বারা বুঝা যায় যে, যে অংশে অংশীর সামান্য সাদৃশ্য আছে, তাহাকে বলে প্রতিবিম্বাংশ। ইহাই পূর্ব্বে "বিভিন্নাংশ" নামে কথিত হইয়াছে। ঈশ্বরও চৈতন্যস্বরূপ, জীবও চৈতন্যস্বরূপ, সুতরাং অন্যান্যরূপে জীব ও ঈশ্বরের বাস্তব ভেদ থাকিলেও ঐ উভয়ের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্যও আছে। এই জন্যই ঈশ্বরের বিভিন্নাংশ জীব তাঁহার প্রতিবিম্বাংশ বলিয়াও কথিত হইয়াছে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য পূর্ব্বোক্ত বেদান্ত-সূত্রে "আভাস" শব্দের দ্বারা জীবের প্রতিবিম্বত্ববশতঃ মিথ্যাত্বই সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু মধ্বাচার্য্যের মতে জীব সত্য। জীব ঈশ্বরের প্রতিবিম্বাংশ হইলেও মিথ্যা হইতে পারে না। কারণ, জীবে ঈশ্বরের সাদৃশ্যপ্রযুক্তই জীবকে "আভাস" বলা হইয়াছে। ঐ তাৎপর্য্যেই "আভাস" ও "প্রতিবিম্ব" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। মধ্বাচার্য্যের উদ্ধৃত "প্রতিবিম্বে স্বল্প-সাম্যং" ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যের দ্বারাও উহাই সমর্থিত হইয়াছে। অর্থাৎ যেমন পুত্রে পিতার কিঞ্চিৎ সাদৃশ্যপ্রযুক্তই পুত্রকে পিতার প্রতিবিম্ব বা ছায়া বলা হয়, কিন্তু পুত্র পিতা হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন পদার্থ ও সত্য, তদ্রূপ পরমেশ্বরের পুত্র জীবগণও তাঁহার কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য-প্রযুক্তই পরমেশ্বরের প্রতিবিম্বাংশ বলিয়া কথিত হইয়াছে, কিন্তু জীবগণ পরমেশ্বর হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন পদার্থ ও সত্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, অংশ দ্বিবিধ—স্বরূপাংশ ও বিভিন্নাংশ; মৎস্য কূর্ম্ম প্রভৃতি অবতারগণ ঈশ্বরের স্বরূপাংশ বলিয়াই ঈশ্বর হইতে তাঁহারা স্বরূপতঃ অভিন্ন। কিন্তু জীব, ঈশ্বরের বিভিন্নাংশ বলিয়া জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ অভেদ নাই, কেবল ভেদই আছে, ইহাই মধ্বাচার্য্যের সিদ্ধান্ত, এবং বৈষ্ণব দার্শনিকগণের মধ্যে পূর্ব্বোক্তরূপ দ্বৈতবাদই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন মত, ইহা বুঝা যায়। এই মতে অংশ হইলেই তাহা অংশী হইতে স্বরূপতঃ অভিন্ন হয় না। জীব ঈশ্বরের সম্বন্ধী, এই তাৎপর্য্যেও জীবকে ঈশ্বরের অংশ বলা যায়। ঐরূপ তাৎপর্য্যে ভিন্ন পদার্থও অংশ বলিয়া কথিত হয়, ইহার

অনেক দৃষ্টান্ত আছে। নিম্বার্ক স্বামী জীবকে ঈশ্বরের অংশ বলিয়া স্বরূপতঃই জীব ও ঈশ্বরের ভেদ ও অভেদ স্বীকার করিয়াছেন। মধ্বাচার্য্য তাহা স্বীকার করেন নাই। তাঁহার মতে জীব ঈশ্বরের বিভিন্নাংশ। সুতরাং জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ অভেদ নাই, কেবল ভেদই বাস্তব তত্ত্ব। পরবর্ত্তী কালে মধ্বশিষ্য ব্যাসতীর্থ ও মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্গত আরও অনেক মহানৈয়ায়িক সূক্ষ্ম বিচার করিয়া পূর্ব্বোক্ত মাধ্বমতের বিশেষ সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। এ বিষয়ে "ন্যায়ামৃত" প্রভৃতি অনেক গ্রন্থে অনেক সূক্ষ্ম বিচার পাওয়া যায়। মাধ্বসম্প্রদায়ের অমুদ্রিত অনেক প্রাচীন গ্রন্থেও উক্ত মতের বিশেষ সমর্থন পাওয়া যায়। ফলকথা, মধ্বাচার্য্যের ব্যাখ্যাত পূর্ব্বোক্তরূপ প্রাচীন দ্বৈতবাদ যে দেশবিশেষে ও সম্প্রদায়বিশেষে বিশেষরূপে সমাদৃত ও প্রচারিত হইয়াছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।

প্রেমাবতার ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব কোন কোন বিষয়ে বিশিষ্ট মত গ্রহণ করিলেও তিনিও মাধ্বমতানুসারে জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ ভেদবাদই গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সম্প্রদায় শ্রীজীবগোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণব দার্শনিকগণও উক্ত বিষয়ে মাধ্বমতেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন. ইহাই আমার মনে হয়। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতের ব্যাখ্যাতা সুপণ্ডিত বৈষ্ণবগণও বলেন যে, শ্রীচৈতন্যদেব এবং তাঁহার সম্প্রদায়-রক্ষক শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণব দার্শনিকগণ জীব ও ঈশ্বরের অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদী। "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থের আধুনিক টিপ্পনীকারগণও ঐ ভাবের কথাই লিখিয়াছেন। সুতরাং এখানে উক্ত বিষয়ে তাঁহাদিগের কথার সমালোচনা করা আবশ্যক। উক্ত মতের মূল বিষয়ে বহু জিজ্ঞাসার পরে কোন বহু-বিজ্ঞ বৃদ্ধ গোস্বামী পণ্ডিত মহোদয়ের নিকটে জানিতে পাই যে, শ্রীমদ্‌ভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোকের দ্বিতীয় পাদের টীকায় পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী কল্পান্তরে যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন,[১] তদ্‌দ্বারা ব্রহ্মরূপ বস্তুর অংশ জীব, এবং ঐ ব্রহ্মের শক্তি মায়া ও ব্রহ্মের কার্য্য জগৎ, এই সমস্ত ঐ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহে, এই সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। সেখানে "ব্যাখ্যালেশ"কার শ্রীধর স্বামীর তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়া, শ্রীধর স্বামীর মতে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ ও অভেদ, উভয়ই তত্ত্ব, ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীধর স্বামীর ব্যাখ্যানুসারে শ্রীমদ্‌ভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোকের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ভেদাভেদবাদই চরম সিদ্ধান্ত বুঝা যায়। পরন্তু শ্রীমদ্‌ভাগবতাদি অনেক গ্রন্থে যখন জীবকে ঈশ্বরের অংশ বলা হইয়াছে, তখন জীব ও ঈশ্বরের অংশাংশিভাবে ভেদ ও অভেদ, উভয়ই সিদ্ধান্ত বুঝা যায়। নিম্বার্ক স্বামীও ঐ জন্য জীব ও ব্রহ্মের ভেদ ও অভেদ, উভয়কেই বাস্তব তত্ত্ব বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। পরন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য প্রভুপাদ শ্রীজীব গোস্বামী "তত্ত্বসন্দর্ভে" ব্রহ্মতত্ত্বকে জীবস্বরূপ হইতে অভিন্ন বলিয়াছেন। তিনি "পরমাত্মসন্দর্ভে"ও

১। বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনং। ভাগবত, ২য় শ্লোক। যদ্বা বাস্তবশব্দেন বস্তুনোঽংশো জীবঃ, বস্তুনঃ শক্তির্মায়া চ, বস্তুনঃ কার্য্যং জগচ্চ তৎ সর্ব্বং বস্ত্বেব, ন ততঃ পৃথগিতি বেদ্যং অযত্নেনৈব জ্ঞাতুং শক্যমিত্যর্থঃ।—স্বামিটীকা।

শাস্ত্রে জীব ও ঈশ্বরের ভেদ নির্দ্দেশ ও অভেদ নির্দ্দেশের উপপাদন করিয়াছেন এবং ইহাও বলিয়াছেন যে, যাঁহারা জ্ঞানলিপ্সু, তাঁহাদিগের জন্যই শাস্ত্রে কোন কোন স্থলে জীব ও ব্রহ্মের অভেদের উপদেশ হইয়াছে, এবং যাঁহারা ভক্তিলিপ্সু, তাঁহাদিগের জন্য শাস্ত্রে জীব ও ব্রহ্মের ভেদের উপদেশ হইয়াছে। সুতরাং শ্রীজীব গোস্বামীর ঐ সকল কথা দ্বারা তিনি যে জীব ও ব্রহ্মের ভেদের ন্যায় অভেদও স্বীকার করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। পরন্তু "শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত" গ্রন্থে পাওয়া যায়, শ্রীচৈতন্যদেব তাঁহার প্রিয় ভক্ত সনাতন গোস্বামীকে উপদেশ করিতে বলিয়াছিলেন,—"জীবের স্বরূপ হয় নিত্য কৃষ্ণের দাস। কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ॥" (মধ্য খণ্ড, ২০শ পরিচ্ছেদ)। উক্ত শ্লোকে জীবের স্বরূপ বলিতে "ভেদাভেদ-প্রকাশ" এই কথার দ্বারা জীব ও ঈশ্বরের ভেদ ও অভেদ, উভয়ই তত্ত্ব, ঐ উভয়ই শ্রীচৈতন্যদেবের সম্মত, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার সম্প্রদায়রক্ষক গোস্বামিপাদগণ জীব ও ব্রহ্মের অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদী, ইহাই প্রসিদ্ধ আছে।

পূর্ব্বোক্ত কথায় বক্তব্য এই যে, পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় শ্লোকের দ্বিতীয় পাদের শেষে কল্পান্তরে যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তদ্দ্বারা ভেদাভেদবাদই বুঝা যায় না। কারণ, তিনি সেখানে জীবাদির উল্লেখ করিয়া "তৎ সর্ব্বং বস্ত্বেব" এইরূপ কথাই লিখিয়াছেন। সুতরাং উহার দ্বারা জীব প্রভৃতি সেই ব্রহ্মবস্তু হইতে পৃথক্ নহে অর্থাৎ ব্রহ্মসত্তা হইতে উহাদিগের বাস্তব পৃথক্ সত্তা নাই, এই অদ্বৈত সিদ্ধান্তই তাঁহার বিবক্ষিত মনে হয়। পরন্তু শ্রীধরস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে উহার দ্বারা শেষে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের সম্মত অদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদেরই স্পষ্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীজীব গোস্বামীও ঐ শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতে শ্রীধর স্বামিপাদের যে ঐরূপই আশয়, অর্থাৎ তিনি যে ঐ শ্লোকের দ্বারা শেষে অদ্বৈতসিদ্ধান্তেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহা স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং দ্বিতীয় শ্লোকেও তিনি শেষে অদ্বৈত সিদ্ধান্তেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাঁহার ঐরূপই তাৎপর্য্য, ইহাই মনে হয়। কিন্তু যদিও শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীধরস্বামীকে অমান্য করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন, তথাপি শ্রীধরস্বামী মায়াবাদের ব্যাখ্যা করিলেও শ্রীচৈতন্যদেব উহা গ্রহণ করেন নাই; তিনি সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকটে মায়াবাদের খণ্ডন করিয়াছিলেন, মায়াবাদের নিন্দাও করিয়াছিলেন, এমন কি, ইহাও বলিয়াছিলেন,—"মায়াবাদী ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ।" (চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যখণ্ড, ৬ষ্ঠ পঃ)। ফলকথা, শ্রীধরস্বামীর ব্যাখ্যাত সমস্ত মতই যে শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার সম্প্রদায় শ্রীজীবগোস্বামী প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মত, ইহা কোনরূপেই বলা যাইবে না। পরন্তু শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থে জীব ঈশ্বরের অংশ, ইহা কথিত হইলেও তদ্দ্বারা জীব ও ঈশ্বরের যে স্বরূপতঃ ভেদ ও অভেদ, উভয়ই আছে, ইহা নিশ্চয় করা যায় না। কারণ, মধ্বাচার্য্যের মতানুসারে জীব ঈশ্বরের বিভিন্নাংশ হইলে তাহাতে স্বরূপতঃ ঈশ্বরের অভেদ নাই, ইহা বলা যাইতে পারে। এ বিষয়ে মধ্বাচার্য্যের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তাহার পরে "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থে "ভেদাভেদপ্রকাশ" এই কথার দ্বারাও জীব ও ঈশ্বরের যে

স্বরূপতঃই ভেদ ও অভেদ, উভয়ই তত্ত্বরূপে কথিত হইয়াছে, ইহাও বুঝা যায় না। উহার দ্বারা বুঝা যায় যে, শাস্ত্রে যেমন জীব ও ঈশ্বরের ভেদ প্রকাশ আছে, তদ্রূপ অভেদেরও প্রকাশ আছে। কিন্তু সেই অভেদ তত্ত্বতঃ অভেদ নহে, উহা জীব ও ঈশ্বরের একজাতীয়ত্বাদিপ্রযুক্ত অভেদ। শাস্ত্রে ঐরূপ অভেদ নির্দ্দেশের উদ্দেশ্য আছে, পরে তাহা ব্যক্ত হইবে। ফলকথা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ঐ কথার দ্বারা জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ অভেদ বুঝা যায় না। কারণ, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্য শ্লোকের দ্বারা শ্রীচৈতন্যদেব যে জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ অভেদ একেবারেই স্বীকার করিতেন না, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকটে অদ্বৈতবাদের খণ্ডন করিতে শ্রীচৈতন্যদেবের যে সকল উক্তি "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থে কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে আছে,—

"মায়াধীশ মায়াবশ ঈশ্বরে জীবে ভেদ। হেন জীবে ঈশ্বর সহ কহ অভেদ ? ॥
গীতাশাস্ত্রে জীবরূপ শক্তি করি মানে। হেন জীবে অভেদ কর ঈশ্বরের সনে ? ॥"

(মধ্যম খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ)।

পূর্ব্বোক্ত দুইটি শ্লোকের দ্বারা জীব ও ঈশ্বরের যে স্বরূপতঃ অভেদ নাই, ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। প্রথম শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, ঈশ্বর মায়ার অধীশ অর্থাৎ মায়া তাঁহার অধীন, কিন্তু জীব মায়ার অধীন, সুতরাং জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ অভেদ হইতেই পারে না। কারণ, জীব ও ঈশ্বরের তত্ত্বতঃ অভেদ থাকিলে ঈশ্বরকেও মায়ার অধীন বলিতে হয়। ঈশ্বরেরও জীবগত দোষের আপত্তি হয়। দ্বিতীয় শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, জীব ঈশ্বরের পরাপ্রকৃতি অর্থাৎ প্রধান শক্তি বলিয়াই ভগবদ্‌গীতায় কথিত হইয়াছে, সুতরাং তাদৃশ জীবকে ঈশ্বরের সহিত স্বরূপতঃ অভিন্ন বলা যায় না। কারণ, জীব ঈশ্বরের শক্তি হইলে ঈশ্বর আশ্রয়, ঐ শক্তি তাঁহার আশ্রিত, ইহা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে ঐ শক্তি ও শক্তিমানের স্বরূপতঃ কখনই অভেদ থাকিতে পারে না। কারণ, আশ্রয় ও আশ্রিত সর্ব্বত্র স্বরূপতঃ ভিন্ন পদার্থই হইয়া থাকে। নিম্বার্কসম্প্রদায়ের আধুনিক কোন প্রখ্যাত বাঙ্গালী বৈষ্ণব, মহাত্মা শ্রীচৈতন্যদেবও যে নিম্বার্ক-মতানুসারে জীব ও ঈশ্বরের ভেদাভেদবাদী ছিলেন, ইহা সমর্থন করিতে নিজকৃত নিম্বার্কভাষ্য-ভূমিকায় পূর্ব্বোক্ত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের দ্বিতীয় শ্লোকে "হেন জীবে ভেদ কর ঈশ্বরের সনে ?" এইরূপ পাঠ লিখিয়াছেন। কিন্তু প্রাচীন পুস্তকে এবং পরে যে বহু বিজ্ঞ গোস্বামী পণ্ডিতগণের সাহায্যে সংশোধনপূর্ব্বক ব্যাখ্যা সহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে "হেন জীবে অভেদ কর ঈশ্বরের সনে ?" এইরূপ পাঠই পাওয়া যায়। বস্তুতঃ ঐ স্থলে "হেন জীবে ভেদ কর ঈশ্বরের সনে ?" এইরূপ পাঠ প্রকৃত হইতেই পারে না। কারণ, ঐ স্থলে প্রণিধান করা আবশ্যক যে, কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়ের বর্ণনানুসারে শ্রীচৈতন্যদেব, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের নিকটে জীব ও ঈশ্বরের অদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদের খণ্ডন করিতেই ঐ সমস্ত কথা বলিয়াছিলেন। কিন্তু অদ্বৈতবাদীর মতে যখন জীব ও ঈশ্বরের বাস্তব ভেদই নাই, তখন অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিতে ঐ ভেদ খণ্ডন করা কোন-

রূপেই সঙ্গত হইতে পারে না। যিনি জীব ও ঈশ্বরের বাস্তব ভেদই মানেন না, তাহা বলেনও নাই, তাঁহাকে "হেন জীবে ভেদ কর ঈশ্বরের সনে?" এই কথা কিরূপে বলা যায়? শ্রীচৈতন্যদেব ঐ কথা কিরূপে বলিতে পারেন? ইহা অবশ্য চিন্তা করিতে হইবে। অবশ্য ঐ স্থলে "হেন জীবে ভেদ কর" এইরূপ পাঠ হইলেও "ভেদ" শব্দের বিয়োগ বা বিভাগ অর্থ গ্রহণ করিয়া এক প্রকার ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে, এবং ঐ কথার দ্বারা অদ্বৈতবাদের খণ্ডনও বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু উহা প্রকৃত পাঠ নহে। "হেন জীবে অভেদ কহ ঈশ্বরের সনে?" ইহাই প্রকৃত পাঠ[১]। তাহা হইলে এখন পাঠকগণ প্রণিধানপূর্ব্বক বিবেচনা করুন যে, উক্ত দুই শ্লোকে "হেন জীবে ঈশ্বর সহ কহত অভেদ?" এবং "হেন জীবে অভেদ কহ ঈশ্বরের সনে?" এই কথার দ্বারা শ্রীচৈতন্যদেবের কি মত বুঝা যায়। যদি ঈশ্বরের সহিত জীবের স্বরূপতঃ অভেদও থাকে, তাহা হইলে কি পূর্ব্বোক্ত কথার দ্বারা স্বরূপতঃ অভেদের ঐরূপ নিষেধ উপপন্ন হইতে পারে? পরন্তু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অন্যত্রও পাওয়া যায়, "কাহা পূর্ণানন্দৈশ্বর্য্য কৃষ্ণ মায়েশ্বর। কাহা ক্ষুদ্র জীব দুঃখী মায়ার কিঙ্কর॥" (অন্ত্যখণ্ড, পঞ্চম পঃ)। উক্ত শ্লোকের দ্বারাও জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ অভেদেরই নিষেধ হইয়াছে। সুতরাং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্লোকে "ভেদাভেদপ্রকাশ" এই কথার দ্বারা শাস্ত্রে যাহাতে ঈশ্বরের সহিত ভেদ প্রকাশ ও অভেদ প্রকাশ আছে, ইহাই তাৎপর্য্যার্থ বুঝিতে হইবে। শ্রীজীব গোস্বামী যে "অভেদ নির্দ্দেশ" বলিয়া উহার উপপাদন করিয়াছেন, তাহাই "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে" "অভেদ প্রকাশ" বলিয়া কথিত হইয়াছে। সেখানে "প্রকাশ" শব্দের প্রয়োগ কেন হইয়াছে, উহার অর্থ ও প্রয়োজন কি? ইহাও চিন্তা করা আবশ্যক। পরন্তু শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে যে ঈশ্বর প্রজ্বলিত অগ্নিসদৃশ ও জীব স্ফুলিঙ্গ কণার সদৃশ, ইহা কথিত হইয়াছে, তদ্দ্বারাও ঈশ্বরের সহিত জীবের স্বরূপতঃ অভেদ বুঝা যায় না। কারণ, অন্যান্য শ্লোকের দ্বারা স্বরূপতঃ অভেদ নাই, ইহাই প্রতিপন্ন হওয়ায় ঈশ্বর ও জীবের অগ্নি ও স্ফুলিঙ্গের সহিত যথাসম্ভব সাদৃশ্যই সেখানে বুঝিতে হইবে, অসম্ভব সাদৃশ্য বুঝা যাইবে না। জীবচৈতন্য নিত্য পদার্থ, সুতরাং উহা ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন না হওয়ায় এবং উহার বিনাশ সম্ভব না হওয়ায় অগ্নিস্ফুলিঙ্গের সহিত উহার অনেক অংশে সাদৃশ্য সম্ভবও নহে। পরন্তু জীব ঈশ্বরের অংশ বলিয়া কথিত হইলেও তদ্দ্বারা ঈশ্বরের সহিত জীবের স্বরূপতঃ অভেদ সিদ্ধ হয় না। কারণ, জীব ঈশ্বরের শক্তিবিশেষ, এ জন্যই ভিন্ন পদার্থ হইয়াও ঈশ্বরের অংশ বলিয়া কথিত হইয়াছে। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও ইহাই বলিয়াছেন[২] এবং তিনিও গোবিন্দভাষ্যে মাধ্বমতানুসারেই জীবকে ঈশ্বরের বিভিন্নাংশ বলিয়াছেন। জীব ঈশ্বরের

১। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের প্রাচীন পুথিশালায় সংরক্ষিত হস্ত-লিখিত "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থে "হেন জীবে অভেদ কহ ঈশ্বরের সনে?" এইরূপ পাঠ আছে। ঐ পুস্তকের লিপিকাল ১০৮০ বঙ্গাব্দ।

২। স চ তদভিন্নোঽপি তচ্ছক্তিরূপত্বাৎ তদংশো নিগদ্যতে ইত্যাদি।—সিদ্ধান্তরত্ন, ৮ম পাদ।

বিভিন্নাংশ বলিয়াই ঈশ্বরের সহিত তাহার স্বরূপতঃ অভেদ নাই। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থেও ঈশ্বরের অবতারগণ তাঁহার স্বাংশ, এবং জীব তাঁহার বিভিন্নাংশ, ইহা কথিত হইয়াছে। যথা— "স্বাংশ বিস্তার চতুর্ব্যূহ অবতারগণ। বিভিন্নাংশ জীব তাঁর শক্তিতে গণন॥" (মধ্যম খণ্ড, ২২শ পরিচ্ছেদ)। ফলকথা, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের কোন শ্লোকের দ্বারা শ্রীচৈতন্যদেব যে, নিম্বার্কমতানুসারে জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ ভেদাভেদবাদী ছিলেন, ইহা বুঝা যায় না। কারণ, বহু শ্লোকের দ্বারাই তিনি মাধ্বমতানুসারে জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ ঐকান্তিক ভেদবাদী ছিলেন, ইহাই আমরা বুঝিতে পারি। তবে উক্ত বিষয়ে তাঁহার প্রকৃত মত নির্ণয় করিতে হইলে তিনি যে ভক্তচূড়ামণি প্রভুপাদ শ্রীসনাতন গোস্বামীকে শ্রীমুখে তাঁহার সিদ্ধান্ত বলিয়াছিলেন,সেই সনাতন গোস্বামীর নিকটে শিক্ষিত হইয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভুপাদ শ্রীজীবগোস্বামী ও তাঁহার সম্প্রদায়রক্ষক শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়, যিনি শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দের আদেশে বেদান্তদর্শনের গোবিন্দভাষ্য নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন,তিনি উক্ত বিষয়ে কিরূপ সিদ্ধান্ত বলিয়া গিয়াছেন, তাহাই সর্ব্বাগ্রে বুঝা আবশ্যক। কিন্তু তাঁহাদিগের গ্রন্থে নানা স্থানে নানারূপ কথা আছে। তাঁহাদিগের সমস্ত কথার সামঞ্জস্য করিয়া তাঁহাদিগের প্রকৃত মত নির্ণয় করা এবং তাঁহাদিগের নানা কথায় নানা আপত্তির নিরাস করা অতি দুঃসাধ্য বলিয়াই মনে হইয়াছে। তথাপি বহু চিন্তা ও পরিশ্রমে ক্ষুদ্র বুদ্ধির দ্বারা যত দূর বুঝিয়াছি, তাহাতে শ্রীচৈতন্যদেব নিম্বার্কমতানুসারে জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ ভেদাভেদবাদ গ্রহণ করেন নাই। তিনি মাধ্বমতানুসারে জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ ভেদবাদই গ্রহণ করিয়াছিলেন। মধ্বাচার্য্যের মতের সহিত তাঁহার মতের কোন কোন অংশে পার্থক্য থাকিলেও জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ ঐকান্তিক ভেদ বিষয়ে তিনি যে মাধ্বমতকেই গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তদনুসারে তাঁহার সম্প্রদায়রক্ষক শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতিও যে উক্ত মাধ্বমতেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন, ইহাই আমার বোধ হইয়াছে। ক্রমশঃ ইহার কারণ বলিতেছি।

প্রথমতঃ দেখিতে পাই, শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় শ্রীজীব গোস্বামিপাদের "তত্ত্বসন্দর্ভে"র টীকার প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণের প্রথম শ্লোকে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিয়া, দ্বিতীয় শ্লোকে তুল্যভাবে মধ্বাচার্য্যের প্রতিও ভক্তি প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি সেখানে নিম্বার্ক অথবা অন্য কোন বৈষ্ণবাচার্য্যের নামোল্লেখ করেন নাই। পরন্তু শ্রীজীব গোস্বামীও "তত্ত্বসন্দর্ভে" "শ্রীমধ্বাচার্য্যচরণৈঃ" ইত্যাদি এবং "তত্ত্ববাদগুরূণাং...শ্রীমধ্বাচার্য্যচরণানাং" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা মধ্বাচার্য্যের প্রতি অত্যাদর প্রকাশ করিয়াছেন। সেখানে টীকাকার শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় মধ্বাচার্য্যের প্রতি শ্রীজীবগোস্বামিপাদের অত্যাদরের কারণ প্রকাশ করিতে হেতু বলিয়াছেন, "স্বপূর্ব্বাচার্য্যত্বাৎ"। সুতরাং তাঁহার ঐ কথার দ্বারাও শ্রীজীবগোস্বামী যে, জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ ঐকান্তিক ভেদ বিষয়ে তাঁহার পূর্ব্বাচার্য্য মধ্বমুনির মতই সাদরে গ্রহণ করিয়া সমর্থন করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও মঙ্গলাচরণ-শ্লোকে শ্রীচৈতন্যদেবের ন্যায় তুল্যভাবে মধ্বাচার্য্যের

প্রতিও অত্যাদর প্রকাশ করিয়াছেন। পরন্তু তিনি মধ্বাচার্য্যের পূর্ব্বোক্ত মতানুসারেই গোবিন্দভাষ্যে বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন ; কারণ, জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ ঐকান্তিক ভেদ বিষয়ে মধ্বাচার্য্যের মতই শ্রীচৈতন্যদেবের স্বীকৃত, ইহা তাঁহার গোবিন্দ-ভাষ্যের টীকার প্রারম্ভে স্পষ্টই কথিত হইয়াছে[১] এবং তিনি যে, মধ্বাচার্য্যের "তত্ত্ববাদ" আশ্রয় করিয়াই সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহা তাঁহার "সিদ্ধান্তরত্ন" গ্রন্থের শেষ শ্লোকের দ্বারাও স্পষ্ট বুঝা যায়[২]। ঐ গ্রন্থের বিজ্ঞতম টীকাকারও সেখানে ঐ শ্লোকের প্রয়োজন বুঝাইতে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়কে "মাধ্বান্বয়দীক্ষিতভগবৎকৃষ্ণচৈতন্যমতস্থ" বলিয়াছেন[৩]। ঐ শ্লোকের শেষে যে, "তত্ত্ববাদ" বলা হইয়াছে, উহা মাধ্ব সিদ্ধান্তেরই নামান্তর। তাই মধ্বাচার্য্য ও তাঁহার সম্প্রদায় বৈষ্ণবগণ "তত্ত্ববাদী" বলিয়া প্রসিদ্ধ। তত্ত্ববাদী বৈষ্ণবগণও অন্যান্য বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সহিত কোন স্থানে শ্রীচৈতন্যদেবের দর্শন-প্রভাবেই শ্রীকৃষ্ণের উপাসক হইয়া কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহাও "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থে বর্ণিত আছে এবং মধ্বাচার্য্য বিষ্ণুকে পরতত্ত্ব বলিলেও শ্রীচৈতন্যদেব পরিপূর্ণশক্তি স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেই পরতত্ত্ব বলিয়াছিলেন, ইহাও ঐ গ্রন্থে বর্ণিত আছে। (মধ্যমখণ্ড, ৯ম ও ২০শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) ; সুতরাং পরতত্ত্ব বিষয়ে মধ্বাচার্য্যের মত হইতে শ্রীচৈতন্যদেব যে, বিশিষ্ট মতই গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা বুঝা যায়। শ্রীচৈতন্যসম্প্রদায় প্রভুপাদ শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতিও গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব, এই সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ কেবল ভেদই আছে, এই মাধ্বমতেরই সমর্থন করিয়াছেন। অবশ্য শ্রীজীব গোস্বামী "তত্ত্বসন্দর্ভে" জীবস্বরূপ বর্ণনের পরে বলিয়াছেন যে,[৪] এবম্ভূত জীবসমূহের চিন্মাত্র যে স্বরূপ, তাহার সজাতীয়ত্ব ও অংশিত্ববশতঃ সেই জীবস্বরূপ হইতে অভিন্ন যে ব্রহ্মতত্ত্ব, তাহা এই গ্রন্থে বাচ্য। এখানে প্রথমে বুঝা আবশ্যক যে, শ্রীজীব গোস্বামী

১। 'অথ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যহরিস্বীকৃতমধ্বমুনিমতানুসারতো ব্রহ্মসূত্রাণি ব্যাচিখ্যাসুর্ভাষ্যকারঃ শ্রীগোবিন্দৈকান্তী বিদ্যাভূষণাপরনামা বলদেবঃ" ইত্যাদি।

২। আনন্দতীর্থপ্রণুতমচ্যুতং মে চৈতন্যভাস্বৎপ্রভয়াতিফুল্লং।
চেতোঽরবিন্দং প্রিয়তামরন্দং পিবন্ত্বলিঃ সচ্ছবিতত্ত্ববাদঃ॥
—শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণকৃত "সিদ্ধান্তরত্নে"র শেষ শ্লোক।

৩। অথাত্মনঃ শ্রীমাধ্বান্বয়দীক্ষিতভগবৎকৃষ্ণচৈতন্যমতস্থত্বমাহ। "তত্ত্ববাদঃ";—সর্ব্বং বস্তু সত্যং ন কিঞ্চিদসত্ মস্তীতি মধ্বরাদ্ধান্তঃ।—উক্ত শ্লোকের টীকা।

৪। "এবম্ভূতানাং জীবানাং চিন্মাত্রং যৎ স্বরূপং তদৈবাকৃত্যা তদংশিত্বেনচ তদভিন্নং যৎ তত্ত্বং তদত্র বাচ্যমিতি ব্যষ্টিনির্দ্দেশদ্বারা প্রোক্তং"। তত্ত্বসন্দর্ভ। ঈশ্বরজ্ঞানার্থং জীবস্বরূপজ্ঞানং নির্ণীতং, অথ তৎসাদৃশ্যেনেশ্বরস্বরূপং নির্ণেতুং পূর্ব্বোক্তং যোজয়তি, "এবম্ভূতানা"মিত্যাদিনা। "তদৈবাকৃত্যে"তি, চিন্মাত্রত্বে সতি চেতয়িতৃত্বং যাকৃতির্জ্জাতিস্তয়া ইত্যর্থঃ। তদংশিত্বেন জীবাংশিত্বেন চেত্যর্থঃ"। "অংশঃ খলু অংশিনো ন ভিদ্যতে পুরুষাদিব দণ্ডিনো দণ্ডঃ"। জীবাদিশক্তিমদ্ব্রহ্মসমষ্টিঃ, জীবস্তু ব্যষ্টিঃ। তাদৃশজীবনিরূপণদ্বারা শাস্ত্রস্য ব্রহ্মসম্বন্ধিত্বমুক্তং। অত্র জীবাদিশক্তিবিশিষ্টসমষ্টিব্রহ্মনিরূপণেন তস্য তথাত্বং বক্তব্যমিত্যর্থঃ। —বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত টীকা।

ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণ করিতে প্রথমে জীবস্বরূপ নিরূপণ করিয়াছেন কেন? ইহার কারণ বলিতেই—উক্ত সন্দর্ভের দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিতে যে, জীবস্বরূপ বুঝা আবশ্যক, ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি জীবসমূহকেও অনন্তশক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মের অন্যতম প্রধান শক্তি বলিয়াছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শ্রীচৈতন্যদেবের মতানুসারে ভগবদ্গীতার সপ্তম অধ্যায়ের "অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাং। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ" ॥ এই (৫ম) শ্লোকের এবং বিষ্ণুপুরাণের 'বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা'' ইত্যাদি বচন[১] এবং আরও অনেক শাস্ত্রপ্রমাণের দ্বারা জীবসমূহকে ঈশ্বরের শক্তি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। জীব ঈশ্বরের পরাপ্রকৃতি অর্থাৎ প্রধান শক্তিবিশেষ, ইহাই পূর্ব্বোক্ত ভগবদ্গীতা-বাক্যের দ্বারা তাঁহারা বুঝিয়াছেন। অসংখ্য জীবচৈতন্য ঈশ্বরের সৃষ্ট্যাদি কার্য্যের সহায়, জীব না থাকিলে তাঁহার সৃষ্ট্যাদি ও লীলা হইতে পারে না, এই জন্য জীবকে তাঁহার শক্তি বলা হইয়াছে। "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥" এই ভগবদ্গীতা-(১৮।৬১) বচনের দ্বারা প্রত্যেক জীবদেহে যে একই ঈশ্বর অন্তর্যামিরূপে সতত অবস্থান করিতেছেন, এবং প্রত্যেক দেহে এক একটী জীবচৈতন্য সেই ঈশ্বরের অধীন হইয়া সেই ঈশ্বরের সহিতই নিত্য সংশ্লিষ্ট হইয়া বিদ্যমান আছে,ইহা বুঝিলে জীব ঈশ্বরের নিত্যসংশ্লিষ্ট শক্তি এবং তাঁহার মায়াশক্তির অধীন বলিয়া "তটস্থা শক্তি,'' ইহা বলা যাইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত জীব-শক্তি ঈশ্বরের নিত্য বিশেষণ; কারণ, ঈশ্বর সতত ঐ শক্তিবিশিষ্ট। ঈশ্বর তাঁহার বাস্তব অনন্ত শক্তি হইতে কখনই বিযুক্ত হন না, শক্তিমান্‌কে পরিত্যাগ করিয়া শক্তি কখনই থাকিতে পারে না। জীব প্রভৃতি অনন্ত শক্তিবিশিষ্ট চৈতন্যই ঈশ্বর, তাঁহার নিত্য বিশেষণ ঐ অনন্তশক্তিকে ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ চৈতন্যের ঈশ্বরত্ব নাই, পূর্ব্বোক্ত বাস্তব শক্তি-বিশিষ্ট ঈশ্বর-চৈতন্য হইতে অতিরিক্ত ব্রহ্মতত্ত্বও নাই, এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতেই পূর্ব্বোক্ত তাৎপর্য্যে শ্রীজীব গোস্বামী জীব শক্তিকে ঈশ্বরের নিত্য বিশেষণরূপ অংশ ও ব্যষ্টি লিখিয়াছেন এবং উহা বলিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিতে যে, তাঁহার জীবরূপ শক্তি বুঝা নিতান্ত আবশ্যক, সেই জন্যই তিনি পূর্ব্বে জীবস্বরূপ নিরূপণ করিয়াছেন, ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু সেখানে তিনি ব্রহ্মকে জীব হইতে স্বরূপতঃ অভিন্ন বলেন নাই, অর্থাৎ জীবচৈতন্য ও ব্রহ্মচৈতন্য যে তত্ত্বতঃ অভিন্ন বস্তু, ইহা তিনি বলেন নাই। কারণ, তিনি সেখানে ব্রহ্মকে জীবস্বরূপ হইতে অভিন্ন বলিতে লিখিয়াছেন, "তদ্বৈবাকৃতা তদংশিত্বেন চ তদভিন্নং যত্তত্ত্বং"। এখানে প্রণিধান করা আবশ্যক যে, উক্ত বাক্যে ব্রহ্মে জীবের সজাতীয়ত্ব ও অংশিত্ববশতঃ অভেদ বলা হইয়াছে। ব্রহ্মও চৈতন্যস্বরূপ, জীবও চৈতন্যস্বরূপ, সুতরাং চিৎস্বরূপে ব্রহ্ম জীবের একাকৃতি অর্থাৎ সজাতীয়, এবং জীব ব্রহ্মের নিত্য-সিদ্ধ বিশেষণ, ব্রহ্ম কখনই জীবশক্তি হইতে বিযুক্ত হন না, জীবশক্তিকে ত্যাগ করিয়া নির্ব্বিশেষ

১। বিষ্ণুশক্তিঃ পরা প্রোক্তা ক্ষেত্রজ্ঞাখ্যা তথাপরা।
অবিদ্যা কর্ম্মসংজ্ঞান্যা তৃতীয়া শক্তিরিষ্যতে ॥ —বিষ্ণুপুরাণ। ৬।৭।৬১।

নিঃশক্তি চৈতন্যমাত্রের অস্তিত্বই নাই, এই জন্য ব্রহ্মকে জীবের অংশী বলা হইয়াছে। জীবকে ব্রহ্মের অংশ ও ব্যষ্টি বলা হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্ম জীবের সজাতীয়ত্ব ও অংশিত্ব-বশতঃ জীব হইতে অভিন্ন, ইহা বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাহাতে জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপতঃ অভেদ বলা হয় না। তাহা হইলে শ্রীজীব গোস্বামী ঐ স্থলে "স্বরূপতস্তদভিন্নং" এই কথা না বলিয়া "তদৈবাকৃত্যা তদংশিত্বেন চ তদভিন্নং" এইরূপ কথা বলিয়াছেন কেন? ইহাও প্রণিধানপূর্ব্বক চিন্তা করা আবশ্যক। টীকাকার শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় পূর্ব্বোক্ত স্থলে শ্রীজীব গোস্বামীর তাৎপর্য্য বর্ণন করিতে লিখিয়াছেন, "অংশঃ খলু অংশিনো ন ভিদ্যতে পুরুষাদিব দণ্ডিনো দণ্ডঃ।" অর্থাৎ দণ্ডী পুরুষ যেমন তাঁহার বিশেষণ দণ্ড হইতে বিযুক্ত হন না, তাহা হইলে তাঁহাকে তখন দণ্ডী বলা যায় না, তদ্রূপ ঈশ্বর তাঁহার নিত্য-বিশেষণ জীবশক্তি হইতে কখনই বিযুক্ত হন না। তাই ঈশ্বরকে অংশী বলিয়া জীব শক্তিকে তাঁহার অংশ বলা হইয়াছে। দণ্ডী পুরুষের বিশেষণ দণ্ডকে যেমন ঐ দণ্ডী পুরুষের অংশ বলা যায়, তদ্রূপ ঈশ্বরের নিত্যসম্বদ্ধ বিশেষণ জীবশক্তিকে তাঁহার অংশ বলা হইয়াছে। কিন্তু দণ্ডী পুরুষ ও দণ্ডের যেমন স্বরূপতঃ অভেদ নাই, কেবল ভেদই আছে, তদ্রূপ জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ অভেদ নাই, কেবল ভেদই আছে। ফলকথা, এখানে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় দণ্ডী পুরুষ ও তাঁহার দণ্ডকে যখন অংশী ও অংশের দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন, তখন অংশী ঈশ্বর ও অংশ জীবের দণ্ডী পুরুষ ও দণ্ডের ন্যায় স্বরূপতঃ ঐকান্তিক ভেদ প্রদর্শনই তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝা যায়। নচেৎ তিনি অন্যান্য দৃষ্টান্ত ত্যাগ করিয়া ঐ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিবেন কেন? এবং স্বরূপতঃ অভেদ পক্ষে তাঁহার ঐ দৃষ্টান্ত কিরূপেই বা সংগত হইবে? ইহাও প্রণিধানপূর্ব্বক চিন্তা করা আবশ্যক। এখন যদি অংশ ও অংশীর স্বরূপতঃ ভেদই তাঁহার সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে উদ্ধৃত টীকাসন্দর্ভে "ন ভিদ্যতে" এই বাক্যের ব্যাখ্যা বুঝিতে হইবে "ন বিযুজ্যতে"। বিয়োগ বা বিভাগ অর্থেও 'ভিদ্'-ধাতুর প্রয়োগ দেখা যায়, উহা অপ্রামাণিক নহে। পরন্তু শ্রীজীব গোস্বামী "তত্ত্বসন্দর্ভে" পূর্ব্বে জীব ও ঈশ্বরের অভেদবোধক শাস্ত্রের বিরোধপরিহারের জন্য জীব ও ঈশ্বর, এই উভয়ের চৈতন্যরূপতাবশতঃ যে অভেদ বলিয়াছেন, তদ্দ্বারাও তাঁহার মতে জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ অভেদ নাই, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। শ্রীজীব গোস্বামী শাস্ত্রে জীব ও ঈশ্বরের অভেদ নির্দ্দেশের আরও অনেক হেতু বলিয়াছেন। তাঁহার মতে জীব ও ঈশ্বরে স্বরূপতঃ অভেদ নাই বলিয়াই তিনি অভেদ-বোধক শাস্ত্রের বিরোধ পরিহার করিতে ঐ সমস্ত হেতু নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেখানে টীকাকার বলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও দৃষ্টান্তদ্বারা শ্রীজীব গোস্বামীর বক্তব্য[1] বুঝাইয়া, উপসংহারে তাঁহার মূল বক্তব্য স্পষ্ট করিয়াই

১। "অত এব অভেদশাস্ত্রাণ্যুভয়োশ্চিদ্রূপত্বেন" ইত্যাদি।—তত্ত্বসন্দর্ভ। "কেন হেতুনা ইত্যাহ। উভয়োরীশজীবয়োশ্চিদ্রূপত্বেন হেতুনা। যথা গৌরশ্যামযোস্তরুণকুমারয়োর্ব্বা বিপ্রয়োর্ব্বিপ্রত্বেনৈক্যং ততশ্চ জ ত্যৈবাভেদো ন তু ব্যক্ত্যেতিভাবঃ। তথাচাত্র "ঈশজীবয়োঃ স্বরূপাভেদো নাস্তীতি সিদ্ধং"।—টীকা।

প্রকাশ করিতে লিখিয়াছেন,—"তথা চাত্র ঈশজীবয়োঃ স্বরূপাভেদো নাস্তীতি সিদ্ধং।" তিনি দৃষ্টান্ত দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্ত বুঝাইয়াছেন যে, যেমন গৌরবর্ণ ও শ্যামবর্ণ ব্রাহ্মণদ্বয়ের অথবা যুবক ও বালক ব্রাহ্মণদ্বয়ের ব্রাহ্মণত্বরূপে ঐক্য থাকায় জাতিরূপে অভেদ আছে; কিন্তু ব্যক্তিদ্বয়ের অভেদ নাই অর্থাৎ জাতিগত অভেদ থাকিলেও ব্যক্তিগত অভেদ নাই, তদ্রূপ জীবও চৈতন্য-স্বরূপ, ঈশ্বরও চৈতন্যস্বরূপ, সুতরাং উভয়েই চিৎস্বরূপে একজাতীয় বলিয়া শাস্ত্রে ঐরূপ তাৎপর্য্যে উভয়ের অভেদ নির্দ্দেশ হইয়াছে, কিন্তু জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ অভেদ নাই, ভেদই আছে। এখানে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় পূর্ব্বোক্তরূপ দৃষ্টান্তদ্বারা শ্রীজীব গোস্বামিপাদের পূর্ব্বোক্তরূপ সিদ্ধান্তেরই সমর্থন ও স্পষ্ট প্রকাশ করায় জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ ভেদাভেদ-বাদ যে তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত নহে, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। পরন্তু শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাঁহার "সিদ্ধান্তরত্ন" গ্রন্থের অষ্টম পাদে ভেদাভেদবাদের উল্লেখ করিয়া, ঐ মতের খণ্ডনই করিয়াছেন। সেখানে তিনি জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ অভেদ থাকিলে দোষও বলিয়া-ছেন[১] এবং জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ অভেদও তত্ত্ব হইলে ঐ অভেদের জ্ঞানবশতঃ ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি হইতে পারে না, ইহাও অনেক স্থানে বলিয়াছেন এবং স্বরূপতঃ ভেদপক্ষই অর্থাৎ উক্ত বিষয়ে মাধ্বসিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়া ভক্তির সমর্থন করিয়াছেন। শাস্ত্রে জীব ও ঈশ্বরের অভেদ নির্দ্দেশ আছে কেন? ইহা বুঝাইতে তিনিও "সিদ্ধান্তরত্ন" গ্রন্থের শেষে ঐ অভেদ নির্দ্দেশের অনেক হেতু বলিয়াছেন। শ্রীজীব গোস্বামী "পরমাত্মসন্দর্ভে"ও শাস্ত্রে জীব ও ঈশ্বরের ভেদ নির্দ্দেশের ন্যায় অভেদ নির্দ্দেশও আছে, ইহা স্বীকার করিয়া, উহার সামঞ্জস্য প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন যে, শক্তি ও শক্তিমানের পরস্পরানুপ্রবেশ-বশতঃ এবং শক্তিমান্ ব্যতিরেকে শক্তির অসম্ভাবশতঃ এবং জীব ও ঈশ্বর, এই উভয়ের চৈতন্যস্বরূপতার অবিশেষবশতঃ শাস্ত্রে কোন কোন স্থলে জীব ও ঈশ্বরের অভেদ নির্দ্দেশ হইয়াছে। পরে তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, জ্ঞানেচ্ছু অধিকারিবিশেষের জন্যই শাস্ত্রে কোন কোন স্থলে জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ অভেদ নির্দ্দেশ হইয়াছে। কিন্তু ভক্তিলাভেচ্ছু অধিকারীদিগের জন্য জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ ভেদ নির্দ্দেশ হইয়াছে। পরে "ভক্তিসন্দর্ভে" তিনি কৈবল্যকামী অধিকারিবিশেষের কৈবল্য মুক্তিলাভের কারণ জ্ঞানমিশ্র ভক্তিবিশেষও বলিয়াছেন এবং সেখানে "অহংগ্রহ উপাসনা" অর্থাৎ সোহহং জ্ঞানরূপ উপাসনা যে শুদ্ধ ভক্তগণের বিদ্বিষ্ট, তাঁহারা উহা করিতেই পারেন না, ইহাও বলিয়াছেন। সুতরাং কৈবল্য-মুক্তি আছে এবং অধিকারিবিশেষের সাধনার ফলে উহা হইয়া থাকে। যাঁহারা কৈবল্য মুক্তিই পরমপুরুষার্থ মনে করিয়া উহাই ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ঐকাত্ম্যদর্শনরূপ জ্ঞানলাভের জন্য "সোহহংজ্ঞান"রূপ উপাসনা করেন, এবং উহা তাঁহাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট উপায়, ইহা শ্রীজীব গোস্বামিপাদও স্বীকার করিয়াছেন। "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত"

১। যদি জীবেশয়োঃ স্বরূপেণৈবাভেদস্তহীশস্যাপি অংশিকস্থদুঃখভোগঃ, জীবস্য চ জগৎকর্ত্তৃত্বাদি" ইত্যাদি। সিদ্ধান্তরত্ন, অষ্টমপাদ।

গ্রন্থে কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়ও বলিয়াছেন,—"নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সেই কেবল জ্যোতির্ম্ময়। সাযুজ্যের অধিকারী তাহা পায় লয়॥" (আদিখণ্ড, পঞ্চম পঃ)। ফলকথা, শ্রীজীব গোস্বামী জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ ভেদই তত্ত্ব বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। তিনি "পরমাত্মসন্দর্ভে" জীব ও ঈশ্বরের অভেদ নির্দ্দেশের হেতু বলিয়া উহার অনুব্যাখ্যা "সর্ব্বসংবাদিনী" গ্রন্থে স্পষ্ট করিয়াই তাঁহার পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন,—"তদেবমভেদং বাক্যং দ্বয়োশ্চিদ্রূপত্বাদিনৈব একাকারত্বং বোধয়তি উপাসনাবিশেষার্থং ন তু বস্ত্বৈক্যং।" অর্থাৎ "তত্ত্বমসি," "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদি যে অভেদবোধক বাক্য আছে, তাহা অধিকারিবিশেষের উপাসনাবিশেষের জন্য জীব ও ঈশ্বরের চৈতন্যস্বরূপতা প্রভৃতি কারণবশতঃই একাকারত্ব অর্থাৎ ঐ উভয়ের এক-জাতীয়ত্বের বোধক, কিন্তু বস্তুর ঐক্যবোধক নহে অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বর যে তত্ত্বতঃ এক বা অভিন্ন, ইহা ঐ সমস্ত বাক্যের তাৎপর্য্য নহে। শ্রীজীব গোস্বামী তাঁহার "সর্ব্বসংবাদিনী" গ্রন্থে তাঁহার পরমাত্মসন্দর্ভের সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া, উপসংহারে বলিয়াছেন, "তস্মাৎ তত্তদস-ম্ভাবাদ্ব্রহ্মণো ভিন্নান্যেব জীবচৈতন্যানীত্যায়াতং" এবং বলিয়াছেন, "তস্মাৎ সর্ব্বথা ভেদ এব জীবপরয়োঃ।" এখানে "ভিন্নান্যেব" এবং "ভেদ এব" এই দুই স্থলে "এব" শব্দের দ্বারা স্বরূপতঃ অভেদেরই নিষেধ হইয়াছে, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় এবং "ন বস্ত্বৈক্যং" এই বাক্যের দ্বারাও জীব ও ঈশ্বর যে এক বস্তু নহে, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। সুতরাং শ্রীজীব গোস্বামী যে, মাধ্বমতানুসারে জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ ঐকান্তিক ভেদই সমর্থন করিয়াছেন, এ বিষয়ে আমা-দিগের সংশয় হয় না, এবং শ্রীজীব গোস্বামী নানা হেতুর উল্লেখ করিয়া শাস্ত্রে জীব ও ঈশ্বরের যে অভেদ নির্দ্দেশের উপপাদন করিয়াছেন, তাহাই শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে "ভেদাভেদপ্রকাশ" এই কথায় "অভেদ প্রকাশ" বলা হইয়াছে, ইহাই আমরা বুঝিতে পারি। কারণ, পূর্ব্বোক্ত সমস্ত কারণবশতঃ জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ অভেদ নাই, কেবল ভেদই আছে, ইহাই শ্রীচৈতন্যদেব ও তাঁহার সম্প্রদায়রক্ষক শ্রীজীবগোস্বামী প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণবা-চার্য্যগণের সিদ্ধান্ত বলিয়া আমরা নিঃসন্দেহে বুঝিয়াছি। এখানে ইহা স্মরণ রাখা অত্যাবশ্যক যে, জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ ভেদও আছে, অভেদও আছে, তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিবশতঃ তাঁহাতে ঐ ভেদ ও অভেদ থাকিতে পারে, উহা তাঁহাতে বিরুদ্ধ হয় না, ইহাই নিম্বার্কসম্প্রদায়-সম্মত জীব ও ঈশ্বরের ভেদাভেদবাদ বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদ। জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ অভেদ স্বীকার না করিয়া, একজাতীয়ত্বাদিপ্রযুক্ত অভেদ বলিলে ঐ মতকে ভেদাভেদবাদ বলা যায় না। তাহা হইলে নৈয়ায়িক প্রভৃতি দ্বৈতবাদিসম্প্রদায়কেও ভেদাভেদবাদী বলা যাইতে পারে। কারণ, তাঁহাদিগের মতেও চেতনত্বরূপে ও আত্মত্বরূপে জীব ও ঈশ্বর একজাতীয়। একজাতীয়ত্ব-বশতঃ তাঁহারাও জীব ও ঈশ্বরকে অভিন্ন বলিতে পারেন। কিন্তু ব্যক্তিগত অভেদ অর্থাৎ স্বরূপতঃ অভেদ না থাকিলে ভেদাভেদবাদ বলা যায় না। স্বরূপতঃ ভেদ ও অভেদ, এই উভয়ই তত্ত্ব বলিলে সেই মতকেই "ভেদাভেদবাদ" বলা যায়। নিম্বার্কস্বামী ঐরূপ

সিদ্ধান্তই স্বীকার করায় তাঁহার মত "ভেদাভেদবাদ" নামে কথিত হইয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ যখন জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ অভেদের খণ্ডনই করিয়াছেন, এবং উহা করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ ভেদাভেদবাদেরও খণ্ডন করিয়াছেন, এবং উক্ত বিষয়ে মাধ্ব-সিদ্ধান্তেরই সমর্থনপূর্ব্বক স্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন, তখন তাঁহাদিগকে জীব ও ঈশ্বরের ভেদা-ভেদবাদী বা অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী বলা যাইতে পারে না।

কিন্তু শ্রীজীব গোস্বামী সর্ব্বসংবাদিনী গ্রন্থে উপাদান কারণ ও তাহার কার্য্যের ভেদ ও অভেদ বিষয়ে নানা মতের উল্লেখ করিয়া, শেষে কোন সম্প্রদায়, উপাদান কারণ ও কার্য্যের অচিন্ত্যভেদাভেদ স্বীকার করেন, ইহা বলিয়াছেন। সেখানে পরে তাঁহার কথার দ্বারা তাঁহার নিজ মতেও যে, উপাদান কারণ ও কার্য্যের অচিন্ত্যভেদ ও অভেদ উভয়ই তত্ত্ব, ইহাও বুঝা যায়। সেখানে তিনি পূর্ব্বোক্ত অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে,[১] অপর সম্প্রদায় অর্থাৎ ব্রহ্মপরিণামবাদী কোন সম্প্রদায়বিশেষ তর্কের দ্বারা উপাদান কারণ ও কার্য্যের ভেদ সাধন করিতে যাইয়া, তর্কের প্রতিষ্ঠা না থাকায় ভেদপক্ষে অসীম দোষ-সমূহ দর্শনবশতঃ উপাদান কারণ ও কার্য্যকে ভিন্ন বলিয়া চিন্তা করিতে না পারায়, অভেদ সাধন করিতে যাইয়া, ঐ পক্ষেও তর্কের অপ্রতিষ্ঠাবশতঃ অসীম দোষসমূহের দর্শন হওয়ায় উপাদান কারণ ও কার্য্যকে অভিন্ন বলিয়াও চিন্তা করিতে না পারায় আবার ভেদও স্বীকার করিয়া, ঐ উভয়ের অচিন্ত্য-ভেদাভেদই স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীজীব গোস্বামীর উক্ত কথার দ্বারা, উক্ত মতবাদীদিগের তাৎপর্য্য বুঝা যায় যে, উপাদান কারণ ও কার্য্যের ভেদ ও অভেদ, এই উভয় পক্ষেই তর্কের অবধি নাই, উহার কোন পক্ষেই তর্কের প্রতিষ্ঠা না থাকায় কেবল তর্কের দ্বারা উহার কোন পক্ষই সিদ্ধ করা যায় না। অথচ ঘটাদি কার্য্য ও উহার উপাদান কারণ মৃত্তিকাবিশেষের একরূপে ভেদ এবং অন্যরূপে যে অভেদও আছে, ইহাও অনুভবসিদ্ধ হওয়ায় উহা অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং ঐ উভয় পক্ষেই যখন অনেক যুক্তি আছে, তখন তর্ক পরিত্যাগ করিয়া, ঐ ভেদ ও অভেদ উভয়ই স্বীকার্য্য। কিন্তু তর্ক করিতে গেলে যখন ঐ উভয় পক্ষেই অসীম দোষ দেখা যায়, এবং ঐ বিষয়ে তর্কের নিবৃত্তি না হওয়ায় ঐ ভেদ ও অভেদ উভয়কেই চিন্তা করিতে পারা যায় না, তখন ঐ উভয়কে "অচিন্ত্য" বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। "অচিন্ত্য" বলিতে এখানে তর্কের অবিষয়। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণও "তত্ত্বসন্দর্ভের" টীকায় এক স্থানে "অচিন্ত্য" শব্দের অর্থ বলিয়াছেন, তর্কের অবিষয়। বস্তুতঃ যাহা "অচিন্ত্য", তাহা কেবল তর্কের বিষয় নহে। শ্রীজীব গোস্বামী

১। "অপরে তু তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদ্ভেদেঽপ্যভেদেঽপি নির্ম্মর্য্যাদদোষসন্ততিদর্শনেন ভিন্নতয়া চিন্তয়িতু-মশক্যত্বাদভেদং সাধয়ন্তঃ তদ্বদভিন্নতয়াপি চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদ্ভেদমপি সাধয়ন্তোঽচিন্ত্যভেদাভেদবাদং স্বীকুর্ব্বন্তি। তত্র বাদঃপৌরাণিকশৈবানাং মতে ভেদাভেদৌ ভাস্করমতে চ। মায়াবাদিনাং তত্র ভেদাংশো ব্যবহারিক এব প্রাতীতিকো বা। গৌতম-কণাদ-জৈমিনি-কপিল-পাতঞ্জলিমতে চ ভেদ এব, শ্রীরামানুজমধ্বাচার্য্যমতে চেত্যপি সার্ব্বত্রিকী প্রসিদ্ধিঃ। স্বমতে ত্বচিন্ত্যভেদাভেদাবেব, অচিন্ত্যশক্তিময়ত্বাদিতি।"—সর্ব্বসংবাদিনী।

প্রভৃতিও অনেক স্থানে উহা সমর্থন করিতে "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ" এই শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং যাঁহারা কার্য্য ও কারণের ভেদ ও অভেদ স্বীকার করিয়া, উহাকে তর্কের অবিষয় বলিয়াছেন, তাঁহারা "অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ" এই কথাই বলিয়াছেন। আর যাঁহাদিগের মতে ঐ ভেদ ও অভেদ তর্কের দ্বারাই সিদ্ধ হইতে পারে, তাঁহারা কেবল "ভেদাভেদবাদ" এই কথাই বলিয়াছেন। ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি ব্রহ্মপরিণামবাদী অনেক বৈদান্তিক-সম্প্রদায় উপাদান কারণ ও কার্য্যের ভেদ ও অভেদ উভয়কেই তত্ত্ব বলিয়া ব্রহ্ম ও তাঁহার কার্য্য জগতের ভেদ ও অভেদ উভয়কেই তত্ত্ব বলিয়াছেন। শ্রীজীব গোস্বামীও উহা লিখিয়াছেন এবং রামানুজ ও মধ্বাচার্য্যের মতে স্বরূপতঃ কেবল ভেদই তত্ত্ব, ইহাও তিনি বলিয়াছেন। শেষে তাঁহার নিজ মতে উপাদান কারণ ব্রহ্ম ও তাঁহার কার্য্য জগতের যে অচিন্ত্য ভেদ ও অভেদ উভয়ই তত্ত্ব, ইহা তাঁহার কথায় বুঝা যায়। তিনি সেখানে উহার উপপাদক হেতু বলিয়াছেন, "অচিন্ত্যশক্তিময়ত্বাৎ।" অর্থাৎ ঈশ্বর যখন অচিন্ত্য শক্তিময়, তখন তাঁহার অচিন্ত্য শক্তি-প্রভাবে তাঁহাতে তাঁহার কার্য্য জগতের ভেদ ও অভেদ উভয়ই থাকিতে পারে, উহাও অচিন্ত্য অর্থাৎ তর্কের বিষয় নহে। বস্তুতঃ শ্রীজীব গোস্বামীও শ্রীচৈতন্যদেবের মতানুসারে জগৎকে ঈশ্বরের পরিণাম ও সত্য বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন। তিনিও উহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, যেমন চিন্তামণি নামে এক প্রকার মণি আছে, উহা তাহার অচিন্ত্য শক্তিবশতঃ কিছুমাত্র বিকৃত না হইয়াও স্বর্ণ প্রসব করে, ঐ স্বর্ণ সেই মণির সত্য পরিণাম, তদ্রূপ ঈশ্বরও তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিবশতঃ কিছুমাত্র বিকৃত না হইয়াও জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন, জগৎ তাঁহার সত্য পরিণাম। এখানে জানা আবশ্যক যে, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য যেমন তাঁহার নিজসম্মত ও অচিন্ত্যশক্তি অনির্ব্বচনীয় মায়াকে আশ্রয় করিয়া জগৎকে ব্রহ্মের বিবর্ত্ত বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন, ঐ মায়ার মহিমায় ব্রহ্মে নানা বিরুদ্ধ কল্পনার সমর্থন করিয়া সকল দোষের পরিহার করিয়াছেন, তদ্রূপ পূর্ব্বোক্ত বৈষ্ণবাচার্য্যগণও তাঁহাদের নিজসম্মত ঈশ্বরের বাস্তব অচিন্ত্য শক্তিকে আশ্রয় করিয়া জগৎকে ঈশ্বরের পরিণাম বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন। ঈশ্বরের অচিন্ত্য শক্তির মহিমায় তাঁহাতে যে, নানা বিরুদ্ধ গুণেরও সমাবেশ আছে, অর্থাৎ তাঁহাতে গুণবিরোধ নাই এবং কোন প্রকার দোষ নাই, ইহা সমর্থন করিয়াছেন। শ্রীজীব গোস্বামী এ বিষয়ে শাস্ত্রপ্রমাণও প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি সর্ব্বসংবাদিনী গ্রন্থে ইহাও বলিয়াছেন যে, জগৎ ঈশ্বরের সত্য পরিণাম, কিন্তু ঈশ্বর তাঁহার সত্য অচিন্ত্য[1] শক্তিপ্রভাবে কিছুমাত্র বিকৃত হন না, ইহা জানিলে অর্থাৎ ঈশ্বরের বাস্তব অচিন্ত্য শক্তির জ্ঞানবশতঃ তাঁহার প্রতি ভক্তি জন্মিবে, এই জন্য পূর্ব্বোক্ত পরিণামবাদই গ্রাহ্য, অর্থাৎ উহাই প্রকৃত শাস্ত্রার্থ। মূলকথা, জগৎ ঈশ্বরের সত্য পরিণাম হইলে ঈশ্বর জগতের উপাদান কারণ, জগৎ তাঁহার সত্য-কার্য্য, সুতরাং উপাদান কারণ ও কার্য্যের অভেদসাধক যুক্তির দ্বারা জগৎ ও ঈশ্বরের অভেদ সিদ্ধ হয়। কিন্তু চেতন ঈশ্বর হইতে জড় জগতের একেবারে অভেদ কোনরূপেই বলা যায় না। এ জন্য ভেদ ও

স্বীকার করিতে হইবে অর্থাৎ ঈশ্বর ও জগতের অত্যন্ত ভেদও বলা যায় না, অত্যন্ত অভেদও বলা যায় না; ভেদ ও অভেদ, এই উভয় পক্ষেই তর্কের অবধি নাই। সুতরাং বুঝা যায় যে. উহা তর্কের বিষয় নহে, অর্থাৎ ঈশ্বর ও জগতের ভেদ ও অভেদ, উভয়ই আছে,—কিন্তু উহা অচিন্ত্য, কেবল তর্কের দ্বারা উহা সিদ্ধ করা যায় না, কিন্তু ইহা স্বীকার্য্য। কারণ, ঈশ্বরই যখন জগৎরূপে পরিণত হইয়াছেন, তখন জগৎ যে ঈশ্বর হইতে অভিন্ন, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে এবং জড় জগৎ যে চেতন ঈশ্বর হইতে ভিন্ন, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীজীব গোস্বামীর "সর্ব্বসংবাদিনী" গ্রন্থের পূর্ব্বোদ্ধৃত সন্দর্ভের দ্বারা তাঁহার মতে ঈশ্বর ও জগতের অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ বুঝা গেলেও শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় কিন্তু বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের "তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ" ইত্যাদি সূত্রের ভাষ্যে উপাদান-কারণ ব্রহ্ম ও তাঁহার কার্য্য জগতের অভেদ পক্ষই কেবল সমর্থন করিয়াছেন এবং তিনি "সিদ্ধান্তরত্ন" গ্রন্থের অষ্টম পাদে কার্য্য ও কারণের ভেদাভেদবাদও খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থে আমরা কার্য্য ও কারণের পূর্ব্বোক্ত অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদও পাই নাই। সে যাহা হউক, শ্রীজীব গোস্বামীর পূর্ব্বোদ্ধৃত সন্দর্ভের দ্বারা তাঁহার মতে ব্রহ্ম ও জগতের অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ বুঝিতে পারিলেও ঐ মত যে তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই কোন বৈদান্তিক সম্প্রদায় স্বীকার করিতেন, অর্থাৎ উহাও কোন প্রাচীন মত, ইহা তাঁহার কথার দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়। কিন্তু উহা জীব ও ঈশ্বরের অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ নহে। জীবচৈতন্য নিত্য, উহা জগতের ন্যায় ঈশ্বর হইতে উৎপন্ন পদার্থ নহে। সুতরাং ঈশ্বর জীবের উপাদান কারণ না হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত যুক্তির দ্বারা জীব ও ঈশ্বরের ভেদ ও অভেদ, উভয়ই সিদ্ধ হইতে পারে না। উক্ত মতে ঈশ্বর জগৎরূপে পরিণত হইলেও জীবরূপে পরিণত হন নাই, জীব ব্রহ্মের বিবর্ত্তও নহে, অর্থাৎ অদ্বৈতমতানুসারে অবিদ্যাকল্পিত নহে, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত মতে জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ অভেদসাধক কোন যুক্তি নাই। পরন্তু জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ ভেদসাধক বহু শাস্ত্র ও যুক্তি থাকায় স্বরূপতঃ কেবল ভেদই সিদ্ধ হইলে "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা জীব ও ঈশ্বরের চিৎস্বরূপে একজাতীয়ত্ব বা সাদৃশ্যাদিই তাৎপর্য্যার্থ বুঝিতে হইবে। উহার দ্বারা জীব ও ঈশ্বর যে, স্বরূপতঃ অভিন্ন পদার্থ অর্থাৎ তত্ত্বতঃ একই বস্তু, ইহা বুঝা যাইবে না। তাই শ্রীজীব গোস্বামী "সর্ব্বসংবাদিনী" গ্রন্থে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়া বলিয়াছেন, "নতু বস্তৈক্যং", "ব্রহ্মণো ভিন্নান্যেব জীবচৈতন্যানি", "সর্ব্বথা ভেদ এব জীবপরয়োঃ"। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও শ্রীজীব গোস্বামীর "তত্ত্বসন্দর্ভে"র টীকায় তাঁহার সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করিতে যেমন ব্রাহ্মণদ্বয়ের ব্রাহ্মণত্ব জাতিরূপে অভেদ থাকিলেও ব্যক্তির স্বরূপতঃ অভেদ নাই, তদ্রূপ জীব ও ঈশ্বরের ব্যক্তিগত অভেদ নাই, ইত্যাদি কথা বলিয়া উপসংহারে বলিয়াছেন, "তথা চাত্র ঈশজীবয়োঃ স্বরূপাভেদো নাস্তীতি সিদ্ধং।" পরন্তু তাঁহার গোবিন্দভাষ্যের টীকার প্রারম্ভে তিনি যে, শ্রীচৈতন্যদেবের স্বীকৃত পূর্ব্বোক্ত মাধ্বমতানুসারেই বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহাও লিখিত হইয়াছে। শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব দার্শনিকগণের গ্রন্থে আরও অনেক স্থানে অনেক কথা পাওয়া যায়, যদ্দ্বারা তাঁহারা যে মাধ্বমতানুসারে জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ ঐকান্তিক ভেদবাদী

ছিলেন এবং ঐ ঐকান্তিক ভেদ বিশ্বাসবশতঃই ভক্তিসাধন করিয়াছিলেন, ইহা বুঝা যায়। বাহুল্যভয়ে অন্যান্য কথা লিখিত হইল না। পাঠকগণ পূর্ব্বলিখিত সমস্ত কথাগুলি স্মরণ করিয়া উক্ত বিষয়ে পূর্ব্বোক্তরূপ সিদ্ধান্ত নির্ণয়ের সমালোচনা করিবেন।

এখানে স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি সমস্ত বৈষ্ণব দার্শনিকগণের মতেই জীবাত্মা অণু, সুতরাং প্রতি শরীরে ভিন্ন ও অসংখ্য। সুতরাং তাঁহাদিগের সকলের মতেই জীব ও ঈশ্বরের বাস্তব ভেদ আছে। বস্তুতঃ জীবের অণুত্ব ও বিভুত্ব বিষয়ে সুপ্রাচীন কাল হইতেই মতভেদ পাওয়া যায়। শ্রীমদ্‌ভাগবতের দশম স্কন্ধের ৮৭ম অধ্যায়ের ৩০শ শ্লোকেও উক্ত মতভেদের সূচনা পাওয়া যায়। চরকসংহিতার শারীরস্থানের প্রথম অধ্যায়ে "দেহী সর্ব্বগতো হ্যাত্মা" এবং "বিভুত্বমত এবাস্য যস্মাৎ সর্ব্বগতো মহান্" (২৩।২৪) ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা চরকের মতে জীবাত্মার বিভুত্ব বুঝা যায়। সুশ্রুতসংহিতার শারীরস্থানের প্রথম অধ্যায়েও প্রথমে প্রকৃতি ও পুরুষ, উভয়েরই সর্ব্বগতত্ব কথিত হইয়াছে। কিন্তু পরে আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে যে জীবাত্মা অণু বলিয়াই উপদিষ্ট, ইহাও সুশ্রুত বলিয়াছেন[1]। জীবের অণুত্ববাদী সকল সম্প্রদায়ই "বালাগ্র-শতভাগস্য" ইত্যাদি[2] শ্রুতি এবং "এষোঽণুরাত্মা" ইত্যাদি (মুণ্ডক, ৩।১।৯) শ্রুতির দ্বারা জীবের অণুত্ব ও নানাত্ব সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন এবং তদ্দ্বারাও জীবের সহিত ঈশ্বরের বাস্তব ভেদও সমর্থন করিয়াছেন। সুতরাং যে ভাবেই হউক, জীব ও ঈশ্বরের বাস্তব ভেদবাদ যে, সুপ্রাচীন মত, এ বিষয়ে সংশয় নাই। মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি বেদান্তদর্শনের "অবিরোধশ্চন্দনবিন্দুবৎ" (২।৩।২৩) এই সূত্রকে সিদ্ধান্তসূত্ররূপেই গ্রহণ করিয়া, উহার তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, যেমন হরিচন্দনবিন্দু শরীরের কোন একদেশস্থ হইলেও উহা সর্ব্বশরীর ব্যাপ্ত হয়, সর্ব্বশরীরেই উহার কার্য্য হয়, তদ্রূপ অণু জীব, শরীরের কোন এক স্থানে থাকিলেও সর্ব্বশরীরেই উহার কার্য্য সুখ দুঃখাদি ও তাহার উপলব্ধি জন্মে। মধ্বাচার্য্য সেখানে এ বিষয়ে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের একটি বচনও[3] উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতি গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণও মধ্বাচার্য্যের উদ্ধৃত সেই বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। পরন্তু তাঁহারা "সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবঃ" এইরূপ বাক্যকেও শ্রুতি বলিয়া উল্লেখ করিয়া শঙ্করাচার্য্যের সমাধানের খণ্ডনপূর্ব্বক নিজমত সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য জীবের অণুত্ববাদকে পূর্ব্বপক্ষরূপে ব্যাখ্যা করিয়া, জীবের বিভুত্ব সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, শ্রুতিতে যেখানে জীবাত্মাকে অণু বলা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, জীবাত্মা সূক্ষ্ম অর্থাৎ দুর্জ্ঞেয়, অণুপরিমাণ নহে।

১। ন চায়ুর্ব্বেদশাস্ত্রেষূপদিশ্যন্তে সর্ব্বগতাঃ ক্ষেত্রজ্ঞা নিত্যাশ্চ অসর্ব্বগতেষু চ ক্ষেত্রজ্ঞেষু ইত্যাদি।—শারীরস্থান, ১ম অঃ, ১৬।১৭।

২। বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥—শ্বেতাশ্বতর, ৫।৯।

৩। অণুমাত্রোঽপ্যয়ং জীবঃ স্বদেহং ব্যাপ্য তিষ্ঠতি।
যথা ব্যাপ্য শরীরাণি হরিচন্দনবিপ্রুষঃ॥—মধ্বভাষ্যে উদ্ধৃত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ-বচন।

অথবা জীবাত্মার উপাধি অন্তঃকরণের অণুত্ব গ্রহণ করিয়াই জীবাত্মাকে অণু বলা হইয়াছে[১]। জীবাত্মার ঐ অণুত্ব ঔপাধিক, উহা বাস্তব নহে। কারণ, বহু শ্রুতির দ্বারা জীবাত্মা মহান্, ব্রহ্মস্বরূপ, ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে। সুতরাং জীবাত্মার বাস্তব অণুত্ব কখনই শ্রুতিসম্মত হইতে পারে না। নৈয়ায়িক, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল ও মীমাংসকসম্প্রদায়ও অদ্বৈতবাদী না হইলেও জীবাত্মার বিভুত্ব সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ "নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ" ইত্যাদি ভগবদ্গীতা (২।২৪) বচনের দ্বারা জীবাত্মার বিভুত্ব সিদ্ধান্তই স্পষ্ট বুঝা যায়। বিষ্ণুপুরাণে ঐ সিদ্ধান্ত আরও সুস্পষ্ট কথিত হইয়াছে[২]। সুতরাং জীবাত্মার বিভুত্বই প্রকৃত সিদ্ধান্ত হইলে, শাস্ত্রে যে যে স্থানে জীবের অণুত্ব কথিত হইয়াছে, তাহার পূর্ব্বোক্তরূপই তাৎপর্য্য বুঝিতে হয়। কোন কোন স্থলে জীবাত্মার উপাধি অন্তঃকরণ বা সূক্ষ্মশরীরই "জীব" শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে, ইহাও বুঝা যায়। ন্যায় ও বৈশেষিক শাস্ত্রে সূক্ষ্মশরীরের কোন উল্লেখ দেখা যায় না। সুতরাং নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকসম্প্রদায় তাঁহাদিগের সম্মত অণু মনকেই সূক্ষ্ম-শরীরস্থানীয় বলিয়া উহার অণুত্ববশতঃই জীবাত্মার শাস্ত্রোক্ত অণুত্ববাদের উপপাদন করিতে পারেন। উপনিষদে যে, জীবের গতাগতি ও শস্যমধ্যে পতনাদি বর্ণিত আছে, তাহাও ঐ মনের সম্বন্ধেই বর্ণিত হইয়াছে, ইহা তাঁহারা বলিতে পারেন। প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদ, মৃত্যুর পরে শরীর হইতে মনের বহির্নির্গমনের সময়ে আতিবাহিক শরীর-বিশেষের উৎপত্তি স্বীকার করিয়া মনই যে তখন ঐ শরীরে আরূঢ় হইয়া স্বর্গ নরকাদিতে গমন করে, ইহা বলিয়াছেন। সুতরাং নৈয়ায়িকসম্প্রদায়েরও যে, উহাই প্রাচীন সিদ্ধান্ত, ইহা বুঝিতে পারা যায়। (প্রশস্তপাদ-ভাষ্য, কন্দলী সহিত, কাশী সংস্করণ, ৩০৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ফল কথা, নৈয়ায়িক, বৈশেষিক ও মীমাংসকসম্প্রদায় জীবাত্মাকে প্রতি শরীরে ভিন্ন ও বিভু বলিয়া জীবাত্মাকেই কর্ত্তা ও সুখ-দুঃখ-ভোক্তা বলিয়াছেন। জীবাত্মা অণু হইলে শরীরের সর্ব্বাবয়বে উহার সংযোগ সম্ভব না হওয়ায় সর্ব্বাবয়বে জ্ঞানাদি জন্মিতে পারে না। প্রবল শীতে কম্পিতকলেবর জীব, সর্ব্বাবয়বেই যে, শীতবোধ করে, তাহার উপপত্তি হইতে পারে না। কারণ, যাহার শীত বোধ হইবে, সেই জীবাত্মা অণু হইলে সর্ব্বাবয়বে তাহার সংযোগ থাকে না। অনিত্য সাবয়ব চন্দনবিন্দু, নিত্য নিরবয়ব জীবাত্মার দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। জৈনসম্প্রদায়ের ন্যায় জীবাত্মার সংকোচ ও বিকাশ স্বীকার করিলে উহার নিত্যত্বের ব্যাঘাত হয়। কারণ, সাবয়ব অনিত্য পদার্থ ব্যতীত সংকোচ ও বিকাশ হইতে পারে না। এবং জীবাত্মা অণুপরিমাণ হইলে তাহাতে সুখদুঃখাদির প্রত্যক্ষ হইতেও পারে না। কারণ, আশ্রয় অণু হইলে তদ্গত ধর্ম্মের প্রত্যক্ষ হয় না। তাহা হইলে পরমাণুগত রূপাদিরও প্রত্যক্ষ হইতে পারে। এইরূপ নানা যুক্তির দ্বারা নৈয়ায়িক প্রভৃতি সম্প্রদায় জীবাত্মার

১। তস্মাদ্ভুর্জ্জানিত্বাভিপ্রায়মিদমণুবচনমুপাধ্যভিপ্রায়ং বা দ্রষ্টব্যং।—বেদান্তদর্শন, ২য় অ, ৩য় পাং, ২০শ সূত্রের শারীরক ভাষ্য।

২। পুমান্ সর্ব্বগতো ব্যাপী আকাশবদয়ং যতঃ।
কুতঃ কুত্র ক গন্তাসীত্যেতদপ্যর্থবৎ কথং॥—বিষ্ণুপুরাণ।২।১৩।২৪।

বিভুত্ব সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়াছেন। জৈনসম্প্রদায় জীবাত্মাকে দেহসমপরিমাণ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদিগের ঐ মতের খণ্ডন বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের ৩৩শ, ৩৫শ ও ৩৬শ সূত্রের শারীরক ভাষ্য ও ভামতী টীকায় দ্রষ্টব্য।

প্রশ্ন হয় যে, পরমাত্মার ন্যায় জীবাত্মাও বিভু হইলে উভয়ের সংযোগ সম্বন্ধ সম্ভব হয় না এবং জীবাত্মা ও পরমাত্মা স্বরূপতঃই ভিন্ন পদার্থ হইলে ঐ উভয়ের অভেদ সম্বন্ধও নাই, অন্য কোন সম্বন্ধও নাই। সুতরাং পরমাত্মা ঈশ্বর, জীবাত্মার ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্টের অধিষ্ঠাতা, ইহা কিরূপে বলা যায়? জীবাত্মার সহিত ঈশ্বরের কোন সম্বন্ধ না থাকিলে তাহার অদৃষ্টসমূহের সহিতও কোন সম্বন্ধ সম্ভব না হওয়ায় ঈশ্বর উহার অধিষ্ঠাতা হইতে পারেন না। সুতরাং জীবাত্মার অদৃষ্টসমূহের ফলোৎপত্তি কিরূপে হইবে? এতদুত্তরে ন্যায়বার্ত্তিকে উদ্দ্যোতকর প্রথমে বলিয়াছেন যে, কেহ কেহ বিভু পদার্থদ্বয়ের পরস্পর নিত্যসংযোগ স্বীকার করেন এবং প্রমাণদ্বারা উহা প্রতিপাদন করেন। বিভু পদার্থের ক্রিয়া না থাকায় উহাদিগের ক্রিয়াজন্য সংযোগ উৎপন্ন হইতে পারে না বটে, কিন্তু ঐ সংযোগ নিত্য। আকাশাদি বিভু পদার্থ সতত পরস্পর সংযুক্তই আছে। উদ্দ্যোতকর এই মতের যুক্তিও বলিয়াছেন। এই মতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার নিত্য সংযোগ সম্বন্ধ বিদ্যমান থাকায় পরমাত্মা জীবাত্মগত অদৃষ্টের অধিষ্ঠাতা হইতে পারেন। উদ্দ্যোতকর পরেই আবার বলিয়াছেন যে, যাঁহারা বিভুদ্বয়ের সংযোগ স্বীকার করেন না, তাঁহাদিগের মতে প্রত্যেক জীবাত্মার সক্রিয় মনের সহিত পরমাত্মা ঈশ্বরের সংযোগ সম্বন্ধ উৎপন্ন হওয়ায় সেই মনঃসংযুক্ত জীবাত্মার সহিতও ঈশ্বরের সংযুক্ত-সংযোগরূপ পরম্পরা সম্বন্ধ জন্মে। সুতরাং সেই জীবাত্মার ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্টের সহিতও ঈশ্বরের পরম্পরা সম্বন্ধ থাকায় ঈশ্বর উহার অধিষ্ঠাতা হইতে পারেন। ফলকথা, উক্ত উভয় মতেই জীবাত্মার অদৃষ্টের সহিত ঈশ্বরের পরম্পরা সম্বন্ধ আছে। তন্মধ্যে বিভুদ্বয়ের পরস্পর সংযোগ সম্বন্ধ নাই, ইহাই এখন নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ের প্রচলিত মত। কিন্তু প্রাচীন অনেক নৈয়ায়িক যে, উহা স্বীকার করিতেন এবং প্রাচীন কালেও উক্ত বিষয়ে মতভেদ ছিল, ইহা উদ্দ্যোতকরের পূর্ব্বোক্ত কথার দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়। পরন্তু বেদান্ত-দর্শনের "সম্বন্ধানুপপত্তেশ্চ" (২।২।৩৮) এই সূত্রের ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য—প্রকৃতি, পুরুষ ও ঈশ্বরের সংযোগ সম্বন্ধের অনুপপত্তি সমর্থন করিতে উহাদিগের বিভুত্বই প্রথম হেতু বলিয়াছেন। সেখানে ভামতীকার বাচস্পতি মিশ্রও বিভুত্ববশতঃ ও নিরবয়বত্ববশতঃ বিভু পদার্থের পরস্পর সংযোগ হইতে পারে না, ইহা বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি পূর্ব্বে বিভু পদার্থের পরস্পর নিত্য সংযোগও সমর্থন করিয়াছেন[১]। ভামতী টীকায় শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্রের উক্ত বিষয়ে দ্বিবিধ বিরুদ্ধ উক্তির দ্বারা বিভুদ্বয়ের পরস্পর সংযোগ সম্বন্ধ বিষয়ে তখনও যে মতভেদ ছিল এবং কোন প্রাচীন নৈয়ায়িকসম্প্রদায় যে, বিভুদ্বয়ের নিত্য সংযোগ বিশেষরূপে সমর্থন

১। "তত্র নিত্যয়োরাকাশয়োরজসংযোগে উভয়স্তঃ অপি যুতসিদ্ধেরভাবাৎ।" "ন চাজসংযোগো নাস্তি, তস্যানুমানসিদ্ধত্বাৎ। তথাহি আকাশমাত্মসংযোগি, মূর্ত্তদ্রব্যসম্বন্ধাৎ ...দিত্যাদ্যনুমানং।"—বেদান্তদর্শন, ২য় অঃ, ২য় পাঃ, ১৭শ সূত্রের ভাষ্যের "ভামতী" দ্রষ্টব্য।

করিতেন, ইহা আমরা বুঝিতে পারি। শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্র "ভামতী" টীকায় অপরের কোন যুক্তির খণ্ডন করিতে উক্ত প্রাচীন মতবিশেষকেই আশ্রয় করিয়া সমর্থন করিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত ন্যায়-বৈশেষিক সিদ্ধান্তে অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকসম্প্রদায়ের আর একটি বিশেষ আপত্তি এই যে, জীবাত্মা প্রতি শরীরে ভিন্ন ও বিভু হইলে সমস্ত জীবদেহেই সমস্ত জীবাত্মার আকাশের ন্যায় সংযোগ সম্বন্ধ থাকায় সর্ব্বদেহেই সমস্ত জীবাত্মার সুখ দুঃখাদি ভোগ হইতে পারে। অদ্বৈতবাদিসম্প্রদায় ইহা অকাট্য আপত্তি মনে করিয়া সকলেই ইহা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকসম্প্রদায়ের কথা এই যে, সর্ব্বজীবদেহের সহিত সকল জীবাত্মার সামান্য সংযোগসম্বন্ধ থাকিলেও যে জীবাত্মার অদৃষ্টবিশেষবশতঃ যে দেহবিশেষ পরিগ্রহ হইয়াছে, তাহার সহিতই সেই জীবাত্মার বিশেষ সংযোগ জন্মে। জীবাত্মার অদৃষ্টবিশেষ ও দেহবিশেষের সহিত সংযোগবিশেষই সুখদুঃখাদি ভোগের নিয়ামক। তৃতীয় অধ্যায়ের শেষ প্রকরণে ৬৬ ও ৬৭ সূত্রের দ্বারা মহর্ষি গোতম নিজেই উক্ত আপত্তির পরিহার করিয়াছেন। সেখানেই তাঁহার তাৎপর্য্য বর্ণিত হইয়াছে।

আমরা আবশ্যক বোধে নানা মতের আলোচনা করিতে যাইয়া অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। অতিবাহুল্য ভয়ে পূর্ব্বোক্ত বিষয়ে আর অধিক আলোচনা করিতে পারিতেছি না। আমাদিগের মূল বক্তব্য এই যে, ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন গোতম মতের ব্যাখ্যা করিতে পূর্ব্বোক্ত ভাষ্যে ঈশ্বরকে "আত্মান্তর" বলিয়া জীবাত্মা ও ঈশ্বরের যে বাস্তব ভেদ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা নানাভাবে প্রাচীন কাল হইতে নৈয়ায়িকসম্প্রদায় এবং আরও বহু সম্প্রদায় সমর্থন করিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহারাও জীবাত্মা ও পরমাত্মার বাস্তব ভেদ খণ্ডন করিয়া, অদ্বৈত মতের সমর্থন করেন নাই। তাঁহাদিগের যে, অদ্বৈত মতে নিষ্ঠা ছিল না, ইহাও তাঁহাদিগের গ্রন্থের দ্বারা বুঝা যায়। মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্যের "আত্মতত্ত্ববিবেকে"র কোন কোন উক্তি প্রদর্শন করিয়া এখন কেহ কেহ তাঁহাকে অদ্বৈতমতনিষ্ঠ বলিয়া ঘোষণা করিলেও আমরা তাহা বুঝিতে পারি না। কারণ, উদয়নাচার্য্য বৌদ্ধসম্প্রদায়কে যে কোনরূপে নিরস্ত করিবার উদ্দেশ্যেই ঐ গ্রন্থে কয়েক স্থলে অদ্বৈত মত আশ্রয় করিয়াও বৌদ্ধমত খণ্ডন করিয়াছেন এবং তজ্জন্যই কোন স্থলে সেই বৌদ্ধমতের অপেক্ষায় অদ্বৈত মতের বলবত্তা ও শ্রেষ্ঠতা বলিয়াছেন, ইহাই আমরা বুঝি। তদ্দ্বারা তাঁহার অদ্বৈতমতনিষ্ঠতা প্রতিপন্ন হয় না। পরন্তু তিনি যে ন্যায়মতনিষ্ঠ ছিলেন, ইহাই আমরা বুঝিতে পারি। কারণ, তিনি ঐ "আত্মতত্ত্ববিবেক" গ্রন্থে ন্যায়মতানুসারেই পরমপুরুষার্থ মুক্তির স্বরূপ ও কারণাদি বিচারপূর্ব্বক সমর্থন করিয়াছেন। পরন্তু তিনি ঐ গ্রন্থে উপনিষদের "সারসংক্ষেপ" প্রকাশ করিতে[১] "অশরীরং বাব সন্তং প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশতঃ" এই শ্রুতিবাক্যকে তাঁহার নিজসম্মত মুক্তি

১। আম্নায়সারসংক্ষেপস্তু "অশরীরং বাব সন্তং" ইত্যাদি। তৎপ্রামাণ্যং প্রপঞ্চমিথ্যাত্ব-সিদ্ধ-ভেদ-তত্ত্বোপদেশ-পৌনঃপুন্যেষ্বনৃত-বাধিত-পুনরুক্তদোষেভ্যঃ ইতি চেন্ন, সতাৎপর্য্যকত্বাৎ। নিষ্প্রপঞ্চ আত্মা জ্ঞেয়ো মুমুক্ষুভিরিতি-তাৎপর্য্যং প্রপঞ্চমিথ্যাত্বশ্রুতীনাং। অয়মন এবৈকস্ত জ্ঞানমপবর্গসাধনমিত্যদ্বৈতশ্রুতীনাং। দুরূহোঽয়মিতি পৌনঃ-পুন্যশ্রুতীনাং। [illegible] সংকল্পত্যাগে নিষ্প্রয়োজন[illegible]শ্রুতীনাং [illegible] শ্রুতীনাং। [illegible]

বিষয়ে প্রমাণরূপে উল্লেখ করিয়া পূর্ব্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, যদি বল, শ্রুতিতে জগতের মিথ্যাত্ব কথিত হওয়ায়, অর্থাৎ শ্রুতি সত্য জগৎকে মিথ্যা বলিয়া প্রকাশ করায় শ্রুতিতে মিথ্যা কথা (অনৃত-দোষ) আছে এবং শ্রুতিতে নানা বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত কথিত হওয়ায় ব্যাঘাত অর্থাৎ বিরোধরূপ দোষ আছে, এবং শ্রুতিতে পুনঃ পুনঃ একই আত্মতত্ত্বের উপদেশ থাকায় পুনরুক্তি-দোষ আছে, সুতরাং উক্ত দোষত্রয়বশতঃ শ্রুতির প্রামাণ্য না থাকায় পূর্ব্বোক্ত মুক্তি বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ হইতে পারে না। এতদুত্তরে উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন যে, শ্রুতিতে উক্ত দোষত্রয় নাই। কারণ, জগতের মিথ্যাত্বাদি-বোধক শ্রুতিসমূহের ভিন্ন ভিন্নরূপ তাৎপর্য্য আছে। মুমুক্ষু সাধক আত্মাতে পারমার্থিক-রূপে জগৎপ্রপঞ্চ নাই, এইরূপ ধ্যান করিবেন, ইহাই জগতের মিথ্যাত্ববোধক শ্রুতিসমূহের তাৎপর্য্য। জগতের মিথ্যাত্বই সিদ্ধান্ত, ইহা ঐ সমস্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য নহে। এক আত্মারই তত্ত্বজ্ঞান মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ, ইহাই অদ্বৈত শ্রুতি অর্থাৎ আত্মার একত্ববোধক শ্রুতিসমূহের তাৎপর্য্য। আত্মার একত্বই বাস্তব তত্ত্ব, ইহা ঐ সমস্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য নহে। আত্মা অতি দুর্ব্বোধ, ইহা প্রকাশ করাই পুনঃ পুনঃ আত্মতত্ত্বোপদেশের তাৎপর্য্য। মুমুক্ষু বাহ্য সংকল্প ত্যাগ করিবেন, কোন বাহ্য বিষয়কে নিজের প্রিয় করিয়া তাহাতে আসক্ত হইবেন না, ইহাই আত্মার নির্ম্মমত্ববোধক শ্রুতিসমূহের তাৎপর্য্য। আত্মাই উপাদেয়, মুমুক্ষুর আত্মাই চরম জ্ঞেয়, ইহাই "আত্মৈবেদং সর্ব্বং" ইত্যাদি শ্রুতিসমূহের তাৎপর্য্য। আত্মা ভিন্ন আর কোন পদার্থের বাস্তব সত্তা নাই, ইহা ঐ সমস্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য নহে। এইরূপ প্রকৃতি, মহৎ ও অহঙ্কার প্রভৃতি তত্ত্বের বোধক শ্রুতিসমূহ এবং তন্মূলক সাংখ্যাদি দর্শনের তদনুসারে মুমুক্ষুর যোগাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে, ইহাই তাৎপর্য্য। উদয়নাচার্য্য এই সকল কথা বলিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্তরূপ তাৎপর্য্য গ্রহণ না করিলে জৈমিনি মুনি বেদজ্ঞ, কপিল মুনি বেদজ্ঞ নহেন, এ বিষয়ের যথার্থ নিশ্চয় কি আছে ? আর যদি জৈমিনি ও কপিল, উভয়কেই বেদজ্ঞ বলিয়া অবশ্য স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে তাঁহাদিগের ব্যাখ্যাভেদ বা মতভেদ কেন হইয়াছে ? এখানে "জৈমিনির্যদি বেদজ্ঞঃ" ইত্যাদি শ্লোকটি উদয়নাচার্য্যের পূর্ব্ব হইতেই প্রসিদ্ধ ছিল, ইহাই মনে হয়। উদয়নাচার্য্য নিজে ঐ শ্লোক রচনা করিলে তিনি গোতম ও কণাদের নামও বলিতেন, ঐরূপ অসম্পূর্ণ উক্তি করিতেন না, ইহা মনে হয়। সে যাহা হউক, পূর্ব্বোক্ত কথায় উদয়নাচার্য্যের তাৎপর্য্য বুঝা যায় যে, জৈমিনি ও কপিল প্রভৃতি দর্শনকার ঋষিগণ সকলেই বেদজ্ঞ ও তত্ত্বজ্ঞ, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। উঁহাদিগের মধ্যে কেহ বেদজ্ঞ, কেহ বেদজ্ঞ নহেন, ইহা যথার্থরূপে নির্ব্বিবাদে কেহ প্রতিপন্ন করিতে পারেন না। সুতরাং নানা শ্রুতি ও তন্মূলক নানা দর্শনের ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়াই সমন্বয় করিতে হইবে। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ তাৎপর্য্য গ্রহণ করিলে শ্রুতি ও তন্মূলক ভিন্ন ভিন্ন দর্শনের তত্ত্ব বিষয়ে কোন বিরুদ্ধ মতই না থাকায় নানা সিদ্ধান্তভেদ বলিয়া শ্রুতি ও তন্মূলক দর্শনশাস্ত্রে ব্যাঘাত বা মতবিরোধরূপ দোষ বস্তুতঃ নাই, ইহা

প্রকৃত্যাদিশ্রুতীনাং তন্মূলানাং সাংখ্যাদিদর্শনানাঞ্চেতিনেয়ং। অন্যথা "জৈমিনির্যদি বেদজ্ঞঃ কপিলো নেতি কা প্রমা। উভৌ চ যদি বেদজ্ঞৌ ব্যাখ্যাভেদস্তু কিংকৃতঃ॥"—আত্মতত্ত্ববিবেক।

এখানে বুঝা যায়। প্রণিধান করা আবশ্যক যে, উদয়নাচার্য্য পূর্ব্বোক্তরূপ সমন্বয় করিতে যাইয়া অদ্বৈত মতকে সিদ্ধান্তরূপেই স্বীকার করেন নাই। তিনি অদ্বৈত সিদ্ধান্তের অনুকূল শ্রুতিসমূহের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াও যেরূপে উহার তাৎপর্য্য কল্পনা করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তিনি যে ন্যায়মতকেই প্রকৃত সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন এবং উহাই সমর্থন করিবার জন্য ঐ শ্রুতিসমূহের পূর্ব্বোক্তরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়। সুতরাং তাঁহাকে আমরা অদ্বৈতমতনিষ্ঠ বলিয়া আর কিরূপে বুঝিব? অবশ্য তিনি তাঁহার ব্যাখ্যায় ন্যায়মতের সমর্থনের জন্য অদ্বৈতমত খণ্ডন করিতে পারেন। কিন্তু তিনি যখন উপনিষদের "সারসংক্ষেপ" প্রকাশ করিতেই পূর্ব্বোক্তরূপে শ্রুতির তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া সমন্বয় প্রদর্শন-পূর্ব্বক ন্যায়মতেরই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, তখন তাঁহাকে অদ্বৈতমতনিষ্ঠ বলিয়া কোনরূপেই বুঝা যাইতে পারে না। পরন্তু উদয়নাচার্য্য "আত্মতত্ত্ববিবেকে"র সর্ব্বশেষে মুমুক্ষু উপাসকের ধ্যানের ক্রম প্রদর্শনপূর্ব্বক নানা দর্শনের বিষয়ভেদ ও উদ্ভবের কারণ বর্ণন করিয়া যে ভাবে সকল দর্শনের সমন্বয় প্রদর্শন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহার সিদ্ধান্ত বুঝা যায় যে, মুমুক্ষু, শাস্ত্রানুসারে আত্মার শ্রবণ মননাদি উপাসনা করিতে আরম্ভ করিলে প্রথমতঃ তাঁহার নিকটে বাহ্য পদার্থই প্রকাশিত হয়। সেই বাহ্য পদার্থকে আশ্রয় করিয়াই কর্ম্মমীমাংসার উপসংহার এবং চার্ব্বাকমতের উত্থান হইয়াছে। তাহার পরে তাঁহার নিকটে অর্থাকারে অর্থাৎ গ্রাহ্য বিষয়াকারে আত্মার প্রকাশ হয়। তাহাকে আশ্রয় করিয়াই ত্রৈদণ্ডিক মতের উপসংহার ও বিজ্ঞানমাত্রবাদী যোগাচার বৌদ্ধ মতের উত্থান হইয়াছে এবং মুমুক্ষু সাধকের সেই অবস্থা প্রতিপাদনের জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন, "আত্মৈবেদং সর্ব্বং" ইত্যাদি। উদয়নাচার্য্য এই ভাবে নানা দর্শনের নানা মতের উত্থানকে সাধকের ক্রমিক নানাবিধ অবস্থারই প্রতিপাদক বলিয়া শেষে সাধকের কোন্ অবস্থায় যে, কেবল আত্মারই প্রকাশ হয় এবং উহা আশ্রয় করিয়াই অদ্বৈত মতের উপসংহার হইয়াছে, ইহা বলিয়াছেন। অর্থাৎ সাধকের আত্মোপাসনার পরিপাকে এমন অবস্থা উপস্থিত হয়, যে অবস্থায় আত্মা ভিন্ন আর কোন বস্তুরই জ্ঞান হয় না। অনেক শ্রুতি সাধকের সেই অবস্থারই বর্ণন করিয়াছেন, আত্মা ভিন্ন আর কোন পদার্থের বাস্তব সত্তাই নাই, ইহা ঐ সমস্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য নহে। উদয়নাচার্য্য শেষে আবার বলিয়াছেন যে, সাধকের পূর্ব্বোক্ত অবস্থাও থাকে না। পরে আত্মবিষয়েও তাহার সবিকল্পক জ্ঞানের নিবৃত্তি হয়। এই জন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন,—"ন দ্বৈতং নাপি চাদ্বৈতং" ইত্যাদি। এখানে টীকাকার রঘুনাথ শিরোমণি তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, মুমুক্ষু আত্মাকে নির্দ্ধর্ম্মক অর্থাৎ সর্ব্বধর্ম্মশূন্য বা নির্গুণ নির্ব্বিশেষ বলিয়া ধ্যান করিবেন, ইহাই "ন দ্বৈতং" ইত্যাদি শ্রুতির তাৎপর্য্য। আমরা অনুসন্ধান করিয়াও "ন দ্বৈতং" ইত্যাদি শ্রুতির সাক্ষাৎ পাই নাই। কিন্তু দক্ষসংহিতায় ঐরূপ একটি বচন দেখিতে পাইয়াছি[১]। তদ্দ্বারা মহর্ষি দক্ষের বক্তব্য বুঝিতে পারি যে, যোগীর পক্ষে অবস্থাবিশেষে

১। দ্বৈতঞ্চৈব তথাদ্বৈতং দ্বৈতাদ্বৈতং তথৈব চ।
ন দ্বৈতং নাপি চাদ্বৈতমিতি তৎ পারমার্থিকং॥—দক্ষসংহিতা। ৭ম অঃ ৪৮।

দ্বৈত, অদ্বৈত ও দ্বৈতাদ্বৈত, সমস্তই প্রতিভাত হয়। কিন্তু দ্বৈতও নহে, অদ্বৈতও নহে, ইহাই সেই পারমার্থিক। অর্থাৎ যোগীর নির্ব্বিকল্পক সমাধিকালে যে অবস্থা হয়, উহাই তাঁহার পারমার্থিক স্বরূপ। অদ্বৈতবাদী মহর্ষি দক্ষ উক্ত শ্লোকের দ্বারা অদ্বৈত সিদ্ধান্তই প্রকৃত চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা তাঁহার অন্য বচনের সাহায্যে বুঝা যায়। পরে তাহা ব্যক্ত হইবে। উদয়নাচার্য্য পূর্ব্বোক্ত কথার পরে বলিয়াছেন যে, সমস্ত সংস্কারের অভিভব হওয়ায় সাধকের নির্ব্বিকল্পক সমাধিকালে আত্মবিষয়েও যে কোন জ্ঞান জন্মে না, সকল জ্ঞানেরই নিবৃত্তি হয়, ঐ অবস্থাকে আশ্রয় করিয়াই চরম বেদান্তের উপসংহার হইয়াছে এবং ঐ অবস্থা প্রতিপাদনের জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন, "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" ইত্যাদি। মুদ্রিত পুরাতন "আত্মতত্ত্ববিবেক" গ্রন্থে ইহার পরেই আছে, "সা চাবস্থা ন হেয়া মোক্ষনগর-গোপুরায়মাণত্বাৎ।" কিন্তু হস্তলিখিত প্রাচীন পুস্তকে ঐ স্থলে "সা চাবস্থা ন হেয়া" এই অংশ দেখিতে পাই না। কোন পুস্তকে ঐ অংশ কর্ত্তিত দেখা যায়। টীকাকার রঘুনাথ শিরোমণি ও তাঁহার টীকাকার শ্রীরাম তর্কালঙ্কার (নব্যনৈয়ায়িক মথুরানাথ তর্কবাগীশের পিতা) মহাশয়ও ঐ কথার কোন তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন নাই। তাঁহারা ইহার পূর্ব্বোক্ত অনেক কথার অন্যরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাও করিয়াছেন। অনেক কথার কোন ব্যাখ্যাও করেন নাই। তাঁহাদিগের অতি সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যার দ্বারা উদয়নাচার্য্যের শেষোক্ত কথাগুলির তাৎপর্য্যও সম্যক্ বুঝা যায় না। যাহা হউক, "সা চাবস্থা ন হেয়া" এই পাঠ প্রকৃত হইলে উদয়নাচার্য্যের বক্তব্য বুঝা যায় যে, আত্মোপাসক মুমুক্ষুর পূর্ব্বোক্ত অবস্থা পরিত্যাজ্য নহে। কারণ, উহা মোক্ষনগরের পুরদ্বারসদৃশ। এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, উদয়নাচার্য্য পূর্ব্বোক্ত অবস্থাকে মোক্ষনগরের পুরদ্বার সদৃশই বলিয়াছেন, অন্তঃপুরসদৃশ বলেন নাই। সুতরাং তাঁহার পূর্ব্বোক্ত অবস্থার পরে মুমুক্ষুর আরও অবস্থা আছে, পূর্ব্বোক্ত অবস্থারও নিবৃত্তি হয়, ইহা তাঁহার মত বুঝা যায়। উদয়নাচার্য্য পূর্ব্বোক্ত কথার পরেই আবার বলিয়াছেন, "নির্ব্বাণস্তু তস্যাঃ স্বয়মেব, যদাশ্রিত্য ন্যায়দর্শনোপসংহারঃ।" এখানে টীকাকার রঘুনাথ শিরোমণি নিজে কোন ব্যাখ্যা করেন নাই। মতভেদে দ্বিবিধ ব্যাখ্যার উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে প্রথম ব্যাখ্যায় "তস্যাঃ" এই স্থলে পঞ্চমী বিভক্তি, "নির্ব্বাণ" শব্দের অর্থ অপবর্গ। দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় "তস্যাঃ" এই স্থলে ষষ্ঠী বিভক্তি, "নির্ব্বাণ" শব্দের অর্থ বিনাশ। পূর্ব্বোক্ত অবস্থার স্বয়ংই নির্ব্বাণ হয় অর্থাৎ কালবিশেষসহকৃত সেই অবস্থা হইতেই উহার বিনাশ হয়, সেই নির্ব্বাণ বা বিনাশকে আশ্রয় করিয়া ন্যায়দর্শনের উপসংহার হইয়াছে, ইহাই দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় তাৎপর্য্য বুঝা যায়। পূর্ব্বোক্ত অবস্থার বিনাশ না হইলে অর্থাৎ মুমুক্ষুর ঐ অবস্থাই চরম অবস্থা হইলে ন্যায়দর্শনের আর কোন প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত অবস্থার নিবৃত্তি হয় বলিয়াই উহাকে অবলম্বন করিয়া ন্যায়দর্শন সার্থক হইয়াছে। এখানে উদয়নাচার্য্যের শেষ কথার দ্বারা তিনি যে, ন্যায়দর্শনকেই মুমুক্ষুর চরম অবস্থার প্রতিপাদক ও চরম সিদ্ধান্তবোধক বলিয়া গিয়াছেন, ইহাই আমরা বুঝিতে পারি। তাঁহার মতে নানা দর্শনে মুমুক্ষুর উপাসনাকালীন ক্রমিক নানাবিধ অবস্থার প্রতিপাদন হইয়াছে এবং তজ্জন্যও নানা দর্শনের

উদ্ভব হইয়াছে। তন্মধ্যে উপাসনার পরিপাকে সময়ে অদ্বৈতাবস্থা প্রভৃতি কোন কোন অবস্থা মুমুক্ষুর গ্রাহ্য ও আবশ্যক হইলেও সেই অবস্থাই চরম অবস্থা নহে। চরম অবস্থায় ন্যায়দর্শনোক্ত তত্ত্বজ্ঞানই উপস্থিত হয়, তাহার ফলে ন্যায়দর্শনোক্ত মুক্তিই (যাহা পূর্ব্বে উদয়নাচার্য্য বিশেষ বিচার দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন) জন্মে। এখন যদি উদয়নাচার্য্যের "আত্মতত্ত্ববিবেকে"র শেষোক্ত কথার দ্বারা তাঁহার পূর্ব্বোক্তরূপই শেষ সিদ্ধান্ত বুঝা যায়, তাহা হইলে তিনি যে অদ্বৈতমতনিষ্ঠ ছিলেন, ইহা কিরূপে বলা যায়? তিনি উপনিষদের সারসংক্ষেপ প্রকাশ করিতে অদ্বৈতশ্রুতি ও জগতের মিথ্যাত্ববোধক শ্রুতিসমূহের যেরূপ তাৎপর্য্য কল্পনা করিয়াছেন এবং যে ভাবে নানা দর্শনের অভিনব সমন্বয় প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা চিন্তা করিলেও তিনি যে অদ্বৈতমতনিষ্ঠ ছিলেন, ইহা কিছুতেই মনে হয় না। সুধীগণ উদয়নাচার্য্যের ঐ সমস্ত কথায় বিশেষ মনোযোগ করিয়া ইহার বিচার করিবেন।

এখানে ইহাও অবশ্য বক্তব্য যে, উদয়নাচার্য্য যে ভাবে নানা দর্শনের বিষয়-ভেদ ও উদ্ভবের কারণ বর্ণনপূর্ব্বক যে অভিনব সমন্বয় প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সর্ব্বসম্মত হইতে পারে না, ইহা স্বীকার্য্য। কারণ, সকল সম্প্রদায়ই ঐ ভাবে নিজের মতকেই চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া অন্যান্য দর্শনের নানারূপ উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য্য কল্পনা করিতে পারেন। কিন্তু সে কল্পনা অন্য সম্প্রদায়ের মনঃপূত হইতে পারে না। সাংখ্যাচার্য্য বিজ্ঞান ভিক্ষুও সাংখ্য-প্রবচন-ভাষ্যের ভূমিকায় তাঁহার নিজ মতকেই চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া ন্যায়াদি দর্শনের উদ্দেশ্যাদি বর্ণনপূর্ব্বক ষড়্দর্শনের সমন্বয় করিতে গিয়াছেন। "বামকেশ্বরতন্ত্রে"র ব্যাখ্যায় মহামনীষী ভাস্কররায় অধিকারিভেদকে আশ্রয় করিয়া সকল দর্শনের বিশদ সমন্বয় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অনুসন্ধিৎসুর উহা অবশ্য দ্রষ্টব্য। কিন্তু ঐরূপ সমন্বয়ের দ্বারাও বিবাদের শান্তি হইতে পারে না। কারণ, প্রকৃত সিদ্ধান্ত বা চরম সিদ্ধান্ত কি, এই বিষয়ে সর্ব্বসম্মত কোন উত্তর হইতে পারে না। সকল সম্প্রদায়ই নিজ নিজ সিদ্ধান্তকেই চরম সিদ্ধান্ত বলিয়া, অধিকারিভেদ আশ্রয় করিয়া অন্যান্য সিদ্ধান্তের কোনরূপ উদ্দেশ্য বর্ণন করিবেন। অপরের সিদ্ধান্তকে কেহই চরম সিদ্ধান্ত বা প্রকৃত সিদ্ধান্ত বলিয়া কোন দিনই স্বীকার করিবেন না। সুতরাং ঐরূপ সমন্বয়ের দ্বারা বিবাদ-নিবৃত্তির আশা কোথায়? অবশ্য অধিকারিভেদেই যে ঋষিগণ নানা মতের উপদেশ করিয়াছেন, ইহা সত্য; "অধিকারিবিভেদেন শাস্ত্রাণ্যুক্তান্যশেষতঃ" ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যেও উহাই কথিত হইয়াছে, কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা চরম অধিকারী কে? চরম সিদ্ধান্ত কি? ইহা বলিতে যাওয়া বিপজ্জনক। কারণ, আমরা নিম্নাধিকারী, আমাদের গুরূপদিষ্ট সিদ্ধান্ত চরম সিদ্ধান্ত নহে, এইরূপ কথা কোন সম্প্রদায়ই স্বীকার করিবেন না—সকলেরই উহা অসহ্য হইবে। মনে হয়, এই জন্যই প্রাচীন আচার্য্যগণ ঐরূপ সমন্বয় প্রদর্শন করেন নাই। তাঁহারা ভিন্ন সিদ্ধান্তেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন।

এখন এখানে অপক্ষপাত বিচারের কর্ত্তব্যতাবশতঃ ইহাও অবশ্য বক্তব্য যে, অন্যান্য সকল সম্প্রদায়ই যে কোন কারণে অদ্বৈতবাদের প্রতিবাদী হইলেও অদ্বৈতবাদ বা মায়াবাদ, কাহারও বুদ্ধিমাত্রকল্পিত অশাস্ত্রীয় মত নহে। অদ্বৈতবাদ বৌদ্ধ সম্প্রদায়বিশেষকে নিরস্ত করিবার জন্য এবং

বৌদ্ধভাব-ভাবিত তৎকালীন মানবগণের প্রতীতি সম্পাদনের জন্য তাঁহাদিগের সংস্কারানুসারে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের উদ্ভাবিত কোন নূতন মত নহে, সংস্কৃত বৌদ্ধমতবিশেষও নহে। কিন্তু অদ্বৈতবাদও বেদমূলক অতি প্রাচীন মত। শঙ্করাবতার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য উপনিষদের বিশদ ব্যাখ্যা করিয়া তদ্দ্বারাই এই অদ্বৈতবাদের সমর্থন ও প্রচার করিয়াছেন। পরে তাঁহার প্রবর্ত্তিত গিরি, পুরী ও ভারতী প্রভৃতি দশনামী যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসিসম্প্রদায় ভারতের অদ্বৈত-বিদ্যার গুরু, দ্বৈত-সাধনার চরম আদর্শ ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবও যে সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ঈশ্বরপুরীর নিকটে দীক্ষাগ্রহণ ও কেশব ভারতীর নিকটে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্যই তিনি ভক্তচূড়ামণি রামানন্দ রায়ের নিকটে দৈন্য প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, "আমি মায়াবাদী সন্ন্যাসী" (চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্য খণ্ড, অষ্টম পঃ), সেই সন্ন্যাসিসম্প্রদায় গুরুপরম্পরাক্রমে আজ পর্য্যন্ত ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের প্রচারিত অদ্বৈতবাদের রক্ষা করিতেছেন। সাংখ্যাচার্য্য বিজ্ঞান ভিক্ষু সাংখ্য-প্রবচনভাষ্যের ভূমিকায় পদ্মপুরাণের বচন বলিয়া মায়াবাদের নিন্দাবোধক যে সকল বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং অনেক বৈষ্ণবাচার্য্যও উহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, ঐ সকল বচন যে, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের অন্তর্দ্ধানের পরেই রচিত হইয়াছে, ইহা সেখানে "ময়ৈব কথিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা" ইত্যাদি বচনের দ্বারা বুঝা যায়। পরন্তু ঐ সকল বচনের প্রামাণ্য স্বীকার করিলে তদনুসারে আস্তিকসম্প্রদায়ের বেদান্তদর্শন ও যোগদর্শন ভিন্ন আর সমস্ত দর্শনেরই শ্রবণও পরিত্যাগ করিতে হয়। কারণ, ঐ সকল বচনের প্রথমে ন্যায়, বৈশেষিক, পূর্ব্বমীমাংসা প্রভৃতি এবং বিজ্ঞান ভিক্ষুর ব্যাখ্যায় সাংখ্যদর্শনও তামস বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং প্রথমেই বলা হইয়াছে, "যেষাং শ্রবণমাত্রেণ পাতিত্যং জ্ঞানিনামপি।" সুতরাং অদ্বৈতবাদী পূর্ব্বোক্ত সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের ন্যায় নৈয়ায়িক, বৈশেষিক ও মীমাংসক প্রভৃতি সম্প্রদায়ও যে উক্ত বচনাবলীর প্রামাণ্য স্বীকার করেন নাই, স্বীকার করিতেই পারেন না, ইহা বুঝা যায়। ঐ সমস্ত বচন সমস্ত পদ্মপুরাণ পুস্তকেও দেখা যায় না। পরন্তু বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার জন্য কলিযুগে ভগবান্ মহাদেব যে, শঙ্করাচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হইবেন, ইহাও কূর্ম্মপুরাণে বর্ণিত দেখা যায়[১] এবং তিনি বেদান্তসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া শ্রুতির যেরূপ অর্থ বলিয়াছেন, সেই অর্থই ন্যায্য, ইহাও শিবপুরাণে কথিত হইয়াছে বুঝা যায়[২]। সুতরাং পদ্মপুরাণের পূর্ব্বোক্ত বচনাবলীর প্রামাণ্য কিরূপে স্বীকার করা যায়? তাহা হইলে কূর্ম্মপুরাণ ও শিবপুরাণের বচনের প্রামাণ্যই বা কেন স্বীকৃত হইবে না? বস্তুতঃ যদি পদ্মপুরাণের উক্ত বচনাবলীর প্রামাণ্য স্বীকার্য্যই হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, যাঁহাদিগের চিত্তশুদ্ধি ও বৈরাগ্যের কোন লক্ষণ নাই, যাঁহারা সতত

১। "কলৌ রুদ্রো মহাদেবো লোকানামীশ্বরঃ পরঃ" ইত্যাদি—
করিষ্যত্যবতারাণি শঙ্করো নীললোহিতঃ।
শ্রৌত-স্মার্ত্তপ্রতিষ্ঠার্থং ভক্তানাং হিতকাম্যয়া।—কূর্ম্মপুরাণ, পূর্ব্বখণ্ড, ৩০শ অঃ।

২। ব্যাকুর্ব্বন্ ব্যাসসূত্রার্থং শ্রুতেরর্থং যথোচিবান্।
শ্রুতের্ন্যায্যঃ স এবার্থঃ শঙ্করঃ সবিতাননঃ॥"—শিবপুরাণ—৩য় খণ্ড, ১ম অঃ।

সাংসারিক সুখে আসক্ত হইয়া নিজের ব্রহ্মজ্ঞানের দোহাই দিয়া নানা কুকর্ম্ম করিতেন ও করিবেন, তাঁহাদিগকে ঐরূপ বেদান্তচর্চ্চা হইতে নিবৃত্ত করিবার উদ্দেশ্যেই পদ্মপুরাণে মায়াবাদের নিন্দা করা হইয়াছে। আমরা শাস্ত্রে অন্যত্রও দেখিতে পাই,—"সাংসারিকসুখাসক্তং ব্রহ্মজ্ঞোঽস্মীতি বাদিনং। কর্ম্মব্রহ্মোভয়ভ্রষ্টং সন্ত্যজেদন্ত্যজং যথা॥" সাংসারিক সুখাসক্ত অনধিকারী, আমি ব্রহ্মজ্ঞ, ইহা বলিয়া বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে কর্ম্ম ও ব্রহ্ম, এই উভয় হইতেই ভ্রষ্ট হয়, ঐরূপ ব্যক্তির সংসর্গে শাস্ত্রবিহিত বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের হানি হয়, এই জন্য ঐরূপ ব্যক্তি ত্যাজ্য, ইহা উক্ত বচনে কথিত হইয়াছে। সুতরাং কালপ্রভাবে পূর্ব্বকালেও যে অনেক অনধিকারী অদ্বৈতমতানুসারে নিজেকে ব্রহ্মজ্ঞ বলিয়া সন্ন্যাসী সাজিয়া অনেকের গুরু হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদিগের দ্বারা ভারতের বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের অনেক হানি হইয়াছিল, ইহা বুঝা যায়। দক্ষস্মৃতিতেও কুতপস্বীদিগের নানাবিধ প্রপঞ্চ কথিত হইয়াছে[১]। সুতরাং প্রাচীন কালেও যে কুতপস্বীদিগের অস্তিত্ব ছিল, ইহা বুঝা যায়।

মূলকথা, অদ্বৈতবাদ-বিরোধী পরবর্ত্তী কোন কোন গ্রন্থকার যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের সমর্থিত অদ্বৈতবাদকে অশাস্ত্রীয় বলিয়া গিয়াছেন, তাহা স্বীকার করা যায় না। কারণ, উপনিষদে এবং অন্যান্য কোন শাস্ত্রেই যে, পূর্ব্বোক্ত অদ্বৈতবাদের প্রতিপাদক প্রমাণভূত কোন বাক্যই নাই, ইহা কোন দিন কেহ প্রতিপন্ন করিতে পারিবেন না। অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিতে প্রাচীন কাল হইতে সকল গ্রন্থকারই মুণ্ডক উপনিষদের "পরমং সাম্যমুপৈতি" এই শ্রুতিবাক্যে "সাম্য" শব্দ এবং ভগবদ্গীতার "মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ" এই বাক্যে "সাধর্ম্ম্য" শব্দের দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের বাস্তব ভেদ সমর্থন করিয়াছেন, ইহা পূর্ব্বে অনেকবার বলিয়াছি। কিন্তু অদ্বৈতপক্ষে বক্তব্য এই যে, "সাম্য" ও "সাধর্ম্ম্য" শব্দের দ্বারা সর্ব্বত্রই ভেদ সিদ্ধ হয় না। কারণ, "সাম্য" ও "সাধর্ম্ম্য" শব্দের দ্বারা আত্যন্তিক সাধর্ম্ম্যও বুঝা যাইতে পারে। প্রাচীন কালে যে আত্যন্তিক "সাধর্ম্ম্য" বুঝাইতেও "সাধর্ম্ম্য" শব্দের প্রয়োগ হইত, ইহা আমরা মহর্ষি গোতমের ন্যায়দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের "অত্যন্তপ্রায়ৈকদেশসাধর্ম্ম্যাদুপমানাসিদ্ধিঃ" (৪৪শ) এই সূত্রের দ্বারাই স্পষ্ট বুঝিতে পারি। আত্যন্তিক, প্রায়িক ও ঐকদেশিক, এই ত্রিবিধ সাধর্ম্ম্যই যে "সাধর্ম্ম্য" শব্দের দ্বারা প্রাচীন কালে গৃহীত হইত, ইহা উক্ত সূত্রের দ্বারাই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। কোন স্থলে আত্যন্তিক সাধর্ম্ম্য প্রযুক্তও যে, উপমানের সিদ্ধি হয়, ইহা সমর্থন করিতে "ন্যায়বার্ত্তিকে" উদ্দ্যোতকর উহার উদাহরণ বলিয়াছেন, "রামরাবণয়োর্যুদ্ধং রামরাবণয়োরিব।" "সিদ্ধান্ত-মুক্তাবলী"র টীকায় মহাদেব ভট্ট সাদৃশ্য পদার্থের স্বরূপ-ব্যাখ্যায় "গগনং গগনাকারং সাগরঃ সাগরোপমঃ। রামরাবণয়োর্যুদ্ধং রামরাবণয়োরিব" এই শ্লোকে উপমান ও উপমেয়ের ভেদ না থাকায় সাদৃশ্য থাকিতে পারে না, এই পূর্ব্বপক্ষের সমর্থন করিয়া, তদুত্তরে বলিয়াছেন যে, কোন স্থলে উপমান ও উপমেয়ের ভেদ না থাকিলেও সাদৃশ্য স্বীকার্য্য, সেখানে সাদৃশ্যের লক্ষণে ভেদের উল্লেখ পরি-

---

১। লাভপূজানিমিত্তং হি ব্যাখ্যানং শিষ্যসংগ্রহঃ।
এতে চান্যে চ বহবঃ প্রপঞ্চাঃ কুতপস্বিনাং॥—দক্ষসংহিতা, ৭ম অং, । ৩৭ ।

ত্যাজ্য। অথবা যুগভেদে গগন, সাগর ও রামরাবণের যুদ্ধের ভেদ থাকায় এক যুগের গগনাদির সহিত অন্য যুগের গগনাদির সাদৃশ্যই উক্ত শ্লোকে বিবক্ষিত। এই জন্যই আলঙ্কারিকগণ বলিয়াছেন যে, যুগভেদ বিবক্ষা থাকিলে উক্ত শ্লোকে উপমান ও উপমেয়ের ভেদ থাকায় উপমা অলঙ্কার হইবে। অন্যথা "অনন্বয়" অলঙ্কার হইবে। এখানে নৈয়ায়িক মহাদেব ভট্ট যুগভেদে গগনের ভেদ কিরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা সুধীগণ চিন্তা করিবেন। ন্যায়মতে গগনের উৎপত্তি নাই। সর্ব্বকালে সর্ব্বদেশে একই গগন চিরবিদ্যমান। যাহা হউক, উপমান ও উপমেয়ের ভেদ না থাকিলেও যে, সাধর্ম্ম্য থাকিতে পারে, ইহা নব্য নৈয়ায়িক মহাদেব ভট্টও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

বস্তুতঃ প্রামাণিক আলঙ্কারিক মম্মটভট্ট কাব্যপ্রকাশের দশম উল্লাসের প্রারম্ভে "সাধর্ম্ম্যমুপমা-ভেদে" এই বাক্যের দ্বারা উপমান ও উপমেয়ের ভেদ থাকিলে, ঐ উভয়ের সাধর্ম্ম্যকেই তিনি উপমা অলঙ্কার বলিয়াছেন। ঐ বাক্যে "ভেদে" এই পদের দ্বারা "অনন্বয়" অলঙ্কারে উপমা অলঙ্কারের লক্ষণ নাই, ইহাই প্রকটিত হইয়াছে, ইহা তিনি সেখানে নিজেই বলিয়া গিয়াছেন। "রাজীব-মিব রাজীবং" ইত্যাদি শ্লোকে উপমান ও উপমেয়ের অভেদবশতঃ "অনন্বয়" অলঙ্কার হইয়াছে, উপমা অলঙ্কার হয় নাই। ফলকথা, উপমান ও উপমেয়ের অভেদ স্থলেও যে, ঐ উভয়ের "সাধর্ম্ম্য" বলা যায়, ইহা স্বীকার্য্য। ঐরূপ স্থলে সাধর্ম্ম্য—আত্যন্তিক সাধর্ম্ম্য। পূর্ব্বোক্ত ন্যায়সূত্রে ঐরূপ সাধর্ম্ম্যেরও স্পষ্ট উল্লেখ আছে। ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককার প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণ এবং আলঙ্কারিক-গণও উহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। উপমান ও উপমেয়ের ভেদ ব্যতীত যদি সাধর্ম্ম্য সম্ভবই না হয়, উহা বলাই না যায়, তাহা হইলে মম্মট ভট্ট "সাধর্ম্ম্যমুপমাভেদে" এই লক্ষণ-বাক্যে "ভেদ" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন কেন ? ইহা চিন্তা করা আবশ্যক। পরন্তু ইহাও বক্তব্য যে, "সাধর্ম্ম্য" শব্দের দ্বারা একধর্ম্মবত্তাও বুঝা যাইতে পারে। কারণ, সমানধর্ম্মবত্তাই "সাধর্ম্ম্য" শব্দের অর্থ। কিন্তু "সমান" শব্দ তুল্য অর্থের ন্যায় এক অর্থেরও বাচক। অমরকোষের নানার্থবর্গ প্রকরণে "সমানাঃ সৎসমৈকে স্যুঃ" এই বাক্যের দ্বারা "সমান" শব্দের "এক" অর্থও কথিত হইয়াছে। পূর্ব্বোদ্ধৃত "সমানে বৃক্ষে পরিষস্বজাতে" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে এবং "সপত্নী" ইত্যাদি প্রয়োগে "সমান" শব্দের অর্থ এক, অর্থাৎ অভিন্ন। তাহা হইলে ভগবদ্গীতার "মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ" এই বাক্যে "সাধর্ম্ম্য" শব্দের দ্বারা যখন একধর্ম্মবত্তাও বুঝা যায়, তখন উহার দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের বাস্তব ভেদ-নির্ণয় হইতে পারে না। কারণ, ব্রহ্মজ্ঞানী মুক্ত পুরুষ ব্রহ্মের সাধর্ম্ম্য অর্থাৎ এক-ধর্ম্মবত্তা প্রাপ্ত হন, ইহা উহার দ্বারা বুঝা যাইতে পারে। উক্ত মতে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মজ্ঞানীর ব্রহ্মভাবই সেই এক ধর্ম্ম বা অভিন্ন ধর্ম্ম। ফলকথা, যেরূপেই হউক, যদি পদার্থদ্বয়ের বাস্তব ভেদ না থাকিলেও "সাম্য" ও "সাধর্ম্ম্য" বলা যায়, তাহা হইলে আর "সাম্য" ও "সাধর্ম্ম্য" শব্দ প্রয়োগের দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের বাস্তব ভেদ নিশ্চয় করা যায় না। সুতরাং উহাকে অদ্বৈতবাদ খণ্ডনের ব্রহ্মাস্ত্র বলাও যায় না। কারণ, সাধর্ম্ম্য শব্দের দ্বারা আত্যন্তিক সাধর্ম্ম্য বুঝিলে উহার দ্বারা সেখানে পদার্থদ্বয়ের বাস্তব ভেদ সিদ্ধ হয় না। বস্তুতঃ ভগবদ্গীতার পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে "সাধর্ম্ম্য"

শব্দের দ্বারা আত্যন্তিক সাধর্ম্যই বিবক্ষিত এবং মুণ্ডক উপনিষদের পূর্ব্বোক্ত ("নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি") শ্রুতিতে "সাম্য" শব্দের দ্বারাও আত্যন্তিক সাম্যই বিবক্ষিত, ইহা অবশ্য বুঝা যাইতে পারে। কারণ, উক্ত শ্রুতিতে কেবল "সাম্য" না বলিয়া "পরম সাম্য" বলা হইয়াছে,—আত্যন্তিক সাম্যই পরমসাম্য। ব্রহ্ম ও ব্রহ্মজ্ঞানী মুক্ত পুরুষের ব্রহ্মভাবই পরমসাম্য। দুঃখহীনতা প্রভৃতি কিঞ্চিৎ সাদৃশ্যই বিবক্ষিত হইলে "পরম" শব্দ প্রয়োগের সার্থকতা থাকে না। তবে মুক্ত পুরুষ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হইলে তিনি জগৎসৃষ্টির কারণ হইবেন কি না, এবং পুনর্ব্বার তাঁহার জীবভাব ঘটিবে কি না, এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে। কাহারও ঐরূপ আপত্তিও হইতে পারে। তাই ভগবদ্গীতার উক্ত শ্লোকের শেষে বলা হইয়াছে, "সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ।" অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানী মুক্ত পুরুষের অবিদ্যানিবৃত্তিই ব্রহ্মভাব-প্রাপ্তি। সুতরাং তাঁহার আর কখনও জীবভাব হইতে পারে না। তাঁহাতে জগৎপ্রপঞ্চের কল্পনারূপ সৃষ্টিও হইতে পারে না। ব্রহ্মজ্ঞানের প্রশংসার জন্যও উক্ত শ্লোকের পরার্দ্ধ বলা হইতে পারে। ফলকথা, পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যাতেও ভগবদ্গীতার উক্ত শ্লোকের পরার্দ্ধের সার্থকতা আছে। পরন্তু ভগবদ্গীতার চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে দ্বিতীয় শ্লোকে "মম সাধর্ম্যমাগতাঃ" এই বাক্য বলিয়া পরে ১৯শ শ্লোকে বলা হইয়াছে, "মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি"। পরে ২৬শ শ্লোকে বলা হইয়াছে, "ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে"। সুতরাং শেষোক্ত "মদ্ভাব" ও "ব্রহ্মভূয়" শব্দের দ্বারা যে অর্থ বুঝা যায়, পূর্ব্বোক্ত "মম সাধর্ম্যমাগতাঃ" এই বাক্যের দ্বারাও তাহাই বিবক্ষিত বুঝা যায়। পরে অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৫৩শ শ্লোকেও আবার বলা হইয়াছে, "ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে"। সুতরাং উহার পরবর্ত্তী শ্লোকে "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা" ইত্যাদি শ্লোকেও "ব্রহ্মভূত" শব্দের দ্বারা ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত, এই অর্থই বিবক্ষিত বুঝা যায়। উহার দ্বারা ব্রহ্মসদৃশ, এই অর্থ বিবক্ষিত বলিয়া বুঝা যায় না। কারণ, উহার পূর্ব্বশ্লোকে যে, "ব্রহ্মভূয়" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, তাহার মুখ্য অর্থ ব্রহ্মভাব। সুতরাং পরবর্ত্তী শ্লোকেও "ব্রহ্মভূত" শব্দের দ্বারা পূর্ব্বশ্লোকোক্ত ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত, এই অর্থই সরল ভাবে বুঝা যায়। পরন্তু ভগবদ্গীতায় প্রথমে সাধর্ম্য শব্দের প্রয়োগ করিয়া পরে "ব্রহ্মসাম্যায় কল্পতে" এবং "ব্রহ্মতুল্যঃ প্রসন্নাত্মা" এইরূপ বাক্য কেন বলা হয় নাই এবং শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থে "ব্রহ্ম সম্পদ্যতে" এবং "ব্রহ্মাত্মৈকত্বমাপ্নোতি" ইত্যাদি ঋষিবাক্যের দ্বারা সরলভাবে কি বুঝা যায়, ইহাও অপক্ষপাতে চিন্তা করা আবশ্যক।

দ্বৈতবাদি-সম্প্রদায়ের আর একটি বিশেষ কথা এই যে, শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের 'পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা যখন জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদজ্ঞানই মুক্তির কারণ বলিয়া বুঝা যায়, তখন জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ জ্ঞানই তত্ত্বজ্ঞান, ইহা উপনিষদের সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। কিন্তু শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের উক্ত শ্রুতির[১] পূর্ব্বার্দ্ধে "ভ্রাম্যতে ব্রহ্ম-চক্রে" এই বাক্যের সহিতই "পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা" এই তৃতীয় পাদের যোগ করিয়া

১। "সর্ব্বাজীবে সর্ব্বসংস্থে বৃহন্তে তস্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে।
পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি।"—শ্বেতাশ্বতর।১।৬।

ব্যাখ্যা করিলে জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদজ্ঞান-প্রযুক্ত জীব ব্রহ্মচক্রে ভ্রমণ করে অর্থাৎ সংসারে বদ্ধ হয়, এইরূপ অর্থ বুঝা যায়। তাহা হইলে কিন্তু উক্ত শ্রুতি অদ্বৈতবাদেরই সমর্থক হয়। উক্ত শ্রুতির শাঙ্কর ভাষ্যেও পূর্ব্বোক্তরূপ ব্যাখ্যাই করা হইয়াছে এবং ঐ ব্যাখ্যার যথার্থতা সমর্থনের জন্য পরে বৃহদারণ্যক শ্রুতি ও বিষ্ণুধর্ম্মের বচনও উদ্ধৃত হইয়াছে। সেখানে উদ্ধৃত বিষ্ণুধর্ম্মের বচনে অদ্বৈত সিদ্ধান্তের সুস্পষ্ট প্রকাশ আছে, ইহা দেখা আবশ্যক। দ্বৈতবাদী মীমাংসক প্রভৃতি সম্প্রদায়বিশেষ "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের অদ্বৈত ভাবনারূপ উপাসনাবিশেষেই যে তাৎপর্য্য বলিয়াছেন এবং "ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যকে যে গৌণার্থক বলিয়াছেন, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বেদান্তদর্শনের চতুর্থ সূত্রের ভাষ্যে এবং অন্যত্রও ঐ সমস্ত মতের সমালোচনা করিয়া "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য যে বস্তুতত্ত্ববোধক, ইহা উপনিষদের উপক্রমাদি বিচারের দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার শিষ্য সুরেশ্বরাচার্য্য "মানসোল্লাস" গ্রন্থে সংক্ষেপে তাঁহার কথা প্রকাশ করিয়াছেন[১]। ইহাঁদিগের পরে ক্রমশঃ অদ্বৈতবাদিসম্প্রদায়ের বহু আচার্য্য পাণ্ডিত্যপ্রভাবে নানা গ্রন্থে নানারূপ সূক্ষ্ম বিচার দ্বারা বিরুদ্ধ পক্ষের প্রতিবাদ খণ্ডন করিয়া, অদ্বৈতবাদের প্রচার ও প্রভাব বৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। ভারতের সন্ন্যাসিসম্প্রদায় আজ পর্য্যন্ত ঐ অদ্বৈতবাদের সেবা ও রক্ষা করিতেছেন।

অদ্বৈতবাদবিরোধী মধ্বাচার্য্য প্রভৃতি অনেক বৈষ্ণব দার্শনিক অনেক পুরাণ-বচনের দ্বারা নিজ মত সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু ব্রহ্মপুরাণ ও লিঙ্গপুরাণ প্রভৃতি শাস্ত্রে অনেক বচনের দ্বারা অদ্বৈত মতেরও যে সুস্পষ্ট প্রকাশ হইয়াছে, ইহাও স্বীকার্য্য। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের শাঙ্কর ভাষ্যারম্ভে ঐরূপ অনেক বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু তাহা দেখিবেন। পরন্তু বিষ্ণুপুরাণের অনেক বচনের দ্বারাও অদ্বৈত সিদ্ধান্তই স্পষ্ট বুঝা যায়[২]। দ্বৈতিগণ অতত্ত্বদর্শী, ইহাও বিষ্ণুপুরাণের কোন বচনে স্পষ্ট কথিত হইয়াছে[৩]। শ্রীভাষ্যকার রামানুজ ও শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতি বিষ্ণুপুরাণের কোন কোন বচনের কষ্টকল্পনা করিয়া নিজমতানুসারে ব্যাখ্যা করিলেও অপক্ষপাতে বিষ্ণুপুরাণের সকল বচনের সমন্বয় করিয়া বুঝিতে গেলে তদ্দ্বারা অদ্বৈত সিদ্ধান্তই যে বুঝা যায়, ইহা স্বীকার্য্য। পরন্তু গরুড়পুরাণে যে "গীতাসার" বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে অদ্বৈত সিদ্ধান্তই বিশদভাবে কথিত

১। নোপাসনাপরং বাক্যং প্রতিমাস্বীশবুদ্ধিবৎ।
ন চৌপচারিকং বাক্যং রাজবদ্রাজপুরুষে ॥
জীবাত্মনা প্রবিষ্টোহসাবীশ্বরঃ শ্রূয়তে যতঃ ॥—মানসোল্লাস, ৩য় উ।২৪,২৫।

২। তদ্ভাবভাবনাপন্নস্ততোহসৌ পরমাত্মনা।
ভবত্যভেদী ভেদশ্চ তস্যাজ্ঞানকৃতো ভবেৎ ॥
বিভেদজনকেহজ্ঞানে নাশমাত্যন্তিকং গতে।
আত্মনো ব্রহ্মণো ভেদমসন্তং কঃ করিষ্যতি ॥—বিষ্ণুপুরাণ, ষষ্ঠ অংশ, ৯৩।৯৪ ॥

৩। তস্যাত্মপরদেহেষু সতোহপ্যেকময়ং হি তৎ।
বিজ্ঞানং পরমার্থোহসৌ দ্বৈতিনোহতত্ত্বদর্শিনঃ ॥—বিষ্ণু।২।৩১।

হইয়াছে। "শব্দ-কল্পদ্রুমে"র পরিশিষ্ট খণ্ডে গরুড়পুরাণের ঐ "গীতাসার" (২৩৩ হইতে ২৩৬ অধ্যায়) প্রকাশিত হইয়াছে; অনুসন্ধিৎসু উহা দেখিবেন। এইরূপ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের অন্তর্গত সুপ্রসিদ্ধ "অধ্যাত্ম-রামায়ণে"র প্রথমেও (প্রথম অধ্যায়, ৪৭শ শ্লোক হইতে ৫৩শ শ্লোক পর্য্যন্ত) অদ্বৈত সিদ্ধান্তই স্পষ্ট কথিত হইয়াছে। পরে আরও বহু স্থানে ঐ সিদ্ধান্ত বিশদ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বৈষ্ণবসম্প্রদায়ও শ্রীমদ্ভাগবতের ন্যায় পূর্ব্বোক্ত সমস্ত পুরাণেরও প্রামাণ্য স্বীকার করেন। পরন্তু শ্রীমদ্ভাগবতেও নানা স্থানে অদ্বৈত সিদ্ধান্তের স্পষ্ট প্রকাশ আছে। প্রথম শ্লোকেও "তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গো মৃষা" এই তৃতীয় চরণের দ্বারা অদ্বৈত সিদ্ধান্তই স্পষ্ট বুঝা যায়। প্রামাণিক টীকাকার পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামীও শেষে মায়াবাদানুসারেই উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন[১]। পরে শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে পুরাণের দশ লক্ষণের বর্ণনায় নবম লক্ষণ "মুক্তি"র যে স্বরূপ কথিত হইয়াছে, তদ্দ্বারাও সরল ভাবে অদ্বৈত সিদ্ধান্তই বুঝা যায়[২]। টীকাকার শ্রীধর স্বামীও উহার ব্যাখ্যায় অদ্বৈতসিদ্ধান্তই ব্যক্ত করিয়াছেন। তাহার পরে শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে "ব্রহ্মস্তুতি"র মধ্যে আমরা মায়াবাদের সুস্পষ্ট বর্ণন দেখিতে পাই[৩]। সেখানে স্বপ্নতুল্য অসৎস্বরূপ জগৎ মায়াবশতঃ ব্রহ্মে কল্পিত হইয়া "সৎ"পদার্থের ন্যায় প্রতীত হইতেছে, ইহা কোন শ্লোকে বলা হইয়াছে এবং পরে কোন শ্লোকে ঐ সিদ্ধান্তই বুঝাইতে রজ্জুতে সর্পের অধ্যাস দৃষ্টান্তরূপে প্রকটিত হইয়াছে, ইহা প্রণিধান করা আবশ্যক। টীকাকার শ্রীধর স্বামীও সেখানে মায়াবাদেরই ব্যাখ্যা ও তদনুসারেই দৃষ্টান্তব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরে একাদশ স্কন্ধেও অনেক স্থানে অদ্বৈতবাদের স্পষ্ট প্রকাশ আছে। উপসংহারে দ্বাদশ স্কন্ধের অনেক স্থানেও আমরা অদ্বৈত সিদ্ধান্তের স্পষ্ট প্রকাশ দেখিতে পাই[৪]। দ্বাদশ স্কন্ধের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে "প্রবিষ্টো ব্রহ্মনির্ব্বাণং," "ব্রহ্মভূতো

১। যদ্বা তস্যৈব পরমার্থসত্যত্বপ্রতিপাদনায় তদিতরস্য মিথ্যাত্বমুক্তং, যত্র মৃষৈবায়ং ত্রিসর্গো ন বস্তুতঃ সন্নিতি ইত্যাদি স্বামিটীকা।

২। "মুক্তির্হিত্বাহন্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ"। ২য় স্কন্ধ, ১০ম অঃ, ষষ্ঠ শ্লোক। "অন্যথারূপং" অবিদ্যয়াহধ্যস্তং কর্তৃত্বাদি "হিত্বা" "স্বরূপেণ" ব্রহ্মতয়া "ব্যবস্থিতি"র্মুক্তিঃ।—স্বামিটীকা।

৩। "তস্মাদিদং জগদশেষমসৎস্বরূপং স্বপ্নাভমস্তধিষণং পুরুদুঃখদুঃখং।
ত্বয্যেব নিত্যসুখবোধতনাবনন্তে মায়াত উদ্যদপি যৎ সদিবাবভাতি ॥"
"আত্মানমেবাত্মতয়াহবিজানতাং তেনৈব জাতং নিখিলং প্রপঞ্চিতং।
জ্ঞানেন ভূয়োঽপি চ তৎ প্রলীয়তে রজ্জ্বামহের্ভোগভবাভবৌ যথা ॥"—১০ম স্কন্ধ, ১৪শ অঃ, ২২।২৫।

নন্বজ্ঞানেন কথং ভবং তরন্তীতি, তস্যাজ্ঞানমূলত্বাদিত্যাহ "আত্মানমেবে"তি। "তেনৈব" অজ্ঞানেনৈব। 'প্রপঞ্চিতং' প্রপঞ্চঃ। "রজ্জ্বাং অহের্ভোগভবাভবৌ" সর্পশরীরস্যাধ্যাসাপবাদৌ যথেতি।—স্বামিটীকা।

৪। ঘটে ভিন্নে ঘটাকাশ আকাশঃ স্যাদ্‌যথা পুরা।
এবং দেহে মৃতে জীবো ব্রহ্ম সম্পদ্যতে পুনঃ ॥
মনঃ সৃজতি বৈ দেহান্ গুণান্ কর্ম্মাণি চাত্মনঃ।
তন্মনঃ সৃজতে মায়া ততো জীবস্য সংসৃতিঃ ॥ ইত্যাদি।

—শ্রীমদ্ভাগবত। ১২শ স্কন্ধ। ৫ম অঃ। ৫—৬।

মহাযোগী” এবং “ব্রহ্মভূতস্য রাজর্ষেঃ” এই সমস্ত বাক্যের দ্বারা মহারাজ পরীক্ষিতের শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের ফলে যে ব্রহ্মভাব কথিত হইয়াছে এবং সর্ব্বশেষে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শ্রীমদ্ভাগবতের বাচ্য ও প্রয়োজন বর্ণন করিতে “সর্ব্ববেদান্তসারং যৎ” ইত্যাদি যে শ্লোক[1] কথিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা আমরা শ্রীমদ্ভাগবতের উপসংহারেও অদ্বৈতবাদেরই স্পষ্ট প্রকাশ বুঝিতে পারি। তাহা হইলে আমরা ইহাও বলিতে পারি যে, শ্রীমদ্ভাগবতের উপক্রম ও উপসংহারের দ্বারা অদ্বৈত সিদ্ধান্তেই উহার তাৎপর্য্য বুঝা যায়। কিন্তু ভক্তিলিপ্সু অধিকারিবিশেষের জন্য ভক্তির মাহাত্ম্য খ্যাপন ও ভগবানের গুণ ও লীলাদি বর্ণন দ্বারা তাঁহাদিগের ভক্তিলাভের সাহায্য সম্পাদনের জন্যই শ্রীমদ্ভাগবতে বহু স্থানে দ্বৈতভাবে দ্বৈতসিদ্ধান্তানুসারে অনেক কথা বলা হইয়াছে। তদ্দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতে কোন স্থানে অদ্বৈত সিদ্ধান্ত কথিত হয় নাই, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের সমর্থিত অদ্বৈতবাদ শ্রীমদ্ভাগবতে নাই, ইহা বলা যাইতে পারে না। প্রাচীন প্রামাণিক টীকাকার পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামীও শ্রীমদ্ভাগবতের পূর্ব্বোক্ত সমস্ত স্থানেই অদ্বৈত মতেরই ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। অনেক ব্যাখ্যাকার নিজসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত রক্ষার জন্য নিজ মতে কষ্ট কল্পনা করিয়া অনেক শ্লোকের ব্যাখ্যা করিলেও মূল শ্লোকের পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা করিয়া সরলভাবে কিরূপ অর্থ বুঝা যায়, ইহা অপক্ষপাতে বিচার করাই কর্ত্তব্য। ফলকথা, শ্রীমদ্ভাগবতে যে, বহু স্থানে অদ্বৈতবাদের স্পষ্ট প্রকাশই আছে, ইহা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। এইরূপ যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার অধ্যাত্ম-প্রকরণেও অদ্বৈত মতানুসারেই সিদ্ধান্ত বর্ণিত হইয়াছে[2]। দক্ষ-সংহিতার শেষ ভাগে কোন কোন বচনের দ্বারা মহর্ষি দক্ষ যে অদ্বৈতিদিগেরই অবস্থার বর্ণন করিয়াছেন এবং অদ্বৈত পক্ষই তাঁহার নিজ পক্ষ বা নিজমত, ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়[3]। মহাভারতের অনেক স্থানেও অদ্বৈত সিদ্ধান্তের প্রকাশ আছে। অধ্যাত্মরামায়ণের উত্তরকাণ্ডের পঞ্চম অধ্যায়ে অদ্বৈতবাদের সমস্ত কথা এবং বিচার-প্রণালীও বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং অদ্বৈতবাদবিরোধী কোন কোন গ্রন্থকার যে, অদ্বৈতবাদকে সম্প্রদায়বিশেষের কল্পনামূলক একেবারে অশাস্ত্রীয় বলিয়াছেন, তাহা কোনরূপেই গ্রহণ করা যায় না। পূর্ব্বোক্ত স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্রের অদ্বৈত-

---

১। সর্ব্ববেদান্তসারং যদ্ব্রহ্মাত্মৈকত্বলক্ষণং।
বস্ত্বদ্বিতীয়ং তন্নিষ্ঠং কৈবল্যৈকপ্রয়োজনং॥—১২শ স্কন্ধ। ১৩শ অঃ। ১২।

২। আকাশমেকং হি যথা ঘটাদিষু পৃথগ্ভবেৎ।
তথাত্মৈকোপ্যনেকস্তু জলাধারেম্বিবাংশুমান্। ইত্যাদি।—যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, ৩য় অঃ; ১৪৪শ্লোক

৩। য আত্মব্যতিরেকেণ দ্বিতীয়ং নৈব পশ্যতি।
ব্রহ্মীভূয় স এবং হি দক্ষপক্ষ উদাহৃতঃ॥
দ্বৈতপক্ষে সমাস্থা যে অদ্বৈতে তু ব্যবস্থিতাঃ।
অদ্বৈতিনাং প্রবক্ষ্যামি যথাধর্ম্মঃ সুনিশ্চিতঃ॥
তত্রাত্মব্যতিরেকেণ দ্বিতীয়ং যদি পশ্যতি।
ততঃ শাস্ত্রাণ্যধীয়ন্তে শ্রূয়ন্তে গ্রন্থসঞ্চয়াঃ॥—দক্ষসংহিতা। ৭ম অঃ। ১১। ৫০। ৫১।

সিদ্ধান্ত-প্রতিপাদক সমস্ত বচনগুলিই অপ্রমাণ বা অন্যার্থক, ইহা শপথ করিয়া তাঁহারাও বলিতে পারেন না। পূর্ব্বোক্ত অদ্বৈতবাদের ক্রমশঃ সর্ব্বদেশেই প্রচার ও চর্চ্চা হইয়াছে। বিরোধী সম্প্রদায়ও উহার খণ্ডনের জন্য অদ্বৈতবাদের সবিশেষ চর্চ্চা করিয়া গিয়াছেন, ইহা তাঁহাদিগের গ্রন্থের দ্বারাই বুঝা যায়। বঙ্গদেশেও পূর্ব্বে অদ্বৈতবাদের বিশেষ চর্চ্চা হইয়াছে। বঙ্গের মহামনীষী কুল্লুক ভট্ট অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় বেদান্ত শাস্ত্রেরও উপাসনা করিয়া গিয়াছেন, ইহা তাঁহার "মনুসংহিতা"র টীকার প্রথমে নিজের উক্তির দ্বারাই জানা যায়। নব্যনৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি অদ্বৈতসিদ্ধান্ত-সমর্থক শ্রীহর্ষের "খণ্ডনখণ্ডখাদ্য" গ্রন্থের টীকা করিয়া বঙ্গে অদ্বৈতবাদ-চর্চ্চার বিশেষ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। শান্তিপুরের প্রভুপাদ অদ্বৈতাচার্য্য প্রথমে অদ্বৈত-মতানুসারেই শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা করিতেন, ইহারও প্রমাণ আছে। বৈদান্তিক বাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য শ্রীচৈতন্যদেবের নিকটে অদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, ইহা "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" প্রভৃতি গ্রন্থের দ্বারাই জানা যায়। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য তাঁহার "মলমাসতত্ত্বা"দি গ্রন্থে শারীরক ভাষ্যাদি বেদান্তগ্রন্থের সংবাদ দিয়া গিয়াছেন এবং "মলমাসতত্ত্বে" মুমুক্ষুকৃত্য প্রকরণে শঙ্করাচার্য্যের মতানুসারেই সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি "আহ্নিকতত্ত্বে"র প্রথমে প্রাতরুত্থানের পরে পাঠ্য শ্লোকের মধ্যে "অহং দেবো ন চান্যোঽস্মি ব্রহ্মৈবাহং ন শোকভাক্" ইত্যাদি অদ্বৈত-সিদ্ধান্তপ্রতিপাদক সুপ্রসিদ্ধ ঋষিবাক্যেরও উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার পরে ঐ গ্রন্থে গায়ত্র্যর্থ ব্যাখ্যাস্থলে তিনি শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় অদ্বৈত সিদ্ধান্তানুসারেই গায়ত্রীমন্ত্রের ব্যাখ্যা ও উপাসনার উপদেশ করিয়াছেন। তদ্দ্বারা তখন যে বঙ্গদেশেও অনেকে অদ্বৈত সিদ্ধান্তানুসারেই গায়ত্র্যর্থ চিন্তা করিয়া উপাসনা করিতেন, ইহাও আমরা বুঝিতে পারি এবং স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের গায়ত্র্যর্থ ব্যাখ্যায় অদ্বৈত সিদ্ধান্তের স্পষ্ট প্রকাশ দেখিয়া, তিনি ও তাঁহার গুরুসম্প্রদায় যে, অদ্বৈতমতনিষ্ঠ ছিলেন, ইহাও আমরা বুঝিতে পারি। তাঁহার পরেও বঙ্গের অনেক গ্রন্থে অদ্বৈতবাদের সংবাদ পাওয়া যায়। বঙ্গের ভক্তচূড়ামণি রামপ্রসাদের গানেও আমরা অদ্বৈতবাদের সংবাদ শুনিতে পাই। মূল কথা, অদ্বৈতবাদ যে কারণেই হউক, অন্যান্য সম্প্রদায়ের স্বীকৃত না হইলেও উহাও শাস্ত্রমূলক সুপ্রাচীন মত, ইহা স্বীকার্য্য।

কিন্তু ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে, পূর্ব্বোক্ত অদ্বৈতবাদের ন্যায় দ্বৈতবাদও শাস্ত্রমূলক অতি প্রাচীন মত। মহর্ষি গোতম ও কণাদ প্রভৃতি আচার্য্যগণ যে দ্বৈতবাদের উপদেষ্টা, উহা অশাস্ত্রীয় ও কোন নবীন মত হইতে পারে না। "দ্বৈতবাদ" বলিতে এখানে আমরা জীব ও ব্রহ্মের বাস্তব ভেদবাদ গ্রহণ করিতেছি। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত অদ্বৈতবাদ ভিন্ন সমস্ত বাদই (বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ প্রভৃতি) এখানে বুঝিতে হইবে। কারণ, ঐ সমস্ত বাদেই জীব ও ব্রহ্মের বাস্তব ভেদ স্বীকৃত। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যাতা বোধায়ন ও জামাতৃমুনি প্রভৃতি শ্রীভাষ্যকার রামানুজেরও বহু পূর্ব্ববর্ত্তী। দ্বৈতাদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যাতা সনক, সনন্দ প্রভৃতি, ইহাও পূর্ব্বে বলিয়াছি। পূর্ব্বোক্তরূপ দ্বৈতবাদের কয়েকটি মূল আমরা বুঝিতে পারি। প্রথম, জীবাত্মার অণুত্ব। শাস্ত্রে অনেক স্থানে জীবাত্মাকে অণু বলা হইয়াছে, উহার দ্বারা জীবাত্মা অণুপরিমাণ,

এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিলে, বিভু এক ব্রহ্মের সহিত অসংখ্য অণু জীবাত্মার বাস্তব ভেদ স্বীকার করিতেই হইবে। বৈষ্ণব দার্শনিকগণের নিজ মত সমর্থনে ইহাই মূল যুক্তি। তাঁহাদিগের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। দ্বিতীয়, শ্রুতি ও যুক্তির দ্বারা জীবাত্মা বিভু হইয়াও প্রতি শরীরে ভিন্ন, সুতরাং অসংখ্য, এই সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিলে ব্রহ্মের সহিত জীবাত্মার বাস্তব ভেদ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। মহর্ষি গোতম ও কণাদ প্রভৃতি দ্বৈতবাদের উপদেষ্টা আচার্য্যগণের ইহাই মূল যুক্তি। তাঁহাদিগের কথাও পূর্ব্বে বলিয়াছি। তৃতীয়, বেদাদি শাস্ত্রে বহু স্থানে জীব ও ব্রহ্মের যে, ভেদ কথিত হইয়াছে, উহা অবাস্তব হইতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে তত্ত্বজ্ঞানের জন্য জীবাত্মার কর্ম্মানুষ্ঠান ও উপাসনা প্রভৃতি চলিতেই পারে না। আমি ব্রহ্ম, বস্তুতঃ ব্রহ্ম হইতে আমার কোন ভেদ নাই, ইহা শ্রবণ করিলে এবং ঐ তত্ত্বের মননাদি করিতে আরম্ভ করিলে তখন উপাসনাদি কার্য্যে প্রবৃত্তিই ব্যাহত হইয়া যাইবে। সুতরাং জীব ও ব্রহ্মের বাস্তব ভেদই স্বীকার্য্য হইলে অভেদবোধক শাস্ত্রের অন্যরূপই তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। ইহাও সমস্ত দ্বৈতবাদিসম্প্রদায়ের একটি প্রধান মূল যুক্তি। পরন্তু বৈষ্ণব মহাপুরুষ মধ্বাচার্য্য জীব ও ঈশ্বরের সত্য ভেদের বোধক যে সমস্ত শ্রুতির উল্লেখ করিয়াছেন, ঐ সমস্ত শ্রুতি অন্য সম্প্রদায় প্রমাণরূপে গ্রহণ না করিলেও এবং অন্যত্র উহা পাওয়া না গেলেও মধ্বাচার্য্য যে, ঐ সমস্ত শ্রুতি রচনা করিয়াছিলেন, ইহা কখনই বলা যায় না। তিনি তাঁহার প্রচারিত দ্বৈতবাদের প্রাচীন গুরু-পরম্পরা হইতেই ঐ সমস্ত শ্রুতি লাভ করিয়াছিলেন, কালবিশেষে সেই সম্প্রদায়ে ঐ সমস্ত শ্রুতির পঠন পাঠনাও ছিল, ইহাই বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং তিনি অধিকারিবিশেষের জন্য দ্বৈতবাদের সমর্থন করিতে ঐ সমস্ত শ্রুতির উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার উল্লিখিত ঐ সমস্ত শ্রুতিও দ্বৈতবাদের মূল বলিয়া গ্রহণ করা যায়। পরন্তু পূর্ব্বোদ্ধৃত দক্ষ-সংহিতাবচনে "দ্বৈতপক্ষে সমাস্থা যে" এই বাক্যের দ্বারা অদ্বৈতবাদী মহর্ষি দক্ষও যে দ্বৈতপক্ষের এবং তাহাতে সম্যক্ আস্থাসম্পন্ন অধিকারিবিশেষের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। প্রথমে দ্বৈতপক্ষে সম্যক্ আস্থাসম্পন্ন হইয়াও পরে অনেকে অদ্বৈত সাধনার অধিকারী হইয়া থাকেন, ইহাও তাঁহার উক্ত বচনের দ্বারা বুঝা যায়। বস্তুতঃ প্রথমে দ্বৈত সিদ্ধান্ত আশ্রয় না করিলে কেহই অদ্বৈত সাধনার অধিকারী হইতে পারেন না। বেদান্তশাস্ত্র যেরূপ ব্যক্তিকে অদ্বৈত সাধনার অধিকারী বলিয়াছেন, সেইরূপ ব্যক্তি চিরদিনই দুর্লভ। বেদান্তদর্শনের "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই সূত্রে "অথ" শব্দের দ্বারা যেরূপ ব্যক্তির যে অবস্থায় যে সময়ে ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসার অধিকার সূচিত হইয়াছে এবং তদনুসারে বেদান্তসারের প্রারম্ভে সদানন্দ যোগীন্দ্র যেরূপ ব্যক্তিকে বেদান্তের অধিকারী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, এবং অন্যান্য অদ্বৈতাচার্য্যগণও যেরূপ অধিকারীকে বেদান্ত শ্রবণ করিতে বলিয়াছেন, তাহা দেখিলে সকলেই ইহা বুঝিতে পারিবেন। বেদান্তশাস্ত্রে উক্তরূপ অধিকারিনিরূপণের দ্বারা অনধিকারীদিগকে অদ্বৈতসাধনা হইতে নিবৃত্ত করাও উদ্দেশ্য বুঝা যায়। নচেৎ অনধিকারী ও অধিকারীর নিরূপণ ব্যর্থ হয়। ফল কথা, প্রথমতঃ সকলকেই দ্বৈতসিদ্ধান্ত আশ্রয় করিয়া কর্ম্মাদি দ্বারা চিত্তশুদ্ধি সম্পাদন করিতে হইবে।

তৎপূর্ব্বে তাহারই অদ্বৈত-সাধনায় অধিকার হইতেই পারে না। সুতরাং শাস্ত্রে দ্বৈতসিদ্ধান্তও আছে। দ্বৈতবাদ অশাস্ত্রীয় হইতে পারে না। পরন্তু যাঁহারা দ্বৈতসিদ্ধান্তেই দৃঢ়নিষ্ঠাসম্পন্ন সাধনশীল অধিকারী, অথবা যাঁহারা দ্বৈতবুদ্ধিমূলক ভক্তিকেই পরমপুরুষার্থ জানিয়া ভক্তিই চাহেন, কৈবল্যমুক্তি বা ব্রহ্মসাযুজ্য চাহেন না, পরন্তু উহা তাঁহারা অভীষ্ট লাভের অন্তরায় বুঝিয়া উহাতে সতত বিরক্ত, তাঁহাদিগের জন্য শাস্ত্রে যে, দ্বৈত-বাদেরও উপদেশ হইয়াছে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য; কারণ, সকল শাস্ত্রের কর্ত্তা বা মূলাধার পরমেশ্বর কোন অধিকারীকেই উপেক্ষা করিতে পারেন না, প্রকৃত ভক্তের প্রার্থনা অপূর্ণ রাখিতে পারেন না। তাই তাঁহারই ইচ্ছায় অধিকারিবিশেষের অভীষ্ট লাভের সহায়তার জন্য শ্রীসম্প্রদায়, ব্রহ্মসম্প্রদায়, রুদ্রসম্প্রদায় ও সনকসম্প্রদায়, এই চতুর্ব্বিধ বৈষ্ণবসম্প্রদায়েরও প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। পদ্মপুরাণে উক্ত চতুর্ব্বিধ সম্প্রদায়ের বর্ণন আছে; বেদান্তদর্শনের গোবিন্দ-ভাষ্যের টীকাকার প্রথমেই তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। উক্ত চতুর্ব্বিধ বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরাও তিনি সেখানে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা সকলেই মহাজন, সকলেই ভগবানের প্রিয় ভক্ত ও তত্ত্বজ্ঞ। তাঁহারা বিভিন্ন অধিকারিবিশেষের অধিকার ও রুচি বুঝিয়াই তাঁহাদিগের সাধনার জন্য তত্ত্বোপদেশ করিয়াছেন এবং সেই উপদিষ্ট তত্ত্বেই অধিকারিবিশেষের নিষ্ঠার সংরক্ষণ ও পরিবর্দ্ধনের জন্যই অন্য মতের খণ্ডনও করিয়াছেন। কিন্তু উহার দ্বারা তাঁহারা যে অন্যান্য শাস্ত্রসিদ্ধান্তকে একেবারেই অশাস্ত্রীয় মনে করিতেন, তাহা বলা যায় না। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দার্শনিকগণও নিজ সম্প্রদায়ের অধিকার ও রুচি অনুসারে অদ্বৈত সাধনাকে গ্রহণ না করিলেও এবং অদ্বৈত সিদ্ধান্তকে চরম সিদ্ধান্ত না বলিলেও অধিকারিবিশেষের পক্ষে অদ্বৈত সাধনা ও তাহার ফল ব্রহ্মসাযুজ্য-প্রাপ্তি যে শাস্ত্র-সম্মত, ইহা স্বীকার করিয়াছেন। তবে ভক্ত অধিকারী উহা চাহেন না, উহা পরমপুরুষার্থও নহে, ইহাই তাঁহাদিগের কথা। বস্তুতঃ শ্রীমদ্‌ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে ভক্তিযোগ বর্ণনায়[১] "নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচিৎ" ইত্যাদি ভগবদ্‌বাক্যের দ্বারা কেহ কেহ অর্থাৎ ভগবানের পদসেবাভিলাষী ভক্তগণ তাঁহার ঐকাত্ম্য চাহেন না, ইহাই প্রকটিত হওয়ায় কেহ কেহ যে, ভগবানের ঐকাত্ম্য ইচ্ছা করেন, সুতরাং তাঁহারা ঐ ঐকাত্ম্য বা ব্রহ্মসাযুজ্যই লাভ করেন, ইহাও শ্রীমদ্‌ভাগবতেরও সিদ্ধান্ত বুঝা যায়। অন্যথা উক্ত শ্লোকে "কেচিৎ" এই পদের প্রয়োগ করা হইয়াছে কেন? ইহা অবশ্য চিন্তা করিতে হইবে। পরন্তু শ্রীমদ্‌ভাগবতের সর্ব্বশেষে ভগবান্ বেদব্যাস স্বয়ংই যখন শ্রীমদ্‌ভাগবতকে "ব্রহ্মাত্মৈকত্বলক্ষণ" এবং "কৈবল্যৈকপ্রয়োজন" বলিয়া গিয়াছেন, তখন অধিকারি-বিশেষের যে, শ্রীমদ্‌ভাগবত-বর্ণিত অদ্বৈতজ্ঞান বা ঐকাত্ম্য দর্শনের ফলে কৈবল্য বা ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হয়, উহা অলীক নহে, ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দার্শনিকগণও অদ্বৈত জ্ঞান ও তাহার ফল "ঐকাত্ম্য"কে অশাস্ত্রীয় বলেন নাই। "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থে কৃষ্ণদাস কবিরাজ

১। নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচিন্মৎপাদসেবাভিরতা মদীহাঃ। যেঽন্যোন্যতো ভাগবতাঃ প্রসজ্য সভাজয়ন্তে মম পৌরুষাণি ॥—৩য় স্কন্ধ, ২৫শ অঃ, ৩৫ শ্লোক। একাত্মতাং সাযুজ্যমোক্ষং। মদর্থমীহা ক্রিয়া যেষাং। "প্রসজ্য" আসক্তিং কৃত্বা। "পৌরুষাণি" বীর্য্যাণি।—স্বামিটীকা।

মহাশয়ও লিখিয়াছেন, "নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সেই কেবল জ্যোতির্ম্ময় সাযুজ্যের অধিকারী তাহা পায় লয়॥" (আদি, ৫ম পঃ)। পূর্ব্বে লিখিয়াছেন, "সার্ষ্টি সারূপ্য আর সামীপ্য সালোক্য। সাযুজ্য না চায় ভক্ত যাতে ব্রহ্ম ঐক্য॥" (ঐ, ৩য় পঃ)। ফলকথা, অধিকারিবিশেষের জন্য শ্রীমদ্‌ভাগবতে যে অদ্বৈত জ্ঞানেরও উপদেশ হইয়াছে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। কারণ, শ্রীমদ্‌ভাগবতে যে, বহু স্থানে অদ্বৈত সিদ্ধান্তের স্পষ্ট বর্ণন আছে, ইহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ভক্তিপ্রধান শাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্তিলিপ্সু অধিকারীদিগের জন্যই বিশেষরূপে ভক্তির প্রাধান্য খ্যাপন ও ভক্তিযোগের বর্ণন করা হইয়াছে। এইরূপে অধিকারিভেদানুসারেই শাস্ত্রে নানা মত ও নানা সাধনার উপদেশ হইয়াছে। ইহা ভিন্ন শাস্ত্রোক্ত নানা মতের সমন্বয়ের আর কোন পন্থা নাই। অবশ্য ঐরূপ সমন্বয়-ব্যাখ্যার দ্বারাও যে সকল সম্প্রদায়ের বিবাদের শান্তি হয় না, ইহাও পূর্ব্বে বলিয়াছি। পরন্তু ইহাও অবশ্য বক্তব্য যে, দ্বৈতবাদী ও অদ্বৈতবাদী প্রভৃতি সমস্ত আস্তিক দার্শনিকগণই বেদ হইতেই নানা বিরুদ্ধ মতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভিন্ন ভিন্ন বেদবাক্যকেই ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তের প্রতিপাদকরূপে গ্রহণ করিয়া নানারূপে ঐ সিদ্ধান্তের সমর্থন করিয়াছেন। বেদকে অপেক্ষা না করিয়া কেবল যে নিজ বুদ্ধির দ্বারাই তাঁহারা কেহই ঐ সকল সিদ্ধান্তের উদ্ভাবন ও সমর্থন করেন নাই, ইহা স্বীকার্য্য। কারণ, ঐরূপ বিষয়ে কেবল কাহারও বুদ্ধিমাত্রকল্পিত সিদ্ধান্ত পূর্ব্বকালে এ দেশে আস্তিক-সমাজে পরিগৃহীত হইত না। চার্ব্বাক-সম্প্রদায় এই জন্য শেষে তাঁহাদিগের সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে কোন কোন স্থলে বেদের বাক্যবিশেষও প্রদর্শন করিয়াছেন। মহামনীষী ভর্ত্তৃহরিও নিজে কোন মতবিশেষের সমর্থন করিলেও অন্যান্য মতও যে, পূর্ব্বোক্তরূপে বেদের বাক্যবিশেষকে আশ্রয় করিয়া তদনুসারেই ব্যাখ্যাত ও সমর্থিত হইয়াছে, ইহা বলিয়াছেন[১]। ফল কথা, ন্যায় ও বৈশেষিক প্রভৃতি দর্শনে বেদার্থ বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত সমর্থিত না হওয়ায় বেদনিরপেক্ষ বুদ্ধিমাত্র-কল্পিত সিদ্ধান্তই সমর্থিত হইয়াছে, ইহা বলা যায় না। মননশাস্ত্র বলিয়াই ন্যায়াদি দর্শনে বেদার্থ বিচার হয় নাই, ইহা প্রণিধান করা আবশ্যক।

প্রকৃত কথা এই যে, সাধনা ব্যতীত বেদার্থ বোধ হইতে পারে না। যাঁহার পরমেশ্বর ও গুরুতে পরা ভক্তি জন্মিয়াছে, সেই মহাত্মা ব্যক্তির হৃদয়েই বেদপ্রতিপাদিত ব্রহ্ম প্রভৃতির তত্ত্ব প্রতিভাত হইয়া থাকে, ইহা ব্রহ্মতত্ত্বপ্রকাশক উপনিষৎ নিজেই বলিয়াছেন[২]। সুতরাং কুতর্ক বা জিগীষামূলক ব্যর্থ বিচার পরিত্যাগ করিয়া, পরমেশ্বরের তত্ত্ব বুঝিতে তাঁহারই শরণাপন্ন হইতে হইবে, তাঁহাতেই প্রপন্ন হইতে হইবে। তাঁহার কৃপা ব্যতীত তাঁহাকে বুঝা যায় না এবং তাঁহাকে লাভ করা যায় না,—"যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ।"—(কঠ) সুতরাং পূর্ব্বোক্ত সকল বাদের চরম "কৃপাবাদ"ই সার বুঝিয়া, তাঁহার কৃপালাভের অধিকারী হইতেই প্রযত্ন করা কর্ত্তব্য।

১। "তত্ত্বার্থবাদরূপাণি নিশ্চিতাঃ স্ববিকল্পজাঃ।
একত্বিনাং দ্বৈতিনাঞ্চ প্রবাদা বহুধা মতাঃ॥"—বাক্যপদীয়।৭।

২। "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥"—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের শেষ শ্লোক।

তিনি কৃপা করিয়া দর্শন দিলেই তাঁহাকে দেখা যাইবে, এবং তখনই কোন্ তত্ত্ব চরম জ্ঞেয় এবং সাধনার সর্ব্বশেষ ফল কি, ইত্যাদি বুঝা যাইবে। সুতরাং তখন আর কোন সংশয়ই থাকিবে না। তাই শ্রুতি নিজেই বলিয়াছেন,—"ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ ....তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥" (মুণ্ডক ২।২)। কিন্তু যে পরা ভক্তির ফলে ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝা যাইবে, যাহার ফলে তিনি কৃপা করিয়া দর্শন দিবেন, সেই ভক্তিও প্রথমে জ্ঞানসাপেক্ষ। কারণ, যিনি ভজনীয়, তাঁহার স্বরূপ ও গুণাদি বিষয়ে অজ্ঞ ব্যক্তির তাঁহার প্রতি ভক্তি জন্মিতে পারে না। তাই বেদে নানা স্থানে তাঁহার স্বরূপ ও গুণাদির বর্ণন হইয়াছে। বেদজ্ঞ ঋষিগণ সেই বেদার্থ স্মরণ করিয়া, নানাবিধ অধিকারীর জন্য নানাভাবে সেই ভজনীয় ভগবানের স্বরূপ ও গুণাদির বর্ণন করিয়াছেন। তাই মহর্ষি গোতমও সাধকের ঈশ্বর বিষয়ে ভক্তিলাভের পূর্ব্বাঙ্গ জ্ঞান-সম্পাদনের জন্য ন্যায়দর্শনে এই প্রকরণের দ্বারা উপদেশ করিয়া গিয়াছেন যে, ঈশ্বর জীবের কর্ম্মসাপেক্ষ জগৎকর্ত্তা এবং তিনিই জীবের সকল কর্ম্মফলের দাতা। তিনি কর্ম্মফল প্রদান না করিলে কর্ম্ম সফল হয় না। অসংখ্য জীবের অসংখ্য বিচিত্র কর্ম্মানুসারেই তিনি অনাদি কাল হইতে সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করিতেছেন, সুতরাং তিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকর্ত্তা। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও মহর্ষির এই প্রকরণের শেষ সূত্রের ভাষ্যে পূর্ব্বোক্ত উদ্দেশ্যেই "গুণবিশিষ্টমাত্মান্তরমীশ্বরঃ" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা ঈশ্বরের স্বরূপ ও গুণাদির বর্ণন করিয়াছেন। দ্বিতীয় আহ্নিকের প্রারম্ভে ও শেষে আবার জগৎকর্ত্তা পরমেশ্বরের কথা বলিব। "আদাবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে" ॥২১॥

কেবলেশ্বরকারণতা-নিরাকরণ-প্রকরণ
(বার্ত্তিকাদি মতে ঈশ্বরোপাদানতা-প্রকরণ)
সমাপ্ত ॥৫॥

———o———

ভাষ্য। অপর ইদানীমাহ—

অনুবাদ। ইদানীং অর্থাৎ জীবের কর্ম্মসাপেক্ষ ঈশ্বরের নিমিত্ত-কারণত্ব ব্যবস্থাপনের পরে অপর (নাস্তিকবিশেষ) বলিতেছেন,—

সূত্র। অনিমিত্ততো ভাবোৎপত্তিঃ কণ্টক-তৈক্ষ্ণ্যাদিদর্শনাৎ ॥২২॥৩৬৫॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) ভাবপদার্থের (শরীরাদির) উৎপত্তি নির্নিমিত্তক, যেহেতু কণ্টকের তীক্ষ্ণতা প্রভৃতি (নির্নিমিত্তক) দেখা যায়।

ভাষ্য। অনিমিত্তা শরীরাদ্যুৎপত্তিঃ, কস্মাৎ? কণ্টকতৈক্ষ্ণ্যাদিদর্শনাৎ, যথা কণ্টকস্য তৈক্ষ্ণ্যং, পর্ব্বতধাতূনাং চিত্রতা, গ্রাব্ণাং শ্লক্ষ্ণতা, নির্নিমিত্তঞ্চোপাদানবচ্চ দৃষ্টং, তথা শরীরাদিসর্গোঽপীতি।

অনুবাদ। শরীরাদির উৎপত্তি নির্নিমিত্তক অর্থাৎ উহার নিমিত্ত-কারণ নাই। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) যেহেতু কণ্টকের তীক্ষ্ণতা প্রভৃতি দেখা যায়। (তাৎপর্য্যার্থ) যেমন কণ্টকের তীক্ষ্ণতা, পার্ব্বত্য ধাতুসমূহের নানাবর্ণতা, প্রস্তরসমূহের কাঠিন্য (ইত্যাদি) নির্নিমিত্ত এবং উপাদানবিশিষ্ট অর্থাৎ নিমিত্তকারণশূন্য, কিন্তু উপাদানকারণবিশিষ্ট দেখা যায়, তদ্রূপ শরীরাদি সৃষ্টিও নির্নিমিত্ত, কিন্তু উপাদান-কারণবিশিষ্ট।

টিপ্পনী। মহর্ষি 'প্রেত্যভাবে'র পরীক্ষা করিতে তাঁহার মতে শরীরাদি ভাব কার্য্যের উপাদান কারণ প্রকাশ করিয়া পূর্ব্বপ্রকরণের দ্বারা জীবের কর্ম্মসাপেক্ষ ঈশ্বরকে নিমিত্ত-কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু কোন চার্ব্বাক-সম্প্রদায় শরীরাদি ভাব-কার্য্যের উপাদান-কারণ স্বীকার করিলেও নিমিত্ত-কারণ স্বীকার করেন নাই। সুতরাং তাঁহাদিগের মতে ঈশ্বর জীবের কর্ম্ম ও শরীরাদি সৃষ্টির কারণ না হওয়ায় উহাঁর অস্তিত্বে কোন প্রমাণ নাই। তাই মহর্ষি এখানে তাঁহার পূর্ব্বপ্রকরণোক্ত সিদ্ধান্তের বাধক নাস্তিক-সম্প্রদায়ের মতকে পূর্ব্বপক্ষরূপে প্রকাশ করিতে এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, শরীরাদি ভাব পদার্থের উৎপত্তি "অনিমিত্ত" অর্থাৎ নিমিত্ত-কারণশূন্য। সূত্রে "অনিমিত্ততঃ" এই স্থলে "অনিমিত্তা" এইরূপ প্রথমান্ত পদের উত্তর "তসিল" (তস্) প্রত্যয় বিহিত হইয়াছে। সুতরাং উহার দ্বারা অনিমিত্ত অর্থাৎ নিমিত্তকারণ-শূন্য, এইরূপ অর্থ বুঝা যায়। ভাষ্যকারও সূত্রোক্ত "অনিমিত্ততঃ" এই পদেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন "অনিমিত্তা"। শরীরাদি ভাবকার্য্যের উৎপত্তি নির্নিমিত্তক, ইহা বুঝিব কিরূপে, ঐ বিষয়ে প্রমাণ কি? তাই সূত্রে বলা হইয়াছে, "কণ্টকতৈক্ষ্ণ্যাদিদর্শনাৎ"। উদ্দ্যোতকর ইহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে,[১] যেমন কণ্টকের তীক্ষ্ণতা প্রভৃতি নিমিত্তকারণশূন্য এবং উপাদান-কারণবিশিষ্ট, তদ্রূপ শরীরাদি সৃষ্টিও নিমিত্তকারণশূন্য এবং উপাদানকারণবিশিষ্ট। উদ্দ্যোতকর শেষে এই সূত্রকে দৃষ্টান্তসূত্র বলিয়া পূর্ব্বোক্ত মতের সাধক অনুমান বলিয়াছেন যে, রচনাবিশেষ যে শরীরাদি, তাহা নির্নিমিত্তক অর্থাৎ নিমিত্তকারণশূন্য, যেহেতু উহাতে সংস্থান অর্থাৎ আকৃতিবিশেষ আছে, যেমন কণ্টকাদি। অর্থাৎ তাঁহার মতে এই সূত্রে কণ্টকাদিকেই দৃষ্টান্ত-রূপে প্রদর্শন করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ অনুমানই সূচিত হইয়াছে। তাৎপর্য্যটীকাকারও এখানে পূর্ব্বপক্ষবাদীর যুক্তির ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, আকৃতিবিশেষবিশিষ্ট কণ্টকাদির নিমিত্ত-কারণের দর্শন না হওয়ায় কণ্টকাদির নিমিত্ত-কারণ নাই, ইহা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে ঐ কণ্টকাদি দৃষ্টান্তের দ্বারা আকৃতিবিশেষবিশিষ্ট শরীরাদিরও নিমিত্ত-কারণ নাই, ইহা অনুমানসিদ্ধ হয়। উদ্দ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশ্র এখানে কণ্টকাদিকেই সূত্রোক্ত দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু সূত্র ও ভাষ্যের দ্বারা কণ্টকের তীক্ষ্ণতা প্রভৃতিই এখানে দৃষ্টান্ত বুঝা যায়। সে যাহা হউক,

---

১। যথা কণ্টকতৈক্ষ্ণ্যাদি নির্নিমিত্তঞ্চ, উপাদানবচ্চ, তথা শরীরাদিসর্গোঽপি। তদিদং দৃষ্টান্তসূত্রং। কঃ পুনরত্র ন্যায়ঃ?—অনিমিত্তা রচনাবিশেষাঃ শরীরাদয়ঃ সংস্থানবত্ত্বাৎ, কণ্টকাদিবদিতি।—ন্যায়বার্ত্তিক।

পূর্ব্বোক্ত মতবাদীদিগের কথা এই যে, কণ্টকের তীক্ষ্ণতা কণ্টকের সংস্থান অর্থাৎ আকৃতি-বিশেষ। কণ্টকের অবয়বের পরস্পর বিলক্ষণ-সংযোগই উহার আকৃতি। ঐ আকৃতির উপাদান-কারণ কণ্টকের অবয়ব প্রত্যক্ষসিদ্ধ এবং ঐ সমস্ত অবয়বই কণ্টকের উপাদান-কারণ। সুতরাং কণ্টক বা উহার তীক্ষ্ণতার উপাদান-কারণ নাই, ইহা বলা যায় না, প্রত্যক্ষসিদ্ধ কারণের অপলাপ করা যায় না। কিন্তু কণ্টকের এবং উহার তীক্ষ্ণতা প্রভৃতির কর্ত্তা প্রত্যক্ষসিদ্ধ নহে, অন্য কোন নিমিত্ত-কারণেরও প্রত্যক্ষ হয় না। সুতরাং উহার নিমিত্ত-কারণ নাই, ইহাই স্বীকার্য্য। এইরূপ পার্ব্বত্য ধাতুসমূহের নানাবর্ণতা ও প্রস্তরের কাঠিন্য প্রভৃতি বহু পদার্থ আছে, যাহার কর্ত্তা প্রভৃতি অন্য কোন কারণের প্রত্যক্ষ না হওয়ায়, ঐ সমস্ত পদার্থ নিমিত্তকারণশূন্য, ইহাই স্বীকার্য্য। এইরূপ শরীরাদি ভাবকার্য্যের উপাদান-কারণ হস্তপদাদি অবয়ব প্রত্যক্ষ-সিদ্ধ বলিয়া উহা স্বীকার্য্য। কিন্তু শরীরাদি ভাবকার্য্যের কর্ত্তা প্রভৃতি আর কোন কারণ বিষয়ে প্রমাণ নাই। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত কণ্টকাদি দৃষ্টান্তের দ্বারা শরীরাদি সৃষ্টি নির্নিমিত্তক অর্থাৎ নিমিত্ত-কারণশূন্য, কিন্তু উপাদানকারণবিশিষ্ট, ইহাই সিদ্ধ হয়। এখানে পূর্ব্বপ্রচলিত সমস্ত ভাষ্য-পুস্তকেই "নির্নিমিত্তকোপাদানং দৃষ্টং" এইরূপ ভাষ্যপাঠ দেখা যায়। কিন্তু উদ্দ্যোতকর লিখিয়াছেন, "নির্নিমিত্তকঞ্চ উপাদানবচ্চ।" উদ্দ্যোতকরের ঐ কথার দ্বারা ভাষ্যকারের "নির্নিমিত্তকোপাদানবচ্চ দৃষ্টং" এইরূপ পাঠই প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করা যায়। কোন ভাষ্যপুস্তকেও ঐরূপ ভাষ্যপাঠই গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং ঐরূপ ভাষ্যপাঠই প্রকৃত বলিয়া গৃহীত হইল। বস্তুতঃ ভাবকার্য্য নিমিত্তকারণশূন্য, কিন্তু উপাদান-কারণ-বিশিষ্ট, এইরূপ মতই এই সূত্রে পূর্ব্বপক্ষরূপে সূচিত হইলে পূর্ব্বোক্তরূপ ভাষ্যপাঠই গ্রহণ করিতে হইবে। প্রচলিত পাঠ বিশুদ্ধ বলিয়া বুঝা যায় না। উদ্দ্যোতকরও পূর্ব্বোক্তরূপ মতই এখানে পূর্ব্বপক্ষরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "তাৎপর্য্য-পরিশুদ্ধি"কার উদয়নাচার্য্যের কথার দ্বারাও পূর্ব্বোক্ত মতবিশেষই এখানে পূর্ব্বপক্ষ বুঝা যায়। ফলকথা, ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন প্রভৃতি প্রাচীনগণের মতে এখানে ভাবকার্য্যের উপাদান কারণ আছে, কিন্তু নিমিত্তকারণ নাই, ইহাই পূর্ব্বপক্ষ। কিন্তু তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধির টীকাকার বর্দ্ধমান উপাধ্যায় প্রভৃতি নব্য নৈয়ায়িকগণের মতে ভাবকার্য্যের কোন নিয়ত কারণই নাই, ইহাই এখানে পূর্ব্বপক্ষ। উদ্দ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশ্র যেমন এই প্রকরণকে "আকস্মিকত্ব-প্রকরণ" বলিয়াছেন, তদ্রূপ নব্য নৈয়ায়িক বৃত্তিকার বিশ্বনাথও তাহাই বলিয়াছেন। এই প্রকরণের ব্যাখ্যার পরে আকস্মিকত্ববাদের স্বরূপ বিষয়ে আলোচনা দ্রষ্টব্য ॥২২॥

সূত্র। অনিমিত্ত-নিমিত্তত্বান্নানিমিত্ততঃ ॥২৩॥৩৬৬॥

অনুবাদ। (উত্তর) "অনিমিত্তে"র নিমিত্ততাবশতঃ অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষবাদী "অনিমিত্ততঃ" এই বাক্যের দ্বারা অনিমিত্তকেই ভাবকার্য্যের নিমিত্ত বলায় "অনিমিত্ততঃ" অর্থাৎ ভাবকার্য্যের উৎপত্তির নিমিত্ত নাই, ইহা আর বলিতে পারেন না।

ভাষ্য। অনিমিত্ততো ভাবোৎপত্তিরিত্যুচ্যতে, যতশ্চোৎপদ্যতে তন্নিমিত্তং, অনিমিত্তস্য নিমিত্তত্বান্নানিমিত্তা ভাবোৎপত্তিরিতি।

অনুবাদ। "অনিমিত্ত" হইতে ভাব কার্য্যের উৎপত্তি, ইহা উক্ত হইতেছে, কিন্তু যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা নিমিত্ত। "অনিমিত্তে"র নিমিত্তভাবশতঃ ভাবকার্য্যের উৎপত্তি নির্নিমিত্তক নহে।

টিপ্পনী। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বসূত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষের উত্তর বলিয়া, পরবর্ত্তী সূত্রের দ্বারা ঐ উত্তরের খণ্ডন করায়, এই সূত্রোক্ত উত্তর, তাঁহার নিজের উত্তর নহে, উহা অপরের উত্তর, ইহা বুঝা যায়। তাই বার্ত্তিককার, তাৎপর্য্যটীকাকার ও বৃত্তিকার প্রভৃতি এই সূত্রোক্ত উত্তরকে অপরের উত্তর বলিয়াই স্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন। মহর্ষি নিজে যে এখানে কোন সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের উত্তর বলেন নাই, ইহা পরবর্ত্তী সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকারের কথার দ্বারাও বুঝা যায়। পরে তাহা ব্যক্ত হইবে। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে অপরের কথা বলিয়াছেন যে, "অনিমিত্ততো ভাবোৎপত্তিঃ" এই বাক্যের দ্বারা "অনিমিত্ত"হইতে ভাবকার্য্যের উৎপত্তি কথিত হওয়ায় "অনিমিত্ত"ই ভাবকার্য্যের নিমিত্ত, ইহা বুঝা যায়। কারণ, "অনিমিত্ততঃ" এই পদে পঞ্চমী বিভক্তির দ্বারা হেতুতা অর্থই বুঝা যায়। তাহা হইলে যখন "অনিমিত্ত"ই ভাবকার্য্যের নিমিত্ত, ইহা বলা হয়, তখন ভাবকার্য্যের উৎপত্তি নির্নিমিত্তক অর্থাৎ উহার নিমিত্ত-কারণ নাই, ইহা আর বলা যায় না। ২৩॥

সূত্র। নিমিত্তানিমিত্তয়োরর্থান্তরভাবাদপ্রতিষেধঃ॥ ॥২৪॥৩৬৭॥

অনুবাদ। (উত্তর) নিমিত্ত ও অনিমিত্তের অর্থান্তরভাব (ভেদ) বশতঃ প্রতিষেধ অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্রোক্ত উত্তর হয় না।

ভাষ্য। অন্যদ্ধি নিমিত্তমন্যচ্চ নিমিত্তপ্রত্যাখ্যানং, নচ প্রত্যাখ্যানমেব প্রত্যাখ্যেয়ং, যথানুদকঃ কমণ্ডলুরিতি নোদকপ্রতিষেধ উদকং ভবতীতি।

স খল্বয়ং বাদোহকর্ম্মনিমিত্তঃ শরীরাদিসর্গ ইত্যেতস্মান্ন ভিদ্যতে, অভেদাত্তৎপ্রতিষেধেনৈব প্রতিষিদ্ধো বেদিতব্য ইতি।

অনুবাদ। যেহেতু নিমিত্ত অন্য, এবং নিমিত্তের প্রত্যাখ্যান (অভাব) অন্য, কিন্তু প্রত্যাখ্যানই প্রত্যাখ্যেয় হয় না, অর্থাৎ নিমিত্তের অভাব (প্রত্যাখ্যান) বলিলে

উহা নিমিত্ত (প্রত্যাখ্যেয়) হয় না। যেমন "কমণ্ডলু অনুদক" (জলশূন্য), এই বাক্যের দ্বারা জলের প্রতিষেধ করিলে "জল আছে" ইহা বলা হয় না।

সেই এই বাদ অর্থাৎ "ভাব পদার্থের উৎপত্তি নির্নিমিত্তক" এই পূর্ব্বপক্ষ, "শরীরাদি সৃষ্টি কর্ম্মনিমিত্তক নহে" এই পূর্ব্বপক্ষ হইতে ভিন্ন নহে, অভেদবশতঃ সেই পূর্ব্বপক্ষের প্রতিষেধের দ্বারাই প্রতিষিদ্ধ জানিবে। [অর্থাৎ তৃতীয়াধ্যায়ের শেষে "শরীরাদি সৃষ্টি কর্ম্মনিমিত্তক নহে" এই পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডনের দ্বারাই "ভাব কার্য্যের উৎপত্তি নির্নিমিত্তক", এই পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডিত হওয়ায় মহর্ষি এখানে আর পৃথক্ সূত্রের দ্বারা এই পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন করেন নাই।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ব্বসূত্রোক্ত উত্তরের খণ্ডন করিতে এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, নিমিত্ত ও অনিমিত্ত অর্থান্তর, অর্থাৎ ভিন্ন পদার্থ। সুতরাং পূর্ব্বসূত্রোক্ত প্রতিষেধ হয় না। ভাষ্যকার মহর্ষির তাৎপর্য্য বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, নিমিত্ত ও নিমিত্তের প্রত্যাখ্যান ভিন্ন পদার্থ। প্রত্যাখ্যানই প্রত্যাখ্যেয় হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, "অনিমিত্ততো ভাবোৎপত্তিঃ" এই বাক্যের দ্বারা ভাবকার্য্যের উৎপত্তির নিমিত্তের প্রত্যাখ্যান বলা হইয়াছে। নিমিত্তের প্রত্যাখ্যান বলিতে নিমিত্তের অভাব। নিমিত্ত ঐ অভাবের প্রতিযোগী বলিয়া উহাকে প্রত্যাখ্যেয় বলা হইয়াছে। পূর্ব্বপক্ষবাদী নিমিত্তকে প্রত্যাখ্যান অর্থাৎ অস্বীকার করায় নিমিত্ত তাঁহার প্রত্যাখ্যেয়, ইহাও বলা যায়। কিন্তু যাহা নিমিত্তের অভাব (প্রত্যাখ্যান), তাহা নিমিত্ত (প্রত্যাখ্যেয়) হইতে পারে না। কারণ, নিমিত্ত ও নিমিত্তের অভাব ভিন্ন পদার্থ। নিমিত্তের অভাব বলিলে নিমিত্ত বলা হয় না। যেমন "কমণ্ডলু জলশূন্য" এই কথা বলিলে কমণ্ডলুতে জল নাই, ইহাই বুঝা যায়; কমণ্ডলুতে জল আছে, ইহা কখনই বুঝা যায় না। তদ্রূপ ভাবকার্য্যের নিমিত্ত নাই বলিলে নিমিত্ত আছে, ইহা কখনই বুঝা যায় না। ফলকথা, "অনিমিত্ততো ভাবোৎপত্তিঃ" এই বাক্যে "অনিমিত্ততঃ" এই পদে পঞ্চমী বিভক্তি প্রযুক্ত হয় নাই; প্রথমা বিভক্তিই প্রযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং উহার দ্বারা ভাবকার্য্যের উৎপত্তি নির্নিমিত্তক অর্থাৎ উহার নিমিত্তের অভাবই কথিত হইয়াছে। "অনিমিত্ত" অর্থাৎ নিমিত্তাভাবই ভাবকার্য্যের নিমিত্ত, ইহা কথিত হয় নাই। নিমিত্তাভাব ও নিমিত্ত, পরস্পর বিরোধী ভিন্ন পদার্থ। সুতরাং নিমিত্তাভাব বলিলে নিমিত্ত আছে, ইহাও বুঝা যায় না; কিন্তু নিমিত্ত নাই, ইহাই বুঝা যায়। সুতরাং নিমিত্তাভাবই ভাবকার্য্যের নিমিত্ত, ইহাও বুঝা যায় না। কারণ, ভাবকার্য্যের যে কোন নিমিত্ত কারণ স্বীকার করিলে "অনিমিত্ততঃ" এই বাক্যের দ্বারা "নিমিত্ত নাই" এইরূপে সামান্যতঃ নিমিত্তের নিষেধ উপপন্ন হয় না। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথা না বুঝিয়াই অপর সম্প্রদায় পূর্ব্বোক্তরূপ উত্তর বলিয়াছেন। তাঁহাদিগের ঐ প্রতিষেধ বা উত্তর ভ্রান্তিমূলক।

তবে ঐ পূর্ব্বপক্ষের প্রকৃত উত্তর কি? সূত্রকার মহর্ষি এখানে নিজে কোন সূত্রের দ্বারা ঐ পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন করেন নাই কেন? এইরূপ প্রশ্ন অবশ্যই হইবে। তাই ভাষ্যকার শেষে

বলিয়াছেন যে, এই পূর্ব্বপক্ষ এবং তৃতীয়াধ্যায়ের শেষে মহর্ষির খণ্ডিত "শরীরাদি-সৃষ্টি জীবের কর্ম্মনিমিত্তক নহে" এই পূর্ব্বপক্ষ, ফলতঃ অভিন্ন। সুতরাং তৃতীয়াধ্যায়ে সেই পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডনের দ্বারাই এই পূর্ব্বপক্ষ পূর্ব্বেই খণ্ডিত হওয়ায় মহর্ষি এখানে আর পৃথক্ সূত্রের দ্বারা উক্ত পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন করেন নাই। তাৎপর্য্য এই যে, মহর্ষি তৃতীয়াধ্যায়ের শেষ প্রকরণে নানা যুক্তির দ্বারা জীবের শরীরাদি সৃষ্টি যে, জীবের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল—ধর্ম্মাধর্ম্মনিমিত্তক, ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সুতরাং জীবের শরীরাদি সৃষ্টিতে ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট নিমিত্ত-কারণরূপে পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন হওয়ায় ভাবকার্য্যের উৎপত্তিতে কোন নিমিত্ত-কারণ নাই, এই পূর্ব্বপক্ষ পূর্ব্বেই খণ্ডিত হইয়াছে। পরন্তু পূর্ব্বপ্রকরণে জীবের কর্ম্মফল অদৃষ্টের অধিষ্ঠাতা ঈশ্বরেরও নিমিত্তকারণত্ব সমর্থন করিয়া, প্রসঙ্গতঃ আবশ্যক বোধে শেষে পূর্ব্বপক্ষরূপে নাস্তিক মতবিশেষও প্রকাশ করিয়াছেন এবং অন্য সম্প্রদায় ঐ পূর্ব্বপক্ষের যে অসদুত্তর বলিয়াছেন, তাহাও প্রকাশ করিয়াছেন। মহর্ষির নিজের যাহা উত্তর, তাহা পূর্ব্বেই প্রকটিত হওয়ায় এখানে আর তাহার পুনরুক্তি করা তিনি আবশ্যক মনে করেন নাই। এখানে তাঁহার উত্তর বুঝিতে হইবে যে, শরীরাদি-সৃষ্টিতে জীবের পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট নিমিত্ত-কারণ, ইহা পূর্ব্বে নানা যুক্তির দ্বারা সমর্থন করা হইয়াছে, এবং ঐ অদৃষ্টরূপ নিমিত্ত-কারণ স্বীকার্য্য হইলে, উহার অধিষ্ঠাতা বা ফলদাতা ঈশ্বরও নিমিত্ত-কারণ বলিয়া স্বীকার্য্য, ইহাও পূর্ব্বপ্রকরণে বলা হইয়াছে। অতএব ভাব-কার্য্যের উৎপত্তির উপাদান-কারণ থাকিলেও কোন নিমিত্ত-কারণ নাই, এই মত কোনরূপেই উপপন্ন হয় না, উহা পূর্ব্বেই নিরস্ত হইয়াছে।

উদ্দ্যোতকর এই প্রকরণের ব্যাখ্যা করিয়া শেষে নিজে পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, সমস্ত কার্য্যই নির্নিমিত্তক অর্থাৎ নিমিত্ত-কারণশূন্য, ইহা অনুমান প্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন করিতে গেলে যাঁহাকে প্রতিপাদন করিতে হইবে, তিনি প্রতিপাদ্য পুরুষ, এবং যিনি প্রতিপাদন করিবেন, তিনি প্রতিপাদক পুরুষ, ইহা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে ঐ প্রতিপাদন-ক্রিয়ার কর্ত্তা ও কর্ম্মকারক পুরুষদ্বয় যে, ঐ প্রতিপাদন-ক্রিয়ার নিমিত্ত, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। কারণ, ক্রিয়ার নিমিত্ত না হইলে তাহা কারক হইতে পারে না। সুতরাং কোন কার্য্যেরই নিমিত্ত নাই বলিয়া আবার উহা প্রতিপাদন করিতে গেলে, ঐ প্রতিপাদন ক্রিয়ার নিমিত্ত স্বীকার করিতে বাধ্য হওয়ায় ঐ প্রতিজ্ঞা ব্যাহত হইবে। অথবা ঐ মত প্রতিপাদন না করিয়া নীরবই থাকিতে হইবে। পরন্তু পূর্ব্বপক্ষবাদী "অনিমিত্ততো ভাবোৎপত্তিঃ" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা তাঁহার মত প্রতিপাদন করায় ঐ বাক্যকেও তিনি তাঁহার ঐ মত-প্রতিপাদনের নিমিত্ত বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য। নচেৎ তিনি ঐ বাক্য প্রয়োগ করেন কেন? পরন্তু তিনি "সনিমিত্তা ভাবোৎপত্তিঃ" এই বাক্য এবং "অনিমিত্ততো ভাবোৎপত্তিঃ" এই বাক্যের অর্থ-ভেদ স্বীকার না করিয়া পারেন না। সুতরাং তিনি যে বাক্যবিশেষের প্রয়োগ করিয়াছেন, উহাই যে তাঁহার মত-প্রতিপাদনে নিমিত্ত, ইহা তাঁহাকে স্বীকার করিতেই হইবে। নচেৎ তিনি "সনিমিত্তা ভাবোৎপত্তিঃ" এইরূপ বাক্য কেন বলেন না? পরন্তু কার্য্য মাত্রেরই নিমিত্ত নাই বলিলে সর্ব্বলোক-

ব্যবহারের উচ্ছেদ হয়। কেবল শরীরাদিই নির্নিমিত্তক, এইরূপ অনুমান করিলেও কণ্টকাদি দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। কারণ, কণ্টকাদি যে নির্নিমিত্তক, ইহা উভয়বাদি-সিদ্ধ নহে। ঘটপটাদি কার্য্যের কর্ত্তা প্রভৃতি নিমিত্ত-কারণ প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং ঘটপটাদি কার্য্যকে সনিমিত্তক বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। ঐ ঘটপটাদি দৃষ্টান্তে কণ্টকাদিরও সনিমিত্তকত্ব অনুমানসিদ্ধ হওয়ায় কণ্টকাদিরও নির্নিমিত্তকত্ব নাই। কণ্টকাদিরও অবশ্য নিমিত্ত-কারণ আছে। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষবাদীর ঐ অনুমানে কণ্টকাদি দৃষ্টান্তও হইতে পারে না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, উদ্দ্যোতকর ও বাচস্পতি মিশ্রের ন্যায় বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্য নৈয়ায়িকগণও এই প্রকরণকে "আকস্মিকত্ব প্রকরণ" বলিয়াছেন। বর্দ্ধমান উপাধ্যায় প্রভৃতি নব্য নৈয়ায়িকগণের মতে ভাব কার্য্যের কোনরূপ নিয়ত কারণ নাই, ইহাই এই প্রকরণের প্রথম সূত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষ। বস্তুতঃ কোন নিয়ত কারণকে অপেক্ষা না করিয়া অকস্মাৎ কার্য্য জন্মে, জগতের সৃষ্টি ও প্রলয় অকস্মাৎ হইয়া থাকে, এই মতই "আকস্মিকত্ববাদ" নামে প্রসিদ্ধ আছে। এই "আকস্মিকত্ববাদে"রই অপর নাম "যদৃচ্ছাবাদ"। এই "যদৃচ্ছাবাদ"ও অতি প্রাচীন মত। অনাদি কাল হইতেই আস্তিক মতের সহিত নানাবিধ নাস্তিক মতেরও প্রকাশ ও সমর্থন হইয়াছে। তাই উপনিষদেও আমরা সমস্ত নাস্তিক মতেরও পূর্ব্বপক্ষরূপে সূচনা পাই। উপনিষদেও "কালবাদ", "স্বভাববাদ" ও "নিয়তিবাদে"র সহিত পূর্ব্বোক্ত "যদৃচ্ছাবাদে"রও উল্লেখ দেখিতে পাই[১]। সেখানে ভাষ্যকার ও "দীপিকা"কারের ব্যাখ্যার দ্বারাও "যদৃচ্ছাবাদ" যে "আকস্মিকত্ব-বাদে"রই নামান্তর, ইহা আমরা বুঝিতে পারি। কিন্তু ঐ কালবাদ ও স্বভাববাদ প্রভৃতির স্বরূপ ব্যাখ্যায় মতভেদও দেখা যায়। সুশ্রুতসংহিতাতেও স্বভাববাদ, ঈশ্বরবাদ, কালবাদ, যদৃচ্ছাবাদ, নিয়তিবাদ ও পরিণামবাদের উল্লেখ দেখা যায়[২]। কিন্তু সুশ্রুতসংহিতার প্রাচীন টীকাকার ডহ্লণাচার্য্য ঐ যদৃচ্ছাবাদের বিপরীত ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার

১। "কালঃ স্বভাবো নিয়তির্যদৃচ্ছা"।—শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ।১।২।

ইদানীং কালাদীনি ব্রহ্মকারণবাদপ্রতিপক্ষভূতানি বিচারবিষয়ত্বেন দর্শয়তি 'কালঃ স্বভাব" ইতি। "যোনি"শব্দঃ সম্বধ্যতে। কালো যোনিঃ কারণং স্যাৎ। কালো নাম সর্ব্বভূতানাং বিপরিণামহেতুঃ। স্বভাবো নাম পদার্থানাং প্রতিনিয়তা শক্তিঃ, অগ্নেরৌষ্ণ্যমিব। নিয়তিরবিষমপুণ্যাপাপলক্ষণং কর্ম্ম। যদৃচ্ছা আকস্মিকী প্রাপ্তিঃ।—শাঙ্কর ভাষ্য। কালো নিমেষাদিপরার্দ্ধান্তপ্রত্যয়োৎপাদকো ভূতো বর্ত্তমান আগামীতি ব্যবহ্রিয়মানো জনৈঃ। "স্বভাবঃ" স্বস্য তত্তৎপদার্থস্য ভাবোঽসাধারণকার্য্যকারিত্বং, যথাঽগ্নের্দ্দাহাদিকারিত্বমপাং নিম্নদেশগমনাদি। "নিয়তিঃ" সর্ব্বপদার্থেষ্বনুগতাকারবন্নিয়মনশক্তিঃ। যথা ঋতুষ্বেব যোষিতাং গর্ভধারণং, ইন্দূদয়ে সমুদ্রবৃদ্ধিরিত্যাদি। "যদৃচ্ছা" কাকতালীয়ন্যায়েন সংবাদকারিণী কাচন শক্তিঃ। যথা ঋতুমতীনাং যোষিতাং কাসাঞ্চিৎ কস্মিংশ্চিদৃতৌ গর্ভধারণ-মিত্যাদি।—শঙ্করানন্দকৃত দীপিকা।

২। বৈদ্যকেতু—"স্বভাবমীশ্বরং কালং যদৃচ্ছাং নিয়তিস্তথা।

পরিণামঞ্চ মন্যন্তে প্রকৃতিং পৃথুদর্শিনঃ"॥—শারীরস্থান।১।১১।

যো যতো ভবতি তৎ তন্নিমিত্তমিতি যাদৃচ্ছিকাঃ। যথা তৃণারণিনিমিত্তো বহ্নিরিতি।—ডহ্লণাচার্য্যটীকা।

ব্যাখ্যানুসারে যদৃচ্ছাবাদীরাও কার্য্যের নিয়ত নিমিত্ত স্বীকার করেন বুঝা যায়। সুতরাং ঐ ব্যাখ্যা আমরা গ্রহণ করিতে পারি না। পরন্তু তিনি পূর্ব্বোক্ত স্বভাববাদ প্রভৃতি সমস্ত মতকেই আয়ুর্ব্বেদের মত বলিয়া, সুশ্রুতসংহিতা হইতেই ঐ সমস্ত মতেরই উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং শেষে তিনি তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী টীকাকার জেজ্জট ও গয়দাসের ব্যাখ্যারও উল্লেখ করিয়াছেন। জেজ্জটের মতে ঈশ্বর ভিন্ন স্বভাব, কাল, যদৃচ্ছা ও নিয়তি, এই সমস্তই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিরই পরিণামবিশেষ। সুতরাং ঐ সমস্তই মূল প্রকৃতি হইতে পরমার্থতঃ ভিন্ন পদার্থ না হওয়ায় আয়ুর্ব্বেদের মতেও ঐ স্বভাব প্রভৃতি জগতের উপাদান-কারণ, ইহা বলা যাইতে পারে। কারণ, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিই জগতের মূল কারণ, ইহাই আয়ুর্ব্বেদের মত। গয়দাসের মতে সুশ্রুতোক্ত স্বভাব, ঈশ্বর ও কাল প্রভৃতি সমস্তই জগতের কারণ। তন্মধ্যে প্রকৃতির পরিণাম উপাদান-কারণ। স্বভাব প্রভৃতি প্রথমোক্ত পাঁচটি নিমিত্ত-কারণ। ফলকথা, "সুশ্রুত-সংহিতা"র প্রাচীন টীকাকারগণের মতে সুশ্রুতোক্ত "স্বভাবমীশ্বরং কালং" ইত্যাদি শ্লোক-বর্ণিত মত আয়ুর্ব্বেদেরই মত, ইহা বুঝা যায়। উক্ত শ্লোকের পূর্ব্বোক্ত "বৈদ্যকে তু" এই বাক্যের দ্বারাও সরল ভাবে উহাই বুঝা যায়। কিন্তু কোন আধুনিক টীকাকার প্রাচীন ব্যাখ্যা পরিত্যাগ করিয়া উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, "পৃথুদর্শী"রা অর্থাৎ স্থূলদর্শীরা কেহ স্বভাব, কেহ ঈশ্বর, কেহ কাল, কেহ যদৃচ্ছা, কেহ নিয়তি ও কেহ পরিণামকে জগতের "প্রকৃতি" অর্থাৎ মূল কারণ মনে করেন। অর্থাৎ উহার কোন মতই আয়ুর্ব্বেদের মত নহে। আয়ুর্ব্বেদের মত পরবর্ত্তী শ্লোকে কথিত হইয়াছে। অবশ্য "স্বভাববাদ" প্রভৃতির প্রাচীন ব্যাখ্যানুসারে "সুশ্রুতসংহিতা"র পূর্ব্বোক্ত "স্বভাবমীশ্বরং কালং" ইত্যাদি শ্লোকের নবীন ব্যাখ্যা সুসংগত হইতে পারে। কিন্তু ঐ শ্লোকের পূর্ব্বে "বৈদ্যকে তু" এইরূপ বাক্য কেন প্রযুক্ত হইয়াছে? উহার পরবর্ত্তী শ্লোকে আয়ুর্ব্বেদের মত কথিত হইলে তৎপূর্ব্বেই "বৈদ্যকে তু" এই বাক্য কেন প্রযুক্ত হয় নাই? ইহা প্রণিধান করা আবশ্যক। এবং পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে "পরিণামঞ্চ" এই বাক্যের দ্বারা কিসের পরিণামকে কিরূপে কোন্ সম্প্রদায় জগতের প্রকৃতি বলিয়াছেন, উহা কিরূপেই বা সম্ভব হয় এবং ঐ শেষোক্ত মতও আয়ুর্ব্বেদের মত নহে কেন? এই সমস্তও চিন্তা করা আবশ্যক। সে যাহা হউক, আমরা পূর্ব্বে যে "যদৃচ্ছাবাদের" কথা বলিয়াছি, উহা যে, "আকস্মিকত্ববাদে"রই নামান্তর, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। "যদৃচ্ছা" শব্দের অর্থ এখানে অকস্মাৎ। তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকের ৩১শ সূত্রে মহর্ষি গোতমও অকস্মাৎ অর্থে "যদৃচ্ছা" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। এবং মহর্ষি গোতমের সর্ব্বপ্রথম সূত্রের ভাষ্যে তর্কের উদাহরণ প্রদর্শন করিতে ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন যে, "আকস্মিক" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, উহার অর্থ বিনা কারণে উৎপন্ন, ইহাও স্পষ্ট বুঝা যায়। (১ম খণ্ড, ৬১ম পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং কোন নিয়ত কারণকে অপেক্ষা না করিয়া কার্য্য স্বয়ংই উৎপন্ন হয়, ইহাই "আকস্মিকত্ববাদ" বলিয়া আমরা বুঝিতে পারি। "যদৃচ্ছা" শব্দের দ্বারাও ঐরূপ অর্থ বুঝা যায়। বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম পাদের ৩৩শ সূত্রের শঙ্করভাষ্যের "ভামতী" টীকায় শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্রের "যদৃচ্ছয়া বা স্বভাবাদ্বা" এই

বাক্যের ব্যাখ্যায় "কল্পতরু" টীকাকার অমলানন্দ সরস্বতী যাহা বলিয়াছেন[১], তদ্দ্বারাও পূর্ব্বোক্ত "যদৃচ্ছা" শব্দের পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থই বুঝা যায় এবং "যদৃচ্ছা" ও "স্বভাব" যে ভিন্ন পদার্থ, ইহাও বুঝা যায়। পূর্ব্বোক্ত শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ প্রভৃতিতেও "স্বভাব" ও "যদৃচ্ছা"র পৃথক্ উল্লেখই দেখা যায়। কিন্তু স্বভাববাদীরাও যদৃচ্ছাবাদীদিগের ন্যায় নিজ মত সমর্থন করিতে কণ্টকের তীক্ষ্ণতাকে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। "বুদ্ধচরিত" গ্রন্থে অশ্বঘোষ "স্বভাববাদে"র উল্লেখ করিতে লিখিয়াছেন, "কঃ কণ্টকস্য প্রকরোতি তৈক্ষ্ণ্যং"[২]। জৈন পণ্ডিত নেমিচন্দ্রের প্রাকৃত ভাষায় লিখিত "গোম্মট্সার" গ্রন্থেও "স্বভাববাদ" বর্ণনে ঐরূপ কথাই পাওয়া যায়[৩]। সুতরাং মহর্ষি গোতমের পূর্ব্বোক্ত "অনিমিত্ততো ভাবোৎপত্তিঃ কণ্টকতৈক্ষ্ণ্যাদিদর্শনাৎ" এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষরূপে পূর্ব্বোক্ত "স্বভাববাদ"ই কথিত হইয়াছে, ইহাও বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু উদ্দ্যোতকর প্রভৃতি ন্যায়াচার্য্যগণ সকলেই এই প্রকরণকে আকস্মিকত্ব-প্রকরণ নামে উল্লেখ করায় তাঁহাদিগের মতে "আকস্মিকত্ববাদ"ই মহর্ষির এই প্রকরণোক্ত পূর্ব্বপক্ষ, ইহাই বুঝা যায়। কিন্তু ভাষ্যকার এবং বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকরের ব্যাখ্যার দ্বারা ভাবকার্য্যের নিমিত্ত-কারণ নাই, কিন্তু উপাদান-কারণ আছে, এই মতই পূর্ব্বোক্ত সূত্রে কথিত হইয়াছে, ইহা বুঝা যায় এবং "তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি"কার উদয়নাচার্য্যের কথার দ্বারাও তাহাই বুঝা যায়, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সুতরাং তাঁহাদিগের মতে পূর্ব্বোক্ত মতবিশেষও যে, সুপ্রাচীন কালে একপ্রকার "আকস্মিকত্ববাদ" নামে কথিত হইত, ইহা বুঝা যায়। পরে কার্য্যের নিয়ত কোন কারণই নাই, এই মতই "আকস্মিকত্ববাদ" নামে প্রসিদ্ধ ও সমর্থিত হওয়ায় বর্দ্ধমান উপাধ্যায় ও বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি নব্য ব্যাখ্যাকারগণ ঐরূপ "আকস্মিকত্ববাদ"কেই এখানে পূর্ব্বপক্ষরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং উদয়নাচার্য্য "তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি" গ্রন্থে ন্যায়বার্ত্তিক ও তাৎপর্য্যটীকার ব্যাখ্যানুসারে পূর্ব্বোক্ত প্রথম প্রকার "আকস্মিকত্ব"বাদকে এখানে পূর্ব্বপক্ষরূপে উল্লেখ করিলেও তিনি তাঁহার "ন্যায়-কুসুমাঞ্জলি" গ্রন্থে "আকস্মিকত্ববাদে"র নানারূপ ব্যাখ্যা করিতে পূর্ব্বোক্তরূপ কোন ব্যাখ্যা করেন নাই। ফলকথা, ভাবকার্য্যের উপাদান-কারণ আছে, কিন্তু নিমিত্ত-কারণ নাই, এইরূপ মত আর কেহই "আকস্মিকত্ববাদ" বলিয়া উল্লেখ না করিলেও সুপ্রাচীন কালে উহাও যে এক

১। নিয়তনিমিত্তমনপেক্ষ্য যদা কদাচিৎ প্রবৃত্ত্যুদয়ো যদৃচ্ছা। স্বভাবস্তু স এব যাবদ্বস্তুভাবী ; যথা শ্বাসাদৌ।
—কল্পতরু।

২। "কঃ কণ্টকস্য প্রকরোতি তৈক্ষ্ণ্যং বিচিত্রভাবং মৃগপক্ষিণাং বা।
স্বভাবতঃ সর্ব্বমিদং প্রবৃত্তং ন কামকারোঽস্তি কুতঃ প্রযত্নঃ॥—বুদ্ধচরিত ৫২।

"সুশ্রুতসংহিতা"র টীকাকার ডল্‌হণাচার্য্য "স্বভাববাদে"র ব্যাখ্যা করিতে লিখিয়াছেন, "তথাহি কঃ কণ্টকানাং প্রকরোতি তৈক্ষ্ণ্যং, চিত্রং বিচিত্রং মৃগপক্ষিণাঞ্চ। মাধুর্য্যমিক্ষৌ কটুতা মরীচে, স্বভাবতঃ সর্ব্বমিদং প্রবৃত্তং।"—শারীর-স্থান ১।১১—টীকা।

৩। "কো করই কণ্টয়াণং তিক্খত্তং মিগবিহংগমাদীণং।
বিবিহত্তং তু সহাও ইদি সব্বং পিয় সহাও ত্তি॥—গোম্মট্সার, ৮৮৩ শ্লোক।

প্রকার "আকস্মিকত্ববাদ" নামে কথিত হইত, ইহা উদ্দ্যোতকর প্রভৃতির ব্যাখ্যার দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি। নচেৎ অন্য কোনরূপে তাঁহাদিগের কথার সামঞ্জস্য হয় না। মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য "ন্যায়কুসুমাঞ্জলি" গ্রন্থের প্রথম স্তবকে চতুর্থ কারিকায় "সাপেক্ষত্বাৎ" এই বাক্যের দ্বারা বিচারপূর্ব্বক কার্য্যকারণ ভাবের ব্যবস্থাপন করিয়া, শেষে "অকস্মাদেব ভবতীতি চেৎ ?" এই বাক্যের দ্বারা "আকস্মিকত্ববাদ"কে পূর্ব্বপক্ষরূপে উল্লেখ করিয়া "হেতুভূতিনিষেধো ন" ইত্যাদি পঞ্চম কারিকা১র দ্বারা ঐ মতের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, "অকস্মাদেব ভবতি" এই বাক্যের দ্বারা কার্য্যের হেতু নিষেধ হইতে পারে না, অর্থাৎ কার্য্যের কিছুমাত্র কারণ নাই, ইহা বলা যায় না। (২) কার্য্যের "ভূতি" অর্থাৎ উৎপত্তিই হয় না, ইহাও বলা যায় না। (৩) কার্য্য নিজেই নিজের কারণ, কার্য্যের অতিরিক্ত কোন কারণ নাই, ইহাও বলা যায় না। (৪) এবং কোন "অনুপাখ্য" অর্থাৎ অলীক পদার্থই কার্য্যের কারণ, কার্য্যের বাস্তব কোন কারণ নাই, ইহাও বলা যায় না। অর্থাৎ "অকস্মাদেব ভবতি" এই বাক্যের দ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপ চতুর্ব্বিধ মতের কোন মতই সংস্থাপন করা যায় না। উদয়নাচার্য্য শেষে ঐ কারিকার দ্বারা "স্বভাববাদে"রও খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু "ন্যায়কুসুমাঞ্জলি"র প্রাচীন টীকাকার বরদরাজ ও বর্দ্ধমান উপাধ্যায় ঐ কারিকার ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন যে, যদি পূর্ব্বপক্ষবাদী বলেন যে, "অকস্মাদেব ভবতি" এই বাক্যে "অকস্মাৎ" শব্দের অর্থ স্বভাব, উহার মধ্যে "কিম্" শব্দ ও "নঞ্" শব্দ নাই। নঞর্থক "অ" শব্দও পৃথক্ ভাবে উহার পূর্ব্বে প্রযুক্ত হয় নাই। কিন্তু ঐ "অকস্মাৎ" শব্দটি "অশ্বকর্ণ" প্রভৃতি শব্দের ন্যায় ব্যুৎপত্তিশূন্য, স্বভাব অর্থেই উহা রূঢ়। তাহা হইলে "অকস্মাদেব ভবতি" এই বাক্যের দ্বারা বুঝা যায় যে, কার্য্য স্বভাব হইতেই উৎপন্ন হয়। তাই উদয়নাচার্য্য পূর্ব্বোক্ত কারিকার তৃতীয় চরণ বলিয়াছেন, "স্বভাববর্ণনা নৈবং"। অর্থাৎ স্বভাব হইতেই কার্য্য জন্মে, ইহাও বলা যায় না। কিন্তু স্বভাববাদিগণ যে, "অকস্মাদেব ভবতি" এই বাক্যের দ্বারা স্বভাববাদের বর্ণনা করিয়াছেন, ইহা আর কোথাও দেখা যায় না। ন্যায়কুসুমাঞ্জলিকারিকার নব্য টীকাকার নবদ্বীপের হরিদাস তর্কাচার্য্য পূর্ব্বোক্ত পঞ্চম কারিকার অবতারণা করিতে লিখিয়াছেন,—"অকস্মাদেব ভবতি ন কিঞ্চিদপেক্ষ্য কার্য্যমিতি, অতএব "অনিমিত্ততো ভাবোৎপত্তিঃ কণ্টকতৈক্ষ্ণ্যাদিদর্শনা"দিতি পূর্ব্বপক্ষসূত্রং, তত্রাহ"। হরিদাস তর্কাচার্য্যের কথার দ্বারা "অকস্মাদেব ভবতি ন কিঞ্চিদপেক্ষ্য কার্য্যং" এই বাক্যটি যে, তাঁহার গুরুমুখশ্রুত আকস্মিকত্ববাদীদিগের সিদ্ধান্তসূত্র, ইহা মনে হয়। এবং "অনিমিত্ততো ভাবোৎপত্তিঃ" ইত্যাদি ন্যায়সূত্রের দ্বারা তাঁহার পূর্ব্বোক্ত "অকস্মাদেব ভবতি" এই মতই যে, পূর্ব্বপক্ষরূপে কথিত হইয়াছে, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। অবশ্য উদয়নাচার্য্য "সাপেক্ষত্বাৎ" এই হেতুবাক্যের দ্বারা কার্য্য নিজের উৎপত্তিতে কিছু অপেক্ষা করে, নচেৎ কার্য্যের কাদাচিৎকত্বের

১। "হেতুভূতিনিষেধো ন স্বানুপাখ্যবিধির্ন চ।
স্বভাববর্ণনা নৈবমবধের্নিয়তত্বতঃ" ॥—ন্যায়কুসুমাঞ্জলি।১.৫।

ব্যাঘাত হয়, অর্থাৎ কার্য্য কখনও আছে, কখনও নাই, ইহা হইতে পারে না, সর্ব্বদাই কার্য্যের উৎপত্তি অনিবার্য্য হওয়ায় কার্য্যের সর্ব্বকালবর্ত্তিত্বেরই আপত্তি হয়, এইরূপ যুক্তির দ্বারা কার্য্যের যে কারণ আছে, ইহা প্রতিপন্ন করিয়া, পরে উহা সমর্থন করিতেই "আকস্মিকত্ববাদ" ও "স্বভাববাদে"র খণ্ডন করিয়াছেন। সুতরাং ঐ উভয় মতেই যে, কার্য্যের কোন নিয়ত কারণ নাই, ইহাও উদয়নাচার্য্যের ঐ বিচারের দ্বারা বুঝা যায়। কিন্তু স্বভাববাদীরা উদয়নাচার্য্যের প্রদর্শিত পূর্ব্বোক্ত আপত্তি চিন্তা করিয়া স্বভাব বলিয়া কোন পদার্থ স্বীকারপূর্ব্বক বলিয়াছিলেন যে, কার্য্য যে কোন নিয়ত দেশকালেই উৎপন্ন হয়, সর্ব্বত্র ও সর্ব্বকালে উৎপন্ন হয় না, ইহাতে স্বভাবই নিয়ামক অর্থাৎ স্বভাবতঃই ঐরূপ হইয়া থাকে। "আকস্মিকত্ববাদ" হইতে "স্বভাববাদে"র এই বিশেষই উদয়নাচার্য্যের কথার দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। "ন্যায়কুসুমাঞ্জলি"র প্রাচীন টীকাকার বরদরাজ এবং বর্দ্ধমান উপাধ্যায়ও শেষে ঐ "স্বভাববাদে"র ব্যাখ্যা করিতে স্বভাববাদীদিগের কারিকা[১] উদ্ধৃত করিয়া স্বভাববাদের বিশেষ প্রদর্শন করিয়াছেন। মাধবাচার্য্য "সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে" চার্ব্বাকদর্শন প্রবন্ধে ঐ কারিকা উদ্ধৃত করিয়াছেন। উদয়নাচার্য্য পূর্ব্বোক্ত বিচারের শেষে স্বভাববাদকেই বিশেষরূপে খণ্ডন করিয়াছেন, তিনি বিচার দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, "স্বভাব" বলিয়া কোন পদার্থ স্বীকার করিয়াও পূর্ব্বোক্ত আপত্তি নিরাস করা যায় না। বস্তুতঃ ঐ "স্বভাবে"র কোনরূপ ব্যাখ্যা করা যায় না। কারণ, "স্বভাব" বলিলে স্বকীয় ভাব বা স্বীয় ধর্ম্মবিশেষ বুঝা যায়। এখন ঐ "স্বভাব" কি কার্য্যের স্বভাব, অথবা কারণের স্বভাব, ইহা বলা আবশ্যক। কার্য্যের স্বভাব বলিলে উহা কার্য্যের উৎপত্তির পূর্ব্বে না থাকায় উহা নিয়ত দেশকালে কার্য্যের উৎপত্তির নিয়ামক হইতে পারে না। ঘটের উৎপত্তির পূর্ব্বে ঘটের কোন স্বভাব থাকিতে পারে না। আর যদি ঐ স্বভাবকে কারণের স্বভাব বলা হয়, তাহা হইলে কারণ স্বীকার করিতেই হইবে। কারণ বলিয়া কোন পদার্থ না থাকিলে কারণের স্বভাব, ইহা কখনই বলা যায় না। কারণ স্বীকার করিতে হইলে আর "স্বভাববাদ" থাকে না, "স্বভাব" বলিয়া কোন অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকারেরও কোন প্রয়োজন থাকে না। কিন্তু কারণের শক্তিই কারণের স্বভাব, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। শক্তি বলিয়া অতিরিক্ত কোন পদার্থ নৈয়ায়িকগণ স্বীকার করেন নাই। উদয়নাচার্য্য "ন্যায়কুসুমাঞ্জলি"র প্রথম স্তবকে বিশেষ বিচারপূর্ব্বক উহা খণ্ডন করিয়া কারণত্বই যে, কারণের শক্তি[২] এবং উহা কারণের স্বভাব, ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। সুতরাং কার্য্যের কারণ অস্বীকার করিয়া স্বভাববাদের প্রতিষ্ঠা হইতে পারে না। "স্বভাব" বলিতে স্বরূপ, অর্থাৎ

১। নিত্যসত্ত্বা ভবন্ত্যন্যে নিত্যাসত্ত্বাশ্চ কেচন।
বিচিত্রাঃ কেচিদিত্যত্র তৎস্বভাবো নিয়ামকঃ॥
অগ্নিরুষ্ণো জলং শীতং সমস্পর্শস্তথানিলঃ।
কেনেদং চিত্রিতং (রচিতং) তস্মাৎ স্বভাবাৎ তদ্ব্যবস্থিতিঃ॥

২। "অথ শক্তিনিষেধে কিং প্রমাণং, ন কিঞ্চিৎ, তৎ কিমস্ত্যেব? বাঢ়ং, নহি নো দর্শনে শক্তিপদার্থ এব নাস্তি। কোহসৌ তর্হি?—কারণত্বং" ইত্যাদি।—১৩শ কারিকার গদ্য ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

কার্য্য নিজেই তাহার স্বভাব, ইহা বলিলে কার্য্য নিজেই উৎপন্ন হয়, অথবা কার্য্য নিজেই নিজের কারণ, ইহাই বলা হয়। কিন্তু কার্য্যের পূর্ব্বে ঐ কার্য্য না থাকায় উহা কোনরূপেই তাহার কারণ হইতে পারে না। কার্য্যের কোন কারণই নাই, কার্য্য নিজের উৎপত্তিতে নিজের স্বভাব বা স্বরূপ ভিন্ন আর কিছুকেই অপেক্ষা করে না, ইহা বলিলে সর্ব্বদা কার্য্যের উৎপত্তি ও স্থিতি অনিবার্য্য। তাই উদয়নাচার্য্য পূর্ব্বোক্ত সমস্ত মতেরই খণ্ডন করিতে হেতু বলিয়াছেন, "অবধে-র্নিয়তত্বতঃ"। অর্থাৎ সকল কার্য্যেরই নিয়ত অবধি আছে। যাহা হইতে অথবা যে দেশ কালে কার্য্য জন্মে, যাহার অভাবে ঐ কার্য্য জন্মে না, তাহাকে ঐ কার্য্যের "অবধি" বলা যায়। ঐ "অবধি" নিয়ত অর্থাৎ উহা নিয়মবদ্ধ। সকল দেশ কালই সকল কার্য্যের অবধি নহে। তাহা হইলে সর্ব্বদাই সর্ব্বত্র কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে। সুতরাং কার্য্যবিশেষের প্রতি যখন দেশবিশেষ ও কালবিশেষই নিয়ত অবধি বলিয়া স্বীকার্য্য এবং উহা পরিদৃষ্ট সত্য, তখন আর পূর্ব্বোক্ত "আকস্মিকত্ববাদ" ও "স্বভাববাদ" কোনরূপেই স্বীকার করা যায় না। কারণ, কার্য্যের যাহা নিয়ত "অবধি" বলিয়া স্বীকার্য্য, তাহাই ঐ কার্য্যের কারণ বলিয়া কথিত হয়। কার্য্য মাত্রই তাহার ঐ নিয়ত কারণসাপেক্ষ। সুতরাং কার্য্য কোন নিয়ত কারণকে অপেক্ষা করে না, অথবা কার্য্য স্বভাবতঃই নিয়ত দেশকালে উৎপন্ন হয়, অতিরিক্ত কোন পদার্থ তাহাতে অপেক্ষিত নহে, ইহা কোনরূপেই বলা যায় না। বস্তুতঃ যে সকল পদার্থ কখনও আছে, কখনও নাই, সেই সমস্ত পদার্থের ঐ "কাদাচিৎকত্ব" কারণের অপেক্ষাবশতঃই সম্ভব হয়, অন্যথা উহা সম্ভবই হইতে পারে না, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। বৌদ্ধসম্প্রদায়বিশেষও ইহা সমর্থন করিয়াছেন। টীকাকার বরদরাজ এ বিষয়ে বৌদ্ধ মহানৈয়ায়িক ধর্ম্মকীর্ত্তির কারিকাও[1] উদ্ধৃত করিয়াছেন। মূলকথা, উদয়নাচার্য্যের বিচারের দ্বারা "আকস্মিকত্ববাদ" ও "স্বভাববাদ" এই উভয় মতেই যে, কার্য্যের নিয়ত কোন প্রকার কারণ নাই, ইহাই আমরা বুঝিতে পারি এবং টীকাকার বরদরাজ ও বর্দ্ধমান উপাধ্যায় প্রভৃতি "স্বভাববাদ" পক্ষেই বিশেষ বিচার করিলেও উদয়নার্য্য যে, পূর্ব্বোক্ত "হেতুভূতিনিষেধো ন" ইত্যাদি কারিকার দ্বারা "আকস্মিকত্ববাদ" ও "স্বভাববাদ" এই উভয় মতেরই খণ্ডন করিয়াছেন, ইহাও বুঝিতে পারি। সুতরাং মহর্ষি গোতম পূর্ব্বোক্ত "অনিমিত্ততো ভাবোৎপত্তিঃ" ইত্যাদি পূর্ব্বপক্ষ-সূত্রের দ্বারা "আকস্মিকত্ববাদে"র ন্যায় "স্বভাববাদ"কেও পূর্ব্ব-পক্ষরূপে প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাও অবশ্য বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককারের ব্যাখ্যার দ্বারা অন্যরূপ পূর্ব্বপক্ষই বুঝা যায়, তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। মহর্ষি এখানে ঐ পূর্ব্ব-পক্ষের নিজে কোন প্রকৃত উত্তর বলেন নাই, ইহা ভাষ্যকার প্রভৃতি বলিলেও পরবর্ত্তী কালে কোন নব্যসম্প্রদায় মহর্ষির পূর্ব্বোক্ত ২৩শ ও ২৪শ সূত্রের অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিয়া, ঐ দুই সূত্রের দ্বারা

১। তদাহ কীর্ত্তিঃ—

"নিত্যং সত্ত্বমসত্ত্বং বা হেতোরন্যানপেক্ষণাৎ।

অপেক্ষাতো হি ভাবানাং কাদাচিৎকত্বসম্ভবঃ" ॥

(ন্যায়কুসুমাঞ্জলির ৫ম কারিকার বরদরাজকৃত টীকা দ্রষ্টব্য)।

মহর্ষি এখানেই যে, তাঁহার পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন করিয়াছেন, ইহা সমর্থন করিয়াছিলেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ শেষে ঐ ব্যাখ্যান্তরও প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ঐ ব্যাখ্যায় কষ্টকল্পনা থাকায়, উহা সূত্রের যথাশ্রুতার্থ ব্যাখ্যা না হওয়ায় ভাষ্যকার প্রভৃতির ন্যায় বৃত্তিকার বিশ্বনাথও নিজে ঐরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই। পরন্তু উদ্দ্যোতকর প্রভৃতির ন্যায় বৃত্তিকার বিশ্বনাথও এই প্রকরণকে "আকস্মিকত্ব-প্রকরণ" নামে উল্লেখ করায় তিনিও এখানে "স্বভাববাদ"কে পূর্ব্বপক্ষরূপে গ্রহণ করেন নাই, ইহা বুঝা যায়। সুধীগণ পূর্ব্বোক্ত সমস্ত কথার সমালোচনা করিয়া এখানে মহর্ষি গোতমের অভিমত পূর্ব্বপক্ষের মূল তাৎপর্য্য চিন্তা করিবেন। ২২।

আকস্মিকত্ব-প্রকরণ সমাপ্ত। ৬।

ভাষ্য। অন্যে তু মন্যন্তে—

সূত্র। সর্ব্বমনিত্যমুৎপত্তিবিনাশধর্ম্মকত্বাৎ ॥২৫॥৩৬৮॥

অনুবাদ। অন্য সম্প্রদায় কিন্তু স্বীকার করেন—(পূর্ব্বপক্ষ) "সমস্ত পদার্থই অনিত্য, যেহেতু উৎপত্তিধর্ম্মক ও বিনাশধর্ম্মক" [অর্থাৎ সমস্ত পদার্থেরই উৎপত্তি ও বিনাশ হওয়ায় উৎপত্তির পূর্ব্বে ও বিনাশের পরে কোন পদার্থেরই সত্তা না থাকায় সমস্ত পদার্থই অনিত্য]।

ভাষ্য। কিমনিত্যং নাম ? যস্য কদাচিদ্ভাবস্তদনিত্যং। উৎপত্তিধর্ম্মকমনুৎপন্নং নাস্তি, বিনাশধর্ম্মকঞ্চ বিনষ্টং[1] নাস্তি। কিং পুনঃ সর্ব্বং ? ভৌতিকঞ্চ শরীরাদি, অভৌতিকঞ্চ বুদ্ধ্যাদি, তদুভয়মুৎপত্তিবিনাশধর্ম্মকং বিজ্ঞায়তে, তস্মাত্তৎ সর্ব্বমনিত্যমিতি।

অনুবাদ। অনিত্য কি ? অর্থাৎ সূত্রোক্ত "অনিত্য" শব্দের অর্থ কি ? (উত্তর) যে বস্তুর কদাচিৎ সত্তা থাকে অর্থাৎ কোন কালবিশেষেই যে বস্তু বিদ্যমান থাকে, সর্ব্বকালে বিদ্যমান থাকে না, সেই বস্তু অনিত্য। উৎপত্তিধর্ম্মক বস্তু উৎপন্ন না হইলে অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে থাকে না, এবং বিনাশধর্ম্মক বস্তু বিনষ্ট হইলে (বিনাশের পরে) থাকে না। (প্রশ্ন) সর্ব্ব কি ? অর্থাৎ সূত্রোক্ত "সর্ব্ব" শব্দের অর্থ কি ? (উত্তর) ভৌতিক (পঞ্চভূতজনিত) শরীরাদি এবং অভৌতিক

১। প্রচলিত ভাষ্য ও বার্ত্তিক পুস্তকে এখানে "অবিনষ্টং নাস্তি" এইরূপ পাঠ আছে। কিন্তু "বিনষ্টং নাস্তি" ইহাই প্রকৃত পাঠ বুঝা যায়। তাৎপর্য্যটীকাকারও ঐ পাঠের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন, "বিনাশধর্ম্মকঞ্চ বিনষ্টং নাস্তি, অবিনষ্টঞ্চাস্তি"।

জ্ঞানাদি। সেই উভয়ই উৎপত্তিধর্ম্মক ও বিনাশধর্ম্মক বুঝা যায়। অতএব সেই সমস্তই অনিত্য।

টিপ্পনী। মহর্ষি তাঁহার উদ্দিষ্ট ও লক্ষিত "প্রেত্যভাব" নামক প্রমেয়ের পরীক্ষা করিতে পূর্ব্বে সূত্র বলিয়াছেন—"আত্মনিত্যত্বে প্রেত্যভাবসিদ্ধিঃ"। ১০। কিন্তু যদি সমস্ত পদার্থই অনিত্য হয়, তাহা হইলে আত্মাও অনিত্য হইবে। তাহা হইলে আর মহর্ষির পূর্ব্বকথিত যুক্তির দ্বারা "প্রেত্যভাব" সিদ্ধ হইতে পারে না। যদিও মহর্ষি গোতম তৃতীয় অধ্যায়ে নানা যুক্তির দ্বারা বিশেষরূপে আত্মার নিত্যত্বসাধন করিয়াছেন, কিন্তু অন্য প্রমাণের দ্বারা সর্ব্বানিত্যত্ব সিদ্ধ হইলে আত্মার নিত্যত্বের সিদ্ধি হইতে পারে না। সমস্ত পদার্থই অনিত্য, ইহা নিশ্চিত হইলে আত্মা নিত্য, এইরূপ অনুমান হইতেই পারে না। সুতরাং মহর্ষির পূর্ব্বোক্ত প্রেত্যভাব পরীক্ষার পরিশোধনের জন্য "সর্ব্বানিত্যত্ববাদ" খণ্ডন করাও অত্যাবশ্যক। তাই মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ বলিয়াছেন—"সর্ব্বমনিত্যং"। এই সূত্রের অবতারণা করিতে ভাষ্যকার, বার্ত্তিককার ও তাৎপর্য্য টীকাকারের "অন্যে তু মন্যন্তে" এই বাক্যের দ্বারা প্রাচীন কালে যে, কোন সম্প্রদায় সর্ব্বানিত্যত্ববাদী ছিলেন, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। বস্তুতঃ বস্তুমাত্রের ক্ষণিকত্ববাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের ন্যায় সুপ্রাচীন চার্ব্বাকসম্প্রদায়ও সর্ব্বানিত্যত্ববাদী ছিলেন। তাঁহারা নিত্য পদার্থ কিছুই স্বীকার করেন নাই। মহর্ষি তাঁহাদিগের ঐ মতের সাধক হেতু বলিয়াছেন—"উৎপত্তি-বিনাশ-ধর্ম্মকত্বাৎ"। তাঁহারা সকল পদার্থেরই উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকার করায় তাঁহাদিগের মতে সকল পদার্থেই উৎপত্তিরূপ ধর্ম্ম (উৎপত্তিমত্ত্ব) ও বিনাশরূপ ধর্ম্ম (বিনাশিত্ব) আছে। সূত্রোক্ত "অনিত্য" শব্দের অর্থ কি? অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষবাদী অনিত্য কাহাকে বলেন? ইহা না বুঝিলে তাঁহার কথিত হেতুতে তাঁহার সাধ্য অনিত্যত্বের ব্যাপ্তি নিশ্চয় হইতে পারে না। এ জন্য ভাষ্যকার ঐ প্রশ্ন করিয়া তদুত্তরে বলিয়াছেন যে, যাহার কদাচিৎ (কোন কালবিশেষেই) সত্তা থাকে, অর্থাৎ সর্ব্বকালে সত্তা থাকে না, তাহাকে বলে অনিত্য। উৎপত্তি-বিনাশধর্ম্মক হইলেই যে, অনিত্য হইবে, ইহা বুঝাইতে শেষে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, উৎপত্তিধর্ম্মক বস্তু উৎপন্ন না হইলে থাকে না, অর্থাৎ উৎপত্তির পরেই তাহার সত্তা, উৎপত্তির পূর্ব্বে তাহার কোন সত্তা নাই। এবং বিনাশধর্ম্মক অর্থাৎ যাহার বিনাশ হয়, সেই বস্তু বিনষ্ট হইলে থাকে না, অর্থাৎ বিনাশের পরে তাহার কোন সত্তাই নাই। উৎপত্তির পরে বিনাশের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্তই তাহার সত্তা থাকে। সুতরাং উৎপত্তিধর্ম্মক ও বিনাশধর্ম্মক হইলে সেই বস্তুর কালবিশেষেই সত্তা স্বীকার্য্য হওয়ায় সূত্রোক্ত ঐ হেতুর দ্বারা বস্তুর অনিত্যত্ব অবশ্যই সিদ্ধ হয়। কিন্তু বস্তুমাত্রেরই যে উৎপত্তি ও বিনাশ হয়, ইহা আস্তিকসম্প্রদায় স্বীকার না করায় তাঁহাদিগের মতে সকল পদার্থে ঐ হেতু অসিদ্ধ। সর্ব্বানিত্যত্ববাদী নাস্তিকসম্প্রদায়ের কথা এই যে, আমরা ঘটাদি দৃষ্টান্তের দ্বারা সকল পদার্থেরই উৎপত্তি ও বিনাশ অনুমানসিদ্ধ করিয়া সকল পদার্থের অনিত্যত্ব সাধন করিব। ভৌতিক শরীরাদি এবং অভৌতিক জ্ঞানাদি সমস্ত পদার্থই "সর্ব্বমনিত্যং" এই প্রতিজ্ঞায় "সর্ব্ব"শব্দের অর্থ। অনুমান দ্বারা ঐ ভৌতিক ও অভৌতিক

দ্বিবিধ পদার্থেরই উৎপত্তি ও বিনাশ আছে, ইহা বুঝা যায়। সুতরাং উৎপত্তি-বিনাশধর্ম্মকত্ব হেতুর দ্বারা ঐ সকল পদার্থেরই অনিত্যত্ব সিদ্ধ হওয়ায় ঐ সমস্তই অনিত্য, জগতে নিত্য কিছু নাই। ২৫ ॥

সূত্র। নানিত্যতা-নিত্যত্বাৎ ॥২৬॥৩৬৯॥

অনুবাদ। (উত্তর) না, অর্থাৎ সকল পদার্থই অনিত্য, ইহা বলা যায় না। কারণ, অনিত্যতা অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথিত সকল পদার্থের অনিত্যতা, নিত্য।

ভাষ্য। যদি তাবৎ সর্ব্বস্যানিত্যতা নিত্যা? তন্নিত্যত্বান্ন সর্ব্বমনিত্যং,—অথানিত্যা? তস্যামবিদ্যমানায়াং সর্ব্বং নিত্যমিতি।

অনুবাদ। যদি (পূর্ব্বপক্ষবাদীর অভিমত) সকল পদার্থের অনিত্যতা নিত্য হয়, তাহা হইলে সেই অনিত্যতার নিত্যত্ববশতঃ সকল পদার্থ অনিত্য হয় না। যদি (ঐ অনিত্যতাও) অনিত্য হয়, তাহা হইলে সেই অনিত্যতা বিদ্যমান না থাকিলে অর্থাৎ উহার বিনাশ হইলে তখন সকল পদার্থই নিত্য।

টিপ্পনী। পূর্ব্বসূত্রোক্ত মত খণ্ডন করিতে মহর্ষি প্রথমে এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, সর্ব্বানিত্যত্ব-বাদীর অভিমত যে, সকল পদার্থের অনিত্যতা, তাহা যখন তিনি নিত্যই বলিতে বাধ্য হইবেন, তখন আর তিনি সকল পদার্থই অনিত্য, ইহা বলিতে পারেন না। ভাষ্যকার ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, সর্ব্বানিত্যত্ববাদীকে প্রশ্ন করা যায় যে, তাঁহার অভিমত সকল পদার্থের অনিত্যতা কি নিত্য? অথবা অনিত্য? যদি নিত্য হয়, তাহা হইলে আর সকল পদার্থই অনিত্য, ইহা তিনি বলিতে পারেন না। কারণ, তাঁহার অভিমত অনিত্যতাই ত তাঁহার মতে নিত্য। উহাও তাঁহার "সর্ব্বমনিত্যং" এই প্রতিজ্ঞায় সর্ব্বপদার্থের অন্তর্গত। আর যদি ঐ অনিত্যতাকেও তিনি অনিত্যই বলেন, তাহা হইলে ঐ অনিত্যতারও সর্ব্বকালে বিদ্যমানতা তিনি স্বীকার করিতে পারিবেন না। উহারও উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকার করিয়া উৎপত্তির পূর্ব্বে ও বিনাশের পরে উহার সত্তা থাকে না, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে সর্ব্বপদার্থের ঐ অনিত্যতা যখন বিনষ্ট হইয়া যাইবে, যখন ঐ অনিত্যতার সত্তাই থাকিবে না, তখন উহার অভাব নিত্যত্বই স্বীকার করিতে হইবে। সর্ব্বপদার্থের অনিত্যতার অভাব হইলে তখন আবার ঐ সমস্ত পদার্থই নিত্য, ইহাই বলিতে হইবে। তাহা হইলে "সর্ব্বমনিত্যং" এই সিদ্ধান্ত আর বলা যাইবে না ॥২৬॥

সূত্র। তদনিত্যমগ্নের্দ্দাহ্যং বিনাশ্যানুবিনাশবৎ ॥২৭॥৩৭০॥

অনুবাদ। (উত্তর) দাহ্য পদার্থকে বিনষ্ট করিয়া পশ্চাৎ অগ্নির বিনাশের ন্যায় সেই অনিত্যত্ব অনিত্য [অর্থাৎ সমস্ত পদার্থের অনিত্যত্বও সমস্ত পদার্থকে বিনষ্ট করিয়া পশ্চাৎ নিজেও বিনষ্ট হয়, সুতরাং আমরা ঐ অনিত্যতাকেও অনিত্যই বলি]।

ভাষ্য। তস্যা অনিত্যতায়া অপ্যনিত্যত্বং। কথং ? যথাঽগ্নির্দাহ্যং বিনাশ্যানু বিনশ্যতি, এবং সর্ব্বস্যানিত্যতা সর্ব্বং বিনাশ্যানুবিনশ্যতীতি।

অনুবাদ। সেই অনিত্যতারও অনিত্যত্ব, (প্রশ্ন) কিরূপে ? (উত্তর) যেমন অগ্নি দাহ্য পদার্থকে বিনষ্ট করিয়া পশ্চাৎ বিনষ্ট হয়, এইরূপ সমস্ত পদার্থের অনিত্যতা, সমস্ত পদার্থকে বিনষ্ট করিয়া পশ্চাৎ বিনষ্ট হয়।

টিপ্পনী। পূর্ব্বসূত্রোক্ত কথার উত্তরে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষবাদীর (সর্ব্বানিত্যত্ব-বাদীর) কথা বলিয়াছেন যে, আমরা সকল পদার্থের অনিত্যতাকে নিত্য বলি না, উহাকেও অনিত্যই বলি। বস্তুবিনাশের পরে ঐ বস্তুর অনিত্যতাও বিনষ্ট হইয়া যায়। যেমন অগ্নি দাহ্য পদার্থকে বিনষ্ট করিয়া শেষে নিজেও বিনষ্ট হইয়া যায়, তদ্রূপ সমস্ত পদার্থের অনিত্যতাও সমস্ত পদার্থকে বিনষ্ট করিয়া শেষে নিজেও বিনষ্ট হইয়া যায়। অবশ্য ঐ অনিত্যতাই যে, সকল পদার্থকে বিনষ্ট করে, তাহা নহে, কিন্তু তথাপি সূত্রোক্ত দৃষ্টান্তানুসারে সকল বস্তুর বিনাশের অনন্তর সেই সেই বস্তুর অনিত্যতাও বিনষ্ট হয়, এই তাৎপর্য্যে ভাষ্যকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "সর্ব্বস্যানিত্যতা সর্ব্বং বিনাশ্যানু বিনশ্যতীতি"। আপত্তি হইবে যে, অনিত্যতা অনিত্য হইলে ঐ অনিত্যতার বিনাশ স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে ঐ অনিত্যতার বিনাশের পরে নিত্যতাই স্বীকার করিতে হইবে। এই জন্যই সূত্রে দৃষ্টান্ত বলা হইয়াছে, "অগ্নের্দাহ্যং বিনাশ্যানুবিনাশবৎ"। অর্থাৎ সর্ব্বানিত্যত্ব-বাদীর গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, অগ্নি যে দাহ্য পদার্থকে আশ্রয় করিয়া থাকে, ঐ দাহ্য পদার্থ বিনষ্ট হইলে তখন আশ্রয়ের অভাবে ঐ অগ্নি থাকিতে পারে না, উহাও বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ অনিত্যতা যে বস্তুর ধর্ম্ম, ঐ বস্তু বিনষ্ট হইলে তখন আশ্রয়ের অভাবে ঐ অনিত্যতাও থাকিতে পারে না, উহাও বিনষ্ট হয়। বস্তুমাত্রেরই যখন বিনাশ হয়, তখন বস্তু বিনাশের পরে ঐ বস্তুর ধর্ম্ম কোথায় থাকিবে ? সুতরাং বস্তু বিনাশের পরে ঐ বস্তুর ধর্ম্ম অনিত্যতাও যে বিনষ্ট হইবে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। এইরূপ বস্তুর অনিত্যতার বিনাশের পরে তখন নিত্যতাও থাকিতে পারে না। কারণ, তখন যে বস্তুতে নিত্যতার আপত্তি করিবে, সেই বস্তুই নাই, উহা বিনষ্ট হইয়াছে। সুতরাং আশ্রয়ের অভাবে যেমন অনিত্যতা থাকিতে পারে না, তদ্রূপ নিত্যতাও থাকিতে পারে না। ফলকথা, সর্ব্বানিত্যত্ববাদী সকল পদার্থের ধ্বংস স্বীকার করিয়া ঐ ধ্বংসেরও ধ্বংস স্বীকার করেন। অন্য সম্প্রদায় তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহাদিগের প্রথম কথা এই যে, ধ্বংসের ধ্বংস হইলে তখন যে বস্তুর ধ্বংস, তাহার পুনরুদ্ভবের আপত্তি হয়। অর্থাৎ ঘটের ধ্বংসের ধ্বংস হইলে সেই ঘটের পুনরুদ্ভব হইতে পারে। কারণ, ঐ ঘটের ধ্বংস যখন বিনষ্ট হইবে, তখন সেই ধ্বংস নাই, ইহা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে তখন সেই ঘটের পূর্ব্ববৎ অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। ঘটের ধ্বংসকালে ঘটের অস্তিত্ব থাকে না ; কারণ, ঘটের ধ্বংস ঘটের বিরোধী। কিন্তু যখন ঐ ধ্বংস থাকিবে না, উহাও বিনষ্ট হইবে, তখন ঘটের বিরোধী না থাকায় সেই ঘটের অস্তিত্বই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু বিনষ্ট ঘটের যখন আর পুনরুৎপত্তি হয় না, তখন উহার ধ্বংস চিরস্থায়ী, উহার ধ্বংসের ধ্বংস আর নাই,

ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। সর্ব্বানিত্যতাবাদী বলিবেন যে, ঘটের ধ্বংসের ধ্বংস হইলেও তখন সেই ঘটের পুনরুদ্ভব হইতে পারে না। কারণ, আমার মতে সেই ঘটধ্বংসের ধ্বংসেরও তখন ধ্বংস হয়। সুতরাং সেই তৃতীয় ধ্বংস, প্রথম ঘটধ্বংসস্বরূপ হওয়ায় তখনও ঘটের বিরোধী থাকায় ঐ ঘটের পুনরুদ্ভব হইতে পারে না, তখন সেই ঘটের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। পরন্তু ঘটের উদ্ভব, ঘটের কারণ-সমূহসাপেক্ষ। যে ঘটের ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, তখন উহার কারণসমূহ না থাকায় আর ঐ ঘটের উৎপত্তি হইতে পারে না। তজ্জাতীয় ঘটান্তরের উৎপত্তি হইলেও যে ঘটটি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, উহার পুনরুৎপত্তি অসম্ভব। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, ধ্বংসের ধ্বংস স্বীকার করিলে সেই ধ্বংসের ধ্বংস এবং তাহার ধ্বংস, ইত্যাদিক্রমে অনন্ত ধ্বংস স্বীকার করিতে হইবে। সকল পদার্থই অনিত্য, এই মতে সকল পদার্থেরই উৎপত্তি ও বিনাশ হয়। সুতরাং ধ্বংসনামক যে পদার্থ জন্মিবে, উহারও বিনাশ হইবে, এইরূপ সেই বিনাশেরও (ধ্বংসেরও) বিনাশ হইবে, এইরূপে অনন্ত কাল পর্য্যন্ত অনন্ত ধ্বংসের উৎপত্তি স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু এইরূপ "অনবস্থা" নিষ্প্রমাণ বলিয়া উহা স্বীকার করা যায় না। ঐরূপ অনন্ত ধ্বংসের কল্পনাগৌরবও প্রমাণাভাবে স্বীকার করা যায় না। মহর্ষি গোতম পূর্ব্বোক্ত মত খণ্ডন করিতে এই সব কথা না বলিয়া, যাহা তাঁহার প্রকৃত সমাধান, সর্ব্বানিত্যত্ব-বাদখণ্ডনে যাহা প্রধান যুক্তি, তাহাই পরবর্ত্তী সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন ॥২৭॥

সূত্র। নিত্যস্যাপ্রত্যাখ্যানং যথোপলব্ধিব্যবস্থানাৎ ॥ ॥২৮॥৩৭১॥

অনুবাদ। (উত্তর) নিত্যপদার্থের প্রত্যাখ্যান করা যায় না,—অর্থাৎ নিত্য-পদার্থই নাই, ইহা উপপন্ন হয় না। কারণ, উপলব্ধি অনুসারে (অনিত্যত্ব ও নিত্যত্বের) ব্যবস্থা (নিয়ম) আছে।

ভাষ্য। অয়ং খলু বাদো নিত্যং প্রত্যাচষ্টে, নিত্যস্য চ প্রত্যাখ্যান-মনুপপন্নং। কস্মাৎ? যথোপলব্ধিব্যবস্থানাৎ, যস্যোৎপত্তিবিনাশধর্ম্মকত্ব-মুপলভ্যতে প্রমাণতস্তদনিত্যং, যস্য নোপলভ্যতে তদ্বিপরীতং। নচ পরমসূক্ষ্মাণাং ভূতানামাকাশ-কাল-দিগাত্ম-মনসাং তদ্গুণানাঞ্চ কেষাঞ্চিৎ সামান্য-বিশেষ-সমবায়ানাঞ্চোৎপত্তিবিনাশ-ধর্ম্মকত্বং প্রমাণত উপলভ্যতে, তস্মান্নিত্যান্যেতানীতি।

অনুবাদ। এই বাদ অর্থাৎ সকল পদার্থই অনিত্য, এই মত বা বাক্য, নিত্য পদার্থকে প্রত্যাখ্যান করিতেছে। কিন্তু নিত্য পদার্থের প্রত্যাখ্যান উপপন্ন হয় না। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) যেহেতু উপলব্ধি অনুসারে ব্যবস্থা আছে। বিশদার্থ এই

যে, প্রমাণের দ্বারা যে পদার্থের উৎপত্তি-বিনাশ-ধর্ম্মকত্ব উপলব্ধ হয়, সেই পদার্থ অনিত্য, যে পদার্থের (উৎপত্তি-বিনাশ-ধর্ম্মকত্ব) উপলব্ধ হয় না, সেই পদার্থ "বিপরীত" অর্থাৎ নিত্য। পরমসূক্ষ্ম ভূতসমূহের অর্থাৎ পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ুর পরমাণু-সমূহের, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মনের এবং তাহাদিগের কতকগুলি গুণের (পরিমাণাদির) এবং সামান্য, বিশেষ ও সমবায়ের উৎপত্তি-বিনাশধর্ম্মকত্ব প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধ হয় না, অতএব এই সমস্ত (পূর্ব্বোক্ত পরমাণু প্রভৃতি) নিত্য।

টিপ্পনী। মহর্ষি বলিয়াছেন যে, নিত্য পদার্থের প্রত্যাখ্যান হয় না, অর্থাৎ নিত্য পদার্থ ই নাই, ইহা উপপন্ন হয় না। কারণ, উপলব্ধি অনুসারেই নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বের ব্যবস্থা আছে। ভাষ্যকার ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, যে পদার্থে উৎপত্তি-বিনাশধর্ম্মকত্ব প্রমাণ দ্বারা উপলব্ধ হয়, তাহাই অনিত্য, যাহাতে উহা প্রমাণ দ্বারা উপলব্ধ হয় না, তাহা নিত্য। তাৎপর্য্য এই যে, সর্ব্বানিত্যত্ব-বাদী যে হেতুর দ্বারা সকল পদার্থেরই অনিত্যত্ব সাধন করেন, ঐ "উৎপত্তি-বিনাশ-ধর্ম্মকত্ব"রূপ হেতু সমস্ত পদার্থে প্রমাণসিদ্ধ নহে। ঘটপটাদি পদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশ প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া ঐ সমস্ত পদার্থের উৎপত্তি-বিনাশ-ধর্ম্মকত্বের উপলব্ধি হওয়ায় ঐ সমস্ত পদার্থ অনিত্য। কিন্তু বৈশেষিক শাস্ত্রবর্ণিত পার্থিবাদি চতুর্ব্বিধ পরমাণু এবং আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা, মন এবং ঐ সকল দ্রব্যের পরিমাণাদি কতিপয় গুণ, এবং "জাতি", "বিশেষ" ও "সমবায়ে"র উৎপত্তি ও বিনাশ প্রমাণসিদ্ধ নহে। প্রমাণের দ্বারা ঐ সকল পদার্থের উৎপত্তি-বিনাশধর্ম্মকত্বের উপলব্ধি হয় না। সুতরাং ঐ সকল পদার্থ নিত্য, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। ফলকথা, সর্ব্বানিত্যত্ববাদী সমস্ত পদার্থেরই অনিত্যত্ব সাধন করিতে যে "উৎপত্তি-বিনাশ-ধর্ম্মকত্ব"কে হেতু বলিয়াছেন, উহা পরমাণু ও আকাশ প্রভৃতি অনেক পদার্থে না থাকায় উহা অংশতঃ স্বরূপাসিদ্ধ। সুতরাং উহার দ্বারা সকল পদার্থের অনিত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। ঘটপটাদি যে সকল পদার্থে উহা প্রমাণসিদ্ধ, সেই সকল পদার্থে অনিত্যত্ব উভয়বাদিসিদ্ধ ; সুতরাং কেবল সেই সকল পদার্থে অনিত্যত্বের সাধন করিলে সিদ্ধ সাধন হইবে। সর্ব্বানিত্যত্ববাদীর কথা এই যে, পরমাণু প্রভৃতিরও উৎপত্তি ও বিনাশ আছে। প্রত্যক্ষাত্মক উপলব্ধি না হইলেও ঘটপটাদি দৃষ্টান্তে পরমাণু ও আকাশ প্রভৃতিরও উৎপত্তি-বিনাশ-ধর্ম্মকত্বের অনুমানাত্মক উপলব্ধি হয়। সুতরাং পরমাণু প্রভৃতিরও অনুমানসিদ্ধ ঐ হেতুর দ্বারা অনিত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে। এতদুত্তরে মহর্ষি গোতমের পক্ষে বক্তব্য এই যে, পরমাণুর উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকার করিলে পরমাণুই সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, জন্য দ্রব্যের অবয়বের যে স্থানে বিশ্রাম, অর্থাৎ যাহার আর কোন অবয়ব বা অংশ নাই, এমন অতি সূক্ষ্ম দ্রব্যই পরমাণু। উহার অবয়ব না থাকায় উপাদান কারণের অভাবে উৎপত্তি হইতে পারে না। বিনাশের কারণ না থাকায় বিনাশও হইতে পারে না। যে দ্রব্যের উৎপত্তি ও বিনাশ হয়, তাহা পরমাণু নহে। ফলকথা, পূর্ব্বোক্তরূপ পরমাণু পদার্থ মানিতে হইলে উহা উৎপত্তিবিনাশশূন্য নিত্য, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। এইরূপ আকাশাদি পদার্থের নিত্যত্বে বিবাদ থাকিলেও আত্মার নিত্যত্ব সিদ্ধান্তে

আস্তিকসম্প্রদায়ের বিবাদ নাই এবং তৃতীয় অধ্যায়ে উহা বহু যুক্তির দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং যদি কোন একটি পদার্থেরও নিত্যত্ব অবশ্য স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে আর সর্ব্বানিত্যত্ববাদী তাঁহার নিজমত সাধন করিতে পারেন না। উদ্দ্যোতকর পূর্ব্বোক্ত মত খণ্ডন করিতে চরমকথা বলিয়াছেন যে, কোন পদার্থই নিত্য না থাকিলে "অনিত্য" এইরূপ শব্দ প্রয়োগই করা যায় না। কারণ, "অনিত্য" শব্দের শেষবর্ত্তী "নিত্য" শব্দের কোন অর্থ না থাকিলে "অনিত্য" এইরূপ সমাস হইতে পারে না। সুতরাং "অনিত্য" বলিতে গেলেই কোন নিত্য পদার্থ মানিতেই হইবে। তাহা হইলে আর "সর্ব্বমনিত্যং" এইরূপ প্রতিজ্ঞাই হইতে পারে না। উদ্দ্যোতকর পূর্ব্বোক্ত ২৫শ সূত্রের বার্ত্তিকে ইহাও বলিয়াছেন যে, "সর্ব্বমনিত্যং" এইরূপ প্রতিজ্ঞাবাক্যে ঐ অনুমানে সমস্ত পদার্থই পক্ষ অর্থাৎ অনিত্যত্বরূপে সাধ্য হওয়ায় কোন পদার্থই দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। কারণ, যাহা সাধ্য, তাহা দৃষ্টান্ত হয় না। অনিত্যত্বরূপে সিদ্ধ পদার্থই ঐ অনুমানে দৃষ্টান্ত হইতে পারে। উদ্দ্যোতকরের এই কথায় বুঝা যায় যে, তাঁহার মতে অনুমানে পক্ষের অন্তর্গত কোন পদার্থ দৃষ্টান্ত হয় না। কিন্তু পরবর্ত্তী অনেক নৈয়ায়িক যুক্তির দ্বারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সাধ্যবিশিষ্ট বলিয়া সিদ্ধ ও সাধ্য সমস্ত পদার্থে অনুমান স্থলে সেই সিদ্ধ পদার্থ পক্ষের অন্তর্গত হইয়াও দৃষ্টান্ত হইতে পারে। সুতরাং "সর্ব্বমনিত্যং" এইরূপ অনুমানে ঘটপটাদি সর্ব্বসিদ্ধ অনিত্য পদার্থ পক্ষের অন্তর্গত হইয়াও দৃষ্টান্ত হইতে পারে। ঘটপটাদি পদার্থের অনিত্যত্ব নিশ্চয়—সমস্ত পদার্থের অনিত্যত্বানুমানে প্রতিবন্ধক হয় না। সুতরাং ঘটপটাদি দৃষ্টান্তের দ্বারা ঐরূপ অনুমানে "পক্ষতা"-রূপ কারণ আছে। কিন্তু তাহা হইলেও ঐ অনুমানের হেতু উৎপত্তিবিনাশধর্ম্মকত্ব সকল পদার্থে নাই। আকাশাদি নিত্য পদার্থে ঐ হেতু না থাকায় উহার দ্বারা সকল পদার্থের অনিত্যত্বের অনুমান হইতে পারে না,—উদ্দ্যোতকর শেষে ইহাও বলিয়াছেন। মহর্ষির এই সূত্রের দ্বারাও ঐ দোষ সূচিত হইয়াছে।

ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন এই সূত্রের ভাষ্যে বৈশেষিক শাস্ত্রবর্ণিত পার্থিবাদি চতুর্ব্বিধ পরমাণু এবং আকাশ, কাল, দিক্, মন এবং ঐ সমস্ত দ্রব্যের পরিমাণাদি কতিপয় গুণ এবং "জাতি", "বিশেষ" ও "সমবায়" নামক পদার্থের নিত্যত্ব সিদ্ধান্ত আশ্রয় করিয়া মহর্ষি গোতমের এই সিদ্ধান্ত-সূত্রের ব্যাখ্যা করায় তাঁহার মতে বৈশেষিক শাস্ত্রবর্ণিত ঐ পরমাণু প্রভৃতি পদার্থে ও উহাদিগের নিত্যত্ব সিদ্ধান্ত যে, মহর্ষি গোতমেরও সম্মত, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। মহর্ষি কণাদের কোন কোন সিদ্ধান্তে মহর্ষি গোতমের সম্মতি না থাকিলেও দার্শনিক মূল সিদ্ধান্তে যে, কণাদ ও গোতম উভয়েই একমত, ইহা ভাষ্যকার ভগবান্ বাৎস্যায়ন হইতে সমস্ত ন্যায়াচার্য্যগণের গ্রন্থের দ্বারাও স্পষ্ট বুঝা যায়। তাই ন্যায়দর্শন বৈশেষিক দর্শনের সমান তন্ত্র বলিয়া কথিত হইয়াছে। বৈশেষিক দর্শনে যে, পার্থিবাদি পরমাণু ও আকাশাদি পদার্থের নিত্যত্ব সিদ্ধান্তই বর্ণিত হইয়াছে, ইহাই চিরপ্রচলিত সম্প্রদায়সিদ্ধ মত। বৈশেষিক দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে মহর্ষি কণাদ "অদ্রব্যত্বেন নিত্যত্বমুক্তং" এবং "দ্রব্যত্বনিত্যত্বে বায়ুনা ব্যাখ্যাতে" ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা পরমাণু ও আকাশাদি দ্রব্যের নিত্যত্ব সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। ঐ সিদ্ধান্তে কণাদের যুক্তি এই যে, কোন দ্রব্য

অনিত্য বা জন্য হইলে তাহার সমবায়ি কারণ (উপাদান কারণ) থাকা আবশ্যক। ঘট পটাদি জন্য দ্রব্যের অবয়বই তাহার সমবায়ি কারণ হইয়া থাকে। কিন্তু পরমাণু ও আকাশাদি দ্রব্যের কোন অবয়ব বা অংশ না থাকায় উহাদিগের সমবায়ি কারণ সম্ভব হয় না। সুতরাং নিরবয়ব দ্রব্যত্ব হেতুর দ্বারা ঐ সমস্ত দ্রব্যের নিত্যত্বই সিদ্ধ হয়। এইরূপ পরমাণু ও আকাশাদি দ্রব্যের পরিমাণাদি কতিপয় গুণ এবং জাতি, বিশেষ ও সমবায় নামে স্বীকৃত পদার্থত্রয়েরও অনিত্যত্ব বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। ঐ সমস্ত পদার্থকে অনিত্য বলিলে উহাদিগের উৎপাদক কারণ কল্পনা ও উৎপত্তি বিনাশ কল্পনায় নিষ্প্রমাণ কল্পনাগৌরব স্বীকার করিতে হয়। সুতরাং ঐ সমস্ত পদার্থও নিত্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। যে সকল পদার্থের উৎপত্তি বিনাশ প্রমাণসিদ্ধ, সেই সমস্ত পদার্থই অনিত্য বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। মহর্ষি গোতমের এই সূত্রের দ্বারা এবং পরবর্তী প্রকরণের দ্বারাও পূর্ব্বোক্তরূপ সিদ্ধান্তই তাঁহার সম্মত বুঝা যায়। পরমাণুর নিত্যত্ব ও পরমাণুদ্বয়ের সংযোগে দ্ব্যণুকাদিক্রমে সৃষ্টি, এই আরম্ভবাদ যে কণাদের সিদ্ধান্ত নহে, ইহা কণাদসূত্রের ব্যাখ্যান্তর করিয়া প্রতিপন্ন করা যায় না, এবং মহর্ষি গোতম যে, ন্যায়দর্শনে কোন নিজ মত প্রতিষ্ঠা করেন নাই, তিনি তৎকালপ্রসিদ্ধ কণাদসিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া উহার সমর্থনের দ্বারা কেবল তাঁহার নিজ কর্ত্তব্য বিচারপ্রণালী প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, ইহাও আমরা বুঝি না। আমরা বুঝি, মহর্ষি কণাদ প্রথমে বৈশেষিকদর্শনে সৃষ্টি বিষয়ে আরম্ভবাদ ও আত্মার নানাত্বাদি যে সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন, উহা মহর্ষি গোতমেরও নিজ সিদ্ধান্ত। তিনি ন্যায়দর্শনে অন্যভাবে অন্যান্য সিদ্ধান্ত ও যুক্তি প্রকাশ করিয়া ঐ সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত মূল সিদ্ধান্তে মহর্ষি কণাদ ও গোতম একমত। ফলকথা, ন্যায়দর্শনে মহর্ষি গোতম কোন নিজ মতের প্রতিষ্ঠা করেন নাই, ন্যায়দর্শন অন্যান্য সকল দর্শনের অবিরোধী, ইহা বুঝিবার কোন বিশেষ কারণ আমরা দেখি না। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য শারীরকভাষ্যে কোন অংশে নিজ মত সমর্থনের জন্য সসম্মানে মহর্ষি গোতমের সূত্র উদ্ধৃত করিলেও তিনি যে, গোতম মত খণ্ডন করেন নাই, ইহাও আমরা বুঝি না। তিনি ন্যায়দর্শনের পূর্ব্বে প্রকাশিত সুপ্রসিদ্ধ বৈশেষিক দর্শনের সূত্র উদ্ধৃত করিয়া কণাদ-বর্ণিত সিদ্ধান্ত খণ্ডন করাতেই তদ্দ্বারা গোতম সিদ্ধান্তও খণ্ডিত হইয়াছে, ইহাই আমরা বুঝি। কণাদসিদ্ধান্ত খণ্ডন করিতে ন্যায়দর্শন বা মহর্ষি গোতমের নামোল্লেখ করেন নাই বলিয়াই যে, তিনি কণাদের ঐ সমস্ত সিদ্ধান্তকে গোতম সিদ্ধান্ত বলিতেন না, ইহা বুঝিবার কোন কারণ নাই। পরন্তু শঙ্করাচার্য্যকৃত দক্ষিণা-মূর্ত্তিস্তোত্রের তাঁহার শিষ্য বিশ্বরূপ বা সুরেশ্বর আচার্য্য "মানসোল্লাস" নামে যে বার্ত্তিক রচনা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি পূর্ব্বোক্ত আরম্ভবাদের বর্ণন করিয়া, উহা যে, বৈশেষিক ও নৈয়ায়িক উভয় সম্প্রদায়েরই মত, ইহা বলিয়াছেন[১]। পূর্ব্বোক্ত আরম্ভবাদ মহর্ষি গোতমের নিজের সিদ্ধান্ত নহে,

---

১। উৎপাদনং প্রাক্তন্ত সংযুক্তাঃ পরমাণবঃ।

মদন্বিতো যস্তস্মদ্ভাসতে নেশ্বরস্থিতঃ" ॥ ইত্যাদি। "ইতি বৈশেষিকাঃ প্রাহুস্তথা নৈয়ায়িকা অপি"।

"কালাকাশদিগাত্মানো নিত্যাশ্চ বিভবশ্চ তে।

চতুর্ব্বিধঃ পরিচ্ছিন্না নিত্যাশ্চ পরমাণবঃ" ॥ ইত্যাদি ॥—মানসোল্লাস—২য়—১৬।২৯॥

উহা মহর্ষি কণাদেরই সিদ্ধান্ত, ইহাই তাঁহার গুরু শঙ্করাচার্য্যের মত হইলে তিনি কখনই ঐরূপ বলিতেন না। সেখানে তিনি প্রথমেই বৈশেষিক-সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়া, পরে বলিয়াছেন,—'তথা নৈয়ায়িকা অপি'। সুতরাং তাঁহারা বৈশেষিক দর্শনকে ন্যায়দর্শনের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াই জানিতেন, ইহাও উহার দ্বারা বুঝা যাইতে পারে। বস্তুতঃ প্রথমে বৈশেষিক দর্শনেই আরম্ভবাদের বিশদ বর্ণন হইয়াছে, ইহাই আমরা বুঝিতে পারি। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন প্রভৃতি অনেক পূর্ব্বাচার্য্যের ব্যাখ্যার দ্বারাও উহা বুঝা যায়। পরন্তু এখানে ইহাও স্মরণ করা আবশ্যক যে, তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকের প্রথম সূত্রের দ্বারা মহর্ষি গোতমের মতেও আকাশ নিত্য, ইহা বুঝা যায়। যথাস্থানে ইহার কারণ বলিয়াছি। এইরূপ এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকের "অন্তর্ব্বহিশ্চ" ইত্যাদি (২০শ) সূত্রের দ্বারা মহর্ষি গোতমের মতে পরমাণুর নিত্যত্ব সিদ্ধান্ত স্পষ্টই বুঝা যায়। সেখানে আকাশের সর্ব্বব্যাপিত্ব সিদ্ধান্ত সমর্থনের দ্বারাও তাঁহার মতে আকাশের নিত্যত্ব সিদ্ধান্ত বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু সাংখ্য ও বৈদান্তিক সম্প্রদায় কণাদ ও গোতমের ঐ সিদ্ধান্ত শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। বস্তুতঃ তৈত্তিরীয়সংহিতায় "তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইত্যাদি (২।১) শ্রুতির দ্বারা ব্রহ্ম হইতে যে আকাশের উৎপত্তি হইয়াছে, আকাশ নিত্য পদার্থ নহে, ইহা সুস্পষ্টই বুঝা যায়। শব্দ যাহার গুণ, সেই পঞ্চম ভূত আকাশই যে, ঐ শ্রুতিতে আকাশ শব্দের বাচ্য, এ বিষয়ে সংশয় নাই। কারণ, ঐ শ্রুতিমূলক নানা স্মৃতি ও নানা পুরাণে পূর্ব্বোক্তরূপ পঞ্চম ভূত আকাশের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। মহর্ষি মনুও পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি অনুসারে বলিয়াছেন, "আকাশং জায়তে তস্মাৎ তস্য শব্দগুণং বিদুঃ"। (১।৭৫)। স্মৃতি ও পুরাণের ন্যায় মহাভারতেও নানা স্থানে সৃষ্টি-প্রক্রিয়ার বর্ণনায় পঞ্চম ভূত আকাশের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং সাংখ্য ও বৈদান্তিকসম্প্রদায়ের মতে আকাশের অনিত্যত্ব যে শাস্ত্রমূলক সিদ্ধান্ত, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু মহর্ষি কণাদ ও গোতমের সম্মত আকাশের নিত্যত্ব সিদ্ধান্তও সুপ্রাচীন প্রতিতন্ত্র সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্তবাদীদিগের কথা এই যে, আকাশের যখন অবয়ব নাই, তখন তাহার সমবায়ি কারণ অর্থাৎ উপাদান কারণ সম্ভব না হওয়ায় আকাশের বাস্তব উৎপত্তি হইতেই পারে না। বৈদান্তিকসম্প্রদায়ের মতে পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি অনুসারে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর আকাশের উপাদান-কারণ। কিন্তু বৈশেষিক ও নৈয়ায়িকসম্প্রদায় বলিয়াছেন যে, ব্রহ্ম, দ্রব্যের উপাদান-কারণ হইতেই পারেন না। কারণ, জন্য দ্রব্য তাহার উপাদান-কারণান্বিতই প্রতীত হইয়া থাকে। মৃত্তিকানির্ম্মিত ঘটাদি দ্রব্যকে মৃত্তিকান্বিতই দেখা যায়। সুবর্ণনির্ম্মিত কুণ্ডলাদি দ্রব্যকে সুবর্ণান্বিতই দেখা যায়। কিন্তু ঈশ্বরসৃষ্ট কোন দ্রব্যই ঈশ্বরান্বিত বলিয়া বুঝা যায় না। সুতরাং ঈশ্বর পরিদৃশ্যমান জন্য দ্রব্যের উপাদান-কারণ নহেন, ইহা স্বীকার্য্য। শঙ্করশিষ্য সুরেশ্বরাচার্য্যও বৈশেষিক ও নৈয়ায়িকের পূর্ব্বোক্ত যুক্তি প্রকাশ করিতে "মানসোল্লাসে" বলিয়াছেন,—"মৃদন্বিতো ঘটস্তস্মাদ্ভাসতে নেশ্বরান্বিতঃ"। টীকাকার রামতীর্থ সেখানে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে ন্যায়-বৈশেষিক-সম্প্রদায়সম্মত যুক্তি অর্থাৎ অনুমান প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন[1]।

১। "অয়মর্থঃ। বিমতা অচেতনোপাদানকাঃ, অচেতনান্বিতত্বয়া ভাসমানত্বাৎ। যঃ স্বসত্তায়াং যদন্বিতো নিয়মেন

পরন্তু আর এক কথা এই যে, উপাদান-কারণের বিশেষ গুণ, সেই কারণজন্য দ্রব্যে সজাতীয় বিশেষ গুণ উৎপন্ন করে, এইরূপ নিয়ম স্বীকার্য্য। কারণ, শুক্ল সূত্রনির্ম্মিত বস্ত্রে শুক্ল রূপই উৎপন্ন হয়, উহাতে তখন নীলপীতাদি কোন রূপ জন্মে না, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং বস্ত্রের উপাদান-কারণ শুক্ল সূত্রগত শুক্ল রূপই সেখানে ঐ বস্ত্রে শুক্ল রূপ উৎপন্ন করে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং ব্রহ্ম বা ঈশ্বর জগতের উপাদান-কারণ হইলে পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে ঈশ্বরের বিশেষ গুণ যে চৈতন্য, তজ্জন্য জগতেরও চৈতন্য জন্মিবে অর্থাৎ চেতন ঈশ্বর হইতে অচেতন জগতের উৎপত্তি হইতে পারে না। কেহ এই আপত্তিকে ইষ্টাপত্তি বলিয়া জগতের চৈতন্য স্বীকারই করিয়াছিলেন, ইহা শারীরকভাষ্যে শঙ্করাচার্য্যের বিচারের দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি। কিন্তু জগতের বাস্তব চৈতন্য শঙ্করও স্বীকার করিতে পারেন নাই। তিনি "বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চ" ইত্যাদি—(তৈত্তিরীয় ২।৬)—শ্রুতিবশতঃ চেতন ও অচেতন দুইটি বিভাগ স্বীকার করিয়া জগতের অচেতনত্ব সমর্থন করিয়াছেন। তাই তিনি তাঁহার সিদ্ধান্তে বৈশেষিক-সম্প্রদায়োক্ত পূর্ব্বোক্তরূপ আপত্তি নিরাস করিতে "মহদ্দীর্ঘবদ্বা" (২।২।১১)—ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন যে, উপাদান-কারণের গুণ, তজ্জন্য দ্রব্যে সজাতীয় গুণান্তর উৎপন্ন করে, এইরূপ নিয়ম বৈশেষিকসম্প্রদায়ও স্বীকার করিতে পারেন না। কারণ, তাঁহাদিগের মতেও পরমাণুদ্বয় হইতে যে দ্ব্যণুকের উৎপত্তি হয়, তাহাতে ঐ পরমাণুর সূক্ষ্মতম পরিমাণ রূপ গুণ, তজ্জাতীয় পরিমাণ জন্মায় না। তাঁহারা ঐ স্থলে ঐ পরমাণুদ্বয়ের দ্বিত্বসংখ্যাই ঐ দ্ব্যণুকের পরিমাণের কারণ বলেন। এইরূপ বহু দ্ব্যণুকগত বহুত্ব সংখ্যাই সেই বহু দ্ব্যণুকজন্য স্থূলদ্রব্যের (ত্রসরেণুর) পরিমাণের কারণ বলেন। সংখ্যা ও পরিমাণ সজাতীয় গুণ নহে। সুতরাং উপাদান-কারণের গুণ, তজ্জন্য দ্রব্যে সজাতীয় গুণান্তর উৎপন্ন করে, এইরূপ নিয়মে বৈশেষিকের নিজমতেই ব্যভিচারবশতঃ ঐরূপ নিয়ম স্বীকার করা যায় না। সুতরাং চেতন ব্রহ্ম জগতের উপাদান-কারণ হইলেও জগতের চেতনত্বের আপত্তি হইতে পারে না। অর্থাৎ চেতন ব্রহ্ম হইতেও অচেতন জগতের উৎপত্তি হইতে পারে। কিন্তু বৈশেষিক ও নৈয়ায়িকসম্প্রদায় উপাদান-কারণের যাহা বিশেষ গুণ, তাহাই সেই কারণজন্য দ্রব্যে সজাতীয় বিশেষ গুণান্তর উৎপন্ন করে, এইরূপ নিয়মই স্বীকার করিয়াছেন। ঐরূপ নিয়মে তাঁহাদিগের মতে কোন ব্যভিচার নাই। কারণ, তাঁহাদিগের মতে সংখ্যা ও পরিমাণ বিশেষ গুণ নহে, উহা সামান্য গুণ। চৈতন্য বিশেষ গুণ। পরমাণুর পরিমাণ পরমাণুর বিশেষ গুণ না হওয়ায় উহা দ্ব্যণুকের পরিমাণের কারণ না হইলেও পূর্ব্বোক্ত নিয়মে ব্যভিচার নাই। পরমাণুর রূপ রসাদি বিশেষ গুণই, ঐ পরমাণুজন্য দ্ব্যণুকের রূপরসাদি বিশেষ গুণ উৎপন্ন করে। শঙ্করাচার্য্য পরমাণুর পরিমাণরূপ সামান্য গুণ গ্রহণ করিয়া তাঁহার কথিত বৈশেষিকোক্ত নিয়মে ব্যভিচার প্রদর্শন করিলেও তাঁহার শিষ্য সুরেশ্বরাচার্য্য কিন্তু বৈশেষিক সিদ্ধান্ত বর্ণন করিতে পরমাণুগত রূপরসাদি বিশেষ গুণই কার্য্য দ্রব্যে সজাতীয় রূপরসাদি বিশেষ গুণান্তর উৎপন্ন করে, ইহাই বলিয়াছেন বুঝা

ভাসতে, স তদুপাদানকো দৃষ্টঃ, যথা মৃদন্বিতত্বেনাবভাসমানো ঘটো মৃদুপাদানকঃ, তথা চেমে, তস্মাত্তথেতি। তস্মাদীশ্বরান্বিততয়া কস্যাপ্যবভাসাদর্শনাৎ নেশ্বরোপাদানকঃ প্রপঞ্চ ইত্যর্থঃ।"—মানসোল্লাসটীকা। ২। ১।

যায়[১]। টীকাকার রামতীর্থ সেখানে তাঁহার ঐ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াই বলিয়াছেন। মূলকথা, ব্রহ্ম বা ঈশ্বরকে আকাশের উপাদান-কারণ বলা যায় না। কারণ, আকাশ দ্রব্যপদার্থ। সুতরাং উহার উৎপত্তি হইলে উহার অবয়ব-দ্রব্যই উহার উপাদান-কারণ হইবে। কিন্তু আকাশের অবয়ব বা অংশ অথবা আকাশের মূল পরমাণু আছে, এ বিষয়ে কিছুমাত্র প্রমাণ নাই। সর্ব্বব্যাপী আকাশ নিরবয়বদ্রব্য, ইহাই প্রমাণসিদ্ধ। সুতরাং আত্মার ন্যায় নিরবয়বদ্রব্য বলিয়া আকাশের নিত্যত্বই অনুমান প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয়।

পরন্তু বৃহদারণ্যক উপনিষদে "অন্তরীক্ষমমৃতং" (২।৩।৩) এই শ্রুতিবাক্যে আকাশ "অমৃত," ইহা কথিত হওয়ায় এবং "আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ" এই শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্ম আকাশের ন্যায় নিত্য, ইহাও কথিত হওয়ায় শ্রুতির দ্বারা আকাশের নিত্যত্বও বুঝা যায়। বৈশেষিক ও নৈয়ায়িকসম্প্রদায় পূর্ব্বোক্তরূপ অনুমান ও শ্রুতির দ্বারা আকাশের নিত্যত্ব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া, পূর্ব্বোক্ত "আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যকে গৌণ প্রয়োগ বলিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহাদিগের কথা এই যে, ঘটপটাদি দ্রব্যের ন্যায় আকাশের কোন অবয়ব না থাকায় উপাদান-কারণের অভাবে আকাশের যখন উৎপত্তি হইতেই পারে না এবং অন্য শ্রুতির দ্বারা আকাশের নিত্যত্বও বুঝা যায়, তখন "আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইত্যাদি শ্রুতি ও তন্মূলক স্মৃতির দ্বারা আকাশের মুখ্য উৎপত্তি বুঝা যাইতে পারে না। সুতরাং "আকাশং কুরু," "আকাশো জাতঃ" এইরূপ লৌকিক গৌণপ্রয়োগের ন্যায় শ্রুতিতেও "আকাশঃ সম্ভূতঃ" এইরূপ গৌণপ্রয়োগই বুঝিতে হইবে[২]। ব্রহ্ম হইতে প্রথমে নিত্য আকাশের প্রকাশ হওয়ায় শ্রুতিতে উহাই বলিতে পূর্ব্বোক্তরূপ গৌণপ্রয়োগই হইয়াছে। বস্তুতঃ শ্রুতিতে অনেক স্থলে ঐরূপ গৌণ প্রয়োগও হইয়াছে। "বেদান্তসারে" উদ্ধৃত "আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ" এই শ্রুতিতে আত্মার যে পুত্ররূপে উৎপত্তি কথিত হইয়াছে, তাহা কখনই মুখ্য উৎপত্তি বলা যাইবে না। সুতরাং উক্ত শ্রুতিবাক্যকে যেমন গৌণপ্রয়োগ বলিতেই হইবে এবং কোন গৌণার্থেই উহার প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইবে, তদ্রূপ "আকাশঃ সম্ভূতঃ" এই শ্রুতিবাক্যকেও গৌণপ্রয়োগ বলিয়া কোন গৌণার্থেই উহার প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপ আরও বহু শ্রুতিবাক্যেরও গৌণার্থ ব্যাখ্যা করিয়া বৈদান্তিকসম্প্রদায়ও নিজমত সমর্থন করিয়াছেন। প্রকৃত স্থলেও ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য আকাশের অনিত্যত্ব সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে পূর্ব্বোক্ত "অন্তরীক্ষমমৃতং" এই শ্রুতি-

---

১। পরমাণুগতা এব গুণা রূপরসাদয়ঃ।
কার্য্যে সমানজাতীয়মারভন্তে গুণান্তরং॥—মানমেয়োদয়, ২.২।
"সমানজাতীয়মিতি বিশেষগুণাভিপ্রায়ং। দ্ব্যণুকাদিপরিমাণস্য পরমাণ্বাদিগতসংখ্যাযোনিত্বাঙ্গীকারাৎ, পরত্বাপরত্বয়োর্দ্দিক্কালপিণ্ডসংযোগযোনিত্বাঙ্গীকারাচ্চ।"—মানমেয়োদয়টীকা।

২। তস্মাদ্‌যথা লোকে "আকাশং কুরু" "আকাশো জাত" ইত্যেবংজাতীয়কো গৌণপ্রয়োগো ভবতি, যথা চ ঘটাকাশঃ করকাকাশো গৃহাকাশ ইত্যেকস্যাপ্যাকাশস্য এবংজাতীয়কো ভেদব্যপদেশো, গৌণো ভবতি। বেদেহপি "আরণ্যানাকাশেষালভেরন্" ইতি, এবমুৎপত্তিশ্রুতিরপি গৌণী দ্রষ্টব্যা। বেদান্তদর্শন, ২য় অঃ, ৩য় পাঃ, ৩য় সূত্রের শারীরকভাষ্য।

বাক্যে "অমৃত" শব্দের গৌণার্থই গ্রহণ করিয়াছেন। বৈশেষিক ও নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ের কথা এই যে, আকাশের নিত্যত্ব পক্ষে যে অনুমান প্রমাণ আছে, উহাকে শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিয়া উপেক্ষা না করিয়া "আকাশঃ সম্ভূতঃ" এই শ্রুতিবাক্যেরই গৌণ অর্থ গ্রহণ করিয়া বিরোধ পরিহার করাই কর্ত্তব্য। তাহা হইলে ঐ বিষয়ে অনুমান প্রমাণ ও পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিসমূহের সামঞ্জস্য-রক্ষা হয়। তাঁহারা যে সুপ্রাচীন কালেই মহর্ষি কণাদ ও গোতমের সম্মত পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে পূর্ব্বোক্তরূপই বিচার করিয়াছিলেন, ইহা আমরা শারীরকভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের বিচারের দ্বারা বুঝিতে পারি। বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদের প্রারম্ভে "বিয়দধিকরণে"র পূর্ব্বপক্ষভাষ্যে প্রথমে শঙ্করাচার্য্য পূর্ব্বপক্ষরূপে আকাশের নিত্যত্ব সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে বৈশেষিকসম্প্রদায়ের পূর্ব্বোক্ত সমস্ত কথাই বলিয়াছেন। "আকাশঃ সম্ভূতঃ" এই শ্রুতিবাক্যে একই "সম্ভূত" শব্দ আকাশের পক্ষে গৌণ, বায়ু প্রভৃতির পক্ষে মুখ্য, ইহা কিরূপে সম্ভব, ইহাও তিনি সেখানে পূর্ব্বপক্ষ সমর্থন করিতে উদাহরণ প্রদর্শনের দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন। তিনিও শেষে ঐ মত খণ্ডন করিতে শ্রুতিতে "আকাশঃ সম্ভূতঃ" এইরূপ গৌণ প্রয়োগ যে, হইতেই পারে না, ইহা বলেন নাই। কিন্তু আকাশের নিত্যত্ব, শ্রুতির সিদ্ধান্ত হইলে শ্রুতিতে যে এক ব্রহ্মের জ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান লাভ হয়, এই কথা আছে, তাহার উপপত্তি হয় না, ইত্যাদি যুক্তির দ্বারাই শেষে আকাশ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। ব্রহ্ম আকাশাদি সমস্ত পদার্থের উপাদান-কারণ হইলেই এক ব্রহ্মের জ্ঞানে আকাশাদি সমস্ত পদার্থের জ্ঞান হইতে পারে, আর কোনরূপেই উহা হইতে পারে না, ইহাই তাঁহার প্রধান কথা। কিন্তু বৈশেষিক ও নৈয়ায়িকসম্প্রদায় তাঁহাদিগের নিজ সিদ্ধান্তেও এক ব্রহ্মজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান লাভের উপপাদন করিয়াছেন। সে যাহা হউক, আকাশের নিত্যত্ব যে মহর্ষি কণাদ ও গোতমের সিদ্ধান্ত, এ বিষয়ে সংশয় নাই। প্রাচীন কালে বৈশেষিক ও নৈয়ায়িক গুরুগণ যেরূপে ঐ সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতেন, তাহা শারীরকভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য নিজেই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং এখন নৈয়ায়িকগণের ঐ সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে "আকাশঃ সম্ভূতঃ" এই শ্রুতিবাক্যের নানা বার্থ ব্যাখ্যার প্রয়াস অনাবশ্যক। এইরূপ পার্থিবাদি চতুর্ব্বিধ পরমাণু ও কালাদির নিত্যত্বও যে মহর্ষি কণাদ ও গোতমের সিদ্ধান্ত, এ বিষয়েও সংশয় নাই। মহাভারতে অন্যান্য সিদ্ধান্তের ন্যায় মহর্ষি কণাদ ও গোতমের পূর্ব্বোক্ত ঐ আর্ষ সিদ্ধান্তও যে বর্ণিত হইয়াছে, ইহাও বুঝা যায়[১]। সেখানে "শাশ্বত," "অচল" ও "ধ্রুব", এই তিনটি শব্দের দ্বারা আকাশাদি ছয়টি দ্রব্যের যে মুখ্য নিত্যত্বই প্রকটিত হইয়াছে, ইহা বুঝা যায়। নচেৎ ঐ তিনটি শব্দ প্রয়োগের সার্থক্য থাকে না। ঐ তিনটি শব্দের দ্বারা সেখানে ষট্‌পদার্থের মুখ্য নিত্যত্বই প্রকটিত

১। 'বিদ্ধি নারদ পঞ্চৈতান্ শাশ্বতানচলান্ ধ্রুবান্।
মহতস্তেজসো রাশীন্ কালষষ্ঠান্ স্বভাবতঃ॥
আপশ্চৈবান্তরীক্ষঞ্চ পৃথিবী বায়ুপাবকৌ।
নাসীদ্ধি পরমং তেভ্যো ভূতেভ্যো মুক্তসংশয়ম্॥
নোপপত্ত্যা ন বা যুক্ত্যা ত্বসদ্ব্রূয়াদসংশয়ম্।" মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব। ২৭৪ অঃ। ৬।৭

হইলে সেখানে অপ্, পৃথিবী, বায়ু ও পাবক শব্দের দ্বারা জলাদির পরমাণুই বিবক্ষিত, ইহাই বুঝিতে হয়। নচেৎ স্থূল জলাদির মুখ্য নিত্যতা কোন মতেই উপপন্ন হয় না। কেহ কেহ মহাভারতের ঐ বচনের পূর্ব্বাপর বচন পর্য্যালোচনার দ্বারা ন্যায়-বৈশেষিকশাস্ত্রোক্ত মতই মহাভারতের প্রকৃত মত, ইহা বলিয়াছেন। কিন্তু মহাভারতে নানাস্থানে সাংখ্যাদি শাস্ত্রোক্ত মতেরও যে বহু বর্ণন আছে, ইহা অস্বীকার করিয়া সত্যের অপলাপ করা যায় না। মহাভারতে সুপ্রাচীন নানা মতেরই বর্ণন আছে। পঞ্চম বেদ মহাভারত সর্ব্বজ্ঞানের আকর, মহাভারত-পাঠকের ইহা অবিদিত নাই। ২৮॥

সর্ব্বানিত্যত্ব-নিরাকরণ-প্রকরণ সমাপ্ত ॥ ৭ ॥

—o—

ভাষ্য। অয়মন্য একান্তঃ—

অনুবাদ। ইহা অপর "একান্তবাদ" অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত "একান্তবাদ" খণ্ডনের পরে মহর্ষি পরবর্ত্তী সূত্রের দ্বারা আর একটি "একান্তবাদ" বলিতেছেন।

সূত্র। সর্ব্বং নিত্যং পঞ্চভূতনিত্যত্বাৎ ॥ ২৯ ॥ ॥ ৩৭২ ॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) সমস্ত অর্থাৎ দৃশ্যমান ঘটপটাদি সমস্ত বস্তুই নিত্য, যেহেতু পঞ্চভূত নিত্য।

ভাষ্য। ভূতমাত্রমিদং সর্ব্বং, তানি চ নিত্যানি, ভূতোচ্ছেদানুপপত্তেরিতি।

অনুবাদ। এই সমস্ত (দৃশ্যমান ঘটপটাদি) ভূতমাত্র, অর্থাৎ পঞ্চভূতাত্মক, সেই পঞ্চভূত নিত্য, কারণ, ভূতসমূহের উচ্ছেদের অর্থাৎ অত্যন্ত বিনাশের উপপত্তি হয় না।

টিপ্পনী। সকল পদার্থই অনিত্য হইলে যেমন মহর্ষির পূর্ব্বোক্ত "প্রেত্যভাবে"র সিদ্ধি হয় না, তদ্রূপ সকল পদার্থ নিত্য হইলেও উহার সিদ্ধি হয় না। কারণ, আত্মার শরীরাদিও যদি নিত্য পদার্থই হয়, তাহা হইলে উহার উৎপত্তি না হওয়ায় আত্মার "প্রেত্যভাব" বলাই যাইতে পারে না। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত "প্রেত্যভাবে"র সিদ্ধির জন্য সর্ব্বনিত্যত্ববাদও খণ্ডন করা আবশ্যক। তাই মহর্ষি পূর্ব্বপ্রকরণের দ্বারা সর্ব্বানিত্যত্ববাদ খণ্ডন করিয়া এই প্রকরণের দ্বারা সর্ব্বনিত্যত্ববাদ খণ্ডন করিতে প্রথমে এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন যে, সকল পদার্থই নিত্য; কারণ, পঞ্চভূত নিত্য। পূর্ব্বপক্ষবাদীর বক্তব্য এই যে, দৃশ্যমান ঘটপটাদি সমস্ত পদার্থই ভূতমাত্র অর্থাৎ

পঞ্চভূতাত্মক। কারণ, ঘট মৃত্তিকা, শরীর মৃত্তিকা, ইত্যাদি প্রকার লৌকিক অনুভবের দ্বারা মৃত্তিকা-নির্ম্মিত ঘটাদি যে মৃত্তিকা হইতে অভিন্ন, ইহা বুঝা যায়। সুতরাং ঘটপটাদি সমস্ত পদার্থের মূল যে পঞ্চভূত, তাহা হইতে ঐ ঘটপটাদি পদার্থ অভিন্ন, সমস্তই ঐ পঞ্চভূতাত্মক, ইহা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে ঐ ঘটপটাদি পদার্থও নিত্য, ইহাও স্বীকার্য্য। কারণ, মূল পঞ্চভূত নিত্য, উহাদিগের অত্যন্তবিনাশ কখনই হয় না এবং উহাদিগের অসত্তাও কোন দিন নাই। তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, নৈয়ায়িকগণ পঞ্চ ভূতের উচ্ছেদ স্বীকার না করায় পঞ্চভূতাত্মক ঘটপটাদি পদার্থের নিত্যত্বই স্বীকার্য্য। পরে তিনি নৈয়ায়িক মতানুসারে ঘটপটাদি দ্রব্য পরমাণুস্বরূপ নহে, ইহা সমর্থন করিয়া পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডন করিয়াই মহর্ষির সিদ্ধান্তসূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু পরে তিনি পূর্ব্বোক্ত সর্ব্ব-নিত্যত্বমতকে সাংখ্যমত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু "প্রকৃতিপুরুষয়োরন্যৎ সর্ব্বমনিত্যং" (৫। ৭২) এই সাংখ্যসূত্রের দ্বারা এবং "হেতুমদনিত্যমব্যাপি" ইত্যাদি (১০ম) সাংখ্যকারিকার দ্বারা সাংখ্যমতেও সকল পদার্থ নিত্য নহে, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। তবে সৎকার্য্যবাদী সাংখ্য-সম্প্রদায়ের মতে মহৎ অহঙ্কার প্রভৃতি ত্রয়োবিংশতি তত্ত্ব যাহা কার্য্য বা অনিত্য বলিয়া কথিত, তাহাও আবির্ভাবের পূর্ব্বেও বিদ্যমান থাকে, এবং উহার অত্যন্ত বিনাশও নাই। সুতরাং সর্ব্বদা সত্তারূপ নিত্যত্ব গ্রহণ করিয়া সাংখ্যমতে সকল পদার্থ নিত্য, ইহা বলা যায়। তাৎপর্য্যটীকাকার পূর্ব্বোক্ত কারণেই সর্ব্বনিত্যত্ববাদকে সাংখ্যমত বলিয়া উল্লেখ করিতে পারেন। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকের প্রথম সূত্র-ভাষ্যে পূর্ব্বোক্ত কারণেই সাংখ্যমতে বুদ্ধি নিত্য, ইহা বলিয়াছেন। নিত্য বলিতে এখানে সর্ব্বদা সৎ, আবির্ভাব ও তিরোভাব-শূন্য নহে। কারণ, সাংখ্যমতে বুদ্ধি প্রভৃতি ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বের আবির্ভাব ও তিরোভাব আছে। তাই সাংখ্য-শাস্ত্রে উহাদিগের অনিত্যত্ব কথিত হইয়াছে। কিন্তু মহর্ষি এখানে সাংখ্যমত গ্রহণ করিয়া সকল পদার্থকে নিত্য বলিলে উহার সমর্থন করিতে পঞ্চভূতের নিত্যত্বকে হেতু বলিবেন কেন? ইহা অবশ্য চিন্তনীয়। সাংখ্যমতে পঞ্চভূতেরও আবির্ভাব ও তিরোভাব আছে। সুতরাং সাংখ্য-মতে পঞ্চভূত প্রকৃতি ও পুরুষের ন্যায় নিত্য নহে। সাংখ্যমতানুসারে সকল পদার্থের নিত্যত্ব সমর্থন করিতে হইলে মূল কারণ প্রকৃতির নিত্যত্ব অথবা সকল পদার্থের সর্ব্বদা সত্তাই হেতু বলা কর্ত্তব্য মনে হয়। আমরা কিন্তু ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার দ্বারা এখানে পূর্ব্বপক্ষবাদীর তাৎপর্য্য বুঝিতে পারি যে, দৃশ্যমান ঘটপটাদি পদার্থ সমস্তই ভূতমাত্র, অর্থাৎ পঞ্চভূত হইতে কোন ভিন্ন পদার্থ নহে। সুতরাং ঐ সমস্ত পদার্থই নিত্য। কারণ, নৈয়ায়িকগণ চতুর্ব্বিধ পরমাণু ও আকাশ, এই পঞ্চ ভূতকে নিত্য বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা ঘটপটাদি দ্রব্যকে ঐ পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন অতিরিক্ত দ্রব্য বলিলেও এখানে মহর্ষি গোতমের কথিত সর্ব্বনিত্যত্ববাদী তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে পরমাণু ও আকাশ হইতে কোন পৃথক্ দ্রব্যের উৎপত্তি হয় নাই, সমস্ত দ্রব্যই ঐ পঞ্চভূতাত্মক, এবং উহা ভিন্ন জগতে আর কোন পদার্থও নাই। সুতরাং তিনি পঞ্চভূত নিত্য বলিয়া পঞ্চভূত মূল সমস্ত পদার্থকেই নিত্য বলিতে পারেন। মহর্ষির পরবর্ত্তী সূত্রের দ্বারাও

পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের এইরূপই তাৎপর্য্য বুঝা যায়। সুধীগণ এখানে তাৎপর্য্যটীকাকারের কথার বিচার করিয়া পূর্ব্বপক্ষের তাৎপর্য্য নির্ণয় করিবেন। ভাষ্যকার এই সূত্রের অবতারণা করিতে পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বনিত্যত্ববাদকে অপর "একান্ত" বলিয়াছেন। যে বাদে কোন এক পক্ষে "অন্ত" অর্থাৎ নিয়ম আছে, তাহা "একান্তবাদ" নামে কথিত হইয়াছে। সকল পদার্থ নিত্যই, এইরূপে নিত্যত্ব পক্ষেই নিয়ম স্বীকৃত হওয়ায় সর্ব্বনিত্যত্ববাদকে "একান্তবাদ" বলা যায়। পূর্ব্বোক্তরূপ কারণে সর্ব্বানিত্যত্ববাদও "একান্তবাদ"। তাই ভাষ্যকার প্রথমে সর্ব্বানিত্যত্ববাদের উল্লেখ করায় পরে সর্ব্বনিত্যত্ববাদকে "অপর একান্ত" বলিয়াছেন। "একান্ত" শব্দের অর্থ এখানে একান্তবাদ। নিশ্চয়ার্থক "অন্ত" শব্দের দ্বারা নিয়ম অর্থ বিবক্ষিত হইয়া থাকে। "অন্ত" শব্দের ধর্ম্ম অর্থও অভিধানে পাওয়া যায়। ভাষ্যকারও ধর্ম্ম অর্থে "অন্ত" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। পরবর্ত্তী ৪১শ সূত্রের ভাষ্য-টিপ্পনী এবং ১ম খণ্ড, ৩৬০ ও ৩৬৩—৬৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ॥ ২৯ ॥

সূত্র। নোৎপত্তি-বিনাশকারণোপলব্ধেঃ ॥৩০॥৩৭৩॥

অনুবাদ। (উত্তর) না,—অর্থাৎ সকল পদার্থ নিত্য নহে,—কারণ, (ঘটাদি পদার্থের) উৎপত্তির কারণ ও বিনাশের কারণের উপলব্ধি হয়।

ভাষ্য। উৎপত্তিকারণঞ্চোপলভ্যতে, বিনাশকারণঞ্চ,—তৎ সর্ব্বনিত্যত্বে ব্যাহন্যত ইতি।

অনুবাদ। উৎপত্তির কারণও উপলব্ধ হয়, বিনাশের কারণও উপলব্ধ হয়, তাহা সকল পদার্থের নিত্যত্ব হইলে ব্যাহত হয়।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ব্বসূত্রোক্ত মতের খণ্ডন করিতে এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, অনেক পদার্থের যখন উৎপত্তি ও বিনাশের কারণ উপলব্ধ হইতেছে, তখন সেই সকল পদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকার করিতেই হইবে। তাহা হইলে আর সকল পদার্থই নিত্য, ইহা কিছুতেই বলা যায় না। কারণ, সকল পদার্থই নিত্য হইলে অনেক পদার্থের যে উৎপত্তি ও বিনাশের কারণ উপলব্ধ হয়, তাহা ব্যাহত হয়, অর্থাৎ সেই সকল পদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশের প্রত্যক্ষসিদ্ধ কারণের অপলাপ করিতে হয়। তাৎপর্য্যটীকাকার সিদ্ধান্তবাদী মহর্ষির তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, পার্থিবাদি চতুর্ব্বিধ পরমাণু ও আকাশ, এই পঞ্চভূত নিত্য হইলেও তজ্জনিত ঘটপটাদি সমস্ত (ভৌতিক) পদার্থ ঐ নিত্য পঞ্চভূত হইতে ভিন্ন পদার্থ, সুতরাং অনিত্য। ঘটপটাদি পদার্থকে ভিন্ন পদার্থ না বলিয়া পরমাণুসমষ্টি বলিলে উহাদিগের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না; কারণ, পরমাণু অতীন্দ্রিয়। সুতরাং ঘটপটাদি পদার্থ নিত্যপঞ্চভূতজনিত পৃথক্ অবয়বী, ইহা স্বীকার্য্য। মহর্ষি দ্বিতীয় অধ্যায়ে অবয়বিপ্রকরণে ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ঘটপটাদি দ্রব্য যখন পরমাণু হইতে ভিন্ন অবয়বী বলিয়া সিদ্ধ হইয়াছে এবং ঐ সমস্ত দ্রব্যের উৎপত্তি ও বিনাশের কারণেরও উপলব্ধি হইতেছে, তখন আর সকল পদার্থই নিত্য, ইহা বলা যায় না ॥ ৩০ ॥

সূত্র। তল্লক্ষণাবরোধাদপ্রতিষেধঃ ॥৩১॥৩৭৪॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) সেই ভূতের লক্ষণ দ্বারা অবরোধবশতঃ অর্থাৎ সকল পদার্থই পূর্ব্বোক্ত নিত্য পঞ্চ ভূতের লক্ষণাক্রান্ত, এ জন্য (পূর্ব্বসূত্রোক্ত) প্রতিষেধ (উত্তর) হয় না।

ভাষ্য। যস্যোৎপত্তিবিনাশকারণমুপলভ্যত ইতি মন্যসে, ন তদ্‌ভূতলক্ষণহীনমর্থান্তরং গৃহ্যতে, ভূতলক্ষণাবরোধাদ্ভূতমাত্রমিদমিত্যযুক্তোঽয়ং প্রতিষেধ ইতি।

অনুবাদ। যে পদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশের কারণ উপলব্ধ হয়, ইহা মনে করিতেছ, তাহা ভূতলক্ষণশূন্য পদার্থান্তর অর্থাৎ নিত্য ভূত হইতে পৃথক্ পদার্থ গৃহীত হয় না,—ভূতলক্ষণাক্রান্ততাবশতঃ ইহা অর্থাৎ দৃশ্যমান ঘটপটাদি দ্রব্য, ভূতমাত্র (নিত্যভূতাত্মক), এ জন্য এই প্রতিষেধ অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্রোক্ত উত্তর অযুক্ত।

টিপ্পনী। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা আবার পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথা বলিয়াছেন যে, ঘটপটাদি যে সকল দ্রব্যের উৎপত্তি ও বিনাশের কারণের উপলব্ধি হয় বলিয়া ঐ সকল দ্রব্যের অনিত্যত্ব সমর্থন করা হইতেছে, ঐ সকল দ্রব্যও মূল ভূতের লক্ষণাক্রান্ত, সুতরাং ঐ সকল দ্রব্যও বস্তুতঃ নিত্য ভূতমাত্র, উহারাও নিত্যভূত হইতে কোন ভিন্ন পদার্থ নহে। সুতরাং ঐ সকল দ্রব্যও বস্তুতঃ নিত্য হওয়ায় পূর্ব্বসূত্রোক্ত উত্তর অযুক্ত। পূর্ব্বপক্ষবাদীর তাৎপর্য্য এই যে, বহিরিন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রত্যক্ষযোগ্য বিশেষ গুণবত্তাই ভূতের লক্ষণ। ঐ লক্ষণ যেমন চতুর্ব্বিধ পরমাণু ও আকাশ, এই পঞ্চভূতে আছে, তদ্রূপ দৃশ্যমান ঘটপটাদি দ্রব্যেও আছে,—ঘটপটাদি দ্রব্যও ঐ ভূতলক্ষণাক্রান্ত। সুতরাং উহাও ভূত বলিয়াই গৃহীত হয়, ভূতলক্ষণশূন্য কোন পৃথক্ পদার্থ বলিয়া গৃহীত হয় না। অতএব বুঝা যায়, ঐ ঘটপটাদি দ্রব্যও পরমাণু ও আকাশ হইতে বস্তুতঃ ভিন্ন পদার্থ নহে। সুতরাং ঘটপদাদি দ্রব্যও নিত্য। অতএব পূর্ব্বসূত্রোক্ত যুক্তির দ্বারা ঘটপটাদি দ্রব্যের নিত্যত্ব প্রতিষেধ হইতে পারে না ॥ ৩১ ॥

সূত্র। নোৎপত্তি-তৎকারণোপলব্ধেঃ ॥৩২॥৩৭৫॥

অনুবাদ। (উত্তর) না, অর্থাৎ সকল পদার্থই নিত্য হইতে পারে না; কারণ, (ঘটপটাদি দ্রব্যের) উৎপত্তি ও তাহার কারণের উপলব্ধি হয়।

ভাষ্য। কারণসমানগুণস্যোৎপত্তিঃ কারণঞ্চোপলভ্যতে, ন চৈতদুভয়ং নিত্যবিষয়ং, ন চোৎপত্তি-তৎকারণোপলব্ধিঃ শক্যা প্রত্যাখ্যাতুং, ন চাবিষয়া

কাচিদুপলব্ধিঃ। উপলব্ধিসামর্থ্যাৎ কারণেন সমানগুণং কার্য্যমুৎপদ্যত ইত্যনুমীয়তে। স খলূপলব্ধের্বিষয় ইতি। এবঞ্চ তল্লক্ষণাবরোধোপপত্তিরিতি।

উৎপত্তিবিনাশকারণপ্রযুক্তস্য জ্ঞাতুঃ প্রযত্নো দৃষ্ট ইতি। **প্রসিদ্ধশ্চাবয়বী তদ্ধর্ম্মা,** উৎপত্তিবিনাশধর্ম্মা চাবয়বী সিদ্ধ ইতি। **শব্দ-কর্ম্ম-বুদ্ধ্যাদীনাঞ্চাব্যাপ্তিঃ,** "পঞ্চভূতনিত্যত্বাৎ" "তল্লক্ষণাবরোধা"চ্চৈত্যনেন শব্দ-কর্ম্ম-বুদ্ধি-সুখ-দুঃখেচ্ছা-দ্বেষ-প্রযত্নাশ্চ ন ব্যাপ্তাঃ, তস্মাদনৈকান্তঃ।

স্বপ্নবিষয়াভিমানবন্মিথ্যোপলব্ধিরিতি চেৎ? ভূতোপলব্ধৌ তুল্যং। যথা স্বপ্নে বিষয়াভিমান এবমুৎপত্তিবিনাশকারণাভিমান ইতি। এবঞ্চৈতদ্‌ভূতোপলব্ধৌ তুল্যং, পৃথিব্যাদ্যুপলব্ধিরপি স্বপ্নবিষয়াভিমানবৎ প্রসজ্যতে। **পৃথিব্যাদ্যভাবে সর্ব্বব্যবহারবিলোপ ইতি চেৎ? তদিতরত্র সমানং।** উৎপত্তিবিনাশকারণোপলব্ধিবিষয়স্যাপ্যভাবে সর্ব্বব্যবহারবিলোপ ইতি। সোঽয়ং নিত্যানামতীন্দ্রিয়ত্বাদবিষয়ত্বাচ্চোৎপত্তিবিনাশয়োঃ "স্বপ্নবিষয়াভিমানব"দিত্যহেতুরিতি।

অনুবাদ। কারণের সমানগুণের উৎপত্তি অর্থাৎ ঘটপটাদিদ্রব্যে উপাদানকারণস্থ বিশেষ গুণের সজাতীয় বিশেষ গুণের উৎপত্তি এবং কারণ উপলব্ধ হয়। এই উভয় অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত গুণোৎপত্তি ও কারণ, নিত্যবিষয়ক (নিত্যসম্বন্ধী) নহে। উৎপত্তি ও তাহার কারণের উপলব্ধি অস্বীকার করিতেও পারা যায় না। নির্ব্বিষয়ক কোন উপলব্ধিও নাই। উপলব্ধির সামর্থ্যবশতঃ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত গুণোৎপত্তি ও তাহার কারণের উপলব্ধির বলে উপাদান-কারণের সমানগুণবিশিষ্ট কার্য্য উৎপন্ন হয়, ইহা অনুমিত হয়। তাহাই উপলব্ধির বিষয় (অর্থাৎ "ইহা ঘট", "ইহা পট", ইত্যাদি প্রকারে যে প্রত্যক্ষাত্মক উপলব্ধি হইতেছে, তাহার বিষয় সেই কারণ-সমান-গুণবিশিষ্ট পৃথক্ জন্য দ্রব্য) এইরূপ হইলেও অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত জন্য দ্রব্য নিত্য ভূত হইতে উৎপন্ন পৃথক্ দ্রব্য হইলেও (উহাতে) সেই ভূতের লক্ষণাক্রান্ততার উপপত্তি হয়।

উৎপত্তি ও বিনাশের কারণ-প্রেরিত জ্ঞাতার (আত্মার) প্রযত্ন দৃষ্ট হয়। [অর্থাৎ ঘটপটাদি পদার্থের বাস্তব উৎপত্তি ও বিনাশ আছে বলিয়াই বিজ্ঞদিগের ঐ

উৎপত্তি ও বিনাশের কারণ বিষয়ে প্রবৃত্তি হইয়া থাকে ; অন্যথা উহা হইতে পারে না]। পরন্তু তদ্ধর্ম্মা অবয়বী প্রসিদ্ধ। বিশদার্থ এই যে, উৎপত্তি ও বিনাশরূপ ধর্ম্ম-বিশিষ্ট অবয়বী (ঘটপটাদি দ্রব্য) সিদ্ধ হইয়াছে, অর্থাৎ দ্বিতীয় অধ্যায়ে অবয়বি-প্রকরণে যুক্তির দ্বারা উহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। পরন্তু শব্দ, কর্ম্ম ও বুদ্ধি প্রভৃতিতে (হেতুর) অব্যাপ্তি। বিশদার্থ এই যে, পঞ্চভূতের নিত্যত্ব এবং ভূত-লক্ষণাক্রান্তত্ব, ইহার দ্বারা শব্দ, কর্ম্ম, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্ন প্রভৃতি ব্যাপ্ত নহে, অতএব (পূর্ব্বপক্ষবাদীর ঐ হেতু) অনেকান্ত। অর্থাৎ "সর্ব্বং নিত্যং" এই প্রতিজ্ঞায় ঐ হেতু অব্যাপক, উহা সমস্ত পক্ষব্যাপক নহে।

(পূর্ব্বপক্ষ) স্বপ্নে বিষয়-ভ্রমের ন্যায় মিথ্যা উপলব্ধি, ইহা যদি বল ? (উত্তর) ভূতের উপলব্ধিতে তুল্য। বিশদার্থ এই যে, যেমন স্বপ্নে বিষয়ের ভ্রম হয়, এইরূপ উৎপত্তি ও বিনাশের কারণের ভ্রম হয়, এইরূপ হইলে ইহা ভূতের উপলব্ধিতে তুল্য, (অর্থাৎ) পৃথিব্যাদির উপলব্ধিও স্বপ্নে বিষয়-ভ্রমের ন্যায় প্রসক্ত হয়। পৃথিব্যাদির অভাবে সকল ব্যবহারের বিলোপ হয়, ইহা যদি বল ? (উত্তর) তাহা অপর পক্ষেও সমান, (অর্থাৎ) উৎপত্তি ও বিনাশের কারণের উপলব্ধির বিষয়েরও অভাব হইলে অর্থাৎ উৎপত্তি ও বিনাশের উপলভ্যমান কারণেরও বাস্তব সত্তা না থাকিলে সকল ব্যবহারের বিলোপ হয়। নিত্যপদার্থসমূহের অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষবাদীর অভিমত পঞ্চ ভূত, চতুর্ব্বিধ পরমাণু ও আকাশের অতীন্দ্রিয়ত্ববশতঃ এবং উৎপত্তি ও বিনাশের অবিষয়ত্ববশতঃ সেই এই "স্বপ্নবিষয়াভিমানবৎ" এই দৃষ্টান্তবাক্য অহেতু অর্থাৎ উহা সাধক হয় না।

টিপ্পনী। পূর্ব্বোক্ত মতের অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করিতে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, ঘটপটাদি অনেক দ্রব্যেরই যখন উৎপত্তি ও তাহার কারণের উপলব্ধি হইতেছে, তখন সকল পদার্থই নিত্য, ইহা কিছুতেই বলা যায় না। ভাষ্যকার মহর্ষির এই সূত্রে বিশেষ যুক্তি ব্যক্ত করিতে সূত্রোক্ত "উৎপত্তি" শব্দের দ্বারা জন্য দ্রব্যে উপাদানকারণের সমান গুণের উৎপত্তি অর্থ গ্রহণ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, কারণের সমান গুণের উৎপত্তি ও কারণ উপলব্ধ হয়। উপলভ্যমান ঐ উৎপত্তি ও কারণ, এই উভয় নিত্যবিষয়ক নহে অর্থাৎ নিত্যপদার্থ উহার বিষয় (সম্বন্ধী) নহে। কারণ, নিত্যপদার্থের সম্বন্ধে উৎপত্তি ও কারণ কোনমতেই সম্ভব নহে। ভাষ্যে এখানে "বিষয়" শব্দের দ্বারা সম্বন্ধী বুঝিতে হইবে। পূর্ব্বোক্তরূপ উৎপত্তি ও তাহার কারণের যে উপলব্ধি হইতেছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না, অর্থাৎ উহা সকলেরই স্বীকার্য্য। ঐ উপলব্ধির কোন বিষয় নাই, ইহাও বলা যায় না। কারণ, বিষয়শূন্য কোন উপলব্ধি নাই। উপলব্ধি মাত্রেরই বিষয় আছে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত উপলব্ধির সামর্থ্যবশতঃ কারণের সমানগুণবিশিষ্ট পৃথক্ দ্রব্যই যে, উৎপন্ন

হয়, ইহা অনুমান দ্বারা সিদ্ধ হয়। তাহাই উপলব্ধির বিষয় হয়। পৃথক্ দ্রব্য উৎপন্ন না হইলে ঐরূপ উপলব্ধি হইতে পারে না। কারণ, ঘটপটাদি যে সকল দ্রব্য উপলব্ধ হইতেছে, তাহা ঐ সকল দ্রব্যের কারণের বিশেষ গুণ রূপাদির সজাতীয়বিশেষগুণবিশিষ্ট, ইহাই দেখা যায়। রক্তসূত্র দ্বারা নির্ম্মিত বস্ত্রই রক্তবর্ণ হইয়া থাকে। নীলসূত্র দ্বারা নির্ম্মিত বস্ত্র রক্তবর্ণ হয় না। সুতরাং সর্ব্বত্রই উপাদানকারণের রূপাদি বিশেষ গুণই কার্য্যদ্রব্যে সজাতীয় বিশেষ গুণের উৎপাদক, ইহা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে ঘটপটাদি দ্রব্যের যে, উপাদান-কারণ আছে, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। নচেৎ ঐ সকল দ্রব্যে রূপাদি বিশেষগুণের উপলব্ধি হইতে পারে না। ভাষ্যকার শেষে মহর্ষির মূল তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়াছেন যে, এইরূপ হইলেও ভূতলক্ষণাক্রান্ততার উপপত্তি হয়। অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষবাদী যে, ঘটপটাদিজন্য দ্রব্যকেও ভূতলক্ষণাক্রান্তত্ববশতঃ নিত্যভূতাত্মক বলিয়াছেন, তাহা অযৌক্তিক। কারণ, ঘটপটাদি দ্রব্য নিত্যভূত হইতে উৎপন্ন পৃথক্ দ্রব্য হইলেও ভূতলক্ষণাক্রান্ত হইতে পারে। ভূতলক্ষণাক্রান্ত হইলেই যে, তাহা নিত্যভূত হইতে অভিন্ন হইবে, এ বিষয়ে কোন যুক্তি নাই। ভূতজন্য বা ভৌতিক পদার্থ সমস্তও ভূত, তাহাতেও ভূতত্ব বা ভূতলক্ষণ আছে। সুতরাং পূর্ব্বসূত্রোক্ত যুক্তির দ্বারা ভূতভৌতিক সমস্ত পদার্থের নিত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। পরন্তু ঘটপটাদি জন্য দ্রব্যের উৎপত্তি ও উহার কারণের উপলব্ধি হওয়ায় ঐ সমস্ত দ্রব্য যে অনিত্য, ইহাই সিদ্ধ হয়।

ভাষ্যকার সূত্রোক্ত যুক্তির ব্যাখ্যা করিয়া শেষে পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বনিত্যত্ব মত খণ্ডন করিতে নিজে বলিয়াছেন যে, উৎপত্তি ও বিনাশের কারণ দ্বারা প্রেরিত আত্মার তদ্‌বিষয়ে প্রযত্ন দৃষ্ট হয়। তাৎপর্য্য এই যে, ঘটাদি দ্রব্যের উৎপত্তি ও বিনাশ বাস্তব পদার্থ, উহার কারণও বাস্তব পদার্থ। নচেৎ ঘটাদি দ্রব্যের উৎপাদন ও বিনাশ করিবার জন্য উহার কারণকে আশ্রয় করিবে কেন? বিজ্ঞ ব্যক্তিরাও যখন ঘটাদি দ্রব্যের উৎপাদন ও বিনাশ করিতে উহার কারণ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছেন, তখন ঐ সকল দ্রব্যের বাস্তব উৎপত্তি ও বাস্তব বিনাশ অবশ্য আছে। তাহা হইলে ঐ সকল দ্রব্যের অনিত্যত্বই অবশ্য স্বীকার্য্য। পরন্তু উৎপত্তি ও বিনাশরূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট অবয়বী সিদ্ধ পদার্থ; দ্বিতীয় অধ্যায়ে অবয়বিপ্রকরণে যুক্তির দ্বারা উহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। সুতরাং ঘটাদি দ্রব্য যে, পরমাণুসমষ্টি নহে, উহা পৃথক্ অবয়বী, ইহা সিদ্ধ হওয়ায় ঐ সকল দ্রব্যের নিত্যত্ব কিছুতেই সিদ্ধ হইতে পারে না। ভাষ্যকার শেষে চরম দোষ বলিয়াছেন যে, "পঞ্চভূতনিত্যত্বাৎ" এবং "তল্লক্ষণাবরোধাৎ" এই দুই হেতুবাক্যের দ্বারা সকল পদার্থ নিত্য, ইহা বলাও যাইতে পারে না। কারণ, শব্দ, কর্ম্ম, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্ন, এই সমস্ত গুণ-পদার্থে এবং ঐরূপ আরও অনেক অভৌতিক পদার্থে ভূতত্ব বা ভূতলক্ষণ নাই; কারণ, ঐ সমস্ত পদার্থ ভূতই নহে। সুতরাং পঞ্চভূতের নিত্যত্ব ও ভূতলক্ষণাক্রান্তত্ববশতঃ ঐ সমস্ত পদার্থকে নিত্য বলা যায় না। পঞ্চভূতাত্মকত্ব বা ভূতলক্ষণাক্রান্তত্ব ঐ সমস্ত পদার্থে না থাকায় ঐ হেতু অনেকান্ত অর্থাৎ অব্যাপক। ভাষ্যে "অনেকান্ত" বলিতে এখানে ব্যভিচারী নহে। কিন্তু পূর্ব্বপক্ষবাদীর হেতু তাঁহার কথিত সমস্ত পক্ষে না থাকায় উহা অনেকান্ত অর্থাৎ সমস্ত পক্ষব্যাপক নহে। উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে,

ঐ হেতুর অন্বয়ে অর্থাৎ সত্তা ও অসত্তায় পক্ষের অবস্থানবশতঃ ঐ হেতু অনৈকান্ত। তাৎপর্য্য এই যে, "সর্ব্বং নিত্যং" এই প্রতিজ্ঞায় সমস্ত পদার্থই পক্ষ। কিন্তু সমস্ত পদার্থেই পঞ্চভূতাত্মকত্ব বা ভূতলক্ষণান্তত্বরূপ হেতু নাই। যেখানে (ঘটাদিদ্রব্যে) আছে, তাহাও পক্ষের অন্তর্গত, যেখানে (শব্দ, বুদ্ধি, কর্ম্ম প্রভৃতিতে) নাই, তাহাও পক্ষের অন্তর্গত। সুতরাং ঐ হেতু সমস্ত পক্ষ-ব্যাপক না হওয়ায় উহা "অনৈকান্ত"। ভাষ্যে "প্রযত্নশ্চ" এই স্থলে "চ" শব্দের দ্বারা ঐরূপ অন্যান্য অভৌতিক পদার্থেরও সমুচ্চয় বুঝিতে হইবে। এবং "শব্দ-কর্ম্ম-বুদ্ধ্যাদীনাং" এই স্থলে সপ্তমী বিভক্তির অর্থে ষষ্ঠী বিভক্তি বুঝিতে হইবে।

মহর্ষি সর্ব্বনিত্যত্ববাদ খণ্ডন করিতে উৎপত্তি ও বিনাশের কারণের যে উপলব্ধি বলিয়াছেন, উহা যথার্থ উপলব্ধি হইলে উৎপত্তি ও বিনাশকে বাস্তব পদার্থ বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে উৎপত্তি-বিনাশবিশিষ্ট ঘটপটাদি পদার্থ যে অনিত্য, ইহাও অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, উৎপত্তি ও বিনাশের কারণের যে উপলব্ধি হয়, উহা মিথ্যা অর্থাৎ ভ্রমাত্মক উপলব্ধি। বস্তুতঃ উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই, সুতরাং তাহার কারণও নাই। স্বপ্নে যেমন অনেক বিষয়ের উপলব্ধি হয়, কিন্তু বস্তুতঃ সেই সমস্ত বিষয় নাই, এ জন্য ঐ উপলব্ধিকে ভ্রমই বলা হয়, তদ্রূপ উৎপত্তি ও বিনাশের কারণ বস্তুতঃ না থাকিলেও উহার ভ্রমাত্মক উপলব্ধি হইয়া থাকে। তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত উৎপত্তি ও বিনাশের কারণের বাস্তব সত্তা না থাকায় ঘটপটাদি পদার্থের অনিত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। ভাষ্যকার শেষে এই কথারও উল্লেখপূর্ব্বক ইহার উত্তরে বলিয়াছেন যে, এইরূপ বলিলে ইহা ভূতের উপলব্ধিতেও তুল্য। অর্থাৎ ঐরূপ বলিলে পৃথিব্যাদি মূল ভূতের যে উপলব্ধি হইতেছে, উহাও স্বপ্নে বিষয়োপলব্ধির ন্যায় ভ্রম বলা যাইতে পারে। নিষ্প্রমাণে যদি ঘটপটাদি দ্রব্যের উৎপত্তি ও বিনাশের কারণবিষয়ক সার্ব্বজনীন উপলব্ধিকে ভ্রম বলা যায়, তাহা হইলে ঘটপটাদি দ্রব্যের যে প্রত্যক্ষাত্মক উপলব্ধি হইতেছে, উহাও ভ্রম বলিতে পারি। তাহা হইলে ঐ ঘটপটাদি দ্রব্যের সত্তাই অসিদ্ধ হওয়ায় উহাতে নিত্যত্ব সাধন হইতে পারে না। যদি বল, পৃথিব্যাদি ভূতের সত্তা না থাকিলে সকল-লোকব্যবহার বিলুপ্ত হয়; এ জন্য উহার সত্তা অবশ্য স্বীকার্য্য। সুতরাং উহার উপলব্ধিকে ভ্রম বলা যায় না। কিন্তু ইহা অপর পক্ষেও সমান। অর্থাৎ ঘটপটাদি দ্রব্যের উৎপত্তি ও বিনাশের কারণের যে উপলব্ধি হইতেছে, ঐ উপলব্ধি ভ্রম হইলে ঐ ভ্রমাত্মক উপলব্ধির বিষয় যে উৎপত্তি ও বিনাশের কারণ, তাহারও অভাব হওয়ায় অর্থাৎ তাহারও বাস্তব সত্তা না থাকায় সকল-লোকব্যবহারের লোপ হয়। ঘটপটাদি পদার্থের উৎপাদন ও বিনাশের কারণ অবলম্বন করিয়া জগতে যে ব্যবহার চলিতেছে, তাহার উচ্ছেদ হয়। কারণ, ঘটপটাদি পদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশের কোন বাস্তব কারণ নাই। সুতরাং লোকব্যবহারের উচ্ছেদ যখন পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতেও তুল্য, তখন তিনি ঐ দোষ বলিতে পারেন না। তিনি নিষ্প্রমাণে ঘটপটাদি পদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশের কারণবিষয়ক উপলব্ধিকে ভ্রম বলিলে ঘটপটাদি পদার্থের প্রত্যক্ষাত্মক উপলব্ধিকেও ভ্রম বলা যাইতে পারে। ভাষ্যকার শেষে পূর্ব্বোক্ত সমাধানে চরম দোষ বলিয়াছেন যে, "স্বপ্নবিষয়াভিমানবৎ" এই দৃষ্টান্ত-বাক্যের দ্বারা উৎপত্তি ও

বিনাশের কারণের উপলব্ধিকে ভ্রম বলিয়া প্রতিপন্ন করা যায় না। ঐ বাক্য বা ঐ দৃষ্টান্ত পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতানুসারে তাঁহার সাধ্যসাধকই হইতে পারে না। কারণ, তাঁহার মতে ঘটপটাদি দ্রব্য পরমাণু ও আকাশ, এই পঞ্চভূতের সমষ্টিরূপ নিত্য। সুতরাং ঐ সমস্ত দ্রব্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে পারে না। পরমাণুর ও আকাশের অতীন্দ্রিয়ত্ববশতঃ তৎস্বরূপ ঐ সকল পদার্থও অতীন্দ্রিয় হইবে। এবং তাঁহার মতে ঐ সকল পদার্থের নিত্যত্ববশতঃ উৎপত্তি ও বিনাশ নাই। তিনি কোন পদার্থেরই বাস্তব উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকার করেন না। সুতরাং তাঁহার মতে কুত্রাপি উৎপত্তি ও বিনাশ-বিষয়ক যথার্থ বুদ্ধি জন্মে না। তাহা হইলে কোন স্থলে উৎপত্তি ও বিনাশবিষয়ক ভ্রম-বুদ্ধিও হইতে পারে না। কারণ, যে বিষয়ে কোন স্থলে যথার্থ-বুদ্ধি জন্মে না, সে বিষয়ে ভ্রমাত্মক বুদ্ধি হইতেই পারে না। ভাষ্যকার দ্বিতীয় অধ্যায়ে (১ম আঃ, ৩৭শ সূত্রের ভাষ্যে) ইহা সমর্থন করিয়াছেন। পরন্তু যে বিষয়ের সত্তাই নাই, তদ্বিষয়ে ভ্রমবুদ্ধিও হইতে পারে না। স্বপ্নে যে সকল বিষয়ের উপলব্ধি হয়, সেই সকল বিষয় একেবারে অসৎ বা অলীক নহে। অন্যত্র তাহার সত্তা আছে। সুতরাং স্বপ্নে তাহার ভ্রম উপলব্ধি হইতে পারে। কিন্তু পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতে ঘটপটাদি পদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশ একেবারেই অসৎ অর্থাৎ অলীক। সুতরাং উহার ভ্রম উপলব্ধিও হইতে পারে না। এবং তাঁহার মতে ঘটপটাদি দ্রব্যের প্রত্যক্ষও অসম্ভব। কারণ, ঐ সমস্ত পদার্থ পরমাণু ও আকাশ, এই পঞ্চ ভূতমাত্র। ঘটপটাদি দ্রব্যের প্রত্যক্ষ না হইলে তাহাতে উৎপত্তি ও বিনাশের ভ্রম প্রত্যক্ষও হইতে পারে না। সুতরাং "স্বপ্নবিষয়াভিমানবৎ" এই দৃষ্টান্তবাক্য বা ঐ দৃষ্টান্ত সাধ্যসাধক হইতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বনিত্যত্ববাদের সর্ব্বথা অনুপপত্তি প্রদর্শন করিতে উদ্দ্যোতকর ইহাও বলিয়াছেন যে, সকল পদার্থ ই নিত্য হইলে "সর্ব্বং নিত্যং" এই বাক্য-প্রয়োগই ব্যাহত হয়। কারণ, ঐ বাক্যের দ্বারা যদি পূর্ব্বপক্ষবাদী অপরের সকল পদার্থের নিত্যত্ববিষয়ক জ্ঞান উৎপন্ন করিতে চাহেন, তাহা হইলে ঐ বাক্যজন্য সেই জ্ঞানকেই ত তিনি অনিত্য বলিয়া স্বীকার করিলেন। তাহা হইলে আর "সকল পদার্থ ই নিত্য," ইহা বলিতে পারেন না; আর যদি তাঁহার ঐ বাক্যকে তিনি সাধ্যের সাধক না বলিয়া সিদ্ধের নিবর্ত্তক বলেন, তাহা হইলে সেই সিদ্ধ পদার্থের নিবৃত্তি হইতে পারে না। কারণ, তাঁহার মতে সেই সিদ্ধ পদার্থও নিত্য। নিত্য পদার্থের নিবৃত্তি হয় না। তিরোভাব হয় বলিলেও অপূর্ব্ব বস্তুর উৎপত্তি ও পূর্ব্ববস্তুর বিনাশ অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। পরে ইহা পরিস্ফুট হইবে॥ ৩২॥

ভাষ্য। অবস্থিতস্যোপাদানস্য ধর্ম্মমাত্রং নিবর্ত্ততে, ধর্ম্মমাত্রমুপজায়তে স খলূৎপত্তিবিনাশয়োর্বিষয়ঃ। যচ্চোপজায়তে, তৎ প্রাগপ্যুপজননাদস্তি, যচ্চ নিবর্ত্ততে, তন্নিবৃত্তমপ্যস্তীতি। এবঞ্চ সর্ব্বস্য নিত্যত্বমিতি।

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) অবস্থিত অর্থাৎ সর্ব্বদা বিদ্যমান উপাদানের ধর্ম্মমাত্র নিবৃত্ত হয়, ধর্ম্মমাত্র উৎপন্ন হয়, তাহাই অর্থাৎ সেই ধর্ম্মদ্বয়ই (যথাক্রমে) উৎপত্তি ও বিনাশের বিষয়। কিন্তু যাহা অর্থাৎ যে ধর্ম্ম মাত্র উৎপন্ন হয়, তাহা উৎপত্তির পূর্ব্বেও

(ধর্ম্মিরূপে) থাকে, এবং যে ধর্ম্ম মাত্র নিবৃত্ত হয়, তাহা নিবৃত্ত হইয়াও (ধর্ম্মিরূপে) থাকে। এইরূপ হইলেই সকল পদার্থের নিত্যত্ব হয়।

সূত্র। ন ব্যবস্থানুপপত্তেঃ ॥৩৩॥৩৭৩॥

অনুবাদ। (উত্তর) না, অর্থাৎ কোনরূপেই সকল পদার্থের নিত্যত্ব সিদ্ধ হয় না, কারণ, (ঐ মতে) ব্যবস্থার উপপত্তি হয় না।

ভাষ্য। অয়মুপজন ইয়ং নিবৃত্তিরিতি ব্যবস্থা নোপপদ্যতে, উপজাতনিবৃত্তয়োর্ব্বিদ্যমানত্বাৎ। অয়ং ধর্ম্ম উপজাতোঽয়ং নিবৃত্ত ইতি সদ্ভাবাবিশেষাদব্যবস্থা। ইদানীমুপজননিবৃত্তী, নেদানীমিতি কালব্যবস্থা নোপপদ্যতে, সর্ব্বদা বিদ্যমানত্বাৎ। অস্য ধর্ম্মস্যোপজননিবৃত্তী, নাস্যেতি ব্যবস্থানুপপত্তিঃ, উভয়োরবিশেষাৎ। অনাগতোঽতীত ইতি চ কাল-ব্যবস্থানুপপত্তিঃ, বর্ত্তমানস্য সদ্ভাবলক্ষণত্বাৎ। অবিদ্যমানস্যাত্মলাভ উপজনো বিদ্যমানস্যাত্মহানং নিবৃত্তিরিত্যেতস্মিন্ সতি নৈতে দোষাঃ। তস্মাদ্যদুক্তং প্রাগুপজননাদস্তি,—নিবৃত্তশ্চাস্তি, তদযুক্তমিতি।

অনুবাদ। "ইহা উৎপত্তি","ইহা নিবৃত্তি" (বিনাশ), এই ব্যবস্থা উপপন্ন হয় না। কারণ, (পূর্ব্বোক্ত মতে) উৎপন্ন ও বিনষ্টের বিদ্যমানত্ব আছে। এই ধর্ম্ম উৎপন্ন, এই ধর্ম্ম বিনষ্ট, ইহা হইলে অর্থাৎ কোন ধর্ম্মমাত্রই উৎপন্ন হয়, এবং কোন ধর্ম্ম-মাত্রই বিনষ্ট হয়, ধর্ম্মী সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকে, ইহা বলিলে সত্তার বিশেষ না থাকায় ব্যবস্থা হয় না। পরন্তু ইদানীং উৎপত্তি ও বিনাশ, ইদানীং নহে, এই কালব্যবস্থা উপপন্ন হয় না। কারণ, (ধর্ম্মী) সর্ব্বদাই বিদ্যমান আছে। এবং এই ধর্ম্মের উৎপত্তি ও বিনাশ, এই ধর্ম্মের নহে, এইরূপ ব্যবস্থার উপপত্তি হয় না ; কারণ, উভয় ধর্ম্মের বিশেষ নাই (অর্থাৎ উৎপন্ন ও বিনষ্ট, উভয় ধর্ম্মই যখন সর্ব্বদা বিদ্যমান, তখন পূর্ব্বোক্তরূপ ব্যবস্থা উপপন্ন হইতে পারে না)। অনাগত অর্থাৎ ভবিষ্যৎ এবং অতীত, এইরূপে কালব্যবস্থার উপপত্তি হয় না। কারণ, বর্ত্তমান সদ্ভাবলক্ষণ, [অর্থাৎ সদ্ভাব বা সত্তাই বর্ত্তমানের লক্ষণ। পূর্ব্বোক্ত মতে সকল পদার্থেরই সর্ব্বদা সত্তাবশতঃ সকল পদার্থই বর্ত্তমান, সুতরাং কোন পদার্থেই অতীতত্ব ও ভবিষ্যত্ব না থাকায় ইহা অতীত, ইহা ভবিষ্যৎ, এইরূপে যে, কালব্যবস্থা, তাহা

হইতে পারে না] কিন্তু অবিদ্যমান পদার্থের আত্মলাভ অর্থাৎ যাহা পূর্ব্বে ছিল না, তাহার স্বরূপলাভ উৎপত্তি, বিদ্যমান পদার্থের আত্মহান (স্বরূপত্যাগ) নিবৃত্তি অর্থাৎ বিনাশ, ইহা হইলে অর্থাৎ আমাদিগের সম্মত অসৎকার্য্যবাদ স্বীকার করিলে এই সমস্ত (পূর্ব্বোক্ত) দোষ হয় না। অতএব যে বলা হইয়াছে, উৎপত্তির পূর্ব্বেও আছে এবং বিনষ্ট হইয়াও আছে, তাহা অযুক্ত।

টিপ্পনী। মহর্ষি এই প্রকরণে শেষে আবার এই সূত্রের দ্বারা কোনরূপেই যে, সর্ব্বনিত্যত্ববাদ সিদ্ধ হইতে পারে না, ইহা বলিয়াছেন। তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বে সাংখ্যমত খণ্ডন করিয়া, এখন এই সূত্রের দ্বারা পাতঞ্জল সিদ্ধান্তানুসারেও সর্ব্বনিত্যত্ববাদ খণ্ডিত হইয়াছে। কিন্তু ভাষ্যকার পূর্ব্বে যেরূপে পূর্ব্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহার মতে পূর্ব্বে যে, সাংখ্যমতই খণ্ডিত হইয়াছে, ইহা আমরা বুঝিতে পারি না। তবে এই সূত্রের অবতারণা করিতে ভাষ্যকার যে মতের উল্লেখ করিয়াছেন, উহা পাতঞ্জল সিদ্ধান্ত বুঝিতে পারা যায়। পাতঞ্জল-মতে সমস্ত ধর্ম্মীরই পরিণাম ত্রিবিধ—(১) ধর্ম্মপরিণাম, (২) লক্ষণ-পরিণাম, (৩) অবস্থা-পরিণাম। (পাতঞ্জলদর্শন, বিভূতিপাদ, ১৩শ সূত্র ও ব্যাসভাষ্য দ্রষ্টব্য)। সুবর্ণের পরিণাম বা বিকার কুণ্ডলাদি অলঙ্কার, উহা মূল সুবর্ণ হইতে বস্তুতঃ কোন পৃথক্ পদার্থ নহে। কুণ্ডলাদি ঐ সুবর্ণেরই ধর্ম্মবিশেষ, সুতরাং সুবর্ণের ঐ কুণ্ডলাদি পরিণাম "ধর্ম্মপরিণাম"। ঐ সুবর্ণের অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান-ভাব অথবা উহাতে ঐরূপ এক লক্ষণের তিরোভাবের পরে অন্য লক্ষণের আবির্ভাব হইলে উহা তাহার "লক্ষণ-পরিণাম"। এবং ঐ সুবর্ণের নূতন অবস্থা, পুরাতন অবস্থা প্রভৃতি উহার "অবস্থাপরিণাম"। তাৎপর্য্যটীকাকার পাতঞ্জল সিদ্ধান্তরূপে বলিয়াছেন যে, ধর্ম্মীর এই ত্রিবিধ পরিণাম। কিন্তু ঐ ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা, মূল ধর্ম্মী হইতে ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে। ধর্ম্মী সর্ব্বদাই বিদ্যমান থাকায় নিত্য, সুতরাং ধর্ম্মী হইতে অভিন্ন ঐ ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থাও ধর্ম্মিরূপে নিত্য। কিন্তু ধর্ম্মী হইতে সেই ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থার কথঞ্চিৎ ভেদও থাকায় উহাদিগের উৎপত্তি ও বিনাশও উপপন্ন হয়। ভাষ্যকার এই মতের সংক্ষেপে বর্ণন করিতে বলিয়াছেন যে, ধর্ম্মী পূর্ব্বাপরকালে অবস্থিতই থাকে, উহাই কার্য্যের উপাদান, উহার উৎপত্তিও হয় না, বিনাশও হয় না। কিন্তু উহার কোন ধর্ম্মমাত্রেরই বিনাশ হয় এবং ধর্ম্মমাত্রেরই উৎপত্তি হয়। তাহা হইলেও ত সেই ধর্ম্মের অনিত্যত্বই স্বীকার করিতে হইবে, যাহার উৎপত্তি এবং যাহার বিনাশ হইবে, তাহাকে ত নিত্য বলা যাইবে না। সুতরাং এই মতেও সর্ব্ব-নিত্যত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইবে? তাই ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, এই মতে যে ধর্ম্মমাত্রের উৎপত্তি হয়, তাহা উৎপত্তির পূর্ব্বেও ধর্ম্মিরূপে থাকে এবং যে ধর্ম্মের নিবৃত্তি হয়, তাহা নিবৃত্ত হইয়াও ধর্ম্মিরূপে থাকে। কারণ, সেই ধর্ম্মী হইতে সেই উৎপন্ন ও বিনষ্ট ধর্ম্ম স্বরূপতঃ অভিন্ন। সেই ধর্ম্মীর সর্ব্বদা বিদ্যমানত্ববশতঃ তদ্রূপে তাহার ধর্ম্মও সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকে। সর্ব্বদা বিদ্যমানত্বই নিত্যত্ব। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত মতে সকল পদার্থেরই নিত্যত্ব সিদ্ধ হয়। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত মত খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, কোন মতেই সর্ব্বনিত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, ব্যবস্থার

উপপত্তি হয় না। অর্থাৎ অবিদ্যমান পদার্থের উৎপত্তি ও বিদ্যমান পদার্থের অত্যন্ত বিনাশ স্বীকার না করিলে উৎপত্তি ও বিনাশের যে সমস্ত ব্যবস্থা অর্থাৎ নিয়ম আছে, তাহার কোন ব্যবস্থারই উপপত্তি হয় না। ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত পাতঞ্জল সিদ্ধান্তানুসারে মহর্ষিসূত্রোক্ত ব্যবস্থার অনুপপত্তি বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, ইহা উৎপত্তি, ইহা বিনাশ, এইরূপ যে ব্যবস্থা আছে, তাহা পূর্ব্বোক্ত মতে উপপন্ন হয় না। কারণ, পূর্ব্বোক্ত মতে যাহা উৎপন্ন হয়, এবং যাহা বিনষ্ট হয়, এই উভয়ই ধর্ম্মিরূপে সর্ব্বদা বিদ্যমান। এই ধর্ম্ম উৎপন্ন, এই ধর্ম্ম বিনষ্ট, এইরূপে ধর্ম্মবিশেষের উৎপত্তি ও বিনাশের স্বরূপতঃ যে ব্যবস্থা আছে, অর্থাৎ যে ধর্ম্মটি উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার উৎপত্তিই হইয়াছে, বিনাশ হয় নাই, তাহার তখন অস্তিত্ব আছে এবং যে ধর্ম্মটি বিনষ্ট হইয়াছে, তাহার বিনাশই হইয়াছে, তাহার তখন অস্তিত্ব নাই, এইরূপ যে ব্যবস্থা বা নিয়ম সর্ব্বজনসিদ্ধ, তাহা পূর্ব্বোক্ত মতে উপপন্ন হয় না। কারণ, পূর্ব্বোক্ত মতে উৎপন্ন ও বিনষ্ট ধর্ম্মের সদ্ভাব অর্থাৎ সত্তার কোন বিশেষ নাই। উৎপন্ন ধর্ম্মটিও যেমন পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান থাকে, বিনষ্ট ধর্ম্মটিও তদ্রূপ বিদ্যমান থাকে, উহার অত্যন্তবিনাশ হয় না। বিনাশের পরেও উহা ধর্ম্মিরূপে বিদ্যমান থাকে। সুতরাং ইহা আছে এবং ইহা নাই, এইরূপ কথাই পূর্ব্বোক্ত মতে যখন বলা যায় না, তখন ইহা উৎপন্ন ও ইহা বিনষ্ট, এইরূপে উৎপত্তি ও বিনাশের ব্যবস্থা ঐ মতে উপপন্ন হইতে পারে না। পরন্তু ইদানীং উৎপত্তি হইয়াছে, ইদানীং বিনাশ হইয়াছে, ইদানীং উৎপত্তি ও বিনাশ হয় নাই, এইরূপে উৎপত্তি ও বিনাশের যে কালব্যবস্থা আছে, তাহাও পূর্ব্বোক্ত মতে উপপন্ন হয় না। কারণ, যে ধর্ম্মের উৎপত্তি ও বিনাশ স্বীকার করিবে, তাহা সর্ব্বদাই বিদ্যমান আছে। পূর্ব্বোক্ত মতে যখন সকল পদার্থই সর্ব্বদাই বিদ্যমান, তখন ইদানীং আছে, ইদানীং নাই, এইরূপ কথাই ঐ মতে বলা যায় না। সুতরাং ঐ মতে উৎপত্তি ও বিনাশের কালিক ব্যবস্থাও কোনরূপেই উপপন্ন হয় না। পরন্তু এই ধর্ম্মের উৎপত্তি, এই ধর্ম্মের বিনাশ, এই ধর্ম্মের উৎপত্তি ও বিনাশ নহে, এইরূপ যে ব্যবস্থা আছে, তাহাও পূর্ব্বোক্ত মতে উপপন্ন হয় না। কারণ, যে ধর্ম্মের উৎপত্তি ও যে ধর্ম্মের বিনাশ হয়, এই উভয় ধর্ম্মের কোন বিশেষ নাই। পূর্ব্বোক্ত মতে ঐ উভয় ধর্ম্মই সর্ব্বদা বিদ্যমান। পরন্তু এই ধর্ম্ম অনাগত (ভাবী), এই ধর্ম্ম অতীত, এইরূপ যে, কালব্যবস্থা আছে, তাহাও পূর্ব্বোক্ত মতে উপপন্ন হয় না। কারণ, পূর্ব্বোক্ত মতে সকল ধর্ম্মই সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকায় সকল ধর্ম্মই বর্ত্তমান। যাহা বর্ত্তমান, তাহাকে ভাবী ও অতীত বলা যায় না। ফল কথা, উৎপত্তি ও বিনাশের সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থাই পূর্ব্বোক্ত মতে উপপন্ন না হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত মত গ্রহণ করা যায় না। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত মতানুসারেও সর্ব্বনিত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত মতে সূত্রোক্ত "ব্যবস্থার" অনুপপত্তির ব্যাখ্যা করিয়া শেষে বলিয়াছেন যে, উৎপত্তির পূর্ব্বে যে পদার্থ থাকে না, তাহার কারণজন্য আত্মলাভই উৎপত্তি, এবং পরে সেই পদার্থের আত্মত্যাগ অর্থাৎ অত্যন্ত বিনাশই নিবৃত্তি, এই মতে অর্থাৎ আমাদিগের অভিমত অসৎকার্য্যবাদ স্বীকার করিলে পূর্ব্বোক্ত কোন দোষই হয় না, পূর্ব্বোক্ত কোন ব্যবস্থারই অনুপপত্তি হয় না। অতএব উৎপত্তির পূর্ব্বেও সেই পদার্থ থাকে এবং বিনষ্ট হইয়াও সেই পদার্থ থাকে, এই মত

অযুক্ত। কারণ, ঐ মতে পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বজনসিদ্ধ কোন ব্যবস্থাই উপপন্ন হয় না। পরবর্ত্তী ৪৯শ সূত্রের ভাষ্য-টিপ্পনীতে ন্যায়দর্শনসম্মত অসৎকার্য্যবাদ-সমর্থনে পূর্ব্বোক্ত মতের বিশেষ আলোচনা দ্রষ্টব্য। তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে সূত্রোক্ত "ব্যবস্থার" অনুপপত্তির ব্যাখ্যা করিয়া গূঢ় তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, ধর্ম্মীর ধর্ম্ম, লক্ষণ ও অবস্থা, ঐ ধর্ম্মী হইতে ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে, ইহা কিছুতেই বলা যায় না। একাধারে ঐরূপে ভেদ ও অভেদ থাকিতেই পারে না। তাহা হইলে উৎপত্তি ও বিনাশের কোনরূপ ব্যবস্থা উপপন্ন হয় না। সুতরাং ঐ ব্যবস্থার উপপত্তির জন্য ধর্ম্মী হইতে তাহার "ধর্ম্ম", "লক্ষণ" ও "অবস্থার" ভেদ অবশ্য স্বীকার্য্য হইলে উহাদিগের অনিত্যত্ব অবশ্য স্বীকার করিতেই হইবে। এ বিষয়ে উদ্দ্যোতকর প্রভৃতির অন্যান্য কথা পরে কথিত হইবে॥ ৩৩॥

সর্ব্বনিত্যত্ব-নিরাকরণ-প্রকরণ সমাপ্ত॥ ৮॥

ভাষ্য। অয়মন্য একান্তঃ—

অনুবাদ। ইহা অপর একান্তবাদ—

সূত্র। সর্ব্বং পৃথক্ ভাবলক্ষণপৃথক্ত্বাৎ ॥৩৪॥৩৭৭॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) সমস্ত পদার্থই পৃথক্ অর্থাৎ নানা; কারণ, ভাবের লক্ষণের অর্থাৎ পদার্থের সংজ্ঞাশব্দের পৃথক্ত্ব (সমূহবাচকত্ব) আছে।

ভাষ্য। সর্ব্বং নানা, ন কশ্চিদেকো ভাবো বিদ্যতে, কস্মাৎ? **ভাবলক্ষণপৃথক্ত্বাৎ**, ভাবস্য লক্ষণমভিধানং, যেন লক্ষ্যতে ভাবঃ, স সমাখ্যাশব্দঃ, তস্য পৃথগ্বিষয়ত্বাৎ। সর্ব্বো ভাবসমাখ্যাশব্দঃ সমূহবাচী। "কুম্ভ" ইতি সংজ্ঞাশব্দো গন্ধ-রস-রূপ-স্পর্শসমূহে বুধ্নপার্শ্বগ্রীবাদি-সমূহে চ বর্ত্ততে, নিদর্শনমাত্রঞ্চেদমিতি।

অনুবাদ। সমস্ত পদার্থই নানা, এক কোন ভাব (পদার্থ) নাই। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) যেহেতু ভাবের লক্ষণের পৃথক্ত্ব আছে। বিশদার্থ এই যে, ভাবের (পদার্থের) লক্ষণ বলিতে অভিধান, (শব্দ), যদ্দ্বারা ভাব লক্ষিত হয়, তাহা সংজ্ঞাশব্দ, সেই সংজ্ঞাশব্দের পৃথগ্বিষয়ত্ব আছে। তাৎপর্য্য এই যে, ভাবের (পদার্থের) সমস্ত সংজ্ঞাশব্দ, সমূহবাচক। "কুম্ভ" এই সংজ্ঞাশব্দটি গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ-সমূহে এবং বুধ্ন অর্থাৎ কুম্ভের নিম্নভাগ এবং পার্শ্ব ও গ্রীবাদি (অগ্রভাগ প্রভৃতি) সমূহের অর্থাৎ গন্ধাদি গুণের সমষ্টি এবং নিম্নভাগ প্রভৃতি অবয়বের সমষ্টি অর্থে

বর্ত্তমান আছে, ইহা কিন্তু দৃষ্টান্ত মাত্র। [অর্থাৎ কুম্ভ শব্দের ন্যায় গো, মনুষ্য প্রভৃতি সমস্ত সংজ্ঞাশব্দই নানা গুণ ও নানা অবয়বসমূহের বাচক। সমস্ত সংজ্ঞাশব্দেরই বাচ্য অর্থ, গুণাদির সমূহ বা সমষ্টিরূপ নানা পদার্থ। সুতরাং জগতে এক কোন পদার্থ নাই, সকল পদার্থই গুণাদির সমষ্টিরূপ নানা।]

টিপ্পনী। সকল পদার্থই নানা, এক কিছুই নাই, ঘটপটাদি যে সকল পদার্থকে এক বলিয়া বুঝা হয়, তাহা বস্তুতঃ এক নহে; কারণ, তাহা নানা অবয়ব ও নানা গুণের সমষ্টি। ঐ সমষ্টিই ঘটপটাদি শব্দের বাচ্য। এই মতও অপর একটি "একান্তবাদ"। ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনগণ এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষরূপে পূর্ব্বোক্তরূপ সর্ব্বনানাত্ব মতেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৃত্তিকার নবীন বিশ্বনাথও প্রথমে ঐরূপই পূর্ব্বপক্ষ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সকল পদার্থই নানা, ইহার হেতু কি? তাই সূত্রে বলা হইয়াছে—"ভাবলক্ষণপৃথক্ত্বাৎ"। "ভাব" শব্দের অর্থ পদার্থ মাত্র। যাহার দ্বারা ঐ ভাব লক্ষিত অর্থাৎ বোধিত হয়, এই অর্থে "লক্ষণ" শব্দের অর্থ এখানে সংজ্ঞা-শব্দ। "পৃথক্ত্ব" শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে পৃথগ্‌বিষয়ত্ব অর্থাৎ নানার্থবাচকত্ব। সকল পদার্থেরই সংজ্ঞাশব্দ আছে। সেই সমস্ত শব্দের বিষয় অর্থাৎ বাচ্য পৃথক্ অর্থাৎ নানা। কারণ, সমস্ত শব্দেরই বাচ্য অর্থ কতিপয় অবয়ব ও গুণের সমষ্টি। সুতরাং সমস্ত সংজ্ঞাশব্দই সমূহ-বাচক। সমূহ বা সমষ্টি এক পদার্থ নহে। সুতরাং সকল পদার্থই সমূহাত্মক হইলে সকল পদার্থই নানা হইবে, কোন পদার্থই এক হইতে পারে না। ভাষ্যকার ইহা একটি দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, "কুম্ভ" এই সংজ্ঞাশব্দটি গন্ধ, রস, রূপ ও স্পর্শসমূহ এবং নিম্নভাগ, পার্শ্বভাগ ও অগ্রভাগ প্রভৃতি অবয়বসমূহের বাচক। কারণ, "কুম্ভ" শব্দ শ্রবণ করিলে ঐ গন্ধাদিসমূহই বুঝা যায়। সুতরাং ঐ গন্ধাদিসমূহই কুম্ভ পদার্থ। তাহা হইলে কুম্ভ পদার্থ নানা, উহা এক নহে, ইহা স্বীকার্য্য। এইরূপ গো, মনুষ্য প্রভৃতি সংজ্ঞাশব্দগুলিও পূর্ব্বোক্তরূপ সমূহ অর্থের বাচক হওয়ায় গো, মনুষ্য প্রভৃতি পদার্থও নানা, ইহা বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকারোক্ত "কুম্ভ" শব্দ দৃষ্টান্তমাত্র। উদ্দ্যোতকর এই মতের যুক্তির ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে,[১] "কুম্ভ" শব্দ অনেকার্থবোধক; কারণ, উহা একটি পদ। পদ বা সংজ্ঞাশব্দ মাত্রই অনেকার্থবোধক, যেমন "সেনা" শব্দ। "সেনা" বলিলে কোন একটিমাত্র পদার্থই বুঝা যায় না। চতুরঙ্গ সেনাই "সেনা" শব্দের অর্থ (২য় খণ্ড, ১৭৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এইরূপ "কুম্ভ" শব্দ শ্রবণ করিলেও যখন অনেক অর্থেরই বোধ হয়, তখন "কুম্ভ" শব্দও "সেনা" শব্দের ন্যায় অনেকার্থবোধক অর্থাৎ সমূহবাচক। এইরূপ অন্যান্য সমস্ত শব্দই পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে সমূহবাচক বলিয়া সিদ্ধ হইলে সকল পদার্থই নানা, এক কোন পদার্থ নাই, ইহাই সিদ্ধ হয়। তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে পূর্ব্বপক্ষ ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, রূপাদি গুণ হইতে ভিন্ন কোন দ্রব্য নাই, অবয়ব হইতে ভিন্ন কোন অবয়বীও নাই, ইহা বৌদ্ধ সৌত্রান্তিক ও

১। "কুম্ভশব্দোঽনেকবিষয়ঃ, একপদত্বাৎ, সেনাশব্দবদিতি। পদশ্রবণাদনেকার্থাবগতেঃ, যস্মাৎ পদশ্রুতেরনেকোঽর্থোঽবগম্যতে যথা সেনেতি।"—ন্যায়বার্ত্তিক।

বৈভাষিক সম্প্রদায়ের মত। পরবর্ত্তী সূত্রের দ্বারা ঐ মত খণ্ডিত হইয়াছে। বস্তুতঃ বৌদ্ধ-সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক সম্প্রদায় বাহ্য পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন। বৈভাষিক সম্প্রদায়ের মতে যে, সকল পদার্থই সমষ্টিরূপ, একমাত্র পদার্থ কেহই নহে, ইহা তাৎপর্য্য-টীকাকার পূর্ব্বেও এক স্থানে বলিয়াছেন। (২য় খণ্ড, ১৮৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু মহর্ষি গোতম "সর্ব্বং পৃথক্," এই বাক্যের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বনানাত্ব মতই পূর্ব্বপক্ষরূপে গ্রহণ করিলে ঐ মত যে, তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই উদ্ভাবিত হইয়াছে, পরবর্ত্তী কালে বৌদ্ধসম্প্রদায়বিশেষ ঐ মতের সমর্থনপূর্ব্বক নিজ সিদ্ধান্তরূপে উহা গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা বুঝিবার কোন বাধকনিশ্চয় নাই। পরন্তু "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" এই শ্রুতিবাক্যের দ্বারা যদি জগতে নানা অর্থাৎ সমষ্টিরূপ কোন পদার্থ নাই, ইহাই কথিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে বেদবিরোধী কোন সম্প্রদায়বিশেষ, সুপ্রাচীন কালেও বৈদিক সিদ্ধান্ত খণ্ডনের আগ্রহবশতঃ পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বনানাত্ব মতেরও সমর্থন করিতে পারেন। সে যাহা হউক, ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনগণ এখানে যে ভাবে সর্ব্বনানাত্ব মতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে এই মতে "আত্মন্" শব্দও সমূহবাচক। সুতরাং আত্মাও গুণাদির সমষ্টিরূপ নানা পদার্থ। তাহা হইলে মহর্ষি তৃতীয় অধ্যায়ে আত্মার যে স্বরূপ বলিয়াছেন, তাহা আর বলা যায় না—আত্মার নিত্যত্বও ব্যাহত হয়। পূর্ব্বোক্ত "ব্যক্তাদ্ব্যক্তানাং" ইত্যাদি (১১শ) সূত্রের দ্বারা যে সিদ্ধান্ত সূচিত হইয়াছে, তাহাও ব্যাহত হয়। সুতরাং মহর্ষির সম্মত "প্রেত্যভাবে"র সিদ্ধি হইতে পারে না। তাই মহর্ষি "প্রেত্যভাবে"র পরীক্ষাপ্রসঙ্গে ঐ পরীক্ষা পরিশোধনের জন্য এখানে পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বনানাত্ব মতেরও খণ্ডন করিয়াছেন। ৩৪।

সূত্র। নানেকলক্ষণৈরেকভাবনিষ্পত্তেঃ ॥৩৫॥৩৭৮॥

অনুবাদ। (উত্তর) না, অর্থাৎ সমস্ত পদার্থই নানা নহে। কারণ, অনেক প্রকার লক্ষণবিশিষ্ট একটি ভাবের (কুম্ভাদি এক একটি পদার্থের) উৎপত্তি হয়।

ভাষ্য। "অনেকলক্ষণৈ"[১]রিতি মধ্যপদলোপী সমাসঃ। গন্ধাদিভিশ্চ গুণৈর্ব্বুধ্নাদিভিশ্চাবয়বৈঃ সম্বদ্ধ একো ভাবো নিষ্পদ্যতে। গুণব্যতিরিক্তং দ্রব্যমবয়বাতিরিক্তশ্চাবয়বীতি। বিভক্তন্যায়ঞ্চৈতদুভয়মিতি।

অনুবাদ। "অনেকলক্ষণৈঃ" এই বাক্যে মধ্যপদলোপী সমাস (অর্থাৎ সূত্রে "অনেকলক্ষণ" এই বাক্য অনেকবিধ লক্ষণ এই অর্থে "বিধা" শব্দের লোপ হওয়ায় মধ্যপদলোপী কর্ম্মধারয় সমাস)। গন্ধ প্রভৃতি গুণের দ্বারা এবং বুধ্ন প্রভৃতি

১। এখানে "অনেকবিধলক্ষণৈঃ" এইরূপ ভাষ্যপাঠ প্রকৃত বলিয়া বুঝা যায় না। কারণ, সূত্রে "অনেক-লক্ষণৈঃ" এইরূপ পাঠই আছে। উহার ব্যাখ্যা "অনেকবিধলক্ষণৈঃ"। উদ্দ্যোতকরও লিখিয়াছেন, "অনেকলক্ষণৈ-রিতি মধ্যপদলোপী সমাসোঽনেকবিধলক্ষণৈ"রিতি।—ন্যায়বার্ত্তিক।

অবয়বের দ্বারা সম্বন্ধ একটি ভাব অর্থাৎ কুম্ভ প্রভৃতি এক একটি অবয়বী উৎপন্ন হয়। গুণ হইতে ভিন্ন দ্রব্য এবং অবয়ব হইতে ভিন্ন অবয়বী, এই উভয়, বিভক্তন্যায়ই অর্থাৎ দ্রব্য যে গুণ হইতে ভিন্ন এবং অবয়বী যে, অবয়ব হইতে ভিন্ন, এই উভয় বিষয়ে ন্যায় (যুক্তি) পূর্ব্বেই বিভক্ত অর্থাৎ ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

টিপ্পনী। পূর্ব্বোক্ত মতের খণ্ডন করিতে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, কুম্ভ প্রভৃতি নানা নহে। কারণ, অনেক প্রকার লক্ষণবিশিষ্ট কুম্ভ প্রভৃতি এক একটি অবয়বী দ্রব্যেরই উৎপত্তি হয়। সূত্রে "অনেকলক্ষণৈঃ" এই বাক্যে বিশেষণে তৃতীয়া বিভক্তিই বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকার এই সূত্রে "লক্ষণ" শব্দের দ্বারা কুম্ভ প্রভৃতি দ্রব্যের গন্ধ প্রভৃতি গুণ এবং বুধ্ন অর্থাৎ নিম্নভাগ প্রভৃতি অবয়বকে গ্রহণ করিয়া সূত্রোক্ত হেতুর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভাষ্যকার শেষে সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, গুণ হইতে গুণী দ্রব্য অত্যন্ত ভিন্ন, এবং অবয়ব হইতে অবয়বী দ্রব্য অত্যন্ত ভিন্ন। তাৎপর্য্য এই যে, কুম্ভের গন্ধ প্রভৃতি গুণ এবং নিম্নভাগ প্রভৃতি অবয়ব হইতে কুম্ভ একেবারেই ভিন্ন পদার্থ। সুতরাং কুম্ভ কখনও ঐ গন্ধাদি গুণ ও নিম্নভাগ প্রভৃতি অবয়বের সমষ্টি হইতে পারে না। ঐ গন্ধাদি গুণবিশিষ্ট ও নিম্নভাগ প্রভৃতি অবয়ববিশিষ্ট কুম্ভ নামে একটি পৃথক্ দ্রব্যই উৎপন্ন হওয়ায় উহা নানা পদার্থ হইতে পারে না। গুণ হইতে গুণী দ্রব্য যে, ভিন্ন পদার্থ এবং অবয়ব হইতে অবয়বী দ্রব্য যে, ভিন্ন পদার্থ, এ বিষয়ে ন্যায় অর্থাৎ যুক্তি পূর্ব্বেই বিভক্ত (ব্যাখ্যাত) হইয়াছে। সুতরাং কুম্ভাদি পদার্থকে গন্ধাদি গুণ ও বুধ্ন প্রভৃতি অবয়ব হইতে অভিন্ন বলিয়া ঐ সমস্ত পদার্থই নানা, এইরূপ সিদ্ধান্ত বলা যায় না। ভাষ্যকার দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের ৩৬শ সূত্রের ভাষ্যে বিস্তৃত বিচার করিয়া অবয়ব হইতে অবয়বী ভিন্ন, এই সিদ্ধান্ত বহু যুক্তির দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তদ্দ্বারা গন্ধাদি গুণ হইতে কুম্ভাদি দ্রব্য যে, অত্যন্ত ভিন্ন পদার্থ, ইহাও প্রতিপন্ন হইয়াছে। গন্ধ, রস ও স্পর্শ, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে। কুম্ভাদি দ্রব্য গন্ধাদিস্বরূপ হইলে চক্ষুর্গ্রাহ্য হইতে পারে না। গন্ধাদি গুণের আশ্রয় পৃথক্ না থাকিলে আশ্রয়ের ভেদবশতঃ ঐ সমস্ত গুণের ভেদ ও উৎকর্ষাপকর্ষও হইতে পারে না। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের শেষে মহর্ষির "অর্থ"পরীক্ষার দ্বারাও গুণ হইতে গুণের আশ্রয় দ্রব্য ভিন্ন, এই সিদ্ধান্ত বুঝিতে পারা যায়। প্রথম অধ্যায়ে প্রথম আহ্নিকের ১৪শ সূত্রের "পৃথিব্যাদিগুণাঃ" এই বাক্যের "পৃথিব্যাদীনাং···গুণাঃ" এইরূপ ব্যাখ্যার দ্বারাও ভাষ্যকার ঐ সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়াছেন॥ ৩৫॥

ভাষ্য। অথাপি—

সূত্র। লক্ষণব্যবস্থানাদেবাপ্রতিষেধঃ ॥৩৬॥৩৭৯॥

অনুবাদ। পরন্তু লক্ষণের অর্থাৎ সংজ্ঞাশব্দের ব্যবস্থাবশতঃই প্রতিষেধ হয় না, অর্থাৎ এক কোন পদার্থ নাই, এই প্রতিষেধ অযুক্ত।

ভাষ্য। ন কশ্চিদেকো ভাব ইত্যযুক্তঃ প্রতিষেধঃ। কস্মাৎ?

লক্ষণব্যবস্থানাদেব। যদিহ লক্ষণং ভাবস্য সংজ্ঞাশব্দভূতং তদেকস্মিন্ ব্যবস্থিতং, 'যং কুম্ভমদ্রাক্ষং তং স্পৃশামি, যমেবাস্পাক্ষং তং পশ্যামী'তি। নাণুসমূহো গৃহ্যত ইতি। অণুসমূহে চাগৃহ্যমাণে যদ্গৃহ্যতে তদেকমেবেতি।

অনুবাদ। এক কোন ভাব (পদার্থ) নাই, এই প্রতিষেধ অযুক্ত। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) লক্ষণের ব্যবস্থাবশতঃই। বিশদার্থ এই যে, এই জগতে ভাবের অর্থাৎ সমস্ত পদার্থের সংজ্ঞাশব্দভূত যে লক্ষণ, তাহা এক পদার্থে ব্যবস্থিত। 'যে কুম্ভকে দেখিয়াছিলাম, তাহাকে স্পর্শ করিতেছি, যাহাকেই স্পর্শ করিয়াছিলাম, তাহাকে দেখিতেছি।' পরমাণুসমূহ গৃহীত হয় না। পরমাণুসমূহ গৃহ্যমাণ অর্থাৎ প্রত্যক্ষবিষয় না হওয়ায় যাহা গৃহীত হয়, তাহা একই।

টিপ্পনী। পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডন করিতে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা চরম কথা বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বপক্ষবাদীর হেতুই অসিদ্ধ হওয়ায় তিনি উহার দ্বারা পদার্থের একত্বের প্রতিষেধ করিতে পারেন না, অর্থাৎ জগতে কোন পদার্থই এক নহে, সকল পদার্থই নানা, ইহা বলিতে পারেন না। কারণ, পদার্থের সংজ্ঞাশব্দরূপ যে "লক্ষণ"কে তিনি সমূহবাচক বলিয়াছেন, ঐ "লক্ষণে"র ব্যবস্থাই আছে, অর্থাৎ উহার একপদার্থবাচকত্বের নিয়মই আছে। সূত্রে "লক্ষণ" শব্দের অর্থ এখানে সংজ্ঞাশব্দ। "ব্যবস্থান" শব্দের অর্থ একপদার্থবাচকত্বের ব্যবস্থা অর্থাৎ নিয়ম। ভাষ্যকার মহর্ষির তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, পদার্থের সংজ্ঞাশব্দরূপ যে লক্ষণ, তাহা এক পদার্থেই ব্যবস্থিত অর্থাৎ এক পদার্থেরই বাচক। সমূহ বা সমষ্টিরূপ নানা পদার্থের বাচক নহে। কারণ, "যে কুম্ভকে দেখিয়াছিলাম, তাহাকে স্পর্শ করিতেছি", "যাহাকেই স্পর্শ করিয়াছিলাম, তাহাকেই দেখিতেছি", এইরূপ যে বোধ হইয়া থাকে, উহার দ্বারা কুম্ভ পদার্থ যে এক, "কুম্ভ" শব্দ যে এক অর্থেরই বাচক, ইহা বুঝা যায়। কুম্ভ পদার্থ নানা হইলে "যে সমস্ত পদার্থ দেখিয়াছিলাম, সেই সমস্ত পদার্থকে স্পর্শ করিতেছি", ইত্যাদি প্রকারই বোধ হইত। পরন্তু কুম্ভগত রস ও স্পর্শাদিও কুম্ভ পদার্থ হইলে তাহার দর্শন হইতে পারে না, এবং কুম্ভগত রূপ, রস ও গন্ধও কুম্ভ পদার্থ হইলে তাহার স্পার্শন প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কারণ, রসাদি চক্ষুরিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হয় না, রূপাদিও ত্বগিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হয় না। পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি রূপাদিসমষ্টিকেই কুম্ভপদার্থ বলেন, তাহা হইলে উহার পূর্ব্বোক্তরূপ চাক্ষুষ ও ত্বাচ প্রত্যক্ষ অসম্ভব হওয়ায় পূর্ব্বোক্তরূপ বোধের অপলাপ করিতে হয়। সুতরাং চক্ষু ও ত্বগিন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য কুম্ভ পদার্থ যে, রূপাদিসমষ্টি নহে, উহা রূপাদি হইতে পৃথক্ একটি দ্রব্য, ইহা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে "কুম্ভ" শব্দ যে এক পদার্থেরই বাচক, উহা পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথিত সমূহ বা সমষ্টিরূপ নানা পদার্থের বাচক নহে, ইহাও স্বীকার্য্য। অতএব পূর্ব্বপক্ষবাদী যে হেতুর দ্বারা সকল পদার্থের নানাত্ব সিদ্ধ করিতে চাহেন, ঐ হেতুই অসিদ্ধ হওয়ায় উহার দ্বারা তাঁহার সাধ্য সিদ্ধি হইতেই পারে না। পরন্তু পূর্ব্বপক্ষবাদী কুম্ভাদি সকল পদার্থকেই পরমাণুসমষ্টি বলিয়াছেন, তাহার

মতে রূপাদিও পরমাণুসমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। কিন্তু তাহা হইলে কুম্ভাদি পদার্থের প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কারণ, প্রত্যেক পরমাণু যখন অতীন্দ্রিয়, তখন উহার সমষ্টিও অতীন্দ্রিয়ই হইবে, প্রত্যেক পরমাণু হইতে উহার সমষ্টি কোন পৃথক্ পদার্থ নহে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে অবয়বিপ্রকরণে ভাষ্যকার বিশদ বিচারপূর্ব্বক পরমাণুসমষ্টির যে প্রত্যক্ষ হইতে পারে না, ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এখন যদি পরমাণুসমষ্টি প্রত্যক্ষের বিষয়ই না হয়, তাহা হইলে যে পদার্থের প্রত্যক্ষ হইতেছে, তাহা যে, পরমাণুসমষ্টি নহে, কিন্তু তদ্ভিন্ন একটি পদার্থ, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। "কুম্ভ" নামক পদার্থের প্রত্যক্ষ, যাহা পূর্ব্বপক্ষবাদীও স্বীকার করেন, তাহার উপপাদন করিতে হইলে কুম্ভকে একটি পৃথক্ অবয়বী দ্রব্য বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। সূত্রোক্ত "লক্ষণব্যবস্থা" বুঝাইতে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, "কুম্ভ" এইরূপ প্রয়োগে সর্ব্বত্রই উহার দ্বারা বহু পদার্থ বুঝা গেলে অর্থাৎ "কুম্ভ" শব্দ বহু অর্থেরই বাচক হইলে কুত্রাপি "কুম্ভ" শব্দের উত্তর একবচনের প্রয়োগ হইতে পারে না, সর্ব্বত্রই "কুম্ভাঃ" এইরূপ বহুবচনান্ত প্রয়োগ করিতে হয়। কারণ, পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতে সর্ব্বত্রই "কুম্ভ" শব্দের দ্বারা নানা পদার্থের সমষ্টি বুঝা যায়। পরন্তু "কুম্ভমানয়" এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়া একটি কুম্ভ আনয়নের জন্যও লোক প্রেরণ করা হয় এবং ঐ স্থলে ঐ বাক্যার্থবোদ্ধা ব্যক্তিও ঐ "কুম্ভ" শব্দের দ্বারা "কুম্ভ" নামক একটি পদার্থই বুঝিয়া থাকে। ঐ কুম্ভ যে, একটি পদার্থ নহে, উহা নানা পদার্থের সমষ্টি, সুতরাং নানা, ইহা বুঝে না। তাহা বুঝিলে এক কুম্ভ, এইরূপ বোধ হইত না। যাহা বস্তুতঃ এক নহে, তাহাকে এক বলিয়া বুঝিলে ভ্রমাত্মক বোধ স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু "এক কুম্ভ" এইরূপ সার্ব্বজনীন প্রতীতিকে ভ্রম বলিয়া এবং "এক কুম্ভ" এইরূপ প্রয়োগকে গৌণ প্রয়োগ বলিয়া স্বীকার করার কোন প্রমাণ নাই। পরন্তু প্রত্যক্ষবিষয়তাবশতঃ কুম্ভ যে নানা পদার্থের সমষ্টি নহে, উহা পৃথক্ একটি অবয়বী, এই বিষয়েই প্রমাণ আছে।

মহর্ষি এই প্রকরণে তিন সূত্রেই একই অর্থে "লক্ষণ" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহাই মনে হয় এবং "লক্ষণ" শব্দের একই অর্থ গ্রহণ করিয়াও পূর্ব্বোক্ত তিন সূত্রের ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনগণ সেইরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই। তাঁহাদিগের ব্যাখ্যায় প্রথম সূত্র ও তৃতীয় সূত্রে "লক্ষণ" শব্দের অর্থ সংজ্ঞাশব্দ। যাহার দ্বারা পদার্থ লক্ষিত অর্থাৎ বোধিত হয়, এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে "লক্ষণ" শব্দের দ্বারা সংজ্ঞাশব্দ অর্থাৎ নাম বুঝা যাইতে পারে। এবং যাহা পদার্থকে লক্ষিত অর্থাৎ বিশেষিত করে, এইরূপ ব্যুৎপত্তি অনুসারে "লক্ষণ" শব্দের দ্বারা পদার্থের গুণ এবং অবয়বও বুঝা যাইতে পারে। দ্বিতীয় সূত্রে এই অর্থেই "লক্ষণ" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। কারণ, দ্বিতীয় সূত্রে "অনেকলক্ষণৈঃ" এই বাক্যে "লক্ষণ" শব্দের দ্বারা পূর্ব্ববৎ সংজ্ঞাশব্দ বুঝিলে অনেকবিধ সংজ্ঞাশব্দবিশিষ্ট একটি পদার্থের উৎপত্তি হয়, এইরূপ অর্থই উহার দ্বারা বুঝা যায়। কিন্তু ঐরূপ অর্থ কোনরূপেই সংগত হয় না। পরন্তু সর্ব্বনানাত্ববাদী সমস্ত পদার্থের সমস্ত সংজ্ঞাশব্দই সমূহবাচক বলিয়া প্রথমে ঐ হেতুর দ্বারাই নিজমত সমর্থন করায় ভাষ্যকার প্রথম সূত্রে "লক্ষণ" শব্দের দ্বারা সংজ্ঞাশব্দরূপ অর্থেরই ব্যাখ্যা করিয়া "ভাবলক্ষণপৃথক্ত্বাৎ" এই হেতুবাক্যের পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং তৃতীয় সূত্রের দ্বারা উক্ত

হেতুরই অসিদ্ধতার ব্যাখ্যা করিতে "লক্ষণ" শব্দের দ্বারা প্রথম সূত্রোক্ত "ভাবলক্ষণ"ই অর্থাৎ পদার্থের সংজ্ঞাশব্দরূপ অর্থেরই গ্রহণ করিয়াছেন।

ভাষ্য। অথাপ্যেতদনুক্তং,[১] **নাস্ত্যেকো ভাবো যস্মাৎ সমুদায়ঃ।** একানুপপত্তের্নাস্ত্যেব সমূহঃ। নাস্ত্যেকো ভাবো যস্মাৎ সমূহে ভাবশব্দ-প্রয়োগঃ, একস্য চানুপপত্তেঃ সমূহো নোপপদ্যতে, একসমুচ্চয়ো হি সমূহ ইতি ব্যাহতত্বাদনুপপন্নং—**নাস্ত্যেকো ভাব** ইতি। যস্য প্রতিষেধঃ প্রতিজ্ঞায়তে 'সমূহে ভাবশব্দপ্রয়োগা'দিতি হেতুং ব্রুবতা স এবাভ্যনু-জ্ঞায়তে, একসমুচ্চয়ো হি সমূহ ইতি। 'সমূহে ভাবশব্দপ্রয়োগা'দিতি চ সমূহমাশ্রিত্য প্রত্যেকং সমূহিপ্রতিষেধো **নাস্ত্যেকো ভাব** ইতি। সোঽয়মুভয়তো ব্যাঘাতাদ্‌যৎকিঞ্চনবাদ ইতি।

অনুবাদ। পরন্তু ইহা (বৌদ্ধ কর্তৃক) পশ্চাৎ উক্ত হইয়াছে, "এক পদার্থ নাই, যেহেতু সমুদায়" অর্থাৎ পদার্থমাত্রই সমুদায় বা সমষ্টিরূপ, অতএব কোন পদার্থই এক নহে। (খণ্ডন) একের উপপত্তি অর্থাৎ সত্তা না থাকায় সমূহ নাই। বিশদার্থ এই যে, (পূর্ব্বপক্ষ) এক পদার্থ নাই, যেহেতু সমূহে অর্থাৎ গুণাদির সমষ্টি বুঝাইতে ভাববোধক শব্দের প্রয়োগ হয়। (খণ্ডন) কিন্তু (পূর্ব্বোক্ত মতে) এক পদার্থের সত্তা না থাকায় সমূহ (সমষ্টি) উপপন্ন হয় না; কারণ, এক পদার্থের সমষ্টিই সমূহ, অতএব ব্যাঘাতবশতঃ "এক পদার্থ নাই" ইহা উপপন্ন হয় না। (ব্যাঘাত বুঝাইতেছেন) যে এক পদার্থের প্রতিষেধ (অভাব) প্রতিজ্ঞাত হইতেছে, "সমূহে ভাবশব্দপ্রয়োগাৎ" এই হেতুবাক্য বলিয়া সেই এক পদার্থই স্বীকৃত হইতেছে; কারণ, একের সমষ্টিই সমূহ। পরন্তু "সমূহে ভাবশব্দপ্রয়োগাৎ"—এই হেতুবাক্যের দ্বারা সমূহকে আশ্রয় করিয়া "নাস্ত্যেকো ভাবঃ"—এই প্রতিজ্ঞাবাক্যের দ্বারা প্রত্যেক সমূহীর অর্থাৎ ব্যষ্টির প্রতিষেধ করা হইতেছে। সেই ইহা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত মত উভয়তঃ ব্যাঘাত (বিরোধ) বশতঃ অর্থাৎ যেমন প্রতিজ্ঞাবাক্যের সহিত হেতুবাক্যের বিরোধ, তদ্রূপ হেতুবাক্যের সহিত প্রতিজ্ঞাবাক্যের বিরোধবশতঃ যৎকিঞ্চিদ্‌বাদ, অর্থাৎ অতি তুচ্ছ মত।

১। অথাপ্যেতদনুক্তমিতি। অপিচ "ভাবলক্ষণপৃথক্ত্বা"দিতি হেতুমুক্ত্বা বৌদ্ধেন পশ্চাদেতদুক্তং, কিং তদুক্তমিত্যত আহ "নাস্ত্যেকো ভাবো যস্মাৎ সমুদায় ইতি। এতদনুক্তং দূষয়তি "একানুপপত্তের্নাস্ত্যেব সমূহ" ইতি। অনুক্তং বিবৃণোতি "নাস্ত্যেকো ভাবো যস্মাৎ সমূহে ভাবশব্দপ্রয়োগ" ইতি। অস্য দূষণং বিবৃণোতি "একস্যানুপ-পত্তে"রিতি। এতৎ প্রপঞ্চয়তি "একসমূহো হীতি"।—তাৎপর্য টীকা।

টিপ্পনী। ভাষ্যকার সূত্রোক্ত উত্তরের ব্যাখ্যা করিয়া, শেষে পূর্ব্বোক্ত বৌদ্ধ মত যে, সর্ব্বথা অনুপপন্ন, উহা অতি তুচ্ছ মত, ইহা বুঝাইতে নিজে স্বতন্ত্রভাবে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত মতবাদী বৌদ্ধবিশেষ "ভাবলক্ষণপৃথক্ত্বাৎ"—এই হেতুবাক্য বলিয়া পরে বলিয়াছেন, "নাস্ত্যেকো ভাবো যস্মাৎ সমুদয়ঃ"। অর্থাৎ যেহেতু সমস্ত পদার্থই সমষ্টিরূপ, অতএব এক কোন পদার্থ নাই। পূর্ব্বোক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, সমূহ বা সমষ্টি বুঝাইতেই ভাববোধক কুম্ভাদি শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। অর্থাৎ কুম্ভাদি শব্দ, রূপাদিগুণবিশেষ ও ভিন্ন ভিন্ন অবয়ববিশেষের সমূহ বা সমষ্টিই বুঝায়। উহা বুঝাইতেই কুম্ভাদি শব্দের প্রয়োগ হয়। সুতরাং কুম্ভাদি পদার্থ নানা পদার্থের সমষ্টিরূপ হওয়ায়, একটি পদার্থ নহে। কারণ, যাহা সমষ্টিরূপ, তাহা বহু, তাহা কিছুতেই এক হইতে পারে না। ভাষ্যকার এই যুক্তির খণ্ডন করিতে চরম কথা বলিয়াছেন যে, এক না থাকিলে সমূহও থাকে না। কারণ, একের সমষ্টিই সমূহ। অতএব ব্যাঘাতবশতঃ "এক পদার্থ নাই" এই সিদ্ধান্ত উপপন্ন হয় না। ভাষ্যকার শেষে তাঁহার কথিত ব্যাঘাত বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বপক্ষবাদী যে, এক পদার্থের অভাবকে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, তিনি উহা সমর্থন করিতে "সমূহে ভাবশব্দপ্রয়োগাৎ"—এই হেতুবাক্য বলিয়া সেই এক পদার্থই আবার স্বীকার করিতেছেন। কারণ, এক পদার্থের সমষ্টিই সমূহ। এক না থাকিলে সমূহ থাকিতে পারে না। এক একটি পদার্থ গণনা করিয়া, সেই বহু এক পদার্থের সমষ্টিকেই সমূহ বলে। উহার অন্তর্গত এক একটি পদার্থকে সমূহী অথবা ব্যষ্টি বলে। কিন্তু ব্যষ্টি না থাকিলে সমষ্টি থাকে না। সুতরাং যিনি সমূহ বা সমষ্টি মানিবেন, তিনি সমূহী অর্থাৎ ব্যষ্টিও মানিতে বাধ্য। তাহা হইলে তিনি আর এক পদার্থ নাই অর্থাৎ ব্যষ্টি নাই, সমস্ত পদার্থই সমষ্টিরূপ, এই কথা বলিতেই পারেন না। কারণ, তিনি "এক পদার্থ নাই" এই প্রতিজ্ঞাবাক্য বলিয়া উহা সমর্থন করিতে যে হেতুবাক্য বলিয়াছেন, তাহাতে সমূহ স্বীকার করায় এক পদার্থও স্বীকার করা হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার ঐ প্রতিজ্ঞাবাক্যের সহিত তাঁহার ঐ হেতুবাক্যের বিরোধ হওয়ায় তিনি উহার দ্বারা তাঁহার সাধ্যসিদ্ধি করিতে পারেন না। ভাষ্যকার শেষে পূর্ব্বপক্ষবাদীর প্রতিজ্ঞা ও হেতু যে, উভয়তঃ বিরুদ্ধ অর্থাৎ তাঁহার প্রতিজ্ঞাবাক্যের সহিত তাঁহার হেতুবাক্যের যেমন বিরোধ, তদ্রূপ হেতুবাক্যের সহিতও প্রতিজ্ঞাবাক্যের বিরোধ, ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বপক্ষবাদী "সমূহে ভাবশব্দপ্রয়োগাৎ" এই হেতুবাক্যের দ্বারা সমূহকে আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ সকল পদার্থকেই সমূহ বলিয়া স্বীকার করিয়া "নাস্ত্যেকো ভাবঃ" এই প্রতিজ্ঞাবাক্যের দ্বারা প্রত্যেক সমূহীর অর্থাৎ ঐ সমূহনির্ব্বাহক প্রত্যেক ব্যষ্টির প্রতিষেধ করিয়াছেন। সুতরাং তিনি হেতুবাক্যে সমূহ অর্থাৎ সমষ্টি স্বীকার করিয়া, উহার নির্ব্বাহক এক একটি পদার্থরূপ ব্যষ্টিও স্বীকার করিতে বাধ্য হওয়ায় তাঁহার ঐ হেতুবাক্যের সহিতও তাঁহার প্রতিজ্ঞাবাক্যের বিরোধ হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার প্রতিজ্ঞা ও হেতুবাক্যের উভয়তঃ বিরোধবশতঃ তিনি উহার দ্বারা তাঁহার সাধ্যসিদ্ধি করিতে পারেন না। তাঁহার ঐ মত তাঁহার নিজের কথার দ্বারাই খণ্ডিত হওয়ায় উহা অতি তুচ্ছ মত। বস্তুতঃ কুম্ভাদি পদার্থের একত্ব কাল্পনিক, নানাত্বই বাস্তব, এই মতে কোন পদার্থেই একত্বের যথার্থ জ্ঞান সম্ভব না হওয়ায় একত্বের ভ্রম জ্ঞানও সম্ভব হয় না। পরন্তু যে

বৌদ্ধসম্প্রদায় কুম্ভাদি পদার্থকে পরমাণুসমষ্টি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাঁহাদিগের মতে পরমাণুর একত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য। কারণ, পরমাণুও রূপাদির সমষ্টি, ইহা বলিলে ঐ পরমাণুতে যে রূপ আছে, তাহা কিসের সমষ্টি, ইহা বলিতে হইবে। কিন্তু পরমাণুর রূপ বা পরমাণুকে সমষ্টি বলা যায় না। কারণ, ঘটাদি পদার্থকে বিভাগ করিতে গেলে কোন এক স্থানে উহার বিশ্রাম স্বীকার করিতে হইবে। নচেৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রতর, বৃহৎ বৃহত্তর প্রভৃতি নানাবিধ ঘটের ভেদসিদ্ধি হইতে পারে না। সমস্ত ঘটই যদি সমষ্টিরূপ হয় এবং উহার মূল পরমাণুও যদি সমষ্টিরূপ হয়, তাহা হইলে সমস্ত ঘটই অনন্ত পদার্থের সমষ্টি হওয়ায় ঘটের পরিমাণের তারতম্য হইতে পারে না। সুতরাং ঘটের অবয়ব বিভাগ করিতে যাইয়া যে পরমাণুতে বিশ্রাম স্বীকার করিতে হইবে, ঐ পরমাণু যে, সমষ্টিরূপ নহে, উহার প্রত্যেক পরমাণুতে বাস্তব একত্বই আছে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। সুতরাং সকল পদার্থই সমষ্টি-রূপ নানা, এই মত কোনরূপেই সিদ্ধ হইতে পারে না॥ ৩৬॥

সর্ব্বপৃথক্ত্বনিরাকরণ-প্রকরণ সমাপ্ত॥ ৯॥

—o—

ভাষ্য। অয়মপর একান্তঃ—

অনুবাদ। ইহা অপর একান্তবাদ—

সূত্র। সর্ব্বমভাবো ভাবেষ্বিতরেতরাভাবসিদ্ধেঃ॥ ॥৩৭॥৩৮০॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) সকল পদার্থই অভাব অর্থাৎ অসৎ বা অলীক, কারণ. ভাবসমূহে (গো, অশ্ব প্রভৃতি পদার্থে) পরস্পরাভাবের সিদ্ধি (জ্ঞান) হয়।

ভাষ্য। যাবদ্ভাবজাতং তৎ সর্ব্বমভাবঃ, কস্মাৎ? **ভাবেষ্বিতরে-তরাভাবসিদ্ধেঃ**। 'অসন্ গৌরশ্বাত্মনা', 'অনশ্বো গৌঃ', 'অসন্নশ্বো গবাত্মনা', 'অগৌরশ্ব' ইত্যসৎপ্রত্যয়স্য প্রতিষেধস্য চ ভাবশব্দেন সামানাধি-করণ্যাৎ সর্ব্বমভাব ইতি।

অনুবাদ। যে সমস্ত ভাবসমূহ অর্থাৎ "প্রমাণ" "প্রমেয়" প্রভৃতি নামে সৎ-পদার্থ বলিয়া যে সমস্ত কথিত হয়, সেই সমস্তই অভাব অর্থাৎ অসৎ বা অলীক, (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) যেহেতু ভাবসমূহে অর্থাৎ ভাব বলিয়া কথিত পদার্থ-সমূহে পরস্পরাভাবের জ্ঞান হয়। (তাৎপর্য্য) 'গো অশ্বস্বরূপে অসৎ', 'গো অশ্ব নহে'. 'অশ্ব গোস্বরূপে অসৎ', 'অশ্ব গো নহে', এই প্রকারে "অসৎ" এইরূপ প্রতীতির এবং "প্রতিষেধে"র অর্থাৎ "অসৎ" এই প্রতিষেধক শব্দের—ভাববোধক

শব্দের ("গো" "অশ্ব" প্রভৃতি শব্দের) সহিত সামানাধিকরণ্যপ্রযুক্ত সমস্তই অর্থাৎ ভাব বলিয়া কথিত সমস্ত পদার্থই অভাব।

টিপ্পনী। সমস্ত পদার্থই অসৎ অর্থাৎ কোন পদার্থেরই সত্তা নাই, এই মতবিশেষও অপর একটি "একান্তবাদ"। এই মত সিদ্ধ হইলে আত্মাও অসৎ, ইহা স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে আত্মার "প্রেত্যভাব"ও কোন বাস্তব পদার্থ হয় না, পরন্তু উক্ত মতে "প্রেত্যভাব"ও অসৎ বা অলীক। তাই মহর্ষি প্রেত্যভাবের পরীক্ষা-প্রসঙ্গে এখানে অত্যাবশ্যকবোধে পূর্ব্বোক্ত মত খণ্ডন করিতে প্রথমে এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ বলিয়াছেন, "সর্ব্বমভাবঃ"। ভাষ্যকার প্রভৃতির ব্যাখ্যানুসারে এখানে "অভাব" বলিতে অসৎ অর্থাৎ অলীক। যাহার সত্তা নাই, তাহাকেই অলীক বলে। "প্রমাণ", "প্রমেয়" প্রভৃতি যে সমস্ত পদার্থ সৎ বলিয়া কথিত হয়, তাহা সমস্তই অসৎ অর্থাৎ অলীক। তাৎপর্য্যটীকাকার পূর্ব্বোক্ত মতকে শূন্যতাবাদীর মত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন এবং এই মতে সকল পদার্থের শূন্যতাই বাস্তব—সত্তা বাস্তব নহে, অবাস্তব কল্পনাবশতঃই সকল পদার্থ সতের ন্যায় প্রতীত হয়, ইহা বলিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা সকল পদার্থই অলীক বলিয়াছেন, যাঁহাদিগের মতে কোন পদার্থই বাস্তব নহে, তাঁহারা শূন্যতাকে কিরূপে বাস্তব বলিবেন, এবং কোন পদার্থই সৎ না থাকিলে সতের ন্যায় প্রতীতি কিরূপে বলিবেন, ইহা অবশ্য চিন্তনীয়। তাৎপর্য্যটীকাকার বেদান্ত-দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের ৩১শ সূত্রের ভাষ্যভামতীতে শূন্যবাদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, বস্তু সৎও নহে, অসৎও নহে, এবং সৎ ও অসৎ, এই উভয় প্রকারও নহে এবং সৎ ও অসৎ এই উভয় ভিন্ন অন্য প্রকারও নহে। অর্থাৎ কোন বস্তুই পূর্ব্বোক্ত কোন প্রকারেই বিচারসহ নহে। অতএব সর্ব্বথা বিচারাসহত্বই বস্তুর তত্ত্ব। "মাধ্যমিককারিকাতে"ও আত্মার অস্তিত্বও নাই, নাস্তিত্বও নাই, এইরূপ কথা পাওয়া যায়। (তৃতীয় খণ্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু ভাষ্যকার পূর্ব্বপ্রকরণে সর্ব্বাস্তিত্ববাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মতের বিচার করিয়া, এই প্রকরণে সর্ব্বনাস্তিত্ববাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মতেরই বিচার করিয়াছেন অর্থাৎ সর্ব্বশূন্যতাবাদই তিনি এই প্রকরণে পূর্ব্বপক্ষরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাই বুঝা যায়। এই সর্ব্বশূন্যতাবাদের অপর নাম অসদ্‌বাদ। পূর্ব্বোক্ত শূন্যবাদ ও অসদ্‌বাদ একই মত নহে। কারণ, অসদ্‌বাদে সকল পদার্থই অসৎ, ইহা ব্যবস্থিত। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত শূন্যবাদে কোন বস্তুই (১) সৎ, (২) অসৎ, (৩) সদসৎ, (৪) এবং সৎও নহে, অসৎও নহে, ইহার কোন পক্ষেই ব্যবস্থিত নহে। উক্তরূপ শূন্যবাদের বিশেষ বিচার বাৎস্যায়নভাষ্যে পাওয়া যায় না। প্রাচীন বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মধ্যে কোন সম্প্রদায় পূর্ব্বোক্ত অসদ্‌বাদ সমর্থন করিতেন। তাহার অনেক পরে কোন সম্প্রদায় সূক্ষ্ম বিচার করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকার শূন্যবাদই সমর্থন করেন, ইহাই আমরা বুঝিতে পারি। কারণ, ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের সময়ে পূর্ব্বোক্ত শূন্যবাদের প্রচার থাকিলে তিনি বৌদ্ধ মতের আলোচনায় অবশ্যই বিশেষরূপে ঐ মতেরও উল্লেখ ও খণ্ডন করিতেন। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকের ২৬শ সূত্র হইতে বৌদ্ধ মতের যে বিচার করিয়াছেন, সেখানে এ সম্বন্ধে অন্যান্য কথা বলিব। এখানে ন্যায়সূত্রে যে, সর্ব্বশূন্যতাবাদ বা অসদ্‌বাদের উল্লেখ হইয়াছে, ইহা কোন বৌদ্ধসম্প্রদায় পরে সিদ্ধান্তরূপে সমর্থন করিলেও

উহা তাঁহাদিগেরই প্রথম উদ্ভাবিত মত নহে। সুপ্রাচীন কালে অন্য নাস্তিকসম্প্রদায়ই পূর্ব্বোক্ত অসদ্বাদের সমর্থন করিয়াছেন। এ বিষয়েও অন্যান্য বক্তব্য দ্বিতীয় আহ্নিকে পূর্ব্বোক্ত স্থানে বলিব।

এখন প্রকৃত কথা এই যে, মহর্ষি গোতম প্রথমে "সর্ব্বমভাবঃ" এই বাক্যের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত নাস্তিক মত প্রকাশ করিয়া, উহার সাধক হেতুবাক্য বলিয়াছেন, "ভাবেম্বিতরেতরাভাবসিদ্ধেঃ"। গো অশ্ব প্রভৃতি যে সকল পদার্থ ভাব অর্থাৎ সৎ বলিয়া কথিত হয়, তাহাই এখানে "ভাব" শব্দের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে। "ইতরেতরাভাব" শব্দের অর্থ পরস্পরের অভাব। পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথা এই যে, "গো অশ্ব নহে" এইরূপে যেমন গোকে অশ্বের অভাব বলিয়া বুঝা যায়, তদ্রূপ "অশ্ব গো নহে" এইরূপে অশ্বকেও গোর অভাব বলিয়া বুঝা যায়। সুতরাং গো অশ্ব প্রভৃতি সমস্ত পদার্থই পরস্পরের অভাবরূপ হওয়ায় অসৎ। এই মতে অভাব বলিতে তুচ্ছ অর্থাৎ অলীক। অভাব বলিয়া সিদ্ধ হইলেই তাহা অলীক হইবে। কারণ, অভাবের সত্তা নাই; যাহার সত্তা নাই, তাহাই "অভাব" শব্দের অর্থ। এই মতে অভাব বা অসতের জ্ঞান হয়। কিন্তু ঐ জ্ঞানও অসৎ। সমস্ত বস্তুই অসৎ, এবং তাহার জ্ঞানও অসৎ, এবং তন্মূলক ব্যবহারও অসৎ, জগতে সৎ কিছুই নাই, সমস্তই অভাব বা অসৎ।

ভাষ্যকার মহর্ষির হেতুবাক্যের উল্লেখপূর্ব্বক পূর্ব্বপক্ষবাদীর যুক্তির ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যে গো পদার্থ সৎ বলিয়া কথিত হয়, উহা অশ্বস্বরূপে অসৎ এবং গো অশ্ব নহে। এইরূপ যে অশ্ব পদার্থ সৎ বলিয়া কথিত হয়, উহাও গোস্বরূপে অসৎ, এবং অশ্ব গো নহে। এইরূপে ভাববোধক "গো" "অশ্ব" প্রভৃতি শব্দের সহিত "অসৎ" এইরূপ প্রতীতির এবং "অসৎ" ও "অনশ্ব" "অগো" ইত্যাদি প্রতিষেধক শব্দের সামানাধিকরণ্যপ্রযুক্ত ঐ সমস্ত পদার্থই "অসৎ", ইহা প্রতিপন্ন হয়। বিভিন্নার্থক শব্দের একই অর্থে প্রবৃত্তিকে প্রাচীনগণ শব্দদ্বয় বা পদদ্বয়ের "সামানাধিকরণ্য" নামে উল্লেখ করিয়াছেন[১]। যেখানে পদার্থদ্বয়ের অভেদদ্যোতক অভিন্নার্থক বিভক্তির প্রয়োগ হয়, সেই স্থলে ঐ একার্থক বিভক্তিমত্ত্বও "সামানাধিকরণ্য" নামে কথিত হইয়াছে। যেমন "নীলো ঘটঃ" এই বাক্যে "নীল" শব্দ ও "ঘট" শব্দের উত্তর অভিন্নার্থক প্রথমা বিভক্তির প্রয়োগ হওয়ায় "ঘট" শব্দের সহিত "নীল" শব্দের "সামানাধিকরণ্য" কথিত হইয়াছে। ঐ "সামানাধিকরণ্য" প্রযুক্ত ঐ স্থলে নীল পদার্থ ও ঘট পদার্থের অভেদ বুঝা যায়। কারণ, উক্ত বাক্যে "নীল" শব্দ ও "ঘট" শব্দের উত্তর অভিন্নার্থক প্রথমা বিভক্তির প্রয়োগবশতঃ ঘট—নীলরূপবিশিষ্ট হইতে অভিন্ন, এইরূপ অর্থ বুঝা যায়। এইরূপ "অসন্ গোঃ" ইত্যাদি বাক্যে "অসৎ" শব্দ ও "গো" প্রভৃতি শব্দের উত্তর অভিন্নার্থক প্রথমা বিভক্তির প্রয়োগ হওয়ায় "গো" প্রভৃতি শব্দের সহিত "অসৎ" শব্দের যে "সামানাধিকরণ্য" আছে, তৎপ্রযুক্ত "অসৎ" ও গো প্রভৃতি পদার্থ যে অভিন্ন পদার্থ, ইহা বুঝা যায়। তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত যুক্তিতে সকল পদার্থই অসৎ, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। কারণ, গো অশ্বরূপে এবং অশ্ব গোরূপে, ঘট, পটরূপে, পট ঘটরূপে, ইত্যাদি প্রকারে অন্যরূপে সকল পদার্থই অসৎ, এইরূপ প্রতীতির বিষয়

১। ভিন্নপ্রবৃত্তিনিমিত্তানাং শব্দানামেকস্মিন্নর্থে প্রবৃত্তিঃ সামানাধিকরণ্যং।—বেদান্তসারের টীকা প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

হইলে সকল পদার্থকেই অসৎ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককার এখানে ভাব-বোধক "গো" প্রভৃতি শব্দের সহিত "অসৎ" এইরূপ প্রতীতির সামানাধিকরণ্য বলিয়া তৎপ্রযুক্ত গো প্রভৃতি পদার্থকে "অসৎ" বলিয়াছেন। কিন্তু বার্ত্তিককার এখানে "সামানাধিকরণ্য" বলিয়াছেন, অভিন্নবিভক্তিমত্ত্ব। তাৎপর্য্যটীকাকার উহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অভিন্নার্থক বিভক্তিমত্ত্ব। এবং তিনি গো প্রভৃতি ভাববোধক শব্দের সহিত "অসৎ" এইরূপ প্রতীতি ও "অসৎ" শব্দ, এই উভয়েরই "সামানাধিকরণ্য" বলিয়াছেন। সুতরাং বুঝা যায় যে, "অসন্ গৌঃ" এইরূপ প্রয়োগে "গো" শব্দ ও "অসৎ" শব্দের উত্তর অভিন্নার্থক প্রথমা বিভক্তির প্রয়োগবশতঃই যখন "গো অসৎ" এইরূপ প্রতীতি হইয়া থাকে, তখন ঐ জন্যই ঐরূপ স্থলে "গো" শব্দের সহিত "অসৎ" শব্দের ন্যায় "অসৎ" এইরূপ প্রতীতিরও "সামানাধিকরণ্য" কথিত হয়। এবং ঐ জন্য "নীলো ঘটঃ" এইরূপ প্রয়োগেও "ঘট" শব্দের সহিত "নীল" শব্দের ন্যায় "নীল" এইরূপ প্রতীতিরও "সামানাধিকরণ্য" কথিত হয়। ভাষ্যকার "অসন্ গৌরশ্বাত্মনা" এই বাক্যের দ্বারা "গো" শব্দের সহিত "অসৎ" এইরূপ প্রতীতির "সামানাধিকরণ্য" প্রদর্শন করিয়া, পরে "অনশ্বো গৌঃ" এই বাক্যের দ্বারা "গো" শব্দের সহিত "অনশ্ব" এই প্রতিষেধের সামানাধিকরণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন এবং "অসন্নশ্বো গবাত্মনা" এই বাক্যের দ্বারা "অশ্ব" শব্দের সহিত "অসৎ" এই প্রতীতির সামানাধিকরণ্য প্রদর্শন করিয়া, পরে "অগৌরশ্বঃ" এই বাক্যের দ্বারা "অশ্ব" শব্দের সহিত "অগো" এই প্রতিষেধের "সামানাধিকরণ্য" প্রদর্শন করিয়াছেন। ভাষ্যে "প্রতিষেধ" শব্দের দ্বারা প্রতিষেধক অর্থাৎ অভাবপ্রতিপাদক শব্দই বিবক্ষিত। "অনশ্ব" এবং "অগো" এই দুইটি শব্দ পূর্ব্বোক্ত স্থলে "অশ্ব নহে" এবং "গো নহে" এইরূপে অশ্ব ও গোর অভাবপ্রতিপাদক হওয়ায় ঐ শব্দদ্বয়কে "প্রতিষেধ" বলা যায়। "গো" শব্দের সহিত "অনশ্ব" শব্দের এবং "অশ্ব" শব্দের সহিত "অগো" শব্দের পূর্ব্বোক্তরূপ সামানাধিকরণ্যপ্রযুক্ত "অনশ্বো গৌঃ" এই বাক্যের দ্বারা গো অশ্বের অভাবাত্মক, এবং "অগৌরশ্বঃ" এই বাক্যের দ্বারা অশ্ব গোর অভাবাত্মক, ইহা বুঝা যায়। এইরূপ অন্যান্য সমস্ত শব্দের সহিতই পূর্ব্বোক্তরূপে "অসৎ" এইরূপ প্রতীতির সামানাধিকরণ্য এবং পূর্ব্বোক্তরূপ প্রতিষেধের সামানাধিকরণ্য প্রযুক্ত সমস্ত শব্দই অভাব-বোধক, ইহা বুঝা যায়। বার্ত্তিককার উক্ত যুক্তির ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, ঘটের উৎপত্তির পূর্ব্বে ও বিনাশের পরে "ঘটো নাস্তি" এইরূপ বাক্য প্রয়োগ হয়। সেইস্থানে ঘট শব্দ "অসৎ" এইরূপ প্রতীতি এবং "নাস্তি" এই প্রতিষেধের সমানাধিকরণ হওয়ায় যেমন ঘটের অত্যন্ত অসত্তার প্রতিপাদক হয়, তদ্রূপ অন্যান্য সমস্ত শব্দই "অসৎ" এইরূপ প্রতীতি এবং "অনশ্ব" "অগো" ইত্যাদি প্রতিষেধের সমানাধিকরণ হওয়ায় অভাবের প্রতিপাদক হয়, অর্থাৎ সমস্ত শব্দই অভাবের বোধক, সমস্ত শব্দের অর্থই অভাব, সুতরাং সমস্ত পদার্থই অভাব অর্থাৎ অসৎ বা অলীক। তাৎপর্য্যটীকাকার অনুমান প্রয়োগ প্রদর্শন করিয়া বার্ত্তিককারের পূর্ব্বোক্ত যুক্তি ব্যক্ত করিয়াছেন[১]। পরন্তু তিনি পূর্ব্বোক্ত মতের বিশেষ যুক্তি বলিয়াছেন যে, সৎপদার্থ স্বীকার করিতে হইলে ঐ

১। প্রয়োগশ্চ—সর্বে ভাবশব্দা অসদ্বিষয়াঃ, অসৎপ্রত্যয়প্রতিষেধাভ্যাং সামানাধিকরণ্যাৎ, অনুৎপন্নপ্রধ্বস্তঘট-শব্দবৎ।—তাৎপর্য্যটীকা

সকল পদার্থ নিত্য, কি অনিত্য, ইহা বলিতে হইবে। নিত্য বলিলে সত্ত্বা থাকিতে পারে না কারণ, কার্য্যকারিত্বই সত্তা। যে পদার্থ কোন কার্য্যকারী হয় না, তাহাকে "সৎ" বলা যায় না। কিন্তু যাহা নিত্য বলিয়া স্বীকৃত হইবে, তাহার সর্ব্বদা বিদ্যমানতাবশতঃ ক্রমিকত্ব সম্ভব না হওয়ায় তজ্জন্য কার্য্যের ক্রমিকত্ব সম্ভব হয় না অর্থাৎ নিত্য পদার্থ কার্য্যকারী বা কার্য্যের জনক বলিলে সর্ব্বদাই কার্য্য জন্মিতে পারে। সুতরাং নিত্য পদার্থের কার্য্যকারিত্ব সম্ভব না হওয়ায় তাহাকে সৎ বলা যায় না। আর যদি সৎপদার্থ স্বীকার করিয়া সকল পদার্থকে অনিত্যই বলা হয়, তাহা হইলে বিনাশ উহার স্বভাব বলিতে হইবে, নচেৎ কোন দিনই উহার বিনাশ হইতে পারে না। কারণ, যাহা পদার্থের স্বভাব নহে, তাহা কেহ করিতে পারে না। নীলকে সহস্র কারণের দ্বারাও কেহ পীত করিতে পারে না। কারণ, পীত, নীলের স্বভাব নহে। সুতরাং অনিত্য পদার্থকে বিনাশ-স্বভাব বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলে ঐ অনিত্য পদার্থের উৎপত্তিক্ষণেও উহার বিনাশ স্বীকার করিতে হইবে। নচেৎ বিনাশকে উহার স্বভাব বলা যায় না। কারণ, যাহা স্বভাব, তাহা উহার আধারের অস্তিত্বকালে প্রতিক্ষণেই বিদ্যমান থাকিবে। সুতরাং যদি অনিত্য পদার্থের উৎপত্তিক্ষণ হইতে প্রতিক্ষণেই উহার বিনাশরূপ স্বভাব স্বীকার্য্য হয়, তাহা হইলে সর্ব্বদা উহার অসত্তাই স্বীকৃত হইবে; কোন পদার্থকেই কোন কালেই সৎ বলা যাইবে না। অতএব শূন্যতা বা অভাবই সকল পদার্থের বাস্তব তত্ত্ব, সকল পদার্থই পরমার্থতঃ অসৎ, কিন্তু অবাস্তব কল্পনাবশতঃ সতের ন্যায় প্রতীত হয়। এখানে তাৎপর্য্যটীকাকারের কথার দ্বারা "ভামতী" প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁহার ব্যাখ্যাত শূন্যবাদ হইতে উক্ত সর্ব্বশূন্যতাবাদ যে, তাঁহার মতেও পৃথক্ মত, ইহা বুঝা যায়। ন্যায়দর্শনের প্রথম সূত্রভাষ্যে বিতণ্ডাপরীক্ষায় ভাষ্যকার শেষে উক্ত সর্ব্বশূন্যতাবাদীর মতই খণ্ডন করিয়াছেন, ইহাও বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু সেখানে তাৎপর্য্যটীকাকারের কথানুসারে তাঁহার ব্যাখ্যাত শূন্যবাদীর মতানুসারেই ভাষ্যতাৎপর্য্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ১ম খণ্ড, ২৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।৩৭।

ভাষ্য। **প্রতিজ্ঞাবাক্যে পদয়োঃ প্রতিজ্ঞাহেত্বোশ্চ ব্যাঘাতাদযুক্তং।**

অনেকস্যাশেষতা সর্ব্বশব্দস্যার্থো ভাবপ্রতিষেধশ্চাভাবশব্দার্থঃ। পূর্ব্বং সোপাখ্যমুত্তরং নিরুপাখ্যং, তত্র সমুপাখ্যায়মানং কথং নিরুপাখ্যমভাবঃ স্যাদিতি, ন জাত্বভাবো নিরুপাখ্যোহনেকতয়াহশেষতয়া শক্যঃ প্রতিজ্ঞাতুমিতি। সর্ব্বমেতদভাব ইতি চেৎ? যদিদং সর্ব্বমিতি মন্যসে তদভাব ইতি, এবঞ্চেদনিবৃত্তো ব্যাঘাতঃ, অনেকমশেষঞ্চেতি নাভাবে প্রত্যয়েন শক্যং ভবিতুং, অস্তি চায়ং প্রত্যয়ঃ সর্ব্বমিতি, তস্মান্নাভাব ইতি।

প্রতিজ্ঞাহেত্বোশ্চ ব্যাঘাতঃ "সর্ব্বমভাবঃ" ইতি ভাবপ্রতিষেধঃ প্রতিজ্ঞা, "ভাবেম্বিতরেতরাভাবসিদ্ধে"রিতি হেতুঃ। ভাবেম্বিতরেতরাভাব-

মনুজ্ঞায়াশ্রিত্য চেতরেতরাভাবসিদ্ধ্যা "সর্ব্বমভাব" ইত্যুচ্যতে,—যদি "সর্ব্বমভাবঃ", "ভাবেম্বিতরেতরাভাবসিদ্ধে"রিতি নোপপদ্যতে,—অথ "ভাবেম্বিতরেতরাভাবসিদ্ধিঃ', 'সর্ব্বমভাব' ইতি নোপপদ্যতে।

অনুবাদ। (উত্তর) প্রতিজ্ঞাবাক্যে পদদ্বয়ের এবং প্রতিজ্ঞাবাক্য ও হেতু-বাক্যের বিরোধবশতঃ (পূর্ব্বোক্ত মত) অযুক্ত। (প্রতিজ্ঞাবাক্যে পদদ্বয়ের বিরোধ বুঝাইতেছেন) অনেক পদার্থের অশেষত্ব "সর্ব্ব" শব্দের অর্থ। ভাবের প্রতিষেধ "অভাব" শব্দের অর্থ। পূর্ব্ব অর্থাৎ প্রথমোক্ত '"সর্ব্ব" শব্দের অর্থ—সোপাখ্য অর্থাৎ সস্বরূপ সৎ, উত্তর অর্থাৎ শেষোক্ত "অভাব" শব্দের অর্থ নিরুপাখ্য অর্থাৎ নিঃস্বরূপ অলীক। তাহা হইলে সমুপাখ্যায়মান অর্থাৎ সস্বরূপ পদার্থ কিরূপে নিঃস্বরূপ অভাব হইবে? কখনও নিঃস্বরূপ অভাবকে অনেকত্ব ও অশেষত্ববিশিষ্ট বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতে পারা যায় না। (পূর্ব্বপক্ষ) এই সমস্ত অভাব, ইহা যদি বল? (বিশদার্থ) এই যাহাকে সর্ব্ব বলিয়া মনে কর,—অর্থাৎ সর্ব্ব বলিয়া বুঝিয়া থাক, তাহা অভাব, (উত্তর) এইরূপ যদি বল, (তাহা হইলেও) বিরোধ নিবৃত্ত হয় না। (কারণ) অভাবে অর্থাৎ অসৎ বিষয়ে "অনেক" এবং "অশেষ",—এইরূপ বোধ হইতে পারে না। কিন্তু "সর্ব্ব" এইরূপ বোধ আছে, অর্থাৎ ঐরূপ বোধ সর্ব্বসম্মত,—অতএব (সর্ব্বপদার্থই) অভাব নহে।

প্রতিজ্ঞাবাক্য ও হেতুবাক্যেরও বিরোধ। (এই বিরোধ বুঝাইতেছেন) "সর্ব্বমভাবঃ" এই ভাব-প্রতিষেধ-বাক্য প্রতিজ্ঞা, "ভাবেম্বিতরেতরাভাবসিদ্ধেঃ" এই বাক্য হেতু। ভাব পদার্থসমূহে পরস্পরাভাব স্বীকার করিয়া এবং আশ্রয় করিয়া পরস্পরাভাবের সিদ্ধিপ্রযুক্ত "সকল পদার্থই অভাব" ইহা কথিত হইতেছে—(কিন্তু) যদি সকল পদার্থই অভাব হয়, তাহা হইলে ভাব পদার্থসমূহে পরস্পরা-ভাবের সিদ্ধি হয়, ইহা অর্থাৎ এই হেতু উপপন্ন হয় না,—আর যদি ভাব পদার্থসমূহে পরস্পরাভাবের সিদ্ধি হয়, তাহা হইলে সকল পদার্থই অভাব, ইহা উপপন্ন হয় না।

টিপ্পনী। ভাষ্যকার প্রথমে মহর্ষিসূত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষের ব্যাখ্যা করিয়া, পরে এখানেই ঐ পূর্ব্ব-পক্ষের সর্ব্বথা অনুপপত্তি প্রদর্শনের জন্য নিজে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বপক্ষবাদীর "সর্ব্বমভাবঃ" এই প্রতিজ্ঞাবাক্যে "সর্ব্ব" পদ ও "অভাব" পদ এই দুইটি পদের ব্যাঘাত এবং তাঁহার প্রতিজ্ঞাবাক্য ও হেতুবাক্যেরও ব্যাঘাতবশতঃ তাঁহার ঐ মত অযুক্ত। প্রথমে প্রতিজ্ঞাবাক্যে "সর্ব্ব" পদ ও "অভাব"

পদের ব্যাঘাত বুঝাইতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, অনেক পদার্থের অশেষত্ব "সর্ব্ব" শব্দের অর্থ[১] এবং ভাবের প্রতিষেধ "অভাব" শব্দের অর্থ। সুতরাং সর্ব্বপদার্থ সোপাখ্য, অভাব পদার্থ নিরুপাখ্য। কারণ, যে ধর্ম্মের দ্বারা পদার্থ উপাখ্যাত (লক্ষিত) হয়, অর্থাৎ পদার্থের যাহা স্বরূপলক্ষণ, তাহাকে ঐ পদার্থের উপাখ্যা বলা যায়। অনেকত্ব ও অশেষত্বরূপ ধর্ম্মের দ্বারা সর্ব্বপদার্থ উপাখ্যাত হইয়া থাকে। কারণ, "সর্ব্বে ঘটাঃ" এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিলে "সর্ব্ব" শব্দের দ্বারা অশেষ ঘটই বুঝা যায়। কতিপয় ঘট বুঝাইতে "সর্ব্বে ঘটাঃ" এইরূপ বাক্য প্রয়োগ হয় না। সুতরাং সর্ব্বপদার্থে অনেকত্ব ও অশেষত্বরূপ ধর্ম্ম বস্তুতঃ না থাকিলে সর্ব্বপদার্থ নিরূপণ করাই যায় না। অতএব অনেকত্ব ও অশেষত্বরূপ ধর্ম্ম সর্ব্বপদার্থের উপাখ্যা হওয়ায় উহা সোপাখ্য পদার্থ। কিন্তু পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতে অভাবের বাস্তব সত্তা না থাকায় অভাব নিঃস্বরূপ। সুতরাং তাঁহার মতে অভাবের কোন উপাখ্যা বা লক্ষণ না থাকায় অভাব নিরুপাখ্য। তাহা হইলে সর্ব্বপদার্থ যাহা সোপাখ্য, তাহাকে অভাব অর্থাৎ নিরুপাখ্য বলা যায় না। সস্বরূপ পদার্থ কখনই নিঃস্বরূপ হইতে পারে না। ফলকথা, পূর্ব্বপক্ষবাদীর "সর্ব্বমভাবঃ" এই প্রতিজ্ঞাবাক্যে "সর্ব্ব" পদ ও "অভাব" পদ পরস্পর বিরুদ্ধার্থক। কারণ, সর্ব্বপদার্থ সস্বরূপ বলিয়া সৎ, অভাবপদার্থ নিঃস্বরূপ বলিয়া অসৎ। সুতরাং "সর্ব্ব" বলিলেই সৎপদার্থ স্বীকৃত হওয়ায় "সর্ব্ব পদার্থ অভাব," ইহা আর বলা যায় না। তাহা বলিলে "সৎ পদার্থ সৎ নহে" এইরূপ কথাই বলা হয়। সুতরাং ঐ প্রতিজ্ঞাবাক্যে "সর্ব্ব" পদ ও "অভাব" পদের বিরুদ্ধার্থকতারূপ ব্যাঘাত বা বিরোধবশতঃ ঐরূপ প্রতিজ্ঞাই হইতে পারে না। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, নিঃস্বরূপ অভাবকে অনেকত্ব ও অশেষত্ববিশিষ্ট বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতে পারা যায় না। তাৎপর্য্য এই যে, অনেকত্ব ও অশেষত্ব সর্ব্ব পদার্থের ধর্ম্ম, উহা অভাবের ধর্ম্ম নহে। কারণ, অভাবের কোন স্বরূপই নাই। সুতরাং অনেকত্ব ও অশেষত্ব যাহা সর্ব্ব পদার্থের সর্ব্বত্ব, তাহা অভাবে না থাকায় সর্ব্ব পদার্থের সহিত অভিন্নরূপে অভাব বুঝাইয়া "সর্ব্বমভাবঃ" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করা যায় না। পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথা এই যে, আমি ঐরূপ সর্ব্ব পদার্থ স্বীকার করি না। সুতরাং আমার নিজের মতে সর্ব্ব পদার্থ সোপাখ্য বা সস্বরূপ না হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত বিরোধ নাই। আমার "সর্ব্বমভাবঃ" এই প্রতিজ্ঞাবাক্যের অর্থ এই যে, তোমরা যাহাকে সর্ব্ব বলিয়া বুঝিয়া থাক, অর্থাৎ তোমাদিগের মতে যাহা সস্বরূপ বা সৎ, তাহা বস্তুতঃ অভাব অর্থাৎ অসৎ। এতদুত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, এইরূপ বলিলেও বিরোধ নিবৃত্ত হয় না। কারণ, "সর্ব্বং" এইরূপ বোধ সকলেরই স্বীকার্য্য। ঐ বোধের বিষয় অনেক ও অশেষ। কিন্তু অনেক ও অশেষ বলিয়া যে বোধ জন্মে, ঐ বোধ অভাববিষয়ক নহে। অভাব বা অসৎ বিষয়ে ঐরূপ বোধ হইতেই পারে না।

১। "সর্ব্বে ঘটাঃ" ইত্যাদি প্রয়োগে 'সর্ব্ব' শব্দের দ্বারা অশেষত্ববিশিষ্ট অর্থের বোধ হওয়ায় বিশেষণভাবে অশেষত্ব ও সর্ব্ব শব্দের অর্থ, এই তাৎপর্য্যেই ভাষ্যকার এখানে অশেষত্বকে "সর্ব্ব" শব্দের অর্থ বলিয়াছেন। "শক্তিবাদ" গ্রন্থে গদাধর ভট্টাচার্য্যও সর্ব্ব পদার্থ বিচারের প্রারম্ভে অশেষত্বকে সর্ব্ব পদার্থ বলিয়া বিচারপূর্ব্বক শেষে বিশিষ্ট যাবত্ত্বকে সর্ব্ব পদার্থ বলিয়াছেন এবং "সর্ব্বং গগনং" এইরূপ প্রয়োগ না হওয়ায় যাবত্ত্বের ন্যায় অনেকত্বও সর্ব্ব পদার্থ, ইহা বলিয়াছেন। ভাষ্যকারের "অনেকত্বাশেষতা সর্ব্বশব্দার্থঃ" এই বাক্যেরও ঐরূপ তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে।

কারণ, অভাবে অনেকত্ব ও অংশত্ব ধর্ম্ম নাই। অভাব নিঃস্বরূপ। সুতরাং "সর্ব্বং" এইরূপ সর্ব্বজনসিদ্ধ বোধের বিষয় সৎ পদার্থ, উহা অভাব বা অসৎ হইতেই পারে না। অতএব পূর্ব্বপক্ষবাদীর প্রতিজ্ঞাবাক্যে "সর্ব্ব"পদ ও "অভাব" পদের বিরোধ অনিবার্য্য। ভাষ্যকার শেষে পূর্ব্বপক্ষবাদীর প্রতিজ্ঞাবাক্য ও হেতুবাক্যেরও যে বিরোধ পূর্ব্বে বলিয়াছেন, উহার উল্লেখ করিয়া, ঐ বিরোধ বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, "সর্ব্বমভাবঃ" এই ভাবপ্রতিষেধক বাক্যটি প্রতিজ্ঞা। "ভাবেম্বিতরেতরাভাবসিদ্ধেঃ" এই বাক্যটি হেতু। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষবাদী ভাব পদার্থ একেবারেই অস্বীকার করিলে তাঁহার ঐ হেতুবাক্য বলিতেই পারেন না। তিনি ভাব পদার্থসমূহে পরস্পরাভাব স্বীকার করিয়া এবং উহা আশ্রয় করিয়াই ভাবসমূহে পরস্পরাভাবের সিদ্ধিপ্রযুক্ত অর্থাৎ তাঁহার কথিত হেতুপ্রযুক্ত সকল পদার্থ অভাব, ইহা বলিয়াছেন। কিন্তু সকল পদার্থই যদি অভাব হয়, তাহা হইলে ভাবপদার্থ একেবারেই না থাকায় তিনি যে, ভাব পদার্থসমূহে পরস্পরাভাবের সিদ্ধিকে হেতু বলিয়াছেন, তাহা উপপন্ন হয় না। কারণ, ভাব পদার্থ অস্বীকার করিলে ভাব পদার্থসমূহে পরস্পরাভাবের সিদ্ধি, এই কথাই বলা যায় না। আর যদি ভাব পদার্থ স্বীকার করিয়া ভাব পদার্থসমূহে পরস্পরাভাবের সিদ্ধিকে হেতু বলা যায়, তাহা হইলে সকল পদার্থই অভাব, এই সিদ্ধান্ত উপপন্ন হয় না। ফলকথা, পূর্ব্বপক্ষবাদীর প্রতিজ্ঞা ও হেতুবাক্য পরস্পর বিরুদ্ধার্থক। কারণ, প্রতিজ্ঞাবাক্যের দ্বারা সকল পদার্থই অভাব, ইহা বুঝা যায়। হেতুবাক্যের দ্বারা ভাব পদার্থও আছে, ইহা বুঝা যায়। সুতরাং সকল পদার্থই অভাব, এই প্রতিজ্ঞার্থ সাধন করিতে যে হেতুবাক্য বলা হইয়াছে, তাহাতে ভাবপদার্থ স্বীকৃত ও আশ্রিত হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞাবাক্য ও হেতুবাক্যের ব্যাঘাত (বিরোধ) অনিবার্য্য। বার্ত্তিককার এখানে পূর্ব্বপক্ষবাদীর প্রতিজ্ঞাবাক্যস্থ "অভাব" শব্দেও ব্যাঘাত প্রদর্শন করিয়াছেন যে, ভাব অর্থাৎ সৎপদার্থ না থাকিলে অভাব শব্দেরই প্রয়োগ হইতে পারে না। যাহা ভাব নহে, এই অর্থে "নঞ্" শব্দের সহিত "ভাব" শব্দের সমাসে "অভাব" শব্দ নিষ্পন্ন হইলে ভাব পদার্থ অবশ্য স্বীকার্য্য। কারণ, ভাব পদার্থ একেবারেই না থাকিলে "ভাব" শব্দের পূর্ব্বে "নঞ্" শব্দের যোগই হইতে পারে না। যেমন এক না মানিলে "অনেক" বলা যায় না, নিত্য না মানিলে "অনিত্য" বলা যায় না, তদ্রূপ ভাব না মানিলে "অভাব" বলা যায় না। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষবাদীর নিজ মতে "অভাব" শব্দও ব্যাহত।

ভাষ্য। সূত্রেণ চাভিসম্বন্ধঃ।

অনুবাদ। সূত্রের সহিতও অর্থাৎ পরবর্ত্তী সূত্রোক্ত দোষের সহিতও (পূর্ব্বোক্ত দোষের) সম্বন্ধ (বুঝিবে)।

সূত্র। ন স্বভাবসিদ্ধের্ভাবানাং ॥৩৮॥৩৮১॥

অনুবাদ। (উত্তর) না, অর্থাৎ সকল পদার্থই অভাব নহে, কারণ, ভাবসমূহের স্বভাবসিদ্ধি অর্থাৎ স্বকীয় ধর্ম্মরূপে সত্তা আছে।

ভাষ্য। ন সর্ব্বমভাবঃ, কস্মাৎ ? স্বেন ভাবেন সদ্ভাবাদ্ভাবানাং, স্বেন ধর্ম্মেণ ভাবা ভবন্তীতি প্রতিজ্ঞায়তে। কশ্চ স্বো ধর্ম্মো ভাবানাং ? দ্রব্যগুণকর্ম্মণাং সদাদিসামান্যং, দ্রব্যাণাং ক্রিয়াবদিত্যেবমাদির্ব্বিশেষঃ, "স্পর্শপর্য্যন্তাঃ পৃথিব্যা" ইতিচ, প্রত্যেকঞ্চানন্তো ভেদঃ, সামান্যবিশেষসমবায়ানাঞ্চ বিশিষ্টা ধর্ম্মা গৃহ্যন্তে। সোঽয়মভাবস্য নিরুপাখ্যত্বাৎ সংপ্রত্যায়কোঽর্থভেদো ন স্যাৎ, অস্তি ত্বয়ং, তস্মান্ন সর্ব্বমভাব ইতি।

অথবা "**ন স্বভাবসিদ্ধের্ভাবানা**"মিতি স্বরূপসিদ্ধেরিতি। "গৌ"রিতি প্রযুজ্যমানে শব্দে জাতিবিশিষ্টং দ্রব্যং গৃহ্যতে নাভাবমাত্রং যদি চ সর্ব্বমভাবঃ, গৌরিত্যভাবঃ প্রতীয়েত, "গো"শব্দেন চাভাব উচ্যেত। যস্মাত্তু "গো"শব্দপ্রয়োগে দ্রব্যবিশেষঃ প্রতীয়তে নাভাবস্তস্মাদযুক্তমিতি।

অথবা "**ন স্বভাবসিদ্ধে**"রিতি 'অসন্ গৌরশ্বাত্মনা' ইতি, গবাত্মনা কস্মান্নোচ্যতে ? অবচনাদ্গবাত্মনা গৌরস্তীতি স্বভাবসিদ্ধিঃ। "অনশ্বোঽশ্ব" ইতি বা "গৌরগৌ"রিতি বা কস্মান্নোচ্যতে ? অবচনাৎ স্বেন রূপেণ বিদ্যমানতা দ্রব্যস্যেতি বিজ্ঞায়তে।

অব্যতিরেকপ্রতিষেধে চ ভাবেনাসৎপ্রত্যয়সামানাধিকরণ্যং।* সংযোগাদিসম্বন্ধো ব্যতিরেকঃ, অত্রাব্যতিরেকোঽভেদাখ্যসম্বন্ধঃ, তৎপ্রতিষেধে চাসৎপ্রত্যয়সামানাধিকরণ্যং, যথা 'ন সন্তি কুণ্ডে বদরাণী'তি। অসন্ গৌরশ্বাত্মনা, অনশ্বো গৌরিতি চ গবাশ্বয়োরব্যতিরেকঃ প্রতিষিধ্যতে গবাশ্বয়োরেকত্বং নাস্তীতি, তস্মিন্ প্রতিষিধ্যমানে ভাবে ন গবা সামানাধিকরণ্যমসৎপ্রত্যয়স্য 'অসন্ গৌরশ্বাত্মনে'তি যথা

---

* এখানে পূর্ব্বপ্রচলিত অনেক পুস্তকে "অব্যতিরেকপ্রতিষেধে চ ভাবানামসংযোগাদিসম্বন্ধো ব্যতিরেকঃ" ইত্যাদি এবং কোন কোন পুস্তকে "ভাবানাং সংযোগাদিসম্বন্ধো ব্যতিরেকঃ" ইত্যাদি পাঠ আছে। কোন পুস্তকে অন্যরূপ পাঠও আছে। কিন্তু ঐ সমস্ত পাঠ প্রকৃত বলিয়া বুঝিতে পারি নাই। উদ্ধৃত ভাষ্যপাঠই প্রকৃত বলিয়া বোধ হওয়ায় গৃহীত হইল। পরে কোন পুস্তকে ঐরূপ পাঠই গৃহীত হইয়াছে দেখিয়াছি। কিন্তু তাহাতেও "ভাবানাং" এইরূপ ষষ্ঠ্যন্ত পাঠ গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু পরে ভাষ্যকারের "ভাবেন গবা" ইত্যাদি ব্যাখ্যার দ্বারা এবং বার্ত্তিককারের "ভাবেন" এইরূপ তৃতীয়ান্ত পাঠের দ্বারা এখানে ভাষ্যে "ভাবেন" এইরূপ পাঠই প্রকৃত বলিয়া বোধ হওয়ায় গৃহীত হইল। সুধীগণ এখানে প্রচলিত ভাষ্যপাঠের ব্যাখ্যা করিয়া প্রকৃত পাঠ নির্ণয় করিবেন।

"ন সন্তি কুণ্ডে বদরাণী"তি কুণ্ডে বদরসংযোগে প্রতিষিধ্যমানে সদ্ভিরসৎ-প্রত্যয়স্য সামানাধিকরণ্যমিতি।

অনুবাদ। সকল পদার্থ অভাব নহে। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) যেহেতু স্বকীয় ধর্ম্মরূপে ভাবসমূহের সত্তা আছে, স্বকীয় ধর্ম্মরূপে ভাবসমূহ আছে, ইহা প্রতিজ্ঞাত হয় [অর্থাৎ আমরা স্বকীয় ধর্ম্মরূপে ভাবসমূহের সত্তা প্রতিজ্ঞা করিয়া হেতুর দ্বারা উহা সিদ্ধ করায় সকল পদার্থ অভাব, এইরূপ প্রতিজ্ঞা হইতে পারে না]। (প্রশ্ন) ভাবসমূহের স্বকীয় ধর্ম্ম কি? (উত্তর) দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের সত্তা প্রভৃতি সামান্য ধর্ম্ম, দ্রব্যের ক্রিয়াবত্তা প্রভৃতি বিশেষ ধর্ম্ম, এবং পৃথিবীর স্পর্শ পর্য্যন্ত অর্থাৎ গন্ধ, রস, রূপ ও স্পর্শ, এই চারিটি বিশেষ গুণ ইত্যাদি, এবং প্রত্যেকের অর্থাৎ দ্রব্যাদি ভাব পদার্থের এবং গন্ধাদি গুণের প্রত্যেকের অসংখ্য ভেদ। সামান্য, বিশেষ এবং সমবায়েরও অর্থাৎ বৈশেষিকশাস্ত্র-বর্ণিত সামান্যাদি পদার্থত্রয়েরও বিশিষ্ট ধর্ম্ম (নিত্যত্ব ও সামান্যত্বাদি) গৃহীত হয়। অভাবের নিরুপাখ্যত্ব-(নিঃস্বরূপত্ব)বশতঃ সেই এই অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সত্তা, অনিত্যত্ব, ক্রিয়াবত্ত্ব, গুণবত্ত্ব প্রভৃতি সংপ্রত্যায়ক (পরিচায়ক) অর্থভেদ অর্থাৎ দ্রব্যাদি পদার্থের পূর্ব্বোক্ত স্বকীয় ধর্ম্মরূপ স্বভাবভেদ থাকে না, কিন্তু ইহা অর্থাৎ দ্রব্যাদি পদার্থের পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থভেদ বা স্বভাবভেদ আছে, অতএব সকল পদার্থ অভাব নহে।

অথবা "ন স্বভাবসিদ্ধের্ভাবানাং" এই সূত্রে ("স্বভাবসিদ্ধেঃ" এই বাক্যের অর্থ) স্বরূপসিদ্ধিপ্রযুক্ত। (তাৎপর্য্য) "গৌঃ" এই শব্দ প্রযুজ্যমান হইলে জাতিবিশিষ্ট দ্রব্য গৃহীত হয়, অভাবমাত্র গৃহীত হয় না। কিন্তু যদি সকল পদার্থই অভাব হয়, তাহা হইলে "গৌঃ" এইরূপে অভাব প্রতীত হউক? এবং "গো"শব্দের দ্বারা অভাব কথিত হউক? কিন্তু যেহেতু "গো"শব্দের প্রয়োগ হইলে দ্রব্যবিশেষই প্রতীত হয়, অভাব প্রতীত হয় না, অতএব (পূর্ব্বোক্ত মত) অযুক্ত।

অথবা "ন স্বভাবসিদ্ধেঃ" ইত্যাদি সূত্রের (অন্যরূপ তাৎপর্য্য)। "গো অশ্বস্বরূপে অসৎ" এই বাক্যে "গোস্বরূপে" কেন কথিত হয় না? অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষবাদী "গো গোস্বরূপে অসৎ" ইহা কেন বলেন না? অবচনপ্রযুক্ত অর্থাৎ যেহেতু পূর্ব্বপক্ষবাদীও এইরূপ বলেন না, অতএব গোস্বরূপে গো আছে, এইরূপে স্বভাবসিদ্ধি (স্বস্বরূপে গোর অস্তিত্ব সিদ্ধি) হয়। এবং "অশ্ব অশ্ব নহে," "গো গো নহে" ইহাই বা কেন কথিত হয় না? অবচনপ্রযুক্ত অর্থাৎ যেহেতু পূর্ব্বপক্ষ-

বাদীও ঐরূপ বলেন না, অতএব স্বকীয় রূপে (অশ্বত্বাদিরূপে) দ্রব্যের (অশ্বাদির) অস্তিত্ব আছে, ইহা বুঝা যায়।

"অব্যতিরেকে"র (অভেদসম্বন্ধের) প্রতিষেধ হইলেও অর্থাৎ তন্নিমিত্তও ভাবের (গবাদি সৎপদার্থের) সহিত, "অসৎ" এইরূপ প্রতীতির "সামানাধিকরণ্য" হয়। (বিশদার্থ) সংযোগাদিসম্বন্ধকে "ব্যতিরেক" বলে। এখানে "অব্যতিরেক" বলিতে অভেদ নামক সম্বন্ধ। সেই অভেদ সম্বন্ধের প্রতিষেধ হইলেও "অসৎ" এইরূপ প্রতীতির "সামানাধিকরণ্য" হয়, যেমন "কুণ্ডে বদর নাই"। (তাৎপর্য্য) "গো অশ্বস্বরূপে অসৎ" এবং "গো অশ্ব নহে" এই বাক্যের দ্বারা গো এবং অশ্বের একত্ব (অভেদ) নাই, এইরূপে গো এবং অশ্বের "অব্যতিরেক" (অভেদ) প্রতিষিদ্ধ হয়। সেই "অব্যতিরেক" প্রতিষিধ্যমান হইলে ভাব অর্থাৎ সৎ গোপদার্থের সহিত "গো অশ্বস্বরূপে অসৎ" এইরূপে "অসৎ" প্রতীতির সামানাধিকরণ্য হয়, যেমন "কুণ্ডে বদর নাই", এই বাক্যের দ্বারা কুণ্ডে বদরের সংযোগ প্রতিষিধ্যমান হইলে সৎ বদরের সহিত "অসৎ" প্রতীতির সামানাধিকরণ্য হয়।

টিপ্পনী। পূর্ব্বসূত্রের ব্যাখ্যার পরে ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত মতে দোষ প্রদর্শন করিয়া, শেষে এই সূত্রের অবতারণা করিতে বলিয়াছেন, "সূত্রেণ চাভিসম্বন্ধঃ"। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বোক্ত মত খণ্ডন করিতে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা যাহা বলিয়াছেন, তাহার সহিতও আমার কথিত দোষের সম্বন্ধ বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ আমার কথিত দোষবশতঃ এবং মহর্ষির এই সূত্রোক্ত দোষবশতঃ "সকল পদার্থই অভাব" এই মত উপপন্ন হয় না। পূর্ব্বোক্ত মত খণ্ডন করিতে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, সকল পদার্থ অভাব নহে অর্থাৎ সকল পদার্থের অভাবত্ব বা অসত্ত্ব বাধিত ; কারণ, ভাবসমূহের স্বকীয় ধর্ম্মরূপে সত্তা আছে। ভাষ্যকার মহর্ষির মূল তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, ভাবসমূহ স্বকীয় ধর্ম্মরূপে আছে, ইহা প্রতিজ্ঞাত হয়। তাৎপর্য্য এই যে, স্বকীয় ধর্ম্মরূপে দ্রব্যাদি ভাব পদার্থ আছে অর্থাৎ "সৎ" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া হেতুর দ্বারা সকল পদার্থের সত্তা সিদ্ধ করায় পূর্ব্বপক্ষবাদীর "সর্ব্বমভাবঃ" এই প্রতিজ্ঞার্থ বাধিত। সুতরাং তিনি উহা সিদ্ধ করিতে পারেন না। অবশ্য ভাবসমূহের স্বকীয় ধর্ম্মরূপে সত্তা সিদ্ধ হইলে উহাদিগের অভাবত্ব অর্থাৎ অসত্তা বা অলীকত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। কিন্তু ভাবসমূহের স্বকীয় ধর্ম্ম কি ? তাহা না বুঝিলে ভাষ্যকারের ঐ কথা বুঝা যায় না। তাই ভাষ্যকার নিজেই ঐ প্রশ্ন করিয়া তদুত্তরে বলিয়াছেন যে, দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের সত্তা অনিত্যত্ব প্রভৃতি সামান্য ধর্ম্ম, স্বকীয় ধর্ম্ম, এবং দ্রব্যের ক্রিয়াবত্ত্ব প্রভৃতি বিশেষ ধর্ম্ম স্বকীয় ধর্ম্ম, এবং দ্রব্যের মধ্যে পৃথিবীর স্পর্শ পর্য্যন্ত অর্থাৎ গন্ধ, রস, রূপ ও স্পর্শ নামক বিশেষ গুণ স্বকীয় ধর্ম্ম, ইত্যাদি।

বৈশেষিক দর্শনে মহর্ষি কণাদ, দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় নামে ষট্ প্রকার

ভাব পদার্থের উল্লেখ করিয়া "সদনিত্যং"[১] ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা সত্তা ও অনিত্যত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মকে তাঁহার পূর্ব্বকথিত দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মনামক পদার্থত্রয়ের সামান্য ধর্ম্ম বলিয়াছেন। এবং "ক্রিয়া-গুণবৎসমবায়িকারণমিতি দ্রব্যলক্ষণং" (১।১।১৫) এই সূত্রের দ্বারা ক্রিয়াবত্ত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মকে দ্রব্যের লক্ষণ বলিয়া দ্রব্যের বিশেষ ধর্ম্ম বলিয়াছেন। এইরূপ পরে গুণ ও কর্ম্মেরও লক্ষণ বলিয়া বিশেষ ধর্ম্ম বলিয়াছেন। ভাষ্যকার এখানে পূর্ব্বোক্ত কণাদসূত্রানুসারেই কণাদোক্ত দ্রব্য, গুণ ও কর্ম্মের সামান্য ধর্ম্ম ও বিশেষ ধর্ম্মকে স্বকীয় ধর্ম্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কণাদের "সদনিত্যং" ইত্যাদি সূত্রে "সৎ" ও "অনিত্য" প্রভৃতি শব্দেরই প্রয়োগ থাকায় তদনুসারে ভাষ্যকারও বলিয়াছেন—"সদাদি-সামান্যং"। এবং কণাদের "ক্রিয়াগুণবৎ" ইত্যাদি সূত্রানুসারেই ভাষ্যকার বলিয়াছেন—"ক্রিয়াব-দিত্যেবমাদির্ব্বিশেষঃ"। সুতরাং কণাদসূত্রের ন্যায় ভাষ্যকারের "সদাদি" শব্দের দ্বারাও সত্তা ও অনিত্যত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মই বুঝিতে হইবে এবং কণাদের "ক্রিয়াগুণবৎ" এই বাক্যের দ্বারা দ্রব্য ক্রিয়া-বিশিষ্ট ও গুণবিশিষ্ট, এই অর্থের বোধ হওয়ায় ক্রিয়াবত্ত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মই দ্রব্যের লক্ষণ বুঝা যায়। সুতরাং কণাদের ঐ বাক্যানুসারে ভাষ্যকারের ঐ বাক্যের দ্বারাও ক্রিয়াবত্ত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মই বিশেষ ধর্ম্ম বলিয়া তাঁহার বিবক্ষিত বুঝিতে হইবে। এবং ভাষ্যকার ন্যায়দর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের "গন্ধ-রস-রূপ-স্পর্শ-শব্দানাং স্পর্শপর্য্যন্তাঃ পৃথিব্যাঃ" (৬২ম) এই সূত্রানুসারেই "স্পর্শপর্য্যন্তাঃ পৃথিব্যাঃ" এই বাক্যের প্রয়োগপূর্ব্বক আদি অর্থে "ইতি" শব্দের প্রয়োগ করিয়া "ইতি চ" এই বাক্যের দ্বারা গুণ ও কর্ম্মের কণাদোক্ত লক্ষণরূপ বিশেষ ধর্ম্মকে এবং জল, তেজ ও বায়ু প্রভৃতি দ্রব্যের বিশেষ গুণকেও স্বকীয় ধর্ম্ম বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন বুঝা যায়। নচেৎ ভাষ্যকারের বক্তব্যের ন্যূনতা হয়। "ইতি চ" এই বাক্যের দ্বারা "ইত্যাদি" এইরূপ অর্থ প্রকাশ করিলে ভাষ্যকারের বক্তব্যের ন্যূনতা থাকে না। "ইতি" শব্দের আদি অর্থও কোষে কথিত হইয়াছে[২]। ভাষ্যকার শেষে আরও বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম ও গন্ধাদি গুণের প্রত্যেকের অনন্ত ভেদ, অর্থাৎ তত্তদ্ব্যক্তিভেদে ঐ সকল পদার্থ অসংখ্য, এবং কণাদোক্ত "সামান্য," "বিশেষ" ও "সমবায়" নামক পদার্থত্রয়েরও নিত্যত্ব ও সামান্যত্ব প্রভৃতি বিশিষ্ট ধর্ম্ম গৃহীত হয় অর্থাৎ ঐ পদার্থত্রয়েরও নিত্যত্বাদি স্বকীয় ধর্ম্ম আছে। ভাষ্যকার এই সমস্ত কথার দ্বারা দ্রব্যাদি ভাব পদার্থসমূহের সূত্রোক্ত "স্বভাব" অর্থাৎ স্বকীয় ধর্ম্ম বলিয়া পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্ব-পক্ষের সূত্রকারোক্ত খণ্ডন বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, দ্রব্যাদি পদার্থ অভাব অর্থাৎ অসৎ হইলে ঐ সকল পদার্থের পূর্ব্বোক্ত স্বকীয় ধর্ম্মরূপ সম্প্রত্যায়ক যে অর্থভেদ, তাহা থাকিতে পারে না। কারণ, অভাব নিরুপাখ্য অর্থাৎ নিঃস্বরূপ। যাহা অসৎ, তাহার কোন স্বকীয় ধর্ম্ম থাকিতে পারে না। কিন্তু দ্রব্যাদি পদার্থের স্বকীয় ধর্ম্মরূপে সংপ্রতীতি অর্থাৎ যথার্থ বোধ জন্মে। পূর্ব্বোক্ত স্বকীয় ধর্ম্মরূপ স্বভাব না বুঝিলে দ্রব্যাদি পদার্থের সম্প্রতীতি জন্মিতেই পারে না। এই জন্যই মহর্ষি কণাদ ঐ সকল পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানের জন্য উহাদিগের পূর্ব্বোক্ত নানাবিধ স্বভাব বা স্বকীয় ধর্ম্ম

১। "সদনিত্যং দ্রব্যবৎ কার্য্যং কারণং সামান্যবিশেষবদিতিদ্রব্য-গুণ-কর্ম্মণামবিশেষঃ"।—বৈশেষিক দর্শন, ১।১।৮।

২। "ইতি হেতু-প্রকরণ-প্রকাশাদি-সমাপ্তিষু"।—অমরকোষ, অব্যয়বর্গ। ২০।

বলিয়াছেন। দ্রব্যাদি পদার্থের পূর্ব্বোক্ত নানাবিধ স্বকীয় ধর্ম্মরূপ ভিন্ন ভিন্ন পদার্থই উহাদিগের সম্প্রত্যায়ক (পরিচায়ক) অর্থভেদ। ঐ অর্থভেদ বা স্বভাবভেদ, অসৎ পদার্থের সম্ভবই হয় না। কারণ, যাহা অসৎ, যাহার বাস্তব কোন সত্তাই নাই, তাহাতে সত্তা, অনিত্যত্ব প্রভৃতি কোন ধর্ম্ম এবং গন্ধ প্রভৃতি গুণ কোনরূপেই থাকিতে পারে না এবং তাহার অসংখ্য ভেদও থাকিতে পারে না। কারণ, যাহা অলীক, তাহা নানাপ্রকার ও নানাসংখ্যক হইতে পারে না। যাহাতে স্বভাবভেদ নাই, তাহাতে প্রকারভেদ থাকিতে পারে না। কিন্তু দ্রব্যাদি পদার্থের স্বকীয় ধর্ম্মরূপে বোধ সর্ব্বজনসিদ্ধ, নচেৎ ঐ সমস্ত পদার্থের সম্প্রতীতি হইতেই পারে না; সর্ব্বজনসিদ্ধ বোধের অপলাপ করা যায় না। সুতরাং দ্রব্যাদি পদার্থের পূর্ব্বোক্ত স্বকীয় ধর্ম্মরূপ অর্থভেদ বা স্বভাবভেদ অবশ্য স্বীকার্য্য। তাহা হইলে আর দ্রব্যাদি পদার্থকে অভাব বলা যায় না। অতএব দ্রব্যাদি পদার্থ অভাব নহে। ভাষ্যকারের এই প্রথম ব্যাখ্যায় সূত্রোক্ত "স্বভাব" শব্দের অর্থ স্বকীয় ধর্ম্ম।

সর্ব্বশূন্যতাবাদী পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যাদি পদার্থ এবং তাহার স্বভাব অর্থাৎ স্বকীয় ধর্ম্ম কিছুই বাস্তব বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে ঐ সমস্তই অসৎ, সুতরাং ভাষ্যকারের ব্যাখ্যাত পূর্ব্বোক্ত যুক্তির দ্বারা তিনি নিরস্ত হইবেন না। ভাষ্যকার ইহা মনে করিয়া এই সূত্রের দ্বিতীয় প্রকার ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, অথবা এই সূত্রে "স্বভাব" শব্দের অর্থ স্বরূপ। "গো" প্রভৃতি শব্দের দ্বারা গোত্বাদিবিশিষ্ট গো প্রভৃতি স্বরূপের সিদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান হওয়ায় সকল পদার্থ অভাব নহে, ইহাই এই সূত্রের তাৎপর্য্যার্থ। ভাষ্যকার ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, "গো" শব্দ প্রয়োগ করিলে তদ্দ্বারা গোত্ব জাতিবিশিষ্ট গো নামক দ্রব্যবিশেষই বুঝা যায়, অভাবমাত্র বুঝা যায় না। সমস্ত পদার্থ ই অভাব হইলে "গো" শব্দের দ্বারা অভাবই কথিত হইত এবং অভাবেরই প্রতীতি হইত। কিন্তু "গো" শব্দের দ্বারা কেহ অভাব বুঝে না, গোত্ববিশিষ্ট দ্রব্যই বুঝিয়া থাকে। গো পদার্থের স্বরূপ গোত্ব জাতি, অভাবে থাকিতে পারে না। কারণ, অভাব নিঃস্বরূপ। সুতরাং যখন "গো" শব্দ প্রয়োগ করিলে গোত্ব জাতিবিশিষ্ট গো নামক দ্রব্যবিশেষই বুঝা যায়, তখন গো পদার্থকে অভাব বলা যায় না। এইরূপ অন্যান্য শব্দের দ্বারাও ভাব পদার্থের স্বরূপেরই জ্ঞান হওয়ায় সকল পদার্থ ই অভাব, এই মত অযুক্ত। সর্ব্বশূন্যতাবাদী ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্ত যুক্তিও স্বীকার করিবেন না। কারণ, তাঁহার মতে গোত্বাদি জাতিও অসৎ, সুতরাং "গো" শব্দের দ্বারা তিনি গোত্ববিশিষ্ট কোন বাস্তব দ্রব্য বুঝেন না, তাঁহার মতে গো নামক পদার্থও নিঃস্বরূপ বলিয়া "গো" শব্দের দ্বারা গোত্বজাতিবিশিষ্ট সৎদ্রব্য বুঝা যায় না। ভাষ্যকার ইহা মনে করিয়া শেষে তৃতীয় কল্পে এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষখণ্ডনে চরম যুক্তির ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, সর্ব্বশূন্যতাবাদীর নিজের কথার দ্বারাই গো প্রভৃতি ভাব পদার্থের স্বভাবসিদ্ধি অর্থাৎ স্বরূপসিদ্ধি হয়—গো প্রভৃতি ভাব পদার্থ কোনরূপেই সৎ নহে, ইহা সর্ব্বশূন্যতাবাদীও বলিতে পারেন না। কারণ, তিনি নিজ মতের যুক্তি প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন যে, "গো অশ্বস্বরূপে অসৎ"। কিন্তু "গো গোস্বরূপে অসৎ", ইহা কেন বলেন না? আর বলিয়াছেন—"গো অশ্ব নহে", "অশ্ব গো নহে", কিন্তু তিনি "অশ্ব অশ্ব

নহে," "গো গো নহে" ইহা কেন বলেন না ? তিনি যখন উহা বলেন না, বলিতেই পারেন না, তখন গো, গোস্বরূপে সৎ এবং অশ্ব, অশ্বস্বরূপে সৎ, ইহা তিনিও স্বীকার করিতে বাধ্য। কারণ, গো অশ্ব প্রভৃতি দ্রব্য যে, স্বস্বরূপে সৎ, ইহা তাঁহার নিজের কথার দ্বারাই বুঝা যায়। সুতরাং সকল পদার্থই সর্ব্বথা "অসৎ", এই মতের কোন সাধক নাই। ভাষ্যকারের এই তৃতীয় পক্ষে মহর্ষির সূত্রের অর্থ এই যে, গো প্রভৃতি ভাবসমূহের স্বভাবতঃ অর্থাৎ স্বস্বরূপে সিদ্ধি হওয়ার অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষবাদীর নিজের কথার দ্বারাও উহা প্রতিপন্ন হওয়ায় সকল পদার্থই অভাব, এই মত অযুক্ত। সর্ব্বশূন্যতাবাদী অবশ্যই বলিবেন যে, যদি গো অশ্ব প্রভৃতি সৎপদার্থই হয়, তাহা হইলে "গো অশ্ব-স্বরূপে অসৎ", "অশ্ব গোস্বরূপে অসৎ" এইরূপ বাক্য প্রয়োগ ও প্রতীতি হয় কেন ? এতদুত্তরে শেষে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, "অব্যতিরেকে"র নিষেধ স্থলেও ভাবের সহিত অর্থাৎ গো প্রভৃতি সৎ পদার্থের সহিত "অসৎ" এইরূপ প্রতীতির সামানাধিকরণ্য হয়। অর্থাৎ গো প্রভৃতি সৎপদার্থ বিষয়েও অন্যরূপে "অসৎ" এইরূপ প্রতীতি জন্মে। গো পদার্থে অশ্বের "অব্যতিরেকে"র অর্থাৎ অভেদ সম্বন্ধের অভাব বুঝাইতে "গো অশ্বস্বরূপে অসৎ" এইরূপ বাক্য প্রয়োগ হইয়া থাকে। সুতরাং ঐ স্থলে গো পদার্থের সহিত "অসৎ" এই প্রতীতির সামানাধিকরণ্য হয়। ঐরূপ বাক্য প্রয়োগ ও প্রতীতির দ্বারা গো-পদার্থের স্বরূপ-সত্তার অভাব প্রতিপন্ন হয় না; গো এবং অশ্বের একত্ব অর্থাৎ অভেদ নাই, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। ভাষ্যকার "অব্যতিরেকপ্রতিষেধে চ" এই বাক্যে "চ" শব্দের দ্বারা দৃষ্টান্তরূপে ব্যতিরেক-প্রতিষেধকেও প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। তাই প্রথমে ব্যতিরেক শব্দার্থের ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, সংযোগাদি সম্বন্ধকে "ব্যতিরেক" বলে। সংযোগ প্রভৃতি ভেদসম্বন্ধকে "ব্যতিরেক" বলিলে অভেদ সম্বন্ধকে "অব্যতিরেক" বলা যায়। তাই বলিয়াছেন যে, এখানে "অব্যতিরেক" বলিতে অভেদ নামক সম্বন্ধ। অর্থাৎ যে "অব্যতিরেকে"র প্রতিষেধ বলিয়াছি, উহা "ব্যতিরেকে"র অর্থাৎ সংযোগাদি ভেদ-সম্বন্ধের বিপরীত অভেদ সম্বন্ধ। "ব্যতিরেকে"র প্রতিষেধ স্থলে যেমন সৎপদার্থের সহিত "অসৎ" এইরূপ প্রতীতির সামানাধিকরণ্য হয়, তদ্রূপ "অব্যতিরেকে"র প্রতিষেধ স্থলেও সৎপদার্থের সহিত "অসৎ" এইরূপ প্রতীতির সামানাধিকরণ্য হয়, ইহাই এখানে ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বুঝা যায়। ব্যতিরেকের প্রতিষেধ স্থলে কোথায় সৎপদার্থের সহিত "অসৎ" এইরূপ প্রতীতির সামানাধিকরণ্য হয়, ইহা উদাহরণ দ্বারা ভাষ্য-কার বুঝাইয়াছেন যে, যেমন "কুণ্ডে বদর নাই" এই বাক্যের দ্বারা "কুণ্ড" নামক আধারে বদরফলের সংযোগের নিষেধ করিলে অর্থাৎ বদরফলের সংযোগ-সম্বন্ধের সত্তার অভাব বুঝাইলে তখন সৎপদার্থ বদরফলের সহিত "অসৎ" এইরূপ প্রতীতির সামানাধিকরণ্য হয়। কিন্তু ঐ স্থলে কুণ্ডে বদরের সত্তার নিষেধ হয় না। "কুণ্ডে বদর অসৎ" এই বাক্যের দ্বারা কুণ্ডে বদরের অসত্তা প্রতিপন্ন হয় না, কুণ্ডে বদরের সংযোগ-সম্বন্ধরূপ ব্যতিরেকেরই নিষেধ হয়। অর্থাৎ বদর সৎপদার্থ হইলেও কুণ্ডে উহার সংযোগ-সম্বন্ধ নাই, ইহাই ঐ বাক্যের দ্বারা কথিত ও প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং ঐরূপ স্থলে "কুণ্ডে বদরাণি ন সন্তি" এইরূপে সৎপদার্থ বদরের সহিত "ন সন্তি" অর্থাৎ "অসৎ" এইরূপ প্রতীতির সামানাধিকরণ্য হয়। উদ্দ্যোতকর "ব্যতিরেকপ্রতিষেধে ভাবেনাসৎপ্রত্যয়স্য সামানাধিকরণ্যমিতি"

ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা এখানে কেবল ভাষ্যকারোক্ত দৃষ্টান্তেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রচলিত "বার্ত্তিক" গ্রন্থে "অব্যতিরেকপ্রতিষেধে চ" ইত্যাদি কোন পাঠ দেখা যায় না। উদ্দ্যোতকরের "ব্যতিরেকপ্রতিষেধে" ইত্যাদি পাঠ দেখিয়া ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও যে, এখানে ব্যতিরেকপ্রতিষেধকেও প্রকাশ করিয়া উহার উদাহরণরূপে প্রদর্শন করিতেই "যথা ন সন্তি কুণ্ডে বদরাণি" এই বাক্য বলিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। কিন্তু প্রচলিত কোন ভাষ্যপুস্তকেই এখানে "ব্যতিরেকপ্রতিষেধে"র উল্লেখ দেখা যায় না। তাই ভাষ্যকারের "অব্যতিরেকপ্রতিষেধে চ" এই বাক্যে "চ" শব্দের দ্বারা দৃষ্টান্তরূপে ব্যতিরেক প্রতিষেধও প্রকাশিত হইয়াছে, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সে যাহা হউক, প্রকৃত কথা এই যে, ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীন নৈয়ায়িকগণের মতে "কুণ্ডে বদরাণি ন সন্তি," "ভূতলে ঘটো নাস্তি" ইত্যাদি প্রতীতিতে কুণ্ডে বদরফলের সংযোগসম্বন্ধ এবং ভূতলে ঘটের সংযোগসম্বন্ধ প্রভৃতি "ব্যতিরেকে"র অভাবই বিষয় হয়। সুতরাং ঐ প্রতিষেধের নাম "ব্যতিরেক-প্রতিষেধ"। "ন্যায়-কুসুমাঞ্জলি" গ্রন্থে প্রাচীন নৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্যের কথার দ্বারা পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন মত স্পষ্টই বুঝা যায়[১]। সেখানে "প্রকাশ" টীকাকার বর্দ্ধমান উপাধ্যায় যুক্তির দ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপ প্রাচীন মত সমর্থন করিয়াছেন। অভেদ সম্বন্ধের নিষেধের নাম "অব্যতিরেক-প্রতিষেধ"। "গো অশ্ব-স্বরূপে অসৎ," "গো অশ্ব নহে," "অশ্ব গোস্বরূপে অসৎ," "অশ্ব গো নহে" এইরূপ প্রয়োগ ও প্রতীতিতে গো পদার্থে অশ্বের অভেদ সম্বন্ধ ও অশ্বপদার্থে গোর অভেদ সম্বন্ধরূপ "অব্যতি-রেকে"র প্রতিষেধই (অভাবই) বিষয় হয়। তজ্জন্যই গো প্রভৃতি সৎপদার্থের সহিত "অসৎ" এই প্রতীতির সামানাধিকরণ্য হয়। কিন্তু উহার দ্বারা গো প্রভৃতি পদার্থের স্বরূপসত্তার নিষেধ হয় না। অর্থাৎ গো প্রভৃতি পদার্থ স্বরূপতঃই অসৎ, কোনরূপেই উহার সত্তা নাই, ইহা প্রতিপন্ন হয় না। তাহা হইলে "গো গোস্বরূপে অসৎ", "গো গো নহে", ইত্যাদি প্রকার প্রয়োগ ও প্রতীতিও হইতে পারে। কিন্তু সর্ব্বশূন্যতাবাদীও যখন "গো গোস্বরূপে অসৎ", "গো গো নহে" এই-রূপ প্রয়োগ করেন না, তখন গো পদার্থের স্বস্বরূপে সত্তা তাঁহারও স্বীকার্য্য। ভাষ্যকার পূর্ব্ব-সূত্র-ভাষ্যে ভাববোধক শব্দের সহিত অসৎপ্রত্যয়সামানাধিকরণ্য বলিয়াছেন। সুতরাং এখানেও "ভাব" শব্দের দ্বারা ভাববোধক শব্দই তাঁহার বিবক্ষিত বুঝিয়া কেহ ঐরূপই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু উদ্দ্যোতকরও এখানে "ভাবেনাসৎপ্রত্যয়স্য সামানাধিকরণ্যাৎ" এইরূপ কথাই লিখিয়াছেন। ভাষ্যকারও এখানে পরে "ভাবেন গবা সামানাধিকরণ্যমসৎপ্রত্যয়স্য" এবং "সদ্ভিরসৎপ্রত্যয়স্য সামানাধি-করণ্যাৎ" এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুতরাং এখানে সৎপদার্থের সহিতই অসৎ প্রত্যয়ের সামানাধি-করণ্য ভাষ্যকারের বিবক্ষিত, ইহাই সরলভাবে বুঝা যায়। ভাববোধক শব্দের সহিত সমানার্থক বিভক্তিযুক্ত "অসৎ" শব্দের প্রয়োগ করিলে যেমন ঐ স্থলে ভাববোধক শব্দের সহিত "অসৎ" এই-রূপ প্রতীতি ও ঐ শব্দের সামানাধিকরণ্য বলা হইয়াছে, তদ্রূপ যে পদার্থে ঐ ভাববোধক শব্দের বাচ্যতা আছে, সেই পদার্থেই কোনরূপে "অসৎ" এইরূপ প্রতীতি হইলে ঐ তাৎপর্য্যে এখানে ভাষ্য-

১। "অন্যথা ইহ ভূতলে ঘটো নাস্তীত্যেষাপি প্রতীতিঃ প্রত্যক্ষা ন স্যাৎ ? সংযোগস্য হ্যত্র নিষিধ্যত্বে" ইত্যাদি (ন্যায়কুসুমাঞ্জলি, ২য় স্তবকের ১ম শ্লোকের উদয়নকৃত গদ্য ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)।

কার সেই ভাব পদার্থের সহিতও "অসৎ" এইরূপ প্রতীতির সামানাধিকরণ্য বলিতে পারেন। এই ভাবে ভাববোধক সমস্ত শব্দের ন্যায় সমস্ত ভাব পদার্থও অন্যরূপে "অসৎ" এই প্রতীতির সমানাধিকরণ হইতে পারে। সুতরাং ভাষ্যকার এখানে গো প্রভৃতি ভাব পদার্থের অন্যরূপে "অসৎ" এইরূপ প্রতীতি কেন জন্মে, ইহা বুঝাইতে ভাব পদার্থের সহিতই "অসৎ" প্রতীতির সামানাধিকরণ্য বলিয়া উহা দৃষ্টান্ত দ্বারা উপপাদন করিয়াছেন ॥৩৮॥

সূত্র। ন স্বভাবসিদ্ধিরাপেক্ষিকত্বাৎ ॥৩৯॥৩৮২॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) আপেক্ষিকত্ববশতঃ (পদার্থসমূহের) "স্বভাবসিদ্ধি" অর্থাৎ স্বকীয় স্বরূপে সিদ্ধি হয় না, অর্থাৎ কোন পদার্থই বাস্তব হইতে পারে না।

ভাষ্য। অপেক্ষাকৃতমাপেক্ষিকং। হ্রস্বাপেক্ষাকৃতং দীর্ঘং, দীর্ঘাপেক্ষাকৃতং হ্রস্বং, ন স্বেনাত্মনাবস্থিতং কিঞ্চিৎ। কস্মাৎ? অপেক্ষাসামর্থ্যাৎ, তস্মান্ন স্বভাবসিদ্ধির্ভাবানামিতি।

অনুবাদ। "আপেক্ষিক" বলিতে অপেক্ষাকৃত। হ্রস্বের অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ, দীর্ঘের অপেক্ষাকৃত হ্রস্ব, কোন বস্তু স্বকীয় স্বরূপে অবস্থিত নহে। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) অপেক্ষার সামর্থ্যবশতঃ,—অতএব পদার্থসমূহের স্বভাবের সিদ্ধি হয় না।

টিপ্পনী। পূর্ব্বসূত্রে মহর্ষি ভাবসমূহের যে "স্বভাবসিদ্ধি" বলিয়াছেন, সর্ব্বশূন্যতাবাদী তাহা স্বীকার করেন না। তিনি অন্য যুক্তির দ্বারা উহা খণ্ডন করেন। তাই মহর্ষি আবার এই সূত্রের দ্বারা সর্ব্বশূন্যতাবাদীর সেই যুক্তির উল্লেখ করিয়া, পূর্ব্বপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন যে, ভাবসমূহের অর্থাৎ কোন পদার্থেরই স্বভাবসিদ্ধি হয় না। অর্থাৎ কোন পদার্থই স্বকীয় স্বরূপে অবস্থিত নহে, সকল পদার্থই অবাস্তব। কারণ, সকল পদার্থই আপেক্ষিক। আপেক্ষিক বলিতে অপেক্ষাকৃত অর্থাৎ অন্যাপেক্ষ। ভাষ্যকার ইহার দৃষ্টান্তরূপে বলিয়াছেন যে, হ্রস্বের আপেক্ষিক দীর্ঘ, দীর্ঘের আপেক্ষিক হ্রস্ব। অর্থাৎ যে দ্রব্যকে হ্রস্ব বা খর্ব্ব বলা হয়, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা হ্রস্ব নহে, তাহা উহা হইতে দীর্ঘ দ্রব্য অপেক্ষায় হ্রস্ব, এবং যে দ্রব্যকে দীর্ঘ বলা হয়, তাহাও সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ নহে, তাহাও উহা হইতে হ্রস্ব দ্রব্য অপেক্ষায় দীর্ঘ। এক হস্তপরিমিত দণ্ড হইতে দুই হস্তপরিমিত দণ্ড দীর্ঘ এবং উহা হইতে এক হস্তপরিমিত সেই দণ্ড হ্রস্ব। এইরূপে সমস্ত পদার্থই পরস্পর সাপেক্ষ বলিয়া কোন পদার্থের স্বভাবসিদ্ধি হয় না, অর্থাৎ কোন পদার্থই বাস্তব নহে, ইহা স্বীকার্য্য। তাৎপর্য্যটীকাকার পূর্ব্বপক্ষবাদীর যুক্তির ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, জগতে সমস্ত পদার্থই ভিন্ন-স্বভাব, কিন্তু সমস্ত পদার্থের ভিন্নত্বও অন্যাপেক্ষ। যেমন যাহা নীল বলিয়া কথিত হয়, তাহা পীতাদি অপেক্ষায় ভিন্ন, স্বভাবতঃ ভিন্ন নহে। তাহা হইলে নীলকে নীল হইতেও ভিন্ন বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাহা কেহই বলেন না। সুতরাং নীল স্বভাবতঃই ভিন্ন নহে, ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। এইরূপ হ্রস্বত্ব,

দীর্ঘত্ব, পরত্ব, অপরত্ব, পিতৃত্ব, পুত্রত্ব প্রভৃতি সমস্ত ধর্ম্মই পরস্পর সাপেক্ষ। "পরত্ব" বলিতে জ্যেষ্ঠত্ব ও দূরত্ব, "অপরত্ব" বলিতে কনিষ্ঠত্ব ও নিকটত্ব। সুতরাং উহাও কোন পদার্থের স্বাভাবিক হইতে পারে না; কারণ, উহা আপেক্ষিক বা সাপেক্ষ। যে পদার্থে কাহারও অপেক্ষায় "পরত্ব" আছে, সেই পদার্থের অপেক্ষায় সেই অন্য পদার্থে অপরত্ব আছে। এইরূপ পিতৃত্ব, পুত্রত্ব প্রভৃতিও কাহারও স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইতে পারে না; কারণ, ঐ সমস্তই সাপেক্ষ। যিনি পিতা, তিনি তাঁহার পুত্রেরই পিতা, যিনি পুত্র, তিনি তাঁহার ঐ পিতারই পুত্র, সকলেই সকলের পিতা ও পুত্র নহে। সুতরাং জগতে যখন সকল পদার্থ ই সাপেক্ষ, তখন সকল পদার্থ ই অবাস্তব অসৎ; কারণ, যাহা সাপেক্ষ, তাহা বাস্তব নহে, ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। যেমন শুভ্র স্ফটিকের নিকটে রক্ত জবাপুষ্প রাখিলে ঐ স্ফটিককে তখন রক্তবর্ণ দেখা যায়। ঐ স্ফটিকে বস্তুতঃ রক্ত রূপ নাই, কিন্তু ঐ জবাপুষ্পের সান্নিধ্যবশতঃই উহাতে রক্ত রূপের ভ্রম হয়। সেখানে আরোপিত রক্ত রূপ বাস্তব পদার্থ নহে, উহা ঐ জবাপুষ্পসাপেক্ষ, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। কারণ, সে স্থান হইতে ঐ জবাপুষ্পকে লইয়া গেলে তখন আর ঐ স্ফটিককে রক্তবর্ণ দেখা যায় না। তাহা হইলে যাহা সাপেক্ষ, তাহা স্বাভাবিক নহে—তাহা অবাস্তব অসৎ; যেমন রক্তজবাপুষ্প-সাপেক্ষ স্ফটিকের রক্ততা। এইরূপে ব্যাপ্তিনিশ্চয় হওয়ায় সাপেক্ষত্ব হেতুর দ্বারা সকল পদার্থেরই অসত্তা সিদ্ধ হয়, ইহাই এখানে তাৎপর্য্যটীকাকার প্রভৃতির ব্যাখ্যানুসারে পূর্ব্বপক্ষবাদীর গূঢ় তাৎপর্য্য॥ ৩৯

সূত্র। ব্যাহতত্বাদযুক্তং ॥৪০॥৩৮৩॥

অনুবাদ। (উত্তর) ব্যাহতত্ব অর্থাৎ ব্যাঘাতবশতঃ (পূর্ব্বোক্ত আপেক্ষিকত্ব) অযুক্ত অর্থাৎ উহা উপপন্ন হয় না।

ভাষ্য। যদি হ্রস্বাপেক্ষাকৃতং দীর্ঘং, হ্রস্বমনাপেক্ষিকং, কিমিদানী-মপেক্ষ্য "হ্রস্ব"মিতি গৃহ্যতে? অথ দীর্ঘাপেক্ষাকৃতং হ্রস্বং, দীর্ঘমনা-পেক্ষিকং, কিমিদানীমপেক্ষ্য "দীর্ঘ"মিতি গৃহ্যতে? এবমিতরেতরা-শ্রয়য়োরেকাভাবেঽন্যতরাভাবাদুভয়াভাব ইত্যপেক্ষাব্যবস্থাঽনুপপন্না।

স্বভাবসিদ্ধাবসত্যাং সময়োঃ পরিমণ্ডলয়োর্ব্বা দ্রব্যয়োরাপেক্ষিকে দীর্ঘত্বহ্রস্বত্বে কস্মান্ন ভবতঃ? **অপেক্ষায়ামনপেক্ষায়াঞ্চ দ্রব্যয়োরভেদঃ**, যাবতী দ্রব্যে অপেক্ষমাণে তাবতী এবানপেক্ষমাণে, নান্যতরত্র ভেদঃ। আপেক্ষিকত্বে সত্যন্যতরত্র বিশেষোপজনঃ স্যাদিতি।

কিমপেক্ষাসামর্থ্যমিতি চেৎ? দ্বয়োর্গ্রহণেঽতিশয়গ্রহণোপপত্তিঃ। দ্বে দ্রব্যে পশ্যন্নেকত্র বিদ্যমানমতিশয়ং গৃহ্লাতি, তদ্দীর্ঘমিতি ব্যবস্যতি, যচ্চ হীনং গৃহ্লাতি তদ্‌হ্রস্বমিতি ব্যবস্যতীতি। এতচ্চাপেক্ষাসামর্থ্যমিতি।

অনুবাদ। যদি দীর্ঘ, হ্রস্বের অপেক্ষাকৃত অর্থাৎ আপেক্ষিক হয়, হ্রস্ব অনাপেক্ষিক হয়, তাহা হইলে কাহাকে অপেক্ষা করিয়া "হ্রস্ব" এইরূপ জ্ঞান হয়? আর যদি হ্রস্ব দীর্ঘের অপেক্ষাকৃত অর্থাৎ আপেক্ষিক হয়, দীর্ঘ অনাপেক্ষিক হয়, তাহা হইলে কাহাকে অপেক্ষা করিয়া "দীর্ঘ" এইরূপ জ্ঞান হয়? এবং পরস্পরাশ্রিত হ্রস্ব ও দীর্ঘের অর্থাৎ যদি হ্রস্ব ও দীর্ঘ পরস্পর সাপেক্ষ হয়, তাহা হইলে উহার একের অভাবে অন্যতরের অর্থাৎ অপরেরও অভাবপ্রযুক্ত উভয়েরই অভাব হয়, এ জন্য অপেক্ষাব্যবস্থা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ অপেক্ষামূলক হ্রস্বদীর্ঘব্যবস্থা উপপন্ন হয় না।

পরন্তু "স্বভাবসিদ্ধি" অর্থাৎ হ্রস্ব দীর্ঘ প্রভৃতি পদার্থের বাস্তব স্বকীয় স্বরূপে সিদ্ধি না হইলে তুল্য অথবা "পরিমণ্ডল" অর্থাৎ অণুপরিমাণ দ্রব্যদ্বয়ের আপেক্ষিক দীর্ঘত্ব ও হ্রস্বত্ব কেন হয় না? পরন্তু অপেক্ষা ও অনপেক্ষা অর্থাৎ হ্রস্ব ও দীর্ঘের সাপেক্ষত্ব ও নিরপেক্ষত্ব থাকিলেও দ্রব্যদ্বয়ের অভেদ অর্থাৎ সাম্য আছে। (তাৎপর্য্য) যে পরিমাণ যে দুইটি দ্রব্যই অপেক্ষমাণ অর্থাৎ অন্যকে অপেক্ষা করে, সেই পরিমাণ সেই দুইটি দ্রব্যই অনপেক্ষমাণ অর্থাৎ পরস্পরকে অপেক্ষা করে না, (কিন্তু) অন্যতর দ্রব্যে অর্থাৎ ঐ দ্রব্যদ্বয়ের মধ্যে কোন দ্রব্যেই ভেদ (বৈষম্য) নাই। আপেক্ষিকত্বপ্রযুক্ত অর্থাৎ ঐ দ্রব্যদ্বয়েরও অন্যাপেক্ষত্ব থাকায় তৎপ্রযুক্ত একতর দ্রব্যে বিশেষের (পরিমাণভেদের) উৎপত্তি হউক?

(প্রশ্ন) অপেক্ষার সামর্থ্য অর্থাৎ সাফল্য কি? (উত্তর) দুইটি দ্রব্যের প্রত্যক্ষ হইলে "অতিশয়ে"র অর্থাৎ পরিমাণের উৎকর্ষের প্রত্যক্ষের উপপত্তি। বিশদার্থ এই যে, দুইটি দ্রব্য দর্শন করতঃ একটি দ্রব্যে "অতিশয়" অর্থাৎ পরিমাণের উৎকর্ষ প্রত্যক্ষ করে, সেই দ্রব্যকে "দীর্ঘ" বলিয়া নিশ্চয় করে, এবং যে দ্রব্যকে হীন অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দ্রব্য অপেক্ষায় ন্যূন পরিমাণ বলিয়া প্রত্যক্ষ করে, সেই দ্রব্যকেই "হ্রস্ব" বলিয়া নিশ্চয় করে। ইহাই অপেক্ষার সামর্থ্য।

টিপ্পনী। পূর্ব্বসূত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডন করিতে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, হ্রস্ব দীর্ঘ প্রভৃতি পদার্থের যে আপেক্ষিকত্ব বলা হইয়াছে, তাহা অযুক্ত। কারণ, হ্রস্ব দীর্ঘ প্রভৃতি পদার্থে পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথিত আপেক্ষিকত্ব বা সাপেক্ষত্ব ব্যাহত। অর্থাৎ হ্রস্ব দীর্ঘ প্রভৃতি পদার্থে পূর্ব্বোক্তরূপ আপেক্ষিকত্ব থাকিতেই পারে না, উহা স্বীকার করাই যায় না। ভাষ্যকার সূত্রোক্ত "ব্যাহতত্ব" বা ব্যাঘাত বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, যদি দীর্ঘ পদার্থকে হ্রস্বসাপেক্ষ বলা হয়, তাহা হইলে হ্রস্ব পদার্থকে ঐ দীর্ঘনিরপেক্ষ বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে হ্রস্বের জ্ঞান কিরূপে হইবে? হ্রস্ব যদি দীর্ঘকে অপেক্ষা না করে, তাহা হইলে আর কাহাকে অপেক্ষা করিয়া হ্রস্বের জ্ঞান হইবে? অর্থাৎ তাহা হইলে পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতানুসারে হ্রস্বের জ্ঞান হইতেই পারে না। আর

যদি বল, হ্রস্ব পদার্থ দীর্ঘ পদার্থকে অপেক্ষা করে, উহা দীর্ঘসাপেক্ষ, দীর্ঘ পদার্থকে অপেক্ষা করিয়াই উহার জ্ঞান হয়, তাহা হইলে ঐ দীর্ঘ পদার্থকে হ্রস্বনিরপেক্ষ বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে ঐ দীর্ঘের জ্ঞান কিরূপে হইবে ? দীর্ঘ যদি হ্রস্বকে অপেক্ষা না করে, তাহা হইলে আর কাহাকে অপেক্ষা করিয়া ঐ দীর্ঘের জ্ঞান হইবে ? অর্থাৎ তাহা হইলে পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতানুসারে দীর্ঘের জ্ঞান হইতেই পারে না। তাৎপর্য্য এই যে, যে পদার্থ নিজের উৎপত্তি ও জ্ঞানে অপর পদার্থকে অপেক্ষা করে, ঐ অপর পদার্থ সেই পদার্থের উৎপত্তির পূর্ব্বেই সিদ্ধ থাকা আবশ্যক। সুতরাং দীর্ঘ পদার্থ, হ্রস্ব পদার্থকে অপেক্ষা করিলে ঐ হ্রস্ব পদার্থ সেই দীর্ঘ পদার্থের উৎপত্তির পূর্ব্বেই সিদ্ধ আছে, ইহা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে সেই হ্রস্ব পদার্থ নিরপেক্ষ বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায় সকল পদার্থই সাপেক্ষ, ইহা আর বলা যায় না। হ্রস্ব পদার্থের নিরপেক্ষত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য হইলে উহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদীর স্বীকৃত সাপেক্ষত্ব ব্যাহত হয়। আর যদি পূর্ব্বপক্ষবাদী পূর্ব্বোক্ত দোষভয়ে হ্রস্ব পদার্থকে দীর্ঘসাপেক্ষই বলেন, তাহা হইলে ঐ দীর্ঘ পদার্থকে নিরপেক্ষ বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। কারণ, ঐ দীর্ঘ পদার্থ পূর্ব্বসিদ্ধ না থাকিলে তাহাকে অপেক্ষা করিয়া হ্রস্বের জ্ঞান হইতে পারে না। যাহা পূর্ব্বে নিজেই অসিদ্ধ, তাহাকে অপেক্ষা করিয়া অন্য পদার্থের জ্ঞান হইতে পারে না। সুতরাং এই দ্বিতীয় পক্ষে দীর্ঘ পদার্থকে হ্রস্বের পূর্ব্বসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইলে ঐ দীর্ঘ পদার্থের নিরপেক্ষত্বই স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে উহাতে পূর্ব্বপক্ষবাদীর স্বীকৃত সাপেক্ষত্ব ব্যাহত হয়। পূর্ব্বপক্ষবাদী অবশ্যই বলিবেন যে, আমরা ত হ্রস্ব ও দীর্ঘকে পরস্পর সাপেক্ষই বলিয়াছি। আমাদিগের মতে হ্রস্বের আপেক্ষিক দীর্ঘ, দীর্ঘের আপেক্ষিক হ্রস্ব। এইরূপ সমস্ত পদার্থই সাপেক্ষ, সুতরাং অসৎ। ভাষ্যকার এই তৃতীয় পক্ষে দোষ বলিয়াছেন যে, হ্রস্ব ও দীর্ঘ পরস্পর সাপেক্ষ হইলে পরস্পরাশ্রিত হওয়ায় হ্রস্বের পূর্ব্বে দীর্ঘ নাই এবং দীর্ঘের পূর্ব্বেও হ্রস্ব নাই, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, হ্রস্ব পূর্ব্বসিদ্ধ না থাকিলে হ্রস্বসাপেক্ষ দীর্ঘ থাকিতে পারে না। আবার দীর্ঘ পূর্ব্বসিদ্ধ না থাকিলে দীর্ঘসাপেক্ষ হ্রস্বও থাকিতে পারে না। সুতরাং এই পক্ষে পরস্পরাশ্রয়-দোষবশতঃ হ্রস্বও নাই, দীর্ঘও নাই, সুতরাং হ্রস্ব ও দীর্ঘ, এই উভয়ই নাই, ইহাই স্বীকার করিতে হয়। কারণ, হ্রস্ব ও দীর্ঘের মধ্যে হ্রস্বের অভাবে অন্যতরের অর্থাৎ দীর্ঘেরও অভাব হওয়ায় এবং দীর্ঘের অভাবে হ্রস্বেরও অভাব হওয়ায় ঐ উভয়েরই অভাব হইয়া পড়ে। সুতরাং হ্রস্ব ও দীর্ঘকে পরস্পর সাপেক্ষ বলিলে ঐ উভয়ের সিদ্ধিই হইতে পারে না। সর্ব্বশূন্যতাবাদী অবশ্যই বলিবেন যে, যদি উক্ত ক্রমে হ্রস্ব ও দীর্ঘ, এই উভয়ের অভাবই হয়, তাহা হইলে ত আমাদিগের ইষ্ট-সিদ্ধিই হইল, আমরা ত কোন পদার্থেরই সত্তা স্বীকার করি না। যে কোনরূপে সকল পদার্থের অসত্তা সিদ্ধ হইলেই আমাদিগের ইষ্টসিদ্ধিই হয়। এ জন্য ভাষ্যকার পূর্ব্বপক্ষবাদীর যুক্তি খণ্ডন করিতে পরে আবার বলিয়াছেন যে, স্বভাব সিদ্ধ না হইলে অর্থাৎ হ্রস্বত্ব দীর্ঘত্ব প্রভৃতি বস্তুর স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে, উহা সাপেক্ষ, এই সিদ্ধান্তে তুল্যপরিমাণ দুইটি দ্রব্য অথবা দুইটি পরিমণ্ডল অর্থাৎ দুইটি পরমাণুর আপেক্ষিক দীর্ঘত্ব ও হ্রস্বত্ব কেন হয় না ? তাৎপর্য্য এই যে, তুল্যপরিমাণ যে কোন দুইটি দ্রব্য অথবা দুইটি পরমাণুর মধ্যে কেহ কাহারও অপেক্ষায় দীর্ঘও নহে, হ্রস্বও নহে,

ইহা পূর্ব্বপক্ষবাদীও স্বীকার করেন। কিন্তু যদি দীর্ঘত্ব ও হ্রস্বত্ব কোন বস্তুরই স্বাভাবিক ধর্ম্ম না হয়, উহা কল্পিত অবাস্তব পদার্থই হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত তুল্যপরিমাণ দুইটি দ্রব্য অথবা পরমাণুদ্বয়েরও আপেক্ষিক দীর্ঘত্ব ও হ্রস্বত্ব হইতে পারে। পূর্ব্বপক্ষবাদীর মতে যখন সমস্ত পদার্থই আপেক্ষিক অর্থাৎ সাপেক্ষ, তখন তিনি তুল্যপরিমাণ দ্রব্য ও পরমাণুকেও নিরপেক্ষ বলিতে পারিবেন না। সুতরাং সাপেক্ষত্ববশতঃ বিষমপরিমাণ দ্রব্যদ্বয়ের ন্যায় সমপরিমাণ দ্রব্যদ্বয়ের মধ্যেও একটির হ্রস্বত্ব ও অপরটির দীর্ঘত্ব কেন হয় না? ইহা বলা আবশ্যক। হ্রস্বত্ব ও দীর্ঘত্ব বস্তুর স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইলে পূর্ব্বোক্ত আপত্তি হইতে পারে না। কারণ, তুল্যপরিমাণ দ্রব্যদ্বয়ের একটির হ্রস্বত্ব ও অপরটির দীর্ঘত্ব স্বভাব অর্থাৎ স্বকীয় ধর্ম্মই নহে, এবং পরমাণুর হ্রস্বত্ব দীর্ঘত্ব স্বভাবই নহে। পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, তুল্যপরিমাণ দ্রব্যদ্বয়ও উহা হইতে হ্রস্বপরিমাণ দ্রব্যের অপেক্ষায় দীর্ঘ এবং উহা হইতে দীর্ঘপরিমাণ দ্রব্যের অপেক্ষায় হ্রস্ব, সুতরাং ঐ দ্রব্যদ্বয়েও অপরের অপেক্ষা অর্থাৎ সাপেক্ষত্ব আছে। কিন্তু ঐ দ্রব্যদ্বয় তুল্যপরিমাণ বলিয়া পরস্পর নিরপেক্ষ, সুতরাং উহাতে পরস্পর অনপেক্ষা অর্থাৎ নিরপেক্ষত্বও আছে। তাই ঐ দ্রব্যদ্বয়ের মধ্যে একের হ্রস্বত্ব ও অপরের দীর্ঘত্ব হইতে পারে না। এতদুত্তরে ভাষ্যকার পরে বলিয়াছেন যে, অপেক্ষা ও অনপেক্ষা থাকিলেও দ্রব্যদ্বয়ের বৈষম্য নাই। পরে ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, যে পরিমাণ অর্থাৎ তুল্য-পরিমাণ যে দুইটি দ্রব্য অপর দ্রব্যকে অপেক্ষা করে, সেই দুইটি দ্রব্যই পরস্পরকে অপেক্ষা করে না, কিন্তু উহার কোন দ্রব্যেই ভেদ অর্থাৎ পরিমাণ-বৈষম্য নাই। তাৎপর্য্য এই যে, তুল্য-পরিমাণ যে দুইটি দ্রব্যকে পরস্পর নিরপেক্ষ বলিতেছ, সেই দুইটি দ্রব্যকেই সাপেক্ষ বলিয়াও স্বীকার করিতেছ। কারণ, ঐ দ্রব্যদ্বয়কে সাপেক্ষ না বলিলে সকল পদার্থে সাপেক্ষত্ব ব্যাহত হয়। কিন্তু তুল্যপরিমাণ ঐ দ্রব্যদ্বয় পরস্পর নিরপেক্ষ হইলেও উহাতে যখন সাপেক্ষত্বও আছে, তখন তৎপ্রযুক্ত ঐ দ্রব্যদ্বয়ের পরিমাণ-ভেদ অর্থাৎ হ্রস্বত্ব ও দীর্ঘত্ব অবশ্য হইতে পারে। তাই ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, আপেক্ষিকত্ব অর্থাৎ সাপেক্ষত্ব থাকিলে তৎপ্রযুক্ত ঐ দ্রব্যদ্বয়ের মধ্যে কোন এক দ্রব্যে বিশেষের অর্থাৎ হ্রস্বত্ব বা দীর্ঘত্বের উৎপত্তি হউক? পূর্ব্বপক্ষবাদী যে অপেক্ষাকে হ্রস্বত্ব ও দীর্ঘত্বের নিমিত্ত বলিয়াছেন, উহা যখন তুল্যপরিমাণ দ্রব্যদ্বয়েও আছে, তখন ঐ দ্রব্য-দ্বয়ের একের হ্রস্বত্ব ও অপরের দীর্ঘত্ব কেন হইবে না? কিন্তু ঐ দ্রব্যদ্বয়ের যে পরিমাণ-বৈষম্যরূপ ভেদ নাই, ইহা তাঁহারও স্বীকার্য্য। পূর্ব্বপক্ষবাদী অবশ্যই প্রশ্ন করিবেন যে, যদি হ্রস্বত্ব ও দীর্ঘত্ব দ্রব্যের স্বাভাবিক ধর্ম্মই হয়, তাহা হইলে অপেক্ষার সামর্থ্য অর্থাৎ সাফল্য কি? তাৎপর্য্য এই যে, কোন দ্রব্য কোন দ্রব্য অপেক্ষায় হ্রস্ব এবং কোন দ্রব্য অপেক্ষায় দীর্ঘ, সকল দ্রব্যই সকল দ্রব্য অপেক্ষায় হ্রস্ব ও দীর্ঘ, ইহা কেহই বলেন না। সুতরাং হ্রস্বত্ব ও দীর্ঘত্ব যে অপেক্ষাকৃত, ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। কিন্তু যদি হ্রস্বত্ব ও দীর্ঘত্ব স্বাভাবিক ধর্ম্মই হয়, তাহা হইলে আর অপেক্ষার প্রয়োজন কি? যাহা স্বাভাবিক, তাহা ত কাহারও আপেক্ষিক হয় না। সুতরাং পূর্ব্বোক্তরূপ অপেক্ষা ব্যর্থ। ভাষ্যকার শেষে নিজেই এই প্রশ্ন করিয়া তদুত্তরে বলিয়াছেন যে, দুইটি দ্রব্য দেখিলে তন্মধ্যে যে দ্রব্যে অতিশয় অর্থাৎ পরিমাণের আধিক্য দেখে, ঐ দ্রব্যকে দীর্ঘ বলিয়া নিশ্চয়

করে। যে দ্রব্যে তদপেক্ষায় ন্যূন পরিমাণ দেখে, ঐ দ্রব্যকে হ্রস্ব বলিয়া নিশ্চয় করে, ইহাই অপেক্ষার সাফল্য। তাৎপর্য্য এই যে, হ্রস্বত্ব ও দীর্ঘত্ব দ্রব্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম অর্থাৎ স্বকীয় বাস্তব ধর্ম্ম হইলেও উহার জ্ঞানে পূর্ব্বোক্তরূপ অপেক্ষা-বুদ্ধি আবশ্যক। কারণ, দীর্ঘ ও হ্রস্ব দুইটি দ্রব্য দেখিলে তন্মধ্যে একটিকে দীর্ঘ বলিয়া ও অপরটিকে হ্রস্ব বলিয়া যে নিশ্চয় জন্মে, তাহাতে ঐ দ্রব্যদ্বয়ের পরিমাণের আধিক্য ও ন্যূনতার জ্ঞান আবশ্যক। আধিক্য ও ন্যূনতার জ্ঞানে অপেক্ষার জ্ঞান আবশ্যক। কারণ, যাহার অপেক্ষায় অধিক ও যাহার অপেক্ষায় ন্যূন, তাহা না বুঝিলে আধিক্য ও ন্যূনতা বুঝা যায় না। সুতরাং হ্রস্বত্ব ও দীর্ঘত্ব বুঝিতে অপেক্ষার জ্ঞান আবশ্যক হওয়ায় অপেক্ষা ব্যর্থ নহে। কিন্তু ঐ হ্রস্বত্ব ও দীর্ঘত্বরূপ পদার্থ অপেক্ষাকৃত নহে, উহা বাস্তব কারণজন্য বাস্তব ধর্ম্ম। তাৎপর্য্যটীকাকারও ইহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, দীর্ঘত্ব ও হ্রস্বত্ব পরিমাণবিশেষ, উহা সৎ দ্রব্যের স্বাভাবিক অর্থাৎ বাস্তব ধর্ম্ম। উহার উৎপত্তিতে হ্রস্ব ও দীর্ঘ দ্রব্যদ্বয়ের জ্ঞানের কোন অপেক্ষা নাই। কিন্তু উহার উৎকর্ষ ও অপকর্ষের জ্ঞান পরস্পরের জ্ঞান-সাপেক্ষ। ইক্ষুযষ্টি হইতে বংশযষ্টির দীর্ঘত্ব বুঝিতে এবং বংশযষ্টি হইতে ইক্ষুযষ্টির হ্রস্বত্ব বুঝিতে ইক্ষুযষ্টি ও বংশযষ্টির জ্ঞান আবশ্যক এবং বস্তুর পরস্পর ভেদও অন্য বস্তুকে অপেক্ষা করে না, উহা অন্য বস্তুসাপেক্ষ নহে, কিন্তু উহার জ্ঞান অন্য বস্তুর জ্ঞানসাপেক্ষ। কারণ, ভেদ বুঝিতে যে বস্তু হইতে ভেদ, তাহা বুঝা আবশ্যক হয়। এইরূপ পিতৃত্ব পুত্রত্ব প্রভৃতিও পিত্রাদির স্বকীয় ধর্ম্ম, উহার উৎপত্তি পুত্রাদিসাপেক্ষ নহে। কিন্তু পিতৃত্বাদিধর্ম্মের জ্ঞানই পুত্রাদির জ্ঞানসাপেক্ষ। কারণ, যাহার পিতা, তাহাকে না বুঝিলে পিতৃত্ব বুঝা যায় না এবং যাহার পুত্র, তাহাকে না বুঝিলে পুত্রত্ব বুঝা যায় না। তাৎপর্য্যটীকাকার শেষে বলিয়াছেন যে, যদিও পরত্ব ও অপরত্ব প্রভৃতি গুণ, নিজের উৎপত্তিতেই অপেক্ষা-বুদ্ধি-সাপেক্ষ, ইহা ন্যায় ও বৈশেষিক শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত, তথাপি ঐ সকল পদার্থ লোকযাত্রা-নির্ব্বাহক হওয়ায় অসৎ বলা যায় না। কারণ, ঐ সমস্ত অলীক হইলে লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে পারে না। জ্যেষ্ঠত্ব কনিষ্ঠত্ব, দূরত্ব ও নিকটত্ব প্রভৃতি পদার্থ লোকযাত্রার নির্ব্বাহক। পরন্তু ঐ সকল পদার্থ অপেক্ষা-বুদ্ধিসাপেক্ষ হইলেও উহার আধার-দ্রব্য, সাপেক্ষ নহে। সুতরাং সর্ব্বশূন্যতাবাদী সকল পদার্থই সাপেক্ষ বলিয়া যে অসৎ বলিয়াছেন, তাহাও বলিতে পারেন না। কারণ, সকল পদার্থই সাপেক্ষ নহে। উদ্দ্যোতকরও বলিয়াছেন যে, হ্রস্বত্ব দীর্ঘত্ব, পরত্ব অপরত্ব প্রভৃতি কতিপয় পদার্থকে সাপেক্ষ বলিয়া সমর্থন করিয়া, সকল পদার্থ সাপেক্ষ, সুতরাং অসৎ, ইহা কোনরূপেই বলা যায় না। কারণ, রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি অসংখ্য পদার্থ ও তাহার জ্ঞানে পূর্ব্বোক্তরূপ অপেক্ষার কোন প্রয়োজন নাই। সুতরাং সকল পদার্থই সাপেক্ষ নহে। তাৎপর্য্য-টীকাকার তাঁহার পূর্ব্বোক্ত বিশেষ যুক্তির খণ্ডন করিতে পরে বলিয়াছেন যে, নিত্য ও অনিত্য, এই দ্বিবিধ ভাব পদার্থই আছে। নিত্য পদার্থও যে "অর্থক্রিয়াকারী" অর্থাৎ কার্য্যজনক হইতে পারে, ইহা তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকে ক্ষণিকত্ববাদ নিরাস করিতে উপপাদন করিয়াছি। অনিত্য পদার্থও স্বকীয় কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়া বিনাশের কারণ উপস্থিত হইলে বিনষ্ট হইয়া থাকে; বিনাশ উহার স্বভাব নহে। বিনাশ উহার স্বভাব না হইলে কেহ বিনাশ করিতে পারে না, ইহা

নির্যুক্তিক। যদি বল, নীলকে কেহ পীত করিতে পারে না কেন? এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, নীল বস্ত্রকে পীত করিতে অবশ্যই পারা যায়। যেমন শ্যাম ঘট বিলক্ষণ অগ্নিসংযোগবশতঃ রক্তবর্ণ হইতেছে, তদ্রূপ নীলবস্ত্রও পীতবর্ণ দ্রব্যবিশেষের বিলক্ষণ-সংযোগবশতঃ পীতবর্ণ হয়। যদি বল, নীলত্বকে কেহ পীতত্ব করিতে পারে না, ইহাই আমার বক্তব্য, তাহা হইলে বলিব, ইহা সত্য। কিন্তু ভাবকেও কেহ অভাব করিতে পারে না, ইহাও আমরা বলিব। যদি নীলত্ব পীতত্ব বস্তু স্বীকার করিয়া নীলত্বকে পীতত্ব করা যায় না, এই কথা বল, তাহা হইলে ভাবপদার্থও আছে, ইহা স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে ভাবকে অভাব করা যায় না, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং ইহাই স্বীকার করিতে হইবে যে, যেমন কুম্ভে ক্রমশঃ শ্যাম রূপ ও রক্ত রূপ জন্মে, তদ্রূপ প্রথমে ঐ কুম্ভের অবয়বে কুম্ভ নামক দ্রব্য জন্মে এবং পরে তাহাতে বিনাশের কারণ উপস্থিত হইলে ঐ কুম্ভের বিনাশরূপ অভাব জন্মে। কিন্তু ঐ কুম্ভই অভাব নহে—যাহা ভাব, তাহা কখনই অভাব হইতে পারে না।

উদ্দ্যোতকর সর্ব্বশেষে ইহাও বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বশূন্যতাবাদ সর্ব্বথা ব্যাহত; সুতরাং অযুক্ত। প্রথম ব্যাঘাত এই যে, যিনি বলিবেন, "সকল পদার্থই অভাব", তাঁহাকে ঐ বিষয়ে প্রমাণ প্রশ্ন করিলে যদি তিনি কোন প্রমাণ বলেন, তাহা হইলে প্রমাণের সত্তা স্বীকার করায় তাঁহার কথিত সকল পদার্থের অসত্তা ব্যাহত হয়। কারণ, প্রমাণকে সৎ বলিয়া স্বীকার না করিলে উহার দ্বারা তাঁহার সাধ্যসিদ্ধি হইতে পারে না। আর যদি উক্ত বিষয়ে কোন প্রমাণ না বলেন, তাহা হইলে প্রমাণের অভাবে তাঁহার ঐ মত সিদ্ধ হইতে পারে না। প্রমাণ ব্যতীতও যদি কোন মত সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে "সকল পদার্থই সৎ" ইহাও বলিতে পারি। ইহাতেও কোন প্রমাণের অপেক্ষা না থাকায় প্রমাণ প্রশ্ন হইতে পারে না। দ্বিতীয় ব্যাঘাত এই যে, যদি সর্ব্বশূন্যতাবাদী তাঁহার "সকল পদার্থই অভাব" এই বাক্যের প্রতিপাদ্য পদার্থের সত্তা স্বীকার করেন, তাহা হইলে সেই প্রতিপাদ্য পদার্থের সত্তা স্বীকৃত হওয়ায় তিনি সকল পদার্থেরই অসত্তা বলিতে পারেন না। আর যদি তিনি ঐ বাক্যের কোন প্রতিপাদ্য পদার্থও স্বীকার না করেন, তাহা হইলে উহা তাঁহার নিরর্থক বর্ণোচ্চারণ মাত্র। কারণ, প্রতিপাদ্য না থাকিলে তাহা বাক্যই হয় না। তৃতীয় ব্যাঘাত এই যে, সর্ব্বশূন্যতাবাদী যদি তাঁহার "সর্ব্বমভাবঃ" এই বাক্যের বোদ্ধা ও বোধয়িতা স্বীকার করেন, তাহা হইলে ঐ উভয় ব্যক্তির সত্তা স্বীকৃত হওয়ায় সকল পদার্থেরই অসত্তা বলিতে পারেন না। বোদ্ধা ও বোধয়িতা ব্যক্তির সত্তা স্বীকার না করিলেও বাক্য প্রয়োগ হইতে পারে না। চতুর্থ ব্যাঘাত এই যে, সর্ব্বশূন্যতাবাদী যদি "সর্ব্বমভাবঃ" এবং "সর্ব্বং ভাবঃ" এই বাক্যদ্বয়ের অর্থভেদ স্বীকার করেন, তাহা হইলে সেই অর্থ-ভেদের সত্তা স্বীকৃত হওয়ায় তিনি সকল পদার্থের অসত্তা বলিতে পারেন না। ঐ বাক্যদ্বয়ের অর্থভেদ স্বীকার না করিলে তিনি ঐ বাক্যদ্বয়ের মধ্যে বিশেষ করিয়া "সর্ব্বমভাবঃ" এই বাক্যই বলেন কেন? তিনি "সর্ব্বং ভাবঃ" এই বাক্যই বলেন না কেন? সুতরাং তিনি যে, ঐ বাক্যদ্বয়ের অর্থভেদের সত্তা স্বীকার করেন, ইহা অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তাহা হইলে তিনি আর সকল পদার্থেরই অসত্তা বলিতে পারেন না। উদ্দ্যোতকর এই সকল কথা বলিয়া

সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন যে, এই সর্ব্বশূন্যতাবাদ যে যেরূপেই বিচার করা যায়, সেই সেইরূপেই অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকারেই উপপত্তিসহ হয় না। সুতরাং উহা সর্ব্বথাই অযুক্ত। মহর্ষির "ব্যাহতত্বাদযুক্তং" এই সূত্রের দ্বারা ও উদ্দ্যোতকরের কথিত সর্ব্বপ্রকার ব্যাঘাতপ্রযুক্ত উক্ত মত সর্ব্বথা অযুক্ত, ইহাও সূচিত হইয়াছে বুঝা যায়॥ ৪০॥

সর্ব্বশূন্যতা-নিরাকরণ-প্রকরণ সমাপ্ত॥ ১০॥

ভাষ্য। অথেমে সংখ্যৈকান্তবাদাঃ—

সর্ব্বমেকং সদবিশেষাৎ। সর্ব্বং দ্বে-ধা নিত্যানিত্যভেদাৎ। সর্ব্বং ত্রে-ধা জ্ঞাতা, জ্ঞানং, জ্ঞেয়মিতি। সর্ব্বং চতুর্দ্ধা—প্রমাতা, প্রমাণং, প্রমেয়ং, প্রমিতিরিতি। এবং যথাসম্ভবমন্যেঽপীতি। তত্র পরীক্ষা।

অনুবাদ। অনন্তর অর্থাৎ সর্ব্বশূন্যতাবাদের পরে এই সমস্ত "সংখ্যৈকান্তবাদ" (বলিতেছি)—(১) সমস্ত পদার্থ এক, যেহেতু সৎ হইতে বিশেষ (ভেদ) নাই, অর্থাৎ সমস্ত পদার্থেই নির্ব্বিশেষে "সৎ" এইরূপ প্রতীতি হওয়ায় ঐ "সৎ" হইতে অভিন্ন বলিয়া সমস্ত পদার্থ একই। (২) সমস্ত পদার্থ দুই প্রকার, যেহেতু নিত্য ও অনিত্য, এই দুই ভেদ আছে, অর্থাৎ নিত্য ও অনিত্য ভিন্ন আর কোন প্রকার ভেদ না থাকায় সমস্ত পদার্থ দুই প্রকারই। (৩) সমস্ত পদার্থ তিন প্রকার, (যথা) জ্ঞাতা, জ্ঞান, জ্ঞেয়। (৪) সমস্ত পদার্থ চারি প্রকার, (যথা) প্রমাতা, প্রমাণ, প্রমেয়, প্রমিতি। এইরূপ যথাসম্ভব অন্যও অনেক "সংখ্যৈকান্তবাদ" (জানিবে)। সেই অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত "সংখ্যৈকান্তবাদ" বিষয়ে পরীক্ষা (করিতেছেন)।

সূত্র। সংখ্যৈকান্তাসিদ্ধিঃ কারণানুপপত্ত্যুপ-পত্তিভ্যাং ॥৪১॥৩৮৪॥

অনুবাদ। "কারণে"র অর্থাৎ সাধনের উপপত্তি ও অনুপপত্তিপ্রযুক্ত "সংখ্যৈকান্তবাদ"সমূহের সিদ্ধি হয় না।

ভাষ্য। যদি সাধ্যসাধনয়োর্নানাত্বং ? একান্তো ন সিধ্যতি, ব্যতিরেকাৎ। অথ সাধ্যসাধনয়োরভেদঃ ? এবমপ্যেকান্তো ন সিধ্যতি, সাধনাভাবাৎ। নহি সাধনমন্তরেণ কস্যচিৎ সিদ্ধিরিতি।

অনুবাদ। যদি সাধ্য ও সাধনের নানাত্ব (ভেদ) থাকে, তাহা হইলে "ব্যতিরেকবশতঃ" অর্থাৎ সাধ্য হইতে সেই সাধনের অতিরিক্ত পদার্থত্ববশতঃ একান্ত

(পূর্ব্বোক্ত সংখ্যৈকান্তবাদ) সিদ্ধ হয় না, আর যদি সাধ্য ও সাধনের অভেদ হয়, অর্থাৎ সাধ্য হইতে অতিরিক্ত সাধন না থাকে, এইরূপ হইলেও সাধনের অভাববশতঃ "একান্ত" (পূর্ব্বোক্ত সংখ্যৈকান্তবাদ) সিদ্ধ হয় না। কারণ, হেতু ব্যতীত কোন পদার্থেরই সিদ্ধি হয় না।

টিপ্পনী। মহর্ষি "প্রেত্যভাবে"র পরীক্ষা-প্রসঙ্গে ঐ পরীক্ষা পরিশোধনের জন্যই "সর্ব্বশূন্যতা-বাদ" পর্য্যন্ত কতিপয় "একান্তবাদে"র খণ্ডন করিয়া, শেষে এই সূত্রের দ্বারা "সংখ্যৈকান্তবাদে"রও খণ্ডন করিয়াছেন। এই সূত্রে "সংখ্যৈকান্তাসিদ্ধিঃ" এই বাক্যের দ্বারা "সংখ্যৈকান্তবাদ"ই যে এখানে তাঁহার খণ্ডনীয়, ইহা বুঝা যায়। কিন্তু ঐ "সংখ্যৈকান্তবাদ" কাহাকে বলে, তাহা প্রথমে বুঝা আবশ্যক। তাই ভাষ্যকার প্রথমে চারি প্রকার "সংখ্যৈকান্তবাদে"র বর্ণন করিয়া, শেষে "এবং যথাসম্ভবমন্যেঽপীতি" এই সন্দর্ভের দ্বারা আরও যে অনেক প্রকার "সংখ্যৈকান্তবাদ" আছে, তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। যাহার কোন এক পক্ষেই "অন্ত" অর্থাৎ ব্যবস্থা বা নিয়ম আছে,[১] তাহাকে "একান্ত" বলা যায়। সুতরাং যে সকল বাদে (মতে) সংখ্যা একান্ত, এই অর্থে বহুব্রীহি সমাসে "সংখ্যৈকান্তবাদ" শব্দের দ্বারা ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্ত মতগুলি বুঝা যাইতে পারে। "বার্ত্তিক"কার উদ্দ্যোতকর এবং বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এখানে ভাষ্যকারের পাঠের উল্লেখ করিতে "অথেমে সংখ্যৈকান্ত-বাদাঃ" এইরূপ পাঠেরই উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু তাৎপর্য্যটীকায় "অথৈতে সংখ্যৈকান্তবাদাঃ" এইরূপ পাঠ উল্লিখিত দেখা যায়। সে যাহাই হউক, তাৎপর্য্যটীকাকারও "সংখ্যা একান্তা যেষু বাদেষু তে তথোক্তাঃ" এইরূপ ব্যাখ্যার দ্বারা ভাষ্যকারোক্ত "সংখ্যৈকান্তবাদ" শব্দের পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। (১) সকল পদার্থ এক। (২) সকল পদার্থ দুই প্রকার। (৩) সকল পদার্থ তিন প্রকার। (৪) সকল পদার্থ চারি প্রকার। এই চারিটি মতে যথাক্রমে একত্ব, দ্বিত্ব, ত্রিত্ব ও চতুষ্ট সংখ্যা একান্ত অর্থাৎ ঐকান্তিক বা নিয়ত ; এ জন্য ঐ চারিটি মতই "সংখ্যৈকান্তবাদ" নামে কথিত হইয়াছে। উহার মধ্যে সর্ব্বপ্রথম মত—"সর্ব্বমেকং"।

তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে এই মতকে অদ্বৈতবাদ বা বিবর্ত্তবাদ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। নিত্যজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মই একমাত্র বাস্তব পদার্থ, তদ্‌ভিন্ন বাস্তব দ্বিতীয় কোন পদার্থ নাই। এই জগৎ সেই একমাত্র সৎ ব্রহ্মেরই বিবর্ত্ত, অর্থাৎ অবিদ্যাবশতঃ রজ্জুতে সর্পের ন্যায়

১। "তার্কিকরক্ষা"কার মহানৈয়ায়িক বরদরাজ হেত্বাভাস প্রকরণে "অনেকান্ত" শব্দের অর্থব্যাখ্যায় "অন্ত" শব্দের নিশ্চয় অর্থ বলিয়াছেন। সেখানে টীকাকার মল্লিনাথ বলিয়াছেন যে, নিশ্চয়ার্থবাচক 'অন্ত' শব্দের দ্বারা নিয়তত্ব বা নিয়মের সাদৃশ্যবশতঃ ব্যবস্থা অর্থাৎ নিয়ম অর্থই লক্ষিত হইয়াছে। অর্থাৎ যেখানে কোন এক পক্ষে নিশ্চয় আছে, সেখানে সেই পক্ষেই নিয়ম স্বীকৃত হওয়ায় নিশ্চয় ও নিয়ম তুল্য পদার্থ। সুতরাং এখানে নিশ্চয়বাচক "অন্ত" শব্দের লক্ষণার দ্বারা নিয়ম অর্থ বুঝা যাইতে পারে। এখানে গ্রন্থকার বরদরাজের উহাই তাৎপর্য্য। মল্লিনাথের কথা-নুসারে "অন্ত"শব্দের দ্বারা নিয়ম অর্থ বুঝিলে এখানে "একান্ত" শব্দের দ্বারা একনিয়ত বা কোন এক পক্ষে নিয়মবদ্ধ, এইরূপ অর্থ বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু "অন্ত"শব্দের ধর্ম্ম অর্থেও প্রয়োগ আছে। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন প্রভৃতি অন্যত্র ধর্ম্ম অর্থেও "অন্ত"শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। ১ম খণ্ড, ৩৬৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ব্রহ্মেই আরোপিত, সুতরাং গগন-কুসুমের ন্যায় একেবারে অসৎ বা অলীক না হইলেও মিথ্যা অর্থাৎ অনির্ব্বাচ্য, ইহাই ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের সমর্থিত অদ্বৈতবাদ বা বিবর্ত্তবাদ। এই মতে কোন পদার্থেরই এক ব্রহ্মের সত্তা হইতে অতিরিক্ত বাস্তব সত্তা না থাকায় সকল পদার্থ বস্তুতঃ এক, ইহা বলা যায়। তাৎপর্য্যটীকাকারের মতে ভাষ্যকার "সদবিশেষাৎ" এই হেতুবাক্যের দ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপ যুক্তিরই সূচনা করিয়াছেন। অর্থাৎ একমাত্র ব্রহ্মই "সৎ" শব্দের বাচ্য, সেই সৎ ব্রহ্ম হইতে সকল পদার্থেরই যখন বিশেষ অর্থাৎ বাস্তব ভেদ নাই, তখন সকল পদার্থই বস্তুতঃ সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপ; সুতরাং এক। তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে পূর্ব্বোক্ত অদ্বৈতমতের বর্ণন ও সমর্থনপূর্ব্বক পরে এই সূত্রের তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়া পূর্ব্বোক্ত অদ্বৈতমতের খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু মহর্ষির এই সূত্রোক্ত হেতুর দ্বারা কিরূপে যে, পূর্ব্বোক্ত অদ্বৈতমত খণ্ডিত হয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। তাৎপর্য্যটীকাকারও তাহা বিশদ করিয়া বুঝান নাই। "ন্যায়মঞ্জরী"কার মহানৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্ট পূর্ব্বোক্ত অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করিতে বিস্তৃত বিচার করিয়াছেন। তাঁহার শেষ কথা এই যে, অদ্বৈতবাদি-সম্মত "অবিদ্যা" নামে পদার্থ না থাকিলে পূর্ব্বোক্ত অদ্বৈতমত কোনরূপেই সমর্থিত হইতে পারে না। জগতে সর্ব্ব-সম্মত ভেদব্যবহার কোনরূপেই উপপন্ন হইতে পারে না। কিন্তু ঐ "অবিদ্যা" থাকিলেও ঐ "অবিদ্যা"ই ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় পদার্থ হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত অদ্বৈতমত সিদ্ধ হইতে পারে না। সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মের ন্যায় অনাদি কোন পদার্থ স্বীকৃত হইলে এই জগৎ প্রথমে ব্রহ্মরূপই ছিল, তখন ব্রহ্মভিন্ন দ্বিতীয় কোন পদার্থ ছিল না, এই সিদ্ধান্ত বলা যাইতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত কথা সমর্থন করিতে জয়ন্তভট্টও শেষে মহর্ষি গোতমের এই সূত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার উদ্ধৃত সূত্রপাঠে সূত্রে "কারণ" শব্দ স্থলে "প্রমাণ" শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। জয়ন্তভট্ট সেখানে এই সূত্রের তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, যদি অদ্বৈত-সিদ্ধিতে কোন প্রমাণ থাকে, সেই প্রমাণই দ্বিতীয় পদার্থ হওয়ায় অদ্বৈত সিদ্ধ হয় না। আর যদি উহাতে কোন প্রমাণ না থাকে, তাহা হইলেও প্রমাণাভাবে উহা সিদ্ধ হইতে পারে না। (ন্যায়মঞ্জরী, ৫৩১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু এখানে ইহা প্রণিধান করা আবশ্যক যে, অদ্বৈতবাদসমর্থক ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি প্রমাণাদি পদার্থকে একেবারে অসৎ বলেন নাই। যে পর্য্যন্ত প্রমাণ প্রমেয় ব্যবহার আছে, সে পর্য্যন্ত ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত প্রমাণেরও ব্যবহারিক সত্তা আছে। তাঁহারা প্রধানতঃ যে শ্রুতিপ্রমাণের দ্বারা অদ্বৈত মত সমর্থন করিয়াছেন, ঐ শ্রুতিও তাঁহাদিগের মতে পারমার্থিক বস্তু না হইলেও উহার ব্যবহারিক সত্তা আছে। এবং ঐ অবাস্তব প্রমাণের দ্বারাও যে, বাস্তব তত্ত্বের নির্ণয় হইতে পারে, ইহা বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথম পাদের চতুর্দ্দশ সূত্রের ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বিশেষরূপে সমর্থন করিয়াছেন। তাৎপর্য্যটীকাকার সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্রও সেখানে "ভামতী" টীকায় উহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। অদ্বৈত মতে ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় সত্য পদার্থই স্বীকৃত হয় নাই। কিন্তু অবিদ্যা প্রভৃতি মিথ্যা বা অনির্ব্বাচ্য পদার্থ সমস্তই স্বীকৃত হইয়াছে। তাহাতে অদ্বৈতবাদীদিগের অদ্বৈত-সিদ্ধান্ত-ভঙ্গ হয় না। কারণ, সত্য পদার্থ এক, ইহাই ঐ অদ্বৈত সিদ্ধান্ত। অদ্বৈত সিদ্ধান্তের

"কারণ" অর্থাৎ সাধন বা প্রমাণ থাকিলে উহাই দ্বিতীয় পদার্থ বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায় অদ্বৈত মত সিদ্ধ হয় না, এই এক কথায় অদ্বৈতবাদ বিচূর্ণ করিতে পারিলে উহার সংহার সম্পাদনের জন্য এতকাল হইতে নানা দেশে নানা সম্প্রদায়ে নানারূপে সংগ্রাম চলিত না। তাৎপর্য্যটীকাকার ইতঃপূর্ব্বে "ঈশ্বরঃ কারণং" ইত্যাদি (১৯শ) সূত্রের দ্বারাও পূর্ব্বপক্ষরূপে অদ্বৈতবাদের ব্যাখ্যা করিয়া উহা খণ্ডন করিয়াছেন। আমরা কিন্তু মহর্ষির সূত্র এবং ভাষ্য ও বার্ত্তিকের দ্বারা পূর্ব্বে এবং এখানে যে, অদ্বৈতবাদ খণ্ডিত হইয়াছে, ইহা বুঝিতে পারি নাই। ভাষ্য ও বার্ত্তিকে শঙ্করাচার্য্যের সমর্থিত অদ্বৈতবাদের কোন স্পষ্ট আলোচনা পাওয়া যায় না। পরবর্ত্তী কালে শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্র এবং তাঁহার ব্যাখ্যানুসারে "ন্যায়মঞ্জরী"কার জয়ন্ত ভট্ট পূর্ব্বোক্ত অদ্বৈতমত খণ্ডনে মহর্ষির এই সূত্রের তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়াছেন, ইহাই বুঝা যায়।

ন্যায়সূত্রবৃত্তিকার নব্যনৈয়ায়িক বিশ্বনাথ পঞ্চানন প্রথমে ভাষ্যকারের "অথেমে সংখ্যৈকান্ত-বাদাঃ" ইত্যাদি সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যেমন নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বরূপে পদার্থের দ্বৈধ অর্থাৎ দ্বিপ্রকারতা, তদ্রূপ সত্ত্বরূপে পদার্থের একত্ব, ইহা স্পষ্ট অর্থ। বৃত্তিকার পরে বলিয়াছেন যে, অপর সম্প্রদায় "সর্ব্বমেকং" এই মতকে অদ্বৈতবাদ বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। বৃত্তিকার অপর সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যা বলিয়া এখানে যে, তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি-সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যারই উল্লেখ করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। বৃত্তিকার পরে কল্পান্তরে "সর্ব্বমেকং" এই প্রথম মতের নিজে ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, অথবা সমস্ত পদার্থ এক, অর্থাৎ দ্বৈতশূন্য। কারণ, "ঘটঃ সন্, পটঃ সন্" ইত্যাদি প্রকার প্রতীতি হওয়ায় ঘটপটাদি সমস্ত পদার্থই সৎ হইতে অভিন্ন বলিয়া এক, ইহা বুঝা যায়। তাৎপর্য্য এই যে, সমস্ত পদার্থই সৎ হইলে সৎ হইতে সমস্ত পদার্থই অভিন্ন, ইহা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে ঘট হইতে অভিন্ন যে সৎ, সেই সৎ হইতে পটও অভিন্ন হওয়ায় ঘট ও পট অভিন্ন, ইহাও সিদ্ধ হয়। এইরূপে সমস্ত পদার্থই অভিন্ন হইলে সকল পদার্থই এক অর্থাৎ পদার্থের বাস্তব ভেদ বা দ্বিত্বাদি সংখ্যা নাই, ইহাই সিদ্ধ হয়। বৃত্তিকার শেষে এই মতের সাধকরূপে "একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যাদি শ্রুতিও উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু বৃত্তিকার এই প্রকরণের ব্যাখ্যা করিয়া সর্ব্বশেষে আবার পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ ব্যাখ্যায় তাঁহার অরুচি প্রকাশ করিয়া, শেষ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন যে, অদ্বৈতবাদ খণ্ডন তাৎপর্য্যেই এই প্রকরণ সঙ্গত হয়। বৃত্তিকারের এই শেষ মন্তব্যের দ্বারা তাঁহার অভিপ্রায় বুঝা যায় যে, সূত্রে যে "সংখ্যৈকান্ত" শব্দ আছে, তাহার অর্থ কেবল অদ্বৈতবাদ, এবং ঐ অদ্বৈতবাদই এই প্রকরণে মহর্ষির খণ্ডনীয়। অদ্বৈত মতে ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত বাস্তব কোন সাধন বা প্রমাণ নাই। অবাস্তব প্রমাণের দ্বারা বাস্তব তত্ত্বের নির্ণয় হইতে পারে না। সুতরাং বাস্তব প্রমাণের অভাবে অদ্বৈত মত সিদ্ধ হয় না। ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত বাস্তব প্রমাণপদার্থ স্বীকার করিলেও দ্বিতীয় সত্য পদার্থ স্বীকৃত হওয়ায় অদ্বৈত মত সিদ্ধ হয় না। "ন্যায়মঞ্জরী"কার জয়ন্ত ভট্টেরও এইরূপ অভিপ্রায়ই বুঝা যায়। নচেৎ অন্য কোন ভাবে জয়ন্তভট্ট ও বৃত্তিকার বিশ্বনাথের কথার উপপত্তি হয় না। কিন্তু তাঁহাদিগের ঐ একমাত্র যুক্তির দ্বারাই অদ্বৈতবাদের খণ্ডন হইতে পারে কি না, ইহা চিন্তা করা আবশ্যক। পরন্তু এই

প্রকরণের দ্বারা একমাত্র পূর্ব্বোক্ত অদ্বৈতবাদই মহর্ষির খণ্ডনীয় হইলে মহর্ষি এই সূত্রে স্বল্পাক্ষর ও প্রসিদ্ধ "অদ্বৈত" শব্দের প্রয়োগ না করিয়া "সংখ্যৈকান্ত" শব্দের প্রয়োগ করিবেন কেন ? ইহাও চিন্তা করা আবশ্যক। পূর্ব্বোক্ত অদ্বৈতবাদ বুঝাইতে "সংখ্যৈকান্ত" শব্দের প্রয়োগ আর কোথায় আছে, ইহাও দেখা আবশ্যক। আমরা কিন্তু পূর্ব্বোক্ত অদ্বৈতবাদ বুঝাইতে আর কোথায়ও "সংখ্যৈকান্ত" শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাই নাই। পরন্তু ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন "সংখ্যৈকান্তবাদ" বলিয়া এখানে যে সকল মতের উল্লেখ করিয়াছেন, ঐ সমস্ত মতই সুপ্রাচীন কালে "সংখ্যৈকান্তবাদ" নামে প্রসিদ্ধ ছিল, ইহাই ভাষ্যকারের কথার দ্বারা বুঝা যায়। ভাষ্যকারোক্ত "সর্ব্বং দ্বেধা" ইত্যাদি মতগুলি যে, পূর্ব্বোক্ত অদ্বৈতবাদ নহে, ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। সুতরাং মহর্ষি "সংখ্যৈকান্তা-সিদ্ধিঃ" ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা যে, কেবল অদ্বৈতবাদেরই খণ্ডন করিয়াছেন, ইহা কিরূপে বুঝিব ? ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার দ্বারা উহা কোনরূপেই বুঝা যায় না।

ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককার মহর্ষির এই সূত্রের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, সাধ্য ও সাধনের ভেদ থাকিলে সাধ্য হইতে অতিরিক্ত সাধন স্বীকৃত হওয়ায় "সংখ্যৈকান্তবাদ" সিদ্ধ হয় না। সাধ্য ও সাধনের ভেদ না থাকিলেও অর্থাৎ সাধ্য হইতে অতিরিক্ত সাধন না থাকিলেও সাধনের অভাবে পূর্ব্বোক্ত "সংখ্যৈকান্তবাদ" সিদ্ধ হয় না। আমরা উক্ত প্রাচীন ব্যাখ্যার দ্বারা ভাষ্যকারের প্রথমোক্ত "সর্ব্বমেকং" এই "সংখ্যৈকান্তবাদে"র তাৎপর্য্য বুঝিতে পারি যে, সকল পদার্থই এক অর্থাৎ পদার্থের ভেদ বা দ্বিত্বাদি সংখ্যা কাল্পনিক। দ্রব্য গুণ প্রভৃতি পদার্থভেদ এবং ঐ সকল পদার্থের যে আরও অনেক প্রকার ভেদ কথিত হয়, তাহা বস্তুতঃ নাই। কারণ, "সৎ" হইতে কোন পদার্থেরই বিশেষ নাই। অর্থাৎ পূর্ব্বপ্রকরণে সকল পদার্থই "অসৎ" এই মত খণ্ডিত হওয়ায় জ্ঞেয় সকল পদার্থই "সৎ" ইহা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে সকল পদার্থই সৎস্বরূপে এক, ইহা স্বীকার্য্য হওয়ায় পদার্থের আর কোন প্রকার ভেদ স্বীকার অনাবশ্যক। উক্ত মতের খণ্ডনে মহর্ষির যুক্তির ব্যাখ্যা করিতে ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককার যাহা বলিয়াছেন, তদ্দ্বারাও পূর্ব্বোক্তরূপ পূর্ব্বপক্ষই আমরা বুঝিতে পারি এবং পরবর্ত্তী ৪৩শ সূত্র ও উহার ভাষ্যের দ্বারাও আমরা তাহা বুঝিতে পারি, পরে তাহা ব্যক্ত হইবে। এখানে উক্ত মত খণ্ডনে ভাষ্যকার-ব্যাখ্যাত যুক্তির তাৎপর্য্য বুঝা যায় যে, প্রথমে "সর্ব্বমেকং" এই বাক্যের দ্বারা যে সাধ্যের প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, উহা হইতে ভিন্ন সাধন না থাকিলে ঐ সাধ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, যাহা সাধ্য, তাহা নিজেই নিজের সাধন হয় না। সাধ্য ও সাধনের ভেদ থাকা আবশ্যক। কিন্তু যাঁহার মতে পদার্থের কোন বাস্তব ভেদই নাই, তাঁহার মতে সাধ্য ভিন্ন সাধন থাকা অসম্ভব। সুতরাং তাঁহার মতে পূর্ব্বোক্ত "সর্ব্বমেকং" এই প্রতিজ্ঞার্থ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রথম প্রকার "সংখ্যৈকান্তবাদ" সিদ্ধ হইতে পারে না। আর তিনি যদি তাঁহার সাধ্য হইতে ভিন্ন কোন পদার্থ স্বীকার করিয়া, সেই পদার্থকেই তাঁহার সাধ্যের সাধন বলেন, তাহা হইলেও পূর্ব্বোক্ত "সংখ্যৈকান্তবাদ" সিদ্ধ হয় না। কারণ, সাধ্য হইতে কোন অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকার করিলেই দ্বিতীয় পদার্থ স্বীকৃত হওয়ায় "সর্ব্বমেকং" এই মত বাধিত হইয়া যায়। এইরূপ (২) নিত্য ও অনিত্য-ভেদে সকল পদার্থ দ্বিবিধ, এই দ্বিতীয় প্রকার

কান্তবাদে"রও তাৎপর্য্য বুঝা যায় যে, নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব ভিন্ন পদার্থ-বিভাজক আর কোন ধর্ম্ম নাই। অর্থাৎ পদার্থের আর কোন প্রকার ভেদ নাই,—নিত্য ও অনিত্য, এই দুই প্রকারই পদার্থ। এইরূপ (৩) জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, এই তিন প্রকারই পদার্থ, এই তৃতীয় প্রকার "সংখ্যৈকান্তবাদে"র তাৎপর্য্য বুঝা যায় যে, জ্ঞাতৃত্ব, জ্ঞানত্ব ও জ্ঞেয়ত্ব ভিন্ন পদার্থ-বিভাজক আর কোন ধর্ম্ম নাই অর্থাৎ পদার্থের আর কোন প্রকার ভেদ নাই। জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, এই তিন প্রকারই পদার্থ। এখানে তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, জ্ঞপ্তিও জ্ঞানের বিষয় হওয়ায় উহা জ্ঞেয় হইতে অতিরিক্ত পদার্থ নহে। তাৎপর্য্যটীকাকারের এই কথার দ্বারা তিনি এই মতে "জ্ঞান" শব্দের দ্বারা জ্ঞানের সাধন বুঝিয়াছেন, ইহা বুঝা যাইতে পারে। কারণ, জ্ঞপ্তি অর্থাৎ জ্ঞানকেও জ্ঞেয়মধ্যে গ্রহণ করিলে "জ্ঞান" শব্দের দ্বারা অন্য অর্থই বুঝিতে হয়। এইরূপ (৪) প্রমাতা, প্রমাণ, প্রমেয় ও প্রমিতি, এই চারি প্রকারই পদার্থ, এই চতুর্থ প্রকার "সংখ্যৈকান্তবাদে"রও তাৎপর্য্য বুঝা যায় যে, প্রমাতৃত্ব, প্রমাণত্ব, প্রমেয়ত্ব ও প্রমিতিত্ব ভিন্ন পদার্থ-বিভাজক আর কোন ধর্ম্ম নাই অর্থাৎ পদার্থের আর কোন প্রকার ভেদ নাই। পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকারই পদার্থ। মহর্ষির এই সূত্রোক্ত হেতুর দ্বারা ভাষ্যকারোক্ত দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ প্রকার "সংখ্যৈকান্তবাদ"ও খণ্ডিত হইয়াছে। কারণ, দ্বিতীয় মতে নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বরূপে সমস্ত পদার্থের যে প্রতিজ্ঞা হইয়াছে, ঐ প্রতিজ্ঞার্থ সিদ্ধ করিতে অন্যরূপে কোন পদার্থকে হেতু বলিতে হইবে। কারণ, সাধ্য হইতে ভিন্ন পদার্থই সাধন হইতে পারে। কিন্তু দ্বিতীয়মতবাদী নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব ভিন্ন অন্য কোনরূপে পদার্থের অস্তিত্বই স্বীকার না করায় তিনি তাঁহার সাধ্যের সাধন বলিতে পারেন না। অন্য রূপে কোন পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া, সেই পদার্থকে সাধন বলিলে তৃতীয় প্রকার পদার্থ স্বীকৃত হওয়ায় নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বরূপে পদার্থ দ্বিবিধ, এই সিদ্ধান্ত ব্যাহত হয়। এইরূপ তৃতীয় মতে জ্ঞাতৃত্বাদিরূপে এবং চতুর্থ মতে প্রমাতৃত্বাদি-রূপে পদার্থের যে প্রতিজ্ঞা হইয়াছে, ঐ প্রতিজ্ঞার্থ সিদ্ধ করিতে হইলে উহা হইতে ভিন্নরূপে কোন ভিন্ন পদার্থকেই হেতু বলিতে হইবে। কারণ, সাধ্য বা প্রতিজ্ঞার্থ হইতে ভিন্ন পদার্থই ভিন্নরূপে সাধন হইতে পারে। কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থ মতবাদী অন্য আর কোনরূপেই পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার না করায় তাঁহাদিগের সাধ্যের সাধন বলিতে পারেন না। সুতরাং সাধনের অভাবে তাঁহাদিগের সাধ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। অন্যরূপে কোন পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া, সেই পদার্থকে সাধন বলিলে তৃতীয় মতে চতুর্থ প্রকার ও চতুর্থ মতে পঞ্চম প্রকার পদার্থ স্বীকৃত হওয়ায় ঐ মতদ্বয় ব্যাহত হয়। পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ "সংখ্যৈকান্তবাদ" সুপ্রাচীন কালে সম্প্রদায়ভেদে পরিগৃহীত হইয়াছিল, ইহা মনে হয়। তাই সুপ্রাচীন ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন এখানে ঐ চতুর্ব্বিধ মতের উল্লেখপূর্ব্বক মহর্ষির সূত্রের দ্বারা ঐ মতের খণ্ডন করিয়াছেন।

ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ "সংখ্যৈকান্তবাদে"র স্পষ্ট উল্লেখ করিয়া, শেষে এতদ্ভিন্ন আরও অনেক "সংখ্যৈকান্তবাদ" বুঝিতে বলিয়াছেন। সেখানে ভাষ্যকারের "যথাসম্ভবং" এই বাক্যের দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে, সকল পদার্থ পাঁচ প্রকার এবং সকল পদার্থ ছয় প্রকার এবং সকল পদার্থ সাত প্রকার, ইত্যাদিরূপে যে পর্য্যন্ত পদার্থের সংখ্যাবিশেষের নিয়ম সম্ভব হয়, সেই পর্য্যন্ত

পদার্থের সংখ্যাবিশেষের ঐকান্তিকত্ব বা নিয়তত্ব গ্রহণ করিয়া, যে সকল মতে পদার্থ বর্ণিত হইয়াছে, ঐ সকল মতও পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বিধ মতের ন্যায় "সংখ্যৈকান্তবাদ"। তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে ভাষ্যকারোক্ত অন্য "সংখ্যৈকান্তবাদে"র উদাহরণ প্রদর্শন করিতে বলিয়াছেন যে, প্রকৃতি ও পুরুষ, অথবা রূপাদি পঞ্চ স্কন্ধ, অথবা পশু, পাশ, উচ্ছেদ ও ঈশ্বর ইত্যাদি। অর্থাৎ এই সমস্ত মত এবং এইরূপ আরও অনেক মতও "সংখ্যৈকান্তবাদ"বিশেষ। মাহেশ্বর-সম্প্রদায়বিশেষের মতে যে, (১) কার্য্য, (২) কারণ, (৩) যোগ, (৪) বিধি ও (৫) দুঃখান্ত, এই পঞ্চবিধ পদার্থ পশুপতি ঈশ্বর কর্তৃক পশুসমূহ অর্থাৎ জীবাত্মসমূহের পাশ বিমোক্ষণ অর্থাৎ দুঃখান্ত বা মুক্তির জন্য উপদিষ্ট হইয়াছে, ঐ পঞ্চবিধ পদার্থবাদও এখানে বাচস্পতি মিশ্র "সংখ্যৈকান্তবাদে"র মধ্যে গ্রহণ করিতে পারেন। তিনি বেদান্তদর্শনের ২য় অঃ, ২য় পাদের ৩৭শ সূত্রের ভাষ্যভামতীতে চতুর্ব্বিধ মাহেশ্বরসম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়া, তাঁহাদের সম্মত পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিধ পদার্থের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু এখানে তিনি কোন্ মতানুসারে পশু, পাশ, উচ্ছেদ ও ঈশ্বরের উল্লেখ করিয়া, কিরূপে ঐ মতকে "সংখ্যৈকান্তবাদ" বলিয়াছেন, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না। সাংখ্যসূত্রে (১ম অঃ, ৬১ম সূত্রে) "পঞ্চবিংশতির্গণঃ" এই বাক্যের দ্বারা সাংখ্যশাস্ত্রেও পদার্থের সংখ্যার ঐকান্তিকত্বই অভিপ্রেত, ইহা বুঝিলে পদার্থ বিষয়ে সাংখ্যমতকেও "সংখ্যৈকান্তবাদে"র অন্তর্গত বলা যাইতে পারে। নব্য সাংখ্যাচার্য্য বিজ্ঞান ভিক্ষুও পূর্ব্বোক্ত সাংখ্যসূত্রের ভাষ্যে সাংখ্যসম্প্রদায় অনিয়ত পদার্থবাদী, এই প্রাচীন মতবিশেষের প্রতিবাদ করিয়া, প্রমাণসিদ্ধ সমস্ত পদার্থই সাংখ্যোক্ত পঞ্চবিংশতি তত্ত্বে অন্তর্ভূত, ঐ পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব হইতে অতিরিক্ত আর কোন পদার্থই নাই, ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন। তাৎপর্য্যটীকাকারের "প্রকৃতিপুরুষাবিতি বা" এই বাক্যের দ্বারা প্রকৃতি ও পুরুষ, এই দুই প্রকারই পদার্থ, এই মতকেই তিনি এখানে এক প্রকার "সংখ্যৈকান্তবাদ" বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন বুঝা যায়। কিন্তু প্রকৃতি ও পুরুষ, এই দুই প্রকারে সকল পদার্থের বিভাগ করিলেও আবার প্রকৃতির নানাপ্রকার ভেদও অবশ্য বক্তব্য। সুতরাং প্রকৃতি ও পুরুষ, এই দুই প্রকারই পদার্থ, ইহা বলিয়া ঐ মতকে "সংখ্যৈকান্তবাদে"র মধ্যে কিরূপে গ্রহণ করা যাইবে, তাহা চিন্তনীয়। সাংখ্যসম্প্রদায় গর্ভোপনিষদের "অষ্টৌ প্রকৃতয়ঃ", "ষোড়শ বিকারাঃ" ইত্যাদি শ্রুতি অবলম্বন করিয়া যে চতুর্ব্বিংশতি জড়তত্ত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, উহার আন্তর্গণিক নানাপ্রকার ভেদও তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইয়াছে। পরন্তু যে মতে পদার্থ অথবা পদার্থবিভাজক ধর্ম্মের সংখ্যাবিশেষ ঐকান্তিক বা নিয়ত, সেই মতকেই সংখ্যৈকান্তবাদের মধ্যে গ্রহণ করিলে আরও বহু মতই সংখ্যৈকান্তবাদের অন্তর্গত হইবে। তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে রূপাদি পঞ্চস্কন্ধবাদকেও সংখ্যৈকান্তবাদের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এখানে ভাষ্যকারের "অন্যেঽপি" এই বাক্যের দ্বারা (১) রূপ স্কন্ধ, (২) সংজ্ঞাস্কন্ধ, (৩) সংস্কার স্কন্ধ, (৪) বেদনা স্কন্ধ ও (৫) বিজ্ঞান স্কন্ধ, এই পঞ্চস্কন্ধবাদ প্রভৃতির সমুচ্চয় বলিয়াছেন এবং তিনি ঐ মতকে সৌত্রান্তিক বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মত বলিয়াও প্রকাশ করিয়াছেন। অবশ্য যদি উক্ত মতে ঐ রূপাদি পঞ্চ স্কন্ধ ভিন্ন আর কোনপ্রকার পদার্থ না থাকে, অর্থাৎ যদি উক্ত মতে পদার্থের পঞ্চত্ব সংখ্যাই ঐকান্তিক বা নিয়ত হয়, তাহা হইলে উক্ত মতকেও পূর্ব্বোক্তরূপে সংখ্যৈকান্তবাদ-

বিশেষ বলা যাইতে পারে। কিন্তু শারীরকভাষ্যে (২।২।১৮ সূত্রভাষ্যে) ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ও "মানসোল্লাস" গ্রন্থে তাঁহার শিষ্য সুরেশ্বরাচার্য্য উক্ত মতের যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন[১], তদ্দ্বারা জানা যায়, সৌত্রান্তিক ও বৈভাষিক সম্প্রদায় বাহ্য পদার্থেরও অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া পৃথিব্যাদি ভূতবর্গকে পরমাণুসমূহের সমষ্টি বলিয়া বাহ্য সংঘাত বলিয়াছেন এবং রূপাদি পঞ্চস্কন্ধ-সমুদায়কে আধ্যাত্মিক সংঘাত বলিয়া উহাকেই আত্মা বলিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে উহা হইতে অতিরিক্ত আত্মা নাই, ঈশ্বরও নাই, কিন্তু বাহ্য জগতের অস্তিত্ব আছে। ফলকথা, তাঁহারা যে, পূর্ব্বোক্ত পঞ্চস্কন্ধমাত্রকেই পদার্থ বলিয়া গ্রহণ করিয়া "সর্ব্বং পঞ্চধা" এইরূপ বাক্য বলিয়াছেন, ইহা "ভামতী" প্রভৃতি গ্রন্থে বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতিও বলেন নাই। কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র তাৎপর্য্যটীকায় এখানে পূর্ব্বোক্ত বৌদ্ধ মতকেও কিরূপে সংখ্যৈকান্তবাদের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা সুধীগণ বিচার করিবেন। পূর্ব্বোক্ত রূপাদি পঞ্চস্কন্ধের ব্যাখ্যা তৃতীয় খণ্ডের সপ্তম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ॥৪১॥

সূত্র। ন কারণাবয়বভাবাৎ ॥৪২॥৩৮৫॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) না, অর্থাৎ সংখ্যৈকান্তবাদসমূহের অসিদ্ধি হয় না, যেহেতু কারণের (সাধনের) অবয়বভাব অর্থাৎ সাধ্যের অবয়বত্ব বা অংশত্ব আছে।

ভাষ্য। ন সংখ্যৈকান্তানামসিদ্ধিঃ, কস্মাৎ ? কারণস্যাবয়বভাবাৎ। অবয়বঃ কশ্চিৎ সাধনভূত ইত্যব্যতিরেকঃ। এবং দ্বৈতাদীনামপীতি।

অনুবাদ। সংখ্যৈকান্তবাদসমূহের অসিদ্ধি হয় না, (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) যেহেতু কারণের (সাধনের) অবয়বত্ব আছে। (তাৎপর্য্য) কোন অবয়ব অর্থাৎ সাধ্য বা প্রতিজ্ঞাত পদার্থের কোন অংশই সাধনভূত, এ জন্য "অব্যতিরেক" অর্থাৎ সাধ্য ও সাধনের অভেদ আছে। এইরূপ দ্বৈত প্রভৃতির সম্বন্ধেও (বুঝিবে) [অর্থাৎ "সর্ব্বং দ্বেধা" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা সকল পদার্থের যে দ্বৈতাদির প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, তাহাতেও প্রতিজ্ঞাত পদার্থের কোন অংশই সাধন হওয়ায় সাধ্য ও সাধনের অভেদ আছে]।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ব্বসূত্রোক্ত উত্তরের খণ্ডন করিতে এই সূত্রের দ্বারা সংখ্যৈকান্তবাদীর কথা বলিয়াছেন যে, সংখ্যৈকান্তবাদের অসিদ্ধি হয় না। কারণ, সাধনের "অবয়বভাব" অর্থাৎ

১। সংঘাতঃ পরমাণূনাং মহভূম্যগ্নিসমীরণাঃ ॥
মনুষ্যাদিশরীরাণি স্কন্ধপঞ্চকসংহতিঃ।
স্কন্ধাশ্চ রূপ-বিজ্ঞান-সংজ্ঞা-সংস্কার-বেদনাঃ ॥
পঞ্চভ্য এব স্কন্ধেভ্যো নান্য আত্মাস্তি কশ্চন।
ন কশ্চিদীশ্বরঃ কর্ত্তা স্বগতাতিশয়ং জগৎ ॥
—মানসোল্লাস, ৬ষ্ঠ উল্লাস ২৩০,

সাধ্যাবয়বত্ব বা সাধ্যের একদেশত্ব আছে। সূত্রে "কারণ" শব্দের অর্থ সাধন। "অবয়বভাব" শব্দের দ্বারা সাধ্য পদার্থের অংশত্ব বা একদেশত্বই বিবক্ষিত। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সংখ্যৈকান্তবাদীর সাধ্যের যাহা "কারণ" বা সাধন, উহা ঐ সাধ্য পদার্থেরই অবয়ব অর্থাৎ অংশ, উহা ঐ সাধ্য হইতে অতিরিক্ত কোন পদার্থ নহে। সুতরাং স্বীকৃত পদার্থ হইতে কোন অতিরিক্ত পদার্থ সাধনরূপে স্বীকৃত না হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত মতের বাধ হইতে পারে না। সাধনের অভাবেও উক্ত মতের অসিদ্ধি হইতে পারে না। তাৎপর্য্য এই যে, "সর্ব্বমেকং" এই বাক্যের দ্বারা সমস্ত পদার্থই একত্বরূপে প্রতিজ্ঞাত হইলেও উহার অন্তর্গত কোন পদার্থই ঐ সাধ্যের সাধন হইবে; যাহা সাধন হইবে, তাহা ঐ সাধ্যেরই অবয়ব অর্থাৎ অংশবিশেষ। সুতরাং ঐ সাধ্য হইতে কোন অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকারের আবশ্যকতা নাই, ঐ সাধ্যের সাধনের অভাবও নাই। এইরূপ "সর্ব্বং দ্বেধা" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা সমস্ত পদার্থই দ্বিত্বাদিরূপে প্রতিজ্ঞাত হইলেও উহার অন্তর্গত কোন পদার্থই ঐ সমস্ত সাধ্যের সাধন হইবে। যাহা সাধন হইবে, তাহা ঐ সমস্ত সাধ্যেরই অবয়ব অর্থাৎ অংশবিশেষ। সুতরাং উহা হইতে অতিরিক্ত কোন পদার্থ স্বীকারের আবশ্যকতা নাই। ঐ সমস্ত সাধ্যের সাধনের অভাবও নাই। ফল কথা, পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বপ্রকার "সংখ্যৈকান্তবাদে"র সাধক হেতু আছে এবং ঐ হেতু সংখ্যৈকান্ত-বাদীর স্বীকৃত পদার্থ হইতে অতিরিক্ত পদার্থও নহে; সুতরাং পূর্ব্বসূত্রোক্ত যুক্তির দ্বারা উক্ত মতের অসিদ্ধি হইতে পারে না॥ ৪২॥

সূত্র। নিরবয়বত্বাদহেতুঃ ॥৪৩॥৩৮৬॥

অনুবাদ। (উত্তর) "নিরবয়বত্ব"প্রযুক্ত অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে সমস্ত পদার্থই পক্ষরূপে গৃহীত হওয়ায় উহা হইতে পৃথক্ কোন অবয়ব বা অংশ না থাকায় (পূর্ব্বসূত্রোক্ত হেতু) অহেতু।

ভাষ্য। কারণস্যাবয়বভাবাদিত্যয়মহেতুঃ, কস্মাৎ? সর্ব্বমেকমিত্যনপবর্গেণ প্রতিজ্ঞায় কস্যচিদেকত্বমুচ্যতে, তত্র ব্যপবৃক্তোঽবয়বঃ সাধনভূতো নোপপদ্যতে। এবং দ্বৈতাদিষ্বপীতি।

তে খল্বিমে সংখ্যৈকান্তা যদি বিশেষকারিতস্যার্থভেদবিস্তারস্য প্রত্যাখ্যানেন বর্ত্তন্তে? প্রত্যক্ষানুমানাগমবিরোধান্মিথ্যাবাদা ভবন্তি। অথাভ্যনুজ্ঞানেন বর্ত্তন্তে সমানধর্ম্মকারিতোঽর্থসংগ্রহো বিশেষকারিতশ্চার্থভেদ ইতি? এবমেকান্তত্বং জহতীতি। তে খল্বেতে তত্ত্বজ্ঞানপ্রবিবেকার্থমেকান্তাঃ পরীক্ষিতা ইতি।

অনুবাদ। "কারণে"র (সাধনের) "অবয়বভাব"প্রযুক্ত ইহা অহেতু, অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্রোক্ত ঐ হেতু অসিদ্ধ হওয়ায় উহা হেতুই হয় না। (প্রশ্ন) কেন?

(উত্তর) "সকল পদার্থ এক" এই বাক্যের দ্বারা কোন পদার্থের অপরিত্যাগপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিয়া অর্থাৎ কোন পদার্থেরই অপবর্গ বা পরিত্যাগ না করিয়া, সকল পদার্থকেই পক্ষরূপে গ্রহণপূর্ব্বক "সর্ব্বমেকং" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া (সকল পদার্থের) একত্ব উক্ত হইতেছে, তাহা হইলে "ব্যপবৃক্ত" অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত প্রতিজ্ঞা-কারীর পক্ষ হইতে বস্তুতঃ ভিন্ন সাধনভূত অবয়ব উপপন্ন হয় না। এইরূপ "দ্বৈত" প্রভৃতি মতেও (বুঝিবে) [অর্থাৎ "সর্ব্বমেকং" "সর্ব্বং দ্বেধা" ইত্যাদি প্রতিজ্ঞাবাক্যে সমস্ত পদার্থই পক্ষরূপে গৃহীত হইয়াছে, কোন পদার্থই পরিত্যক্ত হয় নাই ; সুতরাং ঐ সমস্ত প্রতিজ্ঞার্থের সাধন হইতে পারে, এমন কোন পৃথক্ অবয়ব উহার নাই। কারণ, যাহা উহার অবয়ব বলিয়া গৃহীত হইবে, তাহাও ঐ পক্ষ বা সাধ্য হইতে অভিন্ন ; সুতরাং উহা সাধন হইতে না পারায় উহার সাধন-ভূত অবয়ব নাই। সুতরাং নিরবয়বত্ব প্রযুক্ত পূর্ব্বসূত্রোক্ত হেতু অসিদ্ধ হওয়ায় উহা হেতুই হইতে পারে না]।

পরন্তু সেই অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ণিত এই সমস্ত সংখ্যৈকান্তবাদ, যদি বিশেষ ধর্ম্মপ্রযুক্ত পদার্থভেদসমূহের অর্থাৎ নানা বিশেষধর্ম্মবিশিষ্ট নানাবিধ পদার্থের প্রত্যাখ্যানের (অস্বীকারের) নিমিত্তই বর্ত্তমান হয়, তাহা হইলে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আগম-বিরোধবশতঃ মিথ্যাবাদ হয়। আর যদি (পূর্ব্বোক্ত সমস্ত সংখ্যৈকান্তবাদ) সমান ধর্ম্মপ্রযুক্ত পদার্থের সংগ্রহ অর্থাৎ সত্তা, নিত্যত্ব প্রভৃতি সামান্য ধর্ম্মপ্রযুক্ত বহু পদার্থের একত্বাদিরূপে সংগ্রহ এবং বিশেষ ধর্ম্ম (ঘটত্ব পটত্ব প্রভৃতি) প্রযুক্ত পদার্থের ভেদ, ইহা স্বীকারপূর্ব্বক বর্ত্তমান হয়, এইরূপ হইলে একান্তত্ব অর্থাৎ স্বীকৃত পদার্থের সংখ্যার ঐকান্তিকত্ব প্রযুক্ত একান্তবাদত্ব ত্যাগ করে।

সেই এই সমস্ত একান্তবাদ তত্ত্বজ্ঞানের প্রবিবেকের নিমিত্ত অর্থাৎ বিশেষরূপে তত্ত্বজ্ঞান সম্পাদনের জন্য (এখানে) পরীক্ষিত হইয়াছে।

টিপ্পনী। পূর্ব্বসূত্রোক্ত হেতু খণ্ডন করিতে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত সংখ্যৈকান্তবাদ সমর্থন করিতে পূর্ব্বসূত্রে যে, সাধনের অবয়বভাব অর্থাৎ সাধনের সাধ্যাবয়বত্বকে হেতু বলা হইয়াছে, উহা অহেতু অর্থাৎ হেতুই হয় না। কারণ, পূর্ব্বোক্ত সংখ্যৈকান্তবাদীর যাহা প্রতিজ্ঞার্থ বা সাধ্য, তাহা নিরবয়ব, অর্থাৎ ঐ প্রতিজ্ঞার্থ বা সাধ্য হইতে ভিন্ন কোন অবয়ব নাই, যাহা ঐ প্রতিজ্ঞার্থের সাধন হইতে পারে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত হেতু অসিদ্ধ হওয়ায় উহা হেতু হইতে পারে না। ভাষ্যকার মহর্ষির তাৎপর্য্য বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, "সর্ব্বমেকং" এই বাক্যের দ্বারা কোন পদার্থেরই অপবর্গ অর্থাৎ পরিত্যাগ না করিয়া অর্থাৎ সমস্ত পদার্থকেই পক্ষরূপে গ্রহণপূর্ব্বক "সর্ব্বমেকং" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া, পূর্ব্বপক্ষবাদী সকল পদার্থে একত্ব বলিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার পক্ষ হইতে ব্যপবৃক্ত অর্থাৎ ভিন্ন কোন অবয়ব বা অংশ নাই। কারণ, তিনি যে পদার্থকে

সাধন বলিবেন, সেই পদার্থও তাঁহার পক্ষ বা সাধ্যেরই অন্তর্গত, উহা ঐ সাধ্য হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে; সুতরাং তাহা সাধন হইতে পারে না। কারণ, সাধ্য হইতে ভিন্ন পদার্থই সাধন হইয়া থাকে। সাধনীয় ধর্ম্মবিশিষ্ট ধর্ম্মীই প্রতিজ্ঞাবাক্যের প্রতিপাদ্য বা প্রতিজ্ঞার্থ। ভাষ্যকার ঐ প্রতিজ্ঞার্থকেও এক প্রকার সাধ্য বলিয়াছেন। অর্থাৎ সাধ্য বলিলে ঐ প্রতিজ্ঞার্থকেও বুঝা যায় (প্রথম খণ্ড, ২৬৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং ঐ প্রতিজ্ঞার্থরূপ সাধ্যও অনুমানের পূর্ব্বে অসিদ্ধ থাকায় ঐ সাধ্যের অন্তর্গত কোন পদার্থও ঐ সাধ্য হইতে অভিন্ন বলিয়া ঐ সাধ্যের সাধন হইতে পারে না। তাই এখানে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, প্রতিজ্ঞার্থ বা সাধ্য হইতে ব্যপবৃক্ত অর্থাৎ ভিন্ন সাধনভূত কোন অবয়ব নাই অর্থাৎ যাহা ঐ সাধ্যের অবয়ব বলিয়া গৃহীত হইবে, তাহা ঐ সাধ্য হইতে ভিন্ন পদার্থ না হওয়ায় সাধন হইতে পারে, এমন অবয়ব নাই। এখানে উদ্দ্যোতকর লিখিয়াছেন, "সর্ব্বমেকমিত্যেতস্মিন্ প্রতিজ্ঞার্থে ন কিঞ্চিদপবৃজ্যতে অনপবর্গেন সর্ব্বং পক্ষীকৃতমিতি"। সুতরাং ভাষ্যেও "কস্যচিৎ অনপবর্গেণ প্রতিজ্ঞায়" এইরূপ যোজনা বুঝা যায়। বর্জ্জনার্থ "বৃজ্" ধাতুনিষ্পন্ন "অপবর্গ" শব্দের দ্বারা বর্জ্জন বা পরিত্যাগ বুঝা গেলে "অনপবর্গ" শব্দের দ্বারা অপরিত্যাগ বুঝা যাইতে পারে। যে ধর্ম্মীতে কোন ধর্ম্মের অনুমান করা হয়, তাহাকে অনুমানের "পক্ষ" বলে। এখানে "সর্ব্বমেকং," "সর্ব্বং দ্বেধা" ও "সর্ব্বং ত্রেধা" ইত্যাদি প্রকার অনুমানে বাদী কোন পদার্থকেই পরিত্যাগ না করিয়া সর্ব্ব পদার্থকেই পক্ষ করিয়াছেন। তাই উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন,—"অনপবর্গেণ সর্ব্বং পক্ষীকৃতং"। ভাষ্যে বি ও অপপূর্ব্বক "বৃজ্" ধাতুনিষ্পন্ন "ব্যপবৃক্ত" শব্দের দ্বারা পরিত্যক্ত অর্থ বুঝিলে বাদীর পরিত্যক্ত অর্থাৎ বাদী যাহাকে পক্ষ বা সাধ্যমধ্যে গ্রহণ করেন নাই, এইরূপ অর্থ উহার দ্বারা বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু বৃজ্ ধাতুর ভেদ অর্থ গ্রহণ করিলে "ব্যপবৃক্ত" শব্দের দ্বারা সহজেই ভিন্ন অর্থ বুঝা যায়। বৃজ্ ধাতুর ভেদ অর্থেও প্রাচীন প্রয়োগ আছে[১]। তাহা হইলে বাদীর সাধ্য বা প্রতিজ্ঞার্থ হইতে "ব্যপবৃক্ত" অর্থাৎ ভিন্ন সাধনভূত অবয়ব নাই, ইহা ভাষ্যার্থ বুঝা যাইতে পারে। যাহা সাধ্য, তাহা সাধন হইবে না কেন? এতদুত্তরে উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, কোন পদার্থেরই নিজের স্বরূপে নিজের ক্রিয়া হয় না, সুতরাং যাহা প্রতিপাদ্য বা বোধনীয়, তাহাই প্রতিপাদক অর্থাৎ বোধক হইতে পারে না, [illegible] কর্ম্ম, তাহা করণ হইতে পারে না।

ভাষ্যকার মহর্ষিসূত্রের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া, শেষে পূর্ব্বোক্ত সংখ্যৈকান্তবাদসমূহের সর্ব্বথা অনুপপত্তি প্রদর্শন করিতে নিজে বলিয়াছেন যে, যদি পূর্ব্বোক্ত সংখ্যৈকান্তবাদসমূহ বিশেষ ধর্ম্ম-প্রযুক্ত নানা পদার্থভেদের প্রত্যাখ্যান অর্থাৎ অস্বীকারের নিমিত্ত বর্ত্তমান থাকে, তাহা হইলে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-বিরুদ্ধ হওয়ায় মিথ্যাবাদ হয়। তাৎপর্য্য এই যে, ঘটত্ব পটত্বাদি নানা বিশেষধর্ম্মপ্রযুক্ত ঘটপটাদি নানা পদার্থভেদ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-সিদ্ধ, সুতরাং উহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত "সর্ব্বমেকং", "সর্ব্বং দ্বেধা", "সর্ব্বং ত্রেধা" ও "সর্ব্বং চতুর্দ্ধা" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন বাদী, যদি ঐ ঘটত্ব পটত্বাদি বিশেষ ধর্ম্মপ্রযুক্ত ঘটপটাদি নানা পদার্থ-ভেদ প্রত্যাখ্যান করেন অর্থাৎ পদার্থের প্রমাণ-সিদ্ধ ব্যক্তিভেদ ও নানাপ্রকারভেদ একেবারে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে

১। যথা "রেফবর্জ্জযপে পরে রেফবর্জ্জযম্ বা স্যাৎ"। মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ, হসন্ধিপ্রকরণ।

ঐ সমস্ত বাদই প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ-বিরুদ্ধ হওয়ায় অসত্যবাদ হয়। সুতরাং ঐ সমস্ত বাদ একেবারেই অগ্রাহ্য। এখানে লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, ভাষ্যকারের এই কথার দ্বারা তাঁহার পূর্ব্ববর্ণিত সংখ্যৈকান্তবাদসমূহের স্বরূপ বুঝা যায় যে, সংখ্যৈকান্তবাদীরা পদার্থের সমস্ত বিশেষ ধর্ম্মপ্রযুক্ত ভেদ স্বীকার করেন না। তন্মধ্যে "সর্ব্বং দ্বেধা" ইত্যাদি মতবাদীরা তাঁহাদিগের কথিত প্রকার-ভেদ ভিন্ন পদার্থের আর কোন প্রকারভেদও মানেন না। কারণ, তাহা স্বীকার করিলে তাঁহাদিগের ঐ সমস্ত মত একান্তবাদ হয় না। তাঁহাদিগের কথিত প্রকারভেদও অন্য সম্প্রদায়ের অসম্মত না হওয়ায় উহা সাধন করাও ব্যর্থ হয়। সত্তারূপ সামান্য ধর্ম্মরূপে সকল পদার্থের একত্ব এবং নিত্যত্ব ও অনিত্যত্বাদিরূপে সকল পদার্থের দ্বিত্বাদি অন্য সম্প্রদায়েরও সম্মত; উহা স্বীকারে কোন সম্প্রদায়েরই কিছু হানি নাই। বহু পদার্থের কোন সামান্য ধর্ম্মপ্রযুক্ত একরূপে যে সেই পদার্থের সংগ্রহ, (যেমন প্রমেয়ত্বরূপে সকল পদার্থই এক এবং দ্রব্যত্বরূপে সকল দ্রব্য এক ইত্যাদি), ইহা নৈয়ায়িকগণও স্বীকার করেন। কিন্তু ঘটত্ব পটত্বাদি বিশেষ ধর্ম্মপ্রযুক্ত যে পদার্থভেদ, তাহাও প্রমাণ-সিদ্ধ বলিয়া অবশ্য স্বীকার্য্য। এইরূপ স্থাণুর বক্র কোটরাদি বিশেষ ধর্ম্মপ্রযুক্ত পুরুষ হইতে ভেদ এবং পুরুষের হস্তাদি বিশেষ ধর্ম্মপ্রযুক্ত স্থাণু হইতে ভেদও অবশ্য স্বীকার্য্য। স্থাণু ও পুরুষের এবং ঐরূপ অসংখ্য পদার্থের প্রত্যক্ষসিদ্ধ ভেদের অপলাপ করা যায় না। সুতরাং স্থাণু ও পুরুষ প্রভৃতি পদার্থভেদ অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন সমস্ত পদার্থেরও অপলাপ করা যায় না। তাই ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, সমান ধর্ম্মপ্রযুক্ত নানা পদার্থের সংগ্রহ এবং বিশেষ ধর্ম্মপ্রযুক্ত নানা পদার্থভেদ, যাহা আমরাও স্বীকার করি, তাহা স্বীকার করিয়াই যদি পূর্ব্বোক্ত সংখ্যৈকান্তবাদসমূহ কথিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ সমস্ত বাদে পদার্থের সংখ্যার ঐকান্তিকত্ব বা নিয়তত্ব না থাকায় উহার "সংখ্যৈকান্তবাদ"ত্ব থাকে না। অর্থাৎ তাহা হইলে পূর্ব্বপক্ষবাদীদিগের অভিমত সংখ্যৈকান্তবাদ সিদ্ধ হয় না। যাহা সিদ্ধ হয়, তাহা সিদ্ধই আছে; কারণ, আমরাও তাহা স্বীকার করি; কিন্তু আমরা পদার্থের সংখ্যামাত্র স্বীকার করিলেও ঐ সংখ্যার ঐকান্তিকত্ব বা নিয়তত্ব স্বীকার করি না। মহর্ষি গোতমের সর্ব্বপ্রথম সূত্রে প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থের উল্লেখ থাকিলেও সংখ্যা নির্দ্দেশপূর্ব্বক উল্লেখ নাই। সুতরাং মহর্ষি গোতমের নিজের সিদ্ধান্তেও পদার্থের সংখ্যার ঐকান্তিকত্ব বুঝা যাইতে পারে না। মহর্ষি গোতম মোক্ষোপযোগী পদার্থকেই সংক্ষেপে ষোড়শ প্রকারে বিভাগ করিয়া বলিয়াছেন। তাঁহার মতে ঐ সমস্ত পদার্থ হইতে ভিন্ন আর যে, কোন পদার্থই নাই, ইহা নহে। তাঁহার কথিত দ্বাদশ প্রকার প্রমেয় ভিন্ন আরও যে অসংখ্য সামান্য প্রমেয় আছে, ইহা ভাষ্যকারও স্পষ্ট বলিয়াছেন। (প্রথম খণ্ড, ১৬১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। যাঁহারা "সর্ব্বমেকং সদবিশেষাৎ" এই বাক্যের দ্বারা মত প্রকাশ করিয়াছেন যে, সত্তাসামান্যই পদার্থের তত্ত্ব, পদার্থের ভেদসমূহ কাল্পনিক, তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া উদ্দ্যোতকর বলিয়াছেন যে, ভেদ ব্যতীত সামান্য থাকিতেই পারে না। অর্থাৎ সামান্য স্বীকার করিলে বিশেষ স্বীকার করিতেই হইবে। নির্ব্বিশেষ সামান্য শশশৃঙ্গাদির ন্যায় থাকিতেই পারে না। পদার্থের বাস্তব ভেদই বিশেষ। উহা স্বীকার না করিলে সত্তাসামান্যই তত্ত্ব, ইহা বলা যায় না। মূলকথা, পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বপ্রকার সংখ্যৈকান্তবাদই সর্ব্বথা অসিদ্ধ।

অবশ্যই প্রশ্ন হইবে যে, মহর্ষি "প্রেত্যভাবে"র পরীক্ষা-প্রসঙ্গে এখানে পূর্ব্বোক্তরূপ সংখ্যৈকান্ত-বাদসমূহের পরীক্ষা কেন করিয়াছেন ? তাই ভাষ্যকার সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন যে, তত্ত্বজ্ঞানের প্রবিবেকের নিমিত্ত এখানে এই সমস্ত সংখ্যৈকান্তবাদ পরীক্ষিত হইয়াছে। বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকরও ইহাই বলিয়াছেন। তাৎপর্য্যটীকাকার ইহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, অদ্বৈত প্রভৃতি একান্তবাদে প্রেত্যভাব বাস্তব পদার্থ হয় না ; কেবল প্রেত্যভাব নহে, গোতমোক্ত প্রমাণাদি ষোড়শ পদার্থই বাস্তব তত্ত্ব হয় না, ঐ সমস্ত পদার্থ ই কাল্পনিক হয়। সুতরাং ঐ সমস্ত পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানের প্রবিবেকের জন্য এখানে পূর্ব্বোক্ত সমস্ত সংখ্যৈকান্তবাদ পরীক্ষিত হইয়াছে। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বপ্রকার "সংখ্যৈকান্তবাদ" খণ্ডনের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় সমস্ত পদার্থের তাত্ত্বিকত্ব বা বাস্তবত্ব সমর্থন করিয়া, ষোড়শ পদার্থ-তত্ত্বজ্ঞানের বাস্তব-বিষয়কত্ব সিদ্ধ করা হইয়াছে। কিন্তু এখানে প্রণিধান করা আবশ্যক যে, ভাষ্যকারের প্রথমোক্ত ("সর্ব্বমেকং") সংখ্যৈকান্তবাদকে তাৎপর্য্য-টীকাকারের ব্যাখ্যানুসারে অদ্বৈতবাদ অর্থাৎ বিবর্ত্তবাদ বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেও শেষোক্ত ("সর্ব্বং দ্বেধা" ইত্যাদি) সংখ্যৈকান্তবাদসমূহ যে, অদ্বৈতবাদ নহে, ইহা তাৎপর্য্যটীকাকারের ব্যাখ্যার দ্বারাও বুঝা যায়। সুতরাং ঐ সমস্ত মতে যে, "প্রেত্যভাব" কাল্পনিক পদার্থ নহে, ইহা স্বীকার্য্য। পরন্তু ভাষ্যকারের "সর্ব্বমেকং" এই বাক্যের দ্বারা ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের সমর্থিত অদ্বৈতবাদ না বুঝিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ তাৎপর্য্য বুঝিলে ঐ প্রথমোক্ত মতেও "প্রেত্যভাব" কাল্পনিক পদার্থ না হওয়ায় এখানে ঐ মতের খণ্ডনের দ্বারাও প্রেত্যভাবের বাস্তবত্ব সমর্থিত হইয়াছে, ইহা বলা যায় না। কিন্তু ইহা বলা যায় যে, পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বপ্রকার সংখ্যৈকান্তবাদেই পদার্থের অতিরিক্ত কোন প্রকার-ভেদ না থাকায় প্রেত্যভাবত্বরূপে প্রেত্যভাব পদার্থের পৃথক্ অস্তিত্বই নাই। (১) সত্তা, (২) অনিত্যত্ব, (৩) জ্ঞেয়ত্ব ও (৪) প্রমেয়ত্বরূপে প্রেত্যভাব পদার্থ স্বীকার করিলেও ঐ সত্তাদিরূপে প্রেত্যভাবের জ্ঞান মোক্ষের অনুকূল তত্ত্বজ্ঞান নহে। মহর্ষি গোতম সম্মত দ্বাদশবিধ প্রমেয় পদার্থের তত্ত্বজ্ঞান, যাহা মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহা বিশেষ-ধর্ম্মপ্রকারেই হওয়া আবশ্যক। ঐ প্রমেয় পদার্থের অন্তর্গত প্রেত্যভাবের বিশেষধর্ম্ম যে প্রেত্যভাবত্ব, তদ্রূপে উহার জ্ঞানই প্রেত্যভাবের প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান। সুতরাং মহর্ষি এখানে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত প্রেত্যভাবের প্রেত্যভাবত্বরূপে যে তত্ত্বজ্ঞান, তাহার উপপাদনের জন্য প্রেত্যভাবের পরীক্ষা-প্রসঙ্গে শেষে পূর্ব্বোক্ত সর্ব্বপ্রকার সংখ্যৈকান্তবাদের খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন। ঐ সমস্ত বাদের খণ্ডনের দ্বারা প্রেত্যভাবত্ব-রূপ বিশেষ ধর্ম্মপ্রযুক্ত ঐ বিশেষ ধর্ম্মরূপেও "প্রেত্যভাব" নামক প্রমেয় পদার্থের সিদ্ধি হওয়ায়, ঐ বিশেষ ধর্ম্মরূপেও প্রেত্যভাবের তত্ত্বজ্ঞান উপপন্ন হইয়াছে। সামান্য ধর্ম্মরূপে তত্ত্বজ্ঞানের পরে বিশেষ ধর্ম্মরূপে যে পৃথক্ তত্ত্বজ্ঞান, যাহা মোক্ষের অনুকূল প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান, তাহাই এখানে "তত্ত্বজ্ঞান-প্রবিবেক" বলিয়া বুঝা যাইতে পারে। সুধীগণ তাৎপর্য্যটীকাকারের পূর্ব্বাপর ব্যাখ্যার সমালোচনা করিয়া এখানে ভাষ্যকারের প্রকৃত তাৎপর্য্য নির্ণয় করিবেন ॥ ৪৩ ॥

সংখ্যৈকান্তবাদ-নিরাকরণ-প্রকরণ সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

—০—

ভাষ্য। প্রেত্যভাবানন্তরং ফলং, তস্মিন্—

সূত্র। সদ্যঃ কালান্তরে চ ফলনিষ্পত্তেঃ সংশয়ঃ ॥ ॥৪৪॥৩৮৭॥

অনুবাদ। প্রেত্যভাবের অনন্তর "ফল" (পরীক্ষণীয়)। সেই "ফল"-বিষয়ে সংশয় জন্মে, অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞের ফল কি সদ্যঃই হয় ? অথবা কালান্তরে হয় ? এইরূপ সংশয় জন্মে ; কারণ, সদ্যঃ এবং কালান্তরে ফলের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

ভাষ্য। পচতি দোগ্ধীতি সদ্যঃ ফলমোদনপয়সী, কর্ষতি বপতীতি কালান্তরে ফলং শস্যাধিগম ইতি। অস্তি চেয়ং ক্রিয়া, "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকাম" ইতি, এতস্যাঃ ফলে সংশয়ঃ।

ন সদ্যঃ কালান্তরোপভোগ্যত্বাৎ, * স্বর্গঃ ফলং শ্রূয়তে, তচ্চ ভিন্নেঽস্মিন্ দেহভেদাদুৎপদ্যত ইতি ন সদ্যঃ, গ্রামাদিকামানামারম্ভ-ফলমপীতি।

অনুবাদ। "পাক করিতেছে", "দোহন করিতেছে", এই স্থলে অন্ন ও দুগ্ধরূপ ফল সদ্যঃই হয় অর্থাৎ পাকক্রিয়া ও দোহনক্রিয়ার অনন্তরই উহার ফল অন্ন ও দুগ্ধের লাভ হয়। "কর্ষণ করিতেছে," "বপন করিতেছে", এই স্থলে শস্যপ্রাপ্তি-রূপ ফল কালান্তরে হয়। "স্বর্গকাম ব্যক্তি অগ্নিহোত্র হোম করিবে" এই ক্রিয়াও অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বেদবিধি-বোধিত অগ্নিহোত্র নামক ক্রিয়াও আছে। এই ক্রিয়ার ফল বিষয়ে সংশয় হয় অর্থাৎ অগ্নিহোত্র নামক বৈদিক ক্রিয়ার ফল কি সদ্যঃই হয়, অথবা কালান্তরে হয় ? এইরূপ সংশয় জন্মে।

(উত্তর) কালান্তরে উপভোগ্যত্ববশতঃ (অগ্নিহোত্রের ফল) সদ্যঃ হয় না। বিশদার্থ এই যে, (অগ্নিহোত্রের) স্বর্গ ফল শ্রুত হয়। সেই ফল কিন্তু এই দেহ ভিন্ন (বিনষ্ট) হইলে দেহভেদের অনন্তর উৎপন্ন হয় অর্থাৎ স্বর্গলোকে তৈজস দেবদেহ উৎপন্ন হইলেই তখন স্বর্গফল জন্মে, এ জন্য সদ্যঃ হয় না। গ্রামাদিকামী ব্যক্তিদিগের আরম্ভের অর্থাৎ "সাংগ্রহণী" প্রভৃতি ইষ্টিকর্ম্মের ফলও সদ্যঃ হয় না।

---

* "ন সদ্যঃ" ইত্যাদি বাক্য মহর্ষি গোতমের সূত্র বলিয়াই বুঝা যায়। উদ্দ্যোতকর ও বিশ্বনাথ প্রভৃতিও উহা সূত্ররূপেই গ্রহণ করিয়াছেন। "তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি" গ্রন্থে উদয়নাচার্য্যও উহার সূত্রত্ব সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু "ন্যায়সূচীনিবন্ধে" শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র ঐ বাক্যকে সূত্ররূপে গ্রহণ না করায় তদনুসারে উহা ভাষ্য বলিয়াই গৃহীত হইল। এই মতে ভাষ্যকার নিজেই এখানে ঐ বাক্যের দ্বারা মহর্ষির পূর্ব্বসূত্রোক্ত সংশয় নিরাস করিয়াছেন।

টিপ্পনী। মহর্ষি নানা বিচারের দ্বারা তাঁহার উদ্দিষ্ট ও লক্ষিত নবম প্রমেয় "প্রেত্যভাবে"র পরীক্ষা সমাপ্ত করিয়া, এখন অবসরসংগতিবশতঃ তাঁহার উদ্দিষ্ট ও লক্ষিত দশম প্রমেয় "ফলে"র পরীক্ষা করিতে এই সূত্রের দ্বারা "ফল" বিষয়ে পরীক্ষাঙ্গ সংশয় প্রদর্শন করিয়াছেন যে, ফল কি সদ্যঃই হয়, অথবা কালান্তরে হয় ? কারণ, সদ্যঃ এবং কালান্তরেও ফলের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ভাষ্যকার মহর্ষির তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, পাকক্রিয়ার ফল অন্ন এবং দোহনক্রিয়ার ফল দুগ্ধ সদ্যঃই হইয়া থাকে এবং কৃষি ও বীজবপনক্রিয়ার ফল শস্য-প্রাপ্তি কালান্তরেই হয়। অর্থাৎ অনেক ক্রিয়ার ফল যে সদ্যঃ এবং অনেক ক্রিয়ার ফল যে কালান্তরে হয়, ইহা পরিদৃষ্ট সত্য। সুতরাং "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ" এই বেদবিধি-বোধিত অগ্নিহোত্র-ক্রিয়ার ফল বিষয়ে সংশয় হয় যে, উহা কি সদ্যঃই হয়, অথবা কালান্তরে হয় ? উক্ত সংশয়ের সমর্থন পক্ষে ভাষ্যকারের গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, যদি ইহকালে লোকসমাজে প্রশংসাদি লাভই অগ্নিহোত্র ক্রিয়ার ফল হয়, তাহা হইলে ঐ ফল সদ্যঃই হয়, ইহা বলা যায়। কারণ, ঐ ফল অগ্নিহোত্র-ক্রিয়ার অনন্তরই হইয়া থাকে। অবশ্য অগ্নিহোত্র ক্রিয়ার ফল স্বর্গ, ইহা উক্ত বেদবিধিবাক্যে কথিত হইয়াছে। কিন্তু সুখজনক পদার্থেও "স্বর্গ" শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। সুতরাং ঐ স্বর্গ" শব্দের দ্বারা অগ্নিহোত্রীর ঐহিক সুখজনক প্রশংসাদি লাভও বুঝা যাইতে পারে। পরন্তু পারলৌকিক কোন সুখবিশেষকে স্বর্গ বলিয়া গ্রহণ করিলে অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়াজন্য নানা অদৃষ্টবিশেষের কল্পনা করিতে হয়। উক্ত বেদবিধিবাক্যে "স্বর্গ" শব্দের দ্বারা ঐহিক সুখজনক প্রশংসাদি লাভই বুঝিলে অদৃষ্ট কল্পনা-গৌরব হয় না। কিন্তু অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়ার ফল পরলোকে হইয়া থাকে, ইহাই আস্তিকসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত আছে। সুতরাং পূর্ব্বোক্তরূপ বিচারের ফলে মধ্যস্থগণের সংশয় হইতে পারে যে, অগ্নিহোত্র ক্রিয়ার ফল কি সদ্যঃই হয়, অথবা কালান্তরে হয় ? ভাষ্যকার এখানে উক্ত সংশয় খণ্ডন করিতে শেষে বলিয়াছেন যে, অগ্নিহোত্র ক্রিয়ার ফল সদ্যঃ হইতে পারে না। কারণ, উহা কালান্তরে উপভোগ্য। উক্ত বেদবিধিবাক্যে স্বর্গই অগ্নিহোত্র ক্রিয়ার ফল বলিয়া কথিত হইয়াছে। ঐ স্বর্গ-ফল অগ্নিহোত্রকারীর বর্ত্তমান দেহ বিনষ্ট হইলে দেহ-ভেদের অনন্তর অর্থাৎ স্বর্গলোকে তৈজস দেবদেহ লাভ হইলে সেই দেহেই উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং উহা কালান্তরীণ ফল হওয়ায় সদ্যঃ হইতে পারে না। ভাষ্যকারের গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, অগ্নিহোত্র ক্রিয়ার ফল-বিষয়ে পূর্ব্বোক্তরূপ সংশয় করিতে হইলে অগ্নিহোত্র ক্রিয়ার কর্ত্তব্যতা ও তাহার কোন ফল আছে, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু উক্ত "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ" এই বেদবিধি ভিন্ন তদ্‌বিষয়ে আর কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং উক্ত বিধিবাক্যানুসারে স্বর্গই যে, অগ্নিহোত্র ক্রিয়ার ফল, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে অগ্নিহোত্রক্রিয়ার ফল সদ্যঃই হয়, ইহা বলা যায় না। কারণ, নিরবচ্ছিন্ন সুখবিশেষই "স্বর্গ" শব্দের মুখ্য অর্থ[১]। উহা ইহলোকে হইতেই পারে না। উক্ত

১। "যন্ন দুঃখেন সম্ভিন্নং নচ গ্রস্তমনন্তরং।
অভিলাষোপনীতঞ্চ তৎ সুখং স্বঃপদাস্পদং"॥
বিজ্ঞান ভিক্ষু প্রভৃতি কোন কোন গ্রন্থকার উদ্ধৃত বচনকে স্মৃতি বলিয়াছেন। কিন্তু "পরিমল" প্রভৃতি অনেক

বিধিবাক্যে "স্বর্গ" শব্দের মুখ্য অর্থ ত্যাগ করিয়া কোন গৌণ অর্থ (সুখজনক প্রশংসাদি) গ্রহণ করিবার পক্ষে কোন প্রমাণ নাই। উক্ত বিধিবাক্যে "স্বর্গ" শব্দের মুখ্য অর্থই গ্রাহ্য হইলে প্রমাণ-সিদ্ধ অদৃষ্ট কল্পনাও করিতে হইবে। প্রামাণিক গৌরব দোষ নহে। যে সুখ ইহকালে ইহলোকে সম্ভবই হয় না, এমন নিরবচ্ছিন্ন সুখবিশেষই স্বর্গ শব্দের মুখ্য অর্থ, স্বর্গ শব্দ নানার্থ নহে, ইহা এখানে তাৎপর্য্যটীকাকার জৈমিনিসূত্রাদির দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন। ফল কথা, অগ্নিহোত্র ক্রিয়ার ফল যখন পূর্ব্বোক্তরূপ স্বর্গ, তখন তাহা সদ্যঃ হইতে পারে না, তাহা কালান্তরীণ, এইরূপ নিশ্চয় হওয়ায় উক্ত ফল বিষয়ে পূর্ব্বোক্তরূপ সংশয় হইতে পারে না, ইহাই এখানে ভাষ্যকারের মূল তাৎপর্য্য। ভাষ্যকার এখানে শেষে "গ্রামাদি-কামানামারম্ভ-ফলমিতি" এই বাক্য কেন বলিয়াছেন, উহার তাৎপর্য্য কি? এ বিষয়ে বার্ত্তিকাদি গ্রন্থে কোন কথাই পাওয়া যায় না। গ্রামাদি দৃষ্ট ফল লাভে ইচ্ছুক ব্যক্তিদিগের রাজসেবাদি কর্ম্মের ফল (গ্রামাদি লাভ) যেমন সদ্যঃ হয় না, উহা বিলম্বে কালান্তরেই হয়, তদ্রূপ অগ্নিহোত্রক্রিয়ার অদৃষ্ট ফল স্বর্গ কালান্তরেই হয়, ইহা এখানে ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য বুঝা যাইতে পারে। অথবা বেদে যে, গ্রামকাম ব্যক্তি "সাংগ্রহণী" নামক যাগ করিবে, পশুকাম ব্যক্তি "চিত্রা" নামক যাগ করিবে, বৃষ্টিকাম ব্যক্তি "কারীরী" নামক যাগ করিবে, পুত্রকাম ব্যক্তি "পুত্রেষ্টি" নামক যাগ করিবে, ইত্যাদি বিধি আছে, তদনুসারে ভাষ্যকার এখানে পরে বলিয়াছেন যে, গ্রামাদিকামী ব্যক্তিদিগের কর্ম্মের ফলও সদ্যঃ হয় না। অর্থাৎ ভাষ্যকারের বক্তব্য এই যে, যেমন অগ্নিহোত্র ক্রিয়াজন্য পারলৌকিক স্বর্গফল সদ্যঃ হয় না, তদ্রূপ গ্রাম, পশু ও পুত্র প্রভৃতি ঐহিক ফলকামী ব্যক্তিদিগের অনুষ্ঠিত "সাংগ্রহণী" প্রভৃতি ইষ্টির ফল ঐ গ্রামাদি লাভও সদ্যঃ হয় না, সুতরাং উহাও সদ্যঃফল নহে। এই মতে কর্ম্ম সমাপ্তির পরেই যে ফল আর কোন দৃষ্ট কারণকে অপেক্ষা না করিয়াই উৎপন্ন হয়, তাহাই সদ্যঃফল বলিয়া বুঝিতে হইবে। যেমন পাকক্রিয়ার ফল অন্ন এবং দোহনক্রিয়ার ফল দুগ্ধ। ভাষ্যকার নিজেও প্রথমে সদ্যঃফলের উহাই উদাহরণ বলিয়াছেন। এইরূপ লোকসমাজে প্রশংসাদি লাভই অগ্নিহোত্র ক্রিয়ার ফল হইলে উহাও সদ্যঃফল হইতে পারে। কারণ, অগ্নিহোত্র ক্রিয়ার পরে ঐ ফল আর কোন দৃষ্ট কারণকে অপেক্ষা করে না। ঐ ক্রিয়া করিলেই তজ্জন্য লোকসমাজে প্রশংসাদি লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু অগ্নিহোত্র ক্রিয়ার স্বর্গ-ফল কালান্তরে উপভোগ্য, সুতরাং উহা সদ্যঃ হইতে পারে না, ইহা পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। এইরূপ গ্রাম, পশু, বৃষ্টি ও পুত্র প্রভৃতি দৃষ্ট ফল ইহকালে সেই শরীরে উপভোগ্য হইলেও ভাষ্যকারের মতে উহাও কারণান্তরসাপেক্ষ বলিয়া সদ্যঃফল নহে। ভাষ্যে "গ্রামাদিকামানামারম্ভফলমপীতি" এইরূপ পাঠই প্রকৃত বলিয়া বুঝা যায়।

অবশ্য "ন্যায়মঞ্জরী"কার জয়ন্ত ভট্ট বলিয়াছেন যে, বৈদিক যাগজন্য পশু প্রভৃতি ফল কাহারও সদ্যঃও হইয়া থাকে। তিনি ইহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, আমার পিতামহই (কল্যাণ স্বামী) গ্রাম কামনায় "সাংগ্রহণী" নামক ইষ্টি করিয়া উহার অনন্তরই "গৌরমূলক" নামক গ্রাম লাভ

প্রামাণিক গ্রন্থ উদ্ধৃত বচন শ্রুতি বলিয়াই কথিত হইয়াছে। "স্বর্গকামো যজেত" এই বিধিবাক্যের শেষ অর্থবাদরূপ শ্রুতি বলিয়াই উহা কথিত হইয়া থাকে।

করিয়াছিলেন (ন্যায়মঞ্জরী, ২০৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু ইহা প্রণিধান করা আবশ্যক যে. উক্ত গ্রাম লাভে "সাংগ্রহণী" যাগ কারণ হইলেও উহার পরে ব্যক্তিবিশেষের নিকট ঐ গ্রামের প্রতিগ্রহও উহার দৃষ্ট কারণ। কারণ, সেখানে কোন ব্যক্তি তাঁহাকে ঐ গ্রাম দান না করিলে ঐ যাগের অব্যবহিত পরেই তাঁহার ঐ গ্রাম লাভ হইতে পারে না। ঐ যাগের অব্যবহিত পরেই তাঁহার নিকটে গৌরমূলক নামক গ্রাম উৎপন্ন হইয়াছিল, ইহা জয়ন্তভট্টও দেখেন নাই ও তাহা বলেন নাই। সুতরাং উক্ত গ্রামলাভও যে সদ্যঃফল নহে, ইহা বলা যাইতে পারে। এইরূপ "কারীরী" যাগের অনন্তরই যেখানে বৃষ্টি হইয়াছে, সেখানেও উহা সদ্যঃফল নহে, ইহা বলা যায়। কারণ, "কারীরী" যাগের দ্বারা বৃষ্টির প্রতিবন্ধক নিবৃত্তিই হইয়া থাকে। তাহার পরে বৃষ্টির যাহা দৃষ্ট কারণ, তাহা হইতেই বৃষ্টি হইয়া থাকে। সুতরাং উহাও দৃষ্ট কারণান্তরসাপেক্ষ বলিয়া সদ্যঃফল নহে। "সিদ্ধান্তমুক্তাবলী"র টীকার প্রথমে মঙ্গলের কারণত্ব বিচার-প্রসঙ্গে মহাদেব ভট্টও বৃষ্টির প্রতিবন্ধক নিবৃত্তিই "কারীরী" যাগের ফল বলিয়াছেন। এইরূপ পুত্রেষ্টি যাগের ফল পুত্রও ঐ যাগ-সমাপ্তির অব্যবহিত পরেই জন্মে না। উহাও পুত্রোৎপত্তির কারণান্তরসাপেক্ষ বলিয়া সদ্যঃফল নহে। উহা ইহকালে উপভোগ্য ফল হইলেও সদ্যঃফল হইতে পারে না। কর্ষণ ও বপনক্রিয়ার ফল শস্যপ্রাপ্তি ঐহিক ফল হইলেও ভাষ্যকার উহাকে সদ্যঃফল বলেন নাই। কারণ, উহাও কাল-বিশেষরূপ কারণান্তরসাপেক্ষ। এইভাবে ভাষ্যকারের মতে বেদোক্ত গ্রামাদি ফলও সদ্যঃফল নহে॥৪৪॥

সূত্র। কালান্তরেণানিষ্পত্তির্হেতুবিনাশাৎ ॥৪৫॥৩৮৮॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) হেতুর অর্থাৎ যাগাদি কারণের বিনাশ হওয়ায় কালান্তরে (স্বর্গাদি ফলের) উৎপত্তি হইতে পারে না।

ভাষ্য। ধ্বস্তায়াং প্রবৃত্তৌ প্রবৃত্তেঃ ফলং ন কারণমন্তরেণোৎপত্তু-মর্হতি। ন খলু বৈ বিনষ্টাৎ কারণাৎ কিঞ্চিদুৎপদ্যত ইতি।

অনুবাদ। "প্রবৃত্তি" অর্থাৎ শুভাশুভ কর্ম্ম (যাগাদি) বিনষ্ট হইলে কারণ ব্যতীত ঐ কর্ম্মের ফল উৎপন্ন হইতে পারে না। যেহেতু বিনষ্ট কারণ হইতে কিছু উৎপন্ন হয় না।

টিপ্পনী। যাগাদি শুভ কর্ম্মের ফল স্বর্গ এবং ব্রহ্মহত্যাদি অশুভ কর্ম্মের ফল নরক, কাহারও সদ্যঃ হইতে পারে না। কারণ, ঐ ফল কালান্তরে ভিন্ন দেহে উপভোগ্য, ইহা শাস্ত্রসিদ্ধই আছে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত ফল যে, কালান্তরেই হয়, এই পক্ষই গ্রহণ করিতে হইবে। তাই মহর্ষি ঐ পক্ষই গ্রহণ করিয়া, উহাতে এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন যে, কালান্তরেও স্বর্গ নরকাদি ফলের উৎপত্তি হইতে পারে না। কারণ, উহার কারণ বলিয়া যে যাগাদি কর্ম্ম কথিত হইয়াছে, তাহা ঐ স্বর্গ নরকাদি ফলের উৎপত্তির বহু পূর্ব্বেই বিনষ্ট হইয়া যায়। বিনষ্ট কারণ হইতে কোন কার্য্যেরই উৎপত্তি হইতে পারে না। যাহা কারণ, তাহা কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে

থাকা আবশ্যক। কিন্তু যাগাদি কর্ম্ম যখন স্বর্গাদি ফলের বহু পূর্ব্বেই বিনষ্ট হয়, তখন তাহা হইতে স্বর্গাদি ফলের উৎপত্তি কোনরূপেই হইতে পারে না। সুতরাং প্রতিপন্ন হয় যে, যাগাদি ক্রিয়ার স্বর্গাদি ফল নাই, উহা অলীক। কারণ, যাহা সদ্যঃও হইতে পারে না, কালান্তরেও হইতে পারে না, তাহার অস্তিত্বই নাই, তাহা অলীক বলিয়াই বুঝা যায়। পূর্ব্বপক্ষবাদী মহর্ষির ইহাই এখানে চরম তাৎপর্য্য ॥৪৫॥

সূত্র। প্রাঙ্ নিষ্পত্তের্ব্বৃক্ষফলবৎ তৎ স্যাৎ ॥৪৬॥৩৮৭॥

অনুবাদ। (উত্তর) নিষ্পত্তির পূর্ব্বে অর্থাৎ স্বর্গাদি ফলোৎপত্তির পূর্ব্বে বৃক্ষের ফলে যেমন, তদ্রূপ সেই কর্ম্ম থাকে।

ভাষ্য। যথা ফলার্থিনা বৃক্ষমূলে সেকাদিপরিকর্ম্ম ক্রিয়তে, তস্মিংশ্চ প্রধ্বস্তে পৃথিবীধাতু[১]রব্ধাতুনা সংগৃহীত আন্তরেণ তেজসা পচ্যমানো রসদ্রব্যং নির্ব্বর্ত্তয়তি,—স দ্রব্যভূতো রসো বৃক্ষানুগতঃ পাকবিশিষ্টো ব্যূহবিশেষেণ সন্নিবিশমানঃ পর্ণাদিফলং নির্ব্বর্ত্তয়তি, এবং পরিষেকাদি কর্ম্ম চার্থবৎ। নচ বিনষ্টাৎ ফলনিষ্পত্তিঃ। তথা প্রবৃত্ত্যা সংস্কারো ধর্ম্মাধর্ম্মলক্ষণো জন্যতে, স জাতো নিমিত্তান্তরানুগৃহীতঃ কালান্তরে ফলং নিষ্পাদয়তীতি। উক্তঞ্চৈতৎ "পূর্ব্বকৃতফলানুবন্ধাত্তদুৎপত্তি"রিতি।

অনুবাদ। যেমন ফলার্থী ব্যক্তি বৃক্ষের মূলে সেকাদি পরিকর্ম্ম করে, সেই সেকাদি পরিকর্ম্ম বিনষ্ট হইলে জলধাতু কর্ত্তৃক সংগৃহীত পৃথিবী ধাতু আভ্যন্তরীণ তেজঃকর্ত্তৃক পচ্যমান হইয়া রসরূপ দ্রব্য উৎপন্ন করে। বৃক্ষানুগত পাকবিশিষ্ট সেই দ্রব্যভূত রস, আকৃতিবিশেষরূপে সন্নিবিষ্ট হইয়া (বৃক্ষে) পত্রাদি ফল উৎপন্ন করে, এইরূপ হইলে পরিষেকাদি অর্থাৎ বৃক্ষমূলে জলসেকাদি কর্ম্মও সার্থক হয়; কিন্তু বিনষ্ট পদার্থ হইতে অর্থাৎ বিনষ্ট জলসেকাদি কর্ম্ম হইতেই ফলের (বৃক্ষের পত্রাদির) উৎপত্তি হয় না, সেইরূপ "প্রবৃত্তি" অর্থাৎ শুভাশুভ কর্ম্ম-কর্ত্তৃক ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ সংস্কার উৎপাদিত হয়,—উৎপন্ন সেই সংস্কার নিমিত্তান্তর

১। পৃথিব্যাদি পঞ্চভূত ভৌতিক দ্রব্যের ধারক, এজন্য উহা প্রাচীন কালে "ধাতু" বলিয়া কথিত হইত। "চরক-সংহিতা"র শারীরস্থানের পঞ্চম অধ্যায়ে "ষড়্ ধাতবঃ সমুদিতাঃ" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা পৃথিবী প্রভৃতি ষট্ পদার্থ ধাতু বলিয়া কথিত হইয়াছে। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে ঐ "ধাতু" শব্দটি পারিভাষিক, ইহা কথিত হইয়া থাকে। কিন্তু বৌদ্ধ সম্প্রদায়ও পৃথিব্যাদি পঞ্চ ভূত এবং বিজ্ঞান, এই ষট্ পদার্থকে ধাতু বলিয়াছেন। বেদান্তদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের ১৯শ সূত্রের ভাষ্যভামতীতে "যথা ষণ্ণাং ধাতূনাং সমবায়াদ্বীজহেতুরঙ্কুরো জায়তে। তত্র পৃথিবীধাতুর্বীজস্য সংগ্রহকৃত্যং করোতি" ইত্যাদি সন্দর্ভ দ্রষ্টব্য।

কর্ত্তৃক অনুগৃহীত হইয়া অর্থাৎ দেশবিশেষ, কালবিশেষ ও অভিনব দেহবিশেষাদি নিমিত্ত-কারণান্তরসহকৃত হইয়া কালান্তরে ফল (স্বর্গাদি) উৎপন্ন করে। ইহা (মহর্ষি গোতম কর্ত্তৃক) উক্তও হইয়াছে—(যথা) "পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফলের সম্বন্ধ-প্রযুক্ত শরীরের উৎপত্তি হয়"।

টিপ্পনী। পূর্ব্বসূত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন করিতে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম বিনষ্ট হইলেও স্বর্গাদিফলোৎপত্তির অব্যবহিত পূর্ব্বে পূর্ব্বকৃত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মজন্য ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ ব্যাপার থাকায় ঐ ব্যাপারবত্তা সম্বন্ধে সেই কর্ম্মও থাকে। অর্থাৎ বিনষ্ট অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম সাক্ষাৎসম্বন্ধে স্বর্গাদি ফলের কারণ নহে। কিন্তু অগ্নিহোত্রাদি শুভ কর্ম্মজন্য আত্মাতে ধর্ম্ম নামে যে সংস্কার জন্মে এবং হিংসাদি অশুভ কর্ম্মজন্য আত্মাতে যে অধর্ম্ম নামে সংস্কার জন্মে, তাহাই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে স্বর্গ ও নরকের কারণ হয়। শাস্ত্রে এই তাৎপর্য্যেই অগ্নিহোত্রাদি শুভ কর্ম্ম এবং হিংসাদি অশুভ কর্ম্ম যথাক্রমে স্বর্গ ও নরকরূপ কালান্তরীণ ফলের জনক বলিয়া কথিত হইয়াছে। বিনষ্ট কর্ম্মই যে, ঐ স্বর্গাদিফলের সাক্ষাৎ কারণ, ইহা শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নহে। কারণ, যাহা ফলোৎপত্তির বহু পূর্ব্বে বিনষ্ট, তাহা উহার সাক্ষাৎ কারণ হইতেই পারে না। কর্ম্মজন্য ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম উৎপন্ন হইলেও উহাও অন্যান্য নিমিত্ত-কারণ-সহকৃত হইয়াই স্বর্গাদি ফল উৎপন্ন করে। সুতরাং কর্ম্মের অব্যবহিত পরেই কাহারও স্বর্গাদি জন্মে না। তাই ভাষ্যকার বলিয়াছেন, "**নিমিত্তান্তরানুগৃহীতঃ** কালান্তরে ফলং নিষ্পাদয়তি"। অর্থাৎ স্বর্গাদি ফলভোগের অনুকূল দেশবিশেষ, কালবিশেষ এবং অভিনব শরীরবিশেষও উহার নিমিত্তান্তর। সুতরাং ঐ সমস্ত নিমিত্ত-কারণান্তর উপস্থিত হইলেই ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ পূর্ব্বোক্ত নিমিত্তকারণ আত্মাতে স্বর্গ ও নরকরূপ ফল উৎপন্ন করে। পূর্ব্বোক্ত নিমিত্তান্তরগুলি কালান্তরেই উপস্থিত হয়, সুতরাং কালান্তরেই স্বর্গাদি ফল জন্মে, উহা সদ্যঃ হইতে পারে না। স্বর্গ ও নরকরূপ ফল যে, পূর্ব্বকৃত-কর্ম্মফল ধর্ম্ম ও অধর্ম্মজন্য, ইহা মহর্ষি গোতমের সিদ্ধান্তরূপে সমর্থন করিবার জন্য ভাষ্যকার সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন যে, মহর্ষি গোতম, তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকের "পূর্ব্বকৃতফলানুবন্ধাত্তদুৎপত্তিঃ" (৬০ম) এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বেও ইহা বলিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে, মহর্ষি ঐ সূত্রের দ্বারা শরীরের উৎপত্তি পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল ধর্ম্ম ও অধর্ম্মজন্য, এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করায় স্বর্গ ও নরকভোগের অনুকূল শরীরবিশেষও ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম-জন্য, ইহাও কথিত হইয়াছে। তাহা হইলে স্বর্গ ও নরকরূপ ফলও যে, পূর্ব্বকৃত কর্ম্মফল ধর্ম্ম ও অধর্ম্মজন্য, ইহাও উহার দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে মহর্ষি এই সূত্রে দৃষ্টান্ত বলিয়াছেন, "বৃক্ষফলবৎ"। অর্থাৎ বৃক্ষের ফল যেমন জলসেকাদি কর্ম্ম বিনষ্ট হইলেও উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম বিনষ্ট হইলেও কর্ম্মকারী আত্মার স্বর্গাদি ফল উৎপন্ন হইতে পারে। ভাষ্যকার মহর্ষির দৃষ্টান্ত ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে, কোন ব্যক্তি বৃক্ষের পত্রাদি ফলোৎপত্তির জন্য বৃক্ষের মূলে জলসেকাদি পরিকর্ম্ম করে। সংশোধক কর্ম্মবিশেষকেই "পরিকর্ম্ম" বলে। কিন্তু জলসেকাদি পরিকর্ম্ম বৃক্ষের পত্রাদি ফলোৎপত্তি-কাল পর্য্যন্ত থাকে না, উহা বহু পূর্ব্বেই বিনষ্ট হইয়া যায়। উহা বিনষ্ট হইলেও

উহারই ফলে সেই অঙ্কুরিত বৃক্ষের আধার পৃথিবী পূর্ব্বসিক্ত জলকর্তৃক সংগৃহীত অর্থাৎ "সংগ্রহ" নামক বিলক্ষণ-সংযোগ-বিশিষ্ট হইলে তখন উহার আভ্যন্তরীণ তেজঃকর্তৃক ঐ পৃথিবীতে পাক জন্মে। জল ও তেজের সংযোগে পার্থিব দ্রব্যের পাক হইয়া থাকে। তখন পচ্যমান সেই পৃথিবীধাতু অর্থাৎ সেই অঙ্কুরিত বৃক্ষের ধারক বা আধার পার্থিব দ্রব্য, রসরূপ দ্রব্য উৎপন্ন করে। সেই রসরূপ দ্রব্যও পার্থিব, সুতরাং উহাও ক্রমশঃ পাকবিশিষ্ট হইয়া, বিশেষ বিশেষ ব্যূহ বা আকৃতি লাভ করিয়া ঐ বৃক্ষের পত্র-পুষ্পাদি ফল উৎপন্ন করে। বৃক্ষমূলে জলসেকাদি পরিকর্ম্ম করিলে পূর্ব্বোক্ত-ক্রমে কালান্তরে ঐ বৃক্ষে যে সমস্ত পত্রপুষ্পাদি জন্মে, ঐ সমস্তই এখানে বৃক্ষের ফল বলিয়া কথিত হইয়াছে। সূত্রে "ফল"শব্দের অর্থ এখানে জলসেকাদি কার্য্যের উদ্দেশ্য পুত্রপুষ্পাদি ফল। পূর্ব্বোক্তরূপে বৃক্ষমূলে জলসেকাদি কর্ম্মদ্বারা বৃক্ষের যে পত্রপুষ্পাদি ফলের উৎপত্তি হয়, তাহাতে পূর্ব্ববিনষ্ট জলসেকাদি কর্ম্ম সাক্ষাৎ কারণ নহে—পূর্ব্বোক্ত রসদ্রব্যই উহাতে সাক্ষাৎ কারণ। কিন্তু তাহা হইলেও পূর্ব্বকৃত জলসেকাদি কর্ম্ম আবশ্যক, উহা ব্যর্থ নহে। কারণ, ঐ জলসেকাদি কর্ম্ম না করিলে পূর্ব্বোক্তক্রমে পূর্ব্বোক্ত রসদ্রব্য জন্মিতেই পারে না। সুতরাং সেই বৃক্ষের পত্রাদি ফলও জন্মিতেই পারে না। এইরূপ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মও যদিও পূর্ব্বে বিনষ্ট হওয়ায় স্বর্গাদি ফলের সাক্ষাৎ কারণ নহে, তথাপি উহা না করিলে যখন স্বর্গাদিফলের সাক্ষাৎকারণ ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম জন্মে না, তখন স্বর্গাদিফলভোগে ঐ কর্ম্মও আবশ্যক। ঐ কর্ম্ম, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ ব্যাপারের সাক্ষাৎ কারণ হওয়ায় ঐ ব্যাপার দ্বারা ঐ কর্ম্মও স্বর্গাদির কারণ হইতে পারে। শাস্ত্রেরও ইহাই সিদ্ধান্ত। বিনষ্ট অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মই স্বর্গাদিফলের সাক্ষাৎ কারণ, ইহা শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত নহে ॥৪৬॥

ভাষ্য। তদিদং প্রাঙ্‌নিষ্পত্তের্নিষ্পদ্যমানং—

সূত্র। নাসন্ন সন্ন সদসৎ, সদসতোর্বৈধর্ম্ম্যাৎ ॥ ॥৪৭॥৩৯০॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) নিষ্পদ্যমান অর্থাৎ জায়মান সেই এই ফল উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ নহে, সৎ নহে, সৎ ও অসৎ অর্থাৎ উক্ত উভয়রূপও নহে; কারণ, সৎ ও অসতের বৈধর্ম্ম্য (বিরুদ্ধ ধর্ম্মবত্তা) আছে, অর্থাৎ যাহা সৎ, তাহা অসৎ হইতে পারে না, যাহা অসৎ, তাহা সৎ হইতে পারে না, সত্ত্ব ও অসত্ত্ব পরস্পর বিরুদ্ধ।

ভাষ্য। প্রাঙ্‌নিষ্পত্তের্নিষ্পত্তিধর্ম্মকং নাসৎ, উপাদাননিয়মাৎ, কস্যচিদুৎপত্তয়ে কিঞ্চিদুপাদেয়ং, ন সর্ব্বং সর্ব্বস্যেতি, অসদ্ভাবে নিয়মো নোপপদ্যত ইতি। ন সৎ, প্রাগুৎপত্তের্বিদ্যমানস্যোৎপত্তিরনুপ-পন্নেতি। ন সদসৎ, সদসতোর্বৈধর্ম্ম্যাৎ, সদিত্যর্থাভ্যনুজ্ঞা, অসদিত্যর্থ-

প্রতিষেধঃ, এতয়োর্ব্যাঘাতো বৈধর্ম্ম্যং, ব্যাঘাতাদব্যতিরেকানুপপত্তিরিতি।

অনুবাদ। উৎপত্তিধর্ম্মক বস্তু উৎপত্তির পূর্ব্বে (১) "অসৎ" নহে; কারণ, উপাদান-কারণের নিয়ম আছে (অর্থাৎ) কোন বস্তুর উৎপত্তির নিমিত্ত কোন বস্তুবিশেষই উপাদেয় (গ্রাহ্য), সকল বস্তুর উৎপত্তির নিমিত্ত সকল বস্তু উপাদেয় নহে। "অসদ্‌ভাব" অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের অসত্ত্ব হইলে (পূর্ব্বোক্তরূপ) নিয়ম উপপন্ন হয় না। (২) "সৎ" নহে, অর্থাৎ উৎপত্তি-ধর্ম্মক বস্তু উৎপত্তির পূর্ব্বে বিদ্যমান নহে; কারণ, উৎপত্তির পূর্ব্বে বিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তি উপপন্ন হয় না। (৩) "সদসৎ"ও নহে, অর্থাৎ উৎপত্তিধর্ম্মক বস্তু উৎপত্তির পূর্ব্বে সৎ ও অসৎ, এই উভয়াত্মকও নহে। কারণ, সৎ ও অসতের বৈধর্ম্ম্য আছে। বিশদার্থ এই যে, "সৎ" ইহা পদার্থের স্বীকার, "অসৎ" ইহা পদার্থের নিষেধ, এই উভয়ের অর্থাৎ "সৎ" ও "অসতে"র ব্যাঘাতরূপ বৈধর্ম্ম্য আছে, ব্যাঘাতবশতঃ "অব্যতিরেকে"র অর্থাৎ "সৎ" ও "অসতে"র অভেদের উপপত্তি হয় না।

টিপ্পনী। মহর্ষি তাঁহার পূর্ব্বোক্ত দশম প্রমেয় "ফলে"র পরীক্ষা করিতে প্রথমে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের ফল যে, কালান্তরীণ এবং অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম পূর্ব্বে বিনষ্ট হইলেও (তজ্জন্য ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ ব্যাপারের দ্বারা) উহার ফল স্বর্গাদি যে কালান্তরেও হইতে পারে, ইহা সমর্থন করিয়াছেন। সুখ ও দুঃখের উপভোগ মুখ্য ফল হইলেও সুখ ও দুঃখ এবং উহার উপভোগের সাধন দেহাদিও ফল, ইহা প্রথম অধ্যায়ে "প্রবৃত্তিদোষজনিতোঽর্থঃ ফলং" (১।২০) এই সূত্রের দ্বারা কথিত হইয়াছে। সুতরাং অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের ফলের পরীক্ষাও এখানে মহর্ষির পূর্ব্বকথিত ফল-পরীক্ষা। বস্তুতঃ জন্য পদার্থমাত্রই "ফল"। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও মহর্ষিকথিত ফলের লক্ষণ-ব্যাখ্যায় উপসংহারে উহাই বলিয়াছেন। এখন প্রশ্ন এই যে, ঐ ফল বা জন্যপদার্থমাত্র কি উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ, অথবা সৎ, অথবা সদসৎ? যদি উহার কোন পক্ষই সম্ভব না হয়, তাহা হইলে ফলের অস্তিত্বই থাকে না, সুতরাং কার্য্যকারণভাবই অলীক হয়। তাহা হইলে মহর্ষির পূর্ব্বোক্তরূপ বিচার ও সিদ্ধান্তও অসম্ভব। কারণ, যদি "ফলে"র অস্তিত্বই না থাকে, তবে আর তাহার কারণের অস্তিত্ব কিরূপে থাকিবে? তাহার উৎপত্তির কাল ও কারণ বিষয়ে বিচারই বা কিরূপে হইবে? মহর্ষি এই জন্যই এখানে তাঁহার মতানুসারে ফল বা জন্য পদার্থমাত্রই যে, উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ, এই পক্ষই সমর্থন করিতে প্রথমে এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, জায়মান যে ফল অর্থাৎ জন্য পদার্থ, তাহা উৎপত্তির পূর্ব্বে "অসৎ", ইহা বলা যায় না এবং "সৎ", ইহাও বলা যায় না এবং "সদসৎ" অর্থাৎ "সৎ"ও বটে এবং "অসৎ"ও বটে, ইহাও বলা যায় না। তৃতীয় পক্ষ কেন বলা যায় না? তাই মহর্ষি সূত্রশেষে বলিয়াছেন,—"সদসতোর্ব্বৈধর্ম্ম্যাৎ" অর্থাৎ সৎ ও অসতের বিরুদ্ধধর্ম্মবত্তা আছে। সতের ধর্ম্ম সত্ত্ব, অসতের ধর্ম্ম অসত্ত্ব—এই উভয়

পরস্পর বিরুদ্ধ, উহা একাধারে থাকে না। সুতরাং জন্যপদার্থ সৎও বটে এবং অসৎও বটে, অর্থাৎ উহাতে সত্ত্ব ও অসত্ত্ব, এই উভয় ধর্ম্মই আছে, ইহা কোনরূপেই হইতে পারে না। ভাষ্যকার ইহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, "সৎ" ইহা পদার্থের স্বীকার এবং "অসৎ" ইহা পদার্থের প্রতিষেধ, অর্থাৎ সৎ বলিলে পদার্থ আছে, ইহাই বলা হয় এবং অসৎ বলিলে পদার্থ নাই, ইহাই বলা হয়। সুতরাং একই পদার্থকে সৎ ও অসৎ উভয় বলা যায় না। যে পদার্থ সৎ, তাহাই আবার অসৎ হইতে পারে না। একই পদার্থে সত্ত্ব ও অসত্ত্ব ব্যাহত বা বিরুদ্ধ। সুতরাং ঐ ব্যাঘাতরূপ বৈধর্ম্ম্যবশতঃ সৎ ও অসতের যে "অব্যতিরেক" অর্থাৎ অভেদ, তাহা উপপন্ন হয় না। অর্থাৎ যাহা সৎ, তাহাই অসৎ, ঐ উভয় অভিন্ন, ইহা কোনরূপে সম্ভব নহে। পূর্ব্বোক্ত ফল বা জন্যপদার্থ উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ, এই প্রথম পক্ষ কেন বলা যায় না? ইহা বুঝাইতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন—"উপাদাননিয়মাৎ"। অর্থাৎ ভাবকার্য্যমাত্রেরই উপাদান-কারণের নিয়ম আছে। সকল পদার্থই সকল কার্য্যের উপাদান-কারণরূপে গৃহীত হয় না। পার্থিব ঘটের উৎপত্তির জন্য উপাদানরূপে মৃত্তিকাবিশেষই গৃহীত হয়। বস্ত্রের উৎপত্তির জন্য সূত্রই গৃহীত হয়। এইরূপ সমস্ত ভাবকার্য্যেই ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যবিশেষই যে, উপাদান-কারণ, ইহা সর্ব্বসম্মত। কিন্তু ঐ ভাবকার্য্য যদি উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ বা সর্ব্বথা অবিদ্যমানই হয়, তাহা হইলে উহার পূর্ব্বোক্তরূপ উপাদান-কারণনিয়মের উপপত্তি হয় না। অর্থাৎ সকল পদার্থই সকল কার্য্যের উপাদান-কারণ হইতে পারে। কারণ, এই মতে ঘটের উৎপত্তির পূর্ব্বে ঘট যেমন অসৎ, বস্ত্রাদি অন্যান্য কার্য্যের উৎপত্তির পূর্ব্বেও বস্ত্রাদিও ঐরূপ অসৎ। উৎপত্তির পূর্ব্বে সকল কার্য্যেরই অসত্ত্ব সমান। তাহা হইলে মৃত্তিকাও বস্ত্রের উপাদান-কারণ হইতে পারে। সূত্রও ঘটের উপাদান-কারণ হইতে পারে। যদি মৃত্তিকা হইতে সর্ব্বথা অবিদ্যমান ঘটের উৎপত্তি হইতে পারে, তাহা হইলে উহা হইতে সর্ব্বথা অবিদ্যমান বস্ত্রেরও উৎপত্তি হইতে পারিবে না কেন? উৎপত্তির পূর্ব্বে যখন ঘটপটাদি সকল কার্য্যই অসৎ বা সর্ব্বথা অবিদ্যমান, তখন সকল পদার্থ হইতেই সকল কার্য্যের উৎপত্তি হউক? সৎকার্য্যবাদী সাংখ্যসম্প্রদায় উৎপত্তির পূর্ব্বে ভাবকার্য্যকে সৎই বলিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে উৎপত্তি বলিতে বিদ্যমান কার্য্যেরই অভিব্যক্তি বা আবির্ভাব। ঐ উৎপত্তির পূর্ব্বে ভাবকার্য্য তাহার উপাদান-কারণে সূক্ষ্মরূপে বিদ্যমানই থাকে। যে পদার্থে যে কার্য্য বিদ্যমান থাকে, সেই পদার্থই সেই কার্য্যের উপাদান-কারণ। বস্ত্রের উপাদান-কারণ সূত্রসমূহে পূর্ব্ব হইতেই সেই বস্ত্র সূক্ষ্মরূপে বিদ্যমান থাকে বলিয়াই এই সূত্রসমূহ হইতেই সেই বস্ত্রের উৎপত্তি হয়—মৃত্তিকা হইতে উহার উৎপত্তি হয় না। ফলকথা, উক্ত মতে ভাবকার্য্যের উপাদান-কারণের নিয়মের উপপত্তি হইতে পারে। পূর্ব্বপক্ষবাদী মহর্ষি গোতম এই সূত্রে "ন সৎ" এই বাক্যের দ্বারা বলিয়াছেন যে, জন্য পদার্থ যে উৎপত্তির পূর্ব্বে সৎ, ইহাও বলা যায় না। ভাষ্যকার এই দ্বিতীয় পক্ষের অনুপপত্তি বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, উৎপত্তির পূর্ব্বে যাহা বিদ্যমান, তাহার উৎপত্তি উপপন্ন হয় না। অর্থাৎ যাহা পূর্ব্ব হইতে বিদ্যমানই আছে, তাহার আবার উৎপত্তি হইবে কিরূপে? যাহা পূর্ব্বেই বিদ্যমান আছে, তাহা পূর্ব্বেই উৎপন্ন হইয়াছে, ইহা বলিতেই হইবে। সুতরাং তাহার আবার

উৎপত্তি হয় বলিলে উৎপন্নের পুনরুৎপত্তিই বলা হয়। কিন্তু তাহা কোনরূপেই সম্ভব হয় না। মূল কথা, জন্য পদার্থ বা কার্য্যমাত্রই উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ নহে, সৎ নহে, সদসৎও নহে, উহার কোন পক্ষই বলা যায় না। জন্য পদার্থ উৎপত্তির পূর্ব্বে সৎও নহে, অসৎও নহে, ঐ উভয় হইতে বিপরীত চতুর্থ প্রকার, ইহাও একটি পক্ষ হইতে পারে। মহর্ষি ও ভাষ্যকার এখানে ঐ পক্ষের কোন উল্লেখ না করিলেও বার্ত্তিককার ঐ পক্ষেরও উল্লেখপূর্ব্বক উহার প্রতিষেধ করিতে বলিয়াছেন যে, সৎও নহে, অসৎও নহে, এমন কোন কার্য্য হইতেই পারে না। ঐরূপ কোন কার্য্যের স্বরূপ নির্দ্দেশ করা যায় না। সুতরাং তাদৃশ কার্য্য অলীক। যাহার স্বরূপ নির্দ্দেশই করা যায় না, তাহা কোন পদার্থই হইতে পারে না ॥৪৭॥

ভাষ্য। প্রাগুৎপত্তেরুৎপত্তিধর্ম্মকমসদিত্যদ্ধা, কস্মাৎ ?

অনুবাদ। (উত্তর) উৎপত্তিধর্ম্মক বস্তু উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ, ইহা তত্ত্ব, অর্থাৎ পূর্ব্বসূত্রোক্ত প্রথম পক্ষই সত্য বা প্রকৃত সিদ্ধান্ত। (প্রশ্ন) কেন ?

সূত্র। উৎপাদ-ব্যয়দর্শনাৎ ॥৪৮॥৩৯১॥

অনুবাদ। (উত্তর) যেহেতু উৎপত্তি ও বিনাশের দর্শন হয়।

টিপ্পনী। উৎপত্তিধর্ম্মক অর্থাৎ জন্য পদার্থমাত্রই উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ অর্থাৎ উৎপত্তি না হওয়া পর্য্যন্ত উহা সর্ব্বথা অবিদ্যমান, ইহাই আরম্ভবাদী মহর্ষি গোতমের সিদ্ধান্ত। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা তাঁহার উক্ত সিদ্ধান্তের প্রমাণ সূচনা করিয়াছেন। মহর্ষির কথা এই যে, যখন ঘটাদি কার্য্যের উৎপত্তি ও বিনাশ প্রত্যক্ষসিদ্ধ, তখন ঐ ঘটাদি কার্য্য যে, উৎপত্তির পূর্ব্বে বিদ্যমান থাকে না, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতেই হইবে। কারণ, ঘটাদি কার্য্য যদি পূর্ব্ব হইতে বিদ্যমানই থাকে, তাহা হইলে তাহার উৎপত্তি হইতে পারে না। যাহা বিদ্যমানই আছে, তাহার আবার উৎপত্তি বলা যায় কিরূপে ? আত্মা পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান আছে এবং আত্মার কখনও বিনাশ হয় না, ইহা সিদ্ধ হওয়ায় যেমন আত্মার উৎপত্তি বলা যায় না, তদ্রূপ সমস্ত ভাবকার্য্যই যদি উৎপত্তির পূর্ব্বেও অর্থাৎ অনাদি কাল হইতেই বিদ্যমানই থাকে, এবং উহার বিনাশ না হয়, তাহা হইলে সমস্ত কার্য্য বা সকল পদার্থেরই নিত্যত্ব সিদ্ধ হওয়ায় আত্মার ন্যায় কোন পদার্থেরই উৎপত্তি বলা যায় না। কিন্তু ঘটাদি কার্য্যের উৎপত্তি প্রত্যক্ষসিদ্ধ, ঘটাদিকার্য্যের নিয়ত কারণগুলি উপস্থিত হইলে উহার উৎপত্তি হয়, ইহা সকলেরই পরিদৃষ্ট সত্য। সুতরাং উহার দ্বারা ঘটাদিকার্য্য যে, উৎপত্তির পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল না, এই সিদ্ধান্ত অবশ্যই সিদ্ধ হইবে। কারণ, বিদ্যমান পদার্থের উৎপত্তি হইতে পারে না। অনেক জন্য পদার্থের উৎপত্তি প্রত্যক্ষসিদ্ধ না হইলেও অনুমান-প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ হয়। মহর্ষি এই জন্যই সূত্রে বিনাশার্থক "ব্যয়" শব্দের প্রয়োগ করিয়া সূচনা করিয়াছেন যে, জন্য ভাবপদার্থ-মাত্রেরই যখন কোন সময়ে বিনাশ হয়, অন্ততঃ প্রলয়কালেও উহাদিগের বিনাশ স্বীকার করিতেই হইবে, তখন ঐ সমস্ত পদার্থের উৎপত্তিও স্বীকার করিতেই হইবে। কারণ, অনুৎপন্ন ভাব পদা-র্থের কখনই বিনাশ হইতে পারে না। অর্থাৎ যাহা বিনাশী ভাব পদার্থ, তাহা উৎপত্তিমান, এইরূপ

ব্যাপ্তিজ্ঞানবশতঃ বিনাশিভাবত্ব হেতুর দ্বারা সমস্ত জন্য ভাবপদার্থের উৎপত্তিমত্ত্ব অনুমান-প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হওয়ায় সেই উৎপত্তিমত্ত্ব হেতুর দ্বারা ঐ সকল পদার্থেরই উৎপত্তির পূর্ব্বে অসত্ত্ব সিদ্ধ হয়। কারণ, উৎপত্তির পূর্ব্বে সত্ত্ব বা বিদ্যমানতা থাকিলে উৎপত্তি হইতে পারে না। বিদ্যমান পদার্থের উৎপত্তি বলা যায় না।

ভাষ্যকার এখানে পূর্ব্বেই "প্রাগুৎপত্তেরুৎপত্তিধর্ম্মকমসদিত্যদ্ধা",—এই বাক্যের দ্বারা মহর্ষির সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া, পরে উহার সাধকরূপে মহর্ষির এই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু "তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি" গ্রন্থে উদয়নাচার্য্যের কথার দ্বারা এবং বৃত্তিকার বিশ্বনাথ পঞ্চানন এবং "ন্যায়-সূত্রবিবরণ"কার রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য্যের ব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহাদিগের মতে এখানে "প্রাগুৎ-পত্তেঃ" ইত্যাদি বাক্য সূত্রেরই প্রথম অংশ, উহা ভাষ্য নহে, ইহাই বুঝা যায়। কিন্তু তাহা হইলে ভাষ্যকার এই সূত্রের ভাষ্য করেন নাই, ইহা বলিতে হয়। কারণ, এই সূত্রের অবতারণা করিয়া ভাষ্যকার ইহার কোন ব্যাখ্যা করেন নাই। আমাদিগের মনে হয়, ভাষ্যকার "প্রাগুৎপত্তেঃ" ইত্যাদি "কস্মাৎ ?" ইত্যন্ত সন্দর্ভের দ্বারা পূর্ব্বেই এই সূত্রের ভাষ্য প্রকাশ করিয়া, পরে এই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। ভাষ্যকার প্রথম অধ্যায়েও কোন স্থলে পূর্ব্বেই ভাষ্য প্রকাশ করিয়া, পরে সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। সেখানে তাৎপর্য্যটীকাকারও উহাই লিখিয়াছেন। (১ম খণ্ড, ২২২—২৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এখানে ভাষ্যকারের "কস্মাৎ" এই প্রশ্নবাক্যের দ্বারাও পূর্ব্বোক্ত "প্রাগুৎ-পত্তেঃ" ইত্যাদি বাক্য যে, তাঁহার নিজেরই বাক্য, ইহাও বুঝা যায়। ন্যায়বার্ত্তিকে উদ্দ্যোতকরের ব্যাখ্যার দ্বারাও উহাই বুঝা যায়। "ন্যায়সূচীনিবন্ধ" এবং "ন্যায়সূত্রোদ্ধার" গ্রন্থেও "উৎপাদব্যয়-দর্শনাৎ" এইরূপ সূত্রপাঠই গৃহীত হইয়াছে। তদনুসারে এখানে ঐরূপ সূত্রপাঠই গৃহীত হইল। ভাষ্যে "অদ্ধা" এই অব্যয় শব্দের অর্থ সত্য বা তত্ত্ব[1] ॥৪৮॥

ভাষ্য। যৎ পুনরুক্তং প্রাগুৎপত্তেঃ কার্য্যং নাসদুপাদাননিয়মাদিতি—

অনুবাদ। উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য অসৎ নহে, যেহেতু উপাদান-কারণের নিয়ম আছে, এই যাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, (তদুত্তরে মহর্ষি এই সূত্র বলিয়াছেন)—

সূত্র। বুদ্ধিসিদ্ধন্তু তদসৎ ॥৪৯॥৩৯২॥

অনুবাদ। (উত্তর) সেই "অসৎ" অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে অবিদ্যমান ভবিষ্যৎ কার্য্য (এই কারণের দ্বারাই জন্মে, অন্য কারণের দ্বারা জন্মে না, ইহা অনুমান-প্রমাণ-জন্য) বুদ্ধি-সিদ্ধই।

ভাষ্য। ইদমস্যোৎপত্তয়ে সমর্থং, ন সর্ব্বমিতি প্রাগুৎপত্তের্নিয়ত-কারণং কার্য্যং বুদ্ধ্যা সিদ্ধমুৎপত্তি-নিয়মদর্শনাৎ। তস্মাদুপাদাননিয়ম-স্যোপপত্তিঃ। সতি তু কার্য্যে প্রাগুৎপত্তেরুৎপত্তিরেব নাস্তীতি।

১। তত্ত্বে ত্বদ্ধাঞ্জসা দ্বয়ং।—অমরকোষ, অব্যয়বর্গ।

অনুবাদ। এই কার্য্যের উৎপত্তির নিমিত্ত এই পদার্থ সমর্থ, সকল পদার্থই সমর্থ নহে, এইরূপে উৎপত্তির পূর্ব্বে নিয়ত কারণবিশিষ্ট কার্য্য বুদ্ধির দ্বারা অর্থাৎ অনুমান-রূপ বুদ্ধির দ্বারা সিদ্ধ, যেহেতু উৎপত্তির নিয়ম দেখা যায়। অতএব উপাদান-কারণের নিয়মের উপপত্তি হয়। কিন্তু উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য "সৎ" অর্থাৎ বিদ্যমান থাকিলে উৎপত্তিই থাকে না, অর্থাৎ তাহা হইলে উৎপত্তি পদার্থই অলীক বলিতে হয়।

টিপ্পনী। এই সূত্রের দ্বারা সরলভাবে মহর্ষির বক্তব্য বুঝা যায় যে, সেই ফল বা কার্য্যমাত্র উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ, ইহা বুদ্ধিসিদ্ধ অর্থাৎ অনুভব-সিদ্ধ। কারণ, ঘটাদি কার্য্যের উৎপত্তির পূর্ব্বে ঐ ঘটাদি কার্য্য আছে, ইহা কেহই বুঝে না ; পরন্তু উহা নাই, ইহাই সকলে বুঝিয়া থাকে। সার্ব্বলৌকিক ঐ অনুভবের অপলাপ করিয়া কোনরূপেই ঘটাদি কার্য্যকে উৎপত্তির পূর্ব্বেও সৎ বলা যায় না। কিন্তু কার্য্য উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ হইলে উপাদানের নিয়ম থাকে না, অর্থাৎ সকল পদার্থই সকল কার্য্যের উপাদানকারণ হইতে পারে এবং লোকে সকল কার্য্যের উৎপত্তির নিমিত্ত সকল পদার্থকেই উপাদান (গ্রহণ) করিতে পারে। অতএব কার্য্য উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ নহে, এই যে পূর্ব্বপক্ষ সর্ব্বপ্রথমে উক্ত হইয়াছে, তাহার উত্তর দেওয়া আবশ্যক। উক্ত পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন ব্যতীত মহর্ষির নিজ সিদ্ধান্ত সিদ্ধ হইতে পারে না। তাই ভাষ্যকার এখানে প্রথমে তাঁহার পূর্ব্বব্যাখ্যাত ঐ পূর্ব্বপক্ষের উল্লেখ করিয়া, তাহার উত্তরসূত্ররূপেই এই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। বার্ত্তিককার প্রভৃতিও এখানে ঐ ভাবেই সূত্রতাৎপর্য্য গ্রহণ করিয়াছেন। ভাষ্যকার সূত্রতাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, এই কার্য্যের উৎপত্তির নিমিত্ত এই পদার্থই সমর্থ, সকল পদার্থ সমর্থ নহে, এইরূপে উৎপত্তির পূর্ব্বেই কার্য্য যে নিয়তকারণবিশিষ্ট, ইহা বুদ্ধিসিদ্ধ। তাৎপর্য্য-টীকাকার ইহা পরিস্ফুট করিয়া বলিয়াছেন যে,[1] সেই অসৎ অর্থাৎ ভাবি কার্য্য এই কারণের দ্বারাই জন্মে, অন্যের দ্বারা জন্মে না, ইহা অনুমান-প্রমাণ-জন্য বুদ্ধিসিদ্ধই। তাৎপর্য্য এই যে, প্রথমে কোন দ্রব্য হইতে কোন কার্য্যের উৎপত্তি দেখিলে অথবা কোন প্রমাণের দ্বারা নিশ্চয় করিলে তখন এই জাতীয় কার্য্যের প্রতি এই জাতীয় দ্রব্যই উপাদান-কারণ, এইরূপ সামান্যতঃ অনুমানপ্রমাণের দ্বারাই নিশ্চয় জন্মে। তদনুসারেই লোকে তজ্জাতীয় কার্য্যের উৎপাদন করিতে তজ্জাতীয় দ্রব্যকেই উপাদান-কারণরূপে গ্রহণ করে। সুতরাং কার্য্যের উৎপত্তির পূর্ব্বেও পূর্ব্বোক্তরূপে সামান্য কার্য্য-কারণ-ভাবজ্ঞানবশতঃ সেই কার্য্যবিশেষের উৎপাদনে লোকের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। উহাতে বিশেষ কার্য্য-কারণ-ভাব-জ্ঞানের কোন অপেক্ষা নাই। উদ্দ্যোতকরও এই সূত্রের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত যে উপাদান নিয়ম উৎপত্তির পূর্ব্বেও কার্য্যের সত্তার সাধক বলিয়া কথিত হইয়াছে, উহা ঐ সত্তাপ্রযুক্ত নহে, কিন্তু কারণের সামর্থ্যপ্রযুক্ত। অর্থাৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের সত্তা না থাকিলেও পূর্ব্বোক্তরূপ উপাদান-নিয়মের উপপত্তি হয়।

১। তদসদ্ভাবিকার্য্যমনেনৈব কারণেন জন্যতে নান্যেন ইত্যনুমানাদ্বুদ্ধিসিদ্ধমেবেত্যর্থঃ —তাৎপর্য্যটীকা।

কারণ, সকল পদার্থ হইতেই সকল কার্য্যের উৎপত্তি দৃষ্ট হয় না—পদার্থবিশেষ হইতেই কার্য্য-বিশেষের উৎপত্তি দৃষ্ট হয়। সুতরাং এই পদার্থই এই কার্য্যের উৎপাদনে সমর্থ, এইরূপ বুদ্ধি-বশতঃই যে কার্য্যের উৎপাদনে যে পদার্থ সমর্থ, সেই পদার্থকেই সেই কার্য্যের উৎপাদন করিতে গ্রহণ করে। ফলকথা, পদার্থবিশেষেই যে কার্য্যবিশেষের উৎপাদনে সামর্থ্য আছে, ইহা উৎপত্তির নিয়ম দর্শনবশতঃই নিশ্চয় করা যায়। মৃত্তিকা হইতেই পার্থিব ঘট জন্মে, সূত্র হইতে জন্মে না, সূত্র হইতেই বস্ত্র জন্মে, মৃত্তিকা হইতে জন্মে না, এইরূপ নিয়ম পরিদৃষ্ট। সুতরাং মৃত্তিকায় পার্থিব ঘটোৎপাদনের সামর্থ্য আছে, সূত্রে উহা নাই; সূত্রে বস্ত্রোৎপাদনের সামর্থ্য আছে, মৃত্তিকায় উহা নাই, এইরূপে সর্ব্বত্রই কার্য্যবিশেষের উৎপাদনে নিয়ত পদার্থবিশেষেরই সামর্থ্য অবধারিত হয়। সুতরাং পূর্ব্বোক্তরূপে কার্য্য যে নিয়তকারণ-বিশিষ্ট, ইহা উৎপত্তির পূর্ব্বেও অবধারিত হয়। তাহা হইলে কার্য্যের উপাদান-কারণের নিয়মেরও উপপত্তি হয়। ভাষ্যকার প্রভৃতি যে "সামর্থ্য" বলিয়াছেন, উহার দ্বারা কার্য্যবিশেষের উৎপাদনে পদার্থবিশেষেরই সামর্থ্য অর্থাৎ শক্তি আছে, সেই শক্তিবশতঃই পদার্থবিশেষই কার্য্যবিশেষ উৎপন্ন করে, উক্ত শক্তি না থাকায় সকল পদার্থ ই সকল কার্য্য উৎপন্ন করিতে পারে না, ইহাই বুঝা যায়। কিন্তু নৈয়ায়িক মতে কারণত্বই কারণগত শক্তি। কারণত্ব ভিন্ন কারণের পৃথক্ কোন শক্তি নৈয়ায়িকগণ স্বীকার করেন্ নাই। "ন্যায়কুসুমাঞ্জলি"র প্রথম স্তবকে মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য কারণত্ব ভিন্ন কারণগত আর যে কোন শক্তি নাই, ইহা বহু বিচারপূর্ব্বক সমর্থন করিয়াছেন। তাহা হইলে বুঝা যায় যে, মৃত্তিকা হইতে পার্থিব ঘটের উৎপত্তি দেখিলে মৃত্তিকায় পার্থিব ঘটের সামর্থ্য অর্থাৎ কারণত্ব আছে, ইহাই অবধারিত হয়। এইরূপ সূত্র হইতে বস্ত্রের উৎপত্তি দেখিলে সূত্রে বস্ত্রের সামর্থ্য অর্থাৎ কারণত্ব আছে, ইহা অবধারিত হয়। মৃত্তিকা হইতে কখনও বস্ত্রের উৎপত্তি দেখা যায় না, সূত্র হইতে কখনও ঘটের উৎপত্তি দেখা যায় না, তদ্বিষয়ে অন্য কোন প্রমাণও পাওয়া যায় না, এ জন্য মৃত্তিকায় বস্ত্রকারণত্ব এবং সূত্রে ঘটকারণত্ব নাই, ইহাও অবধারিত হয়।

সৎকার্য্যবাদী সাংখ্যসম্প্রদায়ের প্রথম কথা এই যে, কার্য্য যদি উৎপত্তির পূর্ব্বেও অসৎ হয়, তাহা হইলে উহার উৎপত্তি হইতেই পারে না। কারণ, যাহা অসৎ, তাহা উৎপন্ন করা যায় না। অসৎকে কেহ সৎ করিতে পারে না—সহস্র শিল্পীও নীলকে পীত করিতে পারে না। এতদুত্তরে অসৎকার্য্যবাদী নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ের কথা এই যে, যাহা সর্ব্বকালেই অসৎ, তাহাকেই কেহ উৎপন্ন করিতে পারে না, কোন কালেই তাহার সত্তা সম্পাদন করা যায় না। কিন্তু কার্য্য ত গগনকুসুমাদির ন্যায় সর্ব্বকালেই অসৎ নহে। কার্য্য উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ হইলেও পরে সৎ। সত্ত্ব ও অসত্ত্ব এই উভয়ই কার্য্যের ধর্ম্ম। তন্মধ্যে কার্য্যের উৎপত্তির পূর্ব্বকালে তাহাতে "অসত্ত্ব" ধর্ম্ম থাকে এবং উৎপত্তিকাল হইতে কার্য্যের স্থিতিকাল পর্য্যন্ত তাহাতে "সত্ত্ব" ধর্ম্ম থাকে। কার্য্য যখন একেবারে অসৎ বা অলীক নহে, তখন উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যরূপ ধর্ম্মী না থাকিলেও তাহাতে তৎকালে অসত্ত্ব ধর্ম্ম থাকিতে পারে। কারণ, কার্য্যরূপ ধর্ম্মী অসিদ্ধ নহে। ঐ ধর্ম্মী যখন পরে সৎ হইবে, তখন কালবিশেষে উহাতে অসত্ত্ব ও সত্ত্ব, এই ধর্ম্মদ্বয়ই থাকিতে পারে। ইহা স্বীকার

না করিলে সাংখ্যমতেরও উপপত্তি হইতে পারে না। কারণ, সাংখ্যসম্প্রদায়ের মতে যেমন তিলের মধ্যে তৈল থাকে, ধান্যের মধ্যে তণ্ডুল থাকে, গাভীর স্তনমধ্যে দুগ্ধ থাকে, তদ্রূপই মৃত্তিকার মধ্যে ঘট থাকে, সূত্রের মধ্যে বস্ত্র থাকে। তিল প্রভৃতি হইতে তৈল প্রভৃতির আবির্ভাবের ন্যায় মৃত্তিকা প্রভৃতি হইতে ঘটাদি কার্য্যের আবির্ভাব হয়। কিন্তু ইহাতে জিজ্ঞাস্য এই যে, যেমন তিল প্রভৃতির মধ্যে তৈলাদি থাকে, তদ্রূপই কি মৃত্তিকার মধ্যে ঘট থাকে? এবং সূত্রের মধ্যে বস্ত্র থাকে? সাংখ্যসম্প্রদায়ের পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তগুলি কি প্রকৃত স্থলে ঠিকই হইয়াছে? ঘট ও বস্ত্রাদি পদার্থ সাংখ্যসম্প্রদায়ও ঠিক যেরূপে প্রত্যক্ষ করিতেছেন এবং তদ্দ্বারা জলাহরণাদি কার্য্য করিতেছেন, ঐ ঘটাদি পদার্থ কি বস্তুতঃ পূর্ব্ব হইতেই ঠিক সেইরূপেই মৃত্তিকাদির মধ্যে ছিল? তাহা হইলে আর ঐ ঘটাদি পদার্থের আবির্ভাবের পূর্ব্বে, "ঘট হয় নাই", "ঘট হইবে," "বস্ত্র হয় নাই", "বস্ত্র হইবে," ইত্যাদি কথা কেহই বলিতে পারেন না। কিন্তু সাংখ্যসম্প্রদায়ও ত তখন ঐরূপ কথা বলিয়া থাকেন। সুতরাং সাংখ্যসম্প্রদায়ও ঘটাদি পদার্থের আবির্ভাবের পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্তরূপ বাক্যের দ্বারা ঘটত্বাদিরূপে ঘটাদি পদার্থের অসত্তা প্রকাশ করেন, ইহা তাঁহাদিগেরও স্বীকার্য্য। ফল কথা, ধান্যের মধ্যে যেমন পূর্ব্ব হইতেই তণ্ডুলত্বরূপে তণ্ডুলের সত্তা আছে, গাভীর স্তনের মধ্যে যেমন পূর্ব্ব হইতেই দুগ্ধত্বরূপে দুগ্ধের সত্তা আছে, তদ্রূপ পূর্ব্ব হইতেই মৃত্তিকার মধ্যে ঘটত্বরূপে ঘটের সত্তা এবং সূত্রের মধ্যে বস্ত্রত্বরূপে বস্ত্রের সত্তা আছে, ইহা কোনরূপেই বলা যাইতে পারে না। সুতরাং মৃত্তিকাদি উপাদান-কারণে পূর্ব্বে ঘটত্বাদিরূপে ঘটাদি পদার্থ যে অসৎ, ইহা সাংখ্যসম্প্রদায়ও স্বীকার করিতে বাধ্য। তাহা হইলে পূর্ব্বে ঘটত্বাদিরূপে অসৎ ঘটাদি ধর্ম্মীতে অসত্ত্বরূপ ধর্ম্ম তাঁহাদিগেরও স্বীকার্য্য।

সৎকার্য্যবাদ সমর্থনে সাংখ্যসম্প্রদায়ের দ্বিতীয় যুক্তি এই যে, কারণের সহিত কার্য্যের সম্বন্ধ অবশ্য স্বীকার্য্য। কারণ, যাহা কার্য্যের সহিত সম্বদ্ধ, তাহাই ঐ কার্য্যের জনক হইতে পারে ও হইয়া থাকে। অন্যথা মৃত্তিকা হইতেও বস্ত্রের উৎপত্তি এবং সূত্র হইতেও ঘটের উৎপত্তি কেন হয় না? কার্য্যের সহিত কারণের চিরন্তন সম্বন্ধ স্বীকার করিলে উক্তরূপ আপত্তি হইতে পারে না। কারণ, যে কার্য্যের সহিত যে পদার্থ সম্বন্ধযুক্ত, সেই পদার্থই সেই কার্য্যের উৎপাদক হইয়া থাকে, এইরূপ নিয়ম স্বীকার করা যায়। ঘটের সহিতই মৃত্তিকার সেই সম্বন্ধ আছে, বস্ত্রের সহিত উহা নাই, অতএব মৃত্তিকা হইতে ঘটেরই উৎপত্তি হয়, বস্ত্রের উৎপত্তি হয় না। এখন পূর্ব্বোক্ত যুক্তি-বশতঃ যদি ঘটের সহিত মৃত্তিকার সম্বন্ধ অবশ্য স্বীকার্য্য হয়, তাহা হইলে ঐ ঘটের উৎপত্তির পূর্ব্বেও উহার সত্তা স্বীকার করিতেই হইবে। কারণ, পূর্ব্বে ঘট অসৎ হইলে তাহার সহিত বিদ্যমান মৃত্তিকার সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। "সৎ" ও "অসতে" সম্বন্ধ অসম্ভব। সম্বন্ধের যে দুইটি আশ্রয়, যাহা দার্শনিক ভাষায় সম্বন্ধের অনুযোগী ও প্রতিযোগী বলিয়া কথিত হয়, তাহার একটি না থাকিলেও সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। যেমন ঘট বা ভূতল, ইহার কোন একটি পদার্থ না থাকিলেও ঐ উভয়ের সংযোগ সম্বন্ধ থাকিতে পারে না, ইহা সর্ব্বসম্মত। সুতরাং কারণের সহিত কার্য্যের যে সম্বন্ধ অবশ্য স্বীকার্য্য, তাহা কারণ ও কার্য্য উভয়ই বিদ্যমান না থাকিলে থাকিতে পারে না। অতএব

উৎপত্তির পূর্ব্বেও কারণের সহিত সম্বন্ধযুক্ত কার্য্য আছে—কার্য্য, তখনও সৎ, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। কার্য্য ও কারণের কোন সম্বন্ধ নাই, কিন্তু কারণের এমন শক্তি আছে, তৎপ্রযুক্তই সেই সেই কারণ হইতে বিশেষ বিশেষ কার্য্যই উৎপন্ন হয়, ইহা বলিলেও সেই কার্য্যের উৎপত্তির পূর্ব্বে তাহার সত্তা অবশ্য স্বীকার্য্য। কারণ, কারণগত সেই শক্তির সহিত কার্য্যের কোনই সম্বন্ধ না থাকিলে মৃত্তিকা হইতেও বস্ত্রের উৎপত্তি হইতে পারে। কারণ, মৃত্তিকায় যে শক্তি স্বীকৃত হইতেছে, তাহার সহিত বস্ত্রকার্য্যের যেমন সম্বন্ধ নাই, তদ্রূপ ঘটকার্য্যেরও সম্বন্ধ নাই। সুতরাং মৃত্তিকা হইতে ঘটের উৎপত্তি হইবে, বস্ত্রের উৎপত্তি হইবে না, ইহার নিয়ামক কিছুই নাই। অতএব পূর্ব্বোক্ত মতেও মৃত্তিকাদি কারণগত শক্তির সহিত ঘটাদি কার্য্যবিশেষেরই সম্বন্ধ আছে, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে ঘটাদি কার্য্যের উৎপত্তির পূর্ব্বেও তাহার সত্তা স্বীকার্য্য। কারণ, উহা তখন অসৎ হইলে উহার সহিত কারণগত শক্তির সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। সৎ ও অসতের সম্বন্ধ অসম্ভব, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

সাংখ্যসম্প্রদায়ের পূর্ব্বোক্ত সমস্ত কথার উত্তরে নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ের বক্তব্য এই যে, কার্য্য যদি একেবারেই অসৎ বা অলীক হইত, তাহা হইলেই উহার সহিত কাহারই কোন সম্বন্ধ সম্ভব হইত না। কিন্তু আমাদিগের মতে কার্য্য যখন উৎপত্তির পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্তই অসৎ, উৎপত্তিক্ষণ হইতেই সৎ, তখন তাহার সহিত তাহার কারণবিশেষের যে-কোন সম্বন্ধ অসম্ভব হইতে পারে না। আমাদিগের মতে ভাবকার্য্যের উৎপত্তিক্ষণ হইতেই তাহার উপাদান-কারণের সহিত ঐ কার্য্যের "সমবায়" নামক সম্বন্ধ সিদ্ধ হয়। ঐ সম্বন্ধ আধারাধেয় ভাবের নিয়ামক, সুতরাং উহা আধার উপাদানকারণ ও আধেয় ঘটাদি কার্য্যের সত্তাকে অপেক্ষা করায় কার্য্যের উৎপত্তির পূর্ব্বে ঐ সম্বন্ধ সিদ্ধ হয় না। কিন্তু কার্য্য ও কারণের কার্য্যকারণ-ভাবসম্বন্ধ পূর্ব্ব হইতেই সিদ্ধ আছে। সামান্যতঃ অনুমান-প্রমাণের সাহায্যে যে জাতীয় কার্য্যের প্রতি যে জাতীয় পদার্থের সামর্থ্য অর্থাৎ কারণত্ব পূর্ব্বে বুঝা যায়, তজ্জাতীয় কার্য্য ও সেই পদার্থের কার্য্যকারণ-ভাবসম্বন্ধও পূর্ব্বেই বুঝা যায় এবং সেই কারণগত শক্তি—যাহা আমাদিগের মতে কারণত্বরূপ ধর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে—তাহার সহিতও কার্য্যবিশেষের কোন সম্বন্ধও অবশ্য পূর্ব্বেও বুঝা যায়। কার্য্যবিশেষে তাহার কারণগত-কারণত্ব-নিরূপিত কার্য্যত্ব সম্বন্ধ আছে, এবং সেই কারণেও সেই কার্য্যত্ব-নিরূপিত-কারণত্ব সম্বন্ধ আছে। সুতরাং কার্য্যোৎপত্তির পূর্ব্বেও কারণ ও তদ্গত কারণত্বের (শক্তির) সহিত সেই কার্য্যের সম্বন্ধ অবশ্যই আছে। ঐ সম্বন্ধ সংযোগ ও সমবায়াদি সম্বন্ধের ন্যায় আধারাধেয় ভাবের নিয়ামক নহে, সুতরাং উহা ভবিষ্যৎ পদার্থেও থাকিতে পারে। ভবিষ্যৎ পদার্থের সহিত কাহারই কোনরূপ সম্বন্ধ থাকিতে পারে না, ইহা বলা যায় না। আমাদিগের ভবিষ্যৎ মৃত্যু বিষয়ে আমাদিগের যে অবশ্যম্ভাবিত্বজ্ঞান জন্মে, তাহার সহিত সেই ভবিষ্যৎ মৃত্যুর কি কোনই সম্বন্ধ নাই? জ্ঞান ও বিষয়ের কোন সম্বন্ধ স্বীকার না করিলে সকল জ্ঞানকেই সকলবিষয়ক বলা যায়। তাহা হইলে অমুক বিষয়ে জ্ঞান হইয়াছে, অমুক বিষয়ে জ্ঞান হয় নাই, এইরূপ কথাও বলা যায় না। সুতরাং যে বিষয়ে জ্ঞান জন্মে, তাহার সহিতই ঐ জ্ঞানের সম্বন্ধবিশেষ স্বীকার্য্য। তাহা হইলে ভবিষ্যৎ

মৃত্যু বিষয়ে এখন যে জ্ঞান জন্মে, তাহার সহিত সেই মৃত্যুরও সম্বন্ধবিশেষ স্বীকার করিতেই হইবে। সেই সম্বন্ধের অনুরোধে সেই মৃত্যুও পূর্ব্ব হইতেই আছে, ইহা বলিলে জীবিত জীবমাত্রই মৃত, ইহাই বলা হয়। কারণ, জীবের মৃত্যুনামক জন্য পদার্থও ত মৃত্যুর পূর্ব্ব হইতেই সৎ, নচেৎ পূর্ব্বোক্ত সৎকার্য্যবাদ সিদ্ধ হইতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত যে সকল যুক্তির দ্বারা সাংখ্যসম্প্রদায় সৎকার্য্যবাদের সমর্থন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের মতে জীবের মৃত্যুপদার্থও উৎপত্তির পূর্ব্বে সৎ, নচেৎ তাহার কারণের সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ সম্ভব না হওয়ায় উহা জন্মিতে পারে না, ইহাও তাঁহারা অবশ্য বলিতে বাধ্য। মৃত্যু ভাবপদার্থ না হইলেও উহার কারণের সহিত উহার সম্বন্ধ যে আবশ্যক, ইহা তাঁহারা অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

সৎকার্য্যবাদ সমর্থনে সাংখ্যসম্প্রদায়ের চরম যুক্তি এই যে, উপাদান-কারণ ও কার্য্য বস্তুতঃ অভিন্ন। যে মৃত্তিকা হইতে যে ঘটের উৎপত্তি হয়, উহা ঐ মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে। সুবর্ণ-নির্ম্মিত বলয়াদি অলঙ্কার তাহার উপাদান সুবর্ণ হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে। তন্তু-নির্ম্মিত বস্ত্র উহার উপাদান তন্তু হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে। এইরূপ ভাবকার্য্যমাত্রই তাহার উপাদান-কারণ হইতে বস্তুতঃ ভিন্ন পদার্থ নহে। মৃত্তিকাদি উপাদান-কারণ হইতে ঘটাদিকার্য্য অভিন্ন পদার্থ হইলে ঐ ঘটাদিকার্য্যও উৎপত্তির পূর্ব্বে মৃত্তিকাদিরূপে সৎ, ইহা স্বীকার্য্য। কারণ, মৃত্তিকাদি উপাদান-কারণ যখন ঘটাদি কার্য্যের উৎপত্তির পূর্ব্বেও সৎ, তখন উহা হইতে অভিন্ন ঐ ঘটাদিকার্য্য উৎপত্তির পূর্ব্বে একেবারে অসৎ হইতে পারে না। সাংখ্যসম্প্রদায় পূর্ব্বোক্তরূপ সৎকার্য্যবাদ সমর্থনের জন্য উপাদান-কারণ ও তাহার কার্য্যের অভেদ সাধন করিতে নানা অনুমান প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু নৈয়ায়িকসম্প্রদায় ঐ সকল অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদিগের কথা এই যে, উপাদান-কারণ ও তাহার কার্য্যের ভেদ প্রত্যক্ষসিদ্ধ। ঘটাদিকার্য্যের উপাদান মৃত্তিকাদি হইতে বিলক্ষণ আকৃতিবিশিষ্ট ঘটাদি কার্য্য যে, স্বরূপতঃ ভিন্ন পদার্থ, ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারাই বুঝা যায়। মৃত্তিকা ও ঘটের যে অভেদ বুঝা যায়, তাহা মৃত্তিকার সহিত ঐ ঘটের সমবায় সম্বন্ধ-প্রযুক্ত। অর্থাৎ ঘটাদিকার্য্য মৃত্তিকাদি উপাদান-কারণের সহিত অন্বিত অর্থাৎ সমবায় নামক বিলক্ষণ সম্বন্ধযুক্ত হইয়া থাকে বলিয়াই ঘটাদিকার্য্যকে মৃত্তিকাদি হইতে অভিন্ন বলিয়া বুঝা যায়। কিন্তু ঘটাদি কার্য্য ও উহার উপাদান-কারণ যে, বস্তুতঃই স্বরূপতঃ অভিন্ন পদার্থ, তাহা নহে। পরন্তু পার্থিব ঘটেও মৃত্তিকাত্বজাতি আছে বলিয়া, ঐ ঘট ও মৃত্তিকার মৃত্তিকাত্বরূপে যে অভেদ, তাহা ঐ উভয়ের স্বরূপতঃ ব্যক্তিগত ভেদের বাধক নহে। কারণ, ঐরূপ অভেদ সকল পদার্থেই আছে। প্রমেয়ত্বরূপে বস্তুমাত্রের অভেদ আছে, দ্রব্যত্বরূপে দ্রব্যমাত্রের অভেদ আছে। কিন্তু ঐরূপ অভেদ পদার্থের স্বরূপতঃ ব্যক্তিগত ভেদের বাধক হইলে ঘটপটাদি বিভিন্ন পদার্থসমূহেরও স্বরূপতঃ ব্যক্তিগত ভেদ থাকিতে পারে না। পরন্তু পার্থিব ঘটের উপাদান-কারণ মৃত্তিকা ও তজ্জন্য ঘটপদার্থ যে ভিন্ন, ইহা অনুমান প্রমাণের দ্বারাও সিদ্ধ হয়। কারণ, ঐ ঘটের দ্বারা যে জলাহরণাদিকার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহা উহার উপাদান-কারণ মৃত্তিকার দ্বারা হয় না, এবং ঐ মৃত্তিকাকে কেহ ঘট বলিয়া ব্যবহার করে না। এইরূপ আরও অনেক হেতুর দ্বারা মৃত্তিকাদি উপাদান-কারণ হইতে

ঘটাদি কার্য্য যে ভিন্ন পদার্থ, ইহা সিদ্ধ হয়। শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্র "সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী" গ্রন্থে (নবম কারিকার টীকায়) সাংখ্যসম্মত সৎকার্য্যবাদ সমর্থন করিতে নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ের কথিত কার্য্য ও কারণের ভেদসাধক অনেকগুলি হেতুর উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, ঐ সমস্ত হেতু উপাদান-কারণ ও কার্য্যের ঐকান্তিক ভেদ সিদ্ধ করিতে পারে না। বাচস্পতিমিশ্রের এই কথার দ্বারা তিনি যে, সাংখ্যমতেও উপাদান-কারণ ও কার্য্যের আত্যন্তিক ভেদই নাই, কিন্তু কোনরূপে ভেদও আছে, ইহাই সিদ্ধান্তরূপে প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। কিন্তু তাহা হইলে মৃত্তিকায় যেরূপে ঘটের ভেদ আছে, সেইরূপে মৃত্তিকা ও ঘটের অভেদ কিছুতেই সিদ্ধ হইবে না। সুতরাং সেইরূপে মৃত্তিকায় ঘটের উৎপত্তির পূর্ব্বে ঐ ঘট যে অসৎ, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। তাহা হইলে উৎপত্তির পূর্ব্বে ঘট কোনরূপে সৎ এবং কোনরূপে অসৎ, এই মতেরই সিদ্ধি হইবে। তাহা হইলে সদসদ্বাদ বা জৈনসম্মত "স্যাদ্বাদ" স্বীকারে বাধা কি? তাহা বলা আবশ্যক।

শ্রীমদ্‌বাচস্পতিমিশ্র পূর্ব্বোক্ত স্থলে শেষে বলিয়াছেন যে, সূত্রদ্বারা আবরণ-কার্য্য নিষ্পন্ন হয় না, বস্ত্রের দ্বারা উহা নিষ্পন্ন হয়, এইরূপ কার্য্যভেদ বা প্রয়োজনভেদবশতঃ সূত্র ও বস্ত্র যে ভিন্ন পদার্থ, ইহা সিদ্ধ হয় না। কারণ, কার্য্যভেদ থাকিলেই বস্তুর ভেদ থাকিবে, এইরূপ নিয়ম নাই। অবস্থাভেদে একই বস্তুর দ্বারাও বিভিন্ন কার্য্য সম্পন্ন হয়। যেমন একজন শিবিকাবাহক শিবিকা-বহন করিতে পারে না, পথপ্রদর্শনরূপ কার্য্য করিতে পারে, কিন্তু অপর শিবিকাবাহকদিগের সহিত মিলিত হইলে তখন শিবিকা বহন করিতে পারে। কিন্তু ঐ এক ব্যক্তি পূর্ব্বে ও পরে বিভিন্ন ব্যক্তি নহে। এইরূপ বস্ত্রের উপাদান-কারণ সূত্রগুলি প্রত্যেকে আবরণকার্য্য সম্পাদন করিতে না পারিলেও সকলে মিলিত হইয়া বস্ত্রভাব প্রাপ্ত হইলে, তখন উহারাই আবরণকার্য্য সম্পাদন করে। বস্তুতঃ পূর্ব্বকালীন সেই সূত্রসমূহ হইতে সেই বস্ত্রের ভেদ নাই। পূর্ব্বোক্ত কথায় বক্তব্য এই যে, শিবিকাবাহকগণ প্রত্যেকে অসংশ্লিষ্ট থাকিয়াও মিলিত হইয়া শিবিকা বহন করে। কিন্তু বস্ত্রের উপাদান-কারণ সূত্রসমূহ প্রত্যেকে বিলক্ষণ সংযোগবিশিষ্ট না হইলে আবরণ-কার্য্য সম্পন্ন হয় না। সুতরাং ঐ সূত্রসমূহের পরস্পর বিলক্ষণ-সংযোগজন্য সেখানে যে, বস্ত্রনামক একটি পৃথক্ অবয়বী দ্রব্যের উৎপত্তি হয়, সেই দ্রব্যই আবরণ-কার্য্য সম্পাদন করে, ইহাই বুঝা যায়। নচেৎ পিণ্ডাকার সূত্রসমূহের দ্বারা বস্ত্রের কার্য্য কেন নিষ্পন্ন হয় না? ফলকথা, নৈয়ায়িকসম্প্রদায় বাচস্পতি মিশ্রের পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তও সমীচীন বলিয়া স্বীকার করেন নাই। শ্রীমদ্বাচস্পতিমিশ্র "সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদী"তে পূর্ব্বোক্ত সৎকার্য্যবাদ সমর্থন করিতে ভগবদ্‌গীতার "নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ" (২।১৬) এই শ্লোকার্দ্ধও উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু উহার দ্বারা সাংখ্য-সম্মত পূর্ব্বোক্ত সৎকার্য্যবাদই যে কথিত হইয়াছে, ইহা নিঃসংশয়ে বুঝা যায় না। ভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ও টীকাকার শ্রীধর স্বামী প্রভৃতিও উহার দ্বারা সাংখ্যসম্মত সৎকার্য্যবাদেরই ব্যাখ্যা করেন নাই। উহার দ্বারা আত্মার নিত্যত্বই সমর্থিত হইয়াছে, ইহাই অসৎকার্য্যবাদী নৈয়ায়িক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের কথা। কারণ, ঐ শ্লোকের পূর্ব্বে ও পরে আত্মার নিত্যত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে; কার্য্যমাত্রের সর্ব্বদা সত্তা সেখানে বিবক্ষিত নহে। মীমাংসাচার্য্য মহামনীষী পার্থসারথি মিশ্রও

"শাস্ত্রদীপিকা" গ্রন্থে মীমাংসক মতানুসারে সাংখ্যমত খণ্ডন করিতে পূর্ব্বোক্ত ভগবদ্‌গীতাবচনের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, "অসৎ" অর্থাৎ অবিদ্যমান আত্মার উৎপত্তি হয় না, "সৎ" অর্থাৎ চিরবিদ্যমান আত্মার বিনাশও হয় না, অর্থাৎ সমস্ত আত্মাই উৎপত্তি ও বিনাশশূন্য, ইহাই উক্ত বচনের তাৎপর্য্য। সমস্ত কার্য্যই সর্ব্বদা সৎ, উৎপত্তির পূর্ব্বে যাহা অসৎ, তাহার উৎপত্তি হয় না এবং সৎ অর্থাৎ সদা বিদ্যমান সমস্ত কার্য্যেরই কখনও একেবারে বিনাশ হয় না, ইহা উক্ত বচনের তাৎপর্য্য নহে। কারণ, উক্ত বচনের পূর্ব্বে "ন ত্বেবাহং জাতু নাসং" ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা সমস্ত আত্মাই অনাদিকাল হইতে আছে এবং চিরদিনই থাকিবে, ইহাই কথিত হইয়াছে। সুতরাং পরে "নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ" এই বচনের দ্বারাও পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তই অর্থাৎ আত্মার চিরবিদ্যমানতা বা নিত্যত্বই সমর্থিত হইয়াছে, ইহাই বুঝা যায়। ফলকথা, ভগবদ্‌গীতার উক্ত বচনের নানারূপ তাৎপর্য্য বুঝা গেলেও উহার দ্বারা সাংখ্যসম্মত পূর্ব্বোক্ত সৎকার্য্যবাদই যে কথিত হইয়াছে, ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন হয় না। সেখানে প্রকরণানুসারে ঐরূপ তাৎপর্য্যও গ্রহণ করা যায় না। প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকারগণও সেখানে ঐরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন নাই।

পূর্ব্বোক্ত সৎকার্য্যবাদখণ্ডনে নৈয়ায়িক, বৈশেষিক ও মীমাংসকসম্প্রদায়ের চরম কথা এই যে, যে যুক্তির দ্বারা সাংখ্যাদি সম্প্রদায় ঘটাদি কার্য্যকে উৎপত্তির পূর্ব্বেও সৎ বলিয়া স্বীকার করেন, সেই যুক্তির দ্বারা ঐ ঘটাদি কার্য্যের আবির্ভাবকেও তাঁহারা সৎ বলিয়াই স্বীকার করিতে বাধ্য। কিন্তু তাহা হইলে ঐ আবির্ভাবের জন্য কারণ-ব্যাপার নিরর্থক। সৎকার্য্যবাদী সাংখ্যাদি সম্প্রদায় বলিয়াছেন যে, মৃত্তিকাদিতে ঘটাদি কার্য্য পূর্ব্ব হইতে থাকিলেও তাহার আবির্ভাবের জন্যই কারণ-ব্যাপার আবশ্যক। কিন্তু ঐ আবির্ভাবও যদি পূর্ব্ব হইতেই থাকে, তবে উহার জন্য কারণ-ব্যাপারের প্রয়োজন কি? সূত্রে বস্ত্রও আছে, বস্ত্রের আবির্ভাবও আছে, তবে আর দেশে সূত্র নির্ম্মাণ করিয়া উহার দ্বারা আবার বস্ত্র নির্ম্মাণের এত আয়োজন কেন? যদি বল, সেই আবির্ভাবের আবির্ভাবের জন্যই কারণ-ব্যাপার আবশ্যক, তাহা হইলে সেই আবির্ভাবের আবির্ভাব, তাহার আবির্ভাব, ইত্যাদি প্রকারে অনন্ত আবির্ভাবের স্বীকারে অনবস্থা-দোষ অনিবার্য্য। কারণ, পূর্ব্বোক্ত মতে কোন আবির্ভাবই অসৎ হইতে পারে না। সুতরাং সমস্ত আবির্ভাবকেই সৎ বলিয়া স্বীকার করিয়া প্রত্যেকেরই আবির্ভাব স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীমদ্‌বাচস্পতি মিশ্র "সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী"তে শেষে উক্ত কথারও উল্লেখ করিয়া, তদুত্তরে বলিয়াছেন যে, নৈয়ায়িক প্রভৃতি অসৎকার্য্যবাদীদিগের মতে ঘটাদি কার্য্যের যে উৎপত্তি, তাহাও তাঁহারা ঐ ঘটাদিকার্য্যের ন্যায় উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ পদার্থ বলিয়াই স্বীকার করিতে বাধ্য। সুতরাং সেই উৎপত্তিরও উৎপত্তি হয় এবং সেই দ্বিতীয় উৎপত্তিও পূর্ব্বে অসৎ পদার্থ, ইহাও তাঁহারা স্বীকার করিতে বাধ্য। তাহা হইলে সেই উৎপত্তির উৎপত্তি, তাহার উৎপত্তি, ইত্যাদি প্রকারে অনন্ত উৎপত্তি স্বীকারে অনবস্থাদোষ তাঁহাদিগের মতেও অপরিহার্য্য। তাৎপর্য্য এই যে, অনবস্থা প্রামাণিক হইলে উহা দোষই হয় না। কারণ, উহাতে অনবস্থা-দোষের লক্ষণ থাকে না (দ্বিতীয় খণ্ড, ৮৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং অসৎকার্য্যবাদী নৈয়ায়িক প্রভৃতি যদি তাঁহা

দিগের মতে প্রদর্শিত অনবস্থাকে প্রামাণিক বলিয়া দোষ না বলেন, তাহা হইলে সৎকার্য্যবাদী সাংখ্য-সম্প্রদায়ের মতেও প্রদর্শিত অনবস্থা প্রামাণিক বলিয়া দোষ হইবে না। কারণ, তাঁহাদিগের মতে ঘটাদি কার্য্য এবং তাহার আবির্ভাবও সৎ বলিয়াই প্রমাণসিদ্ধ হওয়ায় সেই আবির্ভাবের আবির্ভাব প্রভৃতি অনন্ত আবির্ভাবও প্রমাণসিদ্ধ বলিয়া স্বীকৃত হইবে। ফলকথা, অসৎকার্য্যবাদী নৈয়ায়িক প্রভৃতি যেরূপে তাঁহাদিগের মতে প্রদর্শিত অনবস্থাদোষের পরিহার করিবেন, সাংখ্যসম্প্রদায়ও সেইরূপেই তাঁহাদিগের মতে প্রদর্শিত অনবস্থা-দোষের পরিহার করিবেন। নৈয়ায়িক প্রভৃতি যদি বলেন যে, আমাদিগের মতে ঘটাদি পদার্থের যে উৎপত্তি, উহা ঘটাদি পদার্থ হইতে পৃথক্ কোন পদার্থ নহে, উহা ঘটাদিস্বরূপই, সুতরাং আমাদিগের মতে উৎপত্তির উৎপত্তি, তাহার উৎপত্তি, ইত্যাদি প্রকারে অনন্ত উৎপত্তি স্বীকারের আপত্তি হইতে পারে না; সুতরাং পূর্ব্বোক্তরূপ অনবস্থা-দোষের কোন আশঙ্কাই নাই। এতদুত্তরে শ্রীমদ্বাচস্পতিমিশ্র বলিয়াছেন যে, বস্ত্র ও তাহার উৎপত্তি অভিন্ন পদার্থ হইলে "বস্ত্র উৎপন্ন হইতেছে" এই বাক্যে পুনরুক্তি-দোষ হয়। কারণ, উক্ত মতে বস্ত্র ও তাহার উৎপত্তি একই পদার্থ হওয়ায় বস্ত্র বলিলেই উৎপত্তি বলা হয়, এবং উৎপত্তি বলিলেই বস্ত্র বলা হয়। সুতরাং কেবল বস্ত্র বলিলেই উৎপত্তির বোধ হওয়ায় উৎপত্তি-বোধক শব্দান্তর প্রয়োগ ব্যর্থ হয়। অতএব অসৎকার্য্যবাদী নৈয়ায়িক প্রভৃতি সম্প্রদায় বস্ত্রের উৎপত্তিকে বস্ত্র হইতে ভিন্ন পদার্থই বলিতে বাধ্য। তাঁহারা বস্ত্রের উপাদান-কারণ সূত্রের সহিত বস্ত্রের সমবায় নামক সম্বন্ধ অথবা বস্ত্রে উহার সত্তা জাতির সমবায় নামক সম্বন্ধকেই উৎপত্তি পদার্থ বলিবেন। তাঁহারা নিজমতে উহা ভিন্ন উৎপত্তি পদার্থ আর কিছুই বলিতে পারেন না। তাহা হইলে তাঁহাদিগের মতে সমবায় নামক সম্বন্ধ নিত্য পদার্থ বলিয়া সমবায়-সম্বন্ধরূপ উৎপত্তি পদার্থ নিত্যই হয়। কিন্তু তথাপি তাঁহা-দিগের মতে ঐ উৎপত্তির জন্যও কারণ-ব্যাপার যেরূপে সার্থক হয়, তদ্রূপ সাংখ্যমতেও পূর্ব্ব হইতে বিদ্যমান ঘটাদি পদার্থেরই আবির্ভাবের জন্য কারণ-ব্যাপার সার্থক হইবে। এতদুত্তরে নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ের বক্তব্য এই যে, আমাদিগের মতে ঘটাদি পদার্থের উৎপত্তিকে সমবায় নামক নিত্যসম্বন্ধরূপ স্বীকার করিলেও ঘটাদি পদার্থ যখন অনিত্য, উহা কারণ-ব্যাপারের পূর্ব্বে অসৎ, তখন ঐ ঘটাদি পদার্থের জন্যই কারণ-ব্যাপার সার্থক হয়। কেন না, কারণ-ব্যাপার ব্যতীত ঐ ঘটাদি পদার্থের সত্তাই সিদ্ধ হয় না। কিন্তু সৎকার্য্যবাদী সাংখ্যসম্প্রদায়ের মতে ঘটাদি পদার্থ ও উহার আবির্ভাব, এই উভয়ই যখন সৎ, ঐ উভয়েরই সত্তা যখন পূর্ব্ব হইতেই সিদ্ধ, তখন উক্ত মতে কারণ-ব্যাপার সার্থক হইতেই পারে না। তাঁহাদিগের মতে ঘটাদি পদার্থের আবির্ভাব হইলে তখন যেমন আর কারণব্যাপার আবশ্যক হয় না, তদ্রূপ পূর্ব্বেও কারণ-ব্যাপার অনাবশ্যক। কারণ, যাহা তাঁহাদিগের মতে পূর্ব্ব হইতেই আছে, তাহার জন্য কারণব্যাপার আবশ্যক হইবে কেন? তাঁহারা যদি বলেন যে, ঘটাদি কার্য্যের উপাদান-কারণ মৃত্তিকাদির পরিণামই ঘটাদি কার্য্য। উহা পরিণামি-(মৃত্তিকাদি) রূপে পূর্ব্বে থাকিলেও পরিণামরূপে ঐ ঘটাদিকার্য্যের আবির্ভাবের জন্যই কারণব্যাপার আবশ্যক হয়। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, তাহা হইলে পূর্ব্বে পরিণামরূপে ঘটাদিকার্য্যের অসত্তা স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু পরিণামরূপে ঘটাদিকার্য্যের আবির্ভাবও পূর্ব্বে সৎ না হইলে সৎকার্য্যবাদ সিদ্ধ হইতে

পারে না। সুতরাং পরিণামরূপে ঘটাদিকার্য্যের আবির্ভাবও পূর্ব্ব হইতেই সৎ হইলে তাহার জন্য কারণ-ব্যাপার অনাবশ্যক। পরন্তু উৎপত্তি বলিতে আদ্যক্ষণ-সম্বন্ধ অর্থাৎ ঘটাদি কার্য্যের সহিত তাহার প্রথম ক্ষণের সহিত যে কালিক সম্বন্ধ, তাহাই উৎপত্তিপদার্থ বলিলে উহা সমবায়-সম্বন্ধরূপ নিত্য পদার্থ হয় না। ঐ কালিক সম্বন্ধবিশেষও বস্তুতঃ ঘটাদিকার্য্যস্বরূপ, উহাও কোন অতিরিক্ত পদার্থ নহে। সুতরাং ঐ উৎপত্তির জন্যও কারণ-ব্যাপার সার্থক হইতে পারে। কিন্তু ঘটাদিকার্য্য ও তাহার উৎপত্তি বস্তুতঃ অভিন্ন পদার্থ হইলেও উৎপত্তিমাত্রেই বস্ত্রস্বরূপ না হওয়ায় বস্ত্রত্ব ও উৎপত্তিত্ব ধর্ম্মের ভেদ আছে। কারণ, বস্ত্রত্ব—বস্ত্রমাত্রগত ধর্ম্ম, উৎপত্তিত্ব—সমস্ত কার্য্যস্বরূপ উৎপত্তির সমষ্টিগত ধর্ম্ম। সুতরাং যেমন "ঘটঃ প্রমেয়ঃ" এইরূপ বাক্য বলিলে ঘটত্ব ও প্রমেয়ত্ব-ধর্ম্মের ভেদ থাকায় পুনরুক্তি-দোষ হয় না, তদ্রূপ "বস্ত্র উৎপন্ন হইতেছে" এইরূপ বলিলে বস্ত্রত্ব ও উৎপত্তিত্ব-ধর্ম্মের ভেদ থাকায় পুনরুক্তি-দোষ হইতে পারে না। ধর্ম্মী অভিন্ন হইলেও ধর্ম্মের ভেদ থাকিলে যে, পুনরুক্তি-দোষ হয় না, ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। নচেৎ "ঘটঃ কম্বুগ্রীবাদিমান্" ইত্যাদি বহু বাক্যে পুনরুক্তি-দোষ অনিবার্য্য হয়। সুতরাং কম্বুগ্রীবাদিবিশিষ্ট এবং ঘট, একই পদার্থ হইলেও ঘটত্ব ও কম্বুগ্রীবাদিমত্ত্ব ধর্ম্মের ভেদ থাকাতেই "ঘটঃ কম্বুগ্রীবাদিমান্" এই বাক্যে পুনরুক্তি-দোষ হয় না, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। পরন্তু সাংখ্যসম্প্রদায় ঘটাদি কার্য্যের যে অভিব্যক্তি বা আবির্ভাব বলিয়াছেন, উহাও তাঁহাদিগের মতে ঘটাদিকার্য্য হইতে পৃথক্ কোন পদার্থ নহে, ইহাই বলিতে হইবে। নচেৎ ঐ আবির্ভাবের আবির্ভাব, তাহার আবির্ভাব প্রভৃতি অনন্ত আবির্ভাব স্বীকারে পূর্ব্বোক্ত অনবস্থাদোষ অনিবার্য্য হয়। কিন্তু কার্য্যের উৎপত্তি পদার্থকে ঐ কার্য্য হইতে অভিন্ন পদার্থ বলিলে উৎপত্তি পক্ষে যেমন অনবস্থা-দোষ হয় না, ইহা শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্রও স্বীকার করিয়াছেন, তদ্রূপ কার্য্যের আবির্ভাবকেও ঐ কার্য্য হইতে অভিন্ন পদার্থ বলিলে আবির্ভাব পক্ষেও অনবস্থাদোষ হয় না। সুতরাং সাংখ্যমতেও কার্য্যের আবির্ভাব ঐ কার্য্য হইতে অভিন্ন পদার্থ, ইহাই স্বীকার্য্য। তাহা হইলে সাংখ্যমতেও "বস্ত্র আবির্ভূত হইতেছে" এই বাক্যে পুনরুক্তি-দোষ কেন হয় না, ইহা অবশ্য বক্তব্য। যদি বস্ত্রত্ব ও আবির্ভাবত্বরূপ ধর্ম্মের ভেদবশতঃই পুনরুক্তি-দোষ হয় না, ইহাই বলিতে হয়, তাহা হইলে "বস্ত্র উৎপন্ন হইতেছে" এই বাক্যেও পূর্ব্বোক্ত কারণে পুনরুক্তি-দোষ হয় না, ইহাও অবশ্যই বলা যাইবে।

ন্যায়বার্ত্তিকে উদ্দ্যোতকর, গৌতম মত সমর্থন করিতে গর্দ্দভের শৃঙ্গ কেন জন্মে না, এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়াছেন যে, গর্দ্দভে শৃঙ্গ অসৎ বলিয়াই যে, উহার উৎপত্তি হয় না, ইহা নহে। কিন্তু গর্দ্দভে শৃঙ্গের উৎপত্তির কারণ না থাকাতেই উহার উৎপত্তি হয় না। গর্দ্দভে শৃঙ্গের উৎপত্তি দেখা যায় না, এ জন্য গর্দ্দভ উহার কারণ নহে এবং সেখানে উহার অন্য কোন কারণও নাই, ইহাই অবধারণ করা যায়। কিন্তু সৎকার্য্যবাদী যে, গর্দ্দভে শৃঙ্গ অসৎ বলিয়াই গর্দ্দভে শৃঙ্গের উৎপত্তি হয় না বলিতেছেন, ইহাও তিনি বলিতে পারেন না। কারণ, তাঁহার নিজ সিদ্ধান্তে সকল কার্য্যই আবির্ভাবের পূর্ব্বেও সৎ বলিয়া গর্দ্দভে শৃঙ্গ অসৎ হইতে পারে না। তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে উদ্দ্যোতকরের গূঢ় তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, সৎকার্য্যবাদিসাংখ্যমতে ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতিই সমগ্র জগতের মূল উপাদান এবং সমগ্র জগৎ বা সমস্ত জন্য পদার্থই সেই মূল প্রকৃতি হইতে অভিন্ন

ত্রিগুণাত্মক। সুতরাং উক্ত মতে বস্তুতঃ সকল জন্য পদার্থই সর্ব্বাত্মক অর্থাৎ মূল প্রকৃতি হইতে অভিন্ন বলিয়া সকল জন্য পদার্থেই সকল জন্য পদার্থের অভেদ আছে। কারণ, গো মহিষ প্রভৃতি শৃঙ্গবিশিষ্ট দ্রব্যের যাহা মূল উপাদান, তাহাই যখন গর্দ্দভেরও মূল উপাদান এবং সেই মূল প্রকৃতি হইতে গো, মহিষ, গর্দ্দভ প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্যই অভিন্ন, তখন গর্দ্দভেও গো মহিষাদির অভেদ আছে, ইহাও স্বীকার্য্য। তাহা হইলে গো মহিষাদি দ্রব্যে শৃঙ্গ আছে, গর্দ্দভে শৃঙ্গ নাই, ইহা আর বলা যায় না। অতএব পূর্ব্বোক্ত মতানুসারে গর্দ্দভেও শৃঙ্গ আছে, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে গর্দ্দভ শৃঙ্গ অসৎ বলিয়াই তাহার উৎপত্তি হয় না, ইহা সৎকার্য্যবাদী সাংখ্যসম্প্রদায় বলিতে পারেন না। ফল কথা, সৎকার্য্যবাদী উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের অসত্তা পক্ষে যে উপাদান-কারণের নিয়মের অনুপপত্তিরূপ দোষ বলিয়াছেন, ঐ দোষ তাঁহার নিজমতেই হয়। কারণ, তাঁহার নিজমতে সকল জন্য পদার্থই সর্ব্বাত্মক বলিয়া সকল পদার্থেই সকল পদার্থ আছে। মৃত্তিকায় বস্ত্র নাই, সূত্রে ঘট নাই, বালুকায় তৈল নাই, ইত্যাদি কথা তিনি বলিতেই পারেন না। সুতরাং তাঁহার নিজমতে সকল পদার্থ হইতেই সকল পদার্থের আবির্ভাবের আপত্তি হয়। মৃত্তিকা হইতে বস্ত্রের আবির্ভাব, সূত্র হইতে ঘটের আবির্ভাব, বালুকা হইতে তৈলের আবির্ভাব কেন হয় না, ইহা সৎকার্য্যবাদী বলিতে পারেন না। "ন্যায়মঞ্জরী"কার জয়ন্ত ভট্টও প্রথমে বিচারপূর্ব্বক সৎ-কার্য্যবাদের মূল যুক্তি খণ্ডন করিয়া, শেষে পূর্ব্বোক্তরূপ আপত্তির সমর্থন করিয়াও সৎকার্য্য-বাদের অনুপপত্তি সমর্থন করিয়াছেন ("ন্যায়মঞ্জরী", ৪৯৩—৯৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। "ন্যায়বার্ত্তিকে" উদ্দ্যোতকর সৎকার্য্যবাদীদিগের বিভিন্ন মতের উল্লেখ করিতে বলিয়াছেন যে, সৎকার্য্যবাদীদিগের মধ্যে কেহ বলেন, সূত্রমাত্রই বস্ত্র, অর্থাৎ সূত্র হইতে বস্ত্র কোনরূপেই পৃথক্ দ্রব্য নহে। কেহ বলেন, আকৃতিবিশেষবিশিষ্ট সূত্রসমূহই বস্ত্র। কেহ বলেন, সূত্রসমূহই বস্ত্ররূপে অবস্থিত থাকে। অর্থাৎ সূত্রসমূহ সূত্ররূপে বস্ত্র হইতে ভিন্ন হইলেও বস্ত্ররূপে অভিন্ন। কেহ বলেন, সূত্র-সমূহ হইতে বস্ত্র নামে কোন দ্রব্যের আবির্ভাব হয় না, কিন্তু ঐ সূত্রেরই ধর্ম্মান্তরের আবির্ভাব ও ধর্ম্মান্তরের তিরোভাব মাত্র হয়। কেহ বলেন, শক্তিবিশেষবিশিষ্ট সূত্রসমূহই বস্ত্র। উদ্দ্যোতকর পূর্ব্বোক্ত সকল পক্ষেরই সমালোচনা করিয়া অনুপপত্তি সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু "সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদী"তে (নবম কারিকার টীকায়) অসৎকার্য্যবাদ সমর্থন করিতে শ্রীমদ্বাচস্পতিমিশ্র যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহার বিশেষ সমালোচনা "ন্যায়বার্ত্তিক" ও "তাৎপর্য্যটীকা"য় পাওয়া যায় না। বৈশেষিকাচার্য্য শ্রীধরভট্ট "ন্যায়কন্দলী" গ্রন্থে শ্রীমদ্বাচস্পতিমিশ্রোক্ত অনেক কথার উল্লেখ করিয়া সৎকার্য্যবাদ সমর্থনপূর্ব্বক বিস্তৃত বিচার দ্বারা ঐ মতের খণ্ডন করিয়াছেন। ("ন্যায়কন্দলী", ১৪৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকসম্প্রদায়ের ন্যায় মীমাংসকসম্প্রদায়ও সৎকার্য্যবাদ স্বীকার করেন নাই। পরিণামবাদী সাংখ্য, পাতঞ্জল ও বৈদান্তিকসম্প্রদায় সৎকার্য্যবাদ সমর্থন করিয়াই নিজসিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। মৃত্তিকাদি হইতে ঘটাদি দ্রব্যের আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতেই অর্থাৎ ঘটাদির জনক কুম্ভকারাদির ব্যাপারের পূর্ব্বেও ঘটাদি দ্রব্য থাকে, কারণের ব্যাপার দ্বারা মৃত্তিকাদি হইতে বিদ্যমান ঘটাদি দ্রব্যেরই আবির্ভাব হয়, তজ্জন্যই কারণ-ব্যাপার আবশ্যক,

এই মতই প্রধানতঃ "সৎকার্য্যবাদ" নামে কথিত হয়। এই মতে উপাদান-কারণ মৃত্তিকাদি দ্রব্য ও তাহার কার্য্য ঘটাদি দ্রব্য বস্তুতঃ অভিন্ন। কারণ, মৃত্তিকাদি দ্রব্যই ঘটাদি দ্রব্যরূপে পরিণত হয়। ফল কথা, উক্ত সৎকার্য্যবাদই পরিণামবাদের মূল। তাই পরিণামবাদী সকল সম্প্রদায়েই সৎকার্য্যবাদেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন এবং সৎকার্য্যবাদই তাঁহাদিগের মতে যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হওয়ায় তদনুসারে তাঁহারা পরিণামবাদেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। কারণ, সৎকার্য্যবাদই সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হইলে কার্য্যকে তাহার উপাদান-কারণের পরিণামই বলিতে হইবে। কিন্তু নৈয়ায়িক, বৈশেষিক ও মীমাংসকসম্প্রদায় উক্ত সৎকার্য্যবাদকে সিদ্ধান্ত বলিয়া গ্রহণ না করায় তাঁহারা পরিণামবাদ স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদিগের মতে উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য অসৎ। কারণের ব্যাপারের দ্বারা পূর্ব্বে অবিদ্যমান কার্য্যেরই উৎপত্তি হয়। এই মতের নাম "অসৎ-কার্য্যবাদ"। এই মতে মৃত্তিকাদি দ্রব্যে পূর্ব্বে ঘটাদি দ্রব্য থাকে না, মৃত্তিকাদি দ্রব্য হইতে তাহার কার্য্য ঘটাদি দ্রব্য অত্যন্ত ভিন্ন। সুতরাং এই মতে প্রথমে বিভিন্ন পরমাণুদ্বয়ের সংযোগে উহা হইতে ভিন্ন দ্ব্যণুক নামক অবয়বীর আরম্ভ বা উৎপত্তি হয়। পূর্ব্বোক্তরূপেই দ্ব্যণুকাদিক্রমে সমস্ত জন্য দ্রব্যের আরম্ভ বা সৃষ্টি হয়—এই মত "আরম্ভবাদ" নামে কথিত হইয়াছে। "অসৎকার্য্যবাদ"ই উক্ত "আরম্ভবাদে"র মূল। অসৎকার্য্যবাদই সিদ্ধান্তরূপে স্বীকার্য্য হইলে উক্ত আরম্ভবাদই স্বীকার করিতে হইবে, পরিণামবাদ কোনরূপেই সম্ভব হইবে না। পূর্ব্বোক্ত সৎকার্য্যবাদ ও অসৎকার্য্যবাদ, এই উভয় মতই সুপ্রাচীন কাল হইতে সমর্থিত হইতেছে। সুতরাং তন্মূলক পরিণামবাদ ও আরম্ভবাদও সুপ্রাচীন কাল হইতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে প্রতিষ্ঠিত আছে। দার্শনিক সম্প্রদায়ের অনুভবভেদেও ঐরূপ মতভেদ অবশ্যম্ভাবী। অসৎকার্য্যবাদী নৈয়ায়িক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের অনুভবমূলক প্রধান কথা এই যে, যেমন তিলের মধ্যে তৈল থাকে, ধান্যের মধ্যে তণ্ডুল থাকে, গাভীর স্তনের মধ্যে দুগ্ধ থাকে, তদ্রূপই মৃত্তিকার মধ্যে ঘটত্বরূপে ঘট থাকে, সূত্রের মধ্যে বস্ত্রত্বরূপে বস্ত্র থাকে, ইহা কোনরূপেই অনুভবসিদ্ধ হয় না। এই মৃত্তিকায় ঘট আছে, ইহা বুঝিয়াই কুম্ভকার ঘটনির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হয় না, কিন্তু এই মৃত্তিকায় ঘট হইবে, ইহা বুঝিয়াই ঘট নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হয়। এইরূপ এই সমস্ত সূত্রে বস্ত্র আছে, ইহা বুঝিয়াই তন্তুবায় বস্ত্রনির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হয় না, কিন্তু এই সমস্ত সূত্রে বস্ত্র হইবে, ইহা বুঝিয়াই বস্ত্র-নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হয়। সুতরাং মৃত্তিকায় ঘটোৎপত্তির পূর্ব্বে এবং সূত্রসমূহে বস্ত্রোৎপত্তির পূর্ব্বে ঘট ও বস্ত্র যে অসৎ, ইহাই বুদ্ধিসিদ্ধ বা অনুভবসিদ্ধ। মহর্ষি গোতমের "বুদ্ধিসিদ্ধন্তু তদসৎ" এই সূত্রের দ্বারাও সরলভাবে ঐ কথাই বুঝা যায়। পরন্তু কারণব্যাপারের পূর্ব্বেও যদি মৃত্তিকায় ঘট এবং তাহার আবির্ভাব, এই উভয়ই থাকে, তাহা হইলে আর কিসের জন্য কারণব্যাপার আবশ্যক হইবে? যদি কোনরূপেও পূর্ব্বে মৃত্তিকায় ঘটের অসত্তা স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে উহা সৎকার্য্যবাদ হইবে না। কারণ, মৃত্তিকায় ঘট কোনরূপে সৎ এবং কোনরূপে অসৎ, ইহাই সিদ্ধান্ত হইলে সদসদ্বাদ বা জৈনসম্প্রদায়-সম্মত "স্যাদ্বাদ"ই কেন স্বীকৃত হয় না? ফলকথা, সৎকার্য্যবাদ সমর্থন করিতে গেলে যদি সদসদ্বাদই আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে ঐ আগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া অসৎকার্য্যবাদই স্বীকার করিতে হইবে। নৈয়ায়িক প্রভৃতি আরম্ভবাদী সম্প্রদায়ের মতে উহাই বুদ্ধিসিদ্ধ॥ ৪৯॥

সূত্র। আশ্রয়-ব্যতিরেকাদ্বৃক্ষফলোৎপত্তিবদিত্য-হেতুঃ ॥৫০॥৩৯৩॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) আশ্রয়ের ভেদবশতঃ "বৃক্ষের ফলোৎপত্তির ন্যায়" ইহা অহেতু; অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত হেতু বা সাধক হয় না।

ভাষ্য। মূলসেকাদিপরিকর্ম্ম ফলঞ্চোভয়ং বৃক্ষাশ্রয়ং, কর্ম্ম চেহ শরীরে, ফলঞ্চামুত্রেত্যাশ্রয়ব্যতিরেকাদহেতুরিতি।

অনুবাদ। মূলসেকাদি পরিকর্ম্ম এবং ফল (পত্রাদি) উভয়ই বৃক্ষাশ্রিত, কিন্তু কর্ম্ম (অগ্নিহোত্র) এই শরীরে,—ফল (স্বর্গ) কিন্তু পরলোকে অর্থাৎ ভিন্ন দেহে জন্মে; অতএব আশ্রয়ের অর্থাৎ কর্ম্ম ও তাহার ফল স্বর্গের আশ্রয় শরীরের ভেদবশতঃ (পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত) অহেতু অর্থাৎ উক্ত সিদ্ধান্তের সাধক হয় না।

টিপ্পনী। অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের ফল কালান্তরীণ, এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে মহর্ষি পূর্ব্বে "প্রাঙ্‌নিষ্পত্তেঃ" ইত্যাদি (৪৬শ) সূত্রে বৃক্ষের ফলকে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, যেমন বৃক্ষের মূলসেকাদি কর্ম্ম কালান্তরে ঐ বৃক্ষের পত্র-পুষ্পাদি ফল উৎপন্ন করে, তদ্রূপ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মও তজ্জন্য অদৃষ্টবিশেষের দ্বারা কালান্তরে স্বর্গফল উৎপন্ন করে। মহর্ষি পরে তাঁহার কথিত "ফল"নামক প্রমেয় অর্থাৎ জন্য পদার্থমাত্রই যে, তাঁহার মতে উৎপত্তির পূর্ব্বে অসৎ, এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। এখন এই সূত্রের দ্বারা তাঁহার পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে দেহাত্মবাদী নাস্তিক মতানুসারে পূর্ব্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের ফলোৎপত্তি কালান্তরে হয়, এই সিদ্ধান্তে বৃক্ষের ফলোৎপত্তি দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। সুতরাং উহা ঐ সিদ্ধান্তের প্রতিপাদক হেতু বা সাধক হয় না। কেন হয় না? তাই বলিয়াছেন,—"আশ্রয়ব্যতিরেকাৎ"। অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের আশ্রয় শরীর এবং তাহার ফল স্বর্গের আশ্রয় শরীরের ব্যতিরেক(ভেদ)বশতঃ পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত উক্ত সিদ্ধান্তের সাধক হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, বৃক্ষের মূলসেকাদি পরিকর্ম্ম ও উহার ফল পত্রপুষ্পাদি সেই বৃক্ষেই জন্মে, সেই বৃক্ষই ঐ কর্ম্ম ও ফল, এই উভয়েরই আশ্রয়। কিন্তু অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম যে শরীরের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, সেই শরীরেই উহার ফল স্বর্গ জন্মে না, কালান্তরে ও ভিন্ন শরীরেই উহা জন্মে, ইহাই সিদ্ধান্ত বলা হইয়াছে। অতএব অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম ও উহার ফলের আশ্রয় শরীরের ভেদবশতঃ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম ও বৃক্ষের মূলসেকাদি কর্ম্ম তুল্য পদার্থ নহে। সুতরাং বৃক্ষের ফলোৎপত্তি অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের ফলোৎপত্তির দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। সুতরাং উহা হেতু অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের সাধক হয় না। পূর্ব্বোক্ত "প্রাঙ্‌নিষ্পত্তেঃ" ইত্যাদি (৪৬শ) সূত্রে "বৃক্ষফলবৎ" এইরূপ পাঠই সকল পুস্তকে আছে। বার্ত্তিকাদি গ্রন্থের দ্বারাও সেখানে ঐ পাঠই প্রকৃত বলিয়া বুঝা যায়। সুতরাং তদনুসারে এই সূত্রেও "বৃক্ষফলবৎ" এইরূপ পাঠই প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করা যায়। কিন্তু এখানে বার্ত্তিক, তাৎপর্য্যটীকা, তাৎপর্য্যপরিশুদ্ধি ও ন্যায়সূচী-

নিবন্ধ প্রভৃতি গ্রন্থে "বৃক্ষফলোৎপত্তিবৎ" এইরূপ পাঠই গৃহীত হওয়ায় ঐ পাঠই গৃহীত হইল। ভাষ্যে "অমুত্র" এই শব্দটি পরলোক বা জন্মান্তর অর্থের বোধক অব্যয়। ("প্রেত্যামুত্র ভবান্তরে"—অমরকোষ, অব্যয়বর্গ) ॥ ৫০ ॥

সূত্র। প্রীতেরাত্মাশ্রয়ত্বাদপ্রতিষেধঃ ॥৫১॥৩৭৪॥

অনুবাদ। (উত্তর) প্রীতির আত্মাশ্রিতত্ববশতঃ অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি সৎকর্ম্মের ফল প্রীতি বা সুখ আত্মাশ্রিত, এ জন্য প্রতিষেধ (পূর্ব্বসূত্রোক্ত প্রতিষেধ) হয় না।

ভাষ্য। প্রীতিরাত্মপ্রত্যক্ষত্বাদাত্মাশ্রয়া, তদাশ্রয়মেব কর্ম্ম ধর্ম্মসঙ্গিতং, ধর্ম্মস্যাত্মগুণত্বাৎ, তস্মাদাশ্রয়ব্যতিরেকানুপপত্তিরিতি।

অনুবাদ। আত্মপ্রত্যক্ষত্ববশতঃ প্রীতি (সুখ) আত্মাশ্রিত, ধর্ম্মনামক কর্ম্মও সেই আত্মাশ্রিত; কারণ, ধর্ম্ম আত্মার গুণ। অতএব আশ্রয়ভেদের উপপত্তি হয় না।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ব্বসূত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন করিতে এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বসূত্রোক্ত প্রতিষেধ হয় না। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত অহেতু বলিয়া, উহার হেতুত্ব বা সাধ্যসাধকত্বের যে প্রতিষেধ বলা হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। কারণ, প্রীতি আত্মাশ্রিত। আত্মা যাহার আশ্রয়, এই অর্থে বহুব্রীহি সমাসে সূত্রে "আত্মাশ্রয়" শব্দের দ্বারা বুঝা যায়—আত্মাশ্রিত অর্থাৎ আত্মগত বা আত্মাতে স্থিত। মহর্ষির তাৎপর্য্য এই যে, অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের ফল যে স্বর্গ, তাহা প্রীতি অর্থাৎ সুখপদার্থ। "আমি সুখী" এইরূপে আত্মাতে সুখের মানস প্রত্যক্ষ হওয়ায় সুখ আত্মাশ্রিত অর্থাৎ আত্মারই গুণ, ইহা সিদ্ধ হয়। আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন নিত্য, ইহা তৃতীয় অধ্যায়ে সমর্থিত হইয়াছে। সুতরাং যে আত্মা অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম করে, পরলোকপ্রাপ্ত সেই আত্মাতেই স্বর্গ নামক ফল জন্মে। ঐ আত্মার অনুষ্ঠিত অগ্নিহোত্রাদি সৎকর্ম্মজন্য যে ধর্ম্ম জন্মে, উহাও কর্ম্ম বলিয়া কথিত হয়। ঐ ধর্ম্ম নামক কর্ম্ম আত্মারই গুণ বলিয়া উহাও আত্মাশ্রিত। সুতরাং যে আত্মাতে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মজন্য ধর্ম্ম জন্মে, পরলোকে সেই আত্মাতেই ঐ ধর্ম্মের ফল স্বর্গনামক সুখবিশেষ জন্মে। অতএব স্বর্গফল ও উহার কারণ ধর্ম্ম একই আশ্রয়ে থাকায় ঐ উভয়ের আশ্রয়ের ভেদ নাই। ফলকথা, পূর্ব্বপক্ষবাদী শরীরকেই স্বর্গ ও উহার কারণ কর্ম্মের আশ্রয় বলিয়া, ইহকালে ও পরকালে শরীরের ভেদবশতঃ স্বর্গ ও কর্ম্মের আশ্রয়ভেদ বলিয়াছেন। কিন্তু শরীরাদি ভিন্ন যে নিত্য আত্মা সিদ্ধ হইয়াছে, তাহাতেই ধর্ম্ম ও তজ্জন্য স্বর্গফল জন্মে। সুতরাং আশ্রয়ের ভেদ না থাকায় পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্তের অনুপপত্তি নাই। এইরূপ যে আত্মাতে হিংসাদি পাপকর্ম্মজন্য যে অধর্ম্ম জন্মে, তাহাও পরলোকে সেই আত্মাতেই নরক নামক অপ্রীতি বা দুঃখবিশেষ

উৎপন্ন করে। প্রীতির ন্যায় অপ্রীতি অর্থাৎ দুঃখও আত্মগত গুণবিশেষ। সুতরাং উহার কারণ অধর্ম্ম নামক আত্মগুণ ও উহার ফল দুঃখ একই আশ্রয়ে থাকায় আশ্রয়ের ভেদ নাই ॥৫১॥

সূত্র। ন পুত্র-স্ত্রী-পশু-পরিচ্ছদ-হিরণ্যান্নাদিফল-নির্দ্দেশাৎ ॥৫২॥৩৯৫॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) না, অর্থাৎ প্রীতিকেই ফল বলিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রতিষেধের খণ্ডন করা যায় না, যেহেতু (শাস্ত্রে) পুত্র, স্ত্রী, পশু, পরিচ্ছদ (আচ্ছাদন), স্বর্ণ ও অন্ন প্রভৃতি ফলের নির্দ্দেশ আছে।

ভাষ্য। পুত্রাদি ফলং নির্দ্দিশ্যতে, ন প্রীতিঃ, 'গ্রামকামো যজেত', 'পুত্রকামো যজেতে'তি। তত্র যদুক্তং প্রীতিঃ ফলমিত্যেতদযুক্তমিতি।

অনুবাদ। পুত্র প্রভৃতি ফলরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, প্রীতি নির্দ্দিষ্ট হয় নাই (যথা)—"গ্রামকাম ব্যক্তি যাগ করিবে," "পুত্রকাম ব্যক্তি যাগ করিবে" ইত্যাদি। তাহা হইলে প্রীতিই ফল, এই যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা অযুক্ত।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ সমর্থন করিবার জন্য এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বসূত্রোক্ত উত্তরের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, প্রীতি আত্মাশ্রিত, ইহা বলিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রতিষেধের খণ্ডন করা যায় না। কারণ, সর্ব্বত্র প্রীতি বা সুখবিশেষই যজ্ঞাদি সকল সৎকর্ম্মের ফল নহে। পুত্র, স্ত্রী, পশু, পরিচ্ছদ, স্বর্ণ, অন্ন ও গ্রাম প্রভৃতিও শাস্ত্রে যাগবিশেষের ফলরূপে কথিত হইয়াছে। "পুত্রকাম ব্যক্তি পুত্রেষ্টি যাগ করিবে", "পশুকাম ব্যক্তি 'চিত্রা' যাগ করিবে", "গ্রামকাম ব্যক্তি 'সাংগ্রহণী' যাগ করিবে", ইত্যাদি বহু বৈদিক বিধিবাক্যের দ্বারা পুত্র, পশু ও গ্রাম প্রভৃতিই সেই সমস্ত যাগের ফল বলিয়া বুঝা যায়; প্রীতি বা সুখবিশেষই ঐ সমস্ত যাগের ফলরূপে ঐ সমস্ত বিধিবাক্যে নির্দ্দিষ্ট বা কথিত হয় নাই। কিন্তু পুত্র, পশু ও গ্রাম প্রভৃতি ঐ সমস্ত ফল আত্মাশ্রিত নহে। যেখানে পুত্রেষ্টি প্রভৃতি যাগের ফল পরজন্মেই উৎপন্ন হয়, সেখানে ঐ সমস্ত যাগের কর্ত্তা আত্মা পরজন্মে বিদ্যমান থাকিলেও সেই আত্মাতেই ঐ সমস্ত ফল উৎপন্ন হয় না। কারণ, ঐ পুত্রাদি ফল প্রীতির ন্যায় আত্মগত গুণপদার্থ নহে। কিন্তু ঐ পুত্রেষ্টি প্রভৃতি যাগজন্য যে ধর্ম্ম নামক অদৃষ্টবিশেষ উৎপন্ন হয় (যাহার দ্বারা জন্মান্তরেও ঐ পুত্রাদি ফল জন্মে), তাহা কিন্তু ঐ সমস্ত যাগের অনুষ্ঠাতা সেই আত্মাতেই জন্মে, ইহাই সিদ্ধান্ত বলা হইয়াছে। সুতরাং পুত্রেষ্টি প্রভৃতি যাগজন্য ধর্ম্ম ও উহার ফল পুত্রাদির আশ্রয়ের ভেদ হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত সংগত হয় না। একই আধারে কর্ম্ম ও তাহার ফল উৎপন্ন হইলে কারণ ও কার্য্যের একাশ্রয়ত্ব সম্ভব হয় এবং ঐরূপ স্থলেই কার্য্যকারণ ভাব কল্পনা করা যায় এবং বৃক্ষের ফলকে কর্ম্মফলের দৃষ্টান্তরূপেও উল্লেখ করা যায়। কারণ, যে বৃক্ষে মূলসেকাদি কর্ম্মজন্য পত্র-পুষ্পাদিজনক রসাদির উৎপত্তি হয়, সেই বৃক্ষেই

উহার ফল পত্রপুষ্পাদির উৎপত্তি হয়। কিন্তু পুত্রেষ্টি প্রভৃতি যাগজন্য ধর্ম্মবিশেষ যে আত্মাতে জন্মে, পুত্রাদি ফল সেই আত্মাতে জন্মে না, উহা প্রীতির ন্যায় আত্মধর্ম্ম নহে। অতএব যজ্ঞাদি কর্ম্মফলের কালান্তরীণত্ব পক্ষ সমর্থনের জন্য বৃক্ষের ফলকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া যেরূপ কার্য্য-কারণভাব কল্পনা করা হইয়াছে, তাহা উপপন্ন হইতে পারে না ॥৫২॥

সূত্র। তৎসম্বন্ধাৎ ফলনিষ্পত্তেস্তেষু ফলবদুপ-চারঃ ॥৫৩॥৩৯৩॥

অনুবাদ। (উত্তর) সেই পুত্রাদির সম্বন্ধপ্রযুক্ত ফলের (প্রীতির) উৎপত্তি হয়, এ জন্য সেই পুত্রাদিতে ফলের ন্যায় উপচার হইয়াছে, অর্থাৎ পুত্রাদি ফল না হইলেও ফলের সাধন বলিয়া ফলের ন্যায় কথিত হইয়াছে।

ভাষ্য। পুত্রাদিসম্বন্ধাৎ ফলং প্রীতিলক্ষণমুৎপদ্যত ইতি পুত্রাদিষু ফলবদুপচারঃ। যথাঽন্নে প্রাণশব্দো "অন্নং বৈ প্রাণা" ইতি।

অনুবাদ। পুত্রাদির সম্বন্ধপ্রযুক্ত প্রীতিরূপ ফল উৎপন্ন হয়; এ জন্য পুত্রাদিতে ফলের ন্যায় উপচার (প্রয়োগ) হইয়াছে, যেমন "অন্নং বৈ প্রাণাঃ" এই শ্রুতিবাক্যে অন্নে "প্রাণ"শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

টিপ্পনী। পূর্ব্বসূত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডন করিতে মহর্ষি, এই সূত্রের দ্বারা সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন যে, পুত্রাদিই পুত্রেষ্টি প্রভৃতি যাগের ফল নহে। পুত্রাদিজন্য প্রীতি বা সুখবিশেষই উহার ফল। কিন্তু পুত্রাদির সম্বন্ধপ্রযুক্তই ঐ ফলের উৎপত্তি হয়, নচেৎ উহা জন্মিতেই পারে না। এই জন্যই শাস্ত্রে পুত্রাদিতে ফলের ন্যায় উপচার হইয়াছে। অর্থাৎ ফলের সাধন বলিয়াই শাস্ত্রে পুত্রাদিও ফলের ন্যায় কথিত হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, স্বর্গ যেমন ভোগ্যরূপেই কাম্য, স্বরূপতঃ কাম্য নহে, তদ্রূপ পুত্রাদিও ভোগ্যরূপেই কাম্য, স্বরূপতঃ কাম্য নহে। কারণ, পুত্রাদিজন্য কোনই সুখভোগ না হইলে পুত্রাদি ব্যর্থ। কিন্তু পুত্রাদিজন্য সুখই ভোগ্য, পুত্রাদিস্বরূপ ভোগ্য নহে। অতএব পুত্রাদিজন্য সুখবিশেষই কাম্য হওয়ায় উহাই পুত্রেষ্টি প্রভৃতি যাগের মুখ্য ফল। পুত্রাদি পদার্থ উহার মুখ্য ফল হইতে পারে না। কিন্তু পুত্রাদি পদার্থ ঐ ফলের সাধন বলিয়া শাস্ত্রে পুত্রাদি পদার্থও ফলের ন্যায় কথিত হইয়াছে। ভাষ্যকার দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা সমর্থন করিতে শেষে বলিয়াছেন যে, যেমন "অন্নং বৈ প্রাণাঃ" এই শ্রুতিবাক্যে অন্নে "প্রাণ"শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, যেমন অন্ন পদার্থ বস্তুতঃ প্রাণ না হইলেও প্রাণের সাধন; কারণ, অন্ন ব্যতীত প্রাণরক্ষা হয় না; এ জন্য উক্ত শ্রুতি অন্নকে "প্রাণ" শব্দের দ্বারা প্রাণই বলিয়াছেন, তদ্রূপ পুত্রাদি-জন্য প্রীতিবিশেষ যাহা পুত্রেষ্টি প্রভৃতি যাগের ফল, তাহার সাধন পুত্রাদি পদার্থও বৈদিক বিধি-বাক্য-সমূহে ফলরূপে কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ প্রাণের সাধনকে যেমন প্রাণ বলা হইয়াছে, তদ্রূপ ফলের সাধনকে ফল বলা হইয়াছে। ইহাকে বলে ঔপচারিক প্রয়োগ। তাই মহর্ষি বলিয়াছেন,

"ফলবদুপচারঃ"। নানাবিধ নিমিত্তবশতঃ যে উপচার হয়, ইহা মহর্ষি নিজেও দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে বলিয়াছেন। তন্মধ্যে সাধনরূপ নিমিত্তবশতঃ অন্নে "প্রাণ" শব্দের উপচারও বলা হইয়াছে। (দ্বিতীয় খণ্ড, ৫০৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। মহর্ষি যে প্রয়োগ অর্থেও "উপচার" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহাও অন্যত্র ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার দ্বারা জানা যায়। মূল কথা এই যে, পুত্রাদিজন্য প্রীতি বা সুখবিশেষই পুত্রেষ্টি প্রভৃতি যাগের ফল, সুতরাং উহাও স্বর্গফলের ন্যায় আত্মাশ্রিত, অতএব পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ নিরস্ত হইয়াছে। কারণ, যজ্ঞাদি সৎকর্ম্মজন্য ধর্ম্ম-বিশেষ যে আত্মাতে জন্মে, সেই আত্মাতেই উহার ফল সুখবিশেষ জন্মে। উভয়ের আশ্রয়-ভেদ নাই ॥৫৩॥

ফল-পরীক্ষা-প্রকরণ সমাপ্ত ॥১২॥

ভাষ্য। ফলানন্তরং দুঃখমুদ্দিষ্টমুক্তঞ্চ "বাধনালক্ষণং দুঃখ"মিতি। তৎ কিমিদং প্রত্যাত্মবেদনীয়স্য সর্ব্বজন্তুপ্রত্যক্ষস্য সুখস্য প্রত্যাখ্যানমাহো স্বিদন্যঃ কল্প ইতি। অন্য ইত্যাহ, কথং? ন বৈ সর্ব্বলোকসাক্ষিকং সুখং শক্যং প্রত্যাখ্যাতুং, অয়ন্তু জন্মমরণপ্রবন্ধানুভবনিমিত্তাদ্দুঃখান্নির্ব্বিণ্ণস্য দুঃখং জিহাসতো দুঃখসংজ্ঞাভাবনোপদেশো দুঃখহানার্থ ইতি। কয়া যুক্ত্যা? সর্ব্বে খলু সত্ত্বনিকায়াঃ[1] সর্ব্বাণ্যুৎপত্তিস্থানানি সর্ব্বঃ পুনর্ভবো বাধনানুষক্তো দুঃখসাহচর্য্যাদ্বাধনালক্ষণং দুঃখমিত্যুক্তমৃষিভিঃ।

১। এখানে 'সত্ত্ব" শব্দের অর্থ জীব। (তৃতীয় খণ্ড. ২২শ পৃষ্ঠার পাদটিপ্পনী দ্রষ্টব্য)। "নিকায়" শব্দের দ্বারা সমানধর্ম্মী বা একজাতীয় জীবসমূহ বুঝা যায়। কিন্তু ঐ অর্থে "নিকায়" শব্দের প্রয়োগ করিলে তৎপূর্ব্বে জীববোধক "সত্ত্ব" শব্দ প্রয়োগ আবশ্যক হয় না। তথাপি ভাষ্যকার "সত্ত্বনিকায়াঃ" এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন এবং প্রথম অধ্যায়ের ১৯শ সূত্রের ভাষ্যেও বলিয়াছেন—"প্রাণভৃন্নিকায়ে," এবং এই আহ্নিকের সর্ব্বশেষ সূত্রের ভাষ্যেও "সত্ত্বনিকায়" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। সেখানে তাৎপর্য্যটীকাকার ঐ "নিকায়" শব্দের দ্বারা জাতি অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং তদনুসারে এখানেও "সত্ত্বনিকায়' শব্দের দ্বারা জীবজাতি বা একজাতীয় জীবকুল, এইরূপ অর্থই বুঝা যায়। ভাষ্যকার "নিকায়" শব্দের উক্তরূপ অর্থে তাৎপর্য্য গ্রহণের জন্যই তৎপূর্ব্বে জীববোধক "সত্ত্ব" শব্দের প্রয়োগ করিতে পারেন। (পরবর্ত্তী ৬৭ম সূত্রের ভাষ্য ও টিপ্পনী দ্রষ্টব্য)। কিন্তু ভাষ্যকার ন্যায়দর্শনের দ্বিতীয় সূত্রের ভাষ্যে জন্মের স্বরূপ ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—"নিকায়বিশিষ্টঃ প্রাদুর্ভাবঃ"। সেখানে "নিকায়" শব্দের অন্যরূপ অর্থ ব্যাখ্যাত হইয়াছে (প্রথম খণ্ড, ৯৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ভাষ্যকার পরবর্ত্তী (৫৪শ) সূত্রের ভাষ্যে "সংস্থান" শব্দের প্রয়োগ করায় জন্মের স্বরূপ ব্যাখ্যায় তিনি সংস্থান বা আকৃতিবিশেষ অর্থেই "নিকায়" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহাও মনে হয়। কিন্তু অভিধানে "নিকায়" শব্দের ঐ অর্থ পাওয়া যায় না। অন্যান্য অনেক দার্শনিক গ্রন্থকারও জন্মের লক্ষণ বলিতে "নিকায়" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। সুধীগণ পূর্ব্বোক্ত সমস্ত স্থলে "নিকায়" শব্দের যে অর্থ সংগত হয়, তাহা বিচার করিবেন। "নিকায়স্তু পুমান্ লক্ষ্যো সধর্ম্মিপ্রাণিসংহতৌ। সমুচ্চয়ে সংহতানাং নিলয়ে পরমাত্মনি"।—"মেদিনী," দ্বিতীয় কাণ্ড মনুষ্য কাণ্ড।

অনুবাদ। ফলের অনন্তর দুঃখ উদ্দিষ্ট হইয়াছে, এবং "বাধনালক্ষণ দুঃখ," ইহা অর্থাৎ দুঃখের ঐ লক্ষণ উক্ত হইয়াছে[১]।

(পূর্ব্বপক্ষবাদীর প্রশ্ন) সেই ইহা কি প্রত্যাত্মবেদনীয় (অর্থাৎ) সর্ব্বজীবের মানস প্রত্যক্ষের বিষয় সুখের প্রত্যাখ্যান, অথবা অন্য কল্প, অর্থাৎ সুখের প্রত্যাখ্যান নহে? (উত্তর) অন্য কল্প, ইহা (সূত্রকার মহর্ষি) বলিয়াছেন। অর্থাৎ মহর্ষি সুখের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নাই, ইহাই বুঝা যায়। (প্রশ্ন) কেন? (উত্তর) যেহেতু সর্ব্বলোকসাক্ষিক অর্থাৎ সর্ব্বজীবের মানস প্রত্যক্ষ যাহার প্রমাণ, এমন সুখকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারা যায় না। কিন্তু ইহা অর্থাৎ শরীরাদি ফলমাত্রকেই দুঃখ বলিয়া উল্লেখ, জন্মমরণপ্রবাহের প্রাপ্তিজন্য দুঃখ হইতে নির্ব্বিণ্ণ (অতএব) দুঃখপরিহারেচ্ছুর অর্থাৎ মুমুক্ষু মানবের দুঃখনিবৃত্ত্যর্থ (শরীরাদি পদার্থে) দুঃখ-সংজ্ঞারূপ ভাবনার উপদেশ। (প্রশ্ন) কোন্ যুক্তিবশতঃ? (উত্তর) যেহেতু সমস্ত জীবনিকায় সমস্ত উৎপত্তিস্থান অর্থাৎ সত্যলোক হইতে অবীচি পর্য্যন্ত চতুর্দ্দশ ভুবন এবং সমস্ত জন্ম দুঃখানুষক্ত অর্থাৎ দুঃখের সহিত নিয়ত সম্বন্ধবিশিষ্ট, দুঃখের সাহচর্য্যবশতঃ বাধনালক্ষণ দুঃখ অর্থাৎ দুঃখানুষক্ত বলিয়া পূর্ব্বোক্ত সমস্তই দুঃখ, ইহা ঋষিগণ বলিয়াছেন।

টিপ্পনী। মহর্ষি তাঁহার কথিত দশম প্রমেয় "ফলে"র পরীক্ষা করিয়া, ক্রমানুসারে এখানে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত একাদশ প্রমেয় "দুঃখে"র পরীক্ষা করিয়াছেন। ভাষ্যকার ইহা প্রকাশ করিতেই প্রথমে বলিয়াছেন যে, ফলের অনন্তর দুঃখ উদ্দিষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে প্রমেয়বিভাগসূত্রে (নবম সূত্রে) মহর্ষি ফলের পরে দুঃখের উদ্দেশ করায় ফলের পরীক্ষার পরে ক্রমানুসারে এখন দুঃখের পরীক্ষাই তাঁহার কর্ত্তব্য। কিন্তু সংশয় ব্যতীত পরীক্ষা হয় না। তাই ভাষ্যকার এখানে দুঃখের পরীক্ষাঙ্গ সংশয় সূচনা করিতে বলিয়াছেন যে, মহর্ষি প্রমেয়-বিভাগ-সূত্রে ফলের পরে দুঃখের উদ্দেশ করিয়া, পরে দুঃখের লক্ষণ বলিতে "বাধনালক্ষণং দুঃখং" এই সূত্রটি বলিয়াছেন। অর্থাৎ ঐ সূত্রের দ্বারা শরীরাদি সমস্তই দুঃখ, ইহা বলিয়াছেন (প্রথম খণ্ড, ১৯১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং প্রশ্ন হয় যে, মহর্ষি কি সর্ব্বজীবের মানস প্রত্যক্ষসিদ্ধ সুখ পদার্থকে একেবারে অস্বীকার করিয়াছেন অথবা সুখ পদার্থের অস্তিত্ব তাঁহার সম্মত? ভাষ্যকার এখানে

১। প্রথম অধ্যায়ে "বাধনালক্ষণং দুঃখং" (১।২১) এই সূত্রে "বাধনা" অর্থাৎ পীড়া যাহার লক্ষণ অর্থাৎ পীড়ার দ্বারা যাহার স্বরূপ লক্ষিত হয়, এই অর্থে "বাধনালক্ষণ" শব্দের দ্বারা মুখ্য দুঃখের লক্ষণ কথিত হইয়াছে। এবং যাহা "বাধনালক্ষণ" অর্থাৎ যাহা বাধনার (দুঃখের) সহিত অনুষক্ত, এই অর্থে উহার দ্বারা গৌণদুঃখের লক্ষণ কথিত হইয়াছে। শরীরাদি দুঃখানুষক্ত সমস্ত পদার্থই গৌণ দুঃখ। জয়ন্তভট্ট উক্ত সূত্রের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "ন্যায়মঞ্জরী", ৫০৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পূর্ব্বোক্তরূপ প্রশ্ন প্রকাশ করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ সংশয়েরই সূচনা করিয়াছেন। পরে নিজেই এখানে মহর্ষির অভিমত ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, মহর্ষি অন্য কল্পই বলিয়াছেন। অর্থাৎ সুখের অস্তিত্বই নাই, এই পক্ষ তাঁহার অভিমত নহে; সুখের অস্তিত্ব আছে, এই পক্ষই তাঁহার অভিমত। কারণ, সুখ সর্ব্বজীবের মানস প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুখের উৎপত্তি হইলে সকল জীবই মনের দ্বারা উহা প্রত্যক্ষ করে, সুতরাং উহার প্রত্যাখ্যান করিতে পারা যায় না। অর্থাৎ সুখের অস্তিত্বই নাই, ইহা কিছুতেই বলা যায় না। তবে মহর্ষি "বাধনালক্ষণং দুঃখং" এই সূত্রের দ্বারা শরীরাদি সমস্ত জন্য পদার্থকেই দুঃখ বলিয়াছেন কেন? তিনি সুখকেও যখন দুঃখ বলিয়াছেন, তখন তাঁহার মতে যে সুখের অস্তিত্ব আছে, ইহা আর কিরূপে বুঝিব? এতদুত্তরে শেষে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, মহর্ষি ঐ সূত্রের দ্বারা শরীরাদি পদার্থকে দুঃখ বলিয়া সুখের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নাই। উহা তাঁহার মুমুক্ষুর প্রতি শরীরাদি সকল পদার্থে দুঃখ ভাবনার উপদেশ। যিনি পুনঃ পুনঃ জন্মমরণপরম্পরার অনুভব অর্থাৎ প্রাপ্তিনিমিত্তক দুঃখ হইতে নির্ব্বিণ্ণ হইয়া একেবারে চিরকালের জন্য সর্ব্বদুঃখ পরিহারে ইচ্ছুক, সেই মুমুক্ষু ব্যক্তির আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি অর্থাৎ মুক্তি লাভের জন্যই মহর্ষি ঐরূপ উপদেশ করিয়াছেন। মুমুক্ষু, শরীরাদি পদার্থকে দুঃখ বলিয়া ভাবনা করিলে তাঁহার নির্ব্বেদ জন্মিবে, পরে উহারই ফলে তাঁহার বৈরাগ্য জন্মিবে, তাহার ফলে মোক্ষ জন্মিবে, ইহাই মহর্ষির চরম উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ শরীরাদি সকল পদার্থ ই যে, মহর্ষির মতে মুখ্য দুঃখ পদার্থ, সুখ বলিয়া কোন মুখ্য পদার্থ ই যে, তাঁহার মতে নাই, ইহা নহে। শরীরাদি পদার্থ যদি বস্তুতঃ দুঃখই না হয়, তবে মহর্ষি কেন ঐ সমস্ত পদার্থকে দুঃখ বলিয়াছেন? মহর্ষি কোন্ যুক্তিবশতঃ শরীরাদি পদার্থকে দুঃখ বলিয়া উহাতে মুমুক্ষুর দুঃখ ভাবনার উপদেশ করিয়াছেন? এতদুত্তরে শেষে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, সমস্ত জীবকুল এবং সমস্ত ভুবন এবং জীবের সমস্ত জন্মই দুঃখানুষক্ত অর্থাৎ দুঃখের সহিত নিয়ত সম্বন্ধযুক্ত, একেবারে দুঃখশূন্য কোন জন্মাদি নাই। সুতরাং দুঃখের সাহচর্য্য (দুঃখের সহিত নিয়ত সম্বন্ধ)বশতঃ "বাধনালক্ষণ দুঃখ" অর্থাৎ দুঃখানুষক্ত বলিয়া শরীরাদি সমস্তই দুঃখ, ইহা ঋষিগণ বলিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে, শরীরাদি সমস্ত পদার্থ বস্তুতঃ মুখ্য দুঃখপদার্থ না হইলেও দুঃখানুষক্ত, এই জন্যই ঋষিগণ ঐ সমস্ত পদার্থকে দুঃখ বলিয়াছেন। শরীরাদি সমস্ত পদার্থে মুমুক্ষুর দুঃখসংজ্ঞা ভাবনাই ঐ উক্তির উদ্দেশ্য এবং আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিই উহার চরম উদ্দেশ্য। শরীরাদি পদার্থকে দুঃখ বলিয়া ভাবনার নামই দুঃখসংজ্ঞা ভাবনা। বস্তুতঃ শরীর দুঃখের আয়তন, এবং ইন্দ্রিয়াদি দুঃখের সাধন এবং সুখ দুঃখানুষক্ত, এই জন্যই শরীরাদি পদার্থ দুঃখ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ন্যায়বার্ত্তিকের প্রারম্ভে উদ্দ্যোতকর গৌণ ও মুখ্যভেদে একবিংশতি প্রকার দুঃখ বলিয়া ঐ সমস্ত দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিকেই মুক্তি বলিয়াছেন। তন্মধ্যে যাহা "আমি দুঃখী" এইরূপে সর্ব্বজীবের মানস প্রত্যক্ষসিদ্ধ, যাহা "প্রতিকূলবেদনীয়" বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহাই স্বরূপতঃ দুঃখ অর্থাৎ মুখ্য দুঃখ। শরীরাদি বিংশতি প্রকার পদার্থ গৌণদুঃখ। তন্মধ্যে শরীর দুঃখের আয়তন, শরীর ব্যতীত কাহারই দুঃখ জন্মিতে পারে না, শরীরাবচ্ছেদেই জীবের দুঃখ ও তাহার ভোগ জন্মে, এই জন্যই শরীরকে দুঃখ বলা হইয়াছে। এইরূপ ঘ্রাণাদি ষড়িন্দ্রিয় ও তজ্জন্য ষড়্‌বিধ বুদ্ধি

এবং ঐ বুদ্ধির ষড়্‌বিধ বিষয়, এই অষ্টাদশ পদার্থ দুঃখের সাধন বলিয়াই দুঃখ বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং সুখ, দুঃখানুষক্ত অর্থাৎ দুঃখসম্বন্ধশূন্য সুখ নাই, সুখমাত্রেই দুঃখানুবিদ্ধ, এই জন্য সুখকেও দুঃখ বলা হইয়াছে। তাৎপর্য্যটীকাকার উদ্দ্যোতকরোক্ত ষড়্‌বিধ ইন্দ্রিয়ের ব্যাখ্যায় মনকে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলিয়া ষড়্‌বিধ বিষয়ের ব্যাখ্যায় ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্ন নামক আত্মগুণত্রয়কে মনের বিষয় বলিয়াছেন। অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য গন্ধাদি পঞ্চবিধ বিষয় এবং মনোগ্রাহ্য ইচ্ছা, দ্বেষ ও প্রযত্ন, এই গুণত্রয়কে মনোগ্রাহ্য বিষয়রূপে গ্রহণ করিয়া উদ্দ্যোতকর ষড়্‌বিধ বিষয় বলিয়াছেন। বুদ্ধিও মনোগ্রাহ্য বিষয় হইলেও ষড়্‌বিধ বুদ্ধি বলিয়া উহার পৃথক্ উল্লেখ করিয়াছেন। কারণ, বুদ্ধি না বলিয়া বুদ্ধির বিষয় বলা যায় না। সুখও মনোগ্রাহ্য বিষয় হইলেও উহা অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় দুঃখের সাধন বলিয়া দুঃখ নহে, কিন্তু দুঃখানুষক্ত বলিয়াই উহা দুঃখ বলিয়া কথিত হইয়াছে। তাই সুখের পৃথক্ উল্লেখ করিয়াছেন। উদ্দ্যোতকর বিশেষ করিয়া পূর্ব্বোক্তরূপ একবিংশতি প্রকার দুঃখ বলিলেও এখানে তিনিও ভাষ্যকারের ন্যায় সমস্ত ভুবনকেই দুঃখানুষক্ত বলিয়া দুঃখ বলিয়াছেন। মূলকথা, মহর্ষি শরীরাদি পদার্থকে দুঃখ বলিলেও তিনি সুখের অস্তিত্বের অপলাপ করেন নাই। সুখ আছে, কিন্তু উহা দুঃখানুষক্ত বলিয়া বিবেকীর পক্ষে দুঃখ, বিবেকী মুমুক্ষু উহাকে দুঃখ বলিয়াই ভাবনা করিবেন, এইরূপ উপদেশ করিতেই মহর্ষি সুখকেও দুঃখ বলিয়াছেন। সুখ দুঃখানুষক্ত, অর্থাৎ সুখে দুঃখের অনুষঙ্গ আছে। সুখে দুঃখের অনুষঙ্গ কি, তাহা উদ্দ্যোতকর চারি প্রকারে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রথম অধ্যায়ে তাহা লিখিত হইয়াছে (প্রথম খণ্ড, ৮৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

ভাষ্য। দুঃখসংজ্ঞাভাবনমুপদিশ্যতে, অত্র চ হেতুরুপাদীয়তে।

অনুবাদ। দুঃখসংজ্ঞা-ভাবনা উপদিষ্ট হইয়াছে—এই বিষয়ে (মহর্ষি কর্ত্তৃক) হেতুও গৃহীত হইয়াছে, অর্থাৎ মহর্ষি নিজেই পরবর্ত্তী সূত্রের দ্বারা উক্ত বিষয়ে হেতু বলিয়াছেন।

সূত্র। বিবিধবাধনাযোগাদ্দুঃখমেব জন্মোৎপত্তিঃ॥ ॥৫৪॥৩৯৭॥

অনুবাদ। নানাপ্রকার দুঃখের সম্বন্ধপ্রযুক্ত জন্মের অর্থাৎ শরীরাদির উৎপত্তি দুঃখই।

ভাষ্য। জন্ম জায়ত ইতি শরীরেন্দ্রিয়বুদ্ধয়ঃ। শরীরাদীনাং সংস্থান-বিশিষ্টানাং প্রাদুর্ভাব উৎপত্তিঃ। বিবিধা চ বাধনা—হীনা মধ্যমা উৎকৃষ্টা চেতি। উৎকৃষ্টা নারকিণাং, তিরশ্চান্তু মধ্যমা, মনুষ্যাণাং হীনা, দেবানাং হীনতরা বীতরাগাণাঞ্চ। এবং সর্ব্বমুৎপত্তিস্থানং বিবিধবাধনানুষক্তং পশ্যতঃ সুখে তৎসাধনেষু চ শরীরেন্দ্রিয়বুদ্ধিষু দুঃখসংজ্ঞা ব্যবতিষ্ঠতে।

দুঃখসংজ্ঞাব্যবস্থানাৎ সর্ব্বলোকেষ্বনভিরতিসংজ্ঞা ভবতি। অনভিরতি-সংজ্ঞামুপাসীনস্য সর্ব্বলোকবিষয়া তৃষ্ণা বিচ্ছিদ্যতে, তৃষ্ণাপ্রহাণাৎ সর্ব্ব-দুঃখাদ্বিমুচ্যত ইতি। যথা বিষযোগাৎ পয়ো বিষমিতি বুধ্যমানো নোপা-দত্তে, অনুপাদদানো মরণদুঃখং নাপ্নোতি।

অনুবাদ। জন্মে অর্থাৎ উৎপন্ন হয়—এ জন্য জন্ম বলিতে শরীর, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি। আকৃতিবিশেষবিশিষ্ট শরীরাদির প্রাদুর্ভাব উৎপত্তি, এবং বিবিধ বাধনা,—হীন, মধ্যম ও উৎকৃষ্ট। নারকীদিগের উৎকৃষ্ট, পশ্বাদির কিন্তু মধ্যম, মনুষ্যদিগের হীন, দেবগণের এবং বীতরাগ ব্যক্তিদিগের হীনতর। এইরূপে সমস্ত উৎপত্তিস্থান অর্থাৎ সমস্ত ভুবনকেই[১] বিবিধ দুঃখানুষক্ত বুঝিলে তখন তাহার সুখে এবং সেই সুখের সাধন শরীর, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিবিষয়ে দুঃখসংজ্ঞা ব্যবস্থিত হয়, অর্থাৎ ঐ সমস্ত দুঃখই, এইরূপ জ্ঞান জন্মে। দুঃখসংজ্ঞার ব্যবস্থাপ্রযুক্ত সর্ব্বলোকে অর্থাৎ সত্যলোক প্রভৃতি সর্ব্ব স্থানেই অনভিরতিসংজ্ঞা (নির্ব্বেদ) জন্মে। অনভিরতি-সংজ্ঞা অর্থাৎ নির্ব্বেদকে উপাসনা করিলে তাহার সর্ব্বলোকবিষয়ক তৃষ্ণা বিচ্ছিন্ন হয়। তৃষ্ণার নিবৃত্তিপ্রযুক্ত অর্থাৎ বৈরাগ্যপ্রযুক্ত সর্ব্বদুঃখ হইতে বিমুক্ত হয়। যেমন বিষযোগবশতঃ দুগ্ধ বিষ, ইহা বোধ করতঃ তজ্জন্য (ঐ বিষযুক্ত দুগ্ধকে) গ্রহণ করে না, গ্রহণ না করায় মরণ-দুঃখ প্রাপ্ত হয় না।

টিপ্পনী। ভাষ্যকার, মহর্ষির সূত্রের দ্বারা তাঁহার পূর্ব্বোক্ত কথার সমর্থন করিবার জন্য এই সূত্রের অবতারণা করিতে প্রথমে বলিয়াছেন যে, শরীরাদি পদার্থে যে হেতুবশতঃ ঋষিগণ দুঃখ-ভাবনার উপদেশ করিয়াছেন, তাহা মহর্ষি গোতম এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন। অর্থাৎ পূর্ব্বে মহর্ষি গোতমের যে তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়াছি, তাহা তাঁহার এই সূত্রের দ্বারাই স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে কোন সংশয় হইতে পারে না। ভাষ্যকার সূত্রোক্ত "জন্মন্" শব্দের দ্বারা "জায়তে" অর্থাৎ যাহা জন্মে, এইরূপ ব্যুৎপত্তিবশতঃ শরীর, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিকেই প্রধানতঃ গ্রহণ করিয়াছেন। আকৃতিবিশেষবিশিষ্ট ঐ শরীরাদির যে প্রাদুর্ভাব, তাহাই উহার উৎপত্তি। অর্থাৎ সূত্রে "জন্মোৎপত্তি" শব্দের দ্বারা এখানে বুঝিতে হইবে—শরীর, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির উৎপত্তি। জীবের শরীর, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির উৎপত্তি হইলেই তাহার "জন্মোৎপত্তি" বলা যায় এবং তখন হইতেই জীবের নানাবিধ দুঃখযোগ হয়। সুতরাং জীবের জন্মোৎপত্তি বিবিধ দুঃখানুষক্ত বলিয়া দুঃখই, ইহা মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন। সূত্রোক্ত বিবিধ বাধনার ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার সংক্ষেপে হীন, মধ্যম ও উৎকৃষ্ট, এই তিন প্রকার বাধনা বলিয়াছেন। উহার দ্বারা হীনতর

১। ভুবনের বিস্তার সপ্তলোক। যোগদর্শনের বিভূতিপাদের "ভুবনজ্ঞানং সূর্য্যে সংযমাৎ" এই (২৬শ) সূত্রের ব্যাসভাষ্যে সপ্তলোকের বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

প্রভৃতি আরও বহুপ্রকার বাধনা বুঝিতে হইবে। "বাধনা" শব্দের অর্থ দুঃখ। "বাধনা", "পীড়া", "তাপ" ইত্যাদি দুঃখবোধক পর্য্যায় শব্দ। জীব মাত্রেরই কোন প্রকার দুঃখ অবশ্যই আছে। তন্মধ্যে যাহারা নরক ভোগ করিতেছে, তাহাদিগের দুঃখ উৎকৃষ্ট অর্থাৎ সর্ব্ববিধ দুঃখ হইতে উৎকর্ষবিশিষ্ট বা অধিক। কারণ, নরকের অধিক আর কোন দুঃখ নাই। পশ্বাদির দুঃখ মধ্যম। মনুষ্যদিগের দুঃখ হীন অর্থাৎ নারকী ও পশ্বাদির দুঃখ হইতে অল্প। দেবগণ ও বীতরাগ ব্যক্তিদিগের দুঃখ হীনতর, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত নারকী হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সর্ব্বজীবের দুঃখ হইতে অল্প। ফলকথা, সর্ব্বলোকে সর্ব্বজীবেরই কোন না কোন প্রকার দুঃখ আছে। যে জীবের জন্ম অর্থাৎ শরীর, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার দুঃখ অবশ্যম্ভাবী। সত্যলোক প্রভৃতি উর্দ্ধলোকেও ঐ জীবের দুঃখভোগ করিতে হয়। কারণ, দুঃখের নিদান উচ্ছিন্ন না হইলে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি কোন স্থানে কোন জীবেরই হইতে পারে না। এইরূপে জীবের সমস্ত উৎপত্তিস্থান অর্থাৎ সমস্ত ভুবনকেই যিনি বিবিধ দুঃখানুষক্ত বলিয়া বুঝেন, তখন তাঁহার সুখ ও সুখসাধন শরীরাদিতে এই সমস্ত দুঃখই, এইরূপ জ্ঞান জন্মে। তাহার ফলে সত্যলোকাদি সর্ব্বলোকেই অনভিরতি-সংজ্ঞা অর্থাৎ নির্ব্বেদ জন্মে। ঐ নির্ব্বেদকে অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমে উহার ফলে সত্যলোকাদি সর্ব্বলোক বিষয়েই তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয় অর্থাৎ বৈরাগ্য জন্মে[১]। ঐ বৈরাগ্যপ্রযুক্ত সর্ব্বদুঃখ হইতে মুক্তি হয়। বিষমিশ্রিত দুগ্ধকে বিষ বলিয়া বুঝিলে যেমন বিজ্ঞ ব্যক্তি উহা গ্রহণ করেন না, গ্রহণ না করায় তখন তিনি মরণ-দুঃখ প্রাপ্ত হন না, তদ্রূপ দুঃখানুষক্ত সর্ব্ববিধ সুখকেই দুঃখ বলিয়া বুঝিলে সুখে বৈরাগ্যবশতঃ মুমুক্ষু—সুখকেও পরিত্যাগ করেন, অর্থাৎ তিনি আর সুখের সাধন কিছুই গ্রহণ করেন না, তাই তিনি সর্ব্বদুঃখ হইতে মুক্তি লাভ করেন। তাৎপর্য্য এই যে, বৈরাগ্য ব্যতীত কখনই কাহারও আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হইতে পারে না। কারণ, সুখভোগে অভিলাষ জন্মিলে ঐ সুখের সাধন শরীরাদি সকল বিষয়েই অভিলাষ জন্মিবে। কিন্তু যে কোন সুখভোগ করিতে হইলেই দুঃখভোগ অনিবার্য্য। দুঃখকে পরিত্যাগ করিয়া কুত্রাপি কোন প্রকার সুখভোগ করা যায় না। সুতরাং সুখ ও তাহার সাধন সর্ব্ববিষয়ে বৈরাগ্য জন্মিলেই আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ মুক্তি হইতে পারে। শরীরাদি পদার্থে দুঃখসংজ্ঞা অর্থাৎ দুঃখবুদ্ধিরূপ ভাবনা—ঐ বৈরাগ্যলাভের উপায়। কারণ, যাহা দুঃখ বলিয়া বুঝা যায়, তাহাতে বাসনার নিবৃত্তি হয়। সুতরাং মহর্ষি মুমুক্ষুর প্রতি পূর্ব্বোক্তরূপ দুঃখভাবনার উপদেশের জন্যই শরীরাদি পদার্থকে দুঃখ বলিয়াছেন, তিনি উহার দ্বারা সুখের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নাই, ইহা তাঁহার এই সূত্রের দ্বারা বুঝা যায় ॥৫৪॥

ভাষ্য। দুঃখোদ্দেশস্তু ন সুখস্য প্রত্যাখ্যানং, কস্মাৎ?

১। সুখসাধন বিষয়ে—ইহাতে আমার কোন প্রয়োজন নাই, এইরূপ বুদ্ধিই এখানে নির্ব্বেদ। উহার অপর নাম অনভিরতিসংজ্ঞা। ভোগ্য বিষয় স্বয়ং উপস্থিত হইলেও তাহাতে যে উপেক্ষা-বুদ্ধি, তাহাই এখানে বৈরাগ্য। প্রথমে নির্ব্বেদ, তাহার পরে বৈরাগ্য। প্রথম অধ্যায়ে "বাধনালক্ষণং দুঃখং" এই সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার এইরূপই বলিয়াছেন। সেখানে তাৎপর্য্যটীকাকার নির্ব্বেদ ও বৈরাগ্যের উক্তরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন।

অনুবাদ। দুঃখের উদ্দেশ কিন্তু সুখের প্রত্যাখ্যান নহে, (প্রশ্ন) কেন ?

সূত্র। ন সুখস্যাপ্যন্তরালনিষ্পত্তেঃ ॥৫৫॥৩৯৮॥

অনুবাদ। (উত্তর) না, অর্থাৎ প্রথম অধ্যায়ে প্রমেয়-বিভাগ-সূত্রে প্রমেয়-মধ্যে সুখের উল্লেখ না করিয়া দুঃখের যে উদ্দেশ করা হইয়াছে, তাহা সুখের প্রত্যাখ্যান নহে। কারণ, অন্তরালে অর্থাৎ দুঃখের মধ্যে সুখেরও উৎপত্তি হয়।

ভাষ্য। ন খল্বয়ং দুঃখোদ্দেশঃ সুখস্য প্রত্যাখ্যানং, কস্মাৎ ? সুখস্যাপ্যন্তরালনিষ্পত্তেঃ। নিষ্পদ্যতে খলু বাধনান্তরালেষু সুখং প্রত্যাত্ম-বেদনীয়ং শরীরিণাং, তদশক্যং প্রত্যাখ্যাতুমিতি।

অনুবাদ। এই দুঃখোদ্দেশ অর্থাৎ প্রমেয়-বিভাগ-সূত্রে দুঃখের উদ্দেশ, সুখের প্রত্যাখ্যান নহে, (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) যেহেতু অন্তরালে সুখেরও উৎপত্তি হয়। বিশদার্থ এই যে, দুঃখের মধ্যে মধ্যে সমস্ত দেহীর প্রত্যাত্মবেদনীয় অর্থাৎ সর্ব্বজীবের মনোগ্রাহ্য সুখও উৎপন্ন হয়, সেই সুখ প্রত্যাখ্যান করিতে পারা যায় না।

টিপ্পনী। পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতে পারেন যে, যদি শরীরাদি পদার্থকে দুঃখ বলিয়া ভাবনাই কর্ত্তব্য হয়, তাহা হইলে ঐ সমস্ত পদার্থকে স্বরূপতঃ দুঃখই কেন বলা যায় না ? সুখ পদার্থের অস্তিত্ব স্বীকারের প্রমাণ কি আছে ? পরন্তু মহর্ষি গোতম প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের নবম সূত্রে যে, আত্মা প্রভৃতি দ্বাদশবিধ প্রমেয়ের উদ্দেশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে তিনি সুখের উদ্দেশ না করিয়া দুঃখের উদ্দেশ করিয়াছেন। তদ্দ্বারা উহা যে তাঁহার সুখপদার্থের প্রত্যাখ্যান, অর্থাৎ তিনি যে সুখপদার্থের অস্তিত্বই অস্বীকার করিয়াছেন, ইহাও অবশ্য বুঝিতে পারা যায়। কারণ, তিনি সুখের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে প্রমেয় পদার্থের মধ্যে দুঃখের ন্যায় সুখেরও উল্লেখ করিতেন। মহর্ষি এই জন্যই শেষে এই সূত্রের দ্বারা স্পষ্ট করিয়া তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। ভাষ্য-কারের ব্যাখ্যানুসারে মহর্ষির তাৎপর্য্য এই যে, প্রথম অধ্যায়ে প্রমেয়-বিভাগ-সূত্রে সুখের উল্লেখ না করিয়া যে দুঃখের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা সুখের প্রত্যাখ্যান বা নিষেধ নহে। কারণ, সর্ব্ব-জীবেরই দুঃখের মধ্যে সুখেরও উৎপত্তি হয়। সর্ব্বজীবের মনোগ্রাহ্য ঐ সুখপদার্থের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। দুঃখের মধ্যে মধ্যে যে সর্ব্বজীবের সুখও জন্মে, ইহা সকলেরই মানস প্রত্যক্ষসিদ্ধ সত্য। ঐ সত্যের অপলাপ কোনরূপেই করা যাইতে পারে না। কিন্তু ঐ সুখের পূর্ব্বে ও পরে অবশ্যই দুঃখ আছে, দুঃখসম্বন্ধশূন্য কোন সুখই নাই। এই জন্যই যাঁহারা মুমুক্ষু, তাঁহারা সুখকেও দুঃখ বলিয়া ভাবনা করিবেন। তাই মুমুক্ষুর অত্যাবশ্যক তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় প্রমেয় পদার্থের উল্লেখ করিতে তন্মধ্যে মহর্ষি সুখের উল্লেখ করেন নাই। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য প্রথম অধ্যায়েও ব্যক্ত করা হইয়াছে (প্রথম খণ্ড, ১৬৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) ॥৫৫॥

ভাষ্য। অথাপি—

সূত্র। বাধনাঽনিবৃত্তের্ব্বেদয়তঃ পর্য্যেষণদোষাদপ্রতিষেধঃ ॥৫৬॥৩৯১॥

অনুবাদ। পরন্তু বেদন বা জ্ঞানবিশিষ্ট জীবের অর্থাৎ ভোগ্য বিষয়ের সুখসাধনত্ব-বোদ্ধা সর্ব্বজীবেরই প্রার্থনার দোষবশতঃ দুঃখের নিবৃত্তি না হওয়ায় (পূর্ব্বোক্ত দুঃখভাবনার উপদেশ হইয়াছে), সুখের প্রতিষেধ হয় নাই অর্থাৎ দুঃখমাত্রের উদ্দেশের দ্বারা সুখের প্রতিষেধ করা হয় নাই।

ভাষ্য। সুখস্য, দুঃখোদ্দেশেনেতি প্রকরণাৎ। পর্য্যেষণং প্রার্থনা, বিষয়ার্জ্জনতৃষ্ণা। পর্য্যেষণস্য দোষো যদয়ং বেদয়মানঃ প্রার্থয়তে, তস্য প্রার্থিতং ন সম্পদ্যতে, সম্পদ্য বা বিপদ্যতে, ন্যূনং বা সম্পদ্যতে, বহু প্রত্যনীকং বা সম্পদ্যত ইতি। এতস্মাৎ পর্য্যেষণদোষান্নানাবিধো মানসঃ সন্তাপো ভবতি। এবং বেদয়তঃ পর্য্যেষণদোষাদ্বাধনায়া অনিবৃত্তিঃ। বাধনাঽনিবৃত্তের্দুঃখসংজ্ঞাভাবনমুপদিশ্যতে। অনেন কারণেন দুঃখং জন্ম, ন সুখস্যাভাবাদিতি। অথাপ্যেতদনূক্তং—

"কামং কাময়মানস্য যদা কামঃ সমৃধ্যতি।
অথৈনমপরঃ কামঃ ক্ষিপ্রমেব প্রবাধতে[১] ॥"

"অপি চেদুদনেমি সমন্তাদ্ভূমিং লভতে সগবাশ্বাং
ন স তেন ধনেন ধনৈষী তৃপ্যতি কিন্নু সুখং ধনকামে"[২] ইতি।

১। "কামং" কাময়মানস্য যদা কামঃ "সমৃধ্যতি" সম্পন্নো ভবতি, "অথ" অনন্তরং এনং পুরুষমপরঃ কাম ইচ্ছা ক্ষিপ্রং বাধতে। স্বর্গাদিপ্রাপ্তাবপি স্বারাজ্যাদি কাময়তে, এবং তৎপ্রাপ্তৌ প্রাজাপত্যাদীতি অন্যেচ্ছা-তদুপায়প্রার্থনাদিনা দুঃখেন প্রবাধত ইত্যর্থঃ।—তাৎপর্য্যটীকা। "কাম্যতে" অর্থাৎ যাহা কামনার বিষয় হয়, এই অর্থে "কাম" শব্দের দ্বারা কাম্য বস্তুও বুঝা যায়। ইচ্ছামাত্র অর্থেও "কাম" শব্দের ভূরি প্রয়োগ আছে। "যদা সর্ব্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেঽস্য হৃদি স্থিতাঃ" ইত্যাদি (উপনিষৎ)। "বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্" ইত্যাদি (গীতা)। "ন জাতু কামঃ কামানাং" ইত্যাদি (মনুসংহিতা) দ্রষ্টব্য। কিন্তু "ন্যায়কন্দলী"কার শ্রীধর ভট্ট লিখিয়াছেন যে, কেবল "কাম" শব্দ মৈথুনেচ্ছারই বাচক। (ন্যায়কন্দলী, ২৬২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। শ্রীধর ভট্টের ঐ কথা স্বীকার করা যায় না।

২। "অপি চেদুদনেমি" ইত্যাদি বাক্যটি কোন প্রাচীন বাক্য বলিয়াই বুঝা যায়। "উদনেমিং" এইরূপ পাঠান্তরও আছে। ঐ পাঠে "উদনেমিং সমুদ্রপর্য্যন্তাং ভূমিং লভতে" এইরূপ ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে লিখিয়াছেন, "সমন্তাদুদনেমি যথা ভবতি তথা ভূমিং লভতে ইতি যোজনা"। সুতরাং তাঁহার ব্যাখ্যানুসারে "উদনেমি" এই পদটি ক্রিয়াবিশেষণ পদ বুঝা যায়। "উদকং নেমির্যত্র" এইরূপ বিগ্রহ করিলে উহার দ্বারা সমুদ্র পর্য্যন্ত, এইরূপ অর্থই বিবক্ষিত বুঝা যায়। "উদক" শব্দের দ্বারা সমুদ্রই বিবক্ষিত। "নেমি" শব্দের প্রান্ত বা পরিধি অর্থও কোষে কথিত আছে। "চক্রং রথাঙ্গং তস্যান্তে নেমিঃ স্ত্রী স্যাৎ প্রধিঃ পুমান্।"—অমরকোষ। "রঘুবংশের ১ম সর্গের ১৭শ শ্লোকের মল্লিনাথ টীকা দ্রষ্টব্য।

অনুবাদ। সুখের (প্রতিষেধ হয় নাই)। 'দুঃখের উদ্দেশের দ্বারা' ইহা প্রকরণবশতঃ বুঝা যায়। "পর্য্যেষণ" বলিতে প্রার্থনা (অর্থাৎ) বিষয়ার্জ্জনে আকাঙ্ক্ষা। প্রার্থনার দোষ যে, এই জীব "বেদয়মান" হইয়া অর্থাৎ কোন বিষয়কে সুখসাধন বলিয়া বোধ করতঃ প্রার্থনা করে, (কিন্তু) তাহার প্রার্থিত বস্তু সম্পন্ন হয় না। অথবা সম্পন্ন হইয়া বিনষ্ট হয়, অথবা ন্যূন সম্পন্ন হয়, অথবা বহু বিঘ্নযুক্ত হইয়া সম্পন্ন হয়। এই প্রার্থনা-দোষবশতঃ নানাবিধ মানস দুঃখ জন্মে। এইরূপে বিষয়ের সুখসাধনত্ববোদ্ধা জীবের প্রার্থনা-দোষবশতঃ দুঃখের নিবৃত্তি হয় না। দুঃখের নিবৃত্তি না হওয়ায় দুঃখসংজ্ঞারূপ ভাবনা উপদিষ্ট হইয়াছে। এই কারণবশতঃই জন্ম (শরীরাদি) দুঃখ, সুখের অভাববশতঃ নহে। পরন্তু ইহা (ঋষি কর্ত্তৃক) উক্ত হইয়াছে—"কাম্যবিষয়ক কামনাকারী জীবের যে সময়ে কাম অর্থাৎ তদ্বিষয়ে ইচ্ছা পূর্ণ হয়, অনন্তর অপর কাম অর্থাৎ অন্যবিষয়ক কামনা, এই জীবকে শীঘ্রই পীড়িত করে"। "যদি গো এবং অশ্ব সহিত সমুদ্র পর্য্যন্ত পৃথিবীকেও সর্ব্বতোভাবে লাভ করে, তাহা হইলেও সেই ধনের দ্বারা ধনৈষী ব্যক্তি তৃপ্ত হয় না, ধন কামনায় সুখ কি আছে ?"

টিপ্পনী। মহর্ষি প্রমেয়-বিভাগ-সূত্রে দুঃখের উদ্দেশ করিয়া জন্ম অর্থাৎ শরীরাদিতে যে দুঃখভাবনার উপদেশ করিয়াছেন, তাহা অন্য হেতুর দ্বারাও সমর্থন করিতে আবার এই সূত্রে বলিয়াছেন যে, জীব সুখের জন্য সতত প্রার্থনা ও চেষ্টা করিলেও তাহার দুঃখনিবৃত্তি হয় না। পরন্তু উহাতে তাহার আরও নানাবিধ দুঃখের উৎপত্তি হয়। কারণ, জীব কোন বিষয়কে সুখসাধন বলিয়া বুঝিলেই তদ্বিষয়ে পর্য্যেষণ অর্থাৎ প্রার্থনা করে। কিন্তু সেই প্রার্থনার দোষবশতঃ তাহার দুঃখের নিবৃত্তি হয় না। কারণ, প্রার্থনার দোষ এই যে, জীব প্রার্থনা করিলেও প্রায়ই তাহার প্রার্থিত বিষয় সম্পন্ন হয় না। কোন স্থলে সম্পন্ন হইলেও তাহা স্থায়ী হয় না, বিনষ্ট হইয়া যায়। অথবা ন্যূন সম্পন্ন হয়, অথবা বহু বিঘ্নযুক্ত হইয়া সম্পন্ন হয় অর্থাৎ তাহা পাইলেও তাহার প্রাপ্তিতে বহু বিঘ্ন উপস্থিত হয়। বিষয়ের পর্য্যেষণ বা প্রার্থনার এইরূপ আরও বহু দোষ আছে। প্রার্থনার পূর্ব্বোক্তরূপ নানা দোষবশতঃ প্রার্থী জীবের নানাবিধ মানস দুঃখ জন্মে ; জীব কিছুতেই শান্তি পায় না। প্রার্থিত বিষয় না পাইলে যেমন অশান্তি, উহা সম্পন্ন হইয়া বিনষ্ট হইলেও তখন আরও অশান্তি, উহা সম্পূর্ণ না পাইলেও অশান্তি, আবার পাইলেও উহার প্রাপ্তিতে বহু বিঘ্ন উপস্থিত হইলে তখন আবার অশান্তি ; সুতরাং প্রার্থীর সর্ব্বদাই অশান্তি, "অশান্তস্য কুতঃ সুখং"। যে সুখের জন্য জীবের সতত প্রার্থনা, সতত চেষ্টা, সে সুখের পূর্ব্বে, পরে ও মধ্যে সর্ব্বদাই দুঃখ। সুখের প্রার্থী কখনই ঐ দুঃখ হইতে মুক্ত হইতে পারে না। তাহার "পর্য্যেষণ" অর্থাৎ প্রার্থনার পূর্ব্বোক্তরূপ নানা দোষবশতঃ তাহার "বাধনা"র অর্থাৎ দুঃখের নিবৃত্তি হয় না, এই জন্যই জন্মে

অর্থাৎ শরীরাদিতে দুঃখবুদ্ধিরূপ ভাবনা উপদিষ্ট হইয়াছে এবং ঐ জন্যই জন্ম অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত শরীরাদিকে দুঃখ বলা হইয়াছে। সুখের অভাববশতঃ অর্থাৎ সুখ পদার্থকে একেবারে অস্বীকার করিয়া শরীরাদি পদার্থকে দুঃখ বলা হয় নাই। পূর্ব্বসূত্র হইতে "সুখস্য" এই পদের অনুবৃত্তি করিয়া "সুখস্য অপ্রতিষেধঃ" অর্থাৎ সুখের প্রতিষেধ হয় নাই, ইহাই সূত্রকারের বিবক্ষিত বুঝিতে হইবে। তাই ভাষ্যকার সূত্রের অবতারণা করিয়াই প্রথমে "সুখস্য" এই পদের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রথম অধ্যায়ে প্রমেয়-বিভাগ-সূত্রে সুখের উদ্দেশ না করিয়া যে দুঃখের উদ্দেশ করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা সুখের প্রতিষেধ করা যায় না, ইহা মহর্ষি পূর্ব্বসূত্রে বলিয়াছেন। সুতরাং এই সূত্রে প্রকরণবশতঃ "দুঃখোদ্দেশেন" এই বাক্যও মহর্ষির বুদ্ধিস্থ, ইহা বুঝা যায়। তাই ভাষ্যকার পরেই আবার বলিয়াছেন, "দুঃখোদ্দেশেনেতি প্রকরণাৎ"। ফলকথা, ভাষ্যকারের ব্যাখ্যানুসারে প্রমেয়-বিভাগ-সূত্রে দুঃখের উদ্দেশের দ্বারা সুখের প্রতিষেধ হয় নাই, কিন্তু শরীরাদি পদার্থে দুঃখ ভাবনারই উপদেশ করা হইয়াছে, ইহাই এই সূত্রে মহর্ষির শেষ বক্তব্য। দুঃখ ভাবনার উপদেশ কেন করা হইয়াছে? উহার আর বিশেষ হেতু কি? তাই মহর্ষি প্রথমে বলিয়াছেন, "বাধনাঽনিবৃত্তের্ব্বেদয়তঃ পর্য্যেষণদোষাৎ"। সূত্রে "বেদয়ৎ" শব্দ এবং ভাষ্যে "বেদয়মান" শব্দ চুরাদিগণীয় জ্ঞানার্থক বিদ্‌ধাতুর উত্তর "শতৃ" ও "শানচ" প্রত্যয়নিষ্পন্ন। উহার অর্থ জ্ঞান-বিশিষ্ট। কোন বিষয়কে ইহা আমার সুখসাধন বা যে কোন ইষ্টসাধন বলিয়া বুঝিলেই জীব তদ্বিষয়ে পর্য্যেষণ অর্থাৎ প্রার্থনা করে। সুতরাং ঐ প্রার্থনার কারণ জ্ঞানবিশেষই এখানে "বিদ্" ধাতুর দ্বারা বুঝিতে হইবে।

ভাষ্যকার শেষে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্য "কামং কাময়মানস্য" ইত্যাদি মুনিবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। "বার্ত্তিক"কার উদ্দ্যোতকরও এখানে "অয়মেব চার্থো মুনিনা শ্লোকেন বর্ণিতঃ"—এই কথা বলিয়া পূর্ব্বোক্ত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু কোন্ গ্রন্থে কোন্ মুনি উক্ত শ্লোক বলিয়াছেন, তাহা তিনিও বলেন নাই। অনুসন্ধান করিয়া আমরাও উহা জানিতে পারি নাই। কিন্তু মনুসংহিতা ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থে[১] "ন জাতু কামঃ কামানাং" ইত্যাদি প্রসিদ্ধ শ্লোকটি দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ শ্লোকের তাৎপর্য্যার্থ এই যে, কাম্য বিষয়ের উপভোগের দ্বারা কামের অর্থাৎ উপভোগ-বাসনার শান্তি হয় না। পরন্তু যেমন ঘৃতের দ্বারা অগ্নির বৃদ্ধিই হয়, তদ্রূপ উপভোগের দ্বারা পুনর্ব্বার কামের বৃদ্ধিই হয়। ভাষ্যকারের উদ্ধৃত শ্লোকের দ্বারাও উহাই বুঝা যায় যে, কোন বিষয় কামনা করিলে যখন সেই কামনা সফল হয়, তখনই আবার অন্য কামনা উপস্থিত হইয়া সেই ব্যক্তিকে পীড়িত করে। অর্থাৎ কামের সিদ্ধির দ্বারা উহার নিবৃত্তি হয় না; পরন্তু আরও বৃদ্ধি হয়। ভাষ্যকারের শেষোক্ত বাক্যেরও তাৎপর্য্য এই যে, ধনৈষী ব্যক্তি যদি সম্পূর্ণরূপে সসাগরা পৃথিবীকেও লাভ করে, তাহা হইলেও উহার দ্বারা তাহার তৃপ্তি হয় না, অর্থাৎ তাহার আরও ধনাকাঙ্ক্ষা জন্মে। সুতরাং ধন কামনায় সুখ কি আছে? তাৎপর্য্য এই যে, সুখ

১। ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥—মনুসংহিতা, ২। ৯৪। ভাগবত, ৯।১৯।১৪॥

বা দুঃখ নিবৃত্তির জন্য সতত কামনা ও চেষ্টা করিলেও লৌকিক উপায়ের দ্বারাও কাহারও আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হইতে পারে না। কারণ, উহাতে আরও কামনার বৃদ্ধি ও উহার অপূর্ণতাবশতঃ নানাবিধ দুঃখেরই সৃষ্টি হয়। এক কামনা পূর্ণ হইলে তখনই আবার অপর কামনা আসিয়া দুঃখকে ডাকিয়া আনে। সুতরাং কামনা দুঃখের নিদান। কামনা ত্যাগ বা বৈরাগ্যই শান্তি লাভের উপায়। উহাই মুক্তি-মণ্ডপের একমাত্র দ্বার। তাই মহর্ষি গোতম বৈরাগ্য লাভের জন্যই শরীরাদি পদার্থে দুঃখভাবনার উপদেশ করিয়াছেন এবং সেই জন্যই তিনি প্রমেয়-বিভাগ-সূত্রে প্রমেয়মধ্যে সুখের উদ্দেশ না করিয়া দুঃখের উদ্দেশ করিয়াছেন ॥৫৬॥

সূত্র। দুঃখবিকল্পে সুখাভিমানাচ্চ ॥৫৭॥৪০০॥

অনুবাদ। এবং যেহেতু দুঃখবিকল্পে অর্থাৎ বিবিধ দুঃখে (অবিবেকীদিগের) সুখ-ভ্রম হয়, (অতএব দুঃখ ভাবনার উপদেশ করা হইয়াছে)।

ভাষ্য। দুঃখসংজ্ঞাভাবনোপদেশঃ ক্রিয়তে। অয়ং খলু সুখসংবেদনে ব্যবস্থিতঃ সুখং পরমপুরুষার্থং মন্যতে, ন সুখাদন্যন্নিঃশ্রেয়সমস্তি, সুখে প্রাপ্তে চরিতার্থঃ কৃতকরণীয়ো ভবতি। মিথ্যাসংকল্পাৎ সুখে তৎসাধনেষু চ বিষয়েষু সংরজ্যতে, সংরক্তঃ সুখায় ঘটতে, ঘটমানস্যাস্য জন্ম-জরা-ব্যাধি-প্রায়ণানিষ্ট-সংযোগেষ্টবিয়োগ-প্রার্থিতানুপপত্তিনিমিত্তমনেকবিধং যাবদ্দুঃখ-মুৎপদ্যতে, তং দুঃখবিকল্পং সুখমিত্যভিমন্যতে। সুখাঙ্গভূতং দুঃখং, ন দুঃখমনাসাদ্য শক্যং সুখমবাপ্তুং, তাদর্থ্যাৎ সুখমেবেদমিতি সুখসংজ্ঞোপ-হতপ্রজ্ঞো জায়স্ব ম্রিয়স্ব চেতি সংধাবতীতি[1] সংসারং নাতিবর্ত্ততে। তদস্যাঃ সুখসংজ্ঞায়াঃ প্রতিপক্ষো দুঃখসংজ্ঞাভাবনমুপদিশ্যতে, দুঃখানুষঙ্গাদ্দুঃখং জন্মেতি, ন সুখস্যাভাবাৎ।

১। "জায়স্ব ম্রিয়স্ব চেতি সংধাবতীতি"। পুনর্জায়তে পুনর্ম্রিয়তে জনিত্বা ম্রিয়তে মৃত্বা জায়তে, তদিদং সংধাবন-ব্যাপারিপ্রসঙ্গ ইত্যর্থঃ। তাৎপর্য্যটীকা।—এখানে তাৎপর্য্যটীকাকারের উদ্ধৃত ভাষ্যপাঠ ও ব্যাখ্যার দ্বারা বুঝা যায়, জন্মের পরে মৃত্যু, মৃত্যুর পরে জন্ম, এইরূপে পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মরণই ভাষ্যকারোক্ত সংধাবনক্রিয়া। ভাষ্যকার "জায়স্ব ম্রিয়স্ব চেতি" এই বাক্যের দ্বারা প্রথমে ঐ সংধাবনক্রিয়ারই প্রকাশ করিয়া, পরে "সংধাবতি" এই ক্রিয়াপদের প্রয়োগ করিয়াছেন। পরে "সংসারং নাতিবর্ত্ততে" এই বাক্যের দ্বারা উহারই বিবরণ করিয়াছেন। এখানে তাৎপর্য্য-টীকানুসারে "সংধাবতীতি" এইরূপ ভাষ্যপাঠই গৃহীত হইল। ভাষ্যে "জায়স্ব" ও "ম্রিয়স্ব" এই দুই ক্রিয়াপদে জনন ও মরণ-ক্রিয়ার পৌনঃপুন্য অর্থের বিবক্ষাবশতঃ লোট্ বিভক্তির "স্ব" বিভক্তির প্রয়োগ হইয়াছে। "ক্রিয়াসমভি-হারে লোট্ লোটো হিস্বৌ বাচ তধ্বমোঃ।" (পাণিনিসূত্র ৩,৪।২)। প্রয়োগ যথা—"পুরীমবস্কন্দ লুনীহি নন্দনং" ইত্যাদি (শিশুপালবধ, ১ম সর্গ, ৫১শ শ্লোক)।

যদ্যেবং, কস্মাদ্দুঃখং জন্মেতি নোচ্যতে ? সোঽয়মেবং বাচ্যে যদেবমাহ দুঃখমেব জন্মেতি, তেন সুখাভাবং জ্ঞাপয়তীতি।

জন্মবিনিগ্রহার্থীয়ো বৈ খল্বয়মেবশব্দঃ, কথং ? ন দুঃখং জন্ম-স্বরূপতঃ, কিন্তু দুঃখোপচারাৎ, এবং সুখমপীতি। এতদনেনৈব নির্ব্বর্ত্ত্যতে, নতু দুঃখমেব জন্মেতি।

অনুবাদ। দুঃখসংজ্ঞারূপ ভাবনার উপদেশ করা হইয়াছে। যেহেতু এই জীব সুখভোগে ব্যবস্থিত, (অর্থাৎ) সুখকেই পরম পুরুষার্থ মনে করে, সুখ হইতে অন্য নিঃশ্রেয়স নাই, সুখ প্রাপ্ত হইলেই চরিতার্থ (অর্থাৎ) কৃত-কর্ত্তব্য হয়। মিথ্যা সংকল্পবশতঃ সুখে এবং তাহার সাধন বিষয়সমূহে সংরক্ত অর্থাৎ অত্যন্ত অনুরক্ত হয়, সংরক্ত হইয়া সুখের জন্য চেষ্টা করে, চেষ্টমান এই জীবের জন্ম, জরা, ব্যাধি, মৃত্যু, অনিষ্টসংযোগ, ইষ্টবিয়োগ এবং প্রার্থিত বিষয়ের অনুপপত্তিনিমিত্তক অনেক-প্রকার দুঃখ উৎপন্ন হয়। সেই দুঃখবিকল্পকে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত নানাবিধ দুঃখকে সুখ বলিয়া অভিমান (ভ্রম) করে। দুঃখ সুখের অঙ্গভূত, (অর্থাৎ) দুঃখ না পাইয়া সুখ লাভ করিতে পারা যায় না। "তাদর্থ্য"বশতঃ অর্থাৎ দুঃখের সুখার্থতা-বশতঃ 'ইহা (দুঃখ) সুখই,' এইরূপ সুখসংজ্ঞার দ্বারা হতবুদ্ধি হইয়া (জীব) পুনঃ পুনঃ জন্মে এবং পুনঃ পুনঃ মরে, এইরূপ অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মরণরূপ সংধাবন করে (অর্থাৎ) সংসারকে অতিক্রম করে না। তজ্জন্যই এই সুখসংজ্ঞার অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বিবিধ দুঃখে সুখ-বুদ্ধির প্রতিপক্ষ (বিরোধী) দুঃখবুদ্ধিরূপ ভাবনা উপদিষ্ট হইয়াছে। দুঃখানুষঙ্গবশতঃই জন্ম দুঃখ, সুখের অভাববশতঃ নহে।

(পূর্ব্বপক্ষ) যদি এইরূপ হয়, অর্থাৎ জন্ম যদি দুঃখানুষঙ্গবশতঃই দুঃখ হয় (স্বরূপতঃ দুঃখ না হয়), তাহা হইলে 'জন্ম দুঃখ' ইহা কেন কথিত হইতেছে না ? সেই এই সূত্রকার (মহর্ষি গোতম) এইরূপ বক্তব্যে অর্থাৎ "জন্ম দুঃখ" এইরূপ বক্তব্যস্থলে যে, "জন্ম দুঃখই" এইরূপ বলিতেছেন,—তদ্দ্বারা সুখের অভাব জ্ঞাপন করিতেছেন।

(উত্তর) এই "এব" শব্দ জন্মনিবৃত্ত্যর্থ, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ অযুক্ত; কারণ, মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত ৫৪শ সূত্রে "দুঃখমেব" এই বাক্যে যে "এব" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, ঐ "এব" শব্দ জন্মনিবৃত্তি বা মুক্তিরূপ চরম উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত হইয়াছে, উহা সুখপদার্থের ব্যবচ্ছেদার্থ নহে। (প্রশ্ন) কেন ? (উত্তর) জন্ম, স্বরূপতঃ দুঃখ নহে, কিন্তু দুঃখের উপচারবশতঃই দুঃখ, এইরূপ সুখও স্বরূপতঃ দুঃখ নহে,

কিন্তু দুঃখের উপচারবশতঃই দুঃখ। ইহা অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত জন্ম এই জীব কর্ত্তৃকই অর্থাৎ পূর্ব্ববর্ণিত বিবিধ দুঃখে সুখাভিমানী জীবকর্ত্তৃকই উৎপাদিত হইতেছে, কিন্তু জন্ম দুঃখই, ইহা নহে।

টিপ্পনী। পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে আপত্তি হইতে পারে যে, বিবেকী ব্যক্তিরা সাংসারিক সুখ ও উহার সমস্ত সাধনকেই দুঃখানুষক্ত বলিয়া বুঝিয়া উপদেশ ব্যতীতও কালে স্বয়ংই তাঁহারা ঐ সুখের চেষ্টা হইতে নিবৃত্ত হইবেন ; সুতরাং পূর্ব্বোক্তরূপ দুঃখভাবনার উপদেশের কোনই প্রয়োজন নাই। এতদুত্তরে মহর্ষি শেষে আবার এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, বিবিধ দুঃখে সুখের অভিমানপ্রযুক্তও পূর্ব্বোক্ত দুঃখভাবনার উপদেশ করা হইয়াছে। সূত্রের শেষে "দুঃখভাবনোপদেশঃ ক্রিয়তে" এই বাক্য মহর্ষির বুদ্ধিস্থ বুঝিয়া ভাষ্যকার সূত্রপাঠের পরেই ভাষ্যারম্ভে ঐ বাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত বাক্যের সহিত সূত্রের যোগ করিয়া সূত্রার্থ বুঝিতে হইবে। মহর্ষির তাৎপর্য্য এই যে, কোন কোন বিবেকী ব্যক্তিবিশেষের জন্য পূর্ব্বোক্তরূপ দুঃখভাবনার উপদেশের প্রয়োজন না থাকিলেও অসংখ্য অবিবেকী ব্যক্তির জন্য ঐরূপ উপদেশের প্রয়োজন আছে। কারণ, তাহারা সুখভোগের জন্য অপরিহার্য্য বিবিধ দুঃখকে সুখ বলিয়া ভ্রম করে। তজ্জন্য তাহারা নানাবিধ কর্ম্ম করিয়া আরও বিবিধ দুঃখভোগ করে। সুতরাং তাহারা যে সুখ ও উহার সাধন জন্মকে সুখ বলিয়াই বুঝে, উহাকে দুঃখ বলিয়া ভাবনা করিলে তাহার ফলে তাহাদিগের ঐ সুখবুদ্ধি বিনষ্ট হইবে, ক্রমে জন্মাদিতে দুঃখবুদ্ধি বা তজ্জন্য সংস্কার সুদৃঢ় হইয়া বৈরাগ্য উৎপন্ন করিবে, তাহার ফলে চিরদিনের জন্য তাহারা দুঃখমুক্ত হইবে। আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি অর্থাৎ মুক্তিই এই শাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য। সুতরাং তাহার সাহায্যের জন্যই পূর্ব্বোক্তরূপ দুঃখভাবনার উপদেশ করা হইয়াছে। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও "অয়ং খলু" ইত্যাদি ভাষ্যের দ্বারা অবিবেকী জীবেরই বুদ্ধি ও কার্য্যের বর্ণন করিয়া, তাহাদিগের জন্যই যে মহর্ষি দুঃখভাবনার উপদেশ করিয়াছেন, ইহাই বলিয়াছেন বুঝা যায়। ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, এই জীব অর্থাৎ বিবেকশূন্য সাধারণ জীব সুখভোগে ব্যবস্থিত, অর্থাৎ তাহারা একমাত্র সুখকেই পরমপুরুষার্থ মনে করে, সুখ ভিন্ন কোন নিঃশ্রেয়স নাই, সুখ পাইলেই তাহারা চরিতার্থ বা কৃতকর্ত্তব্য হয়। তাহারা মিথ্যা সঙ্কল্পবশতঃ সুখ ও উহার উপায়সমূহে অত্যন্ত অনুরক্ত হইয়া, সুখের জন্য নানাবিধ চেষ্টা করে। তাহার ফলে জন্মলাভ করিয়া জরা, ব্যাধি, মৃত্যু এবং যাহা অনিষ্ট, তাহার সহিত সম্বন্ধ এবং যাহা ইষ্ট, তাহার সহিত বিয়োগ এবং অভিলষিত বিষয়ের অপ্রাপ্তি প্রভৃতি কারণজন্য নানাবিধ দুঃখলাভ করে। কিন্তু তাহারা সেই নানাবিধ দুঃখকে সুখ বলিয়াই বুঝে। কারণ, দুঃখভোগ না করিয়া কিছুতেই সুখভোগ করা যায় না, দুঃখ সুখের অঙ্গ, অর্থাৎ সুখের অপরিহার্য্য নির্ব্বাহক। সুতরাং দুঃখের সুখার্থতাবশতঃ সুখাভিলাষী অবিবেকী ব্যক্তিরা দুঃখকে সুখ বলিয়াই বুঝে। দুঃখে তাহাদিগের যে সুখসংজ্ঞা অর্থাৎ সুখবুদ্ধি, তদ্দ্বারা তাহারা হতবুদ্ধি হইয়া সুখের জন্য নানা কার্য্য করে, তাহার ফলে পুনঃ পুনঃ জন্ম ও মরণ লাভ করে, তাহারা সংসারকে অতিক্রম করিতে পারে না। অর্থাৎ তাহারা সুখকে পরমপুরুষার্থ

মনে করিয়া সুখের জন্য যে সকল কার্য্য করে, উহা তাহাদিগের নানাবিধ দুঃখের কারণ হইয়া আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির প্রতিবন্ধক হয়। সুতরাং তাহাদিগের নানাবিধ দুঃখে যে সুখসংজ্ঞা বা সুখবুদ্ধি, যাহা তাহাদিগকে হতবুদ্ধি করিয়া আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির প্রতিবন্ধক নানাবিধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিতেছে। উহা বিনষ্ট করা আবশ্যক; প্রতিপক্ষ ভাবনার দ্বারাই উহা বিনষ্ট হইতে পারে। তাই পূর্ব্বোক্তরূপ সুখসংজ্ঞার প্রতিপক্ষ যে দুঃখসংজ্ঞারূপ ভাবনা, তাহাই উপদিষ্ট হইয়াছে। সুখের সাধন এবং সুখকেও দুঃখ বলিয়া ভাবনা করিলে তাহার ফলে সুখে বৈরাগ্য জন্মিবে, তখন আর সুখের অঙ্গ নানাবিধ দুঃখে সুখবুদ্ধি জন্মিবে না, তখন দুঃখের প্রকৃত স্বরূপ বোধ হওয়ায় চিরকালের জন্য দুঃখমুক্ত হইতেই অভিলাষ ও চেষ্টা জন্মিবে। তাই মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত অবিবেকীদিগের সুখে বৈরাগ্যলাভের জন্য জন্মাদিতে দুঃখভাবনার উপদেশ করিয়াছেন, তজ্জন্যই তিনি জন্মকে দুঃখ বলিয়াছেন এবং প্রমেয়-বিভাগ-সূত্রে সুখের উদ্দেশ না করিয়া, দুঃখের উদ্দেশ করিয়াছেন। মূল কথা, দুঃখানুষঙ্গবশতঃই জন্ম দুঃখ বলিয়া কথিত হইয়াছে; সুখের অভাব-বশতঃ অর্থাৎ সুখের অস্তিত্বই নাই বলিয়া মহর্ষি জন্মকে দুঃখ বলেন নাই।

পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতে পারেন যে, মহর্ষির মতে জন্ম যদি দুঃখানুষঙ্গবশতঃই দুঃখ হয় অর্থাৎ স্বরূপতঃ দুঃখপদার্থ না হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত ৫৪শ সূত্রে "দুঃখং জন্মোৎপত্তিঃ" এইরূপ বাক্যই তাঁহার বক্তব্য। কিন্তু তিনি যখন "দুঃখমেব জন্মোৎপত্তিঃ" এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, অর্থাৎ "দুঃখ" শব্দের পরে "এব" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তখন উহার দ্বারা তিনি যে, সুখের অস্তিত্বই অস্বীকার করিয়াছেন, ইহা বুঝিতে পারা যায়। নচেৎ ঐ বাক্যে তাঁহার "এব" শব্দ প্রয়োগের সার্থক্য কি? "দুঃখমেব" এইরূপ বাক্য বলিলে "এব" শব্দের দ্বারা সুখ নহে, ইহা বুঝা যায়। সুতরাং যাহাকে সুখের সাধন বলিয়া সুখও বলা যায়, তাহাকে মহর্ষি দুঃখই অর্থাৎ সুখ নহে, ইহা বলিলে তিনি যে, সুখপদার্থের অস্তিত্বই স্বীকার করেন নাই, ইহা অবশ্য বুঝা যায়। ভাষ্যকার শেষে নিজেই উক্ত পূর্ব্বপক্ষের উল্লেখ করিয়া, উহার খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত সূত্রে মহর্ষির প্রযুক্ত "এব" শব্দ "জন্মবিনিগ্রহার্থীয়"। অর্থাৎ উহা সুখের নিষেধার্থ নহে, কিন্তু জন্মের বিনিগ্রহ বা নিবৃত্তির জন্য অর্থাৎ মুক্তির জন্যই উহা প্রযুক্ত। অতএব উক্ত পূর্ব্বপক্ষ যুক্ত নহে। ভাষ্যে "বৈ" শব্দটি উক্ত পূর্ব্বপক্ষের অযুক্ততাদ্যোতক। "খলু" শব্দটি হেত্বর্থ। জন্মের বিনিগ্রহ বা নিবৃত্তিরূপ "অর্থ" (প্রয়োজন) বশতঃই প্রযুক্ত, এই অর্থে তদ্ধিত প্রত্যয় গ্রহণ করিয়া ভাষ্যকার "জন্মবিনিগ্রহার্থীয়" এইরূপ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। অর্থাৎ যেমন "মতু" প্রত্যয়ের অর্থে প্রযুক্ত প্রত্যয়কে প্রাচীনগণ "মত্বর্থীয়" বলিয়াছেন, তদ্রূপ ভাষ্যকার এখানে পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থে "এব" শব্দকে "জন্মবিনিগ্রহার্থীয়" বলিয়াছেন। ভাষ্যকারের ঐ কথার তাৎপর্য্য এই যে,[১] মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত ৫৪শ সূত্রে "দুঃখমেব" এই বাক্যে "এব" শব্দের দ্বারা 'জন্ম

১। পরিহরতি "জন্মবিনিগ্রহার্থীয়" ইতি। জন্মনো বিনিগ্রহে বিনিবৃত্তিঃ স এবার্থোঽত্র বর্ত্তত ইতি জন্মবিনিগ্রহার্থীয়ঃ, যথা মত্বর্থীয় ইতি। এতদুক্তং ভবতি, জন্ম দুঃখমেবেতি ভাবয়িতব্যং, নাত্র মনাগপি সুখবুদ্ধিঃ কর্ত্তব্যা। অনেকানর্থপরম্পরাপাতেনাপবর্গপ্রত্যূহপ্রসঙ্গাদিতি।—তাৎপর্য্যটীকা।

দুঃখই' এইরূপ ভাবনার কর্ত্তব্যতাই সূচনা করিয়াছেন। জন্মে অল্পমাত্রও সুখবুদ্ধি করিবে না, কেবল দুঃখবুদ্ধিই করিবে, ইহাই মহর্ষির উপদেশ। কারণ, জন্মে সুখবুদ্ধি করিলে সুখের সাধন নানা কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া মুমুক্ষু ব্যক্তিরাও আবার সুখ ভোগের জন্য জন্ম পরিগ্রহ করিবেন। সুতরাং উহা তাঁহাদিগের মুক্তির প্রতিবন্ধকই হইবে। অতএব মহর্ষি জন্মে সুখবুদ্ধির অকর্ত্তব্যতা সূচনা করিয়া কেবল দুঃখবুদ্ধির কর্ত্তব্যতা সূচনা করিতেই "দুঃখমেব" এই বাক্যে "এব" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। জন্মের নিবৃত্তি অর্থাৎ মুক্তিই উহার চরম উদ্দেশ্য। জন্মে সুখবুদ্ধি করিলে পুনঃ পুনঃ জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়, সুতরাং জন্মের নিবৃত্তি অর্থাৎ মুক্তি হইতে পারে না। মূলকথা, মহর্ষি পূর্ব্বে "দুঃখমেব" এই বাক্যে "এব" শব্দের দ্বারা সুখের নিষেধ করেন নাই। তিনি জন্মকে স্বরূপতঃই দুঃখপদার্থ বলেন নাই। ভাষ্যকার ইহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, জন্ম স্বরূপতঃই দুঃখপদার্থ, ইহা হইতেই পারে না, এবং সুখও যে স্বরূপতঃই দুঃখপদার্থ, ইহাও হইতে পারে না, কিন্তু দুঃখের উপচারবশতঃই জন্ম ও সুখকে দুঃখ বলা হয়। দুঃখের আয়তন শরীর এবং দুঃখের সাধন ইন্দ্রিয়াদি এবং স্বয়ং সুখপদার্থ, এই সমস্তই দুঃখানুষক্ত; তাই ঐ সমস্তকে শাস্ত্রে গৌণদুঃখ বলা হইয়াছে। মহর্ষি গোতমও তাহাই বলিয়াছেন। তিনি ঐ সমস্তকে মুখ্য দুঃখ বলেন নাই, তাহা বলিতেই পারেন না। ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত জন্ম এই জীবকর্ত্তৃকই উৎপাদিত হয়, কিন্তু জন্ম স্বরূপতঃ দুঃখ নহে। ভাষ্যকার প্রথমেই "অয়ং খলু" ইত্যাদি ভাষ্যে "ইদম্" শব্দের দ্বারা যে জীবকে গ্রহণ করিয়া তাহার বিবিধ দুঃখে সুখাভিমানের বর্ণন করিয়াছেন, শেষে "অনেনৈব" এই বাক্যে "ইদম্" শব্দের দ্বারাও বিবিধ দুঃখের সুখাভিমানী ঐ জীবকেই গ্রহণ করিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে, জীবই বিবিধ দুঃখে সুখাভিমানবশতঃ সুখভোগের জন্য নানা কর্ম্ম করিয়া তাহার ফলে জন্ম পরিগ্রহ করে। সুতরাং ঐ জীবই কর্ম্মদ্বারা নিজের জন্মের উৎপাদক। কারণ, জীব কর্ম্ম না করিলে ঈশ্বর তাহার কর্ম্মানুসারে জন্মসৃষ্টি কিরূপে করিবেন? কিন্তু ঐ জন্ম যে স্বরূপতঃ দুঃখই, তাহা নহে; উহা দুঃখানুষক্ত বলিয়া গৌণ দুঃখ। উহাতে সুখবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া, কেবল দুঃখভাবনার উপদেশ করিবার জন্যই মহর্ষি বলিয়াছেন—"দুঃখমেব জন্মোৎপত্তিঃ"।

বস্তুতঃ মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত ৫৪শ সূত্রে "দুঃখমেব জন্মোৎপত্তিঃ" এই বাক্যের দ্বারা জন্মকে যে, স্বরূপতঃ দুঃখই বলেন নাই, বিবিধ দুঃখানুষক্ত বলিয়াই গৌণ দুঃখ বলিয়াছেন, ইহা ঐ সূত্রের প্রথমে "বিবিধবাধনাযোগাৎ" এই হেতুবাক্যের দ্বারাই প্রকটিত হইয়াছে এবং উহার পরেই "ন সুখস্যা-প্যন্তরালনিষ্পত্তেঃ" এই (৫৫শ) সূত্রের দ্বারা মহর্ষি সুখের অস্তিত্ব স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন। পরন্তু তিনি তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে (১৮শ সূত্রে) আত্মার নিত্যত্ব সমর্থন করিতে নবজাত শিশুর হর্ষের উল্লেখ করিয়াও সুখপদার্থের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন এবং ঐ অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকে (৪১শ সূত্রে) অন্য উদ্দেশ্যে সুখ ও দুঃখ, এই উভয়েরই উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত ৫৪শ সূত্রে "দুঃখমেব" এই বাক্যে "এব" শব্দের প্রয়োগ করিয়া তিনি সুখের অস্তিত্বই অস্বীকার করিয়াছেন, ইহা কোনরূপেই বুঝা যাইতে পারে না। অতএব জন্মাদিতে সুখবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া, কেবল দুঃখভাবনার উপদেশ করিবার জন্যই মহর্ষি "দুঃখমেব" এইরূপ বাক্য বলিয়াছেন,

ইহাই বুঝিতে হইবে। তাই ভাষ্যকার প্রভৃতি মহর্ষির ঐরূপই তাৎপর্য্য নির্ণয় করিয়া ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। যোগদর্শনে মহর্ষি পতঞ্জলিও বিবেকীর পক্ষে সমস্ত দুঃখই, অর্থাৎ বিবেকী ব্যক্তি জন্মাদি সমস্তকে দুঃখ বলিয়াই বুঝেন, এই তত্ত্ব প্রকাশ করিতে বলিয়াছেন,—"দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ"। কিন্তু তিনি পূর্ব্বে সুখেরও অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন[১]। ফলকথা, ভারতের মুক্তিমার্গের উপদেশক ব্রহ্মনিষ্ঠ মহর্ষিগণ সুখের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া সকলকেই সুখের জন্য কর্ম্ম করিতে নিষেধ করেন নাই। তাঁহারা সুখ ও দুঃখনিবৃত্তি, এই উভয়কেই প্রয়োজন বলিয়াছেন, এবং সুখার্থী অধিকারিবিশেষের জন্য সুখসাধন নানা কর্ম্মেরও উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের পরিগৃহীত মূল বেদেও সুখসাধন নানাবিধ কর্ম্মের উপদেশ আছে, আবার মুমুক্ষু সন্ন্যাসীর পক্ষে ঐ সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগেরও উপদেশ আছে। কারণ, সুখসাধন কর্ম্ম করিলে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি-রূপ মুক্তি হইতে পারে না। তাই আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি লাভ করিতে হইলে জন্মাদিকে দুঃখ বলিয়াই ভাবনা করিতে হইবে, ইহাই মহর্ষিগণের উপদেশ। মহর্ষি গোতম এই জন্যই প্রথম অধ্যায়ে প্রমেয়-বিভাগসূত্রে মুমুক্ষুর তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় দ্বাদশবিধ প্রমেয়ের উল্লেখ করিতে সুখের উল্লেখ না করিয়া, দুঃখেরই উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার মতে সুখের অস্তিত্ব থাকিলেও অর্থাৎ সুখ সামান্যতঃ প্রমেয় পদার্থ হইলেও আত্মাদির ন্যায় বিশেষ প্রমেয় নহে। কারণ, সুখের তত্ত্বজ্ঞান মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণ নহে। মুমুক্ষু যে সুখকে দুঃখ বলিয়াই ভাবনা করিবেন, সেই সুখের তত্ত্বজ্ঞান তাঁহার পক্ষে মোক্ষের প্রতিকূলই হয়, পূর্ব্বে ইহা বলিয়াছি।

জৈন পণ্ডিত হরিভদ্র সূরি "ষড়্দর্শনসমুচ্চয়"গ্রন্থে ন্যায়দর্শনসম্মত "প্রমেয়" পদার্থের উল্লেখ করিতে "প্রমেয়ন্বাত্মদেহাদ্যং বুদ্ধীন্দ্রিয়সুখাদি চ" এই বচনের দ্বারা প্রমেয়মধ্যে সুখেরও উল্লেখ করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থের টীকাকার জৈন পণ্ডিত গুণরত্ন সেখানে বলিয়াছেন যে, সুখও দুঃখানুষক্ত বলিয়া সুখে দুঃখত্ব ভাবনার জন্য প্রমেয়মধ্যে সুখেরও উল্লেখ হইয়াছে। কিন্তু ন্যায়দর্শনে সুখের লক্ষণ ও পরীক্ষা পাওয়া যায় না। সুতরাং মহর্ষি গোতম প্রমেয়মধ্যে সুখের উদ্দেশ করেন নাই, ইহাই বুঝা যায়। পরন্তু ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যানুসারে তাঁহার মতে যে, মহর্ষি গোতম প্রমেয়ের মধ্যে সুখের উল্লেখ করেন নাই, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই। প্রথম অধ্যায়ে প্রমেয়-বিভাগ-সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকারের কথার দ্বারা উহা স্পষ্টই বুঝা যায়। এখানে দুঃখপরীক্ষা-প্রকরণের ব্যাখ্যার দ্বারাও তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। হরিভদ্রসূরির সময় খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী। কেহ কেহ ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীও বলিয়াছেন। (হরগোবিন্দ দাসকৃত "হরিভদ্রসূরিচরিত্রং" দ্রষ্টব্য)। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী গ্রহণ করিলেও ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন যে, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী, এ বিষয়ে সংশয় নাই। সুতরাং ভাষ্যকার ভগবান্ বাৎস্যায়নের কথা অগ্রাহ্য করিয়া হরিভদ্রসূরির কথা গ্রহণ করা যায় না। তবে হরিভদ্রসূরি ন্যায়দর্শনসম্মত প্রমেয় পদার্থের উল্লেখ করিতে সুখের

১। "তে হ্লাদ-পরিতাপফলাঃ পুণ্যাপুণ্যহেতুত্বাৎ"।

"পরিণাম-তাপ-সংস্কার-দুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্ব্বং বিবেকিনঃ"।—যোগদর্শন। সাধনপাদ। ১৪।১৫

উল্লেখ করিয়াছেন কেন? তাঁহার ঐরূপ উক্তির মূল কি? ইহা অবশ্য বিশেষ চিন্তনীয়। এ বিষয়ে প্রথম খণ্ডে (১৬৫-৬৬ পৃষ্ঠায়) কিছু আলোচনা করিয়াছি। পরন্তু ইহাও মনে হয় যে, হরিভদ্রসূরি ন্যায়দর্শনোক্ত চরম প্রমেয় অপবর্গকেই "সুখ" শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি সংক্ষেপে অর্দ্ধশ্লোকের দ্বারা ন্যায়দর্শনোক্ত দ্বাদশ প্রমেয় প্রকাশ করিতে "আদ্য" ও "আদি" শব্দের দ্বারাই সপ্ত প্রমেয় প্রকাশ করিয়াছেন এবং শ্লোকের ছন্দোরক্ষার্থ ন্যায়সূত্রোক্ত প্রমেয়-বিভাগের ক্রমও পরিত্যাগ করিয়াছেন, ইহা এখানে প্রণিধান করা আবশ্যক। সুতরাং তিনি অপবর্গের উল্লেখ করিতে "সুখ" শব্দেরই প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন, ইহাও বুঝিতে পারি। কারণ, আত্যন্তিক দুঃখাভাবই অপবর্গ। বেদে কোন স্থলে যে, আত্যন্তিক দুঃখাভাব অর্থেই "সুখ" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, ইহা ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও প্রথম অধ্যায়ে বলিয়াছেন (প্রথম খণ্ড, ২০১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। তদনুসারে হরিভদ্র সূরিও উক্ত শ্লোকে আত্যন্তিক দুঃখাভাবরূপ অপবর্গ বুঝাইতে "সুখ" শব্দের প্রয়োগ করিতে পারেন। তিনি অতি সংক্ষেপে ন্যায়দর্শনসম্মত দ্বাদশ প্রমেয়ের প্রকাশ করিতে প্রত্যেকের নামের উল্লেখ করিতে পারেন নাই, ইহা তাঁহার উক্ত বচনের দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায়।

হরিভদ্র সূরির উক্ত বচনে "সুখ" শব্দ দেখিয়া কোন প্রবীণ ঐতিহাসিক কল্পনা করিয়াছেন যে, প্রাচীন কালে ন্যায়দর্শনের প্রমেয়বিভাগ-সূত্রে (১।১।৯) "সুখ" শব্দই ছিল, "দুঃখ" শব্দ ছিল না। পরে "সুখ" শব্দের স্থলে "দুঃখ" শব্দ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে এবং তখন হইতেই নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ও সর্ব্বাশুভবাদ বা সর্ব্বদুঃখবাদের সমর্থন করিয়াছেন। তৎপূর্ব্বে নৈয়ায়িকসম্প্রদায় সর্ব্বাশুভবাদী ছিলেন না; তাঁহারা তখন জন্মাদিকে এবং সুখকে দুঃখ বলিয়া ভাবনার উপদেশ করেন নাই। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, হরিভদ্র সূরি ন্যায়দর্শন-সম্মত প্রমেয়বর্গের প্রকাশ করিতে সুখের উল্লেখ করিলেও তিনি "আদ্য" বা "আদি" শব্দের দ্বারা যে দুঃখেরও উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য। টীকাকার গুণরত্নও ঐ স্থলে তাহা বলিয়াছেন এবং তিনি ন্যায়দর্শনের "দুঃখ"শব্দ-যুক্ত প্রমেয়বিভাগ-সূত্রটিও ঐ স্থলে উদ্ধৃত করিয়া হরিভদ্র সূরির "আদ্য" ও "আদি" শব্দের প্রতিপাদ্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তবে তিনি হরিভদ্র সূরির প্রযুক্ত "সুখ"শব্দের অন্য কোন অর্থের ব্যাখ্যা করেন নাই। কিন্তু যদি হরিভদ্র সূরির উক্ত বচনের দ্বারা তাঁহার মতে দুঃখকেও ন্যায়-দর্শনোক্ত প্রমেয় বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে উক্ত বচনে "সুখ"শব্দ আছে বলিয়া পূর্ব্বকালে ন্যায়দর্শনের প্রমেয়বিভাগ-সূত্রে "সুখ"শব্দই ছিল, "দুঃখ" শব্দ ছিল না, এইরূপ কল্পনা করা যায় না। পরন্তু "দুঃখ"শব্দের ন্যায় "সুখ"শব্দও ছিল, এইরূপ কল্পনা করা যাইতে পারে। কিন্তু ন্যায়দর্শনে সুখের লক্ষণ ও পরীক্ষা না থাকায় ঐরূপ কল্পনাও করা যায় না। ভাষ্যকার ভগবান্ বাৎস্যায়নের ব্যাখ্যার দ্বারাও তাঁহার সময়ে ন্যায়দর্শনের প্রমেয়বিভাগসূত্রে যে সুখ শব্দ ছিল না, দুঃখ শব্দই ছিল, ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়। সুতরাং হরিভদ্র সূরি কোন মতান্তর গ্রহণ করিয়া ন্যায়মত বর্ণন করিতে প্রমেয়মধ্যে সুখেরও উল্লেখ করিয়াছেন, অর্থাৎ তিনি ত্রয়োদশ প্রমেয় বলিয়াছেন, অথবা তিনি আত্যন্তিক দুঃখাভাবরূপ অপবর্গ প্রকাশ করিতেই "সুখ" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহাই

বুঝিতে হইতে (প্রথম খণ্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। মূলকথা, ভাষ্যকার প্রভৃতির ব্যাখ্যানুসারে মহর্ষি গোতম দুঃখের ন্যায় সুখেরও অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু মুমুক্ষুর তত্ত্বজ্ঞান-বিষয় আত্মাদি প্রমেয়ের মধ্যে সুখের উল্লেখ করেন নাই, দুঃখেরই উল্লেখ করিয়াছেন; ইহার কারণ পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সুখের অভাবই দুঃখ, দুঃখের অভাবই সুখ ; সুখ ও দুঃখ বলিয়া কোন ভাব পদার্থ নাই, এইরূপ মতও এখন শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু উহাও কোন আধুনিক নূতন মত নহে। "সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী"তে (দ্বাদশ কারিকার টীকায়) শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র উক্ত মতের উল্লেখপূর্ব্বক উহার খণ্ডন করিতে শেষে বলিয়াছেন যে, সুখ ও দুঃখের ভাবরূপতা অনুভবসিদ্ধ, উহাকে অভাবপদার্থ বলিয়া অনুভব করা যায় না। সুখের অভাব দুঃখ এবং দুঃখের অভাব সুখ, ইহা বলিলে অন্যোন্যাশ্রয়-দোষও অনিবার্য্য হয়। কারণ, ঐ মতে সুখ বুঝিতে গেলে দুঃখ বুঝা আবশ্যক, এবং দুঃখ বুঝিতে গেলে সুখ বুঝা আবশ্যক। সুতরাং সুখের অসিদ্ধিবশতঃ দুঃখের অসিদ্ধি এবং দুঃখের অসিদ্ধিবশতঃ সুখের অসিদ্ধি হওয়ায় সুখ ও দুঃখ, এই উভয় পদার্থই অসিদ্ধ হয়। কিন্তু যেরূপেই হউক, সুখ ও দুঃখ, এই উভয় পদার্থ উভয় পক্ষেরই সম্মত। শ্রীধরভট্টও উক্ত মতের উল্লেখপূর্ব্বক খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন ("ন্যায়কন্দলী", ২৬০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) ॥৫৭॥

দুঃখ-পরীক্ষা-প্রকরণ সমাপ্ত ॥১৩॥

ভাষ্য। দুঃখোদ্দেশানন্তরমপবর্গঃ, স প্রত্যাখ্যায়তে—

অনুবাদ। দুঃখের উদ্দেশের অনন্তর অপবর্গ (উদ্দিষ্ট ও লক্ষিত হইয়াছে), তাহা প্রত্যাখ্যাত হইতেছে, অর্থাৎ মহর্ষি অপবর্গের পরীক্ষার জন্য প্রথমে পূর্ব্বপক্ষ প্রকাশ করিতে এই সূত্রের দ্বারা অপবর্গের অস্তিত্ব খণ্ডন করিতেছেন—

সূত্র। ঋণ-ক্লেশ-প্রবৃত্ত্যনুবন্ধাদপবর্গাভাবঃ ॥৫৮॥৪০১॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) ঋণানুবন্ধ, ক্লেশানুবন্ধ এবং প্রবৃত্ত্যনুবন্ধপ্রযুক্ত অপবর্গের অভাব, অর্থাৎ অপবর্গ অসম্ভব, সুতরাং উহা অলীক।

ভাষ্য। **ঋণানুবন্ধান্নাস্ত্যপবর্গঃ**,—"জায়মানো হ বৈ ব্রাহ্মণ-স্ত্রিভিঋৈর্ণবা জায়তে ব্রহ্মচর্য্যেণ ঋষিভ্যো যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ প্রজয়া পিতৃভ্য"[1] ইতি **ঋণানি**, তেষামনুবন্ধঃ,—স্বকর্ম্মভিঃ সম্বন্ধঃ, কর্ম্ম-

---

১। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় "তৈত্তিরীয়সংহিতা"র ষষ্ঠ কাণ্ডের তৃতীয় প্রপাঠকের দশম অনুবাকে "জায়মানো বৈ ব্রাহ্মণ-স্ত্রিভিঋৈর্ণবা জায়তে, ব্রহ্মচর্য্যেণ ঋষিভ্যো যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ প্রজয়া পিতৃভ্য এষ বা অনৃণো যঃ পুত্রী যজ্বা ব্রহ্মচারীবাসী তদবদানৈরেবাবদয়তে তদবদানানামবদানত্বং"—এইরূপ শ্রুতি দেখা যায়। ভাষ্যকার সায়নাচার্য্যও "তৈত্তিরীয়-সংহিতা"র প্রথম কাণ্ডের ভাষ্যে ঐরূপ শ্রুতিপাঠই উদ্ধৃত করিয়াছেন। (তৈত্তিরীয়সংহিতা, পুনা, আনন্দাশ্রম সংস্করণ, প্রথম খণ্ড, ৪৮১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন এখানে "জায়মানো হ বৈ ব্রাহ্মণস্ত্রিভিঋৈর্ণবা জায়তে" ইত্যাদি শ্রুতিপাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাঁহার উদ্ধৃত শ্রুতিপাঠে যে, "ঋণৈঃ" এই পদটি আছে, ইহা

সম্বন্ধবচনাৎ। "জরামর্য্যং বা এতৎ সত্রং যদগ্নিহোত্রং, দর্শপূর্ণমাসৌ চে"তি,"জরয়া হ বা এষ তস্মাৎ সত্রাদ্বিমুচ্যতে মৃত্যুনা হ বে"তি'। ঋণানুবন্ধাদপবর্গানুষ্ঠানকালো নাস্তীত্যপবর্গাভাবঃ। **ক্লেশানুবন্ধান্নাস্ত্যপবর্গঃ,**—ক্লেশানুবন্ধ এবায়ং ম্রিয়তে, ক্লেশানুবদ্ধশ্চ জায়তে, নাস্য ক্লেশানুবন্ধবিচ্ছেদো গৃহ্যতে। **প্রবৃত্ত্যনুবন্ধান্নাস্ত্যপবর্গঃ,**—জন্ম প্রভৃত্যয়ং যাবৎপ্রায়ণং বাগ্‌বুদ্ধিশরীরারম্ভেণাবিমুক্তো গৃহ্যতে। তত্র যদুক্তং, "দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষমিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাপায়াদপবর্গ" ইতি, তদনুপপন্নমিতি।

অনুবাদ। (১) "ঋণানুবন্ধ"প্রযুক্ত অপবর্গ নাই অর্থাৎ উহা অলীক। (বিশদার্থ) "জায়মান ব্রাহ্মণ তিন ঋণে ঋণী হন, ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা ঋষিঋণ হইতে, যজ্ঞের দ্বারা দেবঋণ হইতে, পুত্রের দ্বারা পিতৃঋণ হইতে (মুক্ত হন")—এই সমস্ত অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবর্ণিত ব্রহ্মচর্য্যাদি "ঋণ", সেই ঋণত্রয়ের "অনুবন্ধ" বলিতে স্বকীয় কর্ম্মসমূহের সহিত সম্বন্ধ, যেহেতু (শ্রুতিতে) কর্ম্মসম্বন্ধের কথন আছে। যথা—"এই সত্র জরামর্য্য, যাহা অগ্নিহোত্র এবং দর্শ ও পূর্ণমাস। জরার দ্বারা এই গৃহস্থ দ্বিজ সেই সত্র হইতে বিমুক্ত হয়, অথবা মৃত্যুর দ্বারা বিমুক্ত হয়"। "ঋণানুবন্ধ"প্রযুক্ত অপবর্গানুষ্ঠানের (অপবর্গার্থ শ্রবণমননাদি কার্য্যের) সময় নাই, অতএব অপবর্গ নাই।

(২) "ক্লেশানুবন্ধ"প্রযুক্ত অপবর্গ নাই। বিশদার্থ এই যে, (জীবমাত্রই) ক্লেশানুবদ্ধ (রাগদ্বেষাদিযুক্ত) হইয়াই মরে, ক্লেশানুবদ্ধ হইয়াই জন্মে,—এই জীবের ক্লেশানুবন্ধ হইতে বিচ্ছেদ অর্থাৎ কখনই রাগদ্বেষাদি-দোষশূন্যতা বুঝা যায় না।

পরবর্ত্তী সূত্রের ভাষ্যে তাঁহার উক্তির দ্বারা নিঃসংশয়ে বুঝা যায়। বেদের অন্যত্র ঐরূপ শ্রুতিপাঠও থাকিতে পারে। "মনুসংহিতা"র ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৩৬শ শ্লোকের টীকায় মহামনীষী কুল্লুক ভট্ট "জায়মানো ব্রাহ্মণস্ত্রিভিঋণৈঋর্ণবান্ জায়তে যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ প্রজয়া পিতৃভ্যঃ স্বাধ্যায়েন ঋষিভ্যঃ" এইরূপ শ্রুতিপাঠ উদ্ধৃত করিয়াছেন। বেদে কোন স্থলে ঐরূপ শ্রুতিপাঠও থাকিতে পারে। কিন্তু "ঋণবান্ জায়তে" এই স্থলে "ঋণবা জায়তে" ইহাই প্রকৃত পাঠ। মূলসংহিতায় ঐরূপ পাঠই আছে। বৈদিকপ্রয়োগবশতঃ "ঋণবান্" এই স্থলে "ঋণবা জায়তে" এইরূপ প্রয়োগ হইয়াছে। প্রাচীন হস্তলিখিত কোন ভাষ্যপুস্তকেও "ঋণবা জায়তে" এইরূপ পাঠ পাওয়া যায়। মুদ্রিত কোন কোন ভাষ্যপুস্তকের নিম্নে উহা পাঠান্তররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

১। প্রচলিত সমস্ত ভাষ্যপুস্তকে উক্তরূপ শ্রুতিপাঠই উদ্ধৃত দেখা যায়। তদনুসারে এখানে উক্তরূপ পাঠই গৃহীত হইল। কিন্তু পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পাদের চতুর্থ সূত্রের ভাষ্যে দেখা যায়—"অপিচ শ্রূয়তে—"জরামর্য্যং বা এতৎ সত্রং যদগ্নিহোত্রং দর্শপূর্ণমাসৌচ, জরয়া হ বা এতাভ্যাং নির্মুচ্যতে মৃত্যুনা চে"তি।

(৩) "প্রবৃত্ত্যনুবন্ধ"বশতঃ অপবর্গ নাই। বিশদার্থ এই যে, এই জীব জন্ম প্রভৃতি মৃত্যু পর্য্যন্ত বাগারম্ভ, বুদ্ধ্যারম্ভ ও শরীরারম্ভ কর্তৃক অর্থাৎ বাচিক, মানসিক ও শারীরিক, এই ত্রিবিধ কর্ম্মকর্তৃক অপরিত্যক্ত বুঝা যায় অর্থাৎ জীব সর্ব্বদাই কোন প্রকার কর্ম্ম অবশ্যই করিতেছে।

তাহা হইলে এই যে বলা হইয়াছে, "দুঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তি, দোষ ও মিথ্যাজ্ঞানের উত্তরোত্তরের বিনাশ হইলে তদনন্তরের বিনাশপ্রযুক্ত অপবর্গ হয়", তাহা উপপন্ন হয় না।

টিপ্পনী। প্রথম অধ্যায়ে প্রমেয়মধ্যে "দুঃখে"র পরেই "অপবর্গে"র উপদেশ করিয়া, তদনুসারে দুঃখের লক্ষণ বলা হইয়াছে। পূর্ব্বপ্রকরণে দুঃখের পরীক্ষা করা হইয়াছে। সুতরাং এখন ক্রমানুসারে অপবর্গের পরীক্ষার অবসর উপস্থিত হইয়াছে। তাই মহর্ষি অবসরসংগতিবশতঃ এখানে অপবর্গের পরীক্ষা করিতে প্রথমে এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। পূর্ব্বপক্ষ এই যে, অপবর্গ নাই অর্থাৎ উহা অলীক। পূর্ব্বপক্ষের সমর্থক হেতু বলিয়াছেন—ঋণানুবন্ধ, ক্লেশানুবন্ধ ও প্রবৃত্ত্যনুবন্ধ। সূত্রোক্ত "অনুবন্ধ" শব্দের "ঋণ", "ক্লেশ" ও "প্রবৃত্তি" শব্দের প্রত্যেকের সহিত সম্বন্ধবশতঃ পূর্ব্বোক্ত হেতুত্রয় বুঝা যায়। পূর্ব্বপক্ষবাদীর বক্তব্য এই যে, ঋণানুবন্ধ, ক্লেশানুবন্ধ ও প্রবৃত্ত্যনুবন্ধবশতঃ অপবর্গ হইতেই পারে না, উহা অসম্ভব। যাহা অসম্ভব, তাহা কোন হেতুর দ্বারাই সিদ্ধ হইতে পারে না। সম্ভাবিত পক্ষই হেতুর দ্বারা সিদ্ধ করা যায় না; যাহা অসম্ভাবিত, তাহা কোন হেতুর দ্বারাই কিছুতেই সিদ্ধ করা যায় না, ইহা নৈয়ায়িকগণও বলিয়াছেন (দ্বিতীয় খণ্ড, ৩৪৯ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য)।

ভাষ্যকার সূত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষের ব্যাখ্যা করিতে প্রথমে বলিয়াছেন,—"ঋণানুবন্ধান্নাস্ত্যপবর্গঃ"। উক্ত পূর্ব্বপক্ষ বুঝিতে হইলে "ঋণ" কি এবং উহার "অনুবন্ধ" কি, এবং কেনই বা তৎপ্রযুক্ত অপবর্গ অসম্ভব, ইহা বুঝা আবশ্যক। তাই ভাষ্যকার পরেই "জায়মানো হ বৈ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া, ঐ শ্রুতিবাক্যোক্ত ঋষিঋণ, দেবঋণ ও পিতৃঋণ, এই ঋণত্রয়কে সূত্রোক্ত "ঋণ" বলিয়া, ঐ ঋণত্রয় মোচনের জন্য যে সকল কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহার সহিত কর্ত্তার সম্বন্ধকে বলিয়াছেন "ঋণানুবন্ধ"। "অনুবন্ধ" শব্দের অর্থ এখানে অপরিহার্য্য সম্বন্ধ। "ঋণানুবন্ধ" এই স্থলে সেই সম্বন্ধ—কর্ম্মসম্বন্ধ। ভাষ্যকার ইহার হেতু বলিয়াছেন—"কর্ম্মসম্বন্ধবচনাৎ"। অর্থাৎ শ্রুতিতে পূর্ব্বোক্ত ঋণ মোচনের জন্য কর্ম্মবিশেষের অবশ্যকর্ত্তব্যতা কথিত হইয়াছে। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঋণ মোচনের জন্য কর্ম্ম কর্ত্তব্য। "ঋণানুবন্ধ" হইতে কখনও মুক্তি নাই। উদ্দ্যোতকর এই তাৎপর্য্যেই বলিয়াছেন, "অনুবন্ধঃ সদাকরণীয়তা"। অর্থাৎ ঋণ মোচনের জন্য যাবজ্জীবন কর্ম্মের কর্ত্তব্যতাই এখানে "ঋণানুবন্ধ" শব্দের ফলিতার্থ। ভাষ্যকার তাঁহার পূর্ব্বোক্ত কর্ম্ম সম্বন্ধের প্রমাণ প্রদর্শন করিবার জন্য পরে "জরামর্য্যং বা এতৎ সত্রং" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। উক্ত শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, অগ্নিহোত্র এবং দর্শ ও পূর্ণমাস নামক যাগ—"জরামর্য্য" অর্থাৎ

জরা ও মৃত্যু পর্য্যন্ত উহা কর্ত্তব্য। জরা অর্থাৎ বার্দ্ধক্যবশতঃ অত্যন্ত অশক্ত হইলে উহা ত্যাগ করা যায়। নচেৎ মৃত্যু পর্য্যন্ত উহা করিতেই হইবে। উক্ত শ্রুতিবাক্যের শেষে ইহা স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে যে, জরা ও মৃত্যুর দ্বারা যজমান উক্ত যজ্ঞ কর্ত্তৃক নির্ম্মুক্ত হয়। "জরা" শব্দের অর্থ এখানে জরানিমিত্তক অত্যন্ত অশক্ততা, "মর" শব্দের অর্থ মৃত্যু। উক্ত শ্রুতিবাক্যে "জরামরাভ্যাং নির্ম্মুচ্যতে" এইরূপ অর্থে "জরামর" শব্দের উত্তর তদ্ধিত প্রত্যয়নিষ্পন্ন "জরামর্য্য" শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। "জরামর্য্য" শব্দের দ্বারা অগ্নিহোত্র এবং দর্শ ও পূর্ণমাস নামক যাগের যাবজ্জীবন কর্ত্তব্যতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। বস্তুতঃ অগ্নিহোত্র এবং দর্শ ও পূর্ণমাস নামক যাগ যে, যাবজ্জীবন কর্ত্তব্য, এ বিষয়ে বেদের অন্তর্গত "বহ্বৃচ ব্রাহ্মণে" "যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি" এবং "যাবজ্জীবং দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং যজেত" এই দুইটি বিধিবাক্যও আছে। পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পাদের প্রথম সূত্রের ভাষ্যে শবর স্বামী উক্ত বিধিবাক্যদ্বয় উদ্ধৃত করিয়াছেন। এখন প্রকৃত কথা এই যে, প্রথমে ঋষিঋণ হইতে মুক্ত হইবার জন্য যথাশাস্ত্র ব্রহ্মচর্য্য সমাপনপূর্ব্বক পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইবার জন্য দারপরিগ্রহ করিয়া পুত্রোৎপাদন কর্ত্তব্য এবং দেবঋণ হইতে মুক্ত হইবার জন্য যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র এবং দর্শ ও পূর্ণমাস নামক যাগ কর্ত্তব্য। তাহা হইলে উক্ত ঋণত্রয়-মুক্ত হইতেই সমগ্র জীবন অতিবাহিত হওয়ায় মোক্ষের জন্য অনুষ্ঠান করার সময়ই থাকে না, সুতরাং মোক্ষ অসম্ভব, উহা অলীক, ইহাই পূর্ব্বপক্ষ-বাদীর প্রথম কথার তাৎপর্য্য। পূর্ব্বোক্ত ঋণত্রয় নিরাকরণ করিয়াই মোক্ষে মনোনিবেশ কর্ত্তব্য। পরন্তু উহা না করিয়া মোক্ষার্থ অনুষ্ঠান করিলে অধোগতি হয়, ইহা ভগবান্ মনুও স্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন[১]। ব্যক্তিবিশেষের ব্রহ্মচর্য্য ও পুত্রোৎপাদনের পরে জীবনের অনেক সময় থাকিলেও যাবজ্জীবন কর্ত্তব্য অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞের অবশ্যকর্ত্তব্যতাবশতঃ তাঁহারও মোক্ষার্থ অনুষ্ঠানের সময় নাই। সুতরাং অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ যে, দ্বিজাতির মোক্ষার্থ অনুষ্ঠানের চরম ও প্রধান প্রতিবন্ধক, ইহা স্বীকার্য্য। তাই ভাষ্যকার এখানে "জরামর্য্যং বা" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া, অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞকেই মোক্ষার্থ অনুষ্ঠানের চরম প্রতিবন্ধকরূপে প্রদর্শন করিয়া, পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন। পরন্তু যদিও "জায়মানো হ বৈ" ইত্যাদি শ্রুতিতে ব্রাহ্মণেরই পূর্ব্বোক্ত ঋণত্রয় কথিত হইয়াছে; কিন্তু শ্রুতিতে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরও ব্রহ্মচর্য্যাদির বিধান থাকায় দ্বিজাতিমাত্রেরই পূর্ব্বোক্ত ঋণত্রয় নিরাকরণ করা আবশ্যক। মনুসংহিতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে ও ৩৭শ শ্লোকে "দ্বিজ" শব্দের দ্বারা দ্বিজাতিমাত্রই গৃহীত হইয়াছে, শাস্ত্রান্তরেও উহা স্পষ্ট কথিত হইয়াছে। দ্বিজেতর অধিকারীদিগেরও যাবজ্জীবন-

---

১। ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ।
অনপাকৃত্য মোক্ষন্তু সেবমানো ব্রজত্যধঃ ॥৩৫॥
অধীত্য বিধিবদ্বেদান্ পুত্রাংশ্চোৎপাদ্য ধর্ম্মতঃ।
ইষ্ট্বা চ শক্তিতো যজ্ঞৈর্ম্মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ ॥৩৬॥
অনধীত্য দ্বিজো বেদানমুৎপাদ্য তথা সুতান্।
অনিষ্ট্বা চৈব যজ্ঞৈশ্চ মোক্ষমিচ্ছন্ ব্রজত্যধঃ ॥৩৭॥—মনুসংহিতা, ষষ্ঠ অঃ।

কর্ত্তব্য শাস্ত্রবিহিত অনেক কর্ম্ম আছে। সুতরাং তাঁহাদিগেরও মোক্ষার্থ অনুষ্ঠানের সময় না থাকায় মোক্ষ অসম্ভব। সুতরাং মোক্ষ কাহারই হইতে পারে না, উহা অলীক, ইহাই পূর্ব্বপক্ষবাদীর তাৎপর্য্য।

পূর্ব্বপক্ষবাদীর দ্বিতীয় কথা এই যে, "ক্লেশানুবন্ধ"প্রযুক্ত অপবর্গ অসম্ভব। ভাষ্যকার ইহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, জীবমাত্রই ক্লেশানুবদ্ধ হইয়াই মরে এবং ক্লেশানুবদ্ধ হইয়াই জন্মে, ক্লেশানুবন্ধ হইতে কখনও জীবের বিচ্ছেদ বুঝা যায় না। তাৎপর্য্য এই যে, জীবের রাগ, দ্বেষ ও মোহ, এই দোষত্রয়রূপ যে "ক্লেশ", উহাই জীবের সংসারের নিদান; উহার উচ্ছেদ ব্যতীত জীবের মুক্তি অসম্ভব। কিন্তু উহার যে, উচ্ছেদ হইতে পারে, ইহার কোন প্রমাণ নাই। জীবের ঐ ক্লেশের সহিত তাহার যে অনুবন্ধ অর্থাৎ অপরিহার্য্য সম্বন্ধ, তাহার কখনও বিচ্ছেদ বা উচ্ছেদ হয়, ইহা বুঝা যায় না। পরন্তু জন্মকালেও জীবের ক্লেশানুবন্ধ, মরণকালেও ক্লেশানুবন্ধ এবং ইহার পূর্ব্বেও সকল সময়েই জীবের ক্লেশানুবন্ধ বুঝা যায়। সুতরাং উহার উচ্ছেদ অসম্ভব বলিয়া মুক্তিও অসম্ভব। কারণ, সংসারের নিদানের উচ্ছেদ না হইলে কখনই সংসারের উচ্ছেদ হইতে পারে না। মহর্ষি পতঞ্জলি যোগদর্শনের সাধনপাদের তৃতীয় সূত্রে অবিদ্যা প্রভৃতি পঞ্চবিধ "ক্লেশ" বলিয়াছেন। কিন্তু মহর্ষি গোতম সংক্ষেপে রাগ, দ্বেষ ও মোহ, এই ত্রিবিধ দোষ বলিয়াছেন। তাঁহার মতে ঐ দোষত্রয়েরই নাম "ক্লেশ"। পরবর্ত্তী ৬৩ম সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকারের ব্যাখ্যার দ্বারা ইহা বুঝা যায়। বস্তুতঃ যোগদর্শনোক্ত পঞ্চবিধ ক্লেশও রাগ, দ্বেষ ও মোহেরই অন্তর্গত। সুতরাং সংক্ষেপে রাগ, দ্বেষ ও মোহকেও "ক্লেশ" বলা যায়।

পূর্ব্বপক্ষবাদীর তৃতীয় কথা এই যে, "প্রবৃত্ত্যনুবন্ধ"প্রযুক্ত অপবর্গ অসম্ভব। মহর্ষি গোতম "প্রবৃত্তির্বাগ্‌বুদ্ধিশরীরারম্ভঃ" (১৷১৷১৭) এই সূত্রের দ্বারা বাচিক, মানসিক ও শারীরিক, এই ত্রিবিধ কর্ম্মকে "প্রবৃত্তি" বলিয়াছেন এবং ঐ কর্ম্মজন্য ধর্ম্মাধর্ম্মকেও "প্রবৃত্তি" বলিয়াছেন। মনুষ্যমাত্রই জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত যথাসম্ভব ঐ কর্ম্ম করিতেছে। কাহারও একেবারে কর্ম্মশূন্যতা দেখা যায় না, উহা হইতেই পারে না। পূর্ব্বোক্ত "প্রবৃত্তির" সহিত অপরিহার্য্য সম্বন্ধই "প্রবৃত্ত্যনুবন্ধ"। তৎপ্রযুক্ত কাহারই অপবর্গ হইতেই পারে না। কারণ, কর্ম্ম করিলেই তজ্জন্য ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম উৎপন্ন হইবেই। সুতরাং উহার ফলভোগের জন্য পুনর্ব্বার জন্ম পরিগ্রহও করিতে হইবে। অতএব মোক্ষ অসম্ভব। কারণ, দোষজন্য প্রবৃত্তি সংসারের নিদান। সুতরাং উহার উচ্ছেদ ব্যতীত সংসারের উচ্ছেদ হইতেই পারে না। কিন্তু ঐ প্রবৃত্তির অনুৎপত্তি অসম্ভব বলিয়া সংসারের উচ্ছেদও অসম্ভব, ইহাই পূর্ব্বপক্ষবাদীর তৃতীয় কথার তাৎপর্য্য। ভাষ্যকার পূর্ব্বপক্ষ ব্যাখ্যার উপসংহারে ন্যায়দর্শনের "দুঃখ-জন্ম" ইত্যাদি দ্বিতীয় সূত্র উদ্ধৃত করিয়া পূর্ব্বপক্ষের উপসংহার করিয়াছেন যে, "দুঃখ-জন্ম" ইত্যাদি সূত্রে যে ক্রমে কারণ সূচনা করিয়া অপবর্গের প্রতিপাদন করা হইয়াছে, তাহা উপপন্ন হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, প্রথমতঃ ঋণত্রয় মোচনের জন্য যাবজ্জীবন কর্ম্মের অবশ্যকর্ত্তব্যতাবশতঃ সময়াভাবে শ্রবণমননাদি অনুষ্ঠান অসম্ভব হওয়ায় শাস্ত্রোক্ত তত্ত্বজ্ঞান লাভই হইতে পারে না, সুতরাং মিথ্যাজ্ঞানের বিনাশ অসম্ভব। মিথ্যাজ্ঞান-

প্রযুক্ত রাগ ও দ্বেষরূপ দোষও অবশ্যম্ভাবী, উহার উচ্ছেদেরও সম্ভাবনা নাই এবং দোষ-প্রযুক্ত কর্ম্মরূপ প্রবৃত্তি ও তজ্জন্য ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ প্রবৃত্তির অনুৎপত্তিরও সম্ভাবনা নাই। সুতরাং প্রবৃত্তির অপায়ে জন্মের অপায়প্রযুক্ত যে দুঃখাপায়রূপ অপবর্গ কথিত হইয়াছে, তাহা কোনরূপেই সম্ভব নহে। জন্মের সাক্ষাৎ কারণ ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ "প্রবৃত্তির" কারণ কর্ম্ম যখন সর্ব্বদাই করিতে হয়, যাঁহারা জ্ঞানী বলিয়া খ্যাত, তাঁহারাও উহা করেন, সুতরাং ঐ ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ "প্রবৃত্তি" সকলেরই পুনর্জ্জন্ম সম্পাদন করিবে, অতএব মোক্ষ কাহারই সম্ভব নহে ; সুতরাং মোক্ষ নাই অর্থাৎ মোক্ষ অলীক ॥৫৮॥

ভাষ্য। অত্রাভিধীয়তে, যত্তাবদৃণানুবন্ধাদিতি ঋণৈরিব ঋণৈরিতি।

অনুবাদ। এই পূর্ব্বপক্ষে (উত্তর) কথিত হইতেছে অর্থাৎ মহর্ষি পরবর্ত্তী সূত্র হইতে কতিপয় সূত্রের দ্বারা যথাক্রমে পূর্ব্বসূত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষের উত্তর বলিতেছেন। "ঋণানুবন্ধাৎ" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা [যে পূর্ব্বপক্ষ কথিত হইয়াছে, তাহাতে বক্তব্য এই যে, শ্রুতিতে] "ঋণৈঃ" এই বাক্যের ব্যাখ্যা "ঋণৈরিব" অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিতে "ঋণ" শব্দ গৌণশব্দ, উহার অর্থ ঋণসদৃশ।

সূত্র। প্রধানশব্দানুপপত্তের্গুণশব্দেনানুবাদো নিন্দা-প্রশংসোপপত্তেঃ ॥৫৯॥৪০২॥

অনুবাদ। (উত্তর) প্রধান শব্দের অনুপপত্তিবশতঃ অপ্রধান শব্দের দ্বারা অনুবাদ হইয়াছে ; কারণ, নিন্দা ও প্রশংসার উপপত্তি হয়।

ভাষ্য। "ঋণৈ"রিতি নায়ং প্রধানশব্দঃ, যত্র খল্বেকঃ প্রত্যাদেয়ং দদাতি, দ্বিতীয়শ্চ প্রতিদেয়ং গৃহ্লাতি, তত্রাস্য দৃষ্টত্বাৎ প্রধানমৃণশব্দঃ, ন চৈতদিহোপপদ্যতে, **প্রধানশব্দানুপপত্তের্গুণশব্দেনানুবাদঃ** ঋণৈরিব ঋণৈরিতি। **অপ্রযুক্তোপমঞ্চৈতদ্যথাঽগ্নির্ম্মাণবক ইতি।** অন্যত্র দৃষ্টশ্চায়মৃণশব্দ ইহ প্রযুজ্যতে যথাঽগ্নিশব্দো মাণবকে। কথং গুণশব্দে-নানুবাদঃ ? **নিন্দাপ্রশংসোপপত্তেঃ।** কর্ম্মলোপে ঋণীব ঋণাদানা-ন্নিন্দ্যতে, কর্ম্মানুষ্ঠানে চ ঋণীব ঋণদানাৎ প্রশস্যতে, স এবোপমার্থ ইতি।

জায়মান ইতি চ গুণশব্দো বিপর্য্যয়েনাধিকারাৎ। "জায়-মানো হ বৈ ব্রাহ্মণ" ইতি চ গুণশব্দো গৃহস্থঃ সম্পদ্যমানো "জায়মান" ইতি। যদাঽয়ং গৃহস্থো জায়তে তদা কর্ম্মভিরধিক্রিয়তে **মাতৃতো জায়মানস্যানধিকারাৎ।** যদা তু মাতৃতো জায়তে কুমারো ন তদা

কর্ম্মভিরধিক্রিয়তে, **অর্থিনঃ শক্তস্য চাধিকারাৎ।** অর্থিনঃ কর্ম্মভিরধিকারঃ, কর্ম্মবিধৌ কামসংযোগশ্রুতেঃ, "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকাম" ইত্যেবমাদি। **শক্তস্য চ প্রবৃত্তিসম্ভবাৎ,** শক্তস্য কর্ম্মভিরধিকারঃ প্রবৃত্তিসম্ভবাৎ, শক্তঃ খলু বিহিতে কর্ম্মণি প্রবর্ত্ততে, নেতর ইতি। **উভয়াভাবস্তু প্রধানশব্দার্থে,** মাতৃতো জায়মানে কুমারে উভয়মর্থিতা শক্তিশ্চ ন ভবতীতি। **ন ভিদ্যতে চ লৌকিকাদ্বাক্যাদ্বৈদিকং বাক্যং প্রেক্ষাপূর্ব্বকারিপুরুষ-প্রণীতত্বেন।** তত্র লৌকিকস্তাবদপরীক্ষকোঽপি ন জাতমাত্রং কুমারকমেবং ব্রূয়াদধীষ্ব যজস্ব ব্রহ্মচর্য্যং চরেতি, কুত এবমৃষিরুপপন্নানবদ্যবাদী উপদেশার্থেন প্রযুক্ত উপদিশতি? ন খলু বৈ নর্ত্তকোঽন্ধেষু প্রবর্ত্ততে ন গায়নো বধিরেম্বিতি। **উপদিষ্টার্থবিজ্ঞাতা চোপদেশবিষয়ঃ।** যশ্চোপদিষ্টমর্থং বিজানাতি তং প্রত্যুপদেশঃ ক্রিয়তে, ন চৈতদস্তি জায়মানকুমারকে ইতি। **গার্হস্থ্যলিঙ্গঞ্চ মন্ত্রব্রাহ্মণং কর্ম্মাভিবদতি,** যচ্চ মন্ত্রব্রাহ্মণং কর্ম্মাভিবদতি, তৎ পত্নীসম্বন্ধাদিনা গার্হস্থ্যলিঙ্গেনোপপন্নং, তস্মাদ্গৃহস্থোঽয়ং জায়মানোঽভিধীয়ত ইতি।

অনুবাদ। "ঋণৈঃ" এই পদে ইহা অর্থাৎ "জায়মানো হ বৈ" ইত্যাদি শ্রুতিতে "ঋণৈঃ" এই পদের অন্তর্গত ঋণ শব্দটী প্রধান শব্দ (মুখ্য শব্দ) নহে। কারণ, যে স্থলে এক ব্যক্তি প্রত্যাদেয় দ্রব্য দান করে এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রতিদেয় দ্রব্য গ্রহণ করে, সেই স্থলে এই "ঋণ" শব্দের দৃষ্টতাবশতঃ অর্থাৎ ঐরূপ স্থলেই সেই প্রতিদেয় দ্রব্যে "ঋণ" শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়; এ জন্য (ঐ অর্থেই) "ঋণ" শব্দ প্রধান অর্থাৎ মুখ্য। কিন্তু এই "ঋণ" শব্দে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যে প্রযুক্ত "ঋণ" শব্দে ইহা (প্রধানশব্দত্ব) উপপন্ন হয় না। প্রধান শব্দের উপপত্তি না হওয়ায় গুণ শব্দ অর্থাৎ অপ্রধান বা গৌণ শব্দের দ্বারা অনুবাদ হইয়াছে। (অর্থাৎ) "ঋণৈরিব" এই অর্থে "ঋণৈঃ" এই পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। এই পদ "অপ্রযুক্তোপম", যেমন "মাণবক অগ্নি" এই বাক্যে। বিশদার্থ এই যে, অন্য অর্থে দৃষ্ট এই "ঋণ" শব্দ এই অর্থে অর্থাৎ ঋণসদৃশ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, যেমন মাণবকে অগ্নিশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে [অর্থাৎ "অগ্নির্মাণবকঃ" এই বাক্যে যেমন মাণবক (নবব্রহ্মচারী) অগ্নির ন্যায় তেজস্বী

বলিয়া তাহাকে অগ্নি বলা হইয়াছে, ঐ স্থলে অগ্নিসদৃশ অর্থেই "অগ্নি" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, তদ্রূপ পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিতেও ঋণসদৃশ অর্থেই "ঋণ" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে এবং "ঋণবৎ" শব্দেরও তৎসদৃশ অর্থে প্রয়োগ হইয়াছে—উক্ত স্থলে উপমা অর্থাৎ সাদৃশ্যবোধক কোন শব্দের প্রয়োগ হয় নাই, কিন্তু সাদৃশ্যই বিবক্ষিত]। (প্রশ্ন) গুণ শব্দের দ্বারা অনুবাদ কেন হইয়াছে ? (উত্তর) যেহেতু নিন্দা ও প্রশংসার উপপত্তি হয়। বিশদার্থ এই যে, যেমন ঋণী ব্যক্তি ঋণদান না করায় নিন্দিত হন, তদ্রূপ (ব্রাহ্মণ) কর্ম্মলোপে অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য, পুত্রোৎপাদন ও অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ না করিলে নিন্দিত হন, এবং যেমন ঋণী ব্যক্তি ঋণ দান করায় প্রশংসিত হন, তদ্রূপ (ব্রাহ্মণ) কর্ম্মের (পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মচর্য্যাদির) অনুষ্ঠান করিলে প্রশংসিত হন, তাহাই উপমার্থ।

"জায়মান" এই শব্দটীও গুণশব্দ অর্থাৎ অপ্রধান বা গৌণ শব্দ, যেহেতু বিপর্য্যয়ে অর্থাৎ বৈপরীত্য হইলে (মুখ্যার্থবোধক প্রধান শব্দ হইলে) অধিকার নাই। বিশদার্থ এই যে, "জায়মানো হ বৈ ব্রাহ্মণঃ" ইহাও অপ্রধান শব্দ, গৃহস্থ সম্পদ্যমান অর্থাৎ যিনি গৃহস্থ হইয়াছেন, তিনি "জায়মান" [অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যে "জায়মান" শব্দের গৌণার্থ গৃহস্থ, গৃহস্থ ব্রাহ্মণকেই লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে, জায়মান ব্রাহ্মণ] যে সময়ে এই ব্রাহ্মণ গৃহস্থ হন, সেই সময়ে কর্ম্ম অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মকর্ত্তৃক অধিকৃত হন, যেহেতু মাতা হইতে জায়মানের অর্থাৎ সদ্যোজাত শিশুর অধিকার নাই। (বিশদার্থ) যে সময়ে কিন্তু মাতা হইতে শিশু জন্মে, সেই সময়ে কর্ম্মকর্ত্তৃক অধিকৃত হয় না, অর্থাৎ তখন তাহার কর্ম্মাধিকার হয় না। কারণ, অর্থী অর্থাৎ কামনাবিশিষ্ট এবং সমর্থ ব্যক্তিরই অধিকার হয়, (বিশদার্থ) অর্থী ব্যক্তির কর্ম্মকর্ত্তৃক অধিকার হয়, কারণ, কর্ম্মবিধিতে কামসংযোগের অর্থাৎ ফল-সম্বন্ধের শ্রুতি আছে, (যথা) "স্বর্গকাম ব্যক্তি অগ্নিহোত্র হোম করিবে" ইত্যাদি। এবং যেহেতু সমর্থ ব্যক্তির প্রবৃত্তির সম্ভব হয় ; (বিশদার্থ) সমর্থ ব্যক্তির কর্ম্মকর্ত্তৃক অধিকার হয়, যেহেতু প্রবৃত্তির সম্ভব হয়, (অর্থাৎ) সমর্থ ব্যক্তিই বিহিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, ইতর অর্থাৎ অসমর্থ ব্যক্তি প্রবৃত্ত হয় না। কিন্তু প্রধান শব্দার্থে অর্থাৎ উক্ত শ্রুতিবাক্যে "জায়মান" শব্দের মুখ্য অর্থে উভয়েরই অভাব। (বিশদার্থ) মাতা হইতে জায়মান কুমারে অর্থাৎ সদ্যোজাত শিশুতে অর্থিতা (স্বর্গাদি কামনা) এবং শক্তি অর্থাৎ কর্ম্মসামর্থ্য, উভয়ই নাই। পরন্তু প্রেক্ষাপূর্ব্বকারী অর্থাৎ যথার্থ বুদ্ধিপূর্ব্বক বাক্যরচনাকারী পুরুষের প্রণীতত্ববশতঃ লৌকিক বাক্য হইতে বৈদিক বাক্য

ভিন্ন অর্থাৎ বিজাতীয় নহে। তাহা হইলে লৌকিক ব্যক্তি অপরীক্ষক হইয়াও অর্থাৎ শাস্ত্রপরিশীলনাদিজন্য বুদ্ধিপ্রকর্ষ প্রাপ্ত না হইয়াও জাতমাত্র শিশুকে "অধ্যয়ন কর", "যজ্ঞ কর," "ব্রহ্মচর্য্য কর," এইরূপ বলে না, যুক্তিযুক্ত ও নির্দ্দোষবাদী ঋষি অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত "জায়মানো হ বৈ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের বক্তা ঋষি উপদেশার্থ প্রযুক্ত (কৃতযত্ন) হইয়া কেন এইরূপ উপদেশ করিবেন? নর্ত্তক, অন্ধ ব্যক্তি বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না, গায়ক, বধির ব্যক্তি বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় না, অর্থাৎ নর্ত্তক অন্ধকে উদ্দেশ্য করিয়া নৃত্য করে না, গায়কও বধিরকে উদ্দেশ্য করিয়া গান করে না। উপদিষ্টার্থের বিজ্ঞাতা অর্থাৎ বোদ্ধা ব্যক্তিই উপদেশের বিষয়, (বিশদার্থ) যে ব্যক্তি উপদিষ্ট পদার্থ বুঝে, তাহার প্রতিই উপদেশ করা হয়, কিন্তু জায়মান কুমারে অর্থাৎ সদ্যোজাত শিশুতে ইহা (পূর্ব্বোক্ত উপদেশবিষয়ত্ব) নাই। পরন্তু মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ (বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ নামক অংশবিশেষ) গার্হস্থ্যলিঙ্গ কর্ম্ম অর্থাৎ গার্হস্থ্যের লিঙ্গ বা লক্ষণ পত্নীর সম্বন্ধ যে কর্ম্মে আছে, এমন কর্ম্ম উপদেশ করিতেছে। বিশদার্থ এই যে, "মন্ত্র" ও "ব্রাহ্মণ" যে কর্ম্ম উপদেশ করিতেছে, তাহা পত্নীর সম্বন্ধ প্রভৃতি গার্হস্থ্য-লিঙ্গের দ্বারা উপপন্ন (যুক্ত), অতএব এই জায়মান, গৃহস্থ অভিহিত হইয়াছে, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত "জায়মানো হ বৈ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে "জায়মান" শব্দের অর্থ গৃহস্থ। গৃহস্থ ব্রাহ্মণকেই "জায়মান ব্রাহ্মণ" বলা হইয়াছে।

টিপ্পনী। মহর্ষি "ঋণানুবন্ধ"প্রযুক্ত অপবর্গ অসম্ভব, এই প্রথমোক্ত পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন করিবার জন্য প্রথমে এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, প্রধান শব্দের অনুপপত্তিবশতঃ গৌণ শব্দের দ্বারা অনুবাদ হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। মহর্ষির মূল তাৎপর্য্য এই যে, "জায়মানো হ বৈ" ইত্যাদি যে শ্রুতিবাক্যানুসারে উক্ত পূর্ব্বপক্ষ সমর্থন করা হইয়াছে, ঐ শ্রুতিবাক্যে "জায়মান" শব্দটি প্রধান শব্দ বলা যায় না। কারণ, মুখ্যার্থবোধক শব্দকেই প্রধান শব্দ বলে। উক্ত শ্রুতিবাক্যে "জায়মান" শব্দটি মুখ্যার্থবোধক হইলে "জায়মান ব্রাহ্মণ" বলিতে সদ্যোজাত শিশু ব্রাহ্মণ বুঝা যায়। কিন্তু তাহার ব্রহ্মচর্য্যাদি কর্ম্মাধিকার নাই। সুতরাং তাহার প্রতি ব্রহ্মচর্য্যাদির উপদেশও করা যায় না। অতএব উক্ত শ্রুতিবাক্যে "জায়মান" শব্দ যে, প্রধান শব্দ অর্থাৎ মুখ্যার্থবোধক শব্দ নহে; উহা যে গৌণ শব্দ, অর্থাৎ উহার কোন গৌণ অর্থই বিবক্ষিত, ইহা বুঝা যায়। সেই গৌণ অর্থ গৃহস্থ। অর্থাৎ উক্ত শ্রুতিবাক্যে "জায়মান" শব্দের দ্বারা যিনি ব্রহ্মচর্য্যাদি সমাপনান্তে গৃহস্থ জায়মান, তাঁহাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। ঐ "জায়মান" শব্দটি গৌণ অর্থের বোধক হওয়ায় গুণ শব্দ বা গৌণ শব্দ। কারণ, গৌণ অর্থের বোধক শব্দকেই "গুণ" শব্দ ও "গৌণ" শব্দ বলে। ফলকথা, ব্রহ্মচর্য্য সমাপনান্তে গৃহস্থ দ্বিজাতিই অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞের দ্বারা দেবঋণ হইতে মুক্ত হইবেন এবং পুত্রোৎপাদন করিয়া পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হইবেন, ইহাই "জায়মানো হ বৈ" ইত্যাদি

শ্রুতির তাৎপর্য্য। সুতরাং বৈরাগ্যবশতঃ যথাকালে গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া অথবা তৎপূর্ব্বেই প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে তখন আর তাঁহার অগ্নিহোত্রাদি কর্ত্তব্য নহে। তখন তিনি মোক্ষার্থ শ্রবণমননাদি অনুষ্ঠান করিয়া মোক্ষলাভ করিতে পারেন। অতএব মোক্ষার্থ অনুষ্ঠানের সময় না থাকায় কাহারই মোক্ষ হইতে পারে না ; মোক্ষ অসম্ভব বা অলীক, এই যে পূর্ব্বপক্ষ বলা হইয়াছে, তাহা অযুক্ত।

ভাষ্যকার এই সূত্রের অবতারণা করিতে প্রথমে "যত্তাবদৃণানুবন্ধাদিতি" এই বাক্যের দ্বারা তাঁহার প্রথম ব্যাখ্যাত পূর্ব্বপক্ষ স্মরণ করাইয়া, এই সূত্রের দ্বারা যে, ঐ পূর্ব্বপক্ষই খণ্ডিত হইয়াছে, ইহা প্রকাশ করিয়াছেন এবং পরে "ঋণৈরিব ঋণৈরিতি" এই বাক্যের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যে "ঋণৈঃ" এই পদের ব্যাখ্যা "ঋণৈরিব", ইহা প্রকাশ করিয়া দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের অন্য উক্ত শ্রুতিবাক্যে "ঋণ"শব্দ যে প্রধান শব্দ নহে, উহাও গৌণার্থবোধক গৌণ শব্দ, ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থাৎ ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যে "জায়মান" শব্দের গৌণশব্দত্ব সমর্থন করিতে দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্যই প্রথমে উক্ত শ্রুতিবাক্যে "ঋণ" শব্দের গৌণশব্দত্ব সমর্থন করিয়াছেন। উক্ত শ্রুতিবাক্যে "ঋণ"শব্দ যেমন প্রধান শব্দ অর্থাৎ মুখ্যার্থবোধক শব্দ নহে, কিন্তু গৌণশব্দ, তদ্রূপ "জায়মান" শব্দও প্রধান শব্দ নহে, উহাও গৌণশব্দ, ইহাই এখানে ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য। তাৎপর্য্যটীকাকারও এখানে এইরূপ তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়াছেন। ভাষ্যকার সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে প্রথমে পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যে "ঋণ" শব্দ যে প্রধান শব্দ অর্থাৎ মুখ্যার্থবোধক শব্দ নহে, ইহা বলিয়া, উহার হেতু বলিয়াছেন যে, যে স্থলে এক ব্যক্তি প্রত্যাদেয় ধন দান করে, দ্বিতীয় ব্যক্তি সেই প্রতিদেয় ধন গ্রহণ করে, অর্থাৎ উত্তমর্ণ ব্যক্তি অধমর্ণ ব্যক্তিকে যে ধন দান করে, অধমর্ণ ব্যক্তি যে ধনকে যথাকালে প্রত্যর্পণ করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত থাকে, সেই ধনেই "ঋণ" শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হওয়ায় ঐরূপ ধনই "ঋণ" শব্দের মুখ্য অর্থ। সুতরাং ঐরূপ ধন বুঝাইলেই "ঋণ" শব্দটি প্রধান শব্দ বা মুখ্য শব্দ। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যে যে, ঋষিঋণ প্রভৃতি ঋণত্রয় কথিত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বোক্তরূপ ধন নহে। সুতরাং উহা "ঋণ" শব্দের মুখ্য অর্থ হইতেই পারে না। সুতরাং উক্ত শ্রুতিবাক্যে "ঋণ"শব্দটি প্রধান শব্দ বা মুখ্যার্থবোধক শব্দ নহে, প্রধান শব্দের উপপত্তি না হওয়ায় গুণশব্দ বা গৌণশব্দের দ্বারা অনুবাদ হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। গুণশব্দের দ্বারা কেন অনুবাদ হইয়াছে? এতদুত্তরে সূত্রকার মহর্ষি শেষে উহার হেতু বলিয়াছেন,—"নিন্দাপ্রশংসোপপত্তেঃ"। ভাষ্যকার ইহার তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, যেমন ঋণী অধমর্ণ উত্তমর্ণ ব্যক্তিকে গৃহীত ঋণ প্রত্যর্পণ না করিলে তাহার নিন্দা হয় এবং উহা প্রত্যর্পণ করিলে তাহার প্রশংসা হয়, তদ্রূপ গৃহস্থ দ্বিজাতি অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম না করিলে তাহার নিন্দা হয়, এবং উহা করিলে তাহার প্রশংসা হয়, তাহাই উপমার্থ। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্তরূপ নিন্দা ও প্রশংসা প্রকাশ করিতেই পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যে "ঋণ" শব্দের দ্বারা ব্রহ্মচর্য্যাদি কর্ম্মকে ঋণ বলিয়া শ্রুতিবিহিত ব্রহ্মচর্য্যাদি কর্ম্মেরই অনুবাদ করা হইয়াছে। সপ্রয়োজন পুনরুক্তির নাম "অনুবাদ"। পূর্ব্বোক্তরূপ নিন্দা ও প্রশংসা প্রকাশ করাই উক্ত অনুবাদের উদ্দেশ্য বা প্রয়োজন। "জায়মানো হ বৈ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য বিহিতানুবাদ, পরে ইহা ব্যক্ত হইবে। উক্ত শ্রুতিবাক্যে

"ঋণ"শব্দের অর্থ ঋণসদৃশ, তাই উহা গুণ শব্দ বা গৌণ শব্দ। সদৃশ অর্থে লাক্ষণিক শব্দকেই নৈয়ায়িকগণ গুণ শব্দ ও গৌণ শব্দ বলিয়াছেন। ভাষ্যকার "অগ্নির্মাণবকঃ" এই প্রসিদ্ধ বাক্যে "অগ্নি" শব্দকে ইহার উদাহরণরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। অর্থাৎ মাণবক (নবব্রহ্মচারী) অগ্নি নহে, অগ্নির ন্যায় তেজস্বী বলিয়া তাহাতে অগ্নিসদৃশ অর্থে "অগ্নি" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। ঐ বাক্যে অগ্নিশব্দ যেমন প্রধান শব্দ নহে—গৌণশব্দ, তদ্রূপ পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যে ঋণশব্দ প্রধান শব্দ নহে, গৌণশব্দ, উহার অর্থ ঋণসদৃশ। ভাষ্যকার ইহার পূর্ব্বে "অপ্রযুক্তোপমঞ্চেদং" এই বাক্যের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ঋণশব্দই যে, পূর্ব্বোক্ত অগ্নি শব্দের ন্যায় "অপ্রযুক্তোপম", ইহাই বলিয়াছেন বুঝা যায়। কিন্তু ন্যায়বার্ত্তিকে উদ্দ্যোতকর পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিতে "ঋণবান্ জায়তে" এই বাক্যকেই পরে "অপ্রযুক্তোপম" বলিয়াছেন[1]। তিনি বলিয়াছেন যে, উক্ত বাক্যে উপমা অর্থাৎ সাদৃশ্যবোধক "ইব" শব্দ লুপ্ত, উহার প্রয়োগ হয় নাই—"ঋণবানিব জায়তে" ইহাই ঐ বাক্যের দ্বারা বুঝিতে হইবে। উক্ত বাক্যে অপ্রযুক্ত বা লুপ্ত "ইব" শব্দের অর্থ অস্বাতন্ত্র্য। ঋণবান্ ব্যক্তির যেমন স্বাতন্ত্র্য বা স্বাধীনতা নাই, তদ্রূপ জায়মান অর্থাৎ গৃহস্থ দ্বিজাতির অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মে স্বাতন্ত্র্য নাই, উহা তাঁহার অবশ্যকর্ত্তব্য। গৃহস্থ দ্বিজাতি ঋণবান্ ব্যক্তির ন্যায় পরতন্ত্র হইয়া অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, এই কথা ভাষ্যকারও পরে বলিয়াছেন। এখানে উদ্দ্যোতকরের বার্ত্তিকের পাঠানুসারে "অপ্রযুক্তোপমঞ্চেদং" এইরূপ ভাষ্যপাঠই গৃহীত হইয়াছে।

ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যে ঋণশব্দের গৌণশব্দত্ব সমর্থন করিয়া, উহার ন্যায় "জায়মান" শব্দও যে গৌণশব্দ, ইহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, "জায়মান"শব্দ যদি গুণশব্দ না হইয়া প্রধান শব্দ হয়, তাহা হইলে উহার দ্বারা মাতা হইতে জায়মান অর্থাৎ সদ্যোজাত বুঝা যায়। কিন্তু সদ্যোজাত শিশুর অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মে অধিকার নাই। কারণ, অর্থিত্ব (কামনা) এবং সামর্থ্য না থাকিলে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মাধিকার হইতেই পারে না। কারণ, "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ" ইত্যাদি বৈদিক বিধিবাক্যে স্বর্গরূপ ফলসম্বন্ধের শ্রুতি আছে। সুতরাং স্বর্গকাম ব্যক্তিই ঐ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের অধিকারী। সমর্থ ব্যক্তিই বিহিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, অসমর্থ ব্যক্তির কর্ম্মপ্রবৃত্তি সম্ভব না হওয়ায় তাহার কর্ম্মাধিকার হইতে পারে না। সদ্যোজাত শিশুর স্বর্গকামনা ও অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মসামর্থ্য, এই উভয়ই না থাকায় তাহার ঐ কর্ম্মে অধিকার নাই। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা সদ্যোজাত শিশুকে ব্রহ্মচর্য্য ও অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম করিতে উপদেশ করা হয় নাই, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। কেহ যদি বলেন যে, বেদে ঐরূপ অনেক উপদেশ আছে। লৌকিক যুক্তির দ্বারা বৈদিক উপদেশের বিচার হইতে পারে না। বেদে যাহা কথিত হইয়াছে, তাহাই নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিতে হইবে। এই জন্য ভাষ্যকার শেষে আবার বলিয়াছেন যে, লৌকিক প্রমাণবাক্য হইতে বৈদিক বাক্য বিজাতীয় নহে। কারণ, ঐ উভয় বাক্যই প্রেক্ষা-

---

১। অপ্রযুক্তোপমঞ্চেদং বাক্যং "ঋণবান্ জায়তে" ইতি। উপমাত্র লুপ্তা দ্রষ্টব্যা, ঋণবানিব জায়ত ইতি। ক উপমানার্থঃ? অস্বাতন্ত্র্যং, ঋণবান্ যথা অস্বতন্ত্রঃ, এবময়ং জায়মানঃ কর্ম্মসু অস্বতন্ত্রো বর্ত্তত ইতি।—ন্যায়বার্ত্তিক।

পূর্ব্বকারী পুরুষের প্রণীত। প্রকৃত বিষয়ের যথার্থবোধই এখানে "প্রেক্ষা"। লৌকিক প্রমাণ-বাক্যের বক্তা পুরুষ যেমন ঐ প্রেক্ষাপূর্ব্বক অর্থাৎ বক্তব্য বিষয়টি যথার্থরূপে বুঝিয়া বাক্য রচনা করেন, তদ্রূপ বেদবক্তা পুরুষও প্রেক্ষাপূর্ব্বক বাক্য রচনা করিয়াছেন। সুতরাং লৌকিক প্রমাণবাক্যে যেমন কোন অসম্ভব উপদেশ থাকে না, তদ্রূপ বৈদিক বাক্যেও ঐরূপ কোন অসম্ভব উপদেশ থাকিতে পারে না। পরন্তু লৌকিক ব্যক্তি শাস্ত্র পরিশীলনাদি করিয়া বুদ্ধিপ্রকর্ষ প্রাপ্ত না হইলেও অর্থাৎ সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন হইয়াও সদ্যোজাত শিশুর অনধিকার বুঝিয়া তাহাকে "তুমি অধ্যয়ন কর, যজ্ঞ কর, ব্রহ্মচর্য্য কর," এইরূপ উপদেশ করে না,—যুক্তবাদী ও নির্দ্দোষবাদী ঋষি কেন ঐরূপ উপদেশ করিবেন? অর্থাৎ লৌকিক ব্যক্তিও যাহা করে না, ঋষি তাহা কিছুতেই করিতে পারেন না। সুতরাং সদ্যোজাত শিশুকে তিনি ব্রহ্মচর্য্য ও অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের উপদেশ করেন নাই, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। ভাষ্যকার ইহা সমর্থন করিতে পরে বলিয়াছেন যে, নর্ত্তক অন্ধকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রবৃত্ত হয় না, গায়ক বধিরকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রবৃত্ত হয় না। অর্থাৎ অন্ধের নৃত্যদর্শন-সামর্থ্য নাই জানিয়া, নর্ত্তক তাহাকে নৃত্য দেখাইবার জন্য নৃত্য করে না এবং বধিরের গান শ্রবণের সামর্থ্য নাই জানিয়া, তাহাকে গান শুনাইবার জন্য গায়ক গান করে না। এইরূপ সদ্যোজাত শিশুর ব্রহ্মচর্য্যাদি সামর্থ্য না থাকায় তাহাকে উহা করিতে উপদেশ করা কোন বুদ্ধিমানেরই কার্য্য হইতে পারে না। পরন্তু উপদিষ্ট পদার্থের বোদ্ধা ব্যক্তিই উপদেশের বিষয়, অর্থাৎ প্রকৃত উপদেষ্টা তাদৃশ ব্যক্তিকেই উপদেশ করিয়া থাকেন। কিন্তু সদ্যোজাত শিশু উপদিষ্টার্থ বুঝিতেই পারে না, তাহাতে উপদেশবিষয়ত্বই নাই। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত "জায়মানো হ বৈ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের বক্তা ঋষি সদ্যোজাত শিশুকে ঐরূপ উপদেশ করেন নাই, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। এখানে ভাষ্যকারের কথার দ্বারা তাঁহার মতে কোন ঋষিই যে উক্ত শ্রুতিবাক্যের বক্তা, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। এ বিষয়ে ভাষ্যকারের অন্য কথা ও তাহার আলোচনা পরে পাওয়া যাইবে। ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্তরূপ বিচার করিয়া উক্ত শ্রুতিবাক্যে "জায়মান" শব্দ যে, প্রধান শব্দ নহে, উহা গৌণার্থক গৌণশব্দ, উহার অর্থ গৃহস্থ, ইহাই সমর্থন করিয়াছেন। ভাষ্যকার ইহা সমর্থন করিতে পরে আরও বলিয়াছেন যে, বেদের "মন্ত্র" ও "ব্রাহ্মণ" নামক অংশবিশেষ যে অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ-কর্ম্মের উপদেশ করিয়াছেন, তাহা গার্হস্থ্য-লিঙ্গযুক্ত। গার্হস্থ্যের লিঙ্গ বা লক্ষণ পত্নী[1]। কারণ, পত্নী ব্যতীত গার্হস্থ্য নিষ্পন্ন হয় না। গৃহস্থ শব্দের অন্তর্গত গৃহ শব্দের অর্থ গৃহিণী। অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞকর্ম্মে গৃহিণীর অনেক কর্ত্তব্য বেদে উপদিষ্ট হইয়াছে। গৃহিণী বা পত্নী ব্যতীত অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞকর্ম্ম হইতে পারে না। পতির যজ্ঞকর্ম্মের সহিত তাঁহার শাস্ত্রবিহিত বিশেষ সম্বন্ধ থাকায় তাঁহার নাম পত্নী[2]। অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞকর্ম্মে আরও অনেক কর্ত্তব্যের উপদেশ আছে, যাহা গৃহস্থ দ্বিজাতির

১। গার্হস্থ্যস্য লিঙ্গং পত্নী যস্মিন্ কর্ম্মণি তত্তথোক্তং। "পত্ন্যবেক্ষিতমাজ্যং ভবতি। পত্ন্য উদ্গায়ন্তি। "ক্ষৌমে বসানা বাধীয়তা"মিত্যেবমাদি। তাৎপর্য্যটীকা।

২। "পত্যুর্নো যজ্ঞসংযোগে"।—পাণিনিসূত্র ।৪।১।৩৩ পতিশব্দস্য নকারাদেশঃ স্যাৎ, যজ্ঞেন সম্বন্ধে। বশিষ্ঠস্য পত্নী, তৎকর্ত্তৃকযজ্ঞস্য ফলভোক্ত্রীত্যর্থঃ। দম্পত্যোঃ সহাধিকারাৎ।—সিদ্ধান্তকৌমুদী।

পক্ষেই বিহিত, সুতরাং তাহাও গার্হস্থ্যের লিঙ্গ। সুতরাং বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ নামক অংশে গার্হস্থ্যের লিঙ্গ পত্নীসম্বন্ধাদিযুক্ত অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞকর্ম্মের উপদেশ থাকায় "জায়মানো হ বৈ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে "জায়মান" শব্দের দ্বারা গৃহস্থেরই যজ্ঞকর্ম্মের অনুবাদ হইয়াছে। অর্থাৎ উক্ত শ্রুতিবাক্যে "জায়মান" শব্দের গৌণ অর্থ গৃহস্থ, ইহাই বুঝা যায়। এখানে ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককার পূর্ব্বোক্তরূপ বিচার করিয়া পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যে "জায়মান" শব্দের অর্থ গৃহস্থ, ইহা সমর্থন করিলেও যিনি ব্রহ্মচর্য্য ও গুরুকুলবাস সমাপ্ত করিয়া ঋষিঋণ হইতে মুক্ত হইয়াছেন, সেই গৃহস্থের সম্বন্ধে তখন পূর্ব্বোক্ত ঋণত্রয়ের উল্লেখ সঙ্গত হইতে পারে না, গৃহস্থ ব্রাহ্মণকে পূর্ব্বোক্ত ঋণত্রয়বান্ বলা যায় না, ইহা চিন্তা করা আবশ্যক। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ ইহা চিন্তা করিয়া পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যে "জায়মান" শব্দের গৌণশব্দত্ব সমর্থন করিতে ভাষ্যকারের সন্দর্ভ উদ্ধৃত করিয়াও বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যে "জায়মান" শব্দের অর্থ উপনীত। কারণ, উপনীত বা উপনয়নসংস্কার-বিশিষ্ট হইলেই ব্রহ্মচর্য্যাদিতে অধিকার হয়। পরে গৃহস্থ হইলে তাহার অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মে অধিকার হয়। বস্তুতঃ উপনয়ন সংস্কারের দ্বারা দ্বিজত্ব বা দ্বিতীয় জন্ম নিষ্পন্ন হওয়ায় ঐ দ্বিতীয় জন্ম গ্রহণ করিয়া পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যে "জায়মান" শব্দটি উপনীত অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে, ইহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে এবং উপনীত ব্রাহ্মণ, প্রথমে ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা ঋষিঋণ হইতে মুক্ত হইয়া, পরে গৃহস্থ হইয়া অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞের দ্বারা দেবঋণ হইতে এবং পুত্রোৎপাদনের দ্বারা পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হন, ইহা উক্ত শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য বুঝা যাইতে পারে। অর্থাৎ কালভেদেই উপনীত দ্বিজাতির উক্ত ঋণত্রয়বত্তা বিবক্ষিত বুঝা যায়। কিন্তু কালভেদে গৃহস্থ ব্রাহ্মণকেও উক্ত ঋণত্রয়বান্ বলা যাইতে পারে। কারণ, ব্রহ্মচর্য্য না করিয়া গৃহস্থ হওয়া যায় না। যিনি গৃহস্থ হইবেন, পূর্ব্বে তিনি উপনীত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য করিবেন, ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। সুতরাং যে ব্রাহ্মণ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য অর্থাৎ যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য না করিয়া গৃহস্থ হন, তিনি প্রথমে ব্রহ্মচর্য্যের দ্বারা ঋষিঋণ হইতে মুক্ত হইয়া, পরে দারপরিগ্রহ করিয়া অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞের দ্বারা দেবঋণ হইতে এবং পুত্রোৎপাদনের দ্বারা পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হন, ইহাও উক্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য বুঝা যাইতে পারে। পূর্ব্বোক্ত গৃহস্থ ব্রাহ্মণের যখন পূর্ব্বে ব্রহ্মচর্য্য অবশ্য কর্ত্তব্য, তখন তাঁহাকেও কালভেদে পূর্ব্বোক্ত ঋণত্রয়বান্ বলা যাইতে পারে। বৃত্তিকার বিশ্বনাথের মতেও কালভেদেই উপনীত ব্রাহ্মণের পূর্ব্বোক্ত ঋণত্রয়বত্তা বিবক্ষিত, ইহা বলিতে হইবে। পরন্তু উপনীত ব্রাহ্মণ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হইয়া দার-পরিগ্রহ না করিলে তাহার পক্ষে দেবঋণ ও পিতৃঋণ নাই। সুতরাং উপনীত ব্রাহ্মণমাত্রকেই ঋণত্রয়বান্ বলা যায় না। কিন্তু গৃহস্থ ব্রাহ্মণ শাস্ত্রানুসারে অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞবিশেষ এবং পুত্রোৎপাদন করিতে বাধ্য হওয়ায় তাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত ঋণত্রয়বান্ বলা যাইতে পারে। ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককার পূর্ব্বোক্তরূপ চিন্তা করিয়াই "জায়মানো হ বৈ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে "জায়মান" শব্দের গৌণার্থ বলিয়াছেন গৃহস্থ, ইহাই মনে হয়। যে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের যাবজ্জীবন কর্ত্তব্যতাবশতঃ উহা অপবর্গের প্রতিবন্ধক হওয়ায় অপবর্গ অসম্ভব, ইহা পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিয়াছেন, সেই অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম যে, গৃহস্থেরই কর্ত্তব্য, অন্যের উহাতে অধিকার নাই, ইহাও ভাষ্যকার শেষে

সমর্থন করিয়া পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যে "জায়মান" শব্দের দ্বারা যে, গৃহস্থ অর্থ ই লক্ষিত হইয়াছে, ইহা বুঝাইয়াছেন। ফলকথা, উৎকট বৈরাগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত গৃহস্থ দ্বিজাতি যে, নিত্য অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ এবং পুত্রোৎপাদন করিতে বাধ্য এবং দার-পরিগ্রহের পূর্ব্বে তিনি ব্রহ্মচর্য্য করিতেও বাধ্য, এই সিদ্ধান্তানুসারে ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককার পূর্ব্বোক্তরূপ তাৎপর্য্যেই গৃহস্থ ব্রাহ্মণকেই পূর্ব্বোক্ত ঋণত্রয়বান্ বলিয়াছেন, ইহাই মনে হয়। বৃত্তিকার বিশ্বনাথের বহু পরবর্ত্তী "ন্যায়-সূত্রবিবরণ"কার রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য্য কিন্তু বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যে "জায়মান" শব্দের দ্বারা ব্রহ্মচর্য্যাধিকারী উপনীত এবং অগ্নিহোত্রাধিকারী গৃহস্থ, এই উভয়ই লক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ "জায়মান" শব্দের একই স্থলে লক্ষণার দ্বারা উপনীত এবং গৃহস্থ, এই দ্বিবিধ অর্থ গ্রহণ করিলেও উক্ত শ্রুতিবাক্যে জায়মান ব্রাহ্মণকে কিরূপে ঋণত্রয়বান্ বলা হইয়াছে, ইহা চিন্তা করা আবশ্যক। গোস্বামী ভট্টাচার্য্যের মতে যিনি উপনীত, তিনিও ঋণত্রয়বান্ নহেন—যিনি গৃহস্থ, তিনিও ঋণত্রয়বান্ নহেন। কালভেদে ঋণত্রয়বান্, ইহা বলিলে আর ঐ "জায়মান" শব্দের উপনীত ও গৃহস্থ, এই দ্বিবিধ অর্থে লক্ষণা স্বীকার অনাবশ্যক। ঐরূপ লক্ষণা সমীচীনও মনে হয় না। সুধীগণ পূর্ব্বোক্ত সকল কথার বিচার করিবেন। অন্যান্য কথা ক্রমে ব্যক্ত হইবে।

ভাষ্য। **অর্থিত্বস্য চাবিপরিণামে জরামর্য্যবাদোপপত্তিঃ[১]। যাবচ্চাস্য ফলেনার্থিত্বং ন বিপরিণমতে ন নিবর্ত্ততে, তাবদনেন কর্ম্মানুষ্ঠেয়-মিত্যুপপদ্যতে জরামর্য্যবাদস্তং প্রতীতি। "জরয়া হ বে"ত্যায়ুষস্তুরীয়স্য চতুর্থস্য প্রব্রজ্যাযুক্তস্য বচনং। "জরয়া হ বা এষ এতস্মাদ্বি-মুচ্যতে" ইতি, আয়ুষস্তুরীয়ং চতুর্থং প্রব্রজ্যাযুক্তং জরেত্যুচ্যতে, তত্র হি প্রব্রজ্যা বিধীয়তে। অত্যন্তসংযোগে "জরয়া হ বে"ত্যনর্থকং। অশক্তো বিমুচ্যতে ইত্যেতদপি নোপপদ্যতে, স্বয়মশক্তস্য বাহ্যাং শক্তিমাহ। "অন্তেবাসী বা জুহুয়াদ্ব্রহ্মণা স পরিক্রীতঃ," "ক্ষীরহোতা বা জুহুয়াদ্ধনেন স পরিক্রীত" ইতি। অথাপি বিহিতং বাঽনূদ্যেত কামাদ্বাঽর্থঃ পরিকল্প্যেত? বিহিতানুবচনং ন্যায্যমিতি। ঋণবানিবাস্বতন্ত্রো গৃহস্থঃ কর্ম্মসু প্রবর্ত্তত ইত্যুপপন্নং বাক্যস্য সামর্থ্যং। ফলস্য সাধনানি প্রযত্ন-বিষয়ো ন ফলং, তানি সম্পন্নানি ফলায় কল্পন্তে। বিহিতঞ্চ জায়মানং, বিধীয়তে চ জায়মানং, তেন যঃ সম্বধ্যতে সোঽয়ং জায়মান ইতি।**

অনুবাদ। এবং অর্থিত্বের (কামনার) বিপরিণাম (নিবৃত্তি) না হইলে "জরা-

---

১। তদনেন গার্হস্থ্যাৎ পূর্ব্বাবস্থা তাবদৃণানুবন্ধা ন ভবতীত্যুক্তং, সম্প্রত্যুত্তরাবস্থাপি ন ঋণানুবন্ধেত্যাহ—যদা চার্থিনোঽধিকারস্তদাঽর্থিত্বস্যাবিপরিণামে জরামর্য্যবাদোপপত্তিঃ।—তাৎপর্য্যটীকা।

মর্ষ্যবাদে"র অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত "জরামর্ষ্যং বা" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের উপপত্তি হয়। বিশদার্থ এই যে, যাবৎকাল পর্য্যন্ত ইহার অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত গৃহস্থ দ্বিজাতির ফলার্থিত্ব (স্বর্গাদি ফলকামনা) বিপরিণত না হয়, (অর্থাৎ) নিবৃত্ত না হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত এই গৃহস্থ দ্বিজাতি কর্ত্তৃক কর্ম্ম (অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম) অনুষ্ঠেয়, এ জন্য তাঁহার সম্বন্ধে জরামর্ষ্যবাদ উপপন্ন হয়। "জরয়া হ বা" এই বাক্যের দ্বারা আয়ুর প্রব্রজ্যা-যুক্ত তুরীয় (অর্থাৎ) চতুর্থ ভাগের কথন হইয়াছে। বিশদার্থ এই যে, "জরয়া হ বা এষ এতস্মাদ্বিমুচ্যতে" এই শ্রুতিবাক্যে আয়ুর প্রব্রজ্যাযুক্ত তুরীয় (অর্থাৎ) চতুর্থ খণ্ড "জরা" এই শব্দের দ্বারা কথিত হইয়াছে, যেহেতু সেই সময়ে প্রব্রজ্যা বিহিত হইয়াছে। অত্যন্ত-সংযোগ হইলে অর্থাৎ সকল অবস্থাতেই গৃহস্থ দ্বিজাতির অগ্নি-হোত্রাদি কর্ম্ম যাবজ্জীবন কর্ত্তব্য হইলে "জরয়া হ বা" এই বাক্য ব্যর্থ হয়। অশক্ত অর্থাৎ অত্যন্ত জরাবশতঃ অগ্নিহোত্রাদি কার্য্যে অসমর্থ গৃহস্থ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম-কর্ত্তৃক বিযুক্ত হয়, ইহাও উপপন্ন হয় না। (কারণ) স্বয়ং অশক্ত গৃহস্থের পক্ষে (শ্রুতি) বাহ্যশক্তি বলিয়াছেন (যথা)—"অন্তেবাসী হোম করিবে সেই অন্তেবাসী বেদদ্বারা পরিক্রীত," "অথবা ক্ষীরহোতা (অধ্বর্য্যু) হোম করিবে, সেই ক্ষীরহোতা ধনের দ্বারা অর্থাৎ দক্ষিণার দ্বারা পরিক্রীত"।

পরন্তু (প্রশ্ন) বিহিত অনূদিত হইয়াছে ? অথবা স্বেচ্ছামাত্রপ্রযুক্ত অর্থ অর্থাৎ কোন অপ্রাপ্ত পদার্থ কল্পিত হইয়াছে ? অর্থাৎ "জায়মানো হ বৈ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য কি শ্রুত্যন্তরের দ্বারা বিহিত ব্রহ্মচর্য্যাদির অনুবাদ ? অথবা উহা জায়মান বালকেরই ব্রহ্মচর্য্যাদির বিধি ? (উত্তর) বিহিতানুবাদই ন্যায্য অর্থাৎ যুক্তিযুক্ত। ঋণবান্ ব্যক্তির ন্যায় অস্বতন্ত্র গৃহস্থ কর্ম্মসমূহে (অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মে) প্রবৃত্ত হন, এ জন্য বাক্যের অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যের সামর্থ্য (যোগ্যতা) উপপন্ন হয়। ফলের সাধনসমূহই প্রযত্নের বিষয়, ফল প্রযত্নের বিষয় নহে ; সেই সাধনসমূহ সম্পন্ন হইয়া ফলের নিমিত্ত সমর্থ হয় অর্থাৎ ফলজনক হয় [অর্থাৎ বালকের আত্মা স্বর্গাদি-ফললাভে যোগ্য হইলেও ফলের সাধন অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম যাহা প্রযত্নের বিষয় অর্থাৎ কর্ত্তব্য, তদ্বিষয়ে বালকের যোগ্যতা না থাকায় পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা বালকের পক্ষে অগ্নিহোত্রাদি বিধি বুঝা যায় না, সুতরাং উহা বিহিতানুবাদ] জায়মান বিহিত হইয়াছে এবং জায়মানই বিহিত হইতেছে[1] অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত "জায়মানো হ বৈ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের পূর্ব্বে অন্য শ্রুতিবাক্যের দ্বারা গৃহস্থেরই জায়মান যজ্ঞাদি কর্ম্ম

১। বিহিতঞ্চ জায়মানমিতি শাখাবাক্যাৎ প্রাক্, বিধীয়তে চ ঋণবাক্যাদূর্দ্ধমিত্যর্থঃ।—তাৎপর্য্যটীকা।

বিহিত হইয়াছে এবং উহার পরেও অন্যান্য শ্রুতিবাক্যে গৃহস্থেরই জায়মান যজ্ঞাদি বিহিত হইতেছে ; সেই জায়মানের সহিত যিনি সম্বন্ধ, সেই এই "জায়মান"। (অর্থাৎ জায়মান বিহিত কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ বলিয়াই পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যে "জায়মান" শব্দের গৌণ অর্থ গৃহস্থ, ইহা বুঝা যায়)।

টিপ্পনী। ভাষ্যকার পূর্ব্বে "জায়মানো হ বৈ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে "জায়মান" শব্দের গৌণ অর্থ গৃহস্থ, ইহা বিচারপূর্ব্বক সমর্থন করিয়া, গৃহস্থ দ্বিজাতিরই যাবজ্জীবন কর্ত্তব্য অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মে অধিকারবশতঃ গৃহস্থ হইবার পূর্ব্বে ঐ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের কর্ত্তব্যতা না থাকায় তখন অপবর্গার্থ অনুষ্ঠান সম্ভব হইতে পারে, সুতরাং তখন অধিকারিবিশেষের পক্ষে অপবর্গ অসম্ভব নহে, ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এখন গৃহস্থ হইয়াও যে অগ্নিহোত্রাদি ত্যাগ করিয়া অপবর্গার্থ অনুষ্ঠান করিতে পারে, ইহা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, যে কাল পর্য্যন্ত স্বর্গাদি কামনার নিবৃত্তি না হয়, সেই কাল পর্য্যন্তই অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম অনুষ্ঠেয়। তাদৃশ গৃহস্থের সম্বন্ধেই "জরামর্য্যং বা" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ স্বর্গই যাঁহার কাম্য, যাঁহার স্বর্গকামনার নিবৃত্তি হয় নাই, তাদৃশ গৃহস্থই মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত স্বর্গার্থ অগ্নিহোত্রাদি করিবেন। কিন্তু যাঁহার স্বর্গকামনা নিবৃত্ত হইয়াছে, যিনি মুমুক্ষু, তিনি অগ্নিহোত্রাদি ত্যাগ করিয়া মোক্ষার্থ শ্রবণমননাদি অনুষ্ঠান করিবেন। তিনি তখন স্বর্গফলক অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞের অধিকারীই নহেন। কারণ, তিনি তখন "স্বর্গকাম" নহেন। এখানে স্মরণ করা আবশ্যক যে, ভাষ্যকার পূর্ব্বে "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ" [মৈত্রী উপনিষৎ, ৬।৩৬] ইত্যাদি বৈদিক বিধিবাক্যকে গ্রহণ করিয়া, কর্ম্মবিধিতে যে ফলসম্বন্ধ শ্রুতি আছে, ইহা প্রদর্শন করিয়া স্বর্গরূপ ফলার্থী গৃহস্থ দ্বিজাতিই যে, অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞের অধিকারী, ইহা সমর্থন করিয়াছেন। বার্ত্তিককারও এখানে স্পষ্ট বলিয়াছেন যে, সমস্ত কর্ম্মবিধিবাক্যে ফলসম্বন্ধশ্রুতি আছে। কিন্তু কাম্য অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞের বিধিবাক্যে ফলসম্বন্ধশ্রুতি থাকিলেও যাবজ্জীবন কর্ত্তব্য নিত্য অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞের বিধিবাক্যে ফল-সম্বন্ধশ্রুতি নাই। মহর্ষি জৈমিনি পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পাদের প্রারম্ভে "যাবজ্জীবিকোঽভ্যাসঃ কর্ম্মধর্ম্মঃ প্রকরণাৎ" ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা কাম্য অগ্নিহোত্রাদি হইতে ভিন্ন যাবজ্জীবন কর্ত্তব্য নিত্য অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞের প্রতিপাদন করিয়াছেন। সেখানে ভাষ্যকার শবরস্বামী বেদের অন্তর্গত বহ্বৃচব্রাহ্মণের "যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি" এবং "যাবজ্জীবং দর্শপূর্ণমাসাভ্যাং যজেত" এই বিধিবাক্যদ্বয় উদ্ধৃত করিয়া, উক্ত বিধিবাক্যের দ্বারা যে নিত্য অগ্নিহোত্র এবং নিত্য দর্শযাগ ও পূর্ণমাস যাগেরই বিধান হইয়াছে, ইহা প্রদর্শন করিয়া, পরে "জরামর্য্যং বা" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারাও পূর্ব্বোক্ত অগ্নিহোত্র, দর্শ ও পূর্ণমাস-যাগের যাবজ্জীবনকর্ত্তব্যতা বা নিত্যতা সমর্থন করিয়াছেন। "শাস্ত্রদীপিকা"কার পার্থসারথিমিশ্রও সেখানে সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, প্রত্যবায় পরিহারের জন্য যাবজ্জীবন অগ্নিহোত্র ও দর্শ এবং পূর্ণমাস যাগ কর্ত্তব্য। সুতরাং গৃহস্থ দ্বিজাতির স্বর্গকামনা নিবৃত্তি হইলে কাম্য অগ্নিহোত্রাদি কর্ত্তব্য না হইলেও প্রত্যবায় পরিহারের জন্য নিত্য অগ্নিহোত্রাদি যাবজ্জীবনই কর্ত্তব্য, উহা তিনি কখনই ত্যাগ করিতে পারেন না। মনে হয়, ভাষ্যকার

এই জন্যই শেষে বলিয়াছেন যে, "জরামর্য্যং বা" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে শেষে "জরয়া হ বা" এই বাক্যের দ্বারা আয়ুর চতুর্থ ভাগই কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ উক্ত শ্রুতিবাক্যের শেষে "জরয়া হ বা এষ এতস্মাদ্বিমুচ্যতে" এই বাক্যে যে জরাশব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, উহার অর্থ আয়ুর প্রব্রজ্যাযুক্ত চতুর্থ ভাগ। কারণ, আয়ুর চতুর্থ ভাগেই প্রব্রজ্যা বিহিত হইয়াছে। বস্তুতঃ আয়ুর তৃতীয় ভাগে বনবাস বা বানপ্রস্থাশ্রম অবলম্বন করিয়া, চতুর্থ ভাগেই যে, প্রব্রজ্যা অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে, ইহা ভগবান্ মনুও বলিয়াছেন[১]। তাহা হইলে উক্ত শ্রুতিবাক্যে "জরয়া হ বা এষ এতস্মাদ্বিমুচ্যতে" এই কথার দ্বারা বুঝা যায় যে, গৃহস্থ দ্বিজাতি "জরা" অর্থাৎ আয়ুর চতুর্থ ভাগ কর্তৃক পূর্ব্বোক্ত অগ্নিহোত্রাদি হইতে বিমুক্ত হন। অর্থাৎ আয়ুর চতুর্থ ভাগে সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে তখন আর তাঁহার নিত্য অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মও করিতে হয় না। কারণ, তখন তিনি ঐ সমস্ত বাহ্য কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, আত্মজ্ঞানের জন্যই শ্রবণ মননাদি অনুষ্ঠান করিবেন, ইহাই শাস্ত্রসিদ্ধান্ত। উক্ত শ্রুতিবাক্যে "জরা"শব্দের যে উক্ত লাক্ষণিক অর্থই বিবক্ষিত, ইহা সমর্থন করিতে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, যদি ঐ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের সহিত সমগ্র জীবনের অত্যন্ত-সংযোগ বা ব্যাপ্তিই বিবক্ষিত হয় অর্থাৎ মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের কর্ত্তব্যতাই যদি উক্ত শ্রুতিবাক্যের প্রতিপাদ্য হয়, তাহা হইলে উক্ত শ্রুতিবাক্যের শেষে "মৃত্যুনা হ বা" এই বাক্যের দ্বারাই উহা প্রতিপন্ন হওয়ায় "জরয়া হ বা" এই বাক্য ব্যর্থ হয়। সুতরাং "জরয়া হ বা" এই বাক্যে "জরা" শব্দের দ্বারা যে, কোন কালবিশেষই লক্ষিত হইয়াছে, ইহা বুঝা যায়। আয়ুর চতুর্থ ভাগই সেই কালবিশেষ। তৎকালে প্রব্রজ্যার বিধান থাকায় যিনি প্রব্রজ্যা বা সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন, তিনি অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম হইতে বিমুক্ত হইবেন এবং যিনি অধিকারাভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ না করিয়া গৃহস্থই থাকিবেন অথবা বানপ্রস্থ থাকিবেন, তিনি মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত নিত্য অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম করিবেন, ইহাই উক্ত শ্রুতিবাক্যে "জরয়া হ বা এষ এতস্মাদ্বিমুচ্যতে মৃত্যুনা হ বা" এই বাক্যের তাৎপর্য্য।

অবশ্যই বলা যাইতে পারে যে, জরাগ্রস্ত হইয়া অত্যন্ত অশক্ত হইলে তখন গৃহস্থ অগ্নিহোত্রাদি হইতে বিমুক্ত হন, অর্থাৎ তখন তিনি উহা পরিত্যাগ করিতে পারেন। আর অত্যন্ত অশক্ত না হইলে মৃত্যু না হওয়া পর্য্যন্ত উহা কর্ত্তব্য, ইহাই উক্ত শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য। সুতরাং "জরয়া হ বা" এই বাক্য ব্যর্থ নহে, "জরা" শব্দের পূর্ব্বোক্তরূপ লাক্ষণিক অর্থ-গ্রহণও অনাবশ্যক ও অযুক্ত। ভাষ্যকার শেষে ইহা খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, অশক্ত গৃহস্থ অগ্নিহোত্রাদি হইতে বিমুক্ত হন, এইরূপ তাৎপর্য্যও উপপন্ন হয় না। কারণ, স্বয়ং অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মে অশক্ত গৃহস্থের পক্ষে শ্রুতিতে বাহ্য শক্তি কথিত হইয়াছে। শ্রুতি বলিয়াছেন, "অন্তেবাসী অর্থাৎ শিষ্য হোম করিবেন, তিনি বেদদ্বারা পরিক্রীত।" অর্থাৎ গুরু তাঁহাকে বেদ প্রদান করায় তদ্দ্বারা তিনি ক্রীত অর্থাৎ গুরুর অধীন হইয়াছেন, তিনি গুরুর আদেশানুসারে প্রতিনিধিরূপে গুরুর কর্ত্তব্য অগ্নিহোত্রাদি করিবেন; তাহাতেই গুরুর কর্ত্তব্য সিদ্ধ হইবে। যাঁহার শিষ্য উপস্থিত নাই, অথবা যে কোন কারণে তাঁহার

১। বনেষু তু বিহৃত্যৈবং তৃতীয়ং ভাগমায়ুষঃ।
চতুর্থমায়ুষো ভাগং ত্যক্ত্বা সঙ্গান্ পরিব্রজেৎ ।—মনুসংহিতা ।৬।৩৩।

দ্বারা অগ্নিহোত্রাদি কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইতে পারে না, তখন ঐরূপ ব্রাহ্মণের এবং অশক্ত ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পক্ষে অধ্বর্যু অর্থাৎ যজুর্ব্বেদজ্ঞ পুরোহিত দক্ষিণা লাভের জন্য অগ্নিহোত্রাদি করিবেন। তিনি ধনদ্বারা ক্রীত অর্থাৎ দক্ষিণারূপ ধনের দ্বারা যজমানের অধীন হওয়ায় অশক্ত যজমানের নিজকর্ত্তব্য অগ্নিহোত্রাদি করিবেন। এইরূপ স্মৃতিশাস্ত্রে ঋত্বিক্ ও পুত্রপ্রভৃতি অনেক প্রতিনিধির উল্লেখ হইয়াছে[১]। সুতরাং অত্যন্ত অশক্ত হইলে প্রতিনিধির দ্বারাও অগ্নিহোত্রাদি কার্য্যের বিধান থাকায়, অত্যন্ত অশক্ত গৃহস্থ অগ্নিহোত্রাদি হইতে বিমুক্ত হইবেন অর্থাৎ তখন উহা করিতেই হইবে না, ইহা উক্ত শ্রুতির তাৎপর্য্য বুঝা যায় না। সুতরাং "জরা" শব্দের দ্বারা অত্যন্ত অশক্ততাই উপলক্ষিত হইয়াছে, ইহা কিছুতেই বলা যায় না। অতএব উক্ত "জরা" শব্দের দ্বারা আয়ুর চতুর্থ ভাগই লক্ষিত হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে "জরয়া হ বা" এই বাক্যের সার্থক্যও হয়। "ক্ষীরহোতা বা জুহুয়াৎ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে "ক্ষীরহোতৃ" শব্দের দ্বারা অধ্বর্য্যু অর্থাৎ যজুর্ব্বেদজ্ঞ পুরোহিতই বিবক্ষিত, ইহা বুঝা যায়। কারণ, কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রের ভাষ্যকার কর্কাচার্য্য কোন সূত্রে "ক্ষীরহোতৃ" শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিতে বলিয়াছেন যে,[২] "ক্ষীরহোতৃ" শব্দের অবয়বার্থ বা যোগার্থ পরিত্যাগ করিলে উহার দ্বারা অধ্বর্য্যু বুঝা যায়। তদনুসারে পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যেও "ক্ষীরহোতৃ" শব্দের দ্বারা আমরা অধ্বর্য্যু বুঝিতে পারি। যজুর্ব্বেদজ্ঞ পুরোহিতের নাম অধ্বর্য্যু।

কেহ যদি বলেন যে, শ্রুতিতে গৃহস্থের পক্ষে যদিও যজ্ঞাদির অন্যান্য বিধিবাক্য আছে, তাহা হইলেও "জায়মানো হ বৈ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা বালকেরও পৃথক্ যজ্ঞাদির বিধান হইয়াছে, ইহাই বুঝিব; "জায়মান" শব্দের গৌণ অর্থ স্বীকার করিয়া, উক্ত শ্রুতিবাক্যকে বিহিতানুবাদ বলিয়া বুঝিব কেন? ভাষ্যকার এই আশঙ্কার খণ্ডন করিতে পরে প্রশ্ন করিয়াছেন যে, "জায়মানো হ বৈ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা কি বিহিতেরই অনুবাদ হইয়াছে, অথবা উহার দ্বারা স্বেচ্ছামাত্রপ্রযুক্ত কোন অপ্রাপ্ত পদার্থেরই কল্পনা করিবে? অর্থাৎ বালকের পক্ষে কোন শ্রুতির দ্বারাই যে যজ্ঞাদি পদার্থ প্রাপ্ত বা বিহিত হয় নাই, উক্ত শ্রুতিবাক্য সেই যজ্ঞাদির বিধায়ক, ইহাই বুঝিবে? ভাষ্যকার উক্ত উভয় পক্ষের মধ্যে প্রথম পক্ষকেই সিদ্ধান্তরূপে সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, বিহিতানুবাদই ন্যায্য অর্থাৎ যুক্তিযুক্ত। অর্থাৎ অন্যান্য শ্রুতির দ্বারা গৃহস্থ ব্রাহ্মণের যে যজ্ঞাদি বিহিত হইয়াছে, "জায়মানো হ বৈ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য তাহারই অর্থানুবাদ, উহা "জায়মান" অর্থাৎ বালক ব্রাহ্মণের সম্বন্ধে পৃথক্ করিয়া যজ্ঞাদির বিধায়ক বা বিধিবাক্য নহে। মহর্ষি গোতম ন্যায়দর্শনের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের শেষে বেদের ব্রাহ্মণভাগরূপ বাক্যকে বিধিবাক্য, অর্থবাদবাক্য ও অনুবাদবাক্য, এই ত্রিবিধ বলিয়াছেন এবং তন্মধ্যে অনুবাদ-বাক্যকে বিধ্যনুবাদ ও বিহিতানুবাদ, এই দ্বিবিধ বলিয়াছেন। তন্মধ্যে শব্দানু-

১। ঋত্বিক্ পুত্রো গুরুর্ভ্রাতা ভাগিনেয়োঽথ বিট্‌পতিঃ।
এভিরেব হুতং যত্তু তদ্ধুতং স্বয়মেবহি॥—দক্ষসংহিতা, ২ অঃ, ২১ শ্লোক।

২। "বাগ্‌যতো দোহপ্রভৃত্যাহোমাৎ ক্ষীরহোতা চেৎ"। কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্র [চতুর্থ অঃ, ৩৪৫ সূত্র]।
"ক্ষীরহোতা" প্রত্যস্তমিতাবয়বার্থবৃত্তিরত্রাধ্বর্য্যুরুচ্যতে।—কর্কভাষ্য।

বাদের নাম "বিধ্যনুবাদ" এবং অর্থানুবাদের নাম "বিহিতানুবাদ" (দ্বিতীয় খণ্ড, ৩৩৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। অন্যান্য যে সকল শ্রুতির দ্বারা গৃহস্থ ব্রাহ্মণের যজ্ঞাদি বিহিত হইয়াছে, "জায়মানো হ বৈ" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা ঐ সকল শ্রুতির অর্থেরই অনুবাদ হওয়ায় উহা "বিহিতানুবাদ"। তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে ভাষ্যকারের গূঢ় তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়াছেন যে, "জায়মানো হ বৈ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে বিধিবোধক (বিধিলিঙ্ প্রভৃতি) কোন বিভক্তি নাই। সুতরাং উহা যে প্রমাণান্তরসিদ্ধ পদার্থেরই অনুবাদ—বিধিবাক্য নহে, ইহা সহজেই বুঝা যায়। অবশ্য যদি উক্ত শ্রুতিবাক্যে কথিত ব্রহ্মচর্য্য ও যজ্ঞাদির বিধায়ক আর কোন শ্রুতিবাক্য বা প্রমাণান্তর না থাকিত, তাহা হইলে "জায়মানো হ বৈ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যকেই বিধিবাক্য বলিয়া কল্পনা বা স্বীকার করিতে হইত। কিন্তু উক্ত শ্রুতিবাক্যে কথিত ব্রহ্মচর্য্য ও যজ্ঞাদির বিধায়ক বহু শ্রুতিবাক্য আছে, তাহাতে বিধিবোধক বিভক্তিও প্রযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং গৃহস্থের পক্ষে যজ্ঞাদি কর্ম্ম যে অন্যান্য অনেক বিধিবাক্যের দ্বারা বিহিতই হইয়াছে, ইহা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে "জায়মানো হ বৈ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যকে "বিহিতানুবাদ" বলিয়া, "জায়মান" শব্দকে গুণশব্দ অর্থাৎ লাক্ষণিক শব্দ বলিয়া গ্রহণ করাই সমুচিত। "জায়মান" শব্দের মুখ্যার্থ গ্রহণ করিয়া উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা বালক ব্রাহ্মণেরও স্বর্গাদিসাধক যজ্ঞাদির বিধান হইয়াছে, এইরূপ কল্পনা করা সমুচিত নহে। কারণ, ঐরূপ কল্পনা কামপ্রযুক্ত অর্থাৎ স্বেচ্ছামাত্রপ্রযুক্ত, উহাতে কোন প্রমাণ নাই। ফলকথা, উক্ত শ্রুতিবাক্যে "জায়মান" শব্দের লাক্ষণিক অর্থ গৃহস্থ। ঋণী ব্যক্তির ন্যায় অস্বতন্ত্র গৃহস্থ যজ্ঞাদি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন অর্থাৎ তিনি শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞাদি কর্ম্ম করিতে বাধ্য, উহা পরিত্যাগ করিতে তাঁহার স্বাতন্ত্র্য নাই, ইহাই উক্ত শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্যার্থ। সুতরাং উক্ত শ্রুতিবাক্যের সামর্থ্য অর্থাৎ যোগ্যতা উপপন্ন হয়। অর্থাৎ উক্ত শ্রুতিবাক্যে "ঋণ" শব্দের ন্যায় "জায়মান" শব্দকে লাক্ষণিক না বলিলে উহা "বহ্নিনা সিঞ্চতি" ইত্যাদি বাক্যের ন্যায় অযোগ্য বাক্য হয়। কারণ, সদ্যোজাত বা বালক ব্রাহ্মণের যজ্ঞাদিকর্তৃত্ব অসম্ভব হওয়ায় তাহার সম্বন্ধে যজ্ঞাদির বিধান সম্ভবই হইতে পারে না। সুতরাং "জায়মান" শব্দের পূর্ব্বোক্ত লাক্ষণিক অর্থ গ্রহণ করিয়া, উক্ত শ্রুতিবাক্যের পূর্ব্বোক্তরূপ তাৎপর্য্য বুঝিলেই উক্ত বাক্যের যোগ্যতা উপপন্ন হইতে পারে।

বিরুদ্ধবাদী যদি বলেন যে, উক্ত শ্রুতিবাক্যে ঋণ শব্দ যে গৌণ শব্দ, ইহা অবশ্য বুঝা যায় এবং ঐ ঋণ শব্দের অর্থ যে, ঋণসদৃশ, ইহাও অবশ্য বুঝা যায়। ঐরূপ গৌণ শব্দের প্রয়োগ শ্রুতিতেও অন্যত্র বহু স্থলে দেখাও যায়। কিন্তু জায়মান শব্দের অর্থ যে গৃহস্থ, ইহা বুঝা যায় না। জায়মান শব্দের ঐরূপ অর্থে প্রয়োগ আর কোথায় দেখাও যায় না। সুতরাং ঐ জায়মান শব্দের মুখ্যার্থ গ্রহণ করিয়া, উক্ত শ্রুতিবাক্যকে বালক ব্রাহ্মণের ব্রহ্মচর্য্য ও যজ্ঞাদির বিধায়ক বাক্য বলাই উচিত। উহাকে বিহিতানুবাদ বলিলে উক্ত শ্রুতিবাক্যে জায়মান শব্দে অপ্রসিদ্ধ লক্ষণা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তদপেক্ষায় উক্ত শ্রুতিবাক্যকে বিধি বা বিধায়ক বাক্য বলাই উচিত। অবশ্য বালক ব্রাহ্মণের ব্রহ্মচর্য্য ও যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানের যোগ্যতা নাই, ইহা সত্য, কিন্তু তাহার ফললাভে যোগ্যতা অবশ্যই আছে। কারণ, তাহার আত্মাও স্বর্গাদি ফলের

সমবায়ি কারণ। ফলই মুখ্য প্রয়োজন, ফলের সাধন ঐরূপ প্রয়োজন নহে। ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত অসঙ্গত উক্তির প্রতিবাদ করিতে শেষে আবারও বলিয়াছেন যে, ফলের সাধনসমূহই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে প্রযত্নের বিষয়, ফল প্রযত্নের বিষয় নহে। ফলের সাধনসমূহ সম্পন্ন হইয়া ফলের জনক হয়। তাৎপর্য্যটীকাকার, ভাষ্যকারের গূঢ় তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, বিধিবাক্য পুরুষকে স্বকীয় ব্যাপারে কর্ত্তৃত্বরূপে নিযুক্ত করে। প্রযত্নই পুরুষের স্বকীয় ব্যাপার, সুতরাং উহা উহার সাক্ষাৎ বিষয়কে অপেক্ষা করে। সাক্ষাৎ বিষয় লাভ ব্যতীত প্রযত্ন হইতেই পারে না। কিন্তু স্বর্গাদি ফল ঐ প্রযত্নের উদ্দেশ্যরূপ বিষয় হইলেও উহা সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রযত্নের বিষয় নহে। ফলের সাধন বা উপায় কর্ম্মই সাক্ষাৎসম্বন্ধে প্রযত্নের বিষয়। কারণ, বিধিবাক্যার্থবোদ্ধা পুরুষ স্বর্গাদি ফলের জন্য কর্ম্মই করে, স্বর্গাদি করে না ; স্বর্গাদির সাধন কর্ম্ম সম্পন্ন হইলে উহাই স্বর্গাদি ফল উৎপন্ন করে। কিন্তু ফলের সাধন কর্ম্ম বিষয়ে অজ্ঞ সদ্যোজাত বালক ঐ কর্ম্ম করিতে অসমর্থ; সুতরাং তাহার ঐ কর্ম্মে কর্ত্তৃত্বই সম্ভব না হওয়ায় ঐ কর্ম্ম তাহার প্রযত্নের বিষয় হইতেই পারে না। সুতরাং তাহার ঐ কর্ম্মে অধিকারই না থাকায় "জায়মানো হ বৈ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা তাহার সম্বন্ধে ব্রহ্মচর্য্য ও যজ্ঞাদির বিধান হইয়াছে, ইহা কিছুতেই বলা যায় না। অতএব উক্ত শ্রুতিবাক্যকে বিহিতানুবাদ বলিয়া, জায়মান শব্দ যে লাক্ষণিক,—উহার অর্থ গৃহস্থ, ইহাই বলিতে হইবে। তবে জায়মান শব্দ গৃহস্থ অর্থে লাক্ষণিক হইলে জায়মান শব্দের মুখ্যার্থ কি এবং তাহার সহিত গৃহস্থের যে সম্বন্ধ আছে, ইহা বলা আবশ্যক। নচেৎ জায়মান শব্দের দ্বারা যে লক্ষণার সাহায্যে গৃহস্থ অর্থ বুঝা যায়, ইহা প্রতিপন্ন হয় না। তাই ভাষ্যকার সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন যে, জায়মান বিহিত হইয়াছে এবং জায়মান বিহিত হইতেছে, সেই জায়মানের সহিত যিনি সম্বদ্ধ, তিনি জায়মান। ভাষ্যকারের গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাই জায়মান শব্দের মুখ্য অর্থ; সুতরাং যাহা গৃহস্থের প্রযত্নের দ্বারা উৎপন্ন হয়, সেই সমস্ত কর্ম্মও জায়মান শব্দের দ্বারা বুঝা যায় অর্থাৎ সেই সমস্ত কর্ম্মও জায়মান শব্দের মুখ্যার্থ। তাহা হইলে "জায়মানো হ বৈ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের পূর্ব্বে যে সকল কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে এবং উহার পরে যে সকল কর্ম্ম বিহিত হইতেছে, ঐ সমস্ত কর্ম্মও জায়মান অর্থাৎ ঐ সমস্ত কর্ম্মও জায়মান শব্দের মুখ্যার্থ, ইহা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে জায়মান ঐ সমস্ত কর্ম্মের সহিত যখন গৃহস্থেরই সম্বন্ধ—কারণ, গৃহস্থের কর্ত্তব্যরূপেই ঐ সমস্ত কর্ম্ম বিহিত, তখন জায়মান শব্দের দ্বারা লক্ষণার সাহায্যে গৃহস্থ অর্থ বুঝা যাইতে পারে। কারণ, গৃহস্থের সম্বন্ধেই ঐ সমস্ত কর্ম্ম বিহিত হওয়ায় গৃহস্থে উহার কর্ত্তৃত্ব বা অধিকারিত্ব-সম্বন্ধ আছে। সুতরাং জায়মান কর্ম্মের অধিকারী গৃহস্থই উক্ত শ্রুতিবাক্যে "জায়মান" শব্দের লাক্ষণিক অর্থ। উহা ঋণশব্দের ন্যায় সদৃশার্থে লাক্ষণিক না হইলেও লাক্ষণিক শব্দ বলিয়া উহাকেও গুণশব্দ অর্থাৎ অপ্রধান শব্দ বলা হইয়াছে।

ভাষ্য। **প্রত্যক্ষবিধানাভাবাদিতি চেৎ ? ন, প্রতিষেধস্যাপি প্রত্যক্ষবিধানাভাবাদিতি।** প্রত্যক্ষতো বিধীয়তে গার্হস্থ্যং

ব্রাহ্মণেন, যদি চাশ্রমান্তরমভবিষ্যৎ, তদপি ব্যধাস্যত প্রত্যক্ষতঃ, প্রত্যক্ষ-বিধানাভাবান্নাস্ত্যাশ্রমান্তরমিতি। **ন, প্রতিষেধস্যাপি প্রত্যক্ষতো বিধানাভাবাৎ,** ন, প্রতিষেধোঽপি বৈ ব্রাহ্মণেন প্রত্যক্ষতো বিধীয়তে, ন সন্ত্যাশ্রমান্তরাণি, এক এব গৃহস্থাশ্রম ইতি, প্রতিষেধস্য প্রত্যক্ষতোঽশ্রবণাদযুক্তমেতদিতি। **অধিকারাচ্চ বিধানং বিদ্যান্তরবৎ।** যথা শাস্ত্রান্তরাণি স্বে স্বেঽধিকারে প্রত্যক্ষতো বিধায়কানি, নার্থান্তরাভাবাৎ, এবমিদং ব্রাহ্মণং গৃহস্থশাস্ত্রং স্বেঽধিকারে প্রত্যক্ষতো বিধায়কং নাশ্রমান্তরাণামভাবাদিতি।

ঋগ্‌ব্রাহ্মণঞ্চাপবর্গাভিধায্যভিধীয়তে, ঋচশ্চ ব্রাহ্মণানি চাপবর্গাভিবাদীনি ভবন্তি। ঋচশ্চ তাবৎ—

"কর্ম্মভির্ম্মৃত্যুমৃষয়ো নিষেদুঃ প্রজাবন্তো দ্রবিণমিচ্ছমানাঃ।
অথাপরে ঋষয়ো মনীষিণঃ পরং কর্ম্মভ্যোঽমৃতত্বমানশুঃ" (১)॥

"ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকেঽমৃতত্বমানশুঃ।
পরেণ নাকং নিহিতং গুহায়াং বিভ্রাজতে যদ্‌যতয়ো বিশন্তি" (২)॥

[বাজসনেয়িসংহিতা (৩১।১৮)। তৈত্তিরীয় আরণ্যক (৩।১২।৭)। কৈবল্যোপনিষৎ—১ম খণ্ড, ২।৩। নারায়ণোপনিষৎ]

১। অনেক গ্রন্থকার এই শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র "সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী"তে উক্ত শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়া, কর্ম্ম দ্বারা যে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি বা মুক্তি হয় না, ইহা সমর্থন করিয়াছেন। তিনি তাৎপর্য্যটীকায় লিখিয়াছেন—"মৃত্যুমিতি প্রেত্যভাবমিত্যর্থঃ। "পরং কর্ম্মভ্য" ইতি কর্ম্মত্যাগমপবর্গসাধনং সূচয়তি। "অমৃতত্ব"-মিতি চাপবর্গো দর্শিতঃ।

২। সূচিতং কর্ম্মত্যাগমপবর্গসাধনং শ্রুত্যন্তরেণ বিশদয়তি "ন কর্ম্মণা ন প্রজয়ে"তি। "পরেণ নাক"মিতি। "নাক"মিতি অবিদ্যামুপলক্ষয়তি, অবিদ্যায়াঃ পরমিত্যর্থঃ। "নিহিতং গুহায়া"মিতি লৌকিকপ্রমাণাগোচরত্বং দর্শয়তি।—তাৎপর্য্যটীকা।

"ত্যাগেন নিখিল-শ্রৌত-স্মার্ত্তকর্ম্মপরিত্যাগেন পরমহংসাশ্রমরূপেণ। "একে" মহাত্মানঃ সম্প্রদায়বিদঃ। অমৃতত্ব-মবিদ্যাদিমরণভাবরাহিত্যং। "আনশু"রানশিরে প্রাপ্তাঃ।—কৈবল্যোপনিষদের শঙ্করানন্দকৃত "দীপিকা"। "একে" মুখ্যাঃ। নারায়ণকৃত "দীপিকা"।

"পরেণ" পরস্তাৎ। ("নাকং পরেণ") স্বর্গস্যোপরি ইত্যর্থঃ। অথবা "পরেণ" পরং, "নাকং" আনন্দাত্মানং। "নিহিতং" ক্ষিপ্তং স্বয়মেব স্থিতং। "গুহায়াং" বুদ্ধৌ। বিভ্রাজতে বিশেষেণ স্বয়ংপ্রকাশত্বেন দীপ্যতে। "যৎ" প্রসিদ্ধং বিশ্বব্যাপি স্বরূপং। "যতয়ঃ" কৃতসন্ন্যাসাঃ প্রযত্নবন্তো ব্রহ্মসাক্ষাৎকারং সম্প্রতিপন্নাঃ। "বিশন্তি" প্রবিশন্তি। ইদং বয়ং স্ম ইতি সাক্ষাৎকারেণ তদেব ভবন্তীত্যর্থঃ।—শঙ্করানন্দকৃত "দীপিকা"। "গুহায়াং" অজ্ঞানগহ্বরে। —নারায়ণকৃত দীপিকা।

"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" (১) ॥
(শ্বেতাশ্বতর, তৃতীয় অঃ, ৮ম)।

অথ ব্রাহ্মণানি—

"ত্রয়ো ধর্ম্ম-স্কন্ধা যজ্ঞোঽধ্যয়নং দানমিতি প্রথমস্তপ এব, দ্বিতীয়ো ব্রহ্মচার্য্যাচার্য্যকুলবাসী, তৃতীয়োঽত্যন্তমাত্মানমাচার্য্যকুলেঽবসাদয়ন্ সর্ব্ব এবৈতে পুণ্যলোকা ভবন্তি, ব্রহ্মসংস্থোঽমৃতত্বমেতি (২)।"
(ছান্দোগ্য-উপনিষৎ, দ্বিতীয় অঃ, ২৩শ খণ্ড)

"এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তী"তি (৩)।
(বৃহদারণ্যক, চতুর্থ অঃ, চতুর্থ ব্রাঃ—২২শ)

"অথো খল্বাহুঃ কামময় এবায়ং পুরুষ ইতি, স যথাকামো ভবতি তৎক্রতুর্ভবতি, যৎক্রতুর্ভবতি তৎ কর্ম্ম কুরুতে, যৎ কর্ম্ম কুরুতে তদভিসম্পদ্যতে (৪)।"—[বৃহদারণ্যক।৪।৪।৫] ইতি কর্ম্মভিঃ সংসরণমুক্ত্বা প্রকৃতমন্যদুপদিশন্তি—

১। "বেদ" জানে। তমেতং পরমাত্মানং অদ্বৈতং প্রত্যগাত্মানং সাক্ষিণং "পুরুষং",—"মহান্তং" সর্ব্বাত্মত্বাৎ। "আদিত্যবর্ণং" প্রকাশরূপং। "তমসো"ঽজ্ঞানাৎ পরস্তাৎ। তমেব "বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি" মৃত্যুমত্যেতি কস্মাদস্মান্নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে"ঽয়নায়" পরমপদপ্রাপ্তয়ে।—শঙ্করভাষ্য। "তমসঃ পরস্তা"দিতি অবিদ্যা তমঃ, তস্য পরস্তাৎ। "আদিত্যবর্ণ"মিতি নিত্যপ্রকাশমিত্যর্থঃ। তদনেন ঈশ্বরপ্রণিধানস্যাপবর্গোপায়ত্বমুক্তং —তাৎপর্য্যটীকা।

২। ত্রয়স্ত্রিসংখ্যাকা ধর্ম্মস্য স্কন্ধা ধর্ম্মস্কন্ধা ধর্ম্মপ্রবিভাগা ইত্যর্থঃ। কে তে ইত্যাহ যজ্ঞোঽগ্নিহোত্রাদিঃ। অধ্যয়নং সনিয়মস্য ঋগাদেরভ্যাসঃ। দানং বহির্ব্বেদি যথাশক্তি দ্রব্য-সংবিভাগো ভিক্ষমাণেভ্যঃ। ইত্যেষ প্রথমো ধর্ম্মস্কন্ধঃ। তপ এব দ্বিতীয়ঃ, "তপ" ইতি কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি, তদ্বাংস্তাপসঃ পরিব্রাড়্ বা, ন ব্রহ্মসংস্থ আশ্রমধর্ম্মমাত্রসংস্থঃ. ব্রহ্মসংস্থস্য ত্বমৃতত্বশ্রবণাৎ, দ্বিতীয়ো ধর্ম্মস্কন্ধঃ। ব্রহ্মচার্য্যাচার্য্যকুলে বস্তুং শীলমস্যেতি আচার্য্যকুলবাসী। অত্যন্তং যাবজ্জীবমাত্মানং নিয়মৈরাচার্য্যকুলেঽবসাদয়ন্ ক্ষপয়ন্ দেহং তৃতীয়ো ধর্ম্মস্কন্ধঃ। "অত্যন্ত"মিত্যাদি বিশেষণান্নৈষ্ঠিক ইত্যবগম্যতে। "সর্ব্ব এতে ত্রয়োঽপ্যাশ্রমিণো যথোক্তৈর্ধর্ম্মৈঃ পুণ্যলোকা ভবন্তি। পুণ্যো লোকো যেষাং ত ইমে পুণ্যলোকা আশ্রমিণো ভবন্তি। অবশিষ্টস্ত্বনুক্তঃ পরিব্রাড় ব্রহ্মসংস্থো ব্রহ্মণি সম্যক্ স্থিতঃ সোঽমৃতত্বং পুণ্যলোকবিলক্ষণমমরণভাবমাত্যন্তিকমেতি, নাপেক্ষিকং দেবাদ্যমৃতত্ববৎ, পুণ্যলোকাৎ পৃথগমৃতত্বস্য বিভাগকরণাৎ।—শাঙ্করভাষ্য।

"যজ্ঞ" ইত্যাদিনা গৃহস্থাশ্রমো দর্শিতঃ। "তপ" এবেতি বানপ্রস্থাশ্রমঃ. "ব্রহ্মচারী"তি ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমঃ। এষামভ্যুদয়লক্ষণং ফলমাহ "সর্ব্ব এবৈত" ইতি। চতুর্থাশ্রমমাহ "ব্রহ্মসংস্থ" ইতি।—তাৎপর্য্যটীকা।

৩। এতমেবাত্মানং স্বং লোকমিচ্ছন্তঃ প্রার্থয়ন্তঃ প্রব্রাজিনঃ প্রব্রজনশীলাঃ প্রব্রজন্তি প্রকর্ষেণ ব্রজন্তি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সন্ন্যসন্তীত্যর্থঃ।—শাঙ্করভাষ্য।

৪। "অথো" অপরে বন্ধমোক্ষকুশলাঃ খল্বাহুঃ......তস্মাৎ কামময় এবায়ং পুরুষঃ......যস্মাৎ সচ কামময়ঃ সন্ যাদৃশেন কামেন যথাকামো ভবতি তৎক্রতুর্ভবতি স কাম ঈষদভিলাষমাত্রেণাভিব্যক্তো যস্মিন্ বিষয়ে ভবতি সোঽবিহন্য-

"ইতি নু কাময়মানোঽথাকাময়মানো যোঽকামো নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকামো ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতী"তি (১)।

(বৃহদারণ্যক, চতুর্থ অঃ, চতুর্থ ব্রাঃ—৬)

তত্র যদুক্তমৃণানুবন্ধাদপবর্গাভাব ইত্যেতদযুক্তমিতি।

"যে চত্বারঃ পথয়ো দেবযানাঃ"—(তৈত্তিরীয় সংহিতা,—৫।৭।২।৩)

ইতি চ চাতুরাশ্রম্যশ্রুতেরৈকাশ্রম্যানুপপত্তিঃ ॥৫৯॥

অনুবাদ। প্রত্যক্ষতঃ বিধান না থাকায় (আশ্রমান্তর নাই) ইহা যদি বল ? না, অর্থাৎ তাহা বলিতে পার না, যেহেতু প্রতিষেধেরও প্রত্যক্ষতঃ বিধান নাই। বিশদার্থ এই যে, (পূর্ব্বপক্ষ) "ব্রাহ্মণ"কর্ত্তৃক অর্থাৎ বেদের "ব্রাহ্মণ" নামক অংশ-বিশেষকর্ত্তৃক প্রত্যক্ষতঃ গার্হস্থ্য (গৃহস্থাশ্রম) বিহিত হইয়াছে যদি আশ্রমান্তর থাকিত, তাহাও প্রত্যক্ষতঃ বিহিত হইত, প্রত্যক্ষতঃ (আশ্রমান্তরের) বিধান না থাকায় আশ্রমান্তর অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রম ভিন্ন আশ্রম নাই। (উত্তর) না, যেহেতু প্রতিষেধেরও প্রত্যক্ষতঃ বিধান নাই। বিশদার্থ এই যে, আশ্রমান্তর নাই, একই গৃহস্থাশ্রম, এইরূপে প্রতিষেধও অর্থাৎ আশ্রমান্তরের অভাবও "ব্রাহ্মণ" কর্ত্তৃক প্রত্যক্ষতঃ বিহিত হয় নাই ; প্রত্যক্ষতঃ প্রতিষেধের অশ্রবণবশতঃ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ কোন শ্রুতির দ্বারাই আশ্রমান্তর নাই, একই গৃহস্থাশ্রম, এই সিদ্ধান্তের শ্রবণ না হওয়ায় ইহা অর্থাৎ আশ্রমান্তর নাই, এই মত অযুক্ত। পরন্তু শাস্ত্রান্তরের ন্যায় অধিকারপ্রযুক্ত বিধান হইয়াছে। বিশদার্থ এই যে, যেমন শাস্ত্রান্তরসমূহ স্ব স্ব অধিকারে প্রত্যক্ষতঃ বিধায়ক, পদার্থান্তরের অভাববশতঃ নহে, এইরূপ গৃহস্থশাস্ত্র

মানঃ স্ফুটীভবন্ ক্রতুত্বমাপদ্যতে। ক্রতুর্নামাধ্যবসায়ো নিশ্চয়ো যদনন্তরা ক্রিয়া প্রবর্ত্ততে। যৎক্রতুর্ভবতি যাদৃক্-কামকার্য্যেণ ক্রতুনা যথারূপক্রতুরস্য, সোঽয়ং যৎক্রতুর্ভবতি তৎ কর্ম্ম কুরুতে, যদ্বিষয়ঃ ক্রতুস্তৎফলনির্ব্বৃত্তয়ে যদ্যোগ্যং কর্ম্ম তৎ কুরুতে নির্ব্বর্ত্তয়তি। যৎ কর্ম্ম কুরুতে তদভিসম্পদ্যতে, তদীয়ং ফলমভিসম্পদ্যতে।—শঙ্করভাষ্য।

১। "ইতিনু" এবংনু কাময়মানঃ সংসরতি, যস্মাৎ কাময়মান এবৈবং সংসরতি অথ তস্মাদকাময়মানো ন ক্বচিৎ সংসরতি।......কথং পুনরকাময়মানো ভবতি? "যোঽকামো" ভবত্যসাবকাময়মানঃ। কথমকামতেত্যুচ্যতে "যো নিষ্কামঃ", যস্মান্নির্গতাঃ কামাঃ সোঽয়ং নিষ্কামঃ। কথং কামা নির্গচ্ছন্তি? য "আপ্তকামো" ভবতি আপ্তাঃ কামা যেন স আপ্তকামঃ। কথমাপ্যন্তে কামাঃ? "আত্মকামত্বেন,—যস্যাত্মৈব নান্যঃ কাময়িতব্যো বস্ত্বন্তরভূতঃ পদার্থো ভবতি।......"তস্যৈব অকাময়মানস্য কর্ম্মাভাবে গমনকারণাভাবাৎ প্রাণা বাগাদয়ো নোৎক্রামন্তি, কিন্তু বিদ্বান্ স ইহৈব ব্রহ্ম যদ্যপি দেহবানিব লক্ষ্যতে, স ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি"।—শাঙ্কর ভাষ্য। "কাময়মানো য আসীৎ স এবাথাকাময়মানো ভবতি। অকাময়মানঃ কামান্ পরিহরন্ তৎপরিহারসিদ্ধৌ সোঽকাময়ন্, তস্য ব্যাখ্যানং "নিষ্কাম" ইতি। "আত্মকাম"ইতি কৈবল্যোপেতাত্মকামঃ, তৎপ্রাপ্ত্যা আপ্তকামো ভবতি। "ন তস্য প্রাণা" ইতি শাশ্বতো ভবতীত্যর্থঃ।—তাৎপর্য টীকা।

অর্থাৎ গৃহস্থের কর্ত্তব্যবোধক শাস্ত্র এই "ব্রাহ্মণ" ("ব্রাহ্মণ"নামক বেদাংশ) স্বকীয় অধিকারে অর্থাৎ গৃহস্থের কর্ত্তব্য বিষয়েই প্রত্যক্ষতঃ বিধায়ক, আশ্রমান্তরের অভাব-বশতঃ নহে।

অপবর্গপ্রতিপাদক "ঋক্" ও "ব্রাহ্মণ"ও কথিত হইতেছে, অপবর্গপ্রতিপাদক অনেক ঋক্ (মন্ত্র) এবং ব্রাহ্মণ অর্থাৎ "ব্রাহ্মণ"নামক শ্রুতিও আছে। ঋক্ বলিতেছি,—

"পুত্রবান্ ও ধনেচ্ছু ঋষিগণ অর্থাৎ গৃহস্থ ঋষিগণ কর্ম্মদ্বারা মৃত্যু (পুনর্জ্জন্ম) লাভ করিয়াছেন। এবং অপর মনীষী ঋষিগণ অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগী জ্ঞানী ঋষিগণ কর্ম্ম হইতে পর অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগজনিত অমৃতত্ব (মোক্ষ) লাভ করিয়াছেন।"

"কর্ম্মদ্বারা নহে, পুত্রের দ্বারা নহে, ধনের দ্বারা নহে, এক (মুখ্য) অর্থাৎ সন্ন্যাসী জ্ঞানিগণ কর্ম্মত্যাগের দ্বারা মোক্ষ লাভ করিয়াছেন। 'নাক' অর্থাৎ অবিদ্যা হইতে পর গুহানিহিত (লৌকিক প্রমাণের অগোচর) যে বস্তু অর্থাৎ ব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশিত হন, যতিগণ (সন্ন্যাসী জ্ঞানিগণ) যাঁহাতে প্রবেশ করেন অর্থাৎ যাঁহাকে লাভ করেন।"

"আমি আদিত্যবর্ণ (নিত্যপ্রকাশ) তমঃপর অর্থাৎ অবিদ্যা হইতে পর (অবিদ্যাশূন্য) এই মহান্ পুরুষকে অর্থাৎ ব্রহ্মকে জানি, তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করে অর্থাৎ মুক্তিলাভ করে, "অয়নে"র নিমিত্ত অর্থাৎ পরম-পদপ্রাপ্তি বা মোক্ষ-লাভের নিমিত্ত অন্য পন্থা নাই।"

অনন্তর "ব্রাহ্মণ" অর্থাৎ বেদের ব্রাহ্মণ-ভাগের অন্তর্গত কতিপয় শ্রুতিবাক্য (বলিতেছি),—

"ধর্ম্মের স্কন্ধ অর্থাৎ বিভাগ তিনটি—যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান; ইহা প্রথম বিভাগ। তপস্যাই দ্বিতীয় বিভাগ। আচার্য্যকুলে অত্যন্ত (যাবজ্জীবন) আত্মাকে অবসন্ন করতঃ অর্থাৎ দেহযাপন করতঃ আচার্য্যকুলবাসী ব্রহ্মচারী, তৃতীয় বিভাগ। ইঁহারা সকলেই অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত যজ্ঞাদিকারী গৃহস্থ, তপস্যাকারী, বানপ্রস্থ এবং নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, এই ত্রিবিধ আশ্রমীই পুণ্যলোক (পুণ্যলোক প্রাপ্ত) হন, "ব্রহ্মসংস্থ" অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ চতুর্থাশ্রমী সন্ন্যাসী অমৃতত্ব (মোক্ষ) প্রাপ্ত হন"।

"এই লোককেই অর্থাৎ আত্মলোককেই ইচ্ছা করতঃ প্রব্রজনশীল ব্যক্তিগণ প্রব্রজ্যা করেন অর্থাৎ সর্ব্ব কর্ম্ম সন্ন্যাস করেন"।

"এবং (বন্ধ-মোক্ষ-কুশল অন্য ব্যক্তিগণও) বলিয়াছেন,—এই পুরুষ (জীব)

কামময়ই, সেই পুরুষ "যথাকাম" (যেরূপ কামনাবিশিষ্ট) হয়, "তৎক্রতু" অর্থাৎ সেই কামজনিত অধ্যবসায়সম্পন্ন হয়, "যৎক্রতু" হয়, অর্থাৎ যেরূপ অধ্যবসায়-সম্পন্ন হয়, সেই কর্ম্ম করে, অর্থাৎ যে বিষয়ে অধ্যবসায়সম্পন্ন হয়, তাহার ফল সম্পাদনের জন্য যোগ্য কর্ম্ম করে; যে কর্ম্ম করে, তাহা অভিসম্পন্ন হয়, অর্থাৎ সেই কর্ম্মের ফলপ্রাপ্ত হয়।"—এই সমস্ত বাক্যের দ্বারা কর্ম্মদ্বারা সংসার বলিয়া অর্থাৎ কামই কর্ম্মের মূল এবং ঐ কর্ম্মদ্বারা জীবের পুনঃ পুনঃ সংসারই হয়, মোক্ষ হয় না, এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়া, (পরে) অপর প্রকৃত বিষয় উপদেশ করিতেছেন—

"এইরূপ কামনাবিশিষ্ট পুরুষ (সংসার করে); অতএব কামনাশূন্য পুরুষ (সংসার করে না)। যিনি "অকাম" "নিষ্কাম" "আপ্তকাম" "আত্মকাম" অর্থাৎ যিনি কৈবল্যবিশিষ্ট আত্মাকে কামনা করিয়া কৈবল্য বা মোক্ষ প্রাপ্ত হওয়ায় আপ্তকাম হইয়া সর্ব্ববিষয়ে নিষ্কাম হন, তাঁহার প্রাণ উৎক্রান্ত হয় না অর্থাৎ মৃত্যুকালে তাঁহার প্রাণের ঊর্দ্ধগতি হয় না অথবা মৃত্যু হয় না, তিনি ব্রহ্মই হইয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন"।

তাহা হইলে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত নানা শ্রুতিবাক্যের দ্বারা চতুর্থাশ্রম প্রতিপন্ন হইলে "ঋণানুবন্ধপ্রযুক্ত অপবর্গের অভাব" এই যে (পূর্ব্বপক্ষ) উক্ত হইয়াছে, ইহা অযুক্ত।

"দেবযান (দেবলোকপ্রাপক) যে চারিটি পথ অর্থাৎ যে চারিটি আশ্রম," এই শ্রুতিবাক্যেও চতুরাশ্রমের শ্রবণবশতঃ এক আশ্রমের অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রমই একমাত্র আশ্রম, এই সিদ্ধান্তের উপপত্তি হয় না।

টিপ্পনী। ভাষ্যকার পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, আয়ুর চতুর্থ ভাগে প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) বিহিত হওয়ায় ঐ সময়ে মোক্ষের জন্য শ্রবণমননাদি অনুষ্ঠানের কোন বাধক নাই। কারণ, যজ্ঞাদি কর্ম্ম যাহা মোক্ষার্থ অনুষ্ঠানের প্রতিবন্ধকরূপে কথিত হইয়াছে, তাহা গৃহস্থেরই কর্ত্তব্য, চতুর্থাশ্রমী সন্ন্যাসীর ঐ সমস্ত পরিত্যাজ্য। ভাষ্যকার এখন পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে পূর্ব্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, অন্য আশ্রমের প্রত্যক্ষ বিধান না থাকায় উহা বেদবিহিত নহে, সুতরাং উহা নাই। অর্থাৎ শ্রুতিতে সাক্ষাৎ বিধিবাক্যের দ্বারা গৃহস্থাশ্রম ভিন্ন আর কোন আশ্রমের বিধান পাওয়া যায় না, অন্য আশ্রম থাকিলে অবশ্য তাহারও ঐরূপ বিধান পাওয়া যাইত; সুতরাং অন্য আশ্রম নাই, গৃহস্থাশ্রমই একমাত্র আশ্রম। তাহা হইলে যজ্ঞাদি কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মোক্ষের জন্য অনুষ্ঠান করিবার সময় না থাকায় মোক্ষের অভাব অর্থাৎ মোক্ষ অসম্ভব, এই পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের নিরাস হইতে পারে না। বস্তুতঃ গৃহস্থাশ্রম ভিন্ন আর যে, কোন আশ্রম নাই, একমাত্র গৃহস্থাশ্রমই বেদবিহিত, ইহাও

একটি সুপ্রাচীন মত, ইহা বুঝিতে পারা যায়। কারণ, সংহিতাকার মহর্ষি গৌতম প্রথমে চতুরাশ্রমবাদের উল্লেখ করিয়া, শেষে গৃহস্থাশ্রমই একমাত্র আশ্রম, এই মতের উল্লেখ করিয়াছেন[1] এবং তিনিও গার্হস্থ্যের প্রত্যক্ষ বিধানকেই ঐ মতের সাধক হেতু বলিয়াছেন। তাঁহার নিজেরও যে, উহাই মত, ইহাও তাঁহার ঐ চরম উক্তির দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। পরন্তু মহর্ষি জৈমিনিও যে, বেদে গৃহস্থাশ্রম ভিন্ন আর কোন আশ্রমের বিধি স্বীকার করেন নাই, তিনি ব্রহ্মচর্য্যাদিবোধক শ্রুতিসমূহের অন্যরূপ উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহা বেদান্তদর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পাদের অষ্টাদশ সূত্রে কথিত হইয়াছে এবং উহার পরে মহর্ষি বাদরায়ণের মতে যে, আশ্রমান্তরও অনুষ্ঠেয়, ইহা কথিত ও সমর্থিত হইয়াছে। শারীরকভাষ্যকার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য সেখানে প্রথম সূত্রের ভাষ্যে জৈমিনির মতের যুক্তি প্রকাশ করিয়া, পরে বাদরায়ণের মতের ব্যাখ্যা করিতে একাশ্রমবাদ খণ্ডন করিয়া, চতুরাশ্রমবাদেরই সমর্থন করিয়াছেন। পূর্ব্বপক্ষবাদীর প্রথম কথা এই যে, শ্রুতিতে প্রত্যক্ষতঃ কেবল গৃহস্থাশ্রমেরই বিধান পাওয়া যায়। এবং ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের পঞ্চাশীতি (৮৫) সূক্তের বিবাহ-প্রকরণীয় অনেক শ্রুতির দ্বারা গৃহস্থাশ্রমেরই বিধান বুঝা যায়। যজ্ঞাদি কর্ম্মবোধক বেদের "ব্রাহ্মণ"-ভাগের দ্বারাও গৃহস্থাশ্রমেরই বৈধত্ব বুঝা যায়। সুতরাং স্মৃতি, ইতিহাস ও পুরাণে যে চতুরাশ্রমের বিধি আছে, তাহা শ্রুতিবিরুদ্ধ হওয়ায় প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। কারণ, শ্রুতিবিরুদ্ধ স্মৃতি অপ্রমাণ, ইহা মহর্ষি জৈমিনি স্পষ্ট বলিয়াছেন[2]। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের অর্থাৎ একাশ্রমবাদের সমর্থন পক্ষে শেষ কথা বলিয়াছেন যে, শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে আশ্রমান্তরের বিধান থাকিলেও তাহা অনধিকারীর সম্বন্ধেই গ্রহণ করা যায়। অর্থাৎ অন্ধ পঙ্গু প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তি গৃহস্থোচিত যজ্ঞাদি কর্ম্মে অনধিকারী, তাহাদিগের সম্বন্ধেই আশ্রমান্তর বিহিত হইয়াছে। কিন্তু গৃহস্থোচিত কর্ম্মসমর্থ ব্যক্তির পক্ষে একমাত্র গৃহস্থাশ্রমই বিহিত,—তাঁহার পক্ষে কখনও অন্য আশ্রম নাই। শঙ্করাচার্য্য বৃহদারণ্যক উপনিষদের ভাষ্যে চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণের ব্যাখ্যা সমাপ্ত করিয়া, শেষে উক্ত মতভেদের বিস্তৃত সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি সেখানে প্রথমে পূর্ব্বোক্ত মতের সমর্থন করিতে সমস্ত বক্তব্য প্রকাশ করিয়া, পরে উহার খণ্ডনপূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রমের অবশ্যকত্ব ও বৈধত্ব সমর্থন করিয়াছেন। বিশেষ জিজ্ঞাসু তাহা দেখিলে এখানে জ্ঞাতব্য অনেক বিষয় জানিতে পারিবেন।

ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের প্রকাশ ও ব্যাখ্যা করিয়া, উহার খণ্ডন করিতে প্রথমে বলিয়াছেন যে, গৃহস্থাশ্রম ভিন্ন আশ্রম নাই, ইহা বলা যায় না। কারণ, বেদের ব্রাহ্মণভাগে আশ্রমান্তরের প্রত্যক্ষতঃ বিধান না থাকিলেও আশ্রমান্তরের প্রতিষেধ অর্থাৎ অভাবেরও প্রত্যক্ষতঃ বিধান নাই। অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রম ভিন্ন আশ্রম গ্রহণ করিবে না, এইরূপ নিষেধও কোন

১। "তস্যাশ্রমবিকল্পমেকে ব্রুবতে ব্রহ্মচারী গৃহস্থো ভিক্ষুর্বৈখানস ইতি"।
"ঐকাশ্রম্যন্ত্বাচার্য্যাঃ প্রত্যক্ষবিধানাদ্গার্হস্থ্যস্য"।—গৌতমসংহিতা, তৃতীয় অঃ।

২। "বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাদসতি হ্যনুমানম্"।—জৈমিনিসূত্র (পূর্ব্বমীমাংসাদর্শন, ১।৩।৩)

প্রত্যক্ষ শ্রুতির দ্বারা শ্রুত হয় না। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষবাদীর পূর্ব্বোক্ত যুক্তির দ্বারা আশ্রমান্তর নাই, একমাত্র গৃহস্থাশ্রমই আশ্রম, এই সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন হয় না। ভাষ্যকারের গূঢ় তাৎপর্য্য এই যে, কোন শ্রুতির সহিত চতুরাশ্রমবিধায়ক স্মৃতির বিরোধ হইলে মহর্ষি জৈমিনির "বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাৎ" এই বাক্যানুসারে ঐ সমস্ত স্মৃতির অপ্রামাণ্য বলা যাইতে পারে। কিন্তু কোন শ্রুতির সহিত ঐ সমস্ত স্মৃতির বস্তুতঃ কোন বিরোধ নাই। কারণ, কোন শ্রুতির দ্বারাই আশ্রমান্তরের নিষেধ বিহিত হয় নাই। পরন্তু কোন শ্রুতির সহিত স্মৃতির বিরোধ না থাকিলে ঐ স্মৃতির দ্বারা উহার মূল শ্রুতির অনুমানই করিতে হইবে, ইহাও শেষে মহর্ষি জৈমিনি "অসতি হ্যনুমানং" এই বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন। স্মৃতির দ্বারা উহার মূল যে শ্রুতির অনুমান করিতে হয়, তাহার নাম অনুমেয়শ্রুতি। উহা উচ্ছন্ন বা প্রচ্ছন্ন হইলেও প্রত্যক্ষ শ্রুতির ন্যায় প্রমাণ। সুতরাং চতুরাশ্রমবিধায়ক বহু স্মৃতির দ্বারা উহার মূল যে শ্রুতির অনুমান করা যায়, তদ্দ্বারা চতুরাশ্রমই যে শ্রুতিবিহিত, ইহা অবশ্য বুঝা যায়। প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি চতুরাশ্রমই বেদবিহিত হয়, তাহা হইলে বেদের "ব্রাহ্মণ"-ভাগে একমাত্র গৃহস্থাশ্রমেরই বিধান হইয়াছে কেন? অন্য আশ্রমের বিধান না হওয়ায় উহার প্রতিষেধও অনুমান করা যাইতে পারে, অর্থাৎ অন্য আশ্রম নাই, ইহাও বেদের সিদ্ধান্ত বলিয়া বুঝা যাইতে পারে। ভাষ্যকার এই জন্য পরে বলিয়াছেন যে, বেদের "ব্রাহ্মণ"ভাগে অধিকারপ্রযুক্তই কেবল গৃহস্থাশ্রমের বিধান হইয়াছে, আশ্রমান্তরের অভাবপ্রযুক্ত নহে। যেমন "বিদ্যান্তরে" অর্থাৎ ব্যাকরণাদিশাস্ত্রান্তরে স্বীয় অধিকারপ্রযুক্তই ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের বিধান হইয়াছে। তাহাতে যে, অন্য পদার্থের বিধান হয় নাই, তাহা অন্য পদার্থের অভাবপ্রযুক্ত নহে। তাৎপর্য্য এই যে, বেদের ব্রাহ্মণভাগ—যাহা গৃহস্থশাস্ত্র অর্থাৎ গৃহস্থেরই কর্ত্তব্যপ্রতিপাদক শাস্ত্র, গৃহস্থের কর্ত্তব্যবিষয়েই তাহার অধিকার। তদনুসারে তাহাতে গৃহস্থাশ্রমেরই বিধান ও গৃহস্থেরই কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিধান হইয়াছে, অন্য আশ্রমের বিধান হয় নাই। কারণ, তাহার বিধানে উহার অধিকার নাই। যেমন শব্দব্যুৎপাদক ব্যাকরণ-শাস্ত্রে স্বীয় অধিকারানুসারেই প্রতিপাদ্য পদার্থের বিধান হইয়াছে; শাস্ত্রান্তরের প্রতিপাদ্য অন্যান্য পদার্থের বিধান হয় নাই। কিন্তু তাহাতে যে অন্য পদার্থই নাই, অন্য পদার্থের অভাবপ্রযুক্তই ব্যাকরণশাস্ত্রে তাহার বিধান হয় নাই, ইহা প্রতিপন্ন হয় না। তদ্রূপ বেদের ব্রাহ্মণভাগে আশ্রমান্তরের বিধান নাই বলিয়া উহার অভাবই বেদের সিদ্ধান্ত, উহার অভাবপ্রযুক্তই বিধান হয় নাই, ইহা প্রতিপন্ন হয় না। ফলকথা, ব্যাকরণাদি শাস্ত্রান্তরের ন্যায় গৃহস্থশাস্ত্র বেদের ব্রাহ্মণভাগও স্বকীয় অধিকারানুসারে প্রত্যক্ষতঃ অর্থাৎ সাক্ষাৎ বিধিবাক্যের দ্বারা গৃহস্থাশ্রমেরই বিধায়ক। এই জন্যই তাহাতে প্রত্যক্ষতঃ অন্য আশ্রমের বিধান হয় নাই, অন্য আশ্রমের অভাবপ্রযুক্তই যে বিধান হয় নাই, তাহা নহে।

আপত্তি হইতে পারে যে, বেদের "ব্রাহ্মণ"ভাগে যেমন সন্ন্যাসাশ্রমের বিধান নাই, তদ্রূপ বেদের আর কোন স্থানেও ত উহার বিধান নাই, সুতরাং সন্ন্যাসাশ্রমও যে বেদবিহিত, ইহা কিরূপে স্বীকার করা যায়? তদ্বিষয়ে বেদপ্রমাণ ব্যতীত কেবল পূর্ব্বোক্ত যুক্তির দ্বারা উহা স্বীকার করা যায় না। ভাষ্যকার এই জন্য শেষে বলিয়াছেন যে, অপবর্গপ্রতিপাদক "ঋক্" এবং "ব্রাহ্মণ"ও

বলিতেছি। অর্থাৎ বেদের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ-ভাগের অন্তর্গত অপবর্গপ্রতিপাদক অনেক শ্রুতিবাক্য আছে, তদ্দ্বারা সন্ন্যাসাশ্রমও যে, অধিকারিবিশেষের পক্ষে বেদবিহিত, ইহা বুঝা যায়। তাৎপর্য্য এই যে, বেদে প্রত্যক্ষতঃ অর্থাৎ সাক্ষাৎ বিধিবাক্যের দ্বারা সন্ন্যাসাশ্রমের বিধান না থাকিলেও বেদের জ্ঞানকাণ্ডে অনেক শ্রুতিবাক্য আছে, তদ্দ্বারা সন্ন্যাসের বিধি কল্পনা করা যায়। সাক্ষাৎ বিধিবাক্য না থাকিলেও অর্থবাদবাক্যের দ্বারা উহার কল্পনা বা বোধ হইয়া থাকে, ইহা মীমাংসাশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। বেদে ইহার বহু উদাহরণ আছে; মীমাংসকগণ তাহা প্রদর্শন করিয়া বিচারদ্বারা উক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। ভাষ্যকার প্রথমে "ঋক্" বলিয়া যে তিনটী শ্রুতি উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহা উপনিষদের মধ্যে কথিত হইলেও মন্ত্র। উপনিষদে অনেক মন্ত্রও কথিত হইয়াছে। "বৃহদারণ্যক" প্রভৃতি উপনিষদে "ঋক্" বলিয়াও অনেক শ্রুতির উল্লেখ দেখা যায়। শ্বেতাশ্বতর ও নারায়ণ উপনিষদে অনেক মন্ত্র কথিত হইয়াছে—যাহা এখনও কর্ম্মবিশেষে প্রযুক্ত হইতেছে।

ভাষ্যকারের উদ্ধৃত "কর্ম্মভিঃ" ইত্যাদি প্রথম মন্ত্রে বলা হইয়াছে যে, যে সকল ঋষি পুত্রবান্ ও ধনেচ্ছু অর্থাৎ যাঁহাদিগের পুত্রৈষণা ও বিত্তৈষণা ছিল, তাঁহারা কর্ম্ম করিয়া তাহার ফলে মৃত্যু অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্মলাভ করিয়াছেন। কিন্তু অপর মনীষী ঋষিগণ অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত-বিপরীত কর্ম্মত্যাগী জ্ঞানার্থী ঋষিগণ কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মোক্ষলাভ করিয়াছেন। উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা কর্ম্মত্যাগ অর্থাৎ সন্ন্যাস ব্যতীত মোক্ষ হয় না, ইহা বুঝা যায়। সুতরাং উহার দ্বারা মুমুক্ষুর পক্ষে সন্ন্যাসের বিধিও বুঝা যায়। "ন কর্ম্মণা" ইত্যাদি দ্বিতীয় শ্রুতিবাক্যেও কর্ম্মাদির দ্বারা মোক্ষ হয় না, ত্যাগের দ্বারা মোক্ষ হয়, ইহা স্পষ্ট কথিত হইয়াছে এবং "ত্যাগ" শব্দের দ্বারা সন্ন্যাসই গৃহীত হইয়াছে, ইহা বুঝা যায়। সুতরাং উহার দ্বারাও সন্ন্যাসের বিধি বুঝা যায়। কারণ, সন্ন্যাসাশ্রম ব্যতীত উক্ত শ্রুতি-কথিত ত্যাগের উপপত্তি হইতে পারে না। উক্ত শ্রুতিবাক্যের পরার্দ্ধে "নাক" শব্দের দ্বারা অবিদ্যাই উপলক্ষিত হইয়াছে। কৈবল্যোপনিষদের "দীপিকা"কার শঙ্করানন্দ ও নারায়ণ প্রসিদ্ধার্থ রক্ষা করিতে অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিলেও তাৎপর্য্যটীকাকার শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র "নাক" শব্দের দ্বারা অবিদ্যা অর্থেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং ঐ ব্যাখ্যাই সম্প্রদায়সিদ্ধ মনে হয়। "বেদাহমেতং" ইত্যাদি তৃতীয় শ্রুতিবাক্যের দ্বারা পরমাত্মার তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত মোক্ষ হইতে পারে না, এই তত্ত্ব কথিত হওয়ায় উহার দ্বারাও সন্ন্যাসের বিধি বুঝা যায়। তাৎপর্য্যটীকাকার বলিয়াছেন যে, ইহার দ্বারা ঈশ্বরপ্রণিধান যে, মোক্ষের উপায়, ইহা কথিত হইয়াছে। বস্তুতঃ ন্যায়মতে ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞানও মোক্ষে আবশ্যক, ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত মোক্ষ হয় না। দ্বিতীয় আহ্নিকের প্রারম্ভে এ বিষয়ে আলোচনা পাওয়া যাইবে। মূলকথা, ভাষ্যকারের উদ্ধৃত মন্ত্রত্রয় অপবর্গের প্রতিপাদক। উহার দ্বারা অপবর্গের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হওয়ায় অপবর্গের অনুষ্ঠান ও তাহার কাল এবং তৎকালে কর্ম্মত্যাগ বা সন্ন্যাসের কর্ত্তব্যতাও প্রতিপন্ন হইয়াছে। কারণ, যজ্ঞাদি কর্ম্মত্যাগ ব্যতীত অপবর্গার্থ শ্রবণ মননাদি অনুষ্ঠানে অধিকার হয় না, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। সুতরাং অপবর্গের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হইলেই সন্ন্যাসাশ্রমের বৈধত্বও স্বীকার করিতে হইবে, ইহাই এখানে ভাষ্যকারের মূল তাৎপর্য্য। বস্তুতঃ নারায়ণ উপনিষদে "ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন"

ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের পরেই "বেদান্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থাঃ সন্ন্যাসযোগাদ্‌যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা স্পষ্টরূপেই সন্ন্যাসাশ্রমের বৈধত্ব বুঝা যায়। ভাষ্যকার এখানে ঐ শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত না করিলেও উহাও তাঁহার প্রতিপাদ্য সিদ্ধান্তের সাধকরূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

ভাষ্যকার সন্ন্যাসাশ্রমের বেদবিহিতত্ব সমর্থন করিতে প্রথমে অপবর্গপ্রতিপাদক বেদের মন্ত্রত্রয় উদ্ধৃত করিয়া, পরে "ব্রাহ্মণ" উদ্ধৃত করিতে ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষৎ হইতে কতিপয় শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। ছান্দোগ্য উপনিষৎ সামবেদীয় তাণ্ড্যশাখার অন্তর্গত; সুতরাং উহা বেদের ব্রাহ্মণভাগেরই অংশবিশেষ। বৃহদারণ্যক উপনিষৎ শুক্লযজুর্ব্বেদের মাধ্যন্দিন শাখার শতপথব্রাহ্মণের অন্তর্গত। ভাষ্যকারের উদ্ধৃত ছান্দোগ্য উপনিষদের "ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে ধর্ম্মের প্রথম বিভাগ যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও দান, এই কথার দ্বারা গৃহস্থাশ্রম প্রদর্শিত হইয়াছে। গৃহস্থ দ্বিজাতিই অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ এবং তজ্জন্য বেদপাঠ ও দান করিবেন। তপস্যাই ধর্ম্মের দ্বিতীয় বিভাগ, এই কথার দ্বারা বানপ্রস্থাশ্রম প্রদর্শিত হইয়াছে। গৃহস্থ দ্বিজাতি কালবিশেষে গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া বনে যাইয়া তপস্যাদি বিহিত কর্ম্ম করিবেন। মন্বাদি মহর্ষিগণ ইহার স্পষ্টবিধি বলিয়াছেন[১]। উক্ত শ্রুতিবাক্যে পরে যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্যপরায়ণ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর উল্লেখ করিয়া, তাহার পরে উক্ত ব্রহ্মচর্য্যকেই ধর্ম্মের তৃতীয় বিভাগ বলা হইয়াছে, এবং তদ্দ্বারা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম প্রদর্শিত হইয়াছে। পরে বলা হইয়াছে যে, উক্ত ত্রিবিধ আশ্রমী সকলেই যথাশাস্ত্র স্বাশ্রমবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া, তাহার ফলে পুণ্যলোক প্রাপ্ত হন—"ব্রহ্মসংস্থ" ব্যক্তি মোক্ষ প্রাপ্ত হন। শেষোক্ত বাক্যের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ আশ্রমী হইতে ভিন্ন ব্রহ্মসংস্থ ব্যক্তি আছেন, তিনি কর্ম্মলভ্য পুণ্যলোক প্রাপ্ত হন না, কিন্তু জ্ঞানলভ্য মোক্ষই প্রাপ্ত হন, ইহা বুঝা যায়। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত আশ্রমত্রয় হইতে অতিরিক্ত চতুর্থ আশ্রম বা সন্ন্যাসাশ্রম যে অধিকারিবিশেষের পক্ষে বেদবিহিত, ইহাও অবশ্যই বুঝা যায়। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য উক্ত শ্রুতিবাক্যে "ব্রহ্মসংস্থ" শব্দের দ্বারা সন্ন্যাসাশ্রমীই মোক্ষ লাভ করেন, সন্ন্যাসাশ্রম ব্যতীত মোক্ষ লাভ হইতে পারে না, এই মতই বিচারপূর্ব্বক সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু এই মত সর্ব্বসম্মত নহে। পরে ইহার আলোচনা পাওয়া যাইবে। মূলকথা, ভাষ্যকারের উদ্ধৃত "ত্রয়ো ধর্ম্মস্কন্ধাঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা চতুরাশ্রমই যে বেদবিহিত—একমাত্র গৃহস্থাশ্রম বেদবিহিত নহে, ইহা প্রতিপন্ন হয়। ভাষ্যকার পরে বৃহদারণ্যক উপনিষদের "এতমেব" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া, তদ্দ্বারাও প্রব্রজ্যা অর্থাৎ সন্ন্যাসাশ্রম যে, অধিকারিবিশেষের পক্ষে বেদবিহিত, ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা বুঝা যায় যে, ব্রহ্মলোকাদি-পুণ্যলোকার্থী ব্যক্তিগণের সন্ন্যাসে অধিকার নাই। যাঁহারা কেবল আত্মলোকার্থী অর্থাৎ আত্মজ্ঞানলাভের দ্বারা মুক্তিলাভই ইচ্ছা করেন, তাঁহারা প্রব্রজ্যা (সর্ব্বকর্ম্ম-সন্ন্যাস) করেন। সুতরাং মুমুক্ষু অধিকারীর পক্ষে আত্মজ্ঞানলাভের জন্য সর্ব্বকর্ম্মসন্ন্যাস যে কর্ত্তব্য, ইহা উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা বুঝা যায়। ভাষ্যকার পরে

১। মনুসংহিতা, ষষ্ঠ অধ্যায় এবং বিষ্ণুসংহিতা, ৯৪ম অধ্যায় এবং যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, তৃতীয় অধ্যায়, বানপ্রস্থ-প্রকরণ দ্রষ্টব্য।

বৃহদারণ্যক উপনিষদের "অথো খল্বাহুঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা কর্ম্মজন্য সংসার হয় অর্থাৎ কামনাবশতঃই কর্ম্ম করিয়া তাহার ফলে পুনঃ পুনঃ জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়, ইহা বলিয়া, পরে "ইতিনু" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা অপর প্রকৃত অর্থাৎ বিবক্ষিত বিষয় কথিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যে জীবকে "কামময়" বলিয়া, জীব যেরূপ কামনাবিশিষ্ট হয়, "তৎক্রতু" অর্থাৎ সেইরূপ অধ্যবসায়বিশিষ্ট হইয়া, সেইরূপ কর্ম্ম করিয়া তাহার ফল লাভ করে, ইহা কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ কামনাই কর্ম্মের মূল এবং কর্ম্মই সংসারের মূল। কর্ম্মানুসারেই ফলভোগ হয়। কর্ম্ম করিবার পূর্ব্বে কামনা জন্মে, পরে তদ্বিষয়ে ক্রতু জন্মে। ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য এখানে "ক্রতু" শব্দের অর্থ বলিয়াছেন—অধ্যবসায় অর্থাৎ নিশ্চয়। যে কর্ত্তব্য নিশ্চয়ের অনন্তরই কর্ম্ম করে, তাঁহার মতে ঐ নিশ্চয়ই এখানে "ক্রতু" এবং পূর্ব্বোক্ত কামই পরিস্ফুট হইয়া ক্রতুত্ব লাভ করে। তাৎপর্য্যটীকাকার উক্ত শ্রুতিবাক্যে "ক্রতু" শব্দের অর্থ বলিয়াছেন সংকল্প। "ইতিনু" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, কামনাবিশিষ্ট ব্যক্তিরই সংসার হয়। কারণ, কামনা থাকিলেই সংসারজনক কর্ম্ম করে। অতএব কামনাশূন্য ব্যক্তির সংসার হয় না। কারণ, কামনা না থাকিলে কর্ম্ম ত্যাগ করে, সংসারজনক কর্ম্ম করে না। কামনাশূন্য কিরূপে হইবে, ইহা বুঝাইতে পরে বলা হইয়াছে "অকাম"। অর্থাৎ "অকাম" ব্যক্তিকেই কামশূন্য বলা যায়। অকামতা কিরূপে হইবে? এ জন্য পরে বলা হইয়াছে "নিষ্কাম"। অর্থাৎ যাঁহা হইতে সমস্ত কাম নির্গত হইয়াছে, তিনি নিষ্কাম, তাঁহার কামনা থাকে না। সমস্ত কাম নির্গত হইবে কিরূপে? এ জন্য পরে বলা হইয়াছে "আপ্তকাম"। অর্থাৎ যিনি সর্ব্বকাম-প্রাপ্ত, তাঁহার আর কোন বিষয়েই কামনা থাকিতে পারে না। সর্ব্বকাম প্রাপ্ত হইবেন কিরূপে? তাহা কিরূপে সম্ভব হয়? এ জন্য শেষে বলা হইয়াছে "আত্মকাম"। অর্থাৎ আত্মাই যাঁহার একমাত্র কাম্য হয়, তিনি আত্মাকে লাভ করিলে আর অন্য বিষয়ে তাঁহার কামনা হইতেই পারে না। অর্থাৎ মুক্তি লাভ হইলে তাঁহার সর্ব্ববিষয়েই নিষ্কামতা হয়। তাঁহার প্রাণের উৎক্রান্তি হয় না, তিনি ব্রহ্মই হইয়া ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে ন্যায়মতানুসারে "আত্মকাম" শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—কৈবল্যযুক্ত আত্মকাম। আত্মার কৈবল্য কামনাই কৈবল্যযুক্ত আত্মকামনা। কৈবল্য বা মোক্ষ লাভ হইলে কাম্যলাভ হওয়ায় মুক্ত ব্যক্তি আপ্তকাম হন। তাঁহার প্রাণের উৎক্রান্তি (ঊর্দ্ধগতি) হয় না অর্থাৎ তিনি শাশ্বত হন। ন্যায়মতে মুক্ত ব্যক্তি ব্রহ্মের সদৃশ হন, তিনি ব্রহ্ম হইতে পরমার্থতঃ অভিন্ন নহেন। তাঁহার আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তিই ব্রহ্মের সহিত সাদৃশ্য এবং উহাকেই বলা হইয়াছে ব্রহ্মপ্রাপ্তি ও ব্রহ্মভাব। প্রচলিত সমস্ত ভাষ্যপুস্তকেই উক্ত শ্রুতিবাক্যে "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি ইহৈব সমবনীয়ন্তে, ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" এইরূপ পাঠ দেখা যায়। কিন্তু ভাষ্যকার বৃহদারণ্যক উপনিষদের "তস্মাল্লোকাৎ পুনরেত্যস্মৈ লোকায় কর্ম্মণ ইতিনু কাময়মানো" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের "ইতিনু" ইত্যাদি অংশই এখানে উদ্ধৃত করিয়াছেন। উক্ত শ্রুতিবাক্যের মধ্যে "ইহৈব সমবনীয়ন্তে" এই পাঠ নাই। বৃহদারণ্যক উপনিষদে পূর্ব্বে তৃতীয় অধ্যায়ে (৩।২।১১) ব্রহ্মজ্ঞ মুক্ত ব্যক্তির প্রাণ উৎক্রান্ত হয়

না, মৃত্যুকালে তাঁহার প্রাণ অর্থাৎ বাক্ প্রভৃতি পরমাত্মাতে লয় প্রাপ্ত হয়, ইহা কথিত হইয়াছে। সেখানে "অত্রৈব সমবনীয়ন্তে" এইরূপ পাঠ আছে। বেদান্তদর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ে দ্বিতীয় পাদের দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ সূত্রের শারীরকভাষ্যেও ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য উক্ত বিষয়ে বৃহদারণ্যক-শ্রুতির তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি সেখানে "ন তস্য প্রাণাঃ" এবং "ন তস্মাৎ প্রাণাঃ" এইরূপ পাঠভেদেরও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এবং নৃসিংহোত্তরতাপনী উপনিষদের পঞ্চম খণ্ডে "য এবং বেদ সোহকামো নিষ্কাম আপ্তকাম আত্মকামো ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্ত্যত্রৈব সমবনীয়ন্তে ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" এইরূপ শ্রুতি দেখা যায়। কিন্তু ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন উক্ত শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করেন নাই। তিনি বৃহদারণ্যক উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যই এখানে উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার উদ্ধৃত শ্রুতির মধ্যে "ইহৈব সমবনীয়ন্তে" অথবা "সমবলীয়ন্তে" এইরূপ পাঠ লেখকের প্রমাদ-কল্পিত, সন্দেহ নাই। মূলকথা, ভাষ্যকারের শেষোক্ত বৃহদারণ্যক-শ্রুতির দ্বারাও মুমুক্ষু অধিকারীর সন্ন্যাসাশ্রমের বৈধতা প্রতিপন্ন হয়। কারণ, উহার দ্বারা কামনামূলক কর্ম্মজন্য সংসার, এবং নিষ্কামতামূলক কর্ম্মত্যাগে মুক্তি, ইহাই কথিত হইয়াছে। সন্ন্যাসাশ্রম ব্যতীত কর্ম্মত্যাগের উপপত্তি হইতে পারে না। ভাষ্যকার অপবর্গপ্রতিপাদক পূর্ব্বোক্ত নানা শ্রুতিবাক্যের দ্বারা সন্ন্যাসাশ্রমের বেদবিহিতত্ব প্রতিপাদন করিয়া, উপসংহারে বলিয়াছেন যে, অতএব ঋণানুবন্ধপ্রযুক্ত অপবর্গ নাই, এই যে পূর্ব্বপক্ষ বলা হইয়াছে, তাহা অযুক্ত। অর্থাৎ গৃহস্থ দ্বিজাতির পক্ষে পূর্ব্বোক্ত ঋণানুবন্ধ অপবর্গার্থ অনুষ্ঠানের প্রতিবন্ধক থাকিলেও কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসাশ্রমী মুমুক্ষুর পক্ষে পূর্ব্বোক্ত "ঋণানুবন্ধ" নাই। কারণ, যজ্ঞাদি কর্ম্ম তাঁহার পক্ষে বিহিত নহে; পরন্তু উহা তাঁহার ত্যাজ্য। সুতরাং তিনি তখন মোক্ষার্থ শ্রবণ মননাদি অনুষ্ঠান করিয়া মোক্ষলাভ করিতে পারেন। অতএব ঋণানুবন্ধবশতঃ কাহারই অপবর্গার্থ সময়ই নাই, সুতরাং কাহারই অপবর্গ হইতেই পারে না, এই পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডিত হইয়াছে। ভাষ্যকার সর্ব্বশেষে তৈত্তিরীয়সংহিতার "যে চত্বারঃ পথয়ো দেবযানাঃ" এই শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারাও যখন চতুরাশ্রমই বেদের সিদ্ধান্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে, তখন একাশ্রমবাদই যে বেদের সিদ্ধান্ত, ইহা উপপন্ন হয় না। সুতরাং বেদে গৃহস্থাশ্রম ভিন্ন আশ্রমের প্রত্যক্ষ বিধান নাই বলিয়া যে, একমাত্র গৃহস্থাশ্রমই বেদবিহিত, ইহা কোনরূপেই স্বীকার করা যায় না।

এখানে প্রণিধান করা আবশ্যক যে, ভাষ্যকার বেদে আশ্রমান্তরের প্রত্যক্ষ বিধান নাই, ইহা স্বীকার করিয়াই পূর্ব্বোক্তরূপ বিচারপূর্ব্বক চতুরাশ্রমই যে, বেদবিহিত সিদ্ধান্ত, ইহা সমর্থন করিয়াছেন। বস্তুতঃ জাবালোপনিষদে চতুরাশ্রমেরই প্রত্যক্ষ বিধান অর্থাৎ সাক্ষাৎ বিধিবাক্যের দ্বারা বিধান আছে[১]। তাহাতে স্পষ্ট কথিত হইয়াছে যে, "ব্রহ্মচর্য্য সমাপন করিয়া গৃহী হইবে,

---

১। "অথহ জনকো হ বৈদেহো যাজ্ঞবল্ক্যমুপসমেত্যোবাচ ভগবন্ সন্ন্যাসং ব্রূহীতি। স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ, ব্রহ্মচর্য্যং সমাপ্য গৃহী ভবেৎ। গৃহী ভূত্বা বনী ভবেৎ। বনী ভূত্বা প্রব্রজেৎ। যদি বেতরথা ব্রহ্মচর্য্যাদেব প্রব্রজেদ্গৃহাদ্বা বনাদ্বা। অথ পুনরব্রতী বা ব্রতী বা স্নাতকো বাহস্নাতকো বা উৎসন্নাগ্নিরনগ্নিকো বা, যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ"। জাবালোপনিষৎ—চতুর্থ খণ্ড।

গৃহী হইয়া বনী (বানপ্রস্থ) হইবে, বনী হইয়া প্রব্রজ্যা করিবে," অর্থাৎ গৃহস্থাশ্রমের পরে বানপ্রস্থাশ্রমী হইয়া শেষে সন্ন্যাসাশ্রমী হইবে। পরন্তু শেষে ইহাও কথিত হইয়াছে যে, "যে দিনেই বিরক্ত হইবে অর্থাৎ সর্ব্ববিষয়ে বিতৃষ্ণ হইবে, সেই দিনেই প্রব্রজ্যা (সন্ন্যাস) করিবে।" সুতরাং উক্ত শ্রুতিবাক্যে যেমন যথাক্রমে চতুরাশ্রমের প্রত্যক্ষ বিধান আছে, তদ্রূপ বৈরাগ্য জন্মিলে উক্ত ক্রম লঙ্ঘন করিয়াও সন্ন্যাসের প্রত্যক্ষ বিধান আছে। উক্ত উপনিষদে বিদেহাধিপতি জনক রাজার প্রশ্নোত্তরে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের সন্ন্যাস সম্বন্ধে যে সমস্ত উপদেশ যে ভাবে কথিত হইয়াছে, তাহা প্রণিধান করিলে সন্ন্যাসাশ্রম যে, কর্ম্মানধিকারী অন্ধ-বধিরাদি ব্যক্তির সম্বন্ধেই বিহিত হইয়াছে, ইহাও কোনরূপেই বুঝা যায় না। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য শারীরকভাষ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদের ভাষ্যে একাশ্রমবাদ খণ্ডন করিতে উক্ত জাবালোপনিষদের শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। একাশ্রমবাদিগণ "বীরহা বা এষ দেবানাং যোঽগ্নিমুদ্বাসয়তে" ইত্যাদি কতিপয় শ্রুতিবাক্যের দ্বারা আশ্রমান্তরের অবৈধতা সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু ঐ সমস্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা সন্ন্যাসে অনধিকারী অগ্নিহোত্রাদিরত গৃহস্থেরই স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কর্ম্মত্যাগ বা সন্ন্যাসের নিন্দা হইয়াছে। বৈরাগ্যবান্ প্রকৃত অধিকারীর সম্বন্ধে সন্ন্যাসের নিন্দা হয় নাই। কারণ, উক্ত জাবালোপনিষদে বৈরাগ্যবান্ মুমুক্ষু ব্যক্তির সম্বন্ধে সন্ন্যাসের স্পষ্ট বিধান আছে। সুতরাং গৃহস্থাশ্রম ভিন্ন আর কোন আশ্রম নাই, অথবা কর্ম্মানধিকারী অন্ধ-বধিরাদি ব্যক্তির সম্বন্ধেই শাস্ত্রে সন্ন্যাসাশ্রম বিহিত হইয়াছে, এই মতে উক্ত জাবালোপনিষদের শ্রুতিবাক্যের কোনরূপেই উপপত্তি হইতে পারে না। ফলকথা, পূর্ব্বোক্ত "ঋণানুবন্ধ"প্রযুক্ত অপবর্গার্থ শ্রবণ মননাদি অনুষ্ঠানের সময় না থাকায় অপবর্গ অসম্ভব, গৃহস্থাশ্রম ভিন্ন আর কোন আশ্রমও বেদবিহিত নহে, এই পূর্ব্বপক্ষ পূর্ব্বোক্ত জাবালোপনিষদের শ্রুতিবাক্যের দ্বারাই নির্ব্বিবাদে নিরস্ত হয়। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন এখানে পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডন করিতে উক্ত জাবালোপনিষদের শ্রুতিবাক্য কেন উদ্ধৃত করেন নাই, ইহা চিন্তনীয়। এ বিষয়ে অন্যান্য কথা পরে পাওয়া যাইবে ॥৫৯॥

ভাষ্য। ফলার্থিনশ্চেদং ব্রাহ্মণং,—"জরামর্য্যং বা এতৎ সত্রং, যদগ্নিহোত্রং দর্শপূর্ণমাসৌ চে"তি। কথং ?

অনুবাদ। "এই সত্র জরামর্য্যই, যাহা অগ্নিহোত্র এবং দর্শ ও পূর্ণমাস" এই ব্রাহ্মণ অর্থাৎ বেদের ব্রাহ্মণভাগের অন্তর্গত উক্ত শ্রুতিবাক্য ফলার্থীর সম্বন্ধেই কথিত বুঝা যায়। (প্রশ্ন) কেন ? অর্থাৎ উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা স্বর্গাদি ফলার্থীর পক্ষেই যে অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞের যাবজ্জীবন-কর্ত্তব্যতা কথিত হইয়াছে, তাহা কিরূপে বুঝিব ?

সূত্র। সমারোপণাদাত্মন্যপ্রতিষেধঃ ॥৬০॥৪০৩॥

অনুবাদ। (উত্তর) আত্মাতে (অগ্নির) সমারোপণপ্রযুক্ত অর্থাৎ বেদে

সন্ন্যাসের পূর্ব্বে যজ্ঞবিশেষে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিয়া আত্মাতে অগ্নিসমূহের সমারোপের বিধান থাকায় (ঋণানুবন্ধপ্রযুক্ত অপবর্গের) প্রতিষেধ হয় না।

ভাষ্য। "প্রাজাপত্যামিষ্টিং নিরূপ্য তস্যাং সর্ব্ববেদসং হুত্বা আত্মন্যগ্নীন্ সমারোপ্য ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজে"দিতি শ্রূয়তে—তেন বিজানীমঃ প্রজাবিত্ত-লোকৈষণাভ্যো ব্যুত্থিতস্য নিবৃত্তে ফলার্থিত্বে সমারোপণং বিধীয়ত ইতি। এবঞ্চ ব্রাহ্মণানি*—"অন্যদ্বৃত্তমুপাকরিষ্যন্॥ মৈত্রেয়ীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ প্রব্রজিষ্যন্ বা অরেঽহমস্মাৎ স্থানাদস্মি, হন্ত তেঽনয়া কাত্যায়ন্যাঽন্তং করবাণী"তি।

অথাপি—"ইত্যুক্তানুশাসনাঽসি মৈত্রেয্যেতাবদরে খল্বমৃতত্বমিতি হোক্ত্বা যাজ্ঞবল্ক্যো বিজহারে"তি। [—বৃহদারণ্যক, চতুর্থ অঃ, পঞ্চম ব্রাঃ]।

অনুবাদ। "প্রাজাপত্যা" ইষ্টি (যজ্ঞবিশেষ) অনুষ্ঠান করিয়া, তাহাতে সর্ব্বস্ব হোম করিয়া অর্থাৎ সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিয়া, আত্মাতে অগ্নিসমূহ আরোপ করিয়া প্রব্রজ্যা করিবেন" ইহা শ্রুত হয়, তদ্দ্বারা বুঝিতেছি, পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা ও লোকৈষণা হইতে ব্যুত্থিত অর্থাৎ উক্ত ত্রিবিধ এষণা বা কামনা হইতে মুক্ত ব্যক্তিরই ফলকামনা নিবৃত্ত হওয়ায় সমারোপণ (আত্মাতে অগ্নির আরোপ) বিহিত হইয়াছে।

এইরূপই "ব্রাহ্মণ" আছে অর্থাৎ উক্ত সিদ্ধান্তের প্রতিপাদক বেদের "ব্রাহ্মণ-" ভাগের অন্তর্গত শ্রুতিও আছে, (যথা)—"অন্যবৃত্ত অর্থাৎ গার্হস্থ্যরূপ বৃত্ত হইতে ভিন্ন সন্ন্যাসরূপ বৃত্ত করিতে ইচ্ছুক হইয়া যাজ্ঞবল্ক্য ইহা বলিয়াছিলেন, অরে মৈত্রেয়ি! আমি এই 'স্থান' অর্থাৎ গার্হস্থ্য হইতে প্রব্রজ্যা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছি, (যদি ইচ্ছা কর)—এই কাত্যায়নীর সহিত তোমার 'অন্ত' অর্থাৎ 'বিভাগ' করি" এবং "তুমি এইরূপ উক্তানুশাসনা হইলে, অর্থাৎ আমি আত্মতত্ত্ব

* প্রচলিত ভাষ্যপুস্তকে এখানে "সোঽন্যদ্বৃত্তমুপাকরিষ্যমাণো যাজ্ঞবল্ক্যো মৈত্রেয়ীমিতি হোবাচ প্রব্রজিষ্যন্ বা" ইত্যাদি এবং পরে "অথাপ্যুক্তানুশাসনাসি মৈত্রেয়ি এতাবদরে খল্বমৃতত্বমিতি হোক্ত্বা যাজ্ঞবল্ক্যঃ প্রবব্রাজ" এইরূপ শ্রুতিপাঠ আছে। কিন্তু শতপথব্রাহ্মণের অন্তর্গত বৃহদারণ্যক উপনিষদের চতুর্থ অধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণের প্রারম্ভে যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী-সংবাদে "অথহ যাজ্ঞবল্ক্যস্য দ্বে ভার্য্যে বভূবতুর্মৈত্রেয়ী চ কাত্যায়নী চ, তয়োর্হ মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী বভূব, স্ত্রীপ্রজ্ঞৈব তর্হি কাত্যায়ন্যথ হ যাজ্ঞবল্ক্যোঽন্যদ্বৃত্তমুপাকরিষ্যন্ ॥১॥" এবং পরে "মৈত্রেয়ীতি হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ প্রব্রজিষ্যন্ বা" ইত্যাদি শ্রুতিপাঠ আছে। পরে উক্ত পঞ্চম ব্রাহ্মণের সর্ব্বশেষে "বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াদিত্যুক্তানুশাসনাসি, মৈত্রেয্যেতাবদরে খল্বমৃতত্বমিতি হোক্ত্বা যাজ্ঞবল্ক্যো বিজহার" এইরূপ শ্রুতিপাঠ আছে। সুতরাং তদনুসারে এখানে উক্ত শ্রুতির মূল পাঠের উক্ত অংশই ভাষ্যকারের উদ্ধৃত বলিয়া গৃহীত হইল। ভাষ্যপুস্তকে প্রচলিত পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিপাঠ বিকৃত, এ বিষয়ে সংশয় নাই।

সম্বন্ধে তোমাকে পূর্ব্বোক্তরূপ অনুশাসন (উপদেশ) বলিলাম, অরে মৈত্রেয়ি! অমৃতত্ব (মোক্ষ) এতাবন্মাত্র, অর্থাৎ তোমার প্রশ্নানুসারে আমার পূর্ব্ববর্ণিত আত্মদর্শনই মোক্ষের সাধন জানিবে,—ইহা বলিয়া যাজ্ঞবল্ক্য প্রব্রজ্যা করিলেন"।

টিপ্পনী। "ঋণানুবন্ধ"প্রযুক্ত অপবর্গ নাই, অপবর্গ অসম্ভব, এই পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডনের জন্য ভাষ্যকার পূর্ব্বসূত্রভাষ্যে বলিয়াছেন যে, "জরামর্য্যং বা" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা যাঁহার স্বর্গাদি ফলকামনার নিবৃত্তি হয় নাই, তাঁহার সম্বন্ধেই অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞের যাবজ্জীবন-কর্ত্তব্যতা কথিত হইয়াছে। সুতরাং যাঁহার স্বর্গাদি ফলকামনা নাই, যিনি বৈরাগ্যবশতঃ কর্ম্মসন্ন্যাস করিয়াছেন, তাঁহার আর অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম কর্ত্তব্য না হওয়ায় তিনি তখন মোক্ষার্থে শ্রবণ মননাদি অনুষ্ঠান করিয়া মোক্ষলাভ করিতে পারেন। ভাষ্যকার এখন তাঁহার ঐ পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিতে পুনর্ব্বার বলিয়াছেন যে, "জরামর্য্যং বা" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য স্বর্গাদি ফলার্থীর সম্বন্ধেই যে কথিত হইয়াছে, ইহা বুঝা যায় অর্থাৎ শ্রুতিপ্রমাণের দ্বারাও উহা প্রতিপন্ন হয়। কিরূপে উহা বুঝা যায়? কোন্ প্রমাণের দ্বারা উহা প্রতিপন্ন হয়? এই প্রশ্নোত্তরে ভাষ্যকার মহর্ষির এই সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। মহর্ষি তাঁহার পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ খণ্ডন করিতে পরে আবার এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, আত্মাতে অগ্নির আরোপপ্রযুক্ত অর্থাৎ বেদে সন্ন্যাসেচ্ছু ব্রাহ্মণের আত্মাতে সমস্ত অগ্নিকে আরোপ করিয়া সন্ন্যাসের বিধান থাকায় "ঋণানুবন্ধ"প্রযুক্ত অপবর্গের প্রতিষেধ হয় না। ভাষ্যকার মহর্ষির তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিতে "প্রাজাপত্যামিষ্টিং নিরূপ্য" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন যে, উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা ত্রিবিধ এষণা হইতে ব্যুত্থিত অর্থাৎ সর্ব্বথা নিষ্কাম ব্রাহ্মণের সম্বন্ধেই আত্মাতে অগ্নির আরোপ বিহিত হইয়াছে, ইহা বুঝা যায়। ভাষ্যকার এখানে উক্ত শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া, এই প্রসঙ্গে শেষে ইহাও প্রদর্শন করিয়াছেন যে, বেদে সন্ন্যাসাশ্রমের প্রত্যক্ষ বিধান আছে। কারণ, উক্ত শ্রুতিবাক্যের শেষে "প্রব্রজেৎ" এইরূপ বিধিবাক্যের দ্বারাই সন্ন্যাসাশ্রম বিহিত হইয়াছে। উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা বুঝা যায় যে, প্রাজাপত্যা ইষ্টি (যজ্ঞবিশেষ) সন্ন্যাসাশ্রমের পূর্ব্বাঙ্গ। সন্ন্যাসেচ্ছু ব্রাহ্মণ পূর্ব্বে ঐ ইষ্টি করিয়া, তাহাতে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিবেন, পরে তাঁহার পূর্ব্বগৃহীত সমস্ত অগ্নিকে আত্মাতে আরোপ করিয়া অর্থাৎ নিজের আত্মাকেই ঐ সমস্ত অগ্নিরূপে কল্পনা করিয়া সন্ন্যাস করিবেন। সংহিতাকার মন্বাদি মহর্ষিগণও উক্ত শ্রুতি অনুসারেই পূর্ব্বোক্তরূপে সন্ন্যাসের স্পষ্ট বিধি বলিয়াছেন[১]। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, সন্ন্যাসের পূর্ব্বকর্ত্তব্য প্রাজা

১। "প্রাজাপত্যং নিরূপ্যেষ্টিং সর্ব্ববেদসদক্ষিণাং।
আত্মন্যগ্নীন্ সমারোপ্য ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজেদ্গৃহাৎ॥ মনুসংহিতা ৬। ৩৮॥
"অথ ত্রিষ্বাশ্রমেষু পক্বকষায়ঃ প্রাজাপত্যামিষ্টিং কৃত্বা
সর্ব্বং বেদং দক্ষিণাং দত্ত্বা প্রব্রজ্যাশ্রমী স্যাৎ"। "আত্মন্যগ্নীন্
আরোপ্য ভিক্ষার্থং গ্রামমিয়াৎ"॥ বিষ্ণুসংহিতা॥ ৯৫ অধ্যায়॥
"মনদ্গৃহাদ্বা কৃত্বেষ্টিং সর্ব্ববেদসদক্ষিণাং।
প্রাজাপত্যং তদন্তে তানগ্নীনারোপ্য চাত্মনি।—ইত্যাদি যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, তৃতীয় অঃ, যতিপ্রকরণ।

পত্যা ইষ্টিতে সর্ব্বস্ব দক্ষিণাদানের বিধান থাকায় যাঁহার পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা ও লোকৈষণা নাই, অর্থাৎ পুত্রবিষয়ে কামনা এবং বিত্তবিষয়ে কামনা ও লোকসংগ্রহ বা লোকসমাজে খ্যাতির কামনা নাই, এতাদৃশ ব্যক্তির সম্বন্ধেই আত্মাতে অগ্নির আরোপপূর্ব্বক সন্ন্যাস বিহিত হইয়াছে, ইহা বুঝা যায়। কারণ, যাঁহার কোনরূপ এষণা বা কামনা আছে, তাঁহার পক্ষে কখনই সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দান সম্ভব নহে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ এষণামুক্ত ব্যক্তির তখন স্বর্গাদি ফলকামনা না থাকায় তিনি তখন অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ করিবেন না, তখন তিনি তাঁহার অগ্নিহোত্রাদি-সাধন সমস্ত দ্রব্যও দক্ষিণারূপে দান করায় অগ্নিহোত্রাদি করিতেও পারেন না। ফলকথা, পূর্ব্বোক্ত অধিকারিবিশেষের পক্ষে তখন বেদের কর্ম্মকাণ্ডোক্ত কোন কর্ম্মে অধিকার নাই। ঐরূপ ব্যক্তির যে কোন কর্ম্ম নাই, ইহা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও কথিত হইয়াছে[১]। অতএব পূর্ব্বোক্ত "জরামর্য্যং বা" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য যে ফলার্থীর পক্ষেই কথিত হইয়াছে, ইহা বুঝা যায়। কারণ, যিনি স্বর্গাদি ফলার্থী, যিনি পূর্ব্বোক্ত এষণাত্রয় হইতে মুক্ত নহেন, যিনি সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য প্রাজাপত্যা ইষ্টি করিয়া তাহাতে সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দান করেন নাই, তাদৃশ ব্যক্তিই উক্ত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মে অধিকারী।

ভাষ্যকার শেষে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিবার জন্য বেদের "ব্রাহ্মণ"ভাগবিশেষও যে, এষণাত্রয়মুক্ত ব্যক্তিরই সন্ন্যাসপ্রতিপাদক, ইহা প্রদর্শন করিতে বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী-সংবাদের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ী-সংবাদের প্রারম্ভে কথিত হইয়াছে যে, মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী নামে দুই পত্নী ছিলেন। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা পত্নী মৈত্রেয়ী ব্রহ্মবাদিনী হইয়াছিলেন। কনিষ্ঠা পত্নী কাত্যায়নী সাধারণ স্ত্রীলোকের ন্যায় বিষয়জ্ঞানসম্পন্না ছিলেন। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য উৎকট বৈরাগ্যবশতঃ গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণে অভিলাষী হইয়া, জ্যেষ্ঠা পত্নী মৈত্রেয়ীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, আমি এই গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণে ইচ্ছুক হইয়াছি। যদি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে এই কাত্যায়নীর সহিত তোমার বিভাগ করি। অর্থাৎ তাঁহার যাহা কিছু ধনসম্পত্তি ছিল, তাহা উভয় পত্নীকে বিভাগ করিয়া দিয়া তিনি সন্ন্যাস গ্রহণে উদ্যত হইলেন। তখন ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে বলিলেন যে, ভগবন্! যদি এই পৃথিবী ধনপূর্ণা হয়, তাহা হইলে আমি কি মুক্তিলাভ করিতে পারিব? যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন,—না, তাহা পারিবে না, "অমৃতত্বস্য তু নাশাস্তি বিত্তেন"—ধনের দ্বারা মুক্তিলাভের আশাই নাই। মৈত্রেয়ী বলিলেন, যাহার দ্বারা আমি মুক্তিলাভ করিতে পারিব না, তাহার দ্বারা আমি কি করিব? আপনি যাহা মুক্তির সাধন বলিয়া জানেন, তাহাই আমার নিকটে বলুন। তখন মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করিলেন। তিনি নানা দৃষ্টান্ত ও যুক্তির দ্বারা বিশদরূপে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করিয়া সর্ব্বশেষে বলিলেন,—অরে মৈত্রেয়ি! তোমাকে এইরূপে আত্মতত্ত্বের উপদেশ করিলাম, ইহাই মুক্তিলাভের উপায়। ইহা বলিয়া যাজ্ঞবল্ক্য গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। ভাষ্যকার এখানে বৃহদারণ্যক উপনিষ-

১। "যস্ত্বাত্ম-রতিরেব স্যাদাত্ম-তৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে"।—গীতা, ৩।১৭।

দের চতুর্থ অধ্যায় পঞ্চম ব্রাহ্মণের প্রথম শ্রুতি "অস্মদ্বৃত্তনুপাকরিষ্যান্" এই শেষ অংশ এবং "মৈত্রেয়ীতি" ইত্যাদি দ্বিতীয় শ্রুতি এবং সর্ব্বশেষ পঞ্চদশ শ্রুতির "ইত্যুক্তানুশাসনাসি" ইত্যাদি শেষ অংশ উদ্ধৃত করিয়া, উহার দ্বারা যাজ্ঞবল্ক্যের ন্যায় এষণাত্রয়মুক্ত ব্যক্তিই যে, সন্ন্যাস গ্রহণে অধিকারী, ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন এবং পূর্ব্বোক্ত "জরামর্য্যং বা" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা যে অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ কথিত হইয়াছে, তাহা যে ফলার্থী গৃহস্থেরই কর্ত্তব্য, এষণাত্রয়মুক্ত সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য নহে, সুতরাং তাঁহার পক্ষে ঐ সমস্ত কর্ম্ম মোক্ষসাধনের প্রতিবন্ধক হয় না, ইহাও উহার দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের যে বিত্তৈষণা ছিল না, সুতরাং তখন অন্য এষণাও ছিল না, ইহা ভাষ্যকারের উদ্ধৃত "মৈত্রেয়ীতি হোবাচ" ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা প্রকটিত হইয়াছে এবং তিনি যে, সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং সন্ন্যাসাশ্রমও বেদবিহিত, ইহা শেষোক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা প্রকটিত হইয়াছে ॥৬০॥

সূত্র। পাত্রচয়ান্তানুপপত্তেশ্চ ফলাভাবঃ ॥৬১॥৪০৪॥

অনুবাদ। পরন্তু পাত্রচয়ান্ত কর্ম্মের উপপত্তি না হওয়ায় ফলের অভাব হয়।

ভাষ্য। জরামর্য্যে চ কর্ম্মণ্যবিশেষেণ কল্প্যমানে সর্ব্বস্য পাত্রচয়ান্তানি কর্ম্মাণীতি প্রসজ্যতে, তত্রৈষণাব্যুত্থানং ন শ্রূয়েত, "এতদ্ধ স্ম বৈ তৎ পূর্ব্বে বিদ্বাংসঃ প্রজাং ন কাময়ন্তে কিং প্রজয়া করিষ্যামো যেষাং নোঽয়মাত্মাঽয়ং লোক ইতি তে হ স্ম পুত্রৈষণায়াশ্চ বিত্তৈষণায়াশ্চ লোকৈষণায়াশ্চ ব্যুত্থায়াথ ভিক্ষাচর্য্যং চরন্তী"তি।—[বৃহদারণ্যক, চতুর্থ অঃ, চতুর্থ ব্রাঃ।] এষণাভ্যশ্চ ব্যুত্থিতস্য পাত্রচয়ান্তানি কর্ম্মাণি নোপপদ্যন্ত ইতি নাবিশেষেণ কর্ত্তুঃ প্রযোজকং ফলং ভবতীতি।

চাতুরাশ্রম্যবিধানাচ্চেতিহাস-পুরাণ-ধর্ম্মশাস্ত্রেষ্বৈকাশ্রম্যানুপপত্তিঃ। তদপ্রমাণমিতি চেৎ? ন, প্রমাণেন প্রামাণ্যাভ্যনুজ্ঞানাৎ। প্রমাণেন খলু ব্রাহ্মণেনেতিহাস-পুরাণস্য প্রামাণ্যমভ্যনুজ্ঞায়তে,—"তে বা খল্বেতে অথর্ব্বাঙ্গিরস এতদিতিহাসপুরাণমভ্যবদন্নিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদ" ইতি। তস্মাদযুক্তমেতদপ্রামাণ্যমিতি। অপ্রামাণ্যে চ ধর্ম্মশাস্ত্রস্য প্রাণভৃতাং ব্যবহারলোপাল্লোকোচ্ছেদপ্রসঙ্গঃ।

দ্রষ্টৃপ্রবক্তৃসামান্যাচ্চাপ্রামাণ্যানুপপত্তিঃ। য এব মন্ত্র-ব্রাহ্মণস্য দ্রষ্টারঃ প্রবক্তারশ্চ তে খল্বিতিহাসপুরাণস্য ধর্ম্মশাস্ত্রস্য চেতি।

বিষয়ব্যবস্থানাচ্চ যথাবিষয়ং প্রামাণ্যং। অন্যো মন্ত্র-ব্রাহ্মণস্য

বিষয়োঽন্যশ্চেতিহাসপুরাণ-ধর্ম্মশাস্ত্রাণামিতি। যজ্ঞো মন্ত্র-ব্রাহ্মণস্য, লোক-বৃত্তমিতিহাসপুরাণস্য, লোকব্যবহারব্যবস্থানং ধর্ম্মশাস্ত্রস্য বিষয়ঃ। তত্রৈকেন ন সর্ব্বং ব্যবস্থাপ্যত ইতি যথাবিষয়মেতানি প্রমাণানীন্দ্রিয়াদিবদিতি।

অনুবাদ। পরন্তু জরামর্য্যকর্ম্ম (পূর্ব্বোক্ত "জরামর্য্যং বা" ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যোক্ত অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞকর্ম্ম) অবিশেষে কল্প্যমান হইলে অর্থাৎ ফলার্থী ও ফলকামনাশূন্য, এই উভয়েরই কর্ত্তব্য বলিয়া সিদ্ধান্ত হইলে সকলেরই[১] "পাত্রচয়ান্ত" কর্ম্মসমূহ অর্থাৎ মরণকাল পর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্ম, ইহা প্রসক্ত হয়। তাহা হইলে অর্থাৎ সকলেরই অবিশেষে মরণকাল পর্য্যন্ত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মসমূহ কর্ত্তব্য, ইহা স্বীকার করিলে "এষণা" হইতে ব্যুত্থান শ্রুত না হউক? অর্থাৎ তাহা হইলে উপনিষদে পূর্ব্বতম জ্ঞানিগণের "এষণা"ত্রয় হইতে ব্যুত্থান বা মুক্তির যে শ্রুতি আছে, তাহার উপপত্তি হইতে পারে না। যথা—"ইহা সেই, অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণের কারণ এই যে—পূর্ব্বতন জ্ঞানিগণ "প্রজা" কামনা করিতেন না, (তাঁহারা মনে করিতেন) প্রজার দ্বারা আমরা কি করিব, যে আমাদের আত্মাই এই লোক অর্থাৎ অভিপ্রেত ফল, (এইরূপ চিন্তা করিয়া) তাঁহারা পুত্রৈষণা এবং বিত্তৈষণা এবং লোকৈষণা হইতে ব্যুত্থিত (মুক্ত) হইয়া অনন্তর ভিক্ষাচর্য্য করিয়াছেন অর্থাৎ সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন।" কিন্তু এষণাত্রয় হইতে ব্যুত্থিত ব্যক্তির (সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর) "পাত্রচয়ান্ত" কর্ম্মসমূহ অর্থাৎ মরণান্ত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম উপপন্ন হয় না, অতএব ফল অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মের ফল স্বর্গাদি, নির্ব্বিশেষে কর্ত্তার প্রয়োজক হয় না।

পরন্তু ইতিহাস, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্রে চতুরাশ্রমের বিধান থাকায় একাশ্রমের উপপত্তি হয় না অর্থাৎ একমাত্র গৃহস্থাশ্রমই শাস্ত্রবিহিত, আর কোন আশ্রম নাই, এই সিদ্ধান্ত ইতিহাস আদি শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া উহা স্বীকার করা যায় না। (পূর্ব্বপক্ষ) সেই ইতিহাসাদি অপ্রমাণ, ইহা যদি বল? (উত্তর) না, যেহেতু প্রমাণ-কর্ত্তৃক প্রামাণ্যের স্বীকার হইয়াছে। বিশদার্থ এই যে,—"ব্রাহ্মণ"রূপ প্রমাণ-কর্ত্তৃকই ইতিহাস ও পুরাণের প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে। যথা—"সেই এই অথর্ব্ব ও

১। "সর্ব্বস্য পাত্রচয়ান্তানি কর্ম্মাণীতি প্রসজ্যেত, মরণপর্য্যন্তানি কর্ম্মাণীতি প্রসজ্যেত ইত্যর্থঃ। নন্বিষ্যত এব পাত্রচয়ান্তং কর্ম্মণামিত্যত আহ "তত্রৈষণা-ব্যুত্থান"মিতি। তস্মান্নাবিশেষেণ কর্ত্তুঃ প্রয়োজকং ফলং ভবতীতি। "ফলাভাব" ইত্যস্য সূত্রাবয়বস্যাবিশেষেণ ফলস্য কর্ত্তৃপ্রয়োজকস্যাভাব ইত্যর্থঃ। অনেন এষণাব্যুত্থান-শ্রুতিবিরোধো দর্শিতঃ"।—তাৎপর্য্যটীকা।

অঙ্গিরা প্রভৃতি মুনিগণ এই ইতিহাস ও পুরাণকে বলিয়াছিলেন, এই ইতিহাস ও পুরাণ পঞ্চম বেদ এবং বেদসমূহের বেদ" অর্থাৎ সকল বেদার্থের বোধক। অতএব এই ইতিহাস ও পুরাণের অপ্রামাণ্য অযুক্ত। এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের অপ্রামাণ্য হইলে প্রাণিগণের অর্থাৎ মনুষ্যমাত্রের ব্যবহার-লোপপ্রযুক্ত লোকোচ্ছেদের আপত্তি হয়।

দ্রষ্টা ও বক্তার সমানতাপ্রযুক্তও (ইতিহাসাদির) অপ্রামাণ্যের উপপত্তি হয় না। বিশদার্থ এই যে, যাঁহারাই "মন্ত্র" ও "ব্রাহ্মণে"র দ্রষ্টা ও বক্তা, তাঁহারাই ইতিহাস ও পুরাণের এবং ধর্ম্মশাস্ত্রের দ্রষ্টা ও বক্তা।

বিষয়ের ব্যবস্থাপ্রযুক্তও (বেদাদি শাস্ত্রের) যথাবিষয় প্রামাণ্য (স্বীকার্য্য)। বিশদার্থ এই যে, "মন্ত্র" ও "ব্রাহ্মণে"র বিষয় অন্য এবং ইতিহাস, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্রের বিষয় অন্য। যজ্ঞ,—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের বিষয়, লোকবৃত্ত—ইতিহাস ও পুরাণের বিষয়, লোকব্যবহারের ব্যবস্থা ধর্ম্মশাস্ত্রের বিষয়। তন্মধ্যে এক শাস্ত্র কর্ত্তৃক সকল বিষয় ব্যবস্থাপিত হয় না, এ জন্য ইন্দ্রিয় প্রভৃতির ন্যায় এই সমস্ত শাস্ত্র অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত "মন্ত্র," "ব্রাহ্মণ" এবং ইতিহাস পুরাণাদি সকল শাস্ত্রই যথাবিষয় প্রমাণ [অর্থাৎ ইন্দ্রিয় প্রভৃতি যেমন ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, কারণ, উহার মধ্যে একের দ্বারা অপরের গ্রাহ্য বিষয়ে জ্ঞান হয় না, তদ্রূপ উক্ত কারণে বেদাদি সকল শাস্ত্রই ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার্য্য।]

টিপ্পনী। মহর্ষি তাঁহার পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিবার জন্য শেষে আবার এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞকর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সকলেরই কর্ত্তব্য হইলে সকলেরই "পাত্রচয়ান্ত" কর্ম্ম অর্থাৎ মরণকাল পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিতে হয়। কিন্তু সকলেরই "পাত্রচয়ান্ত" কর্ম্মের উপপত্তি হয় না। কারণ, এষণাত্রয়মুক্ত সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর ফলকামনা না থাকায় তাঁহার পক্ষে মরণকাল পর্য্যন্ত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মানুষ্ঠান সম্ভব নহে। অতএব ঐ সকল কর্ম্মের ফল নির্ব্বিশেষে কর্ত্তার প্রযোজক হয় না। অর্থাৎ যে ফলের কামনাপ্রযুক্ত কর্ত্তা ঐ সমস্ত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হন, সর্ব্বত্যাগী নিষ্কাম সন্ন্যাসীর ঐ ফলের কামনা না থাকায় উহা তাঁহার ঐ কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রযোজক হয় না। সুতরাং তিনি ঐ সমস্ত কর্ম্ম করেন না—তাঁহার তখন ঐ সমস্ত কর্ম্ম কর্ত্তব্যও নহে। ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্তরূপেই এই সূত্রের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তদনুসারে তাৎপর্য্যটীকাকারও এখানে পূর্ব্বোক্তরূপেই তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়াছেন। এই ব্যাখ্যায় সূত্রে "ফলাভাব" শব্দের দ্বারা ফলের কর্ত্তৃপ্রযোজকত্বের অভাবই বিবক্ষিত এবং "পাত্রচয়ান্ত" শব্দের দ্বারা মরণান্তকর্ম্মসমূহ বিবক্ষিত। অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞকারী সাগ্নিক দ্বিজাতির মৃত্যু হইলে তাঁহার সমস্ত যজ্ঞপাত্র যথাক্রমে তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে বিন্যস্ত করিয়া অন্ত্যেষ্টি করিতে হয়। কোন্ অঙ্গে কোন্ পাত্র বিন্যস্ত করিতে হয়,

ইহার ক্রম ও বিধিপদ্ধতি "লাট্যায়নসূত্র" এবং "কর্ম্মপ্রদীপ" গ্রন্থে কথিত হইয়াছে[১]। "অন্ত্যেষ্টি-দীপিকা" গ্রন্থে সেই সমস্ত উদ্ধৃত হইয়াছে। ("অন্ত্যেষ্টি-দীপিকা," কাশী সংস্করণ, ৫৬—৫৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। সাগ্নিক দ্বিজাতির অন্ত্যেষ্টিকালে তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে যে যজ্ঞপাত্রের স্থাপন, তাহাই সূত্রে "পাত্রচয়" শব্দের দ্বারা গৃহীত হইয়াছে। কিন্তু যিনি মরণদিন পর্য্যন্ত অগ্নিহোত্র করিয়াছেন, তৎপূর্ব্বে বৈরাগ্যবশতঃ যজ্ঞপাত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই, তাঁহার পক্ষেই অন্ত্যেষ্টিকালে উক্ত যজ্ঞপাত্র স্থাপন সম্ভব হওয়ায় সূত্রে "পাত্রচয়ান্ত" শব্দের দ্বারাই মরণান্ত কর্ম্মসমূহই বিবক্ষিত, ইহা বুঝা যায়। কারণ, মরণদিন পর্য্যন্ত যজ্ঞকর্ম্ম করিলেই তাহার অন্তে দাহের পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত "পাত্রচয়" হইয়া থাকে। সুতরাং "পাত্রচয়ান্ত" শব্দের দ্বারা তাৎপর্য্য-বশতঃ মরণান্তকর্ম্মসমূহ বুঝা যাইতে পারে। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্যানুসারে তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতিমিশ্রও ঐরূপই তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, সকলেরই মরণান্তকর্ম্মসমূহ কর্ত্তব্য, উহা আমরা স্বীকারই করি—এ জন্য ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, তাহা হইলে এষণাত্রয় হইতে ব্যুত্থানের যে শ্রুতি আছে, তাহার উপপত্তি হইতে পারে না। ভাষ্যকার পরে ঐ শ্রুতি প্রদর্শনের জন্য বৃহদারণ্যক উপনিষদের "এতদ্ধ স্ম বৈ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। উক্ত শ্রুতিবাক্যে পূর্ব্বতন আত্মজ্ঞগণ যে, প্রজা কামনা করেন নাই, আত্মাই তাঁহাদিগের একমাত্র "লোক" অর্থাৎ কাম্য, তাঁহারা এ জন্য পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা ও লোকৈষণা পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা উক্ত হইয়াছে। সুতরাং এষণাত্রয়মুক্ত সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীদিগের যে যজ্ঞাদি কর্ম্ম নাই, উহা তাঁহাদিগের পরিত্যাজ্য, ইহা উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা বুঝা যায়। উক্ত শ্রুতিবাক্যের ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য "প্রজা" শব্দের দ্বারা কর্ম্ম ও অপরা ব্রহ্মবিদ্যা পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়া, পূর্ব্বতন আত্মজ্ঞগণ কর্ম্ম ও অপরা বিদ্যাকে কামনা করেন নাই, অর্থাৎ তাঁহারা পুত্রাদি লোকত্রয়ের সাধন কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করেন নাই, এইরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এবং উক্ত শ্রুতিবাক্যের অব্যবহিত পূর্ব্বে "এতমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তি" এই শ্রুতিবাক্যে "প্রব্রজন্তি" এই বাক্যকে সন্ন্যাসাশ্রমের বিধিবাক্য বলিয়া শেষোক্ত "এতদ্ধ স্ম বৈ" ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যকে উহার "অর্থবাদ" বলিয়াছেন। সে যাহাই হউক, মূলকথা উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা যখন এষণাত্রয় পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণের কথা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, তখন তাদৃশ নিষ্কাম সন্ন্যাসীদিগের সম্বন্ধে পাত্রচয়ান্ত কর্ম্ম অর্থাৎ মরণদিন পর্য্যন্ত কর্ম্মানুষ্ঠানের উপপত্তি হইতে পারে না। সুতরাং কর্ম্মের ফল নির্ব্বিশেষে কর্ত্তার প্রযোজক হয় না, ইহাই ভাষ্যকার শেষে সূত্রার্থ ব্যক্ত করিয়াছেন।

বৃত্তিকার বিশ্বনাথ এই সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে প্রথমে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বপক্ষবাদীর আশঙ্কা হইতে পারে যে, মুমুক্ষু সন্ন্যাসী অগ্নিহোত্র পরিত্যাগ করায় উহা তাঁহার মোক্ষের প্রতিবন্ধক না

১। "শিরসি কপালানি ইড়াং দক্ষিণাগ্রাঞ্চ" ইত্যাদি লাট্যায়নসূত্র। "আজ্যপূর্ণাং দক্ষিণাগ্রাং স্রুচং মুখে স্থাপয়েৎ। তথাগ্রমাজ্যপূর্ণং স্রুবং নাসিকায়াং। পাদয়োঃ প্রাগগ্রামধবারণিং। তথাগ্রামুত্তরারণিমুরসি। সব্যপার্শ্বে দক্ষিণাগ্রং শূর্পং। দক্ষিণপার্শ্বে দক্ষিণাগ্রং চমসং, উরুদ্বয়মধ্যে উলূখলং মুষলমধোমুখং, তত্রৈব চ ক্রমোবিলীকঞ্চ স্থাপয়েৎ"।—কর্ম্মপ্রদীপ।

হইলেও তিনি পূর্ব্বে যে অগ্নিহোত্র করিয়াছেন, উহার ফল স্বর্গ তাঁহার অবশ্যই হইবে। সুতরাং ঐ স্বর্গই তাঁহার মোক্ষের প্রতিবন্ধক হইবে। কারণ, স্বর্গভোগ করিতে হইলে মুক্তি হইতে পারে না। উক্ত আশঙ্কা নিরাসের জন্য মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, মুমুক্ষু সন্ন্যাসীর পূর্ব্বকৃত অগ্নিহোত্রের ফলাভাব, অর্থাৎ তাঁহার পক্ষে উহার ফল যে স্বর্গ, তাহা হয় না। কারণ, অগ্নিহোত্র "পাত্রচয়ান্ত"। অগ্নিহোত্রকারীর মৃত্যু হইলে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিকালে তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গে অগ্নিহোত্র-সাধন পাত্রসমূহের বিন্যাসই "পাত্রচয়"। কিন্তু সন্ন্যাসী পূর্ব্বেই ঐ সমস্ত পাত্র পরিত্যাগ করায় তাঁহার অন্ত্যেষ্টিকালে উক্ত "পাত্রচয়" সম্ভবই নহে। সুতরাং তাঁহার পূর্ব্বকৃত অগ্নিহোত্র পাত্রচয়ান্ত না হওয়ায় অসম্পূর্ণ, তাই তাঁহার সম্বন্ধে উহার ফল (স্বর্গ) হয় না। তিনি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া মোক্ষলাভই করেন। আবার আশঙ্কা হইতে পারে যে, মুমুক্ষু সন্ন্যাসী পূর্ব্বে অন্যান্য যে সমস্ত স্বর্গ-জনক ও নরকজনক পুণ্যকর্ম্ম ও পাপকর্ম্ম করিয়াছেন, তাহার ফল স্বর্গ ও নরকই তাঁহার মোক্ষের প্রতিবন্ধক হইবে। এ জন্য মহর্ষি এই সূত্রে "চ" শব্দের দ্বারা অন্য হেতুরও সূচনা করিয়াছেন। সেই হেতু কর্ম্মক্ষয়। তাৎপর্য্য এই যে, মুমুক্ষুর তত্ত্বজ্ঞান তাঁহার প্রারব্ধ ভিন্ন সমস্ত কর্ম্মের ক্ষয় করায় তৎপ্রযুক্ত তাঁহার আর পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফলভোগও হইতে পারে না। সুতরাং সেই সমস্ত কর্ম্মের ফলও তাঁহার মোক্ষের প্রতিবন্ধক হয় না। "ন্যায়সূত্রবিবরণ"কার রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য্যও এখানে বৃত্তিকার বিশ্বনাথের ব্যাখ্যাই গ্রহণ করিয়া পূর্ব্ববৎ সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ শেষে অন্য সম্প্রদায়ের ব্যাখ্যা বলিয়া ভাষ্যকারোক্ত প্রাচীন ব্যাখ্যারও উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু গোস্বামী ভট্টাচার্য্য তাহাও করেন নাই। বস্তুতঃ মহর্ষির এই সূত্রে "ফলাভাব" শব্দের দ্বারা সরলভাবে ফলের অভাব অর্থাৎ ফল হয় না, এই অর্থই বুঝা যায়। সুতরাং এই সূত্রের দ্বারা বৃত্তিকার বিশ্বনাথের ব্যাখ্যাত অর্থ ই যে, সরলভাবে বুঝা যায়, ইহা স্বীকার্য্য। কিন্তু বৃত্তিকারের ব্যাখ্যায় প্রথম বক্তব্য এই যে, যদি অগ্নিহোত্রকারীর অন্ত্যেষ্টিকালে যে কোন কারণে উক্ত "পাত্রচয়" (অঙ্গে যজ্ঞপাত্র বিন্যাস) না হয়, তাহা হইলে তাঁহার পূর্ব্বকৃত অগ্নিহোত্র যে, একেবারেই নিষ্ফল হইবে, এ বিষয়ে প্রমাণ আবশ্যক। বৃত্তিকার এ বিষয়ে কোন প্রমাণ প্রদর্শন করেন নাই। যদি উক্তরূপ স্থলে পূর্ব্বকৃত অগ্নিহোত্রের পূর্ণ ফল না হইলেও কিঞ্চিৎ ফলও হয়, তাহা হইলেও আর "ফলাভাব" বলা যায় না, সুতরাং বৃত্তিকারের প্রথমোক্ত আশঙ্কারও খণ্ডন হয় না। দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, বৃত্তিকার সূত্রস্থ "চ" শব্দের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানীর ফলাভাবে তত্ত্বজ্ঞানজন্য কর্ম্মক্ষয়কে হেত্বন্তররূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত হেতু ব্যর্থ হয়। কারণ, তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে তজ্জন্যই পূর্ব্বকৃত অগ্নিহোত্রজন্য অদৃষ্টেরও ক্ষয় হওয়ায় উহার ফল স্বর্গ হয় না, ইহা সর্ব্বসম্মত শাস্ত্রসিদ্ধান্তই আছে। সুতরাং মুমুক্ষুর তত্ত্বজ্ঞান পর্য্যন্ত গ্রহণ করিয়া তাঁহার কৃত কর্ম্মের ফলের অভাব সমর্থন করিলে উহাতে আর কোন হেতু বলা নিষ্প্রয়োজন এবং তাহা এখানে মহর্ষির বক্তব্যও নহে। কারণ, "ঋণানুবন্ধ"প্রযুক্ত অপবর্গ হইতে পারে না, যজ্ঞাদি কর্ম্মানুরোধে অপবর্গার্থ অনুষ্ঠানের সময়ই নাই, এই পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন করিতেই মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত তিনটি সূত্র বলিয়াছেন। উহার দ্বারা সন্ন্যাসাশ্রমে যজ্ঞাদি কর্ম্মের কর্ত্তব্যতা

না থাকায় অপবর্গার্থ অনুষ্ঠানের সময় আছে,—সন্ন্যাসাশ্রমও বেদবিহিত, সন্ন্যাসীর মরণান্ত কর্ম্ম কর্ত্তব্য নহে, উহা তাঁহার পক্ষে সম্ভবও নহে, এই সমস্ত তত্ত্ব সূচিত হইয়াছে এবং উক্ত পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে শাস্ত্রানুসারে ঐ সমস্ত তত্ত্বই মহর্ষির এখানে বক্তব্য। তাই ভাষ্যকারও এখানে প্রথম হইতেই বিচারপূর্ব্বক ঐ সমস্ত তত্ত্বের সমর্থন করিয়াছেন। মুমুক্ষু অধিকারী সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রবণ মননাদি সাধনের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে, তখন তাঁহার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফল স্বর্গনরকাদি যে তাঁহার মোক্ষের প্রতিবন্ধক হয় না; কারণ, তত্ত্বজ্ঞানজন্য তাঁহার ঐ কর্ম্মক্ষয় হওয়ায় উহার ফল হইতেই পারে না, ইহা শাস্ত্রসিদ্ধান্তই আছে, "জ্ঞানাগ্নিঃ কর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা।" (গীতা, ।৪।৩৭) সুতরাং মহর্ষির পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের সমাধান করিতে এখানে ঐ সমস্ত কথা বলা অনাবশ্যক। পরন্তু যদি বৃত্তিকারের কথিত আশঙ্কার সমাধানও মহর্ষির কর্ত্তব্য হয় এবং এই সূত্রের দ্বারা তিনি তাহাই করিয়াছেন, ইহা বলা যায়, তাহা হইলে এই সূত্রে তত্ত্বজ্ঞানীর পূর্ব্বকৃত অগ্নিহোত্রের ফলাভাবে মহর্ষি "পাত্রচয়ান্তানুপপত্তি"কে হেতু বলিবেন কেন? ইহা চিন্তা করা আবশ্যক। মনে হয়, ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীন ব্যাখ্যাকারগণ এই সমস্ত চিন্তা করিয়াই এই সূত্রের অন্যরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সে ব্যাখ্যা পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। সুধীগণ বৃত্তিকারোক্ত ব্যাখ্যায় পূর্ব্বোক্ত বক্তব্যগুলি চিন্তা করিয়া এই সূত্রের প্রকৃতার্থ বিচার করিবেন।

ভাষ্যকার পূর্ব্বে নানা শ্রুতিবাক্যের দ্বারা সন্ন্যাসাশ্রমের বেদবিহিতত্ব ও চতুরাশ্রমবাদ সমর্থন করিয়া একাশ্রমবাদের খণ্ডন করিয়াছেন। পরিশেষে আবার এখানে উক্ত সিদ্ধান্তের সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, ইতিহাস, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্রেও চতুরাশ্রমের বিধান থাকায় একাশ্রমবাদের উপপত্তি হইতে পারে না। অর্থাৎ ঋষিপ্রণীত ইতিহাস, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্রেও যখন চতুরাশ্রম বিহিত হইয়াছে, তখন উহা যে মূল বেদবিহিত সিদ্ধান্ত, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ, আর্ষ ইতিহাসাদিতে বেদার্থেরই উপদেশ হইয়াছে। নচেৎ ঐ ইতিহাসাদির প্রামাণ্যই সিদ্ধ হয় না। সুতরাং চতুরাশ্রম-বাদ যে সর্ব্বশাস্ত্রে কীর্ত্তিত সিদ্ধান্ত, ইহা স্বীকার্য্য হইলে গৃহস্থাশ্রম ভিন্ন আর কোন আশ্রম নাই, এই মতের কোনরূপেই উপপত্তি হইতে পারে না; সুতরাং উহা অগ্রাহ্য। পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, ইতিহাস, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রামাণ্যই নাই; এতদুত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, বেদের "ব্রাহ্মণ"ভাগ—যাহা প্রমাণ বলিয়া উভয় পক্ষেরই স্বীকৃত, তাহাতেই যখন ইতিহাস ও পুরাণের প্রামাণ্য স্বীকৃত, তখন উহার অপ্রামাণ্য বলা যায় না। ভাষ্যকার ইহা বলিয়া বেদের "ব্রাহ্মণ"-ভাগ হইতে ইতিহাস ও পুরাণের প্রামাণ্যবোধক "তে বা খল্বেতে" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। অনুসন্ধান করিয়াও উক্তরূপ শ্রুতিবাক্যের মূলস্থান জানিতে পারি নাই। ছান্দোগ্যোপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম খণ্ডে নারদ-সনৎকুমার-সংবাদে নারদের উক্তির মধ্যে "ইতিহাস-পুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদং" এইরূপ শ্রুতিপাঠ আছে। (প্রথম খণ্ডের ভূমিকা, ২য় পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। সেখানে ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য "বেদানাং বেদং" এই বাক্যের দ্বারা ব্যাকরণশাস্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন। ব্যাকরণশাস্ত্র সকল বেদের বেদ অর্থাৎ বোধক। বৃহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে "সামবেদোহথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণং" এইরূপ শ্রুতিপাঠ আছে।

কিন্তু এখানে ভাষ্যকারের উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যে "অভ্যবদন্" এই ক্রিয়াপদের প্রয়োগ থাকায় উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা বুঝা যায় যে, অথর্ব্ব ও অঙ্গিরা মুনিগণ ইতিহাস ও পুরাণের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে, ইতিহাস ও পুরাণ পঞ্চম বেদ এবং সমস্ত বেদের বেদ (বোধক), অর্থাৎ সকল বেদার্থের নির্ণায়ক। বস্তুতঃ ইতিহাস ও পুরাণের দ্বারা যে বেদার্থের নির্ণয় করিতে হইবে, ইহা মহাভারতাদি গ্রন্থে ঋষিগণই বলিয়া গিয়াছেন[১]।

ফলকথা, এখানে ভাষ্যকারের উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্য এবং পূর্ব্বোক্ত ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক উপনিষদের শ্রুতিবাক্যের দ্বারা ইতিহাস ও পুরাণের প্রামাণ্য যে বেদসম্মত, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। অবশ্য বেদের অন্তর্গত ইতিহাস ও পুরাণও আছে। বেদব্যাখ্যাকার শঙ্করাচার্য্য ও সায়নাচার্য্য প্রভৃতি তাহাও প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু এখানে ভাষ্যকার যে বেদভিন্ন ইতিহাস ও পুরাণেরই উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহার উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা চতুর্ব্বেদ ভিন্ন ইতিহাস ও পুরাণেরই প্রামাণ্য সমর্থিত হইয়াছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। অন্যথা "ইতিহাস ও পুরাণ পঞ্চম বেদ" এইরূপ উক্তির উপপত্তি হয় না। বস্তুতঃ বেদ হইতে ভিন্ন ইতিহাস ও পুরাণশাস্ত্র যে সুপ্রাচীন কালেও ছিল, ইহা বেদের দ্বারাই বুঝা যায়। বেদের ন্যায় পুরাণও যে সেই এক ব্রহ্ম হইতেই সমুদ্ভূত, ইহা অথর্ব্ববেদসংহিতাতেও স্পষ্ট কথিত হইয়াছে এবং উহাতে বেদ ভিন্ন ইতিহাসেরও উল্লেখ আছে[২]। তৈত্তিরীয় আরণ্যকের প্রথম প্রপাঠকের তৃতীয় অনুবাকে "স্মৃতিঃ প্রত্যক্ষমৈতিহ্যমনুমানচতুষ্টয়ং" এই শ্রুতিবাক্যে "ঐতিহ্য" শব্দের দ্বারা ইতিহাস ও পুরাণশাস্ত্র কথিত হইয়াছে, ইহা মাধবাচার্য্য প্রভৃতি প্রাচীন মনীষিগণ বলিয়াছেন। পরন্তু উক্ত শ্রুতিবাক্যে "স্মৃতি" শব্দের দ্বারা স্মৃতিশাস্ত্র বা ধর্ম্মশাস্ত্রও অবশ্যই বুঝা যায়। সুতরাং ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রামাণ্যও যে শ্রুতিসম্মত এবং সুপ্রাচীন কালেও উহার অস্তিত্ব ছিল, ইহাও বুঝিতে পারা যায়। শতপথব্রাহ্মণের একাদশ ও চতুর্দ্দশ কাণ্ডেও বেদভিন্ন ইতিহাস ও পুরাণের উল্লেখ আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য প্রভুপাদ শ্রীজীব গোস্বামী তত্ত্বসন্দর্ভের প্রারম্ভে পুরাণের প্রামাণ্যাদি বিষয়ে নানা প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন।

মূলকথা, বেদমূলক ইতিহাস পুরাণাদি শাস্ত্রও বেদের সমানকালীন এবং বেদবৎ প্রমাণ, ইহা বেদের দ্বারাই সমর্থিত হয়। পরবর্ত্তী কালে অন্যান্য ঋষিগণ ক্রমশঃ বেদবর্ণিত পূর্ব্বোক্ত ইতিহাস পুরাণাদি শাস্ত্র অবলম্বন করিয়া, নানা গ্রন্থের দ্বারা ঐ সকল শাস্ত্রোক্ত তত্ত্ব নানাপ্রকারে প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের ঐ সমস্ত গ্রন্থও ইতিহাস ও পুরাণাদি নামে কথিত হইয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রামাণ্য সমর্থন করিতে ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রামাণ্য না থাকিলে সর্ব্বপ্রাণীর ব্যবহার লোপ হয় ; সুতরাং লোকোচ্ছেদ হয়। ভাষ্যকার এখানে "প্রাণভৃৎ" শব্দের দ্বারা মনুষ্য-

---

১। ইতিহাসপুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ।
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্বেদো মাময়ং প্রতরিষ্যতি" —মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ১ম অঃ, ২৬৭।

২। ঋচঃ সামানি ছন্দাংসি পুরাণং যজুষা সহ।
উচ্ছিষ্টাজ্জজ্ঞিরে সর্ব্বে দিবি দেবা দিবিশ্রিতঃ। অথর্ব্ববেদসংহিতা—১১।৭।২৪।
"স বৃহতীং দিশমনুব্যচলৎ। তমিতিহাসশ্চ পুরাণঞ্চ গাথাশ্চ নারাশংসীশ্চানুব্যচলন্"।—ঐ, ১৫।৬।১১।

মাত্রই গ্রহণ করিয়াছেন বুঝা যায়। ধর্ম্মশাস্ত্র মনুষ্যমাত্রেরই ব্যবহারপ্রতিপাদক। ধর্ম্মশাস্ত্রবক্তা মন্বাদি ঋষিগণ দস্যু ও পাষণ্ড মনুষ্যগণেরও ধর্ম্ম বলিয়াছেন[১]। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের ১৩৩শ অধ্যায়ে দস্যুধর্ম্ম কথিত হইয়াছে। এবং ১৩৫শ অধ্যায়ে দস্যুগণের প্রতি কর্ত্তব্যের উপদেশ বর্ণিত হইয়াছে। ফলকথা, ধর্ম্মশাস্ত্রে সর্ব্ববিধ মানবেরই ধর্ম্ম কথিত হইয়াছে, উহা অগ্রাহ্য করিয়া সকল মানবই উচ্ছৃঙ্খল হইলে সমাজস্থিতি থাকে না, সুতরাং লোকোচ্ছেদ হয়। অতএব ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রামাণ্য অবশ্য স্বীকার্য্য। তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, ধর্ম্মশাস্ত্র সর্ব্বজনেরই কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্যের প্রতিপাদক বলিয়া সর্ব্বজনপরিগৃহীত, অতএব ধর্ম্মশাস্ত্রেরও প্রামাণ্য স্বীকার্য্য। বুদ্ধ প্রভৃতির শাস্ত্রসমূহ সর্ব্বজনপরিগৃহীত নহে, বেদবিশ্বাসী আস্তিক আর্য্যগণ উহা গ্রহণ করেন নাই, এ জন্য সে সমস্ত শাস্ত্র প্রমাণ হইতে পারে না।

ভাষ্যকার ইতিহাস, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রামাণ্য সমর্থন করিতে শেষে আবার বিশেষ যুক্তি প্রকাশ করিয়াছেন যে, "মন্ত্র" ও "ব্রাহ্মণ" নামক বেদের প্রামাণ্য যখন স্বীকৃত, তখন ইতিহাস, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রামাণ্যও স্বীকার্য্য, উহার অপ্রামাণ্যের উপপত্তি হয় না। কারণ, যে সমস্ত ঋষি "মন্ত্র" ও "ব্রাহ্মণ" নামক বেদের দ্রষ্টা ও প্রবক্তা, তাঁহারাই ইতিহাস, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্রের দ্রষ্টা ও প্রবক্তা। সুতরাং তাঁহাদিগের দৃষ্ট ও কথিত ইতিহাসাদি শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য হইতে পারে না। তাহা হইলে বেদেরও অপ্রামাণ্য হইতে পারে। তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে ধর্ম্মশাস্ত্রের বেদবৎ প্রামাণ্য সমর্থন করিতে একটি বিশেষ যুক্তি বলিয়াছেন যে, অনেক বৈদিক কর্ম্ম স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত ইতিকর্ত্তব্যতা অপেক্ষা করে এবং স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত কর্ম্মও বৈদিক মন্ত্রাদিকে অপেক্ষা করে। অর্থাৎ বৈদিক মন্ত্রাদির সাহায্যে যেমন স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে হয়, তদ্রূপ অনেক বৈদিক কর্ম্ম স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত পদ্ধতি অনুসারেই করিতে হয়। বেদে ঐ সকল কর্ম্মের বিধি থাকিলেও কিরূপে উহা করিতে হইবে, তাহার পদ্ধতি পাওয়া যায় না। সুতরাং বেদের সহিত স্মৃতিশাস্ত্রের ঐরূপ সম্বন্ধ থাকায় স্মৃতিশাস্ত্রের (ধর্ম্মশাস্ত্রের) বেদবৎ প্রামাণ্য স্বীকার করিতে হইবে। অন্যথা বেদ ও স্মৃতিশাস্ত্রের ঐরূপ সম্বন্ধের উপপত্তি হয় না। ভাষ্যকার শেষে বেদ এবং ইতিহাস, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রত্যেকেরই স্ব স্ব বিষয়ে প্রামাণ্য সমর্থন করিতে দ্বিতীয় যুক্তি প্রকাশ করিয়াছেন যে, "মন্ত্র" ও "ব্রাহ্মণ"রূপ বেদের বিষয় অর্থাৎ প্রতিপাদ্য যজ্ঞ; ইতিহাস ও পুরাণের বিষয় লোকচরিত; লোকব্যবহারের অর্থাৎ সকল মানবের কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্যের ব্যবস্থা বা নিয়ম ধর্ম্মশাস্ত্রের বিষয়। উক্ত সমস্ত বিষয়েরই প্রতিপাদক প্রমাণ আবশ্যক। কিন্তু উহার মধ্যে কোন একটি শাস্ত্রই পূর্ব্বোক্ত সমস্ত বিষয়ের প্রতিপাদক নহে। ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্র উক্ত ভিন্ন ভিন্ন বিষয়েরই প্রতিপাদক। সুতরাং যেমন চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় এবং অনুমানাদি প্রমাণগুলি সকল বিষয়েরই প্রতিপাদক নহে, কিন্তু স্ব স্ব বিষয়েরই প্রতিপাদক হওয়ায় ঐ সমস্ত স্ব স্ব বিষয়ে প্রমাণ, তদ্রূপ পূর্ব্বোক্ত বেদাদি শাস্ত্রও প্রত্যেকেই স্ব স্ব বিষয়ে প্রমাণ, ইহা স্বীকার্য্য।

১। দেশধর্ম্মান্ জাতিধর্ম্মান্ কুলধর্ম্মাংশ্চ শাশ্বতান্
পাষণ্ডগণধর্ম্মাংশ্চ শাস্ত্রেঽস্মিন্নুক্তবান্ মনুঃ।—মনুসংহিতা, ১ম অঃ, ১১৮।

এখানে প্রণিধান করা আবশ্যক যে, ভাষ্যকার পূর্ব্বে "দ্রষ্টৃপ্রবক্তৃসামান্যাচ্চ" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা ইতিহাস, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্রের দ্রষ্টা ও বক্তা ঋষিগণই বেদেরও দ্রষ্টা ও বক্তা, এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ করায় তাঁহার মতে ভিন্ন ভিন্ন ঋষিবিশেষই বেদবক্তা এবং তাঁহাদিগের প্রামাণ্য-বশতঃই বেদের প্রামাণ্য, ইহা বুঝা যায়। পূর্ব্বোক্ত "প্রধানশব্দানুপপত্তেঃ" ইত্যাদি (৫৯ম) সূত্রের ভাষ্যেও ভাষ্যকার অন্য প্রসঙ্গে "ঋষি" শব্দের প্রয়োগ করায় তাঁহার মতে ঋষিই যে বেদের বক্তা, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের সপ্তম, অষ্টম ও উনচত্বারিংশ সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকারের উক্তিবিশেষের দ্বারাও তাঁহার মতে বেদবাক্য যে ঋষিবাক্য, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। এবং দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের সর্ব্বশেষ সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, "যাঁহারাই বেদার্থসমূহের দ্রষ্টা ও বক্তা, তাঁহারাই আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতির দ্রষ্টা ও বক্তা।" ভাষ্যকারের ঐ কথার দ্বারাও তাঁহার মতে যে, কোন এক আপ্ত ব্যক্তিই সকল বেদের বক্তা নহেন, বহু আপ্ত ব্যক্তিই সকল বেদের বক্তা, ইহাই বুঝা যায় "তেন প্রোক্তং" এই পাণিনিসূত্রের মহাভাষ্যের দ্বারাও ঋষিগণই যে, বেদবাক্যের রচয়িতা, এই সিদ্ধান্ত বুঝিতে পারা যায়[১]। "সুশ্রুতসংহিতা"য় "ঋষিবচনং বেদঃ" এই উক্তির দ্বারাও বেদ যে ঋষিবাক্য, এই সিদ্ধান্ত বুঝিতে পারা যায়[২]। প্রাচীন বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদও আর্ষজ্ঞানের লক্ষণ বলিতে ঋষিদিগকে বেদের বিধাতা বলিয়াছেন। সেখানে "ন্যায়কন্দলী"কার শ্রীধরভট্টও প্রশস্তপাদের ঐ কথার ব্যাখ্যা করিতে ঋষিদিগকে বেদের কর্ত্তাই বলিয়াছেন। কিন্তু ঈশ্বরই বেদকর্ত্তা, আর কেহই বেদকর্ত্তা হইতেই পারেন না, ইহাও অনেক পূর্ব্বাচার্য্য শাস্ত্র ও যুক্তির দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন। তাৎপর্য্যটীকাকার শ্রীমদ্বাচস্পতিমিশ্র এবং উদয়নাচার্য্য, জয়ন্ত ভট্ট ও গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রভৃতি ন্যায়াচার্য্যগণ ঈশ্বরই বেদকর্ত্তা, এই সিদ্ধান্তই বিশেষরূপে সমর্থন করিয়াছেন; ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন ও বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকরের মতের ব্যাখ্যা করিতেও শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র ঋষিদিগকে বেদকর্ত্তা বলেন নাই, তিনি ঈশ্বরকেই বেদকর্ত্তা বলিয়াছেন। বস্তুতঃ সর্ব্বাগ্রে পরমেশ্বর হইতেই যে বেদের উদ্ভব, বেদাদি সকল শাস্ত্রই পরমেশ্বরের নিঃশ্বসিত, ইহা শ্রুতিসিদ্ধ সিদ্ধান্ত; উপনিষদে ইহা কথিত হইয়াছে। (প্রথম খণ্ডের ভূমিকা, ৩য় পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। পরমেশ্বর প্রথমে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়া, তাঁহাকে মনের দ্বারা বেদের উপদেশ করেন এবং প্রথম উৎপন্ন ব্রহ্মা, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র অথর্ব্বকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করেন, ইহাও উপনিষদে কথিত হইয়াছে। (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ষষ্ঠ অধ্যায়ের ১৮শ শ্রুতিবাক্য এবং মুণ্ডকোপনিষদের প্রথম শ্রুতিবাক্য দ্রষ্টব্য)। পরমেশ্বর প্রথমে যে, আদিকবি হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাকে মনের দ্বারা বেদের উপদেশ করেন, ইহা শ্রুতি অনুসারে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম শ্লোকেও কথিত হইয়াছে, এবং কিরূপে সর্ব্বাগ্রে পরমেশ্বর হইতে বেদের উদ্ভব হইয়াছে, পরে ভিন্ন ভিন্ন ঋষি-

---

১। "যদ্যপ্যর্থো নিত্যঃ, যা ত্বসৌ বর্ণানুপূর্ব্বী সা২নিত্যা" ইত্যাদি।—মহাভাষ্য। "মহাপ্রলয়াদিষু বর্ণানুপূর্ব্বী-বিনাশে পুনরুৎপদ্য ঋষয়ঃ সংস্কারাতিশয়াদ্বেদার্থং স্মৃত্বা শব্দরচনাং বিদধতীত্যর্থঃ"। "ততশ্চ কঠাদয়ো বেদানুপূর্ব্ব্যাঃ কর্ত্তার এব" ইত্যাদি।—কৈয়ট।

২। "ঋষিবচনাচ্চ, ঋষিবচনং বেদো যথা কিঞ্চিদিজ্যার্থং মধুরমাহরেদিতি।"—সুশ্রুতসংহিতা, সূত্রস্থান, ৪০শ অঃ।।৮

বিশেষ কিরূপে বেদলাভ করিয়া, উহার প্রচার করিয়াছেন এবং পরে পরমেশ্বরের অংশরূপে অবতীর্ণ হইয়া পরাশরনন্দন (বেদব্যাস) কিরূপে বেদের বিভাগ করিয়াছেন, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের চতুর্থ অধ্যায়ে এবং দ্বাদশ স্কন্ধের ষষ্ঠ অধ্যায়ে সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে। ফল কথা, পুরাণ-বর্ণিত সিদ্ধান্তানুসারে ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন প্রভৃতি কোন কোন পূর্ব্বাচার্য্য ঋষিগণকে বেদের বক্তা বলিলেও তাহাতে ঋষিগণই যে বেদের স্রষ্টা, ইহা প্রতিপন্ন হয় না। ভাষ্যকার ঋষিগণকে বেদের বক্তা বলিলেও স্রষ্টা বলেন নাই, পরন্তু তাঁহাদিগকে বেদের দ্রষ্টাও বলিয়াছেন, ইহাও প্রণিধান করা আবশ্যক। বেদের দ্রষ্টা বলিলে বেদ যে তাঁহাদিগেরই সৃষ্ট নহে, কিন্তু তাঁহাদিগের বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে কাল-বিশেষে পরমেশ্বরের ইচ্ছায় বেদ প্রতিভাত হইয়াছে, ইহাই বুঝা যায়। যাঁহারা বেদের দ্রষ্টা অর্থাৎ পরমেশ্বর যাঁহাদিগের বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে কালবিশেষে বেদ প্রকাশ করিয়া, তাঁহাদিগের দ্বারা বেদের প্রচার করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে "ঋষি" বলা হইয়াছে। "ঋষ" ধাতুর অর্থ দর্শন। সুতরাং "ঋষ" ধাতুনিষ্পন্ন "ঋষি" শব্দের দ্বারা দ্রষ্টা বুঝা যাইতে পারে। তাহা হইলে বেদের প্রথম দ্রষ্টা হিরণ্যগর্ভকেও ঋষি বলা যায়। এবং তাঁহার পরে যাঁহারা বেদের দ্রষ্টা ও বক্তা হইয়াছেন, তাঁহারাও ঋষি। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের মতে তাঁহারা বেদের ন্যায় ইতিহাস, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্রেরও দ্রষ্টা ও বক্তা অর্থাৎ তাঁহার মতে বেদভিন্ন যে ইতিহাস, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্রের সংবাদ বেদ হইতেই পাওয়া যায়, বেদবক্তা ঋষিগণই ঐ ইতিহাসাদিরও দ্রষ্টা ও বক্তা। সুতরাং তাঁহাদিগের প্রামাণ্য-বশতঃ যেমন বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত, তদ্রূপ ঐ সমস্ত ইতিহাসাদি শাস্ত্রের প্রামাণ্যও স্বীকার্য্য। কারণ, ঐ ইতিহাসাদির দ্রষ্টা ও বক্তা ঋষিগণকে যথার্থদ্রষ্টা ও যথার্থবক্তা বলিয়া স্বীকার না করিলে তাঁহাদিগের দৃষ্ট ও কথিত বেদেরও প্রামাণ্য হইতে পারে না, ইহাই ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য। মূল কথা, ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বেদের স্রষ্টা বা শাস্ত্রযোনি পরমেশ্বরের প্রামাণ্যবশতঃ বেদের প্রামাণ্য না বলিয়া, বেদের দ্রষ্টা ও বক্তা হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতির প্রামাণ্যবশতঃই বেদের প্রামাণ্য বলিয়াছেন। কারণ, সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর বেদের কর্ত্তা হইলেও ঐ বেদের দ্রষ্টা ও বক্তাদিগের প্রামাণ্য ব্যতীত বেদের প্রামাণ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। কারণ, তাঁহারা বেদের যথার্থ দ্রষ্টা ও যথার্থ বক্তা না হইলে তাঁহাদিগের কথিত বেদের অপ্রামাণ্য অনিবার্য্য। তাই ভাষ্যকার দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের শেষ সূত্রে "আপ্ত" শব্দের দ্বারা পরমেশ্বরকেই গ্রহণ না করিয়া, বেদের দ্রষ্টা ও বক্তা হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতিকেই গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। ভাষ্যকার সেখানে বেদার্থের দ্রষ্টা ও বক্তাদিগকে আয়ুর্ব্বেদাদিরও দ্রষ্টা ও বক্তা বলিয়া, আয়ুর্ব্বেদাদির প্রামাণ্যের ন্যায় বেদেরও প্রামাণ্য, ইহা সমর্থন করিয়াছেন। পরন্তু "ন্যায়কুসুমাঞ্জলি"র পঞ্চম স্তবকের শেষে বেদের পৌরুষেয়ত্ব সমর্থন করিতে উদয়নাচার্য্য বলিয়াছেন যে, বেদের "কাঠক," "কালাপক" প্রভৃতি বহু নামে যে বহু শাখা আছে, ঐ সকল নামের দ্বারাও বুঝা যায় যে, পরমেশ্বরই প্রথমে "কঠ" ও "কলাপ" প্রভৃতি নামক বহু ব্যক্তির শরীরে অধিষ্ঠিত হইয়া ঐ সমস্ত শাখা বলিয়াছেন। নচেৎ বেদের শাখার ঐ সমস্ত নাম হইতে পারে না। তাহা হইলে তাঁহার মতে এক পরমেশ্বরই সকল বেদের কর্ত্তা হইলেও তিনি বহু শরীরে অধিষ্ঠিত হইয়া সকল বেদের সৃষ্টি করায় সেই সেই শরীরের ভেদ গ্রহণ করিয়া বহু আপ্ত ব্যক্তিকে বেদের কর্ত্তা বলা যায়।

ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন উক্ত মতানুসারে উক্ত তাৎপর্য্যেও বহু ব্যক্তিকে বেদের বক্তা বলিতে পারেন। তাহা হইলেও পরমেশ্বরই যে বেদের স্রষ্টা, এই সিদ্ধান্ত অব্যাহত থাকে। এ বিষয়ে দ্বিতীয় খণ্ডে পূর্ব্বোক্ত উভয় মতের আলোচনা করিয়া সামঞ্জস্য-প্রদর্শন করিতে যথামতি চেষ্টা করিয়াছি। (দ্বিতীয় খণ্ড, ৩৫৭-৬৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। বেদের অপৌরুষেয়ত্ব-বাদী মীমাংসকসম্প্রদায় বলিয়াছেন যে, "কঠ," "কলাপ" ও "কুথুম" প্রভৃতি নামক অনেক ব্যক্তি বেদের শাখাবিশেষের প্রকৃষ্ট অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এ জন্য তাঁহাদিগের নামানুসারেই ঐ সমস্ত শাখার "কাঠক," "কালাপক" ও "কৌথুম" প্রভৃতি নাম হইয়াছে। উদয়নাচার্য্য উক্ত যুক্তির খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু "ন্যায়-মঞ্জরী"কার মহানৈয়ায়িক জয়ন্ত ভট্ট একমাত্র ঈশ্বরই বেদের সর্ব্বশাখার কর্ত্তা, ইহাই সমর্থন করিয়াছেন। ইহার দ্বারা জয়ন্ত ভট্ট যে,উদয়নাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী অথবা উদয়নাচার্য্যের গ্রন্থ তিনি দেখিতে পান নাই, ইহা মনে হয়। কারণ, তিনি উক্ত বিষয়ে উদয়নাচার্য্যের যুক্তির খণ্ডন বা আলোচনা করেন নাই। উক্ত বিষয়ে তাঁহার নিজ মত-সমর্থনে উদয়নাচার্য্যের যুক্তির খণ্ডন বা সমালোচনা বিশেষ আবশ্যক হইলেও তিনি পূর্ণ বিচারক হইয়াও কেন তাহা করেন নাই, ইহা প্রণিধান করা আবশ্যক। জয়ন্ত ভট্ট বেদ সম্বন্ধে আরও অনেক বিচার করিয়া নিজ মতের সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার নিজ মতে অথর্ব্ববেদই সকল বেদের প্রথম। তিনি অথর্ব্ববেদের বেদত্ব সমর্থন করিতে অনেক প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন এবং আয়ুর্ব্বেদ বেদচতুষ্টয়ের অন্তর্গত নহে, উহা বেদ হইতে পৃথক্ শাস্ত্র, কিন্তু উহাও ঈশ্বর-প্রণীত, এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্যও "বৌদ্ধাধিকারে"র শেষ ভাগে আয়ুর্ব্বেদও ঈশ্বরকৃত, এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া, তদ্‌দৃষ্টান্তে বেদও ঈশ্বরকৃত, ইহা সমর্থন করিয়াছেন। তিনিও সেখানে "বেদায়ুর্ব্বেদাদিঃ" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা আয়ুর্ব্বেদ যে, বেদ হইতে পৃথক্ শাস্ত্র, ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণেও অষ্টাদশ বিদ্যার পরিগণনায় বেদচতুষ্টয় হইতে আয়ুর্ব্বেদ ও ধনুর্ব্বেদ প্রভৃতির পৃথক্ উল্লেখ হইয়াছে। বস্তুতঃ অথর্ব্ববেদে আয়ুর্ব্বেদের প্রতিপাদ্য অনেক তত্ত্বের উপদেশ থাকিলেও প্রচলিত "চরকসংহিতা" প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র যে মূল বেদ নহে, ইহা সকলেরই স্বীকার্য্য। ঐ সকল গ্রন্থের মূল আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের উৎপত্তির ইতিহাস যাহা ঐ সকল গ্রন্থেই বর্ণিত হইয়াছে, তদ্দ্বারাও সেই আয়ুর্ব্বেদ নামক মূল শাস্ত্রও যে, বেদচতুষ্টয় হইতে পৃথক্ শাস্ত্র, কিন্তু উহাও সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরেরই উপদিষ্ট, ইহাই বুঝিতে পারা যায়। এ বিষয়ে দ্বিতীয় খণ্ডে (৩৫৫-৫৬ পৃষ্ঠায়) কিছু আলোচনা করিয়াছি। বেদ সম্বন্ধে নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত ও যুক্তি-বিচারাদি "ন্যায়মঞ্জরী" গ্রন্থে জয়ন্ত ভট্ট এবং "বৌদ্ধাধিকার" গ্রন্থের শেষ ভাগে উদয়নাচার্য্য এবং "ঈশ্বরানুমানচিন্তামণি" গ্রন্থের শেষভাগে নব্যনৈয়ায়িক গঙ্গেশ উপাধ্যায় বিশেষরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। বিশেষ জিজ্ঞাসু ঐ সকল গ্রন্থ পাঠ করিলে উক্ত বিষয়ে তাঁহাদিগের সকল কথা জানিতে পারিবেন।

মূলকথা, ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন ঋষিগণকে বেদের বক্তা বলিলেও ঋষিগণই নিজ বুদ্ধির দ্বারা বেদ রচনা করিয়াছেন, ইহা তাঁহার সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। কারণ, উহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত শাস্ত্রবিশ্বাসী কোন পূর্ব্বাচার্য্যই ঐরূপ সিদ্ধান্ত বলিতে পারেন না। বৈশেষিকাচার্য্য প্রশস্তপাদ ও

শ্রীধর ভট্ট প্রভৃতিরও ঐরূপ সিদ্ধান্ত অভিমত হইতে পারে না। সুতরাং তাঁহারাও ঋষিগণকে বেদের বক্তা, এই তাৎপর্য্যেই বেদের কর্ত্তা বলিয়াছেন, ইহাই বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ বেদের উচ্চারণ-কর্ত্তৃত্বই ঋষিগণের বেদকর্ত্তৃত্ব, ইহাই তাঁহাদিগের অভিমত বুঝিতে হইবে। পরন্তু পরবর্ত্তী ঋষিগণ বেদানুসারে কর্ম্ম করিয়াই ঋষিত্ব লাভ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাদিগের পূর্ব্বেও বেদের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। তাঁহারা বেদকে প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করায় বেদের প্রামাণ্য গৃহীত হইয়াছে, এবং তাঁহারা বেদানুসারে কর্ম্ম করিয়া, ঐ সমস্ত কর্ম্মের প্রত্যক্ষ ফলও লাভ করায় বেদ যে সত্যার্থ, ইহাও তখন হইতে প্রতিপন্ন হইয়াছে। পরন্তু বেদে এমন বহু বহু অলৌকিক তত্ত্বের বর্ণন আছে, যাহা প্রথমে সর্ব্বজ্ঞ ব্যতীত আর কাহারও জ্ঞানগোচর হইতেই পারে না। সুতরাং বেদ যে, সেই সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর হইতেই প্রথমে সমুদ্ভূত, সুতরাং তাহার প্রামাণ্য আছে, ইহা স্বীকার্য্য। পরন্তু ইহাও প্রণিধানপূর্ব্বক চিন্তা করা আবশ্যক যে, স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্রের ন্যায় বেদও ঋষি-প্রণীত হইলে বেদকর্ত্তা ঋষিগণ, বেদ রচনার পূর্ব্বে কোন শাস্ত্রের সাহায্যে জ্ঞান লাভ করিয়া বেদ রচনা করিয়াছেন, ইহা অবশ্যই বলিতে হইবে। কারণ, অনধীতশাস্ত্র ও বৈদিক তত্ত্বে সর্ব্বথা অজ্ঞ কোন ব্যক্তিই নিজ বুদ্ধির দ্বারা বেদ রচনা করিতে পারেন না। ঋষিগণ তপস্যালব্ধ জ্ঞানের দ্বারা বেদ রচনা করিয়াছেন, ইহা বলিলেও তাঁহাদিগের ঐ তপস্যাও কোন শাস্ত্রোপদেশসাপেক্ষ, ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, প্রথমে কোনরূপ শাস্ত্রোপদেশ ব্যতীত কোন ব্যক্তিই শাস্ত্রমাত্র-গম্য তত্ত্বের জ্ঞানলাভ ও তজ্জন্য তপস্যাদি করিতে পারেন না। কিন্তু বেদের পূর্ব্বে আর যে কোন শাস্ত্র ছিল, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। বেদই সর্ব্ববিদ্যার আদি, ইহা এখনও সকলেই স্বীকার করেন। পাশ্চাত্যগণের নানারূপ কল্পনায় সুদৃঢ় কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং বেদ, স্মৃতি পুরাণাদির ন্যায় ঋষিপ্রণীত নহে, বেদ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর হইতেই প্রথমে সমুদ্ভূত, তিনিই হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়া, প্রথমে তাঁহাকে মনের দ্বারা বেদের উপদেশ করেন, পরে তাঁহা হইতে উপদেশপরম্পরাক্রমে ঋষিসমাজে বেদের প্রচার হইয়াছিল, এই সিদ্ধান্তই সম্ভব ও সমীচীন এবং উহাই আমাদিগের শাস্ত্র-সিদ্ধ সিদ্ধান্ত। হিরণ্যগর্ভ হইতে বেদ লাভ করিয়া, ক্রমে ঋষিপরম্পরায় বেদের মৌখিক উপদেশের আরম্ভ হয়। সুপ্রাচীন কালে ঐরূপেই বেদের রক্ষা ও সেবা হইয়াছিল। বেদ লিখিয়া উহার অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাদি তখন ছিল না। বেদগ্রন্থ লিখিয়া সর্ব্বসাধারণের মধ্যে উহার প্রচার প্রাচীন কালে ঋষিগণের মতে বেদবিদ্যার রক্ষার উপায় বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। পরন্তু উহা বেদবিদ্যার ধ্বংসের কারণ বলিয়াই বিবেচিত হইয়াছে। তাই মহাভারতে বেদবিক্রেতা ও বেদলেখকগণের বিশেষ নিন্দা করা হইয়াছে[১]। বস্তুতঃ বর্ত্তমান সময়ে লিখিত বেদগ্রন্থ ও উহার ভাষ্যাদির সাহায্যে নিজে নিজে বেদের যেরূপ চর্চ্চা হইতেছে, ইহা প্রকৃত বেদবিদ্যালাভের উপায় নহে। ঐরূপ চর্চ্চার দ্বারা বেদের প্রকৃত সিদ্ধান্ত বুঝা যাইতে পারে না। যথাশাস্ত্র ব্রহ্মচর্য্য ও গুরুকুলবাস ব্যতীত বেদবিদ্যালাভ হইতে পারে না। প্রাচীন ঋষিগণ ঐরূপ শাস্ত্রোক্ত উপায়েই বেদবিদ্যালাভ করিয়া

১। বেদবিক্রয়িণশ্চৈব বেদানাঞ্চৈব দূষকাঃ।
বেদানাং লেখকাশ্চৈব তে বৈ নিরয়গামিনঃ॥—অনুশাসন পর্ব্ব। ২৩ অঃ, ৭২শ্লোক।

পরে ঐ বেদার্থ স্মরণপূর্ব্বক সকল মানবের মঙ্গলের জন্য স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের প্রণীত ঐ সমস্ত শাস্ত্র বেদমূলক, সুতরাং বেদের প্রামাণ্যবশতঃই ঐ সমস্ত শাস্ত্রেরও প্রামাণ্য সিদ্ধ হইয়াছে।

তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র ঋষিপ্রণীত ইতিহাস পুরাণাদি শাস্ত্রের প্রামাণ্য সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, যদিও মন্বাদি ঋষিগণ স্বয়ং অনুভব করিয়াও উপদেশ করিতে পারেন, অর্থাৎ তাঁহারা অলৌকিক যোগশক্তির প্রভাবে নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াই সেই সমস্ত প্রত্যক্ষ তত্ত্বের উপদেশ করিতে পারেন, ইহা সম্ভব; তাহা হইলে তাঁহাদিগের প্রণীত শাস্ত্র স্বতন্ত্র ভাবেই প্রমাণ হইতে পারে, কিন্তু তাঁহাদিগের প্রণীত স্মৃত্যাদিশাস্ত্রের বেদমূলকত্বই যুক্ত। বাচস্পতিমিশ্র মনুসংহিতার বচন[১] উদ্ধৃত করিয়া, উক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। বস্তুতঃ ঋষি-প্রণীত স্মৃত্যাদি শাস্ত্র যে বেদমূলকত্ববশতঃই প্রমাণ, উহার স্বতন্ত্র প্রামাণ্য নাই, ইহা ঋষিগণ নিজেই বলিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনে স্মৃতিপ্রামাণ্য বিচারে "বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাদসতি হ্যনুমানং" (১।৩।৩) এই সূত্রের দ্বারা মহর্ষি জৈমিনি শ্রুতিবিরুদ্ধ স্মৃতির অপ্রামাণ্য এবং শ্রুতির অবিরুদ্ধ স্মৃতির শ্রুতিমূলকত্ববশতঃই প্রামাণ্য, ইহা স্পষ্ট বলিয়াছেন। মীমাংসা-ভাষ্যকার শবরস্বামী শ্রুতি-বিরুদ্ধ স্মৃতির উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। বার্ত্তিককার কাত্যায়ন উহা স্বীকার করেন নাই। তিনি শবরস্বামীর উদ্ধৃত স্মৃতির সহিত শ্রুতির বিরোধ পরিহার করিয়া, শবরস্বামীর মত অগ্রাহ্য করিয়াছেন। কিন্তু মহর্ষি জৈমিনি যখন "বিরোধে ত্বনপেক্ষং স্যাৎ" এই বাক্যের দ্বারা শ্রুতিবিরুদ্ধ স্মৃতির অপ্রামাণ্য বলিয়াছেন, তখন তাঁহার মতে শ্রুতিবিরুদ্ধ স্মৃতি অবশ্যই আছে, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। শবরস্বামী শ্রুতিবিরুদ্ধ স্মৃতির আরও অনেক উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন। সেগুলিও বিচার করিয়া শ্রুতিবিরুদ্ধ হয় কি না, তাহা দেখা আবশ্যক। শারীরকভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও জৈমিনির পূর্ব্বোক্ত সূত্র উদ্ধৃত করিয়া, উহার দ্বারা শ্রুতিবিরুদ্ধ স্মৃতির অপ্রামাণ্য যে, আর্ষ সিদ্ধান্ত, উহা তাঁহার নিজের কল্পিত নহে, ইহা সমর্থন করিয়াছেন। মূল কথা, ঋষিপ্রণীত স্মৃত্যাদি শাস্ত্রের যে, বেদমূলকত্ববশতঃই প্রামাণ্য, ইহাই আর্ষ সিদ্ধান্ত। সুতরাং "ন্যায়মঞ্জরী"কার জয়ন্ত ভট্ট প্রভৃতি কোন কোন পূর্ব্বাচার্য্য মন্বাদি ঋষিপ্রণীত শাস্ত্রের স্বতন্ত্র প্রামাণ্য সমর্থন করিলেও উক্ত সিদ্ধান্ত ঋষিমত-বিরুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। জয়ন্তভট্টও শেষে উক্ত নবীন সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করিয়া স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্রের বেদমূলকত্ববশতঃই প্রামাণ্য, এই প্রাচীন সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়াছেন। এবং শৈবশাস্ত্র ও পঞ্চরাত্র শাস্ত্রকেও ঈশ্বরবাক্য ও বেদের অবিরুদ্ধ বলিয়া, ঐ উভয়েরও প্রামাণ্য সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু বেদবিরুদ্ধ বলিয়া বৌদ্ধাদি শাস্ত্রের প্রামাণ্য তিনিও স্বীকার করেন নাই।

১। "বেদোঽখিলো ধর্ম্মমূলং স্মৃতশীলে চ তদ্বিদাং।
আচারশ্চৈব সাধূনামাত্মনস্তুষ্টিরেব চ॥"
"যঃ কশ্চিৎ কস্যচিদ্ধর্ম্মো মনুনা পরিকীর্ত্তিতঃ।
স সর্ব্বোঽভিহিতো বেদে সর্ব্বজ্ঞানময়ো হি সঃ॥"—মনুসংহিতা, ২য় অঃ, ৬,৭।

জয়ন্ত ভট্ট শেষে পূর্ব্বকালে বেদপ্রামাণ্যবিশ্বাসী আস্তিকসম্প্রদায়ের মধ্যেও অনেকে যে, বৌদ্ধাদি শাস্ত্রেরও প্রামাণ্য সমর্থন করিতেন, ইহাও প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মধ্যে এক সম্প্রদায় বলিতেন যে, বুদ্ধ ও অর্হৎ প্রভৃতিও ঈশ্বরের অবতার। ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান নিবারণের জন্য ভগবান্ বিষ্ণুই বুদ্ধাদিরূপেও অবতীর্ণ হইয়াছেন। "যদা যদা হি ধর্ম্মস্য" ইত্যাদি ভগবদ্গীতাবাক্যের দ্বারাও ইহা প্রতিপন্ন হয়। সুতরাং বুদ্ধপ্রভৃতির বাক্যও ঈশ্বর-বাক্য বলিয়া বেদবৎ প্রমাণ। তাঁহারা অধিকারিবিশেষের জন্যই বিভিন্ন শাস্ত্র বলিয়াছেন। বেদেও অধিকারিবিশেষের জন্য পরস্পর-বিরুদ্ধ নানাবিধ উপদেশ আছে। সুতরাং একই ঈশ্বরের পরস্পর বিরুদ্ধার্থ নানাবিধ বাক্য থাকিলেও উহার অপ্রামাণ্য হইতে পারে না। বৌদ্ধাদি শাস্ত্রের প্রামাণ্য-সমর্থক অপর এক সম্প্রদায় বলিতেন যে, বৌদ্ধাদি শাস্ত্র ঈশ্বরবাক্য নহে, কিন্তু উহাও স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্রের ন্যায় বেদমূলক। সুতরাং উহারও প্রামাণ্য আছে। মনুসংহিতার "যঃ কশ্চিৎ কস্যচিদ্ধর্ম্মো মনুনা পরিকীর্ত্তিতঃ" ইত্যাদি বচনে যেমন "মনু" শব্দের দ্বারা স্মৃতিকার অত্রি, বিষ্ণু, হারীত ও যাজ্ঞবল্ক্যাদি ঋষিকেও গ্রহণ করা হয়, তদ্রূপ বুদ্ধপ্রভৃতিকেও গ্রহণ করা যাইতে পারে। তাঁহারাও অধিকারিবিশেষের জন্য বেদার্থেরই উপদেশ করিয়াছেন। তাঁহাদিগের ঐ সমস্ত উপদেশও বেদমূলক স্মৃতিবিশেষ। সুতরাং মন্বাদি স্মৃতির ন্যায় উহারও প্রামাণ্য আছে। জয়ন্ত ভট্ট বিচারপূর্ব্বক উক্ত উভয় পক্ষেরই সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি পূর্ব্বেই তাঁহার নিজমতের সংস্থাপন করায় অনাবশ্যক বোধে ও গ্রন্থগৌরবভয়ে শেষে আর উক্ত মতের খণ্ডন করেন নাই। কিন্তু তাই বলিয়া তিনি শেষে যে, বেদবাহ্য বৌদ্ধাদি শাস্ত্রেরও প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া স্বাধীন চিন্তা ও উদারতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, ইহা বুঝা যায় না। কারণ, পূর্ব্বে তিনি যে সমস্ত যুক্তির অবতারণা করিয়া বেদবাহ্য বৌদ্ধাদি শাস্ত্রের অপ্রামাণ্য সমর্থন করিয়াছেন এবং তাঁহার পূর্ব্বোক্ত বিচারের উপসংহারে "তস্মাৎ পূর্ব্বোক্তানামেব প্রামাণ্যমাগমানাং ন তু বেদবাহ্যানামিতি স্থিতং" এই বাক্যের দ্বারা যে নিজ সিদ্ধান্ত স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার প্রতি মনোযোগ করিলে তাঁহার নিজমতে যে বৌদ্ধাদি শাস্ত্রের প্রামাণ্য নাই, এ বিষয়ে কোন সংশয় থাকে না। পরন্তু তিনি পূর্ব্বে তাঁহার নিজমত সমর্থন করিতে "তথা চৈতে বৌদ্ধাদয়োঽপি দুরাত্মানঃ" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা বৌদ্ধাদি সম্প্রদায়কে কিরূপ তিরস্কার করিয়াছেন, তাহার প্রতিও মনোযোগ করা আবশ্যক ("ন্যায়মঞ্জরী", ২৬৬—৭০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। পরন্তু জয়ন্ত ভট্ট "ন্যায়মঞ্জরী"র প্রারম্ভে (চতুর্থ পৃষ্ঠায়) বৌদ্ধদর্শন বেদবিরুদ্ধ, সুতরাং উহা বেদাদি চতুর্দ্দশ বিদ্যাস্থানের অন্তর্গত হইতেই পারে না, ইহাও অসংকোচে স্পষ্ট বলিয়াছেন। সুতরাং তিনি যে বৌদ্ধাদি শাস্ত্রেরও প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, ইহা কোনরূপেই বুঝা যায় না। পরন্তু বৌদ্ধাদি শাস্ত্রও বেদমূলক, এই পূর্ব্বোক্ত মত স্বীকার করিলে তুল্যভাবে পৃথিবীর সকল সম্প্রদায়ের সকল শাস্ত্রকেই বেদমূলক বলা যায়। অর্থাৎ অধিকারিবিশেষের জন্যই বেদ হইতেই ক্রমশঃ ভিন্ন ভিন্ন সমস্ত শাস্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে, বেদবাহ্য কোন ধর্ম্ম বা শাস্ত্র নাই, ইহাও বলিতে পারা যায়। জয়ন্ত ভট্টও এই আপত্তির উত্থাপন করিয়া, তদুত্তরে যাহা বলিয়াছেন, তাহা কোন সম্প্রদায়ই স্বীকার

করেন না। কারণ, পৃথিবীর কোন সম্প্রদায়ই নিজের ধর্ম্মশাস্ত্রকে ঐ শাস্ত্রকর্ত্তার লোভ-মোহ-মূলক বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। অন্য কেহ তাহা বলিলে অপরেও তদ্রূপ, অন্য শাস্ত্রকে কর্ত্তার লোভ-মোহ-মূলক বলিতে পারেন। সুতরাং এ বিবাদের মীমাংসা কিরূপে হইবে ? জয়ন্ত ভট্টই বা পূর্ব্বোক্ত মতের সমর্থন করিতে যাইয়া পূর্ব্বোক্ত আপত্তি খণ্ডন করিতে উহার সর্ব্বসম্মত উত্তর আর কি বলিবেন ? ইহাও প্রণিধানপূর্ব্বক চিন্তা করা আবশ্যক। বস্তুতঃ বৈদিক-ধর্ম্মরক্ষক পরম আস্তিক জয়ন্ত ভট্টের মতেও বৌদ্ধাদি শাস্ত্র বেদবিরুদ্ধ বলিয়া প্রমাণ নহে। কারণ, বেদ-বিরুদ্ধ শাস্ত্রের প্রামাণ্য ঋষিগণ স্বীকার করেন নাই। বেদবাহ্য সমস্ত স্মৃতি ও দর্শন নিষ্ফল, অর্থাৎ উহার প্রামাণ্য নাই, ইহা ভগবান্ মনুও স্পষ্ট বলিয়াছেন[১]। সুতরাং মনুর সময়েও যে বেদবাহ্য শাস্ত্রের অস্তিত্ব ছিল, এবং উহা তখন আস্তিক সমাজে প্রমাণ বলিয়া পরিগৃহীত হয় নাই, ইহা অবশ্যই বুঝা যায়। সুতরাং জয়ন্ত ভট্টও মনুমত-বিরুদ্ধ কোন মতের গ্রহণ করিতে পারেন না।

এখন প্রকৃত কথা স্মরণ করিতে হইবে যে, এই "অপবর্গ-পরীক্ষাপ্রকরণে" মহর্ষি গোতম প্রথম পূর্ব্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, ঋণানুবন্ধপ্রযুক্ত অপবর্গার্থ অনুষ্ঠানের সময় না থাকায় অপবর্গ অসম্ভব। ভাষ্যকার ঐ প্রথম পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন করিতে মহর্ষির তাৎপর্য্যানুসারে বলিয়াছেন যে, গৃহস্থাশ্রমীর পক্ষেই শাস্ত্রে পূর্ব্বোক্ত ঋণত্রয় মোচনের ব্যবস্থা আছে। সুতরাং প্রকৃত বৈরাগ্য-বশতঃ শাস্ত্রানুসারে সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিলে তখন আর তাঁহার পূর্ব্বোক্ত "ঋণানুবন্ধ" না থাকায় অপবর্গার্থ অনুষ্ঠানের সময় ও অধিকার আছে ; অতএব অপবর্গ অসম্ভব নহে। কিন্তু সন্ন্যাসাশ্রম যদি বেদবিহিত না হয়, যদি একমাত্র গৃহস্থাশ্রম ভিন্ন আর কোন আশ্রমই নাই, ইহাই শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত হয়, তাহা হইলে ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্ত সমাধান কোনরূপে সম্ভব হয় না। তাই ভাষ্যকার পরে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত সমাধান সমর্থন করিতে নিজেই পূর্ব্বপক্ষ প্রকাশ করিয়া, সন্ন্যাসাশ্রম যে বেদ-বিহিত, ইহা নানা শ্রুতিবাক্যের দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন, এবং সর্ব্বশেষে ইতিহাস, পুরাণ ও ধর্ম্ম-শাস্ত্রেও চতুরাশ্রমেরই বিধান আছে বলিয়া তদ্দ্বারাও নিজ মত সমর্থন করিয়াছেন এবং উহা সমর্থন করিতে ইতিহাস, পুরাণ ও ধর্ম্মশাস্ত্রেরও যে প্রামাণ্য আছে, ইহা শাস্ত্র ও যুক্তির দ্বারা সমর্থন করিয়াছেন।

এখানে ইহাও স্মরণ করা আবশ্যক যে, ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত "প্রধানশব্দানুপপত্তেঃ" ইত্যাদি (৫৯ম) সূত্রের ভাষ্যে প্রথমে বিশেষ বিচারপূর্ব্বক গৃহস্থাশ্রমীর পক্ষেই "ঋণানুবন্ধ" সমর্থন করায় বুঝা যায় যে, তাঁহার মতে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে থাকিয়াও কোন অধিকারিবিশেষ মোক্ষার্থ শ্রবণ মননাদির অনুষ্ঠান করিতে পারেন। তখন তাঁহার পক্ষে যজ্ঞাদি কর্ম্মের কর্ত্তব্যতা না থাকায় মোক্ষার্থ অনুষ্ঠান অসম্ভব নহে। চিরকুমার নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর পক্ষে উহা সুসম্ভবই হয়। সুতরাং ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে

১। যা বেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়ো যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ।
সর্ব্বাস্তা নিষ্ফলাঃ প্রেত্য তমোনিষ্ঠা হি তাঃ স্মৃতাঃ ॥—মনুসংহিতা, ১২শ অ, ৯৫ ॥

থাকিয়াও অধিকারিবিশেষের তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া মোক্ষ লাভ হইতে পারে। প্রকৃত অধিকারী হইলে যে কোন আশ্রমে থাকিয়াও তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া মোক্ষ লাভ করা যায়। তত্ত্বজ্ঞান বা মোক্ষ-লাভে সন্ন্যাসাশ্রম নিয়ত কারণ নহে, ইহাও সুপ্রাচীন মত আছে। শারীরকভাষ্য ও ছান্দোগ্য উপনিষদের ভাষ্যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও উক্ত সুপ্রাচীন মতের বিশদ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি উক্ত মতের খণ্ডন করিয়া, সন্ন্যাসাশ্রম ব্যতীত যে, মুক্তি হইতে পারে না, এই মতের সমর্থন করিয়াছেন। তিনি ছান্দোগ্য উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ত্রয়োবিংশ খণ্ডের প্রারম্ভে "ব্রহ্ম-সংস্থোঽমৃতত্ত্বমেতি" এই শ্রুতিবাক্যে "ব্রহ্মসংস্থ" শব্দের অর্থ চতুর্থাশ্রমী সন্ন্যাসী এবং ঐ অর্থেই ঐ শব্দটি রূঢ়, ইহা বিশেষ বিচারপূর্ব্বক সমর্থন করিয়াছেন। তাহা হইলে সন্ন্যাসাশ্রমীই অমৃতত্ব (মোক্ষ) লাভ করেন, অন্যান্য আশ্রমিগণ পুণ্যলোক প্রাপ্ত হন, কিন্তু মোক্ষ লাভ করিতে পারেন না, এই সিদ্ধান্তই উক্ত ছান্দোগ্য শ্রুতিবাক্যের দ্বারা অবশ্য বুঝা যায়। কিন্তু পরবর্ত্তী অনেক আচার্য্য শঙ্করের ঐ মত স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদিগের কথা এই যে, যখন তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষের সাক্ষাৎ কারণরূপে শ্রুতির দ্বারা অবধারিত হইয়াছে, তখন মোক্ষলাভে সন্ন্যাসাশ্রম যে, নিয়ত কারণ, ইহা কখনই শ্রুতির সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। কারণ, অধিকারিবিশেষের পক্ষে সন্ন্যাসাশ্রম ব্যতীতও মোক্ষজনক তত্ত্বজ্ঞান জন্মিতে পারে। সন্ন্যাসাশ্রম ব্যতীত যে, কাহারই তত্ত্বজ্ঞান জন্মিতেই পারে না, ইহা স্বীকার করা যায় না। গৃহস্থাশ্রমী রাজর্ষি জনক প্রভৃতি ও মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়াছিল, ইহা উপনিষদের দ্বারাই প্রতিপন্ন হয়। নচেৎ তাঁহারা অপরকে তত্ত্বজ্ঞানের চরম উপদেশ করিতে পারেন না। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য যে, তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্যই শেষে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা স্বীকার করিবার কোন কারণ নাই। বস্তুতঃ গৃহস্থাশ্রমীও যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে মোক্ষ লাভ করিতে পারেন, ইহা সংহিতাকার মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য স্পষ্টই বলিয়াছেন[১]। "তত্ত্ব-চিন্তামণি"কার গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও "ঈশ্বরানুমানচিন্তামণি"র শেষে উক্ত মত সমর্থন করিতে যাজ্ঞবল্ক্যের ঐ বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। আরও অনেক আচার্য্য যাজ্ঞবল্ক্যের ঐ বচন উদ্ধৃত করিয়া গৃহস্থেরও মুক্তি সমর্থন করিয়াছেন। পরন্তু মনুসংহিতার শেষে তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি যে, যে কোন আশ্রমে বাস করিয়াও ইহলোকেই মুক্তি (জীবন্মুক্তি) লাভ করেন, ইহা স্পষ্ট কথিত হইয়াছে[২]। উক্ত বচনে "ব্রহ্মভূয়" শব্দের প্রয়োগ করিয়া চরম মুক্তিই কথিত হইয়াছে, ইহা বুঝা যায়। সুতরাং সন্ন্যাসাশ্রম ব্যতীত যে মুক্তি হইতে পারে না, এই মত সকলে স্বীকার করেন নাই।

সে যাহাই হউক, মূলকথা সন্ন্যাসাশ্রমও বেদবিহিত। জাবাল উপনিষদে উহার স্পষ্ট বিধিবাক্য আছে। নারদপরিব্রাজক উপনিষৎ, সন্ন্যাসোপনিষৎ ও কঠরুদ্রোপনিষৎ প্রভৃতি উপনিষদে সন্ন্যাসীর প্রকারভেদ ও কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য প্রভৃতি সমস্তই কথিত হইয়াছে। মন্বাদিসংহিতাতেও উহা

১। ন্যায়াগতধনস্তত্ত্বজ্ঞাননিষ্ঠোঽতিথিপ্রিয়ঃ।
শ্রাদ্ধকৃৎ সত্যবাদী চ গৃহস্থোঽপি বিমুচ্যতে॥—যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, অধ্যাত্মপ্রকরণ, ১০৫ শ্লোক।

২। বেদশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞো যত্র কুত্রাশ্রমে বসন্।
ইহৈব লোকে তিষ্ঠন্ স ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥—মনুসংহিতা, ১২শঅঃ, ১০২ শ্লোক॥

কথিত হইয়াছে। যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতার টীকাকার অপরার্ক উক্ত বিষয়ে বিশেষ বিচার করিয়াছেন। বেদান্তদর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ পাদের বিংশ সূত্রের ভাষ্যভামতীর টীকা "বেদান্তকল্পতরু" ও উহার "কল্পতরুপরিমল" টীকায় নানা প্রমাণের উল্লেখপূর্ব্বক ঐ সমস্ত বিষয়ের সবিস্তর বর্ণন ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিচার আছে। কমলাকর ভট্টকৃত "নির্ণয়সিন্ধু" গ্রন্থের শেষভাগে সন্ন্যাসীর প্রকার-ভেদ ও সন্ন্যাসগ্রহণের বিধি-পদ্ধতি প্রভৃতি কথিত হইয়াছে। কাশীধাম হইতে মুদ্রিত "যতিধর্ম্মনির্ণয়" নামক সংগ্রহগ্রন্থে সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসাশ্রম সম্বন্ধে সমস্ত বক্তব্য নানা শাস্ত্র-প্রমাণের সহিত লিখিত হইয়াছে। বিশেষ জিজ্ঞাসু ঐ সমস্ত গ্রন্থ পাঠ করিলে উক্ত বিষয়ে সকল কথা জানিতে পারিবেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য যে দশনামী সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নাম ও লক্ষণাদি "বৃহৎশঙ্করবিজয়" ও "মঠাম্নায়" প্রভৃতি পুস্তকে লিখিত আছে[১]। "মঠাম্নায়" পুস্তকে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের সংস্থাপিত জ্যোতির্ম্মঠ (জোশীমঠ), শারদামঠ, শৃঙ্গেরী মঠ ও গোবর্দ্ধন মঠের পরিচয়াদি এবং শঙ্করাচার্য্যের "মহানুশাসন"ও আছে। শঙ্করাচার্য্যের সময় হইতে তাঁহার প্রবর্ত্তিত দশনামী সন্ন্যাসিগণই ভারতে সন্ন্যাসীর প্রথম স্থান অধিকার করিয়া, অদ্বৈত বেদান্ত-সিদ্ধান্তের প্রচার ও রক্ষা করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহারাই অপর অধিকারী শিষ্যকে সন্ন্যাসদীক্ষা দিয়া গিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেবও কেশব ভারতীর নিকটে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঈশ্বর পুরী ও কেশবভারতী মাধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণব সন্ন্যাসী, ইহা কোন কোন পুস্তকে লিখিত হইলেও পুরী ও ভারতী, এই নামদ্বয় যে, শঙ্করাচার্য্যের উপদিষ্ট দশ নামেরই অন্তর্গত, ইহাও চিন্তা করা আবশ্যক। এবং শ্রীচৈতন্যদেব যে রামানন্দ রায়ের নিকটে "আমি হই মায়াবাদী সন্ন্যাসী" এই কথা কেন বলিয়াছিলেন, ইহাও চিন্তা করা আবশ্যক। আমরা বুঝিয়াছি যে, দশনামী সন্ন্যাসী-দিগের মধ্যেই পরে অনেকে নিজের অনধিকার বুঝিতে পারিয়া ভক্তিমার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। এ বিষয়ে বহু বক্তব্য আছে। বাহুল্যভয়ে এখানে ঐ সমস্ত বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করিতে পারিলাম না ॥ ৬১ ॥

ভাষ্য। যৎ পুনরেতৎ ক্লেশানুবন্ধস্যাবিচ্ছেদাদিতি—

অনুবাদ। আর এই যে, "ক্লেশানুবন্ধে"র অবিচ্ছেদবশতঃ (অপবর্গের অভাব), ইহা বলা হইয়াছে, (তদুত্তরে মহর্ষি বলিয়াছেন),—

সূত্র। সুষুপ্তস্য স্বপ্নাদর্শনে ক্লেশাভাবাদপবর্গঃ ॥৬২॥ ॥৪০৫॥

অনুবাদ। (উত্তর) সুষুপ্ত ব্যক্তির স্বপ্নদর্শন না হওয়ায় ক্লেশের অভাব-প্রযুক্ত অর্থাৎ ঐ দৃষ্টান্তপ্রযুক্ত অপবর্গ (সিদ্ধ হয়)।

১। তীর্থাশ্রম-বনারণ্য-গিরি-পর্ব্বত-সাগরাঃ।
সরস্বতী ভারতীচ পুরীতি দশ কীর্ত্তিতাঃ ॥—"বৃহৎশঙ্করবিজয়" ও "মঠাম্নায়" প্রভৃতি।

ভাষ্য। যথা সুষুপ্তস্য খলু স্বপ্নাদর্শনে রাগানুবন্ধঃ সুখদুঃখানুবন্ধশ্চ বিচ্ছিদ্যতে তথাঽপবর্গেঽপীতি। এতচ্চ ব্রহ্মবিদো মুক্তস্যাত্মনো রূপমুদাহরন্তীতি।

অনুবাদ। যেমন সুষুপ্ত ব্যক্তির স্বপ্নদর্শন না হওয়ায় (তৎকালে) রাগানুবন্ধ ও সুখদুঃখের অনুবন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়, তদ্রূপ মুক্তি হইলেও বিচ্ছিন্ন হয়। ব্রহ্মবিদ্‌গণ ইহাই মুক্ত আত্মার স্বরূপ উদাহরণ করেন অর্থাৎ সুষুপ্তি অবস্থাকেই মোক্ষাবস্থার দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করেন।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ব্বোক্ত তিন সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষবাদীর "ঋণানুবন্ধপ্রযুক্ত অপবর্গের অভাব" এই প্রথম কথার খণ্ডন করিয়া, ক্রমানুসারে "ক্লেশানুবন্ধপ্রযুক্ত অপবর্গের অভাব", এই দ্বিতীয় কথার খণ্ডন করিতে এই সূত্রটি বলিয়াছেন। উত্তরবাদী মহর্ষির তাৎপর্য্য এই যে, রাগ, দ্বেষ ও মোহরূপ ক্লেশের যে কখনই উচ্ছেদ হয় না, এইরূপ নিয়ম স্বীকার করা যায় না। কারণ, সুষুপ্তিকালে স্বপ্নদর্শন না হওয়ায় তখন যে, রাগ-দ্বেষাদি ও সুখদুঃখাদি কিছুই থাকে না, তখন রাগাদির বিচ্ছেদ বা উচ্ছেদ হয়, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। জাগ্রদবস্থার ন্যায় স্বপ্নাবস্থাতেও রাগাদি ক্লেশ ও সুখদুঃখের উৎপত্তি হয়, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। কিন্তু নিদ্রিত হইলে যে অবস্থায় স্বপ্নদর্শনও হয় না, সেই 'সুষুপ্তি' নামক অবস্থাবিশেষে কোনরূপ জ্ঞান বা রাগাদির উৎপত্তি হয় না। কারণ, তাহা হইলে সেই অবস্থাতেও স্বপ্নদর্শনাদি হইত। সুতরাং সুষুপ্ত ব্যক্তির স্বপ্নদর্শনও না হওয়ায় তখন তাহার যে, জ্ঞান ও রাগ-দ্বেষাদি কিছুই জন্মে না, ইহা স্বীকার্য্য। তাহা হইলে ঐ দৃষ্টান্তে মুক্তিকালেও সেই মুক্ত পুরুষের রাগাদি ক্লেশানুবন্ধের বিচ্ছেদ বা উচ্ছেদ হয়, অর্থাৎ তখন তাঁহার রাগাদি কিছুই থাকে না ও জন্মে না, ইহা অবশ্য বলিতে পারি। মহর্ষি এই সূত্রে সুষুপ্ত ব্যক্তিকে মুক্ত পুরুষের দৃষ্টান্তরূপে প্রকাশ করিয়াই পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন করিয়াছেন। তাই ভাষ্যকারও শেষে বলিয়াছেন যে, ব্রহ্মবিদ্‌গণ সুষুপ্ত ব্যক্তির পূর্ব্বোক্ত স্বরূপকেই মুক্ত আত্মার স্বরূপের দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করেন। অর্থাৎ মুক্ত আত্মার স্বরূপ কি? মুক্তি হইলে তখন মুক্ত ব্যক্তির কিরূপ অবস্থা হয়? এইরূপ প্রশ্ন করিলে লৌকিক ব্যক্তিদিগকে উহা আর কোনরূপেই বুঝাইয়া দেওয়া যায় না। তাই ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিগণ লোকসিদ্ধ সুষুপ্তি অবস্থাকে দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, সুষুপ্তি অবস্থায় যেমন রাগাদি কোন ক্লেশ থাকে না, তদ্রূপ মুক্তি হইলেও তখন মুক্ত পুরুষের রাগাদি ক্লেশ থাকে না। কিন্তু দৃষ্টান্ত কখনই সর্ব্বাংশে সমান হয় না, সুষুপ্তি অবস্থা হইতে মুক্তাবস্থার যে বিশেষ আছে, তাহাও বুঝা আবশ্যক। তাৎপর্য্যটীকাকার উহা বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, মুক্তাবস্থায় পূর্ব্বোৎপন্ন রাগাদি ক্লেশের সংস্কারও থাকে না। কিন্তু সুষুপ্তি অবস্থা ও প্রলয়াবস্থাতে রাগাদি ক্লেশের বিচ্ছেদ হইলেও উহার সংস্কার থাকে। তাই ভবিষ্যতে পুনর্ব্বার ঐ ক্লেশের উদ্ভব হয়; কিন্তু মুক্তি হইলে আর কখনও রাগাদি ক্লেশের উদ্ভব হয় না, ইহাই বিশেষ। কিন্তু সুষুপ্তি অবস্থায় রাগাদি ক্লেশের যে উচ্ছেদ হয়, এই অংশেই মুক্তাবস্থার সহিত উহার সাদৃশ্য

থাকায় উহা মুক্তাবস্থার দৃষ্টান্তরূপে গৃহীত হইয়াছে। অবশ্য প্রলয়াবস্থাতেও রাগাদি ক্লেশের উচ্ছেদ হয়, কিন্তু উহা লোকসিদ্ধ নহে, লৌকিক ব্যক্তিগণ উহা অবগত নহে। কিন্তু সুষুপ্তি অবস্থা লোকসিদ্ধ, তাই উহাই দৃষ্টান্তরূপে কথিত হইয়াছে। বস্তুতঃ বেদাদিশাস্ত্রে অন্যত্রও সুষুপ্তি অবস্থা মোক্ষাবস্থার দৃষ্টান্তরূপে কথিত হইয়াছে। "সমাধি-সুষুপ্তি-মোক্ষেষু ব্রহ্মরূপতা"—(৫।১১৬) এই সাংখ্যসূত্রেও সমাধি অবস্থা ও সুষুপ্তি অবস্থার সহিত মোক্ষাবস্থার সাদৃশ্য কথিত হইয়াছে। দৃষ্টান্ত ব্যতীত প্রথমে মোক্ষাবস্থার স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম হয় না। তাই উপনিষদেও সুষুপ্তির বর্ণন হইয়াছে। সুষুপ্তিকালে যে স্বপ্নদর্শনও হয় না, ইহা ছান্দোগ্য উপনিষদের অষ্টম অধ্যায়ের ষষ্ঠ খণ্ডে "তদ্‌যত্রৈতৎ সুপ্তঃ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে স্পষ্ট বর্ণিত হইয়াছে এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম ব্রাহ্মণের শেষ ভাগে স্বপ্ন ও সুষুপ্তির স্বরূপ ও ভেদ বর্ণিত হইয়াছে। সেখানে উনবিংশ শ্রুতিবাক্যের শেষে "অতিঘ্নীমানন্দস্য গত্বা শয়ীত" এই বাক্যের দ্বারা বৈদান্তিক সম্প্রদায় সুষুপ্তিকালে দুঃখশূন্য আনন্দাবস্থারই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু আনন্দের অতিঘ্নী অবস্থা বলিতে সর্ব্বপ্রকার আনন্দনাশিনী অর্থাৎ সুখদুঃখশূন্য অবস্থাও বুঝা যায়। তদনুসারে নৈয়ায়িকসম্প্রদায় সুষুপ্তিকালে আত্মার ঐরূপ অবস্থাই সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে সুষুপ্তিকালে কোনরূপ জ্ঞান ও সুখ-দুঃখাদি জন্মে না। সুতরাং ন্যায়দর্শনের ব্যাখ্যাকার বাৎস্যায়ন প্রভৃতি সকলেই (মহর্ষি গোতমের এই সূত্রে সুষুপ্তি অবস্থা মোক্ষাবস্থার দৃষ্টান্তরূপে কথিত হওয়ায়) সুষুপ্তির ন্যায় মোক্ষেও আত্মার কোন জ্ঞান ও সুখ-দুঃখাদি জন্মে না, এই সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়াছেন। সুষুপ্ত ব্যক্তির ন্যায় মুক্ত ব্যক্তির যে সুখদুঃখানুবন্ধেরও উচ্ছেদ হয়, ইহা এই সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকারও স্পষ্ট বলিয়াছেন এবং প্রথম অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের দ্বাবিংশ সূত্রের ভাষ্যে বিশেষ বিচার করিয়া, মোক্ষাবস্থায় নিত্যসুখের অনুভূতি হয়, এই মতের খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু ন্যায়দর্শনকার গোতমের মতে যে, মোক্ষাবস্থায় আনন্দানুভূতিও হয়, এইরূপ মতও পাওয়া যায়। এই প্রকরণের ব্যাখ্যার শেষে উক্ত মতের আলোচনা করিব ॥৬২॥

ভাষ্য। যদপি 'প্রবৃত্ত্যনুবন্ধা'দিতি—

অনুবাদ। আর যে প্রবৃত্তির অনুবন্ধবশতঃ (অপবর্গের অভাব), ইহা বলা হইয়াছে, (তদুত্তরে মহর্ষি বলিয়াছেন),—

সূত্র। ন প্রবৃত্তিঃ প্রতিসন্ধানায় হীনক্লেশস্য ॥৬৩॥ ॥৪০৬॥

অনুবাদ। (উত্তর) 'হীনক্লেশ' অর্থাৎ রাগ, দ্বেষ ও মোহশূন্য ব্যক্তির প্রবৃত্তি (কর্ম্ম) প্রতিসন্ধানের নিমিত্ত অর্থাৎ পুনর্জ্জন্মের নিমিত্ত হয় না।

ভাষ্য। প্রক্ষীণেষু রাগদ্বেষমোহেষু প্রবৃত্তির্ন প্রতিসন্ধানায়।

প্রতিসন্ধিস্তু পূর্ব্বজন্মনিবৃত্তৌ পুনর্জ্জন্ম, তচ্চ তৃষ্ণাকারিতং, তস্যাং প্রহীণায়াং পূর্ব্বজন্মাভাবে জন্মান্তরাভাবোঽপ্রতিসন্ধানমপবর্গঃ। কর্ম্মবৈফল্য-প্রসঙ্গ ইতি চেন্ন, কর্ম্ম-বিপাকপ্রতিসংবেদনস্যাপ্রত্যাখ্যানাৎ পূর্ব্বজন্ম-নিবৃত্তৌ পুনর্জ্জন্ম ন ভবতীত্যুচ্যতে, নতু কর্ম্মবিপাকপ্রতিসংবেদনং প্রত্যাখ্যায়তে, সর্ব্বাণি পূর্ব্বকর্ম্মাণি হ্যন্তে জন্মনি বিপচ্যন্ত ইতি।

অনুবাদ। রাগ, দ্বেষ ও মোহ (ক্লেশ) বিনষ্ট হইলে "প্রবৃত্তি" (কর্ম্ম) "প্রতিসন্ধানে"র নিমিত্ত অর্থাৎ পুনর্জ্জন্মের নিমিত্ত হয় না। (তাৎপর্য্য) "প্রতিসন্ধি" অর্থাৎ সূত্রোক্ত প্রতিসন্ধান কিন্তু পূর্ব্বজন্মের নিবৃত্তি হইলে পুনর্জ্জন্ম, তাহা তৃষ্ণা-জনিত, সেই তৃষ্ণা বিনষ্ট হইলে পূর্ব্বজন্মের অভাবে জন্মান্তরের অভাবরূপ অপ্রতি-সন্ধান (অর্থাৎ) অপবর্গ হয়।

(পূর্ব্বপক্ষ) কর্ম্মের বৈফল্য-প্রসঙ্গ হয়, ইহা যদি বল? (উত্তর) না অর্থাৎ তাহা বলিতে পার না, যেহেতু কর্ম্মবিপাকপ্রতিসংবেদনের অর্থাৎ কর্ম্মফল-ভোগের প্রত্যাখ্যান (নিষেধ) হয় নাই। বিশদার্থ এই যে, পূর্ব্বজন্মের নিবৃত্তি হইলে পুনর্জ্জন্ম হয় না, ইহাই উক্ত হইয়াছে, কিন্তু কর্ম্মফলের ভোগ প্রত্যাখ্যাত হয় নাই, যে হেতু সমস্ত পূর্ব্বকর্ম্ম শেষ জন্মে বিপক (সফল) হয়, অর্থাৎ যে জন্মে মুক্তি হয়, যে জন্মের পরে আর জন্ম হয় না, সেই চরম জন্মেই সমস্ত পূর্ব্বকর্ম্মের ফলভোগ হওয়ায় কর্ম্মের বৈফল্যের আপত্তি হইতে পারে না।

টিপ্পনী। পূর্ব্বপক্ষবাদীর তৃতীয় কথা এই যে, "প্রবৃত্ত্যনুবন্ধ"বশতঃ কাহারই মুক্তি হইতে পারে না। প্রবৃত্তি বলিতে এখানে শুভ ও অশুভ কর্ম্মরূপ প্রবৃত্তিই বিবক্ষিত। তাৎপর্য্য এই যে, জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সকল মানবই যথাসম্ভব বাক্য, মন ও শরীরের দ্বারা শুভ ও অশুভ কর্ম্ম করিয়া ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম সঞ্চয় করিতেছে, সুতরাং উহার ফল ভোগের জন্য সকলেরই পুনর্জ্জন্ম অবশ্যম্ভাবী; অতএব মুক্তি কাহারই হইতে পারে না, মুক্তির আশাই নাই। উক্ত পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন করিতে মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, রাগদ্বেষাদিশূন্য ব্যক্তির প্রবৃত্তি অর্থাৎ শুভাশুভ কর্ম্ম, তাঁহার পুনর্জ্জন্ম সম্পাদন করে না। মহর্ষির তাৎপর্য্য এই যে, তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত কাহারই মুক্তি হয় না, সুতরাং যাঁহার মুক্তি হইবে, তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান অবশ্য জন্মিবে। তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে তখন মিথ্যাজ্ঞান বা মোহ বিনষ্ট হইবে, সুতরাং তখন তাঁহার আর রাগ ও দ্বেষও জন্মিবে না। রাগ, দ্বেষ ও মোহরূপ ক্লেশ না থাকিলে তখন সেই তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তির শুভাশুভ কর্ম্ম তাঁহার পুনর্জ্জন্মের কারণ হয় না। ভাষ্যকার মহর্ষির তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বজন্মের নিবৃত্তি হইলে যে পুনর্জ্জন্ম, তাহা তৃষ্ণাজনিত অর্থাৎ রাগ বা বিষয়তৃষ্ণা উহার নিমিত্ত।

সুতরাং যাঁহার ঐ তৃষ্ণার নিবৃত্তি হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে ঐ নিমিত্তের অভাবে আর উহার কার্য্য যে পুনর্জ্জন্ম, তাহা কখনই হইতে পারে না; সুতরাং তাঁহার পূর্ব্বজন্ম অর্থাৎ বর্ত্তমান সেই জন্মের পরে আর যে জন্মান্তর না হওয়া, তাহাকে অপ্রতিসন্ধান বলা হয় এবং উহাকেই অপবর্গ বলে। বস্তুতঃ তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে মিথ্যাজ্ঞানের উচ্ছেদ হওয়ায় বিষয়তৃষ্ণারূপ রাগের উৎপত্তি হইতেই পারে না, সুতরাং পুনর্জ্জন্ম হয় না। যে মিথ্যাজ্ঞান বা অবিদ্যা সংসারের নিদান, উহার উচ্ছেদ হইলে মূলোচ্ছেদ হওয়ায় আর সংসার বা জন্মপরিগ্রহ কোনরূপেই সম্ভব নহে। অবিদ্যাদি ক্লেশ বিদ্যমান থাকা পর্য্যন্তই যে কর্ম্মের ফল "জাতি", "আয়ু" ও "ভোগ"-লাভ হয়, ইহা মহর্ষি পতঞ্জলিও বলিয়াছেন। যোগদর্শনভাষ্যকার ব্যাসদেব উহার বিশদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন[১]। ভাষ্যকার প্রভৃতি প্রাচীনগণ অনেক স্থানে প্রত্যভিজ্ঞা ও স্মরণাত্মক জ্ঞান অর্থেও "প্রতিসন্ধান" ও "প্রতিসন্ধি" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। কিন্তু এখানে সূত্রোক্ত "প্রতিসন্ধান" শব্দের ঐরূপ অর্থ সংগত হয় না। তাই ভাষ্যকার এখানে বলিয়াছেন যে, "প্রতিসন্ধি" কিন্তু পূর্ব্বজন্মের নিবৃত্তি হইলে পুনর্জ্জন্ম। অর্থাৎ সূত্রে "প্রতিসন্ধান" শব্দের অর্থ কিন্তু এখানে পুনর্জ্জন্ম; উহাকে "প্রতিসন্ধি"ও বলা হয়। ভাষ্যকার ইহা প্রকাশ করিতেই সূত্রোক্ত "প্রতিসন্ধান" শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া এখানে সমানার্থক "প্রতিসন্ধি" শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন। ভাষ্যকার তৃতীয় অধ্যায়েও এক স্থলে পুনর্জ্জন্ম অর্থেই যে, "প্রতিসন্ধি" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহা এখানে তাঁহার "প্রতিসন্ধি" শব্দের পূর্ব্বোক্তরূপ অর্থ ব্যাখ্যার দ্বারা বুঝা যায় (তৃতীয় খণ্ড, ৭২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। পূর্ব্বজন্মের অর্থাৎ বর্ত্তমান জন্মের নিবৃত্তি হইলে পুনর্ব্বার অভিনব শরীরের সহিত আত্মার যে বিলক্ষণ সংযোগ, তাহাকে পুনঃ সংযোগ বলিয়া "প্রতিসন্ধান" বলা যায়। ফলতঃ উহাই পুনর্জ্জন্ম, সুতরাং ঐ "প্রতিসন্ধান" না হইলে উহার অভাব অর্থাৎ অপ্রতিসন্ধানকে অপবর্গ বলা যায়। কারণ, পুনর্জ্জন্ম না হইলেই অপবর্গ সিদ্ধ হয়।

পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতে পারেন যে, যদি তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তির রাগাদির উচ্ছেদ হওয়ায় আর জন্ম পরিগ্রহ করিতে না হয়, তাহা হইলে তাঁহার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের বৈফল্যের আপত্তি হয়। কারণ, তিনি যে সকল কর্ম্মের ফলভোগ করেন নাই, তাহার ফলভোগের আর সম্ভাবনা না থাকায় উহা ব্যর্থই হইবে। তবে কি তাঁহার পক্ষে ঐ সমস্ত কর্ম্মের ফলভোগ হইবেই না, ইহাই বলিবে? ভাষ্যকার শেষে এই কথার উল্লেখ করিয়া, তদুত্তরে বলিয়াছেন যে, না। কর্ম্মের যে "বিপাক" অর্থাৎ ফল, তাহার "প্রতিসংবেদন" অর্থাৎ ভোগের প্রত্যাখ্যান বা নিষেধ করা হয় নাই। তত্ত্বজ্ঞানীর পূর্ব্বজন্মের নিবৃত্তি হইলে পুনর্জ্জন্ম হয় না, ইহাই কথিত হইয়াছে। তাহা হইলে কোন্ সময়ে তাঁহার ঐ কর্ম্মফল ভোগ হইবে? পুনর্জ্জন্ম না হইলে উহা কিরূপে সম্ভব হয়? এ জন্য ভষ্যকার শেষে সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, চরম জন্মেই ঐ সমস্ত পূর্ব্বকর্ম্মের বিপাক অর্থাৎ ফলভোগ হয়।

১। "ক্লেশমূলঃ কর্ম্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ"। "সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগঃ।" (যোগদর্শন, সাধনপাদ, ১২শ ও ১৩শ সূত্র) এই সূত্রদ্বয়ের ব্যাসভাষ্য বিশেষ দ্রষ্টব্য।

তাৎপর্য্য এই যে, তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি তাঁহার সেই চরম জন্মেই তাঁহার পূর্ব্বকৃত সমস্ত প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলভোগ করিয়া নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করেন, এবং সেই কর্ম্মফলভোগের জন্যই তিনি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াও জীবিত থাকেন, এবং তিনি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াও নানা দুঃখ ভোগ করেন। অনেকে শীঘ্র নির্ব্বাণ লাভের ইচ্ছায় যোগবলে কায়ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার অবশ্য-ভোগ্য সমস্ত কর্ম্মফল ভোগ করেন; তৃতীয় অধ্যায়ে অন্য প্রসঙ্গে ভাষ্যকারও ইহা বলিয়াছেন (তৃতীয় খণ্ড, ২৩১-৩২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ফলকথা, যে জন্মে তত্ত্বজ্ঞান ও মুক্তি লাভ হয়, সেই জন্মেই সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয় হওয়ায় আর পুনর্জ্জন্ম হইতে পারে না। কর্ম্মের বৈফল্যও হয় না। ভাষ্যকার এখানে তত্ত্বজ্ঞানীর অভুক্ত সমস্ত প্রারব্ধ কর্ম্মকেই গ্রহণ করিয়া চরম জন্মে উহার ফলভোগ হয়, ইহা বলিয়াছেন। কারণ, সঞ্চিত পূর্ব্বকর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারাই বিনাশ হওয়ায় তত্ত্বজ্ঞানের পরে তাহার ফলভোগের সম্ভাবনা নাই এবং তত্ত্বজ্ঞাননাশ্য সেই সমস্ত কর্ম্মের বৈফল্য স্বীকৃত সিদ্ধান্তই হওয়ায় উহার বৈফল্যের আপত্তি অনিষ্টাপত্তি হইতে পারে না। কিন্তু "নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি" ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যের দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলেও যে কর্ম্মের ফলভোগ ব্যতীত ক্ষয় নাই, ইহা কথিত হইয়াছে, উহা প্রারব্ধ কর্ম্ম নামে উক্ত হইয়াছে। উহা তত্ত্বজ্ঞাননাশ্য নহে, তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি চরম জন্মেই তাঁহার অভুক্ত অবশিষ্ট ঐ সমস্ত কর্ম্মের ফলভোগ করেন। তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা তাঁহার সঞ্চিত সমস্ত কর্ম্মের বিনাশ হওয়ায় উহার ফলভোগ করিতে হয় না, সুতরাং প্রারব্ধ ভোগান্তে তাঁহার অপবর্গ অবশ্যম্ভাবী ॥৬৩॥

সূত্র। ন ক্লেশসন্ততেঃ স্বাভাবিকত্বাৎ॥৬৪॥৪০৭॥

অনুবাদ। (পূর্ব্বপক্ষ) না, অর্থাৎ রাগাদি ক্লেশের অত্যন্ত উচ্ছেদ হইতে পারে না; কারণ, ক্লেশের সন্ততি (প্রবাহ) স্বাভাবিক, অর্থাৎ উহা জীবের স্বভাব-প্রবৃত্ত অনাদি।

ভাষ্য। নোপপদ্যতে ক্লেশানুবন্ধবিচ্ছেদঃ, কস্মাৎ? ক্লেশসন্ততেঃ স্বাভাবিকত্বাৎ, অনাদিরিয়ং ক্লেশসন্ততিঃ ন চানাদিঃ শক্য উচ্ছেত্তুমিতি।

অনুবাদ। ক্লেশানুবন্ধের বিচ্ছেদ উপপন্ন হয় না। কেন? (উত্তর) যে হেতু, ক্লেশের প্রবাহ স্বাভাবিক, (তাৎপর্য্য) এই ক্লেশপ্রবাহ অনাদি, কিন্তু অনাদি পদার্থকে উচ্ছেদ করিতে পারা যায় না।

টিপ্পনী। পূর্ব্বোক্ত কতিপয় সূত্রের দ্বারা মহর্ষি তাঁহার পূর্ব্বোক্ত সমস্ত পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন করিয়া, এখন আবার তাঁহার পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তে এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ বলিয়াছেন যে, ক্লেশের অত্যন্ত উচ্ছেদ হইতেই পারে না। কারণ, ক্লেশের প্রবাহ স্বাভাবিক। অর্থাৎ পূর্ব্বপক্ষবাদীর কথা এই যে, সুষুপ্তি অবস্থাকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া মোক্ষাবস্থায় যে ক্লেশের উচ্ছেদ সমর্থন করা হইয়াছে, তাহা কোনমতেই সম্ভব নহে। কারণ, জীবের রাগ, দ্বেষ ও মোহরূপ যে ক্লেশ,

উহার সাময়িক উচ্ছেদ হইলেও অত্যন্ত উচ্ছেদ অর্থাৎ চিরকালের জন্য একেবারে উচ্ছেদ অসম্ভব। কারণ, ঐ ক্লেশের প্রবাহ স্বাভাবিক। রাগের পরে রাগ, দ্বেষের পরে দ্বেষ, এবং মোহের পরে মোহ এবং মোহের পরে রাগ, রাগের পরে মোহ ইত্যাদি প্রকারে জায়মান যে রাগাদি ক্লেশের প্রবাহ, উহা সর্ব্বজীবেরই স্বভাবপ্রবৃত্ত অনাদি। অনাদি পদার্থকে বিনষ্ট করা যায় না। অনাদি কাল হইতে স্বভাবতঃই পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যে রাগাদি ক্লেশের প্রবাহ সর্ব্বজীবেরই উৎপন্ন হইতেছে, তাহার যে কোনকালে একেবারে উচ্ছেদ হইবে, ইহা বিশ্বাস করা যায় না। পরন্তু যাহা যে বস্তুর স্বাভাবিক ধর্ম্ম, তাহার অত্যন্ত উচ্ছেদ হইলে সেই বস্তুরও অত্যন্ত উচ্ছেদ স্বীকার করিতে হয়। জলের শীতলত্ব, অগ্নির উষ্ণত্ব প্রভৃতি স্বাভাবিক ধর্ম্মের অত্যন্ত উচ্ছেদ হইলে জল ও অগ্নিরও সত্তা থাকিতে পারে না। কিন্তু মুক্তি হইলেও আত্মার অত্যন্ত উচ্ছেদ হইবে না। সুতরাং তখন তাহার স্বাভাবিক ধর্ম্ম রাগাদি ক্লেশের অত্যন্ত উচ্ছেদ কিরূপে বলা যায়? ইহাও পূর্ব্বপক্ষবাদীর তাৎপর্য্য বুঝা যাইতে পারে। ভাষ্যকার সূত্রোক্ত "স্বাভাবিক" শব্দের দ্বারা অনাদি, এইরূপ তাৎপর্য্যার্থই গ্রহণ করিয়াছেন বুঝা যায়॥৬৪॥

ভাষ্য। অত্র কশ্চিৎ পরীহারমাহ—

অনুবাদ। এই পূর্ব্বপক্ষে কেহ পরীহার (সমাধান) বলিয়াছেন,—

সূত্র। প্রাগুৎপত্তেরভাবানিত্যত্ববৎ স্বাভাবিকেঽপ্যনিত্যত্বং ॥৬৫॥৪০৮॥

অনুবাদ। (উত্তর) উৎপত্তির পূর্ব্বে অভাবের ("প্রাগভাব" নামক অভাব পদার্থের) অনিত্যত্বের ন্যায় স্বাভাবিক পদার্থেও অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত রাগাদি ক্লেশ-প্রবাহেরও অনিত্যত্ব হয়।

ভাষ্য। যথাঽনাদিঃ প্রাগুৎপত্তেরভাব উৎপন্নেন ভাবেন নিবর্ত্ত্যতে এবং স্বাভাবিকী ক্লেশসন্ততিরনিত্যেতি।

অনুবাদ। যেমন উৎপত্তির পূর্ব্ববর্ত্তী অনাদি অভাব অর্থাৎ "প্রাগভাব", উৎপন্ন ভাব পদার্থ (ঘটাদি) কর্ত্তৃক বিনাশিত হয়, অর্থাৎ উহা অনাদি হইয়াও অনিত্য, এইরূপ স্বাভাবিক (অনাদি) হইয়াও ক্লেশপ্রবাহ অনিত্য।

টিপ্পনী। মহর্ষি এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বসূত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষের যে সমাধান বলিয়াছেন, ইহা অপরের সমাধান বলিয়াই ভাষ্যকার প্রথমে বলিয়াছেন। মহর্ষির নিজের সমাধান শেষ সূত্রে তিনি বলিয়াছেন, পরে ইহা ব্যক্ত হইবে। এখানে উত্তরবাদীর তাৎপর্য্য এই যে, অনাদি পদার্থ হইলেই যে, তাহার কখনও বিনাশ হয় না, এইরূপ নিয়ম নাই। কারণ, প্রাগভাব পদার্থ অনাদি হইলেও তাহার বিনাশ হইয়া থাকে। ঘটাদি ভাব পদার্থের উৎপত্তির পূর্ব্বে তাহার যে অভাব থাকে, উহার নাম

প্রাগভাব, উহা অনাদি। কারণ, ঐ অভাবের উৎপত্তি না থাকায় উহা কখনই সাদি পদার্থ হইতে পারে না। কিন্তু ঐ প্রাগভাব উহার প্রতিযোগী ঘটাদি পদার্থ উৎপন্ন হইলেই বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন আর উহা থাকে না। এইরূপ রাগাদি ক্লেশসন্ততি অনাদি হইলেও তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলেই তখন উহার বিনাশ হয়, তখন কারণের অভাবে আর ঐ ক্লেশসন্ততির উৎপত্তিও হইতে পারে না। সুতরাং অনাদি প্রাগভাবের অনিত্যত্বের ন্যায় অনাদি ক্লেশসন্ততিরও অনিত্যত্ব সিদ্ধ হওয়ায় পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ অযুক্ত॥৬৫॥

ভাষ্য। অপর আহ—

অনুবাদ। অপর কেহ বলেন—

সূত্র। অণুশ্যামতাঽনিত্যত্ববদ্বা ॥৬৬॥৪০৭॥

অনুবাদ। (উত্তর) অথবা পরমাণুর শ্যাম রূপের অনিত্যত্বের ন্যায় (ক্লেশসন্ততি অনিত্য)।

ভাষ্য। যথাঽনাদিরণুশ্যামতা, অথচাগ্নিসংযোগাদনিত্যা, তথা ক্লেশসন্ততিরপীতি।

সতঃ খলু ধর্ম্মো নিত্যত্বমনিত্যত্বঞ্চ, তত্ত্বং ভাবেঽভাবে ভাক্তমিতি। অনাদিরণুশ্যামতেতি হেত্বভাবাদযুক্তং। অনুৎপত্তিধর্ম্মকমনিত্যমিতি নাত্র হেতুরস্তীতি।

অনুবাদ। যেমন পার্থিব পরমাণুর শ্যাম রূপ অনাদি, অথচ অগ্নিসংযোগপ্রযুক্ত অনিত্য অর্থাৎ অগ্নিসংযোগজন্য উহার বিনাশ হয়, তদ্রূপ ক্লেশসন্ততিও অনিত্য, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে উহারও বিনাশ হয়।

ভাব পদার্থেরই ধর্ম্ম নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব ভাব পদার্থে তত্ত্ব অর্থাৎ মুখ্য, অভাব পদার্থে ভাক্ত অর্থাৎ গৌণ। পরমাণুর শ্যাম রূপ অনাদি, ইহা হেতুর অভাববশতঃ অর্থাৎ প্রমাণ না থাকায় অযুক্ত। অনুৎপত্তিধর্ম্মক পদার্থ অনিত্য, ইহা বলিলেও এই বিষয়ে হেতু (প্রমাণ) নাই।

টিপ্পনী। পূর্ব্বসূত্রে প্রাগভাব পদার্থকে দৃষ্টান্ত করিয়া মহর্ষি একপ্রকার সমাধান বলিয়াছেন। কিন্তু ঐ প্রাগভাব পদার্থে এবং উহার দৃষ্টান্তত্ব বিষয়ে বিবাদ থাকায় মহর্ষি পরে এই সূত্রে ভাব পদার্থকেই দৃষ্টান্ত করিয়া পূর্ব্বোক্ত সমাধানের সমর্থন করিয়াছেন। ভাষ্যকার ইহাও অপর দ্বিতীয় ব্যক্তির সমাধান বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উত্তরবাদীর কথা এই যে, পার্থিব পরমাণুর শ্যাম রূপ অনাদি হইলেও যেমন অগ্নিসংযোগজন্য উহার বিনাশ হয়, তদ্রূপ ক্লেশসন্ততি অনাদি

হইলেও তত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত উহারও বিনাশ হয়। তাৎপর্য্য এই যে, অনাদি ভাব পদার্থের কখনই বিনাশ হয় না—এইরূপ নিয়মও স্বীকার করা যায় না। কারণ, পার্থিব পরমাণুর শ্যাম রূপের বিনাশ হইয়া থাকে। পরমাণু নিত্য পদার্থ, সুতরাং অনাদি। তাহা হইলে শ্যামবর্ণ পার্থিব পরমাণুর যে শ্যাম রূপ, তাহাও অনাদিই বলিতে হইবে। কারণ, পার্থিব পরমাণু কোন সময়েই রূপশূন্য থাকিতে পারে না। তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে উত্তরবাদীর পক্ষ সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, "যদেতচ্ছ্যামং রূপং তদন্নস্য" এই শ্রুতিবাক্যে "অন্ন"শব্দের দ্বারা মৃত্তিকা বা পৃথিবীই বিবক্ষিত, সুতরাং উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা পার্থিব পরমাণুর শ্যাম রূপ অনাদি, ইহা বুঝা যায়।

ভাষ্যকার পূর্ব্বোক্ত সমাধানের ব্যাখ্যা করিয়া, শেষে মহর্ষির সিদ্ধান্ত-সূত্রের অবতারণা করিবার পূর্ব্বে এখানে পূর্ব্বোক্ত অপরের সমাধানের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, নিত্যত্ব ও অনিত্যত্ব ভাব পদার্থেরই ধর্ম্ম, সুতরাং উহা ভাব পদার্থেই মুখ্য, অভাব পদার্থে গৌণ। তাৎপর্য্য এই যে, প্রথম উত্তরবাদী যে, প্রাগভাবের অনিত্যত্বকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা গ্রহণ করা যায় না। কারণ, প্রাগভাবে বস্তুতঃ অনিত্যত্ব ধর্ম্মই নাই। প্রাগভাবের উৎপত্তি না থাকায় উহাতে মুখ্য অনিত্যত্ব নাই। কিন্তু প্রাগভাবের বিনাশ থাকায় অনিত্য ঘট পটাদির সহিত উহার বিনাশিত্বরূপ সাদৃশ্য আছে, এই জন্য প্রাগভাবে অনিত্যত্বের ব্যবহার হয়। এইরূপ প্রাগভাবের উৎপত্তি বা কারণ না থাকায় কারণশূন্য নিত্য পদার্থের সহিতও উহার সাদৃশ্য আছে। এই জন্য উহাতে নিত্যত্বেরও ব্যবহার হয়। কিন্তু ঐ অনিত্যত্ব ও নিত্যত্ব উহাতে "তত্ত্ব" অর্থাৎ মুখ্য নহে, উহা পূর্ব্বোক্তরূপ সাদৃশ্যপ্রযুক্ত, এ জন্য উহা "ভাক্ত" অর্থাৎ গৌণ। বস্তুতঃ মহর্ষি গোতমও দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকে শব্দের অনিত্যত্বসাধক অনুমানে ব্যভিচার নিরাস করিতে "তত্ত্বভাক্তয়োঃ" ইত্যাদি (১৫শ) সূত্রে "তত্ত্ব" ও "ভাক্ত" শব্দের প্রয়োগ করিয়াই মুখ্যনিত্যত্ব ও গৌণ-নিত্যত্বের প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি সেখানে "ধ্বংস"নামক অভাব পদার্থে মুখ্যনিত্যত্ব স্বীকার করেন নাই। সুতরাং "প্রাগভাব" নামক অভাব পদার্থেও তিনি মুখ্যনিত্যত্বের ন্যায় মুখ্য অনিত্যত্বও স্বীকার করেন নাই, ইহা বুঝা যায়। ফলকথা, যে পদার্থের উৎপত্তি ও বিনাশ উভয়ই আছে, তাহাতেই মুখ্য অনিত্যত্ব থাকায় প্রাগভাবে উহা নাই। সুতরাং প্রাগভাব অনাদি হইলেও উহার অনিত্যত্ব না থাকায় উহা দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। বস্তুতঃ পূর্ব্বোক্ত উত্তরবাদী যদি প্রাগভাবের বিনাশকেই দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করেন, "অনিত্যত্ব" শব্দের দ্বারা বিনাশিত্বই যদি তাঁহার বিবক্ষিত হয়, তাহা হইলে ভাষ্যকারোক্ত দোষের অবকাশ হয় না এবং উক্ত উত্তরবাদীর যে তাহাই বক্তব্য, ইহাও বুঝা যায়। সুতরাং ভাষ্যকারের পক্ষে শেষে ইহাই বলিতে হইবে যে, প্রাগভাবের বিনাশ থাকিলেও উৎপত্তি নাই, অর্থাৎ রাগাদি ক্লেশের ন্যায় প্রাগভাব উৎপন্ন হয় না; সুতরাং প্রাগভাব, রাগাদি ক্লেশরূপ জায়মান ভাবপদার্থের অনুরূপ দৃষ্টান্ত হইতে পারে না। কারণ, রাগাদি ক্লেশসন্ততি অনাদি হইলেও প্রাগভাবের ন্যায় উৎপত্তিশূন্য অনাদি নহে। প্রাগভাবের প্রতিযোগী ভাব পদার্থ উৎপন্ন হইলে তখন প্রাগভাব থাকিতেই পারে না। কারণ, ভাব ও অভাব পরস্পর বিরুদ্ধ। কিন্তু রাগাদি ক্লেশসন্ততি ঐরূপ প্রতিযোগি-নশ্য পদার্থ নহে। অতএব অনাদি প্রাগভাবের

ন্যায় অনাদি রাগাদি ক্লেশসন্ততির বিনাশ হয়, ইহা বলা যায় না। পরন্তু হেতু না থাকিলে কেবল দৃষ্টান্তের দ্বারাও কোন সাধ্যসিদ্ধি হয় না, ইহাও এখানে ভাষ্যকারের বক্তব্য বুঝিতে হইবে। ভাষ্যকার যে আরও অনেক স্থানে উহা বলিয়া অপরের মত খণ্ডন করিয়াছেন, ইহাও এখানে স্মরণ করা আবশ্যক।

ভাষ্যকার পরে দ্বিতীয় উত্তরবাদীর দৃষ্টান্ত খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, পরমাণুর শ্যাম রূপ যে অনাদি, এ বিষয়ে কোন হেতু না থাকায় উহা অযুক্ত। তাৎপর্য্য এই যে, পরমাণুর শ্যাম রূপ অনাদি হইলেও যেমন উহার বিনাশ হয়, তদ্রূপ রাগাদি ক্লেশসন্ততি অনাদি হইলেও উহার বিনাশ হয়,—এই যাহা বলা হইয়াছে, তাহাও বলা যায় না। কারণ, পরমাণুর শ্যাম রূপের অনাদিত্ব বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে ভাষ্যকারের গূঢ় তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিতে বলিয়াছেন যে, পার্থিব পরমাণুর শ্যাম রূপের যে উৎপত্তিই হয় না, উহা স্বতঃসিদ্ধ বা নিত্য, সুতরাং অনাদি, এ বিষয়ে কোনই প্রমাণ নাই। পরন্তু উহা যে জন্য পদার্থ, রক্তাদি রূপের ন্যায় উহারও উৎপত্তি হয়, সুতরাং উহা অনাদি নহে, এ বিষয়েই প্রমাণ আছে। পার্থিব পরমাণুর রক্তাদি রূপ অগ্নিসংযোগ-জন্য, অগ্নিসংযোগ ব্যতীত শ্যাম রূপের বিনাশের পরে কুত্রাপি রূপান্তরের উৎপত্তি হয় না। সুতরাং ঐ রক্তাদি রূপকে দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করিয়া "পার্থিব পরমাণুর শ্যাম রূপ জন্য পদার্থ, যেহেতু উহা পৃথিবীর রূপ, যেমন রক্তাদি রূপ," এইরূপে অনুমান প্রমাণের দ্বারা পার্থিব পরমাণুর শ্যাম রূপের জন্যত্বই সিদ্ধ হয়। সুতরাং উহা বস্তুতঃ অনাদি নহে। কিন্তু পার্থিব পরমাণুর সেই পূর্ব্বজাত শ্যাম রূপ, রক্তাদি রূপের ন্যায় কোন জীবের প্রযত্নজন্য নহে, এই জন্যই জীবের প্রযত্নজন্য রক্তাদি রূপ হইতে বৈলক্ষণ্যবশতঃ ঐ শ্যাম রূপকে অনাদি বলা হয়। পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যেরও উহাই তাৎপর্য্য। বস্তুতঃ পার্থিব পরমাণুর শ্যাম রূপ যে তত্ত্বতঃই অনাদি, তাহা নহে। এখানে স্মরণ করা আবশ্যক যে, মহর্ষি তৃতীয় অধ্যায়ের সর্ব্বশেষ সূত্রের পূর্ব্বে "অণুশ্যামতানিত্যত্ববদেতৎ স্যাৎ" এই সূত্রে যে পার্থিব পরমাণুর শ্যাম রূপের নিত্যত্বকেই দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখ করিয়াছেন, উহা তাঁহার নিজের মত নহে। তিনি সেখানে ঐ সূত্রের দ্বারা অপরের সমাধানের উল্লেখ করিয়া, পরবর্ত্তী সূত্রের দ্বারা উহার খণ্ডন করিয়াছেন। সুতরাং পূর্ব্বাপর বিরোধ নাই। তাৎপর্য্যটীকাকার সেখানেও ঐ সমাধানের খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, "পার্থিব পরমাণুর যে শ্যাম রূপ, তাহা কারণশূন্য বা নিত্য নহে, যেহেতু উহা পার্থিব রূপ, যেমন রক্তাদি রূপ," এইরূপ অনুমানের দ্বারা পার্থিব পরমাণুর শ্যাম রূপেরও অগ্নিসংযোগজন্যত্ব সিদ্ধ হয়। ফলকথা, ভাষ্যকার প্রভৃতি নৈয়ায়িক-গণের মতে পার্থিব পরমাণুর সর্ব্বপ্রথম রূপ যে শ্যাম রূপ, তাহাও ঈশ্বরেচ্ছাবশতঃ অগ্নিসংযোগ-জন্য, উহা স্বতঃসিদ্ধ বা নিত্য নহে, সুতরাং উহাও বস্তুতঃ অনাদি নহে। পূর্ব্বোক্ত বাদী বলিতে পারেন যে, পার্থিব পরমাণুর রক্তাদি রূপ অগ্নিসংযোগজন্য হইলেও উহার সর্ব্বপ্রথম রূপ যে শ্যাম রূপ, তাহা জন্য পদার্থ নহে। কারণ, তাহা হইলে ঐ শ্যাম রূপের উৎপত্তির পূর্ব্বে ঐ পরমাণুর রূপশূন্যতা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু পার্থিব পরমাণু কখনও রূপশূন্য, ইহা স্বীকার করা যায় না। সুতরাং পার্থিব পরমাণুর যেমন নিত্যত্ববশতঃ উৎপত্তি নাই, উহা যেমন

অনাদি, তদ্রূপ উহার শ্যাম রূপেরও উৎপত্তি নাই, উহাও স্বতঃসিদ্ধ অনাদি, ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। ভাষ্যকার এই জন্য সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন যে, অনুৎপত্তিধর্ম্মক বস্তু অনিত্য, ইহা বলিলে এ বিষয়েও কোন প্রমাণ নাই। ভাষ্যকারের তাৎপর্য্য এই যে, পরমাণুর শ্যাম রূপের উৎপত্তি হয় না, ইহা বলিলে উহা আত্মাপ্রভৃতির ন্যায় অনুৎপত্তিধর্ম্মক ভাবপদার্থ হয়। কিন্তু তাহা হইলে উহা অনিত্য হইতে পারে না। কারণ, ঐরূপ পদার্থও যে অনিত্য হয়, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। পরন্তু অনুৎপত্তিধর্ম্মক ভাবপদার্থমাত্রই নিত্য, এই বিষয়েই অনুমানপ্রমাণ আছে। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বাদী পরমাণুর শ্যাম রূপের অনিত্যত্বের ন্যায় রাগাদি ক্লেশসন্ততির অনিত্যত্ব বলিয়া পরমাণুর শ্যাম রূপের অনিত্যত্বই স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং পরমাণুর শ্যাম রূপের উৎপত্তিও স্বীকার করিতে তিনি বাধ্য। নচেৎ পরমাণুর শ্যাম রূপের বিনাশও হইতে পারে না। তাহা হইলে তাঁহার ঐ দৃষ্টান্তও সঙ্গত হয় না। পরন্তু পরমাণুর শ্যাম রূপ বিদ্যমান থাকিলে উহাতে অগ্নিসংযোগজন্য রক্ত রূপের উৎপত্তিও হইতে পারে না। কারণ, পার্থিব পদার্থে অগ্নিসংযোগজন্য শ্যাম রূপের বিনাশ হইলেই তাহাতে রক্ত রূপের উৎপত্তি হইয়া থাকে, ইহাই প্রমাণসিদ্ধ। সুতরাং পরমাণুর শ্যাম রূপের বিনাশ যখন উভয় পক্ষেরই স্বীকার্য্য, তখন উহার উৎপত্তিও উভয় পক্ষেরই স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে উহার অনিত্যত্বও সিদ্ধ হইবে। কিন্তু উহা অনুৎপত্তিধর্ম্মক, অথচ অনিত্য, ইহা কখনও বলা যাইবে না। কারণ, অনুৎপত্তিধর্ম্মক বস্তু অনিত্য, এ বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই। ভাষ্যকারের ন্যায় বার্ত্তিককারও শেষে এই কথা বলিয়াছেন। কিন্তু তাৎপর্য্যটীকাকার এখানে ভাষ্যকার ও বার্ত্তিককারের ঐ শেষ কথার কোন উল্লেখ বা ব্যাখ্যা করেন নাই। সুধীগণ এখানে ভাষ্যকারের ঐ শেষ কথার প্রয়োজন ও তাৎপর্য্য বিচার করিবেন ॥৬৬॥

ভাষ্য। অয়ন্তু সমাধিঃ—

অনুবাদ। ইহাই সমাধান—

সূত্র। ন সংকল্প-নিমিত্তত্বাচ্চ রাগাদীনাং ॥ ॥৬৭॥৪১০॥

অনুবাদ। (উত্তর) না, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ উপপন্ন হয় না; কারণ, রাগাদি (ক্লেশ) সংকল্পনিমিত্তক এবং কর্ম্মনিমিত্তক ও পরস্পরনিমিত্তক।

ভাষ্য। কর্ম্মনিমিত্তত্বাদিতরেতর-নিমিত্তত্বাচ্চেতি সমুচ্চয়ঃ। মিথ্যা-সংকল্পেভ্যো রঞ্জনীয়-কোপনীয়-মোহনীয়েভ্যো রাগদ্বেষমোহা উৎপদ্যন্তে। কর্ম্ম চ সত্ত্বনিকায়নির্ব্বর্ত্তকং নৈয়মিকান্ রাগাদীন্ নির্ব্বর্ত্তয়তি নিয়মদর্শনাৎ। দৃশ্যতে হি কশ্চিৎ সত্ত্বনিকায়ো রাগবহুলঃ কশ্চিদ্দ্বেষবহুলঃ কশ্চিন্মোহবহুল

ইতি। **ইতরেতরনিমিত্তা চ রাগাদীনামুৎপত্তিঃ**। মূঢ়ো রজ্যতি, মূঢ়ঃ কুপ্যতি, রক্তো মুহ্যতি কুপিতো মুহ্যতি।

সর্ব্বমিথ্যাসংকল্পানাং তত্ত্বজ্ঞানাদনুৎপত্তিঃ। কারণানুৎপত্তৌ চ কার্য্যানুৎপত্তেরিতি রাগাদীনামত্যন্তমনুৎপত্তিরিতি।

অনাদিশ্চ ক্লেশসন্ততিরিত্যযুক্তং, সর্ব্ব ইমে খল্বাধ্যাত্মিকা ভাবা অনাদিনা প্রবন্ধেন প্রবর্ত্তন্তে শরীরাদয়ঃ, ন জাত্বত্র কশ্চিদনুৎপন্নপূর্ব্বঃ প্রথমত উৎপদ্যতেঽন্যত্র তত্ত্বজ্ঞানাৎ। ন চৈবং সত্যনুৎপত্তিধর্ম্মকং কিঞ্চিদ্ব্যয়ধর্ম্মকং প্রতিজ্ঞায়ত ইতি। কর্ম্ম চ সত্ত্বনিকায়নির্ব্বর্ত্তকং তত্ত্বজ্ঞানকৃতান্মিথ্যাসংকল্প-বিঘাতান্ন রাগাদ্যুৎপত্তিনিমিত্তং ভবতি, সুখদুঃখ-সংবিত্তিঃ ফলন্তু ভবতীতি।

ইতি শ্রীবাৎস্যায়নীয়ে ন্যায়ভাষ্যে চতুর্থাধ্যায়স্যাদ্যমাহ্নিকং ॥

অনুবাদ। কর্ম্মনিমিত্তকত্ববশতঃ এবং পরস্পরনিমিত্তকত্ববশতঃ ইহার সমুচ্চয় বুঝিবে, অর্থাৎ সূত্রে "চ" শব্দের দ্বারা কর্ম্মনিমিত্তকত্ব ও পরস্পরনিমিত্তকত্ব, এই অনুক্ত হেতুদ্বয়ের সমুচ্চয় মহর্ষির অভিপ্রেত। (সূত্রার্থ)—রঞ্জনীয়, কোপনীয় ও মোহনীয় (১) মিথ্যা সংকল্প হইতে রাগ, দ্বেষ ও মোহ উৎপন্ন হয়। প্রাণিজাতির নির্ব্বাহক অর্থাৎ নানাজাতীয় জীব-জন্মের নিমিত্তকারণ (২) কর্ম্মও "নৈয়মিক" অর্থাৎ ব্যবস্থিত রাগ, দ্বেষ ও মোহকে উৎপন্ন করে; কারণ, নিয়ম দেখা যায়। (তাৎপর্য্য) যেহেতু কোন জীবজাতি রাগবহুল, কোন জীবজাতি দ্বেষবহুল, কোন জীবজাতি মোহবহুল অর্থাৎ জীবজাতিবিশেষে রাগ, দ্বেষ ও মোহের ঐরূপ নিয়মবশতঃ উহা জীবজাতিবিশেষের কর্ম্মবিশেষজন্য, ইহা বুঝা যায়। এবং রাগ, দ্বেষ ও মোহের উৎপত্তি (৩) পরস্পরনিমিত্তক। যথা—মোহবিশিষ্ট জীব রাগবিশিষ্ট হয়, মোহবিশিষ্ট জীব কোপবিশিষ্ট হয়, রাগবিশিষ্ট জীব মোহ-বিশিষ্ট হয়, কোপবিশিষ্ট জীব মোহবিশিষ্ট হয় অর্থাৎ মোহজন্য রাগ জন্মে, রাগজন্যও মোহ জন্মে, এবং মোহজন্য কোপ বা দ্বেষ জন্মে, দ্বেষজন্যও মোহ জন্মে, সুতরাং উক্তরূপে রাগ, দ্বেষ ও মোহ যে, পরস্পরনিমিত্তক, ইহাও স্বীকার্য্য।

তত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত সমস্ত মিথ্যা সংকল্পেরই অনুৎপত্তি হয়, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে তখন আর কোন মিথ্যা সংকল্পই জন্মে না, কারণের উৎপত্তি না হইলেও কার্য্যের উৎপত্তি হয় না, এ জন্য (তৎকালে) রাগ, দ্বেষ ও মোহের অত্যন্ত অনুৎপত্তি হয়

অর্থাৎ তখন রাগ দ্বেষাদির কারণের একেবারে উচ্ছেদ হওয়ায় আর কখনই রাগ-দ্বেষাদি জন্মিতেই পাবে না।

পরন্তু ক্লেশসন্ততি অনাদি, ইহা যুক্ত নহে (অর্থাৎ কেবল উহাই অনাদি নহে), যে হেতু এই শরীরাদি আধ্যাত্মিক সমস্ত ভাব পদার্থই অনাদি প্রবাহরূপে প্রবৃত্ত (উৎপন্ন) হইতেছে, ইহার মধ্যে তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন অনুৎপন্নপূর্ব্ব কোন পদার্থ কখনও প্রথমতঃ উৎপন্ন হয় না (অর্থাৎ শরীরাদি ঐ সমস্ত আধ্যাত্মিক পদার্থের অনাদি কাল হইতেই উৎপত্তি হইতেছে, উহাদিগের সর্ব্বপ্রথম উৎপত্তি নাই, ঐ সমস্ত পদার্থই অনাদি) এইরূপ হইলেও অনুৎপত্তিধর্ম্মক কোন বস্তু বিনাশধর্ম্মক বলিয়া প্রতিজ্ঞাত হয় না (অর্থাৎ অনাদি জন্য পদার্থের বিনাশ হইলেও তদ্দৃষ্টান্তে অনাদি অনুৎপত্তি-ধর্ম্মক কোন ভাব পদার্থের বিনাশিত্ব সিদ্ধ করা যায় না), জীবজাতি-সম্পাদক কর্ম্মও তত্ত্বজ্ঞানজাত-মিথ্যাসংকল্প-বিনাশপ্রযুক্ত রাগাদির উৎপত্তির নিমিত্ত (জনক) হয় না,—কিন্তু সুখ ও দুঃখের অনুভূতিরূপ ফল হয়, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে তখনও জীবনকাল পর্য্যন্ত প্রারব্ধ কর্ম্মজন্য সুখদুঃখ ভোগ হয়।

বাৎস্যায়নপ্রণীত ন্যায়ভাষ্যে চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিক সমাপ্ত।

টিপ্পনী। মহর্ষি পূর্ব্বে "ন ক্লেশসন্ততেঃ স্বাভাবিকত্বাৎ" এই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বপক্ষ প্রকাশ-পূর্ব্বক পরে দুই সূত্রের দ্বারা অপর সিদ্ধান্তিদ্বয়ের সমাধান প্রকাশ করিয়া, শেষে এই সূত্রের দ্বারা তাঁহার নিজের সমাধান বা প্রকৃত সমাধান প্রকাশ করিয়াছেন। এই সূত্রের প্রথমে "নঞ্" শব্দের প্রয়োগ করায় ইহা বুঝা যায়। তাই ভাষ্যকার প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত সমাধানকে অপরের সমাধান বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়া, শেষে এই সূত্রের অবতারণা করিতে বলিয়াছেন,—"অয়ন্তু সমাধিঃ" অর্থাৎ এই সূত্রোক্ত সমাধানই প্রকৃত সমাধান।

"সংকল্প" যাহার নিমিত্ত অর্থাৎ কারণ, এই অর্থে সূত্রে "সংকল্পনিমিত্ত" শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে সঙ্কল্পনিমিত্তক অর্থাৎ সঙ্কল্পজন্য। তাহা হইলে "সংকল্পনিমিত্তত্ব" শব্দের দ্বারা বুঝা যায়, সংকল্পজন্যত্ব। ভাষ্যকার সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিবার জন্য প্রথমে বলিয়াছেন যে, কর্ম্মনিমিত্তকত্ব ও পরস্পরনিমিত্তকত্ব, এই হেতুদ্বয়ের সমুচ্চয় বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ সূত্রে "চ" শব্দের দ্বারা পূর্ব্ববৎ কর্ম্মজন্যত্ব ও পরস্পরজন্যত্ব, এই দুইটি অনুক্ত হেতুর সমুচ্চয় (সূত্রোক্ত হেতুর সহিত সম্বন্ধ) মহর্ষির অভিপ্রেত। তাহা হইলে সূত্রার্থ বুঝা যায় যে, রাগাদির সংকল্পজন্যত্ববশতঃ এবং কর্ম্মজন্যত্ববশতঃ ও পরস্পরজন্যত্ববশতঃ পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ উপপন্ন হয় না। অর্থাৎ রাগাদি ক্লেশসন্ততি অনাদি হইলেও উহার কারণ "সংকল্প" প্রভৃতি না থাকিলেও কারণাভাবে উহার আর উৎপত্তি হইতেই পারে না, সুতরাং উহার অত্যন্ত উচ্ছেদ হয়। ভাষ্যকার পরে ক্রমশঃ উক্ত হেতুত্রয়ের ব্যাখ্যা করিয়া সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

প্রথমে বলিয়াছেন যে, "রঞ্জনীয়" অর্থাৎ রাগজনক এবং "কোপনীয়" অর্থাৎ দ্বেষজনক এবং "মোহনীয়" অর্থাৎ মোহজনক যে সমস্ত মিথ্যা সংকল্প, তাহা হইতে যথাক্রমে রাগ, দ্বেষ ও মোহ উৎপন্ন হয়। এখানে এই "সংকল্প" কি, তাহা বুঝা আবশ্যক। মহর্ষি তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের ২৬শ সূত্রেও রাগাদি সংকল্পজন্য, ইহা বলিয়াছেন। ভাষ্যকার সেখানে ঐ "সংকল্প"কে পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের অনুচিন্তনজন্য বলিয়াছেন। বার্ত্তিককার উদ্দ্যোতকর সেখানে এবং এখানে পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের প্রার্থনাকেই "সংকল্প" বলিয়াছেন। পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের অনুচিন্তন বা অনুস্মরণজন্য তদ্বিষয়ে প্রথমে যে প্রার্থনারূপ সংকল্প জন্মে, উহা রাগ পদার্থ হইলেও পরে উহা আবার তদ্বিষয়ে রাগবিশেষ উৎপন্ন করে। বার্ত্তিককার ও তাৎপর্য্যটীকাকারের কথানুসারে পূর্ব্বে এই ভাবে ভাষ্যকারেরও তাৎপর্য্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে। (তৃতীয় খণ্ড, ৮২-৮৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু ভাষ্যকার পূর্ব্ববর্ত্তী ষষ্ঠ সূত্রের ভাষ্যে রঞ্জনীয় সংকল্পকে রাগের কারণ এবং কোপনীয় সঙ্কল্পকে দ্বেষের কারণ বলিয়া, উক্ত দ্বিবিধ সংকল্প মোহ হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে, অর্থাৎ উহাও মোহবিশেষ, এই কথা বলিয়াছেন। ইহার কারণ বুঝা যায় যে, মহর্ষি পূর্ব্ববর্ত্তী ষষ্ঠ সূত্রে "নামূঢ়স্যেতরোৎ-পত্তেঃ" এই বাক্যের দ্বারা রাগ ও দ্বেষকে মোহজন্য বলিয়াছেন। সুতরাং মহর্ষি অন্যত্র রাগাদিকে যে "সংকল্প"জন্য বলিয়াছেন, ঐ "সংকল্প" মোহবিশেষই তাঁহার অভিমত, অর্থাৎ উহা প্রার্থনারূপ রাগ পদার্থ নহে, উহা মিথ্যাজ্ঞানরূপ মোহ, ইহাই তাঁহার অভিপ্রেত বুঝা যায়। মনে হয়, তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র পরে ইহা চিন্তা করিয়াই এখানে বলিয়াছেন যে,[1] যদিও পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের প্রার্থনাই সংকল্প, তথাপি উহার পূর্ব্বাংশ বা কারণ সেই পূর্ব্বানুভবই এখানে "সংকল্প" শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে। কারণ, প্রার্থনা রাগপদার্থ অর্থাৎ ইচ্ছাবিশেষ, উহা রাগের কারণ মিথ্যাজ্ঞান নহে। সুতরাং এখানে "সংকল্প" শব্দের ঐ প্রার্থনারূপ মুখ্য অর্থ গ্রহণ করা যায় না। অতএব মিথ্যানুভব অর্থাৎ ঐ সংকল্পের কারণ মিথ্যাজ্ঞান বা মোহরূপ যে পূর্ব্বানুভব, তাহাই এখানে "সংকল্প" শব্দের অর্থ। কিন্তু তাৎপর্য্যটীকাকার পূর্ব্বোক্ত ষষ্ঠ সূত্রের ভাষ্যে সঙ্কল্প শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিতে মোহপ্রযুক্ত বিষয়ের সুখসাধনত্বের অনুস্মরণ ও দুঃখসাধনত্বের অনুস্মরণকে "সংকল্প" বলিয়াছেন। পূর্ব্বে তাঁহার ঐ কথাও লিখিত হইয়াছে (১২শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। কিন্তু এখানে তাঁহার কথার দ্বারা বুঝা যায় যে, তিনি বার্ত্তিককারের কথানুসারে পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের প্রার্থনাই "সংকল্প" শব্দের মুখ্য অর্থ, ইহা স্বীকার করিয়াই শেষে এখানে পূর্ব্বোক্ত ষষ্ঠ সূত্র ও উহার ভাষ্যানুসারে এই সূত্রোক্ত "সংকল্প" শব্দের লাক্ষণিক অর্থ গ্রহণ করিয়া রঞ্জনীয় (রাগজনক) সংকল্প ও কোপনীয় (দ্বেষজনক) সংকল্পকে মিথ্যানুভবরূপ মোহবিশেষই বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি পরে ঐ মিথ্যাজ্ঞান বা মোহজন্য সংস্কারকেই মোহনীয় সংকল্প বলিয়াছেন। তিনি পূর্ব্বে বার্ত্তিককারের "মূঢ়ো মুহ্যতি" এই বাক্যে "মূঢ়" শব্দেরও অর্থ বলিয়াছেন—মোহজন্য

১। যদ্যপ্যনুভূতবিষয়প্রার্থনা সংকল্পঃ, তথাপি তস্য পূর্ব্বভাগোহনুভবো গ্রাহ্যঃ, প্রার্থনায়া রাগত্বাৎ। তেন মিথ্যানুভবঃ সংকল্প ইত্যর্থঃ। ...... মোহনীয়ঃ সংকল্পো মিথ্যাজ্ঞানসংস্কারঃ।—তাৎপর্য্যটীকা।

সংস্কারবিশিষ্ট। অবশ্য মোহ বা মিথ্যাজ্ঞানজন্য সংস্কার যে মোহের কারণ, ইহা সত্য; কারণ, অনাদিকাল হইতে ঐ সংস্কার আছে বলিয়াই জীবের নানারূপ মোহ জন্মিতেছে, উহার উচ্ছেদ হইলে তখন আর মোহ জন্মে না, জন্মিতেই পারে না। কিন্তু স্থলবিশেষে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে মোহও মোহবিশেষের কারণ হয়, এক মোহ অপর মোহ উৎপন্ন করে, ইহাও সত্য। সুতরাং মোহরূপ সংকল্পকে মোহেরও কারণ বলা যাইতে পারে। বৌদ্ধসম্প্রদায়ও রাগ, দ্বেষ ও মোহ, এই পদার্থত্রয়কে সংকল্পজন্য বলিয়াছেন[১]। মূলকথা, এখানে ভাষ্যকারের মতে "সংকল্প" যে, প্রার্থনা বা ইচ্ছাবিশেষ নহে, কিন্তু উহা মিথ্যাজ্ঞান বা মোহবিশেষ, ইহা ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্ত কথার দ্বারা এবং তাৎপর্য্যটীকাকারের ব্যাখ্যার দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়। ভাষ্যকার এখানে সূত্রোক্ত "সংকল্প"কে মিথ্যাসংকল্প বলিয়া ব্যাখ্যা করায় তদ্দ্বারাও ঐ "সংকল্প" যে মিথ্যাজ্ঞানবিশেষ, ইহা ব্যক্ত হইয়াছে। নচেৎ তাঁহার "মিথ্যা" শব্দ প্রয়োগের উপপত্তি ও সার্থক্য কিরূপে হইবে, ইহাও প্রণিধান করা আবশ্যক। পরে দ্বিতীয় আহ্নিকের দ্বিতীয় সূত্রেও "সংকল্প" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। সেখানেও সূত্রার্থ ব্যাখ্যা করিতে ভাষ্যকার "মিথ্যা" শব্দের অধ্যাহার করিয়াছেন। বৃত্তিকার বিশ্বনাথও এই সূত্রে "সংকল্প" শব্দের দ্বারা মিথ্যাজ্ঞানই গ্রহণ করিয়াছেন। মোহেরই নামান্তর মিথ্যাজ্ঞান। ভাষ্যকার ন্যায়দর্শনের দ্বিতীয় সূত্রের ভাষ্যে নানাপ্রকার মিথ্যাজ্ঞানের আকার প্রদর্শন করিয়াছেন। দ্বিতীয় আহ্নিকের প্রারম্ভ হইতে এ বিষয়ে অন্যান্য কথা ব্যক্ত হইবে। সুধীগণ পূর্ব্বোক্ত "সংকল্প" শব্দের অর্থ ব্যাখ্যায় তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের ২৬শ সূত্রে ও চতুর্থ অধ্যায়ের ষষ্ঠ সূত্রে ও এই সূত্রে তাৎপর্য্যটীকাকারের বিভিন্ন প্রকার উক্তির সমন্বয় ও তাৎপর্য্য বিচার করিবেন।

ভাষ্যকার প্রথমে রাগাদির (১) সংকল্পনিমিত্তকত্ব বুঝাইয়া, ক্রমানুসারে (২) কর্ম্মনিমিত্তকত্ব বুঝাইতে বলিয়াছেন যে, জীবজাতিসম্পাদক অর্থাৎ নানাজাতীয় জীবদেহজনক কর্ম্ম বা অদৃষ্টবিশেষও সেই সেই জাতিবিশেষের পক্ষে ব্যবস্থিত রাগ, দ্বেষ ও মোহ জন্মায়। কারণ, জাতিবিশেষের পক্ষে রাগ, দ্বেষ ও মোহের নিয়ম দেখা যায়। অর্থাৎ নানাজাতীয় জীবের মধ্যে কোন জাতির রাগ অধিক, কোন জাতির দ্বেষ অধিক, কোন জাতির মোহ অধিক, এইরূপ যে নিয়ম দেখা যায়,[২] তাহা সেই সেই জাতিবিশেষের পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম বা অদৃষ্টবিশেষজন্য, নচেৎ উহার উপপত্তি হইতে পারে না। সুতরাং সমান্যতঃ রাগ, দ্বেষ ও মোহ যেমন পূর্ব্বোক্ত মিথ্যাজ্ঞানরূপ সংকল্পজন্য, তদ্রূপ জীবজাতিবিশেষের ব্যবস্থিত যে রাগাদিবিশেষ, তাহা কর্ম্ম বা অদৃষ্টবিশেষজন্য, অর্থাৎ সেই সেই জীবজাতি বা দেহবিশেষের উৎপাদক অদৃষ্টবিশেষ, ঐ রাগাদিবিশেষের উৎপাদক, ইহা স্বীকার্য্য। "নিকায়" শব্দের দ্বারা সজাতীয় জীবসমূহ বুঝা যায়। কিন্তু ভাষ্যকার এখানে "নিকায়" শব্দের পূর্ব্বে জীববাচক "সত্ত্ব" শব্দের প্রয়োগ করায় "নিকায়" শব্দের দ্বারা জাতিই এখানে তাঁহার বিবক্ষিত বুঝা যায়। তাই তাৎপর্য্যটীকাকারও এখানে লিখিয়াছেন,—"নিকায়েন জাতিরুপলক্ষ্যতে"। বৈশেষিক দর্শনে মহর্ষি

১। সংকল্প-প্রভবো রাগো দ্বেষো মোহশ্চ কথ্যতে।—মাধ্যমিক কারিকা।

২। দৃষ্টে হি কশ্চিৎ সত্ত্বনিকায়ো রাগবহুলো যথা পারাবতাদিঃ। কশ্চিৎ ক্রোধবহুলো যথা সর্পাদিঃ। কশ্চিন্মোহবহুলো যথা অজগরাদিঃ।—ন্যায়বার্ত্তিক।

কণাদও শেষে "জাতিবিশেষাচ্চ" (৬।২।১৩) এই সূত্রের দ্বারা জাতিবিশেষপ্রযুক্তও যে, রাগবিশেষ জন্মে, ইহা বলিয়াছেন। তদনুসারে ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকের ২৬শ সূত্রের ভাষ্যে শেষে "জাতিবিশেষাচ্চ রাগবিশেষঃ" এই কথা বলিয়াছেন এবং পরে সেখানে ঐ "জাতিবিশেষ" শব্দের দ্বারা যে, জাতিবিশেষের জনক কর্ম্ম বা অদৃষ্টবিশেষই লক্ষিত হইয়াছে, ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। বৈশেষিক দর্শনের "উপস্কার"কার শঙ্করমিশ্র পূর্ব্বোক্ত কণাদসূত্রের ব্যাখ্যা করিতে জাতিবিশেষপ্রযুক্ত রাগ ও দ্বেষ উভয়ই জন্মে, ইহা দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়াছেন এবং সেখানে তিনিও বলিয়াছেন যে, সেই সেই জাতির নিষ্পাদক অদৃষ্টবিশেষই সেই সেই জাতির বিষয়বিশেষে রাগ ও দ্বেষের অসাধারণ কারণ। জন্মরূপ জাতিবিশেষ উহার দ্বার বা সহকারিমাত্র। কিন্তু মহর্ষি কণাদ ঐ সূত্রের পূর্ব্বে "অদৃষ্টাচ্চ" এই সূত্রের দ্বারা পৃথক্ ভাবেই অদৃষ্টবিশেষকেও অনেক স্থলে রাগের অথবা রাগ ও দ্বেষ উভয়েরই অসাধারণ কারণ বলায় তিনি পর-সূত্রে "জাতিবিশেষ" শব্দের দ্বারা যে, অদৃষ্টভিন্ন জন্মবিশেষকেই গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাই সরলভাবে বুঝা যায়। সে যাহাই হউক, মূল কথা পূর্ব্বোক্ত মিথ্যাজ্ঞানরূপ সংকল্প যেমন সর্ব্বত্রই সর্ব্বপ্রকার রাগ, দ্বেষ ও মোহের সাধারণ কারণ, উহা ব্যতীত কোন জীবেরই কোন প্রকার রাগাদি জন্মে না, তদ্রূপ নানাজাতীয় জীবগণের সেই সেই বিজাতীয় শরীরাদিজনক যে কর্ম্ম বা অদৃষ্টবিশেষ, তাহাও সেই সেই জীবজাতির রাগাদিবিশেষের অর্থাৎ কাহারও অধিক রাগের, কাহারও অধিক দ্বেষের এবং কাহারও অধিক মোহের অসাধারণ কারণ, ইহাই এখানে ভাষ্যকারের বক্তব্য বুঝা যায়। এবং তিনি তৃতীয় অধ্যায়েও "জাতিবিশেষাচ্চ রাগবিশেষঃ" এই বাক্যের দ্বারাও উহাই বলিয়াছেন বুঝা যায়। সুতরাং মহর্ষি কণাদ প্রথমে "অদৃষ্টাচ্চ" এই সূত্রের দ্বারা অদৃষ্টবিশেষকে রাগবিশেষের অসাধারণ কারণরূপে প্রকাশ করিয়াও আবার "জাতিবিশেষাচ্চ" এই সূত্রের দ্বারা জাতি বা জন্মবিশেষের নিষ্পাদক অদৃষ্টবিশেষকেই যে বিশেষ করিয়া রাগবিশেষের অসাধারণ কারণ বলিয়াছেন, ইহা শঙ্কর মিশ্র প্রভৃতির ন্যায় সুপ্রাচীন বাৎস্যায়নেরও অভিমত বুঝা যায়। মহর্ষি কণাদ "অদৃষ্টাচ্চ" এই সূত্রের পূর্ব্বে "তন্ময়ত্বাচ্চ" এই সূত্রের দ্বারা "তন্ময়ত্ব"কেও রাগের কারণ বলিয়াছেন। তদনুসারে ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও তৃতীয় অধ্যায়ে তন্ময়ত্বকে রাগের কারণ বলিয়াছেন (তৃতীয় খণ্ড, ৮২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। ভাষ্যকার সেখানে সংস্কারজনক বিষয়াভ্যাসকেই "তন্ময়ত্ব" বলিয়াছেন। উহা অনাদিকাল হইতেই সেই সেই ভোগ্য বিষয়ে সংস্কার উৎপন্ন করিয়া রাগমাত্রেরই কারণ হয়। শঙ্করমিশ্র উক্ত সূত্রের ব্যাখ্যায় বিষয়ের অভ্যাসজনিত দৃঢ়তর সংস্কারকেই "তন্ময়ত্ব" বলিয়াছেন। ঐ সংস্কারও রাগমাত্রেরই সাধারণ কারণ, সন্দেহ নাই। কারণ, ঐ সংস্কারবশতঃই সেই সেই বিষয়ের অনুস্মরণ জন্মে, তাহার ফলে সংকল্পজন্য সেই সেই বিষয়ে রাগ জন্মে।

ভাষ্যকার পরে রাগাদির উৎপত্তি পরস্পরনিমিত্তক, ইহা বলিয়া তাঁহার পূর্ব্বোক্ত তৃতীয় হেতুর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পরে মূঢ় ব্যক্তি রক্ত ও কুপিত হয় এবং রক্ত ও কুপিত ব্যক্তি মূঢ় হয়, ইহা বলিয়া মোহ যে, রাগ ও কোপের (দ্বেষের) নিমিত্ত এবং রাগ ও দ্বেষবিশেষও মোহবিশেষের নিমিত্ত বা কারণ হয়, ইহা ব্যক্ত করিয়াছেন। এইরূপ অনেক স্থলে রাগবিশেষও

দ্বেষবিশেষের কারণ হয় এবং দ্বেষবিশেষও রাগবিশেষের কারণ হয়, ইহাও বুঝিতে হইবে। ফলকথা, রাগ, দ্বেষ ও মোহ, এই পদার্থত্রয় পরস্পরই পরস্পরের উৎপাদক হয়। সুতরাং ঐ পদার্থত্রয়েরই অত্যন্ত উচ্ছেদ হইলে মোক্ষ হইতে পারে। পূর্ব্বপক্ষবাদী অবশ্যই বলিবেন যে, রাগাদির মূল কারণ যে মিথ্যাজ্ঞান, তাহার অত্যন্ত উচ্ছেদের কোন কারণ না থাকায় রাগাদির অত্যন্ত উচ্ছেদ অসম্ভব ; সুতরাং মোক্ষ অসম্ভব,—এ জন্য ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, তত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত সমস্ত মিথ্যা সংকল্পের অনুৎপত্তি হয়। অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার মিথ্যাজ্ঞানের বিরোধী তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইলে তখন আর কোন প্রকার মিথ্যাজ্ঞানই জন্মিতে পারে না। সুতরাং তখন রাগাদির মূল কারণ মিথ্যাজ্ঞানের অভাবে উহার কার্য্য রাগাদি ক্লেশসন্ততির উৎপত্তি হইতে পারে না, তখন চিরকালের জন্য উহার উচ্ছেদ হওয়ায় মোক্ষ সিদ্ধ হয়। ভাষ্যকার শেষে ইহাও বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বপক্ষবাদী রাগাদি ক্লেশসন্ততিকে যে অনাদি বলিয়াছেন, ইহাও অযুক্ত। তাৎপর্য্য এই যে, কেবল রাগাদি ক্লেশসন্ততিই যে অনাদি, তাহা নহে। শরীরাদি আরও অনেক পদার্থও অনাদি। সেই সমস্ত পদার্থেরও অত্যন্ত উচ্ছেদ হইয়া থাকে। ভাষ্যকার তাঁহার এই তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিতে পরেই বলিয়াছেন যে, শরীরাদি আধ্যাত্মিক সমস্ত ভাবপদার্থ ই অনাদি, ঐ সমস্ত পদার্থের মধ্যে এক তত্ত্বজ্ঞানই কেবল অনাদি নহে। কারণ, তত্ত্বজ্ঞান পূর্ব্বে আর কখনও জন্মে না। অর্থাৎ অনাদি মিথ্যাজ্ঞানবশতঃ অনাদি কাল হইতেই জীবকুলের নানাবিধ শরীরাদি উৎপন্ন হইতেছে। সুতরাং কোন জীবেরই শরীরাদি পদার্থ "অনুৎপন্নপূর্ব্ব" নহে, অর্থাৎ পূর্ব্বে আর কখনও উহার উৎপত্তি হয় নাই, সময়বিশেষে সর্ব্বপ্রথমেই উহার উৎপত্তি হয়, ইহা নহে। যাহা আত্মাকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়, তাহাকে আধ্যাত্মিক পদার্থ বলে। জীবের শরীরাদির ন্যায় তত্ত্বজ্ঞানও আধ্যাত্মিক পদার্থ, কিন্তু উহা শরীরাদির ন্যায় অনাদি হইতে পারে না। কারণ, তাহা হইলে মিথ্যাজ্ঞানের উৎপত্তি অসম্ভব হওয়ায় জন্ম বা শরীরাদি লাভ হইতেই পারে না। তাই ভাষ্যকার তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন শরীরাদি পদার্থেরই অনাদিত্ব বলিয়াছেন। তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম আহ্নিকে আত্মার নিত্যত্ব পরীক্ষায় উক্ত সিদ্ধান্ত প্রতিপাদিত হইয়াছে। মূলকথা, অনাদি রাগাদি ক্লেশসন্ততির ন্যায় অনাদি শরীরাদি পদার্থেরও কালে অত্যন্ত উচ্ছেদ হয়। মুক্ত আত্মার আর কখনও শরীরাদি জন্মে না। পূর্ব্বপক্ষবাদী যদি বলেন যে, অনাদি পদার্থেরও বিনাশ হইলে তদ্‌দৃষ্টান্তে যে পদার্থ "অনুৎপত্তিধর্ম্মক" অর্থাৎ যাহার উৎপত্তি নাই, এমন ভাব পদার্থেরও কালে বিনাশ হয়, ইহাও বলিতে পারি। এ জন্য ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, অনাদি পদার্থের বিনাশ হয় বলিয়া, অনুৎপত্তিধর্ম্মক কোন ভাব পদার্থেরই বিনাশিত্ব সিদ্ধ করা যায় না। কারণ, উৎপত্তিধর্ম্মক রাগাদি অনাদি পদার্থেরই বিনাশিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। অনুৎপত্তিধর্ম্মক অনাদি ভাব পদার্থের অবিনাশিত্বই প্রমাণসিদ্ধ আছে ; সুতরাং ঐরূপ পদার্থের বিনাশিত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। পূর্ব্বপক্ষবাদী বলিতে পারেন যে, তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে মিথ্যাজ্ঞানের নিবৃত্তি হওয়ায় তখন যে আর মিথ্যাজ্ঞাননিমিত্তক রাগাদি জন্মিতে পারে না, ইহা স্বীকার করিলাম। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মনিমিত্তক যে রাগাদি, তাহার নিবৃত্তি

কিরূপে হইবে ? মিথ্যাজ্ঞান নিবৃত্ত হইলেও শরীরাদিরক্ষক প্রারব্ধ কর্ম্মের অস্তিত্ব ত তখনও থাকে, নচেৎ তত্ত্বজ্ঞানের পরক্ষণেই জীবননাশ কেন হয় না ? এতদুত্তরে ভাষ্যকার শেষে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত প্রারব্ধ কর্ম্ম বা অদৃষ্টবিশেষও তখন আর রাগাদির উৎপাদক হয় না। কারণ, তখন তত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত মিথ্যাজ্ঞানের বিনাশ হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, পূর্ব্বোক্ত মিথ্যাজ্ঞানই সর্ব্বপ্রকার রাগাদির সামান্য কারণ। পূর্ব্বোক্তরূপ কর্ম্ম বা অদৃষ্টবিশেষ, রাগাদিবিশেষের বিশেষ কারণ হইলেও সামান্য কারণ মিথ্যাজ্ঞানের অভাবে উহা কার্য্যজনক হয় না। প্রশ্ন হইতে পারে যে, যদি তত্ত্বজ্ঞানীর প্রারব্ধ কর্ম্ম থাকিলেও মিথ্যাজ্ঞানের অভাবে রাগাদির উৎপত্তি না হয়, তাহা হইলে মিথ্যাজ্ঞানের অভাবে তাঁহার ঐ কর্ম্মফল সুখদুঃখ ভোগেরও উৎপত্তি না হউক ? এতদুত্তরে সর্ব্বশেষে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, "সুখদুঃখের উপভোগরূপ ফল কিন্তু হয়।" তাৎপর্য্য এই যে, তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি প্রারব্ধকর্ম্মক্ষয়ের জন্যই জীবনধারণ করিয়া সুখ ও দুঃখভোগ করেন। উহাতে মিথ্যাজ্ঞান বা তজ্জন্য রাগাদির কোন আবশ্যকতা নাই। তিনি যে সুখ ও দুঃখভোগ করেন, উহাতে তাঁহার রাগ ও দ্বেষ থাকে না। তিনি সুখে আসক্তিশূন্য এবং দুঃখে দ্বেষশূন্য হইয়াই তাঁহার অবশিষ্ট কর্ম্মফল ঐ সুখ ও দুঃখ ভোগ করেন। কারণ, উহা তাঁহার অবশ্য ভোগ্য। ভোগ ব্যতীত তাঁহার ঐ সুখদুঃখজনক প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হইতে পারে না। অবশ্য তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি ভোগদ্বারা প্রারব্ধ কর্ম্মক্ষয়ের জন্য জীবন ধারণ করায় তাঁহারও সময়ে বিষয়বিশেষে রাগ ও দ্বেষ জন্মে, ইহা সত্য; কিন্তু মুক্তির প্রতিবন্ধক উৎকট রাগ ও দ্বেষ তাঁহার আর জন্মে না। অর্থাৎ তাঁহার তৎকালীন রাগ ও দ্বেষজনিত কোন কর্ম্মই তাঁহার ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম উৎপন্ন না করায় উহা তাঁহার জন্মান্তরের নিষ্পাদক হইয়া মুক্তির প্রতিবন্ধক হয় না। কারণ, তাঁহার পুনর্জ্জন্ম লাভের মূল কারণ মিথ্যাজ্ঞান চিরকালের জন্য বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। ন্যায়দর্শনের "দুঃখজন্ম" ইত্যাদি দ্বিতীয় সূত্রে পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত ব্যক্ত হইয়াছে। সেখানেই ভাষ্যটিপ্পনীতে উক্ত বিষয়ে অনেক কথা লিখিত হইয়াছে। বৃত্তিকার বিশ্বনাথ প্রভৃতি সেখানে তত্ত্বজ্ঞানীর যে, উৎকট রাগাদিই জন্মে না, এইরূপই তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়াছেন। এখানেও সূত্রে ও ভাষ্যাদিতে "রাগাদি" শব্দের দ্বারা উৎকট অর্থাৎ মুক্তির প্রতিবন্ধক রাগাদিই বিবক্ষিত, বুঝিতে হইবে। মূলকথা, মুক্তির প্রতিবন্ধক বা পুনর্জ্জন্মের নিষ্পাদক উৎকট রাগাদি অনাদি হইলেও তত্ত্বজ্ঞান-জন্য উহার মূল কারণ মিথ্যাজ্ঞানের অত্যন্ত উচ্ছেদবশতঃ আর উহা জন্মে না, জন্মিতেই পারে না। সুতরাং মুক্তি সম্ভব হওয়ায় "ক্লেশানুবন্ধবশতঃ মুক্তি অসম্ভব", এই পূর্ব্বোক্ত পূর্ব্বপক্ষ নিরস্ত হইয়াছে। আর কোনরূপেই উক্ত পূর্ব্বপক্ষের সমর্থন করা যায় না।

মহর্ষি গোতম ক্রমানুসারে তাঁহার কথিত চরম প্রমেয় অপবর্গের পরীক্ষা করিতে পূর্ব্বোক্ত "ঋণক্লেশ" ইত্যাদি-(৫৮ম)-সূত্রোক্ত পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডন করিয়া, অপবর্গ যে সম্ভাবিত, অর্থাৎ উহা অসম্ভব নহে, ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। কারণ, সম্ভাবিত পক্ষই হেতুর দ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে। যাহা অসম্ভব, তাহা কোন হেতুর দ্বারাই সিদ্ধ হইতে পারে না। মহর্ষি এই জন্য দ্বিতীয় অধ্যায়ে

বেদের প্রামাণ্য সমর্থন করিতেও প্রথমে বেদের প্রামাণ্য যে সম্ভাবিত, ইহা সমর্থন করিয়াছেন। এ বিষয়ে শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্রের উদ্ধৃত প্রাচীন কারিকা ও উহার তাৎপর্য্যাদি দ্বিতীয় খণ্ডে (৩৪৯ পৃষ্ঠায়) লিখিত হইয়াছে। কিন্তু মহর্ষি দ্বিতীয় অধ্যায়ে পরে (১ম আঃ, শেষ সূত্রে) যেমন বেদের প্রামাণ্য বিষয়ে অনুমান-প্রমাণও প্রদর্শন করিয়াছেন, তদ্রূপ এখানে অপবর্গ বিষয়ে কোন প্রমাণ প্রদর্শন করেন নাই। অপবর্গ অসম্ভব না হইলেও উহার অস্তিত্ব বিষয়ে প্রমাণ ব্যতীত উহা সিদ্ধ হইতে পারে না। নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ের পূর্ব্বাচার্য্যগণ এই জন্যই অপবর্গ বিষয়ে প্রথমে অনুমান-প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া, পরে শ্রুতিপ্রমাণও প্রদর্শন করিয়াছেন। পূর্ব্বাচার্য্যগণের সেই অনুমান-প্রয়োগ "কিরণাবলী" গ্রন্থের প্রথমে ন্যায়াচার্য্য উদয়ন প্রকাশ করিয়াছেন[১]। মুক্তির অস্তিত্ব বিষয়ে তাঁহাদিগের যুক্তি এই যে, দুঃখের পরে দুঃখ, তাহার পরে দুঃখ, এইরূপে অনাদি কাল হইতে দুঃখের যে সন্ততি বা প্রবাহ উৎপন্ন হইতেছে, উহার এক সময়ে অত্যন্ত উচ্ছেদ অবশ্যম্ভাবী। কারণ, উহাতে সন্ততিত্ব আছে। যাহা সন্ততি, তাহার এক সময়ে অত্যন্ত উচ্ছেদ হয়, ইহার দৃষ্টান্ত—প্রদীপ-সন্ততি। প্রদীপের এক শিখার পরে অন্য শিখার উৎপত্তি, তাহার পরে অন্য শিখার উৎপত্তি, এইরূপে ক্রমিক যে শিখা-সন্ততি জন্মে, তাহার এক সময়ে অত্যন্ত উচ্ছেদ হয়। চরম শিখার ধ্বংস হইলেই ঐ প্রদীপের নির্ব্বাণ হয় ; ঐ প্রদীপসন্ততির আর কখনই উৎপত্তি হয় না। সুতরাং ঐ দৃষ্টান্তে "সন্ততিত্ব" হেতুর দ্বারা দুঃখসন্ততিরূপ ধর্ম্মীতে অত্যন্ত উচ্ছেদ সিদ্ধ হইলে মুক্তিই সিদ্ধ হয়। কারণ, দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই মুক্তি ; পূর্ব্বোক্তরূপ অনুমান-প্রমাণের দ্বারা উহা সিদ্ধ হয়। বৈশেষিকাচার্য্য শ্রীধর ভট্টও "ন্যায়কন্দলী"র প্রথমে মুক্তির স্বরূপ বিচার করিতে মুক্তি বিষয়ে উক্ত অনুমান প্রদর্শন করিয়া, উহা যে নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ের অনুমান, ইহা বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি পার্থিব পরমাণুর রূপাদি-সন্ততিতে ব্যভিচারবশতঃ উক্ত অনুমানের প্রামাণ্য স্বীকার করেন নাই[২]। তাঁহার নিজ মতে "অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ"

১। কিং পুনরত্র প্রমাণং ? দুঃখসন্ততিরত্যন্তমুচ্ছিদ্যতে, সন্ততিত্বাৎ প্রদীপসন্ততিবদিত্যাচার্য্যাঃ"। কিরণাবলী।

২। পার্থিব পরমাণুর রূপাদিরও অনাদি কাল হইতে ক্রমিক উৎপত্তি ও বিনাশ হইতেছে, সুতরাং ঐ রূপাদি সন্ততিতেও সন্ততিত্ব হেতু আছে। কিন্তু উহার কোন সময়েই অত্যন্ত উচ্ছেদ হয় না। কারণ, তাহা হইলে তখন হইতে সৃষ্টি-লোপ হয়। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত অনুমানের হেতু ব্যভিচারী হওয়ায় উহা মুক্তি বিষয়ে প্রমাণ হইতে পারে না, ইহাই শ্রীধরভট্টের তাৎপর্য্য। কিন্তু উদয়নাচার্য্য উক্ত অনুমান প্রদর্শনের পরেই পূর্ব্বোক্ত ব্যভিচার-দোষের উল্লেখ করিয়া, উহার খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, পার্থিব পরমাণুর রূপাদি সন্ততিও ফলতঃ উক্ত অনুমানের পক্ষে অন্তর্ভূত হইয়াছে। অর্থাৎ উক্ত অনুমানের দ্বারা ঐ রূপাদি-সন্ততিরও অত্যন্ত উচ্ছেদ সিদ্ধ করিব। পক্ষে ব্যভিচার দোষ হয় না। শ্রীধর ভট্ট এই কথার কোন প্রতিবাদ না করায় তিনি উদয়নের পূর্ব্ববর্ত্তী, ইহা অনেকে অনুমান করেন। বস্তুতঃ উদয়ন ও শ্রীধর সমকালীন ব্যক্তি। কিন্তু উদয়ন মৈথিল, শ্রীধর বঙ্গীয়। উদয়ন পূর্ব্বেই "কিরণাবলী" রচনা করিয়াছেন। পরে শ্রীধর "ন্যায়কন্দলী" রচনা করিয়াছেন। "ন্যায়কন্দলী"র রচনার কিছু পূর্ব্বে "কিরণাবলী" রচিত হওয়ায় তখন উহার সর্ব্বত্র প্রচার হয় নাই। সুতরাং শ্রীধর, উদয়নের ঐ গ্রন্থ দেখিতে না পাওয়ায় উদয়নের পূর্ব্বোক্ত কথার প্রতিবাদ করেন নাই, ইহাও বুঝা যাইতে পারে।

ইত্যাদি শ্রুতিই মুক্তি বিষয়ে প্রমাণ, অর্থাৎ তাঁহার মতে মুক্তি বিষয়ে শ্রুতি ভিন্ন আর কোন প্রমাণ নাই, ইহা তিনি সেখানে স্পষ্ট বলিয়াছেন।

ইহাঁদিগের পরবর্ত্তী নব্যনৈয়ায়িকগুরু গঙ্গেশ উপাধ্যায় তাঁহার "তত্ত্বচিন্তামণি"র অন্তর্গত "ঈশ্বরানুমানচিন্তামণি" ও "মুক্তিবাদে" মুক্তি বিষয়ে নব্যভাবে অনুমান প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া, পরে শ্রুতিপ্রমাণও প্রদর্শন করিয়াছেন[1]। কিন্তু তিনি পরে "আচার্য্যাস্তু 'অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ' ইতি শ্রুতিস্তত্র প্রমাণং" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা উদয়নাচার্য্যের নিজ মতে যে, উক্ত শ্রুতিই মুক্তি বিষয়ে প্রমাণ, ইহা বলিয়া, উদয়নাচার্য্যের মতানুসারে উক্ত শ্রুতিবাক্যের অর্থ বিচার করিয়াছেন। তিনি সেখানে উদয়নাচার্য্যের "কিরণাবলী" গ্রন্থোক্ত কথারই উল্লেখ করায় তিনি যে উহা উদয়নাচার্য্যের মত বলিয়াই বুঝিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা বুঝা যায়। ফলকথা, শ্রীধর ভট্টের ন্যায় উদয়নাচার্য্যও যে মুক্তি বিষয়ে শ্রুতিকেই প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা আমরা পূর্ব্বোক্ত গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের সন্দর্ভের দ্বারা বুঝিতে পারি। পরবর্ত্তী নব্যনৈয়ায়িক গদাধর ভট্টাচার্য্যও তাঁহার "মুক্তিবাদ" গ্রন্থে মুক্তি বিষয়ে প্রমাণাদি বলিতে গঙ্গেশ উপাধ্যায়েরই অনেক কথার উল্লেখ করিয়াছেন। তিনিও শেষে মুক্তি বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন। ফলকথা, নব্যনৈয়ায়িক গঙ্গেশ প্রভৃতির চরম মতেও যে, মুক্তি বিষয়ে শ্রুতিই মুখ্য প্রমাণ বা একমাত্র প্রমাণ, ইহা তাঁহাদিগের গ্রন্থের দ্বারা বুঝা যায়। সুপ্রাচীন ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও পূর্ব্বোক্ত ৫৯ম সূত্রের ভাষ্যে শেষে মুক্তিপ্রতিপাদক যে সমস্ত শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তিনিও যে সন্ন্যাসাশ্রমের ন্যায় মুক্তির অস্তিত্বও প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন, ইহাও অবশ্য বুঝা যায়। বস্তুতঃ উপনিষদে মুক্তিপ্রতিপাদক আরও অনেক শ্রুতিবাক্য আছে[2], যদ্দ্বারা মুক্তি পদার্থ যে সুচির-প্রসিদ্ধ তত্ত্ব এবং উহাই পরমপুরুষার্থ, ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়।

পরন্তু বেদের মন্ত্রভাগেও পরমপুরুষার্থ মুক্তির সংবাদ পাওয়া যায়। ঋগ্‌বেদসংহিতা ও যজুর্ব্বেদসংহিতায় "ত্র্যম্বকং যজামহে" ইত্যাদি সুপ্রসিদ্ধ[3] মন্ত্রের শেষে "মৃত্যোর্ম্মুক্ষীয় মামৃতাৎ"

১। "প্রমাণন্তু দুঃখত্বং দেবদত্তদুঃখত্বং বা স্বাশ্রয়াসমানকালীনধ্বংসপ্রতিযোগিবৃত্তি, কার্য মাত্রবৃত্তিধর্ম্মত্বাৎ সন্ততিত্ববৎ, এতৎ প্রদীপত্ববৎ। সন্ততিত্বঞ্চ নানাকালীনকার্যমাত্রবৃত্তিধর্ম্মত্বং"। 'আত্মা জ্ঞাতব্যো ন স পুনরাবর্ত্ততে ইতি শ্রুতিশ্চ প্রমাণং" ।—ঈশ্বরানুমানচিন্তামণি।

২। "তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়"—ইত্যাদি। "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিঃ" ইত্যাদি। মুণ্ডক (৩.১.৩) ২২.৮) "নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে"। কঠ। ৩১৫। 'তমেবং জ্ঞাত্বা মৃত্যুপাশাংশ্ছিনত্তি। শ্বেতাশ্বতর। ৪.১৫। 'তরতি শোকমাত্মবিৎ"। "অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ"। ছান্দোগ্য (৭।১।৩) ৮ ১২।১)। "তমেব বিদিত্বাহতিমৃত্যুমেতি"। শ্বেতাশ্বতর। ৩.৮। য এতদ্বিদুরমৃতাস্তে ভবন্তি। বৃহদারণ্যক। ৪ ৪ ১৪। "দুঃখনান্তং বিমুক্তশ্চরতি" ইত্যাদি।

৩। "ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্দ্ধনং। উর্ব্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্ম্মুক্ষীয় মামৃতাৎ"। [ঋগ্বেদসংহিতা, ৭ম মণ্ডল, ৫ম অষ্টক, চতুর্থ অ:, ৫৯ম সূক্ত, ১২শ মন্ত্র]

ত্রয়াণাং ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাণামম্বকং পিতরং যজামহে ইতি শিবাসমাহিতো বশিষ্ঠো ব্রবীতি। কিং বিশিষ্টমিত্যাত আহ "সুগন্ধিং" প্রসারিতপুণ্যকীর্ত্তিং। পুনঃ কিংবিশিষ্টং ? "পুষ্টিবর্দ্ধনং" জগদ্বীজং উরুশক্তিমিত্যর্থঃ, উপাসকস্য

এই বাক্যের দ্বারা মুক্তি যে পরমপুরুষার্থ, ইহা বুঝা যায়। কারণ, উক্ত বাক্যের দ্বারা মৃত্যু হইতে মুক্তির প্রার্থনা প্রকটিত হইয়াছে। ভাষ্যকার সায়নাচার্য্য পরে উক্ত মন্ত্রের শেষোক্ত "অমৃত" শব্দের অন্যরূপ অর্থের ব্যাখ্যা করিলেও তাঁহার প্রথমোক্ত ব্যাখ্যায় "মৃত্যোর্ম্মুক্ষীয় মামৃতাৎ" এই বাক্যের দ্বারা সাযুজ্য মুক্তিই যে উক্ত মন্ত্রে চরম প্রার্থ্য, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। "শতপথব্রাহ্মণে"র দ্বিতীয় অধ্যায়েও উক্ত মন্ত্র ও উহার ঐরূপ ব্যাখ্যা দেখা যায়। বস্তুতঃ পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রের শেষোক্ত "অমৃত" শব্দের মুক্তি অর্থই ঐ স্থলে গ্রহণ করিলে, ঐ বাক্যের দ্বারা "মৃত্যু হইতে মুক্ত হইব, অমৃত অর্থাৎ মুক্তি হইতে মুক্ত (পরিত্যক্ত) হইব না" এইরূপ অর্থও বুঝা যায়। বেদাদি শাস্ত্রে ক্লীবলিঙ্গ "অমৃত" শব্দ ও "অমৃতত্ব" শব্দ মুক্তি অর্থেও প্রযুক্ত আছে। মুক্ত অর্থে পুংলিঙ্গ "অমৃত" শব্দেরও প্রয়োগ আছে। কিন্তু উক্ত মন্ত্রের শেষে "জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্ব্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে" এই ভগবদ্গীতা(১৪।২০)বাক্যের ন্যায় মুক্তিবোধক ক্লীবলিঙ্গ "অমৃত"শব্দেরই যে, প্রয়োগ হইয়াছে, ইহা প্রণিধান করিলেই বুঝা যায়। অবশ্য শাস্ত্রে পরমপুরুষার্থ মুক্তিকে যেমন "অমৃতত্ব" বলা হইয়াছে, তদ্রূপ ব্রহ্মার একদিন (সহস্র চতুর্যুগ) পর্য্যন্ত স্বর্গলোকে অবস্থানকেও "অমৃতত্ব" বলা হইয়াছে। উহা ঔপচারিক অমৃতত্ব, উহা মুখ্য অমৃতত্ব অর্থাৎ পরমপুরুষার্থরূপ মুক্তি নহে, বিষ্ণুপুরাণে ইহা স্পষ্ট কথিত হইয়াছে[১]। বিষ্ণুপুরাণের টীকাকার রত্নগর্ভ ভট্ট ও পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী সেখানে ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—"আভূতসংপ্লবং ব্রহ্মাহঃস্থিতিপর্য্যন্তং যৎ স্থানং তদেবামৃতত্বমুপচারাদুচ্যতে"। শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র "সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদী"তে (দ্বিতীয় কারিকার টীকায়) প্রাচীন মীমাংসক সম্প্রদায়বিশেষের সম্মত ঐ অমৃতত্বরূপ মুক্তি যে, প্রকৃত মুক্তি নহে, ইহা সমর্থন করিয়াছেন। কারণ, উহা হইলেও পরে কালবিশেষে পুনরাবৃত্তি হওয়ায় উহাতে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হয় না, সুতরাং উহা মুক্তি নহে। "অপাম সোমমমৃতা অভূম" এই শ্রুতি-বাক্যের দ্বারা যজ্ঞকর্ম্মের যে অমৃতত্বরূপ ফল বুঝা যায়, উহা বিষ্ণুপুরাণোক্ত ঐ ঔপচারিক বা পারিভাষিক অমৃতত্ব। বাচস্পতি মিশ্র ইহা সমর্থন করিতে সেখানে বিষ্ণুপুরাণের ঐ বচনেরই পূর্ব্বার্দ্ধ উদ্ধৃত করিয়াছেন। যজ্ঞাদি কর্ম্মদ্বারা আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ অমৃতত্ব লাভ হয় না ("ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুঃ") ইহা শ্রুতিতে অনেক স্থানে কথিত হইয়াছে। সুতরাং "অপাম সোমমমৃতা অভূম" এই শ্রুতিবাক্যে সোমপায়ী ব্যক্তিকের যে অমৃতত্বপ্রাপ্তিরূপ ফল বলা হইয়াছে, ঐ অমৃতত্ব প্রকৃত মুক্তি নহে। উহা বিষ্ণুপুরাণোক্ত গৌণ অমৃতত্ব, ইহাই সেখানে বাচস্পতি মিশ্রের কথা। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রের সর্ব্বশেষে ক্লীবলিঙ্গ "অমৃত" শব্দ ("অমৃতত্ব" শব্দ নহে) প্রযুক্ত হওয়ায় এবং উহার পূর্ব্বে "বন্ধন" শব্দ, "মৃত্যু" শব্দ এবং "মুচ" ধাতু প্রযুক্ত হওয়ায় ঐ অমৃত

বর্দ্ধনং অণিমাদিশক্তিবর্দ্ধনং, অতস্ত্বৎপ্রসাদাদেব মৃত্যোর্ম্মরণাৎ সংসারাদ্বা মুক্ষীয় মোচয়, যথা বন্ধনাদুর্ব্বারুকং কর্কটীফলং মুচ্যতে তদ্বন্মরণাৎ সংসারাদ্বা মোচয়, কিং মর্যাদীকৃত্য, অমৃতাৎ সাযুজ্যমোক্ষপর্য্যন্তমিত্যর্থঃ।—সায়ণভাষ্য।

১। "আভূতসংপ্লবং স্থানমমৃতত্বং হি ভ যাতে।
ত্রৈলোক্যস্থিতিকালোঽয়মপুনর্ম্মার উচ্যতে॥"
—বিষ্ণুপুরাণ, দ্বিতীয় অংশ, ৫ম অঃ, ১৬শ শ্লোক॥

শব্দ যে প্রকৃত মুক্তি অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে, এই বিষয়ে সন্দেহ হয় না। সায়নাচার্য্য উক্ত মন্ত্রের শেষে "আঽমৃতাৎ" এইরূপ বাক্য বুঝিয়া, উহার দ্বারা "অমৃত" অর্থাৎ সাযুজ্য মুক্তি পর্য্যন্ত, এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার উক্ত ব্যাখ্যায় "মুক্ষীয়ং" এইরূপ ক্রিয়াপদই তাঁহার অভিপ্রেত বুঝা যায়। পূর্ব্বে তাঁহার ব্যাখ্যা উদ্ধৃত হইয়াছে। মূলকথা, পূর্ব্বোক্ত মুক্তি যে বেদসিদ্ধ তত্ত্ব, উহা যে পরে ক্রমশঃ ভারতীয় দার্শনিক ঋষিগণের চিন্তাপ্রসূত কোন সিদ্ধান্ত নহে, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য।

পূর্ব্বোক্ত মুক্তি ভারতীয় সমস্ত দার্শনিকগণেরই স্বীকৃত পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনে মহর্ষি জৈমিনি সকাম অধিকারিবিশেষের জন্য বেদের কর্ম্মকাণ্ডের ব্যাখ্যা করিতে তদনুসারে যজ্ঞাদি কর্ম্মজন্য যে স্বর্গফলের উল্লেখ করিয়াছেন, উহা তিনি মুক্তি বলিয়া উল্লেখ না করিলেও প্রাচীন মীমাংসক-সম্প্রদায় তাঁহার সূত্রানুসারে স্বর্গবিশেষকেই পরমপুরুষার্থ বলিয়া সমর্থন করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মতে উহাই মুক্তি। উহা হইলে আর পুনরাবৃত্তি হয় না। "অপাম সোমমমৃতা অভূম" ইত্যাদি শ্রুতিই উক্ত বিষয়ে তাঁহারা প্রমাণ বলিয়াছিলেন। "সাংখ্যতত্ত্ব-কৌমুদী"তে শ্রীমদ্বাচস্পতি মিশ্র উক্ত প্রাচীন মীমাংসক মতেরই খণ্ডন করিয়াছেন। কিন্তু মহর্ষি জৈমিনি মীমাংসাদর্শনে বেদের কর্ম্মকাণ্ডেরই ব্যাখ্যা করায় জ্ঞানকাণ্ডোক্ত তত্ত্বজ্ঞানসাধ্য মুক্তির কথা তাহাতে বলেন নাই। বেদের জ্ঞানকাণ্ডকে অপ্রমাণ বলিয়া অথবা উহার অন্যরূপ তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া, উপনিষদুক্ত তত্ত্বজ্ঞান ও মুক্তির অপলাপ করা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে, তাহা সম্ভবও নহে। পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনে "আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাৎ" ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা বেদের মন্ত্রভাগ এবং যজ্ঞাদি কর্ম্মের বিধায়ক ও ইতিকর্ত্তব্যতাদি-বোধক ব্রাহ্মণভাগকেই তিনি ক্রিয়ার্থক বলিয়াছেন, ইহাই আমাদিগের বিশ্বাস। কারণ, বেদের ঐ সমস্ত অংশই তাঁহার ব্যাখ্যেয়। সুতরাং তিনি ঐ সূত্রে "আম্নায়" শব্দের দ্বারা উপনিষৎকে গ্রহণ করেন নাই, ইহা বুঝা যায়। কিন্তু তিনিও যে নিষ্কাম তত্ত্বজিজ্ঞাসু বা মুমুক্ষু অধিকারিবিশেষের পক্ষে উপনিষদুক্ত তত্ত্বজ্ঞান ও মুক্তি স্বীকার করিতেন, এই বিষয়ে সংশয় হয় না। কারণ, বেদান্তদর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের তৃতীয় ও চতুর্থ পাদে মহর্ষি বাদরায়ণ উপনিষদের শ্রুতিবাক্যানুসারে মুক্ত পুরুষের অবস্থার বর্ণন করিতে কোন বিষয়ে জৈমিনির মতেরও সসম্ভ্রমে উল্লেখ করিয়াছেন; পরে তাহা লিখিত হইবে। মহর্ষি জৈমিনি উপনিষদের প্রামাণ্য অস্বীকার করিয়া স্বর্গ ভিন্ন মুক্তি পদার্থ অস্বীকার করিলে বেদান্তদর্শনে বাদরায়ণের ঐ সমস্ত সূত্রের উপপত্তি হয় না। তিনি যে সেখানে অপ্রসিদ্ধ অন্য কোন জৈমিনির মতেরই উল্লেখ করিয়াছেন, এইরূপ কল্পনায় কোন প্রমাণ নাই। পরন্তু পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনের বার্ত্তিককার বিশ্ববিখ্যাত মীমাংসাচার্য্য ভট্ট কুমারিল স্বর্গভিন্ন মুক্তির স্বরূপ ও কারণাদি বলিয়া গিয়াছেন (শ্লোক-বার্ত্তিক, সম্বন্ধাক্ষেপ-পরিহার প্রকরণ, ১০০—১১০ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। মীমাংসাচার্য্য গুরু প্রভাকরও স্বর্গভিন্ন মুক্তির স্বরূপাদি বলিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী মীমাংসাচার্য্য পার্থসারথি মিশ্র "শাস্ত্র-দীপিকা"র তর্কপাদে স্বর্গভিন্ন মুক্তির স্বরূপাদি বিচার করিয়াছেন। তাঁহার কথা পরে লিখিত হইবে। তাঁহার মতে মুক্তির ন্যায় বৈশেষিক শাস্ত্রসম্মত দ্রব্যাদি পদার্থ এবং ঈশ্বরও মীমাংসা-শাস্ত্রের সম্মত, ইহাও তিনি বলিয়াছেন। বস্তুতঃ প্রাচীন মীমাংসকসম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকে জগৎকর্ত্তা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর স্বীকার না করিলেও পরবর্ত্তী অনেক

মীমাংসাচার্য্য ঐরূপ ঈশ্বরও স্বীকার করিয়াছেন। বেদান্তদর্শনে উল্লিখিত মহর্ষি জৈমিনির কোন কোন মতের পর্য্যালোচনা করিলেও মহর্ষি জৈমিনিও যে, উহা স্বীকার করিতেন, ইহা বুঝা যায়। নব্য মীমাংসাচার্য্য আপোদেব তাঁহার "ন্যায়প্রকাশ" গ্রন্থে ধর্ম্মের স্বরূপাদি ব্যাখ্যা করিয়া সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্ম যদি শ্রীগোবিন্দে অর্পণ-বুদ্ধি-প্রযুক্ত অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে মুক্তির প্রযোজক হয়। শ্রীগোবিন্দে অর্পণ-বুদ্ধিপ্রযুক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানে যে প্রমাণ নাই, ইহা বলা যায় না। কারণ, "যৎ করোসি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ। যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণং॥" এই ভগবদ্গীতারূপ স্মৃতি আছে। ঐ স্মৃতির মূলভূত শ্রুতির অনুমান করিয়া, তাহার প্রামাণ্যবশতঃ উহারও প্রামাণ্য নিশ্চয় করা যায়। বস্তুতঃ ভগবদ্গীতা প্রভৃতি নানা শাস্ত্রে ঐরূপ আরও অনেক প্রমাণ আছে। সুতরাং তদনুসারে পূর্ব্বোক্তরূপ সিদ্ধান্ত আস্তিকমাত্রেরই স্বীকার্য্য। তাই নব্য মীমাংসকগণ পরে বিশেষ বিচারপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। "শ্লোকবার্ত্তিকে" ভট্ট কুমারিল জগৎকর্ত্তা সর্ব্বজ্ঞ পুরুষের অস্তিত্ব খণ্ডন করিলেও এখন কেহ কেহ তাঁহার মতেও ঐরূপ ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে, ইহা প্রবন্ধ লিখিয়া সমর্থন করিতেছেন। সে যাহাই হউক, মূলকথা আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ মুক্তি ভারতীয় সমস্ত দার্শনিকেরই স্বীকৃত। যাঁহারা যজ্ঞাদি কর্ম্মজন্য স্বর্গবিশেষকেই পরমপুরুষার্থ বলিয়াছেন, তাঁহাদিগের মতেও উহাই মুক্তি। নাস্তিকশিরোমণি চার্ব্বাকের মতেও মুক্তির অস্তিত্ব আছে। "সর্ব্বসিদ্ধান্তসংগ্রহে" চার্ব্বাক মতের বর্ণনায় শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন,—"মোক্ষস্তু মরণং তচ্চ প্রাণবায়ুনিবর্ত্তনং"। কারণ, চার্ব্বাক মতে দেহ ভিন্ন নিত্য আত্মার অস্তিত্ব না থাকায় জীবের মৃত্যু হইলে আর পুনর্জ্জন্মের সম্ভাবনাই থাকে না। সুতরাং মৃত্যুর পরে সকল জীবেরই আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হওয়ায় সকলেরই মুক্তি হইয়া থাকে। এইরূপ জৈন ও বৌদ্ধ প্রভৃতি নাস্তিকসম্প্রদায়ও মুক্তিকেই পরমপুরুষার্থ বলিয়া স্বীকার করিয়া নিজ নিজ মতানুসারে উহার স্বরূপ-ব্যাখ্যা ও কারণাদি বিচার করিয়াছেন। সকল মতেই মুক্তি হইলে আর জন্ম হয় না। সুতরাং মুক্ত আত্মার আর কখনও দুঃখ জন্মে না। সুতরাং আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ মুক্তি-বিষয়ে কাহারও বিবাদ নাই। তাই মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য তাঁহার "কিরণাবলী" টীকায় প্রথমে মুক্তি বিচার প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন, "নিঃশ্রেয়সং পুনর্দুঃখনিবৃত্তি-রাত্যন্তিকী, অত্রচ বাদিনামবিবাদ এব।" মুক্তি হইলে আর কখনও দুঃখ জন্মে না, সুতরাং তখন আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হয়, এ বিষয়ে কোন সম্প্রদায়ের বিবাদ না থাকিলেও ঐ দুঃখনিবৃত্তি কি দুঃখের প্রাগভাব অথবা দুঃখের ধ্বংস অথবা দুঃখের অত্যন্তাভাব, এ বিষয়ে বিবাদ আছে এবং ঐ দুঃখনিবৃত্তির সহিত তখন আত্যন্তিক সুখ বা নিত্যসুখের অভিব্যক্তি হয় কি না, এ বিষয়েও বিবাদ বা মতভেদ আছে। এখন আমরা ক্রমশঃ উক্ত মতভেদের আলোচনা করিব। কোন কোন সম্প্রদায়ের মত এই যে, দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি বলিতে দুঃখের আত্যন্তিক প্রাগভাব ; উহাই মুক্তি। কারণ, "আমার আর কখনও দুঃখ না হউক" এই উদ্দেশ্যেই মুমুক্ষু ব্যক্তি মোক্ষার্থ অনুষ্ঠান করেন। সুতরাং পুনর্ব্বার দুঃখের অনুৎপত্তিই তাঁহার কাম্য। উহা ভবিষ্যৎ দুঃখের অভাব, সুতরাং প্রাগভাব। ভবিষ্যৎ দুঃখ উৎপন্ন না হইলে তাহার ধ্বংস

হইতে পারে না এবং উহার প্রাগভাব থাকিলে অত্যন্তাভাবও বলা যায় না। সুতরাং দুঃখের ঐ প্রাগভাবই মুক্তি। পরন্ত ন্যায়দর্শনের "দুঃখজন্ম" ইত্যাদি দ্বিতীয় সূত্রের দ্বারা মিথ্যা-জ্ঞানাদির নিবৃত্তিবশতঃ দুঃখের অপায় বা নিবৃত্তি যাহা মুক্তি বলিয়া কথিত হইয়াছে, তাহা যে দুঃখের প্রাগভাব, ইহাই উক্ত সূত্রার্থ পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায়। অবশ্য প্রাগভাব অনাদি পদার্থ, সুতরাং উহার উৎপত্তি না থাকায় জন্য বা সাধ্য পদার্থ নহে। কিন্তু মুক্তি তত্ত্বজ্ঞান-সাধ্য পদার্থ, সুতরাং উহা প্রাগভাব বলা যায় না, ইহা অন্য সম্প্রদায় বলিয়াছেন। কিন্তু উক্ত মতবাদিগণ বলিয়াছেন যে, তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা দুঃখের কারণের উচ্ছেদ হইলে আর কখনও দুঃখ জন্মিবে না। তখন হইতে চিরকালই দুঃখের প্রাগভাব থাকিয়া যাইবে, দুঃখের উৎপত্তি না হওয়ায় কখনও ঐ প্রাগভাব নষ্ট হইবে না, সুতরাং উহাতেও তত্ত্বজ্ঞানসাধ্যতা আছে। তত্ত্বজ্ঞান হইলেই যাহা রক্ষিত হইবে অর্থাৎ যাহার আর বিনাশ হইবে না, তাহাতেও ঐরূপ তত্ত্বজ্ঞানসাধ্যতা থাকায় তাহা পুরুষার্থও হইতে পারে। তাহার জন্য অনুষ্ঠানও সম্ভব হইতে পারে। কারণ, তত্ত্বজ্ঞান না হওয়া পর্য্যন্ত দুঃখের উৎপত্তি হইবেই, তাহা হইলে সেই দুঃখের প্রাগভাবও বিনষ্ট হইয়া যাইবে। দুঃখের প্রাগভাবকে চিরকালের জন্য রক্ষা করিতে হইলে দুঃখের উৎপত্তিকে রুদ্ধ করা আবশ্যক। তাহা করিতে হইলে জন্মের নিরোধ করা আবশ্যক। উহা করিতে হইলে ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ প্রবৃত্তির ধ্বংস ও পুনর্ব্বার অনুৎপত্তি আবশ্যক। উহাতে মিথ্যা-জ্ঞানের বিনাশ আবশ্যক। তাহাতে তত্ত্বজ্ঞান আবশ্যক। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত দুঃখপ্রাগভাবরূপ মুক্তিও পূর্ব্বোক্তরূপে তত্ত্বজ্ঞানসাধ্য। মীমাংসাচার্য্যগণ ঐরূপ সাধ্যতাকে "ক্ষৈমিক সাধ্যতা" বলিয়াছেন। "ক্ষেমস্তু স্থিতরক্ষণং"; যাহা আছে, তাহার রক্ষার নাম "ক্ষেম"। তত্ত্বজ্ঞানের পরে প্রারব্ধ কর্ম্মের বিনাশ হইলে তখন হইতে দুঃখের যে প্রাগভাব থাকিবে, তাহার রক্ষাই ক্ষেম, এবং ঐ প্রাগভাবই মুক্তি, উহাই আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি।

নব্যনৈয়ায়িকগুরু গঙ্গেশ উপাধ্যায় "ঈশ্বরানুমানচিন্তামণি"র শেষে মুক্তিবিচারপ্রসঙ্গে উক্ত মতকে মীমাংসাচার্য্য প্রভাকর গুরুর মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি উক্ত মত সমর্থন করিয়াও শেষে উহার খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, দুঃখের প্রাগভাব পূর্ব্বোক্তরূপে তত্ত্বজ্ঞানসাধ্য হইলেও প্রাগভাবের যখন প্রতিযোগিজনকত্ব নিয়ম আছে, তখন মুক্ত পুরুষেরও পুনর্ব্বার দুঃখোৎ-পত্তি স্বীকার করিতে হইবে। অর্থাৎ দুঃখের প্রাগভাবের প্রতিযোগী দুঃখ। কিন্তু কোন কালে ঐ দুঃখ না জন্মিলে, তাহার প্রাগভাব থাকিতে পারে না। প্রাগভাব তাহার প্রতিযোগীর জনক। প্রাগভাব থাকিলে অবশ্যই কোন কালে তাহার প্রতিযোগী জন্মিবে। সুতরাং মুক্ত পুরুষের দুঃখের প্রাগভাব থাকিলে তাঁহারও কোন কালে দুঃখ জন্মিবেই। নচেৎ তাঁহার সেই দুঃখের অভাবকে প্রাগভাবই বলা যায় না। কিন্তু মুক্ত পুরুষেরও আবার কখনও দুঃখ জন্মিলে তাঁহাকে কেহই মুক্ত বলিতে পারেন না। যদি বলা যায় যে, দুঃখের কারণ অধর্ম্ম ও শরীরাদি না থাকায় মুক্ত পুরুষের আর কখনও দুঃখ জন্মিতে পারে না। কিন্তু তাহা হইলে তাঁহার সেই দুঃখের অভাব যেমন অনাদি, তদ্রূপ নিরবধি বা অনন্ত হওয়ায় উহা অত্যন্তাভাবই হইয়া পড়ে, উহার প্রাগভাবত্ব থাকে না,

উহা নিত্য হওয়ায় অত্যন্তাভাবই হয়। সুতরাং উহাতে বিনশ্বরজাতীয়ত্ব না থাকায় উহার পূর্ব্বোক্তরূপে সাধ্যতাও সম্ভব হয় না। নব্যনৈয়ায়িক গদাধর ভট্টাচার্য্যও তাঁহার নব মুক্তিবাদ গ্রন্থে উক্ত মতের উল্লেখ করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। তিনিও বলিয়াছেন যে, মুক্ত পুরুষের যখন আর কখনও দুঃখ জন্মে না, তখন তাঁহার দুঃখপ্রাগভাব থাকিতে পারে না। কারণ, যে পদার্থ অনাগত বা ভবিষ্যৎ অর্থাৎ পরে যাহার উৎপত্তি অবশ্যই হইবে, তাহারই পূর্ব্ববর্ত্তী অভাবকে প্রাগভাব বলে। যাহা পরে কখনও হইবে না, তাহা প্রাগভাবের প্রতিযোগী হয় না। "আমার দুঃখ না হউক", এইরূপ যে কামনা জন্মে, উহাও উত্তরোত্তর কালের সম্বন্ধবিশিষ্ট দুঃখাত্যন্তাভাববিষয়ক, উহা দুঃখের প্রাগভাববিষয়ক নহে। ঐ অত্যন্তাভাব নিত্য হইলেও উহারও পূর্ব্বোক্তরূপে প্রাগভাবের ন্যায় সাধ্যত্বের কোন বাধক নাই। ফলকথা, গদাধর ভট্টাচার্য্য মুক্ত পুরুষের দুঃখের অত্যন্তাভাব স্বীকার করিয়াছেন। কারণ, তাঁহার মতে দুঃখের ধ্বংস ও প্রাগভাব থাকিলেও দুঃখের অত্যন্তাভাব থাকিতে পারে। তাঁহার মতে ধ্বংস ও প্রাগভাবের সহিত অত্যন্তাভাবের বিরোধিতা নাই। এবং তিনি দুঃখের প্রাগভাবের অভাববিশিষ্ট যে দুঃখের অত্যন্তাভাব, তাহাকেই "আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি" বলিয়া মুক্তির স্বরূপ বলিতেও কোন আপত্তি প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু তিনি পূর্ব্বোক্ত প্রভাকর মত স্বীকার করেন নাই। এবং নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ের মধ্যে আর কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারও যে উক্ত মত স্বীকার করিয়াছেন, ইহাও জানা যায় না। কিন্তু বৈশেষিকাচার্য্য মহামনীষী শঙ্করমিশ্র বৈশেষিকদর্শনের চতুর্থ সূত্রের উপস্কারে পূর্ব্বোক্ত মতই সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার মতে আত্মার অশেষ বিশেষ-গুণের ধ্বংসাবধি দুঃখপ্রাগভাবই আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি, উহাই মুক্তি। মুক্তি হইলে তখন আত্মার অদৃষ্টাদি সমস্ত বিশেষ গুণেরই ধ্বংস হয় এবং আর কখনও দুঃখ জন্মে না। সুতরাং আত্মার তৎকালীন যে দুঃখপ্রাগভাব, তাহাকে মুক্তি বলা যাইতে পারে এবং উহা পূর্ব্বোক্তরূপে তত্ত্বজ্ঞানসাধ্য হওয়ায় পুরুষার্থও হইতে পারে। মুক্ত পুরুষের যখন আর কখনও দুঃখ জন্মে না, তখন তাঁহার দুঃখপ্রাগভাব কিরূপে সম্ভব হইবে? এতদুত্তরে শঙ্করমিশ্র বলিয়াছেন যে, প্রতিযোগীর জনক অভাবই প্রাগভাব। প্রতিযোগীর জনক বলিতে এখানে বুঝিতে হইবে, প্রতিযোগীর স্বরূপযোগ্য। অর্থাৎ প্রতিযোগীর উৎপাদন না করিলেও যাহার উহাতে যোগ্যতা আছে। দুঃখপ্রাগভাবের প্রতিযোগী দুঃখ। কিন্তু উহার উৎপাদনে উহার প্রাগভাব কারণ হইলেও চরম সামগ্রী নহে। অর্থাৎ দুঃখের প্রাগভাব থাকিলেই যে দুঃখ অবশ্য জন্মিবে, তাহা নহে। দুঃখের উৎপত্তিতে আরও অনেক কারণ আছে। সেই সমস্ত কারণ না থাকায় মুক্ত পুরুষের আর দুঃখ জন্মে না। শঙ্করমিশ্র শেষে ন্যায়দর্শনের "দুঃখজন্ম" ইত্যাদি দ্বিতীয় সূত্রটিকে উদ্ধৃত করিয়া বুঝাইয়াছেন যে, ঐ সূত্রের দ্বারাও দুঃখের প্রাগভাবই যে মুক্তি, ইহাই প্রতিপন্ন হয়। কারণ, ঐ সূত্রে জন্মের অপায়প্রযুক্ত যে দুঃখাপায়কে মুক্তি বলা হইয়াছে, তাহা অতীত দুঃখের ধ্বংস হইতে পারে না। কিন্তু ভবিষ্যতে আর কখনও দুঃখের উৎপত্তি না হওয়াই ঐ সূত্রোক্ত দুঃখাপায়, এ বিষয়ে সংশয় নাই। সুতরাং ঐ দুঃখের অনুৎপত্তি যখন ফলতঃ ভবিষ্যৎ দুঃখের অভাব, তখন উহা যে প্রাগভাব, ইহা অবশ্য

স্বীকার্য্য। সুতরাং উক্ত সূত্রানুসারে যে পদার্থ পরে জন্মিবে না, তাহার প্রাগভাবও যে মহর্ষি গোতমের স্বীকৃত, ইহাও স্বীকার্য্য। পরন্তু লোকে সর্প ও কণ্টকাদির যে নিবৃত্তি, তাহার ফলও দুঃখের অনুৎপত্তি অর্থাৎ ভবিষ্যৎ দুঃখের অভাব। কারণ, পথে সর্প বা কণ্টকাদি থাকিলে, তজ্জন্য ভবিষ্যৎ দুঃখনিবৃত্তির উদ্দেশ্যেই লোকে উহার নিবৃত্তির জন্য চেষ্টা করে। সুতরাং সেখানে যেমন দুঃখ না জন্মিলেও দুঃখের প্রাগভাব স্বীকার করিতে হয়, তদ্রূপ মুক্ত পুরুষের ভবিষ্যতে কখনও দুঃখ না জন্মিলেও তাঁহার দুঃখপ্রাগভাব স্বীকার করা যায়। ফলকথা, শঙ্করমিশ্র মীমাংসাচার্য্য প্রভাকরের ন্যায় যে পদার্থ পরে উৎপন্ন হইবে না, তাহারও প্রাগভাব স্বীকার করিয়াছেন। ঐরূপ প্রাগভাব মীমাংসাশাস্ত্রে "পণ্ডপ্রাগভাব" নামে কথিত হইয়াছে। যে প্রাগভাব কখনও তাহার প্রতিযোগী জন্মাইতে পারিবে না, তাহাকে "পণ্ডপ্রাগভাব" বলা যায়। কিন্তু গঙ্গেশ উপাধ্যায় ও গদাধর ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণ ঐরূপ প্রাগভাব স্বীকার করেন নাই। সুতরাং তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত মত গ্রহণ করেন নাই।

কোন সম্প্রদায়ের মতে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি বলিতে দুঃখের আত্যন্তিক অত্যন্তাভাব, উহাই মুক্তি। মুক্ত পুরুষের আর কখনও দুঃখ জন্মিবে না। কারণ, তাঁহার দুঃখের সাধন বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। তৎকালে তাঁহার দুঃখপ্রাগভাবও নাই। সুতরাং তখন তাঁহার দুঃখের প্রাগভাবের অসমানকালীন যে দুঃখধ্বংস, তৎসম্বন্ধে দুঃখের অত্যন্তাভাবকে মুক্তি বলা যাইতে পারে। পরন্তু "দুঃখেনাত্যন্তং বিমুক্তশ্চরতি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা দুঃখের অত্যন্তাভাবই যে মুক্তি, ইহাই বুঝা যায়। শঙ্করমিশ্র পরে উক্ত মতের উল্লেখ করিয়া খণ্ডন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, দুঃখের অত্যন্তাভাব সর্ব্বথা নিত্য পদার্থ, সুতরাং উহা সাধ্য পদার্থ না হওয়ায় পুরুষার্থ হইতে পারে না। পূর্ব্বোক্তরূপ দুঃখধ্বংসও উহার সম্বন্ধ হইতে পারে না। "দুঃখেনাত্যন্তং বিমুক্তশ্চরতি" এই শ্রুতিবাক্যের দ্বারাও দুঃখের আত্যন্তিক প্রাগভাবই অত্যন্তাভাবের সমানরূপে কথিত হইয়াছে, ইহাই তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। "ঈশ্বরানুমানচিন্তামণি" গ্রন্থে গঙ্গেশ উপাধ্যায়ও আরও নানা যুক্তির দ্বারা উক্ত মতের খণ্ডন করিয়াছেন। কোন সম্প্রদায় দুঃখপ্রাগভাবের অসমানকালীন যে দুঃখসাধনধ্বংস, উহাই মুক্তি বলিয়াছেন। "ঈশ্বরানুমানচিন্তামণি" গ্রন্থে গঙ্গেশ উপাধ্যায় বিচারপূর্ব্বক উক্ত মতেরও খণ্ডন করিয়াছেন। এইরূপ উক্ত বিষয়ে আরও অনেক মত ও তাহার খণ্ডন-মণ্ডনাদি নানা গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

গঙ্গেশ উপাধ্যায় প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণের গ্রন্থের দ্বারা তাঁহাদিগের নিজের মত বুঝা যায় যে, আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি বলিতে দুঃখের আত্যন্তিক ধ্বংস, উহাই মুক্তি। দুঃখের আত্যন্তিক ধ্বংস বলিতে যে আত্মার মুক্তি হয়, তাহার দুঃখের অসমানকালীন দুঃখধ্বংস। মুক্তি হইলে আর যখন কখনও দুঃখ জন্মিবে না, তখন মুক্ত আত্মার দুঃখধ্বংস তাঁহার দুঃখের সহিত কখনও সমানকালবৃত্তি হইতেই পারে না। কারণ, তাঁহার ঐ দুঃখধ্বংসের পরে আর কখনও দুঃখের উৎপত্তি না হওয়ায় কখনও দুঃখ ও দুঃখধ্বংস মিলিত হইয়া তাঁহাতে থাকিবে না। সুতরাং ঐরূপ দুঃখধ্বংস তাঁহার দুঃখের অসমানকালীন হওয়ায় উহাকে মুক্তি বলা যায়। সংসারী জীবেরও দুঃখের পরে

দুঃখধ্বংস হইতেছে, কিন্তু তাহার পরে আবার দুঃখও জন্মিতেছে, এবং মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত পুনর্জ্জন্মপরিগ্রহ অবশ্যম্ভাবী বলিয় অন্যান্য জন্মেও তাহার দুঃখ অবশ্য জন্মিবে। সুতরাং সংসারী জীবের যে দুঃখধ্বংস, তাহ তাহার দুঃখের সমানকালীন। কারণ, যে সময়ে তাহার আবার দুঃখ জন্মে, তখনও তাহার পূর্ব্বজাত দুঃখধ্বংস বিদ্যমান থাকায় উহা তাহার দুঃখের সহিত এক সময়ে মিলিত হয়। সুতরাং তাহার ঐরূপ দুঃখধ্বংস মুক্তি হইতে পারে না। মুক্ত পুরুষের পূর্ব্বজাত দুঃখসমূহের অসমানকালীন যে দুঃখধ্বংস, তাহা মুক্তি হইতে পারে। কারণ, উহা সেই আত্মগত-দুঃখের অসমানকালীন দুঃখধ্বংস, উহাই মুক্তির স্বরূপ। এক কথায় চরম দুঃখধ্বংসই মুক্তির স্বরূপ বলা যায় যে দুঃখের পরে আর কখনও দুঃখ জন্মিবে না, সুতরাং সেই দুঃখধ্বংসের পরে আর দুঃখধ্বংসও জন্মিবে না,—সেই দুঃখধ্বংসই চরম দুঃখধ্বংস, উহারই নাম আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি, উহাই মুক্তি। যে আত্মার মুক্তি হয়, তাঁহার ঐ দুঃখধ্বংসে যে তাঁহার দুঃখের অসমানকালীনত্ব, তাহাই ঐ দুঃখধ্বংসের আত্যন্তিকত্ব বা চরমত্ব। তত্ত্বজ্ঞান না হইলে পুনর্জ্জন্ম অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং দুঃখও অবশ্যম্ভাবী, অতএব তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত পূর্ব্বোক্তরূপ চরম দুঃখধ্বংস হইতেই পারে না। সুতরাং উহা তত্ত্বজ্ঞানসাধ্য বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। অবশ্য মুক্ত পুরুষের পূর্ব্বজাত দুঃখসমূহ তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীতও পূর্ব্বেই বিনষ্ট হইয়া যায়। তাঁহার তত্ত্বজ্ঞানের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে কোন দুঃখ জন্মিলে এবং উহার পরে প্রারব্ধ কর্ম্মজন্য দুঃখ জন্মিলে তাহাও ভোগ দ্বারা বিনষ্ট হইয়া যায়। ঐ সমস্ত দুঃখের বিনাশেও তত্ত্বজ্ঞানের কোন অপেক্ষা নাই। সুতরাং পূর্ব্বোক্তরূপ দুঃখধ্বংস তত্ত্বজ্ঞানসাধ্য না হওয়ায় উহাকে মুক্তি বলা যায় না, এইরূপ প্রতিবাদ করিয়া পূর্ব্বপূর্ব্বোক্ত মতাবলম্বী সম্প্রদায় উক্ত মতকে গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু উক্ত মতাবলম্বী নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ের কথা এই যে, তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত পূর্ব্বব্যাখ্যাত চরম দুঃখধ্বংস সম্ভবই হয় না। কারণ, তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে পুনর্জ্জন্মের অবশ্যম্ভাবিতাবশতঃ আবার দুঃখোৎপত্তি অবশ্যই হইবে। তাহা হইলে পূর্ব্বজাত দুঃখধ্বংসকে আর চরমধ্বংস বলা যাইবে না। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত চরম দুঃখধ্বংসকে তত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত বলিতেই হইবে,—উহার চরমত্ব বা আত্যন্তিকত্বই তত্ত্বজ্ঞানপ্রযুক্ত। তাই উহা ঐরূপে তত্ত্বজ্ঞানসাধ্য বলিয়া উহাকে মুক্তি বলা যাইতে পারে। মূলকথা, পূর্ব্বোক্ত আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি যেরূপ দুঃখাভাবই হউক, উহাই পরমপুরুষার্থ, সুতরাং উহাই মুক্তির স্বরূপ, ইহাই ন্যায় ও বৈশেষিকদর্শনের প্রচলিত সিদ্ধান্ত। "অথ ত্রিবিধদুঃখাত্যন্ত-নিবৃত্তিরত্যন্তপুরুষার্থঃ" এই সাংখ্যসূত্রের দ্বারা সাংখ্যমতেও প্রথমে উক্ত সিদ্ধান্তই প্রকটিত হইয়াছে। "হেয়ং দুঃখমনাগতং" এই যোগসূত্রের দ্বারাও উক্ত সিদ্ধান্তই বুঝা যায়।

এখন বিচার্য্য এই যে, মুক্তি হইলে যদি তখন কেবল আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিমাত্রই হয়, তৎকালে কোন সুখবোধ ও ঐ দুঃখনিবৃত্তির বোধও না থাকে, তাহা হইলে তখন ঐ অবস্থা মূর্চ্ছাবস্থার তুল্য হওয়ায় কোন বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরই কাম্য হইতে পারে না। সুতরাং উহার জন্য কোন অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তিও হইতে পারে না। সুতরাং পূর্ব্বোক্তরূপ দুঃখনিবৃত্তিমাত্র পুরুষার্থ হইবে কিরূপে? অনেক সম্প্রদায় পূর্ব্বোক্তরূপ দুঃখনিবৃত্তিমাত্রকে মূর্চ্ছাবস্থার তুল্য বলিয়া পুরুষার্থ বলিয়া

স্বীকার করেন নাই[১]। নব্যনৈয়ায়িকগুরু গঙ্গেশ উপাধ্যায় "ঈশ্বরানুমানচিন্তামণি" গ্রন্থে পূর্ব্বোক্ত কথার অবতারণা করিয়া, তদুত্তরে বলিয়াছেন যে, কেবল দুঃখনিবৃত্তিও স্বতঃ পুরুষার্থ। কারণ, সুখ উদ্দেশ্য না করিয়াও দুঃখভীরু ব্যক্তিদিগের কেবল দুঃখনিবৃত্তির জন্যও প্রবৃত্তি দেখা যায়। দুঃখনিবৃত্তিকালে সুখও হইবে, এই উদ্দেশ্যে দুঃখনিবৃত্তির জন্য সকলে প্রবৃত্ত হয় না। অতএব মুক্তিকালে সুখ নাই বলিয়া যে, তৎকালীন দুঃখনিবৃত্তি পুরুষার্থ হইতে পারে না, ইহা বলা যায় না। তাহা বলিলে সুখের সময়ে ও পূর্ব্বে বা পরে দুঃখের অভাব না থাকায় ঐ সমস্ত সুখও পুরুষার্থ নহে, ইহাও বলিতে পারি। অতএব মুক্তিকালে সুখ না থাকিলেও উহা পুরুষার্থ বা পুরুষের কাম্য হইতে পারে। তৎকালে সুখ নাই, এইরূপ জ্ঞান ঐ দুঃখাভাবরূপ মুক্তির জন্য প্রবৃত্তির প্রতিবন্ধকও হয় না। কারণ, কেবল দুঃখনিবৃত্তিও জীবের কাম্য, তাহার জন্যও প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। পরে ঐ দুঃখনিবৃত্তির জ্ঞান না হইলেও উহা পুরুষার্থ হইতে পারে। কারণ, উহার জ্ঞান কাহারও প্রবৃত্তির প্রযোজক নহে। দুঃখনিবৃত্তিই উদ্দেশ্য হইলে উহাই সেখানে প্রবৃত্তির প্রযোজক হয়। পরন্তু বহুতর অসহ্য দুঃখে নিতান্ত কাতর হইয়া অনেকে কেবল ঐ দুঃখনিবৃত্তির জন্যই আত্মহত্যা করিতেও প্রবৃত্ত হয়। মরণের পরে তাহার তদ্বিষয়ে কোন জ্ঞান বা কোন সুখ-বোধও হয় না। এইরূপ কেবল আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির জন্যই মুমুক্ষু ব্যক্তিরা কর্ম্মাদিতে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। তাঁহারা সুখভোগের জন্য প্রবৃত্ত হন না। যাহারা অবিবেকী, কেবল সুখভোগমাত্রেই ইচ্ছুক, তাহারা ঐ সুখভোগের জন্য নানা দুঃখ স্বীকার করিয়াও পরদারাদিতে প্রবৃত্ত হয় এবং সুখ ত্যাগ করিয়া কখনও পূর্ব্বোক্তরূপ মুক্তি চায় না, ঐরূপ মুক্তিকে উপহাস করে, তাহারা মুক্তিতে অধিকারী নহে। কিন্তু যাঁহারা বিবেকী, তাঁহারা এই সাংসারিক সুখকে কুপিত সর্পের ফণামণ্ডলের ছায়াসদৃশ মনে করিয়া আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির জন্য একেবারে সমস্ত সুখকেও পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারাই মুক্তিতে অধিকারী[২]। ফলকথা, পূর্ব্বোক্ত মতে মুক্তি হইলে তখন মুক্ত পুরুষের কোন সুখবোধ হয় না, কোন বিষয়ে কোনরূপ জ্ঞানই জন্মে না। শরীরাদির অভাবে তখন জ্ঞানাদি জন্মিতেই পারে না। নিত্য সুখের অস্তিত্ব বিষয়ে কোন প্রমাণও নাই, মুক্তিকালে তাহার অনুভূতিরও কোন কারণ নাই। সুতরাং মুক্তি হইলে তখন নিত্য সুখের অনুভূতিও জন্মে না। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন প্রথম অধ্যায়ে বিশদ বিচার-পূর্ব্বক ইহা সমর্থন করিয়াছেন। (প্রথম খণ্ড, ১৯৫—২০৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। গৌতম-ন্যায়ের ব্যাখ্যাকার বাৎস্যায়ন প্রভৃতি সমস্ত আচার্য্যই গৌতম-মতে মুক্তিকালে কোন সুখানুভূতি বা কোন

১। অথ "দুঃখাভাবোঽপি নাবেদ্যঃ পুরুষার্থতয়েষ্যতে। ন হি মূর্চ্ছাদ্যবস্থার্থং প্রবৃত্তো দৃশ্যতে সুধীঃ।" ইত্যাদি। ঈশ্বরানুমানচিন্তামণি।

২। তস্মাদবিবেকিনঃ সুখমাত্রলিপ্সবো বহুতরদুঃখানুবিদ্ধমপি সুখমুদ্দিশ্য "শিরো মদীয়ং যদি যাতু যাস্যতী"তি কৃত্বা পরদারাদিষু প্রবর্ত্তমানা "বরং বৃন্দাবনে রম্যে" ইত্যাদি বদন্তো নাত্রাধিকারিণঃ। যে চ বিবেকিনোঽস্মিন্ সংসারকান্তারে "কিয়ন্তি দুঃখদুর্দ্দিনানি কিয়তী সুখখদ্যোতিকেতি কুপিতফণিফণামণ্ডলচ্ছায়াপ্রতিমমিদমিতি মন্যমানাঃ সুখমপি হাতুমিচ্ছন্তি, তেঽত্রাধিকারিণঃ।—ঈশ্বরানুমানচিন্তামণি

জ্ঞানই জন্মে না, কেবল আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিমাত্রই মুক্তি, ইহাই সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন। "কিরণাবলী"র প্রারম্ভে মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য এবং "ন্যায়মঞ্জরী" গ্রন্থে মহানৈয়ায়িক জয়ন্তভট্ট প্রভৃতি পূর্ব্বাচার্য্যগণ বিশেষ বিচারপূর্ব্বক উক্ত সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়াছেন। ন্যায়শাস্ত্রবক্তা গোতম মুনির মতে মুক্তি যে, প্রস্তরভাব অর্থাৎ প্রস্তরের ন্যায় সুখদুঃখশূন্য জড়ভাবে আত্মার স্থিতি, ইহা মহামনীষী শ্রীহর্ষও নৈষধীয়চরিতকাব্যের সপ্তদশ সর্গে ৭৫ম শ্লোকের দ্বারা স্পষ্ট প্রকাশ করিয়াছেন। (প্রথম খণ্ডের ভূমিকা, ২৩শ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

কিন্তু "সংক্ষেপশঙ্করজয়" গ্রন্থের শেষভাগে মহামনীষী মাধবাচার্য্য বর্ণন করিয়াছেন যে, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের পরিভ্রমণকালে কোন স্থানে কোন নৈয়ায়িক তাঁহাকে গর্ব্বের সহিত প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, যদি তুমি সর্ব্বজ্ঞ হও, তবে কণাদসম্মত মুক্তি হইতে গোতমসম্মত মুক্তির বিশেষ কি, তাহা বল। নচেৎ সর্ব্বজ্ঞত্ব বিষয়ে প্রতিজ্ঞা পরিত্যাগ কর। তদুত্তরে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছিলেন যে, কণাদের মতে আত্মার গুণসম্বন্ধের অত্যন্ত বিনাশপ্রযুক্ত আকাশের ন্যায় স্থিতিই মুক্তি। কিন্তু গোতমের মতে উক্ত অবস্থায় আনন্দানুভূতিও থাকে[১]। উক্ত গ্রন্থে বর্ণিত অনেক ঐতিহাসিক বিষয়ের সত্যতা না থাকিলেও দার্শনিক সিদ্ধান্ত বিষয়ে মাধবাচার্য্যের ন্যায় ব্যক্তি ঐরূপ অমূলক কথা লিখিতে পারেন না। সুতরাং উহার অবশ্যই কোন মূল ছিল, ইহা স্বীকার্য্য। পরন্তু শঙ্করাচার্য্যকৃত "সর্ব্বদর্শনসিদ্ধান্তসংগ্রহ" গ্রন্থেও নৈয়ায়িক মতের বর্ণনায় পূর্ব্বোক্তরূপ মত বুঝিতে পারা যায়[২]। সুতরাং প্রাচীন কালে কোন নৈয়ায়িকসম্প্রদায় যে গোতমসম্মত মুক্তিকালে আনন্দানুভূতিও স্বীকার করিতেন, ইহা স্বীকার্য্য। প্রথম অধ্যায়ে ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের বিস্তৃত বিচারপূর্ব্বক উক্ত মতের খণ্ডনের দ্বারাও তাহাই বুঝা যায়। নচেৎ তাঁহার ঐ স্থলে ঐরূপ বিচারের কোন বিশেষ প্রয়োজন বুঝা যায় না। মুক্তি বিষয়ে তিনি সেখানে আর কোন মতের বিচার করেন নাই। এখন দেখা আবশ্যক, পূর্ব্বকালে কোন নৈয়ায়িকসম্প্রদায় ন্যায়মতে মুক্ত আত্মার নিত্য সুখের অনুভূতিও হয়, এই মত সমর্থন করিয়াছেন কি না? আমরা ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন প্রভৃতি গোতম-মতব্যাখ্যাতা আচার্য্যগণের গ্রন্থে উক্ত মতের খণ্ডনই দেখিতে পাই, ইহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কিন্তু শৈবাচার্য্য ভগবান্ ভাসর্ব্বজ্ঞের "ন্যায়সার" গ্রন্থে (আগম পরিচ্ছেদে) উক্ত মতেরই সমর্থন দেখিতে পাই এবং পূর্ব্বোক্ত বৈশেষিক মতের প্রতিবাদও দেখিতে পাই। ভাসর্ব্বজ্ঞ উক্ত মত সমর্থন করিতে "সুখমাত্যন্তিকং যত্র বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ং। তং বৈ মোক্ষং

১। "তত্রাপি নৈয়ায়িক আস্ততার্কিকঃ কণাদপক্ষাচ্চরণাক্ষপক্ষে।
মুক্তের্বিশেষং বদ সর্ব্ববিচ্চেৎ নোচেৎ প্রতিজ্ঞাং ত্যজ সর্ব্ববিত্ত্বে"॥
"অত্যন্তনাশে গুণসংগতের্যা স্থিতির্নভোবৎ কণভক্ষপক্ষে।
মুক্তিস্তদীয়ে চরণাক্ষপক্ষে সানন্দসংবিৎসহিতা বিমুক্তিঃ"॥—সংক্ষেপশঙ্করজয়। ১৬ অঃ, ৬৮।৬৯।

২। নিত্যানন্দানুভূতিঃ স্যান্মোক্ষে তু বিষয়াদৃতে।
বরং বৃন্দাবনে রম্যে শৃগালত্বং ব্রজাম্যহং॥
বৈশেষিকোক্তমোক্ষাত্তু সুখলেশবিবর্জ্জিতাৎ।" ইত্যাদি সর্ব্বদর্শনসিদ্ধান্তসংগ্রহ, ষষ্ঠ প্রকরণ, নৈয়ায়িক পক্ষ।

বিজানীয়াদ্দুষ্প্রাপমকৃতাত্মভিঃ ॥" এই স্মৃতিবচনও প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি উপসংহারে "ন্যায়সারে"র শেষ পঙ্‌ক্তিতে লিখিয়াছেন,—"তৎসিদ্ধমেতন্নিত্যসংবেদ্যমানেন সুখেন বিশিষ্টা আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তিঃ পুরুষস্য মোক্ষঃ"। "ন্যায়সারে"র অন্যতম টীকাকার জয়তীর্থ ঐ স্থলে লিখিয়াছেন,—"সুখেনেতি পদেন কণাদাদিমতে মোক্ষপ্রতিক্ষেপঃ।" অর্থাৎ কণাদ প্রভৃতির মতে মুক্ত আত্মার সুখানুভূতি থাকে না। ভাসর্ব্বজ্ঞ মুক্তির স্বরূপ বলিতে "সুখেন" এই পদের দ্বারা কণাদ প্রভৃতির সম্মত মুক্তির প্রতিক্ষেপ করিয়াছেন। তাঁহার মতে নিত্য অনুভূয়মান সুখবিশেষবিশিষ্ট আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিই মুক্তি। কণাদাদির সম্মত কেবল আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি মূর্চ্ছাদি অবস্থার তুল্য, উহা পুরুষার্থ হইতে পারে না, সুতরাং উহাকে মুক্তি বলা যায় না। ভাসর্ব্বজ্ঞের "ন্যায়সার" গ্রন্থের অষ্টাদশ টীকার মধ্যে "ন্যায়ভূষণ" নামে টীকা মুখ্য, ইহা "ষড়্‌দর্শনসমুচ্চয়ে"র টীকাকার গুণরত্ন লিখিয়াছেন। ঐ টীকাকার ন্যায়ভূষণ বা ভূষণ প্রমাণত্রয়বাদী ন্যায়ৈকদেশী। তার্কিকরক্ষা গ্রন্থের টীকায় মল্লিনাথ লিখিয়াছেন,—"ন্যায়ৈকদেশিনো ভূষণীয়াঃ"। (১ম খণ্ড, ১৬৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। "ন্যায়সারে"র ঐ মুখ্য টীকা "ন্যায়ভূষণ" এ পর্য্যন্ত পরিদৃষ্ট না হইলেও ঐ টীকাকার ন্যায়ভূষণ বা ভূষণ যে, মুক্তিবিষয়ে পূর্ব্বোক্ত ভাসর্ব্বজ্ঞের মতকেই বিশেষরূপে সমর্থনপূর্ব্বক প্রচার করিয়াছিলেন, ইহা জানা যায়। রামানুজসম্প্রদায়ের অন্তর্গত মহামনীষী শ্রীবেদান্তাচার্য্য বেঙ্কটনাথ তাঁহার "ন্যায়পরিশুদ্ধি"তে (কাশী চৌখাম্বা, সংস্কৃতসীরিজ ১ম খণ্ড, ১৭শ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন,—"অতএব হি ভূষণমতে নিত্যসুখসংবেদনসিদ্ধিরপবর্গে সাধিতা"। তিনিও মুক্তিবিষয়ে প্রচলিত ন্যায়মত উপেক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে, ন্যায়দর্শনে দুঃখের অত্যন্ত বিমুক্তিকে মুক্তি বলা হইলেও উহাতে যে আনন্দের অনুভূতি হয় না, মুক্ত আত্মা জড়ভাবেই অবস্থান করেন, ইহ ত বলা হয় নাই। পরন্তু মুক্তি হইলে তখন যে নিত্যসুখের অনুভূতি হয়, ইহা শ্রুতিতে পাওয়া যায়। ন্যায়দর্শনে উহার বিরুদ্ধবাদ কিছু না থাকায় ন্যায়দর্শনকার মহর্ষি গোতমেরও যে, উহাই মত ইহা অবশ্যই বলিতে পারা যায়।—"ন্যায়পরিশুদ্ধি"কার বেঙ্কটনাথ তাঁহার এই মত সমর্থন করিতেই পরে "অতএব হি ভূষণমতে" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা ভূষণও যে, মুক্তিতে নিত্যসুখের অনুভূতি সমর্থন করিয়াছেন, ইহা বলিয়াছেন। মহর্ষি গোতমোক্ত উপমান-প্রমাণকে পরিত্যাগ করিয়া প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ, এই প্রমাণত্রয়বাদী নৈয়ায়িকসম্প্রদায়বিশেষ, "নৈয়ায়িকৈকদেশী" বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহাদিগের মতে কেবল আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিমাত্রই মুক্তি নহে। কিন্তু মুক্তি হইলে তখন নিত্যসুখের আবির্ভাবও হয়, ইহা "সর্ব্বমতসংগ্রহ" নামক গ্রন্থেও কথিত হইয়াছে[১]। "ন্যায়পরিশুদ্ধি"কার বেঙ্কটনাথের মতে ন্যায়দর্শনকার মহর্ষি গোতমেরও উহাই মত। সে যাহাই হউক, ভগবান্ ভাসর্ব্বজ্ঞ ও তাঁহার সম্প্রদায় ভূষণ প্রভৃতি "ন্যায়ৈকদেশী" নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ের যে, উহাই মত, এ বিষয়ে সংশয় নাই। অনেকের

১ উক্তং হি প্রত্যক্ষানুমানাগমপ্রমাণবাদিনো নৈয়ায়িকৈকদেশিনঃ। অক্ষপাদবদেব প্রমাণাদিস্বরূপস্থিতিঃ। মোক্ষস্তু ন দুঃখনিবৃত্তিমাত্রং, অপি তু নিত্যসুখস্যাবির্ভাবেঽপি, তস্য জন্যত্বেঽপি নিখিলদুঃখপ্রধ্বংসরূপত্বাদবিনাশিত্বম্ উপপদ্যতে ইতি।—সর্ব্বমতসংগ্রহ।

মতে ভাসর্ব্বজ্ঞের সময় খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী। ইহা সত্য হইলেও তাঁহার বহু পূর্ব্ব হইতেই যে, তাঁহার গুরুসম্প্রদায় মুক্তি বিষয়ে পূর্ব্বোক্তরূপ মতই প্রচার করিতেন, এ বিষয়েও সংশয় নাই। শৈবসম্প্রদায়ের মধ্যে ভাসর্ব্বজ্ঞই যে প্রথমে উক্ত মতের প্রবর্ত্তক, ইহা বলা যায় না। পরন্তু যাঁহারা "ন্যায়ৈকদেশী" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা যে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যেরও বহু পূর্ব্ব হইতে নিজ মত প্রচার করিয়াছেন, ইহাও বুঝিতে পারা যায়। কারণ, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য সুরেশ্বরাচার্য্য তাঁহার "মানসোল্লাস" গ্রন্থে ঐ "ন্যায়ৈকদেশী" সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়াছেন। "তার্কিকরক্ষা" গ্রন্থে বরদরাজ সুরেশ্বরাচার্য্যের "মানসোল্লাস" গ্রন্থের শ্লোকই[১] উদ্ধৃত করিয়াছেন, ইহাই আমাদিগের বিশ্বাস। কারণ, সুরেশ্বরাচার্য্য বরদরাজের পূর্ব্ববর্ত্তী। সুতরাং তাঁহার "মানসোল্লাস" গ্রন্থের "প্রত্যক্ষমেকং চার্ব্বাকাঃ" ইত্যাদি শ্লোকত্রয় বরদরাজের নিজকৃত বলিয়া কখনই গ্রহণ করা যায় না। সুতরাং পরবর্ত্তী ভূষণ প্রভৃতির ন্যায় তাঁহাদিগের বহু পূর্ব্বেও যে, "ন্যায়ৈক-দেশী" সম্প্রদায় ছিলেন এবং তাঁহারাও ভাসর্ব্বজ্ঞ ও ভূষণ প্রভৃতির ন্যায় মুক্তিতে নিত্যসুখের অনুভূতি মত সমর্থন করিতেন, ইহা আমরা বুঝিতে পারি। পরন্তু প্রথম অধ্যায়ে মুক্তির লক্ষণ-সূত্রের ভাষ্যে ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও পূর্ব্বোক্ত মতের উল্লেখ করিতে "কেচিৎ" এই পদের দ্বারা যে, শৈবাচার্য্য ভাসর্ব্বজ্ঞের প্রাচীন গুরুসম্প্রদায়কেই গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাও আমরা বুঝিতে পারি। পূর্ব্বোক্ত শৈবসম্প্রদায় ন্যায়দর্শনকার মহর্ষি গোতমের মত বলিয়াই উক্ত মত প্রচার করিতেন। মহর্ষি গোতমও শৈব ছিলেন, এবং তিনি শিবের অনুগ্রহ ও আদেশেই ন্যায়দর্শন রচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি পূর্ব্বোক্ত শৈব মতেরই উপদেষ্টা, ইত্যাদি কথাও তাঁহারা বলিতেন, ইহাও আমরা বুঝিতে পারি। এই জন্যই ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন পরে তাঁহার নিজ মতানু-সারে উক্ত বিষয়ে গৌতম-ন্যায়মতের প্রতিষ্ঠার জন্য মুক্তির লক্ষণ-সূত্রের ভাষ্যে পূর্ব্বোক্ত শৈব মতের খণ্ডন করিতে বিস্তৃত বিচার করিয়াছেন। নচেৎ তাঁহার ঐ স্থলে ঐরূপ বিচারের কোন বিশেষ প্রয়োজন বুঝা যায় না। পরন্তু আমরা ইহাও লক্ষ্য করিয়াছি যে, ভগবান্ ভাসর্ব্বজ্ঞ তাঁহার "ন্যায়সার" গ্রন্থে পূর্ব্বোক্ত শৈব মত সমর্থন করিতে পূর্ব্বোক্ত "সুখমাত্যন্তিকং যত্র" ইত্যাদি যে স্মৃতি-বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে "আত্যন্তিক সুখ" এইরূপ শব্দপ্রয়োগ আছে। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও উক্ত মতের প্রতিপাদক শাস্ত্রের "সুখ" শব্দের দুঃখাভাবরূপ লাক্ষণিক অর্থের ব্যাখ্যা করিয়া নিজ মত সমর্থন করিতে "আত্যন্তিকে চ সংসারদুঃখাভাবে সুখবচনাৎ" এবং "যদ্যপি কশ্চিদাগমঃ স্যান্মুক্তস্যাত্যন্তিকং সুখমিতি" এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন, (প্রথম খণ্ড, ২০১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) তিনি সেখানে শ্রুতিবাক্যস্থ "আনন্দ" শব্দকে গ্রহণ করেন নাই, ইহাও লক্ষ্য করিয়াছি। সুতরাং তিনি যে সেখানে পূর্ব্বোক্ত "সুখমাত্যন্তিকং যত্র" ইত্যাদি স্মৃতিবচনকেই "আগম" শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা আমরা অবশ্য বুঝিতে পারি। তাহা হইলে আমরা ইহা বলিতে পারি

১। "প্রত্যক্ষমেকং চার্ব্বাকাঃ কণাদসুগতৌ পুনঃ।
অনুমানঞ্চ, তচ্চাপি সাংখ্যাঃ শব্দঞ্চ তে অপি॥
ন্যায়ৈকদেশিনোঽপ্যেবমুপমানঞ্চ কেচন" ইত্যাদি।—মানসোল্লাস, ২য় উঃ, ১৭।১৮।১৯।

যে, ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের পূর্ব্বে শৈবাচার্য্য ভাসর্ব্বজ্ঞের গুরুসম্প্রদায় নিজমত সমর্থন করিতে শাস্ত্রপ্রমাণরূপে পূর্ব্বোক্ত "সুখমাত্যন্তিকং যত্র" ইত্যাদি বচন উল্লেখ করিতেন। তাই ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও উক্ত বচনকেই "আগম" শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিয়া, নিজ মতানুসারে উহার অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এবং ভাসর্ব্বজ্ঞও পূর্ব্বোক্ত শৈব মত সমর্থন করিতে তাঁহার পূর্ব্বসম্প্রদায়-প্রাপ্ত উক্ত স্মৃতিবচনই উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুধীগণ এই কথাটা প্রণিধানপূর্ব্বক চিন্তা করিবেন। ফলকথা, আমরা ইহা অবশ্য বুঝিতে পারি যে, ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের পূর্ব্বেও শৈবসম্প্রদায়ের নৈয়ায়িকগণ ন্যায়দর্শনকার মহর্ষি গোতমের মত বলিয়াই মুক্তি বিষয়ে পূর্ব্বোক্তরূপ মত সমর্থন করিতেন। ন্যায়দর্শনের কোন সূত্রে উক্ত মতের বিরুদ্ধবাদ নাই, ইহা বলিয়া অথবা তৎকালে তাঁহাদিগের সম্প্রদায়ে প্রচলিত কোন ন্যায়সূত্রের দ্বারাও তাঁহারা উক্ত মতের প্রচার করিতে পারেন। তাই "সংক্ষেপশঙ্করজয়" গ্রন্থে মাধবাচার্য্য উক্ত প্রাচীন প্রবাদানুসারেই প্রশ্নকর্ত্তা নৈয়ায়িকবিশেষের নিকটে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের উত্তরের বর্ণনায় পূর্ব্বোক্তরূপ কথা লিখিয়াছেন। তিনি নিজে কল্পনা করিয়া ঐরূপ অমূলক কথা লিখিতে পারেন না। সেখানে ইহাও লক্ষ্য করা আবশ্যক যে, শঙ্করাচার্য্যের নিকটে প্রশ্নকর্ত্তা নৈয়ায়িক পূর্ব্বোক্ত মতবাদী শৈবসম্প্রদায়ের অন্তর্গত কোন নৈয়ায়িকও হইতে পারেন। তাহা না হইলেও তিনি যে, কণাদ-সম্মত মুক্তি হইতে গোতম-সম্মত মুক্তির বিশেষই শুনিতে চাহেন, তাহা বলিতে না পারিলে তিনি শঙ্করাচার্য্যকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া স্বীকার করিবেন না, ইহা সেখানে স্পষ্টই বুঝা যায়। সুতরাং "সর্ব্বজ্ঞ" শঙ্করাচার্য্য সেখানে শৈবসম্প্রদায়বিশেষের মতানুসারে পূর্ব্বোক্তরূপ বিশেষ বলিয়া তাঁহার সর্ব্বজ্ঞতা বিষয়ে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন। তাই মাধবাচার্য্যও ঐরূপ লিখিয়াছেন। "সর্ব্বদর্শনসিদ্ধান্তসংগ্রহে"ও নৈয়ায়িক মতের বর্ণনায় উক্ত প্রাচীন মতই কথিত হইয়াছে। কিন্তু ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন উক্ত মতের খণ্ডন করায় সেই সময় হইতে তন্মতানুবর্ত্তী গোতম মতব্যাখ্যাতা নৈয়ায়িকসম্প্রদায় সকলেই মুক্তি বিষয়ে বাৎস্যায়নের মতেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের মতে কণাদসম্মত মুক্তি হইতে গোতম-সম্মত মুক্তির পূর্ব্বোক্তরূপ বিশেষ নাই। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে "অক্ষপাদদর্শন" প্রবন্ধে মাধবাচার্য্যও মুক্তিবিষয়ে প্রচলিত ন্যায়মতেরই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। নিত্যসুখের অভিব্যক্তি মুক্তি, এই মতকে তিনি সেখানে ভট্ট ও সর্ব্বজ্ঞ প্রভৃতির মত বলিয়া বিচারপূর্ব্বক উহার খণ্ডন করিয়া গিয়াছেন।

নিত্যসুখের অনুভূতি মুক্তি, এই মতকে মাধবাচার্য্যের ন্যায় আরও অনেক গ্রন্থকার ভট্টমত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। নব্য নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি উক্ত ভট্টমতের সমর্থন করিয়া গিয়াছেন, ইহা তাঁহার "দীধিতি"র মঙ্গলাচরণ-শ্লোকের ব্যাখ্যায় গদাধর ভট্টাচার্য্য লিখিয়াছেন এবং তিনি নিজেও তাঁহার "মুক্তিবাদ" গ্রন্থে পূর্ব্বোক্ত মতকে ভট্টমত বলিয়া উল্লেখপূর্ব্বক উহার সমালোচনা করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ আরও অনেক গ্রন্থকার উক্ত ভট্টমতের সমালোচনা করিয়াছেন। এখন তাঁহারা "ভট্ট" শব্দের দ্বারা কোন্ ভট্টকে গ্রহণ করিয়াছেন এবং রঘুনাথ শিরোমণি কোন্ গ্রন্থে কিরূপে উক্ত ভট্টমতের সমর্থন করিয়াছেন, ইহা বুঝা আবশ্যক। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থকারগণ যে কুমারিল ভট্টকেই 'ভট্ট' শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিয়াছেন এবং সুপ্রসিদ্ধ কুমারিল

ভট্টই যে, কেবল "ভট্ট" শব্দের দ্বারা বহুকাল হইতে নানা গ্রন্থে কীর্ত্তিত হইয়াছেন এবং কুমারিলের মতই যে, "ভট্টমত" বলিয়া কথিত হয়, ইহা বুঝিবার বহু কারণ আছে। সুতরাং যাঁহারা নিত্য সুখের অভিব্যক্তি মুক্তি, ইহা ভট্টমত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারা যে উহা কুমারিল ভট্টের মত বলিয়াই প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা অবশ্যই বুঝা যায়। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী মহা-নৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য "কিরণাবলী" টীকার প্রথমে মুক্তির স্বরূপ বিচারে "তৌতাতিতাস্তু" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা উক্ত মতকে "তৌতাতিত" সম্প্রদায়ের মত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। অবশ্য "তৌতাতিত" এই নামটি যদি কুমারিল ভট্টেরই নামান্তর হয়, তাহা হইলে উদয়নাচার্য্যও উক্ত মতকে কুমারিলের মত বলিয়াই প্রকাশ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই। "তুতাত" ও "তৌতাতিত" কুমারিল ভট্টেরই নামান্তর, ইহা বিশ্বকোষে (কুমারিল শব্দে) লিখিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ বিষয়ে কোন প্রমাণ লিখিত হয় নাই। বস্তুতঃ "তুতাত" ও "তৌতাতিত" এই নামদ্বয় যে, কুমারিল ভট্টের নামান্তর, ইহা প্রাচীন সংবাদের দ্বারা বুঝা যাইতে পারে। কারণ, মাধবাচার্য্য "সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে" পাণিনিদর্শনে "তদুক্তং তৌতাতিতৈঃ" এই কথা লিখিয়া "যাবন্তো যাদৃশা যেচ যদর্থপ্রতি-পাদনে" ইত্যাদি যে শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহা কুমারিল ভট্টের "শ্লোকবার্ত্তিকে" (স্ফোটবাদে ৬৯ম) দেখা যায়। পরন্তু বৈশেষিকদর্শনের সপ্তম অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকের বিংশ সূত্রের "উপস্কারে" মহামনীষী শঙ্করমিশ্র শব্দের শক্তি বিষয়ে কুমারিলের মতের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন,—"ইতি তৌতাতিকাঃ"। পরে তিনি উক্ত বিষয়ে মীমাংসাচার্য্য গুরু প্রভাকরের মতেরও উল্লেখ করিয়াছেন। পরন্তু "প্রবোধচন্দ্রোদয়" নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় শ্লোকের প্রারম্ভে দেখা যায়—"নৈবাশ্রাবি গুরোর্মতং ন বিদিতং তৌতাতিকং দর্শনং"। এখানে "তুতাত" শব্দের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত গুরু প্রভাকরের ন্যায় সুপ্রসিদ্ধ মীমাংসাচার্য্য কুমারিল ভট্টই যে গৃহীত হইয়াছেন, ইহা অবশ্যই বুঝা যায়। "তুতাত" যদি কুমারিল ভট্টেরই নামান্তর হয়, তাহা হইলে তাঁহার দর্শনকে "তৌতাতিক" দর্শন বলা যায় এবং তাঁহার সম্প্রদায়কেও "তৌতাতিক" বলা যাইতে পারে। "কিরণাবলী" ও "সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে"র পাঠানুসারে যদি "তৌতাতিত" এই নামান্তরও গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে শঙ্কর মিশ্রের উপস্কারে ইতি "তৌতাতিতাঃ" এইরূপ পাঠও প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করা যায়। কিন্তু শঙ্করমিশ্রের "তৌতাতিকাঃ" এই পাঠের ন্যায় উদয়নাচার্য্যের "তৌতাতিকাস্তু" এবং মাধবাচার্য্যের "তৌতাতিকৈঃ" এইরূপ পাঠই প্রকৃত বলিয়া বুঝিলে "তৌতাতিত" এইটীও যে কুমারিল ভট্টের নামান্তর ছিল, ইহা বুঝিবার কোন কারণ পাওয়া যায় না। ঐরূপ নামান্তরেরও কোন কারণ বুঝা যায় না। সে যাহা হউক, মূল কথা নিত্য সুখের অভিব্যক্তি মুক্তি, ইহা যে ভট্ট কুমারিলের মত, ইহা বুঝিবার অনেক কারণ আছে। শঙ্করাচার্য্যবিরচিত "সর্ব্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ" নামক গ্রন্থেও কুমারিল ভট্টের মতের বর্ণনায় মুক্তি বিষয়ে তাঁহার উক্তরূপ মতই বর্ণিত হইয়াছে[১]

১। পরানন্দানুভূতিঃ স্যান্মোক্ষে তু বিষয়াদৃতে।
বিষয়েষু বিরক্তাঃ স্যুর্নিত্যানন্দানুভূতিতঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং মোক্ষমেব মুমুক্ষবঃ॥—সর্ব্বসিদ্ধান্তসংগ্রহ, ভট্টাচার্য্যপক্ষ।

এবং গুরু প্রভাকরের মতে সুখদুঃখশূন্য পাষাণের ন্যায় অবস্থিতিই মুক্তি, ইহাই কথিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী মীমাংসক নারায়ণ ভট্ট তাঁহার "মানমেয়োদয়" নামক মীমাংসা-গ্রন্থে স্পষ্টই বলিয়াছেন যে,[১] দুঃখের আত্যন্তিক উচ্ছেদ হইলে তখন আত্মাতে পূর্ব্ব হইতে বিদ্যমান নিত্যানন্দের যে অনুভূতি হয়, উহাই কুমারিল ভট্টের সম্মত মুক্তি। সুতরাং এই মতানুসারে "কিরণাবলী" গ্রন্থে "তৌতাতিতাস্ত" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা উদয়নাচার্য্য যে, কুমারিল ভট্টের মতেরই প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা বুঝা যাইতে পারে এবং তিনি সেখানে উক্ত মতবাদী সম্প্রদায়কে অনেক উপহাস করায় তজ্জন্যই প্রসিদ্ধ নাম ত্যাগ করিয়া, উপহাসব্যঞ্জক "তৌতাতিতা-(কা) স্ত" এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন, ইহাও বুঝা যাইতে পারে।

কিন্তু উক্ত বিষয়ে বক্তব্য এই যে, নিত্যসুখের অভিব্যক্তি মুক্তি, ইহা যে ভট্ট কুমারিলের মত ছিল, ইহা সর্ব্বসম্মত নহে। "মানমেয়োদয়" গ্রন্থে নারায়ণ ভট্ট ঐরূপ লিখিলেও কুমারিলের মতের ব্যাখ্যাতা মহামীমাংসক পার্থসারথিমিশ্র তাঁহার "শাস্ত্রদীপিকা" গ্রন্থের তর্কপাদে প্রথমে আনন্দ-মোক্ষবাদীদিগের মতের বর্ণন ও সমর্থনপূর্ব্বক পরে বিশেষ বিচারদ্বারা উক্ত মতের খণ্ডনপূর্ব্বক মুক্তিতে নিত্যসুখের অনুভূতি হয় না, আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিমাত্রই মুক্তি, এই সিদ্ধান্তই সমর্থন করিয়াছেন। তিনি সেখানে কতিপয় সরল শ্লোকের দ্বারাও ঐ সিদ্ধান্ত সমর্থনপূর্ব্বক প্রকাশ করিয়াছেন[২]। তবে উক্ত বিষয়ে ভট্ট কুমারিলের প্রকৃত মত কি ছিল, এই বিষয়ে পূর্ব্বকালেও যে বিচার ও মতভেদ হইয়াছিল, ইহাও পার্থসারথিমিশ্র প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি সেখানে উক্ত বিষয়ে অপর সম্প্রদায়ের যে মতের যুক্তি প্রকাশ করিয়াছেন,[৩] উহাই তাঁহার নিজমত, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কারণ, তিনি শাস্ত্রদীপিকার প্রারম্ভে লিখিয়াছেন,—"কুমারিলমতেনাহং করিষ্যে শাস্ত্রদীপিকাং"। সুতরাং তাঁহার ব্যাখ্যাত ও সমর্থিত মতকে তাঁহার মতে কুমারিলের মত বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে এবং পরবর্ত্তী নারায়ণ ভট্টের মতের অপেক্ষায় তাঁহার মত যে সমধিক মান্য, ইহাও স্বীকার করিতে হইবে। পরবর্ত্তী মীমাংসক গাগাভট্টও "ভট্টচিন্তামণি"র তর্কপাদে সুখ ও

১। দুঃখাত্যন্তসমুচ্ছেদে সতি প্রাগাত্মবর্ত্তিনঃ।
নিত্যানন্দস্যানুভূতির্মুক্তিরুক্তা কুমারিলৈঃ॥—মানমেয়োদয়, প্রমেয়পঃ, ২৬শ।

২। তেনাভাবাত্মকত্বেঽপি মুক্তের্নাপুরুষার্থতা।
সুখদুঃখোপভোগোহি সংসার ইতি শব্দ্যতে॥ ৮॥
তয়োরনুপভোগস্তু মোক্ষং মোক্ষবিদো বিদুঃ।
শ্রুতিরপ্যেবমেবাহ ভেদং সংসারমোক্ষয়োঃ॥ ৯॥
নহবৈ সশরীরস্য প্রিয়াপ্রিয়বিহীনতা।
অশরীরং বাব সন্তং স্পৃশতো ন প্রিয়াপ্রিয়ে॥—ইত্যাদি শাস্ত্রদীপিকা, তর্কপাদ।

৩। "অপরে ত্বাহুঃ—অভাবাত্মকত্ববচনমব স্বমতং, উপপত্ত্যভিধানাৎ। আনন্দবচনস্তু উপন্যাসমাত্রত্বাৎ পরমতং। নহি মুক্তস্যানন্দানুভবঃ সম্ভবতি, কারণাভাবাৎ। মনঃ স্যাদিতি চেৎ? ন, অমনস্কত্বশ্রুতেঃ, "অমনোঽবাক্" ইতি—শাস্ত্রদীপিকা, তর্কপাদ।

দুঃখ, এই উভয়ের উপভোগাভাবকেই মুক্তি বলিয়াছেন[১]। বস্তুতঃ কুমারিলভট্ট তাঁহার শ্লোকবার্ত্তিকে "সুখোপভোগরূপশ্চ" ইত্যাদি[২] শ্লোকের দ্বারা মুক্তি যদি সুখের উপভোগরূপ হয়, তাহা হইলে উহা স্বর্গবিশেষই হয়, তাহা হইলে কোন কালে উহার অবশ্যই বিনাশ হইবে, উহা চিরস্থায়ী হইতে পারে না, এইরূপ অনেক যুক্তি প্রকাশ করিয়া, কেবল আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিই যে, তাঁহার মতে মুক্তি, ইহাই সমর্থন করিয়াছেন। মুক্তি আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ অভাবাত্মক না হইলে তাহার নিত্যত্ব সম্ভব হয় না, ইহাও তিনি সেখানে বলিয়াছেন। সুতরাং কুমারিলের সযুক্তিক সিদ্ধান্তবোধক ঐ সমস্ত শ্লোকের দ্বারা তিনি যে, নিত্যসুখের অনুভূতিকে মুক্তি বলিতেন না, ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়। তিনি যে জীবাত্মাতে নিত্য আনন্দ এবং মুক্তিকালে উহার অভিব্যক্তি স্বীকার করিতেন, ইহা তাঁহার কোন শ্লোকেই আমি পাই নাই। পার্থসারথিমিশ্র প্রথমে আনন্দমোক্ষবাদীদিগের মতের সমর্থন করিতে উপসংহারে যে শ্লোকটি (নিজং যত্তাত্মচৈতন্যং" ইত্যাদি) উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহা কুমারিলের শ্লোকবার্ত্তিকে নাই। পার্থসারথিমিশ্র উক্ত বিষয়ে মতান্তর প্রকাশ করিতে যে, "আনন্দবচনন্তু" এই কথা লিখিয়াছেন, উহারও মূল ও ব্যাখ্যা বুঝিতে পারি নাই। পরন্তু "কিরণাবলী" গ্রন্থে উদয়নাচার্য্য "তৌতাতিতাস্তু" ইত্যাদি সন্দর্ভে কুমারিল ভট্টকেই যে "তৌতাতিত" শব্দের দ্বারা গ্রহণ করিয়াছেন, এ বিষয়েও সন্দেহ সমর্থন করা যায়। কারণ, মাধবাচার্য্য সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে "আর্হতদর্শনে" "তথা চোক্তং তৌতাতিতৈঃ" এই কথা লিখিয়া যে কতিপয় শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহা কুমারিলের শ্লোকবার্ত্তিকের শ্লোক নহে। কুমারিলের ঐ ভাবের কতিপয় শ্লোক, যাহা শ্লোকবার্ত্তিকে দেখা যায়, তাহার পাঠ অন্যরূপ[৩]। সুতরাং কুমারিলের পূর্ব্বে তাঁহার সহিত অনেক অংশে একমতাবলম্বী "তৌতাতিত" বা "তুতাত" নামে কোন মীমাংসাচার্য্য ছিলেন, তাঁহার শ্লোকই মাধবাচার্য্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, ইহাও আমরা অবশ্য মনে করিতে পারি। কালে কুমারিলের

১। তস্মাৎ প্রপঞ্চস্য সর্ব্বথাবিলয়ো মুক্তিঃ। স চ দুঃখাভাবরূপত্বাৎ পুরুষার্থঃ। তেন সুখদুঃখোপভোগাভাবো মোক্ষ ইতি ফলিতং। ভট্টচিন্তামণি—তর্কপাদ।

২। সুখোপভোগরূপশ্চ যদি মোক্ষঃ প্রকল্প্যতে। স্বর্গ এব ভবেদেষ পর্য্যায়েণ ক্ষয়ী চ সঃ॥ নহি কারণবৎ কিঞ্চিদক্ষয়িত্বেন গম্যতে। তস্মাৎ কর্ম্মক্ষয়াদেব হেত্বভাবেন মুচ্যতে॥ ন হ্যভাবাত্মকং মুক্ত্বা মোক্ষনিত্যত্বকারণং॥ ইত্যাদি শ্লোকবার্ত্তিক, সম্বন্ধাক্ষেপপরিহার-প্রকরণ, ১০৫—১০॥

৩। "তথাচোক্তং তৌতাতিতৈঃ—

সর্ব্বজ্ঞো দৃশ্যতে তাবন্নেদানীমস্মদাদিভিঃ।
দৃষ্টো ন চৈকদেশোঽস্তি লিঙ্গং বা যোঽনুমাপয়েৎ॥
ন চাগমবিধিঃ কশ্চিন্নিত্যসর্ব্বজ্ঞবোধকঃ॥ ইত্যাদি—"সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে" আর্হত দর্শন।
সর্ব্বজ্ঞো দৃশ্যতে তাবন্নেদানীমস্মদাদিভিঃ।
নিরাকরণবচ্ছক্যা ন চাসীদিতি কল্পনা॥
ন চাগমেন সর্ব্বজ্ঞস্তদীয়েঽন্যোন্যসংশ্রয়াৎ।
নরান্তরপ্রণীতস্য প্রামাণ্যং গম্যতে কথং॥ — শ্লোকবার্ত্তিক (দ্বিতীয়সূত্রবার্ত্তিকে) ১১৭।১১৮॥

প্রভাবে ও তাঁহার গ্রন্থের প্রচারে তুতাত ভট্টের গ্রন্থ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, ইহাও বুঝিতে পারি। অবশ্য মাধবাচার্য্য পরে পাণিনিদর্শনে "তদুক্তং তৌতাতিতৈঃ" এই কথা লিখিয়া "যাবন্তো যাদৃশা যেচ" ইত্যাদি যে শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন, উহা কুমারিলের শ্লোকবার্ত্তিকের স্ফোটবাদে দেখা যায়। কিন্তু উহার পূর্ব্বেই মাধবাচার্য্য "শ্লোকবার্ত্তিকের" স্ফোটবাদের "যস্যানবয়বঃ স্ফোটো ব্যজ্যতে বর্ণবুদ্ধিভিঃ" ইত্যাদি (৯১ম) শ্লোকটি উদ্ধৃত করিতে উহার পূর্ব্বে লিখিয়াছেন,—"তদুক্তং ভট্টাচার্য্যৈর্ম্মীমাংসা-শ্লোকবার্ত্তিকে"। মাধবাচার্য্য একই স্থানে কুমারিলের দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত করিতে দ্বিতীয় স্থলে "তদুক্তং তৌতাতিতৈঃ" এইরূপ লিখিবেন কেন? এবং তিনি আর্হতদর্শনে "তথা চোক্তং তৌতাতিতৈঃ" লিখিয়া কোন্ গ্রন্থকারের কোন্ গ্রন্থের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, ইহাও ত চিন্তা করা আবশ্যক। সর্ব্বদর্শনসংগ্রহের আধুনিক টীকাকার "আর্হতদর্শনে" ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "তৌতাতিতৈর্বৌদ্ধৈঃ"। তাঁহার এই ব্যাখ্যা কোনরূপেই সমর্থন করা যায় না। তিনি পাণিনিদর্শনে মাধবাচার্য্যের পূর্ব্বোক্ত কথার কোনই ব্যাখ্যা করেন নাই কেন, তাহাও বুঝা যায় না। সে যাহা হউক, মাধবাচার্য্য যে "আর্হতদর্শনে" কুমারিলের "শ্লোকবার্ত্তিকে"র শ্লোক উদ্ধৃত করেন নাই, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। সুতরাং সেখানে তাঁহার উক্তির দ্বারা তিনি যে "তৌতাতিত" নামক অন্য কোন গ্রন্থকারের শ্লোকই উদ্ধৃত করিয়াছেন, ইহাই বুঝা যায়। তাহা হইলে তিনি পাণিনিদর্শনেও "তদুক্তং তৌতাতিতৈঃ" বলিয়া তাঁহারই ("যাবন্তো যাদৃশা যেচ" ইত্যাদি) শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন, ইহাও আমরা বলিতে পারি, এবং কুমারিল ভট্টও তাঁহার শ্লোকবার্ত্তিকে তৌতাতিত ভট্টেরই উক্ত প্রসিদ্ধ শ্লোকটি নিজমতের সমর্থকরূপে উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন, ইহাও বলিতে পারি। কুমারিলের শ্লোকবার্ত্তিকে অন্যের শ্লোকও দেখা যায়। তাঁহার গ্রন্থারম্ভে "বিশুদ্ধ-জ্ঞানদেহায়" ইত্যাদি মঙ্গলাচরণ-শ্লোকটিও তাঁহার নিজ রচিত নহে। উহা "কীলক" স্তবের প্রথম শ্লোক। মূলকথা, "তুতাত" এবং "তৌতাতিত" নামে অপর কোন মীমাংসাচার্য্যের সংবাদ পাওয়া না গেলেও পূর্ব্বোক্ত নানা কারণে পূর্ব্বোক্তরূপ কল্পনা করা যাইতে পারে। পরন্তু বৈশেষিক দর্শনের বিবৃতিকার বহুদর্শী মনীষী জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন মহাশয় তাঁহার বিবৃতির শেষ ভাগে (২১৭ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন,—"তুতাতভট্টমতানুযায়িনস্তু দ্রব্য-গুণ-কর্ম্ম-সামান্যরূপাশ্চত্বার এব পদার্থা ইতি বদন্তি"। তিনি সেখানে তুতাত ভট্ট বলিতে কাহাকে গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহার লিখিত ঐ সিদ্ধান্তের মূল কি, ইহাও চিন্তা করা আবশ্যক। ভট্ট কুমারিল কিন্তু "শ্লোকবার্ত্তিকে" "অভাব পরিচ্ছেদে" অভাব পদার্থও সমর্থন করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাকে দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম ও সামান্য, এই পদার্থচতুষ্টয়মাত্রবাদী বলা যায় না। পূর্ব্বোক্ত নানা কারণে এবং কুমারিলের শ্লোক-বার্ত্তিকের "সম্বন্ধাক্ষেপপরিহার" প্রকরণে "সুখোপভোগরূপশ্চ" ইত্যাদি কতিপয় শ্লোকের দ্বারা এবং "শাস্ত্রদীপিকা"য় পার্থসারথি মিশ্রের সিদ্ধান্ত-সমর্থনের দ্বারা কুমারিলের মতে নিত্যসুখের অভিব্যক্তি মুক্তি নহে, ইহা বুঝিয়া উদয়নের "কিরণাবলী"র "তৌতাতিতাস্তু" ইত্যাদি সন্দর্ভানুসারে নিত্যসুখের অভিব্যক্তি মুক্তি, ইহা তুতাত ভট্টের মত, ইহাই আমি প্রথম খণ্ডে (১৯৫ পৃষ্ঠায় পাদটীকায়) লিখিয়াছিলাম। কিন্তু "তুতাত" ও "তৌতাতিত" ইহা কুমারিল ভট্টেরই নামান্তর

হইলে উদয়নাচার্য্য যে কুমারিলেরই উক্তরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, ইহা স্বীকার করিতেই হইবে। মুক্তি বিষয়ে কুমারিলের মতবিষয়ে যে পূর্ব্বকালেও মতভেদ হইয়াছিল, ইহাও আমরা পার্থসারথি-মিশ্রের উক্তির দ্বারা বুঝিয়াছি। সুধীগণ পূর্ব্বোক্ত সমস্ত কথাগুলি প্রণিধানপূর্ব্বক চিন্তা করিয়া বিচার্য্য বিষয়ে প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয় করিবেন। কিন্তু ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, নিত্যসুখের অভিব্যক্তি মুক্তি, ইহা অনেক গ্রন্থকার ভট্টমত বলিয়া উল্লেখ করিলেও এবং ভাসর্ব্বজ্ঞ প্রভৃতি উক্ত মতের সমর্থন করিলেও ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন উক্ত মতের বিস্তৃত সমালোচনাপূর্ব্বক খণ্ডন করায় তাঁহার পূর্ব্ব হইতেই যে, উক্ত মতের প্রচার হইয়াছিল এবং অনেকে উহা গোতম মত বলিয়াও সমর্থন করিতেন, ইহা বুঝা যায়। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন প্রথম অধ্যায়ে পূর্ব্বোক্ত মত প্রকাশ করিতে লিখিয়াছেন, —"নিত্যং সুখমাত্মনো মহত্ত্বন্মোক্ষে ব্যজ্যতে, তেনাভিব্যক্তে নাত্যন্তং বিমুক্তঃ সুখী ভবতীতি কেচিন্মন্যন্তে"। তাৎপর্য্যটীকাকার বাচস্পতি মিশ্র সেখানে ভাষ্যকারের উক্ত সন্দর্ভের দ্বারা অদ্বৈত-বাদী বৈদান্তিক মতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু ভাষ্যকারের উক্ত সন্দর্ভের দ্বারা সরলভাবে ইহাই বুঝা যায় যে, জীবাত্মার মহত্ত্ব বা বিভুত্ব যেমন অনাদিকাল হইতে তাহাতে বিদ্যমান আছে, তদ্রূপ তাহাতে নিত্যসুখও বিদ্যমান আছে। সংসারকালে প্রতিবন্ধকবশতঃ উহার অনুভূতি হয় না। কিন্তু মুক্তিকালে মহত্ত্বের ন্যায় সেই নিত্যসুখের অনুভূতি হয়। সেখানে ভাষ্যকারের শেষোক্ত বিচারের দ্বারাও পূর্ব্বোক্তরূপ মতই যে তাঁহার বিবক্ষিত ও বিচার্য্য, ইহাই বুঝা যায়। প্রথম খণ্ডে যথাস্থানে (১৯৫—৯৬ পৃষ্ঠায়) এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি। পূর্ব্বোদ্ধৃত নারায়ণভট্টের শ্লোকেও উক্ত-রূপ মতই কথিত হইয়াছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, মুক্তি হইলে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হয়, অর্থাৎ আর কোন কালেই তাহার দুঃখ জন্মে না, কারণের অভাবে দুঃখ জন্মিতেই পারে না, এই বিষয়ে মুক্তিবাদী কোন দার্শনিক সম্প্রদায়েরই বিবাদ নাই। কিন্তু মুক্তি হইলে তখন যে, নিত্যসুখেরও অনুভূতি হয়, এই বিষয়ে বিবাদ আছে। অনেক সম্প্রদায় বহু বিচারপূর্ব্বক উক্ত মতের খণ্ডন করিয়াছেন। আবার অনেক সম্প্রদায় বহু বিচারপূর্ব্বক উক্ত মতের সমর্থন করিয়াছেন। যাঁহারা উক্ত মত স্বীকার করেন নাই, তাঁহারা শ্রুতি বিচার করিয়াও উক্ত মত যে, শ্রুতিসম্মত নহে, ইহাও বুঝাইয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, ছান্দোগ্য উপনিষদের শেষে অষ্টম প্রপাঠকের দ্বাদশ খণ্ডের প্রথমে "নহ বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তি। অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ"—এই শ্রুতিবাক্যের দ্বারা স্পষ্টই বুঝা যায় যে, যতদিন পর্য্যন্ত জীবাত্মার শরীরসম্বন্ধ থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহার প্রিয় ও অপ্রিয় অর্থাৎ সুখ ও দুঃখের উচ্ছেদ হইতে পারে না। জীবাত্মা "অশরীর" হইলে তখনই তাহার সুখ ও দুঃখ, এই উভয়ই থাকে না। মুক্তি না হওয়া পর্য্যন্ত জীবাত্মার শরীরসম্বন্ধের অত্যন্ত উচ্ছেদ সম্ভবই নহে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যে "সশরীর" শব্দের দ্বারা বদ্ধ এবং "অশরীর" শব্দের দ্বারা মুক্ত এই অর্থই বুঝা যায়। সুতরাং নির্ব্বাণ মুক্তি হইলে তখন যে মুক্ত আত্মার সুখ দুঃখ উভয়ই থাকে না, ইহাই শ্রুতির চরমসিদ্ধান্ত বুঝা যায়। যাঁহারা মুক্তিতে নিত্য সুখের অনুভূতি সমর্থন করিয়াছেন, তাঁহারা বলিয়াছেন যে,

পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যে "প্রিয়" শব্দের অর্থ বৈষয়িক সুখ অর্থাৎ জন্য সুখ। "অপ্রিয়" শব্দের অর্থ দুঃখ। দুঃখ মাত্রই জন্য পদার্থ, সুতরাং "অপ্রিয়" শব্দের সাহচর্য্যবশতঃ ঐ শ্রুতিবাক্যে "প্রিয়" শব্দের দ্বারা জন্য সুখই বুঝা যায়। সুতরাং মুক্তি হইলে তখন বৈষয়িক সুখ বা জন্য সুখ থাকে না,—শরীরাদির অভাবে তখন কোন সুখের উৎপত্তি হয় না, ইহাই উক্ত শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য বুঝা যায়। তখন যে কোন সুখেরই অনুভূতি হয় না, ইহা উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা কথিত হয় নাই। পরন্তু "আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ মোক্ষে প্রতিষ্ঠিতং" এবং "রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি" (তৈত্তিরীয় উপ, ২য় বল্লী, ৭ম অনু)—ইত্যাদি অনেক শ্রুতি-বাক্যের দ্বারা মুক্তিতে যে আনন্দের অনুভূতি হয়, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবাক্যে মুক্তিতে জন্য সুখের অভাবই কথিত হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। অতএব মুক্তিতে যে নিত্যসুখের অনুভূতি হয়, ইহাই শ্রুতির চরম সিদ্ধান্ত।

"আত্মতত্ত্ববিবেকে"র শেষভাগে মহানৈয়ায়িক উদয়নাচার্য্য যেখানে তাঁহার নিজমতানুসারে মুক্তির স্বরূপ বলিয়া, মুক্তিতে নিত্যসুখের অনুভূতিবাদের খণ্ডন করিয়াছেন, সেখানে টীকাকার নব্য-নৈয়ায়িক রঘুনাথশিরোমণি পরে "অপরে তু" ইত্যাদি সন্দর্ভের দ্বারা উক্ত মতের উল্লেখপূর্ব্বক সমর্থন করিতে বলিয়াছেন যে, জীবাত্মার সংসারকালেও তাহাতে নিত্যসুখ বিদ্যমান থাকে। কিন্তু তখন উহার অনুভব হয় না। তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে তখন হইতেই উহার অনুভব হয়। তত্ত্বজ্ঞানই নিত্যসুখের অনুভবের কারণ। জীবাত্মাতে যে অনাদিকাল হইতেই নিত্যসুখ বিদ্যমান আছে, এই বিষয়ে "আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ মোক্ষে প্রতিষ্ঠিতং" এই শ্রুতিই প্রমাণ। উক্ত শ্রুতিবাক্যে 'ব্রহ্মন্' শব্দের দ্বারা জীবাত্মাই বুঝিতে হইবে। কারণ, পরমাত্মার বন্ধনও নাই, মোক্ষও নাই। সুতরাং পরমাত্মার সম্বন্ধে ঐ কথার উপপত্তি হয় না। বৃহৎ বা বিভু, এই অর্থ-বোধক "ব্রহ্মন্" শব্দের দ্বারা জীবাত্মাও বুঝা যায়। "আনন্দং" এই স্থলে বৈদিক প্রয়োগবশতঃই ক্লীবলিঙ্গ প্রয়োগ হইয়াছে। অথবা ঐ স্থলে অস্ত্যর্থ "অচ্" প্রত্যয়নিষ্পন্ন "আনন্দ" শব্দের দ্বারা আনন্দবিশিষ্ট এই অর্থ বুঝিতে হইবে। তাহা হইলে উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা বুঝা যায় যে, জীবাত্মার আনন্দযুক্ত যে "রূপ" অর্থাৎ স্বরূপ, তাহা মুক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ মুক্তি হইলে তখন হইতেই জীবাত্মার অনাদিসিদ্ধ নিত্য আনন্দের অনুভূতি হয়। তাহা হইলে "অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ" এই শ্রুতিবাক্যের উপপত্তি কিরূপে হইবে? এতদুত্তরে রঘুনাথ শিরোমণি শেষে বলিয়াছেন যে, উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা শরীরশূন্য মুক্ত আত্মার সুখ ও দুঃখ উৎপন্ন হয় না অর্থাৎ কারণাভাবে তখন তাহাতে সুখ ও দুঃখ জন্মিতে পারে না; সুতরাং তখন তাহাতে জন্য-সুখসম্বন্ধ থাকে না, ইহাই কথিত হইয়াছে। উক্ত শ্রুতিবাক্যের দ্বারা মুক্ত আত্মার নিত্যসুখসম্বন্ধেরও অভাব প্রতিপন্ন করা যায় না। রঘুনাথ শিরোমণি সেখানে এই ভাবে পূর্ব্বোক্ত মতের সমর্থন করিয়া উহার কোন প্রতিবাদ করেন নাই। পরন্তু "প্রাহুঃ" এই বাক্যে "প্র" শব্দের প্রয়োগ করিয়া উক্ত মতের প্রশংসাই করিয়া গিয়াছেন। এই জন্যই "অনুমানচিন্তামণি"র "দীধিতি"র মঙ্গলাচরণশ্লোকে রঘুনাথ শিরোমণির "অখণ্ডানন্দবোধায়" এই বাক্যের ব্যাখ্যায়

টীকাকার গদাধর ভট্টাচার্য্য শেষে বলিয়াছেন যে, অথবা রঘুনাথ শিরোমণি নিত্যসুখের অভিব্যক্তি মুক্তি, এই ভট্টমতের পরিষ্কার (সমর্থন) করায় সেই মতাবলম্বনেই তিনি বলিয়াছেন—"অখণ্ডানন্দ-বোধায়"। যাহা হইতে অর্থাৎ যাহার উপাসনার ফলে অখণ্ড (নিত্য) আনন্দের বোধ হয় অর্থাৎ নিত্যসুখের অভিব্যক্তিরূপ মোক্ষ জন্মে, ইহাই ঐ বাক্যের অর্থ। গদাধর ভট্টাচার্য্য নিজেও তাঁহার "মুক্তিবাদ" গ্রন্থে ভট্টমত বলিয়াই উক্ত মতের উল্লেখপূর্ব্বক উহার সমর্থন করিতে অনেক বিচার করিয়াছেন। তিনি রঘুনাথশিরোমণির পূর্ব্বোক্ত কথাও সেখানে বলিয়াছেন। কিন্তু তিনি উক্ত মত গ্রহণ করেন নাই। তিনি প্রচলিত ন্যায়মতেরই সমর্থন করিবার জন্য উক্ত মতের খণ্ডন করিতে সেখানে বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত মতেও যখন মুক্তিকালে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি অবশ্য হইবে, উহা অবশ্য স্বীকার্য্য, তখন তাহাতে তত্ত্বজ্ঞানের কারণত্বও অবশ্য স্বীকার্য্য হওয়ায় ঐ আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিই মুক্তির স্বরূপ, ইহাই স্বীকার করা উচিত। মুক্তিকালে অতিরিক্ত নিত্যসুখসাক্ষাৎকারাদিকল্পনায় গৌরব, সুতরাং ঐ কল্পনা করা যায় না। সুতরাং কেবল আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিই মুক্তির স্বরূপ, ইহাই যখন যুক্তিসিদ্ধ, তখন "আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে দুঃখাভাব অর্থেই লাক্ষণিক "আনন্দ" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে এবং পরে "মোক্ষে প্রতিষ্ঠিতং" এই বাক্যের দ্বারাও ঐ দুঃখাভাব যাহা ব্রহ্মের "রূপ" অর্থাৎ নিত্যধর্ম্ম, তাহা জীবাত্মার মুক্তি হইলে তাহাতে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ উত্তরকালে নিরবধি হইয়া বিদ্যমান থাকে, ইহাই বুঝিতে হইবে। দুঃখাভাব যে মুক্তিকালে অনুভূত হয়, ইহা ঐ শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য নহে; কারণ, মুক্তিকালে শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি না থাকায় কোন জ্ঞানই উৎপন্ন হইতে পারে না। তখন জীবাত্মা ব্রহ্মের ন্যায় সর্ব্বথা দুঃখশূন্য হইয়া বিদ্যমান থাকেন, আর কখনও তাঁহার কোনরূপ দুঃখ জন্মে না, জন্মিতেই পারে না। সুতরাং তখন তিনি ব্রহ্মসদৃশ হন। ফলকথা, পূর্ব্বোক্ত অনেক শ্রুতিতে যে "আনন্দ" শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, উহার অর্থ সুখ নহে, উহার অর্থ দুঃখাভাব। দুঃখাভাব অর্থেও "আনন্দ" ও "সুখ" প্রভৃতি শব্দের লাক্ষণিক প্রয়োগ লৌকিক বাক্যেও অনেক স্থলে দেখা যায়। শ্রুতিতেও সেইরূপ প্রয়োগ হইয়াছে। সুতরাং উহার দ্বারা মুক্তিতে যে নিত্যসুখের অনুভূতি হয় অর্থাৎ নিত্যসুখের অনুভূতি মুক্তি, ইহা সিদ্ধ করা যায় না। ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও পূর্ব্বোক্ত মতের খণ্ডন করিতে পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিস্থ "আনন্দ" শব্দের লক্ষণার দ্বারা দুঃখাভাব অর্থই সমর্থন করিয়াছেন। তদনুসারে তন্মতানুবর্ত্তী অন্যান্য নৈয়ায়িকগণও ঐ কথাই বলিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত মতের খণ্ডন ও মণ্ডনের জন্য প্রাচীনকাল হইতেই ভারতীয় দার্শনিকগণের মধ্যে বহু বিচার হইয়াছে। জৈন দার্শনিকগণও উক্ত বিষয়ে বহু বিচার করিয়াছেন। জৈনদর্শনের "প্রমাণনয়তত্ত্বালোকালঙ্কার" নামক গ্রন্থের "রত্নাবতারিকা" টীকাকার মহাদার্শনিক রত্নপ্রভাচার্য্য ঐ গ্রন্থের সপ্তম পরিচ্ছেদের শেষ সূত্রের টীকায় বিশেষ বিচারপূর্ব্বক মুক্তি যে পরমসুখানুভবরূপ, এই মতেরই সমর্থন করিয়াছেন। তিনিও ভাসর্ব্বজ্ঞোক্ত "সুখমাত্যন্তিকং যত্র" ইত্যাদি পূর্ব্বলিখিত বচনকে স্মৃতি বলিয়া উল্লেখ করিয়া নিজ মত সমর্থন করিয়াছেন। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে,

উক্ত বচনে "সুখ"শব্দ যে দুঃখাভাব অর্থে লাক্ষণিক, ইহা বলা যায় না। কারণ, উক্ত বচনে মুখ্য সুখই যে উহার অর্থ, ইহাতে কোন বাধক নাই। পরন্তু কেবল আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিমাত্র—যাহা পাষাণতুল্যাবস্থা, তাহা পুরুষার্থও হইতে পারে না। কারণ, কোন জীবই কোন কালে নিজের ঐরূপ অবস্থা চায় না। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন পূর্ব্বোক্ত মতের খণ্ডন করিতে বহু কথা বলিয়াছেন (প্রথম খণ্ড, ১৯৫—২০০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। তাঁহার চরম কথা এই যে, নিত্যসুখের কামনা থাকিলে মুক্তি হইতে পারে না। কারণ, কামনা বা রাগ বন্ধন, উহা মুক্তির বিরোধী। বন্ধন থাকিলে কিছুতেই তাহাকে মুক্ত বলা যায় না। যদি বল, মুমুক্ষুর প্রথমে নিত্যসুখে কামনা থাকিলেও পরে তাঁহার উহাতেও উৎকট বৈরাগ্য জন্মে। মুক্তি হইলে তখন তাঁহার ঐ নিত্যসুখে কামনা না থাকায় তাঁহাকে অবশ্য মুক্ত বলা যায়। এতদুত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন যে, যদি সর্ব্ববিষয়ে উৎকট বৈরাগ্যই মোক্ষে প্রবর্ত্তক হয়, মুমুক্ষুর শেষে যদি নিত্যসুখভোগেও কামনা না থাকে, তাহা হইলে তাঁহার নিত্যসুখ সম্ভোগ না হইলেও তাঁহাকে মুক্ত বলা যায়। কারণ, তাঁহার পক্ষে নিত্যসুখসম্ভোগ হওয়া না হওয়া উভয়ই তুল্য। উভয় পক্ষেই তাঁহার মুক্তিলাভে কোন সন্দেহ করা যায় না। আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি না হইলে কোনমতেই মুক্তি হয় না। যাঁহার উহা হইয়া গিয়াছে এবং নিত্যসুখসম্ভোগে কিছুমাত্র কামনা নাই, তাঁহার নিত্যসুখসম্ভোগ না হইলেও তাঁহাকে যখন মুক্ত বলিতেই হইবে, তখন মুক্তির স্বরূপ বর্ণনায় নিত্যসুখের অভিব্যক্তি মুক্তি, এই কথা বলা যায় না। জৈন মহাদার্শনিক রত্নপ্রভাচার্য্য ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের ঐ কথার খণ্ডন করিতে বলিয়াছেন যে, সুখজনক শব্দাদি বিষয়ে যে আসক্তি, উহাই বন্ধন। কারণ, উহাই বিষয়ের অর্জ্জন ও রক্ষণাদির প্রবৃত্তি উৎপন্ন করিয়া সংসারের কারণ হয়। কিন্তু সেই নিত্যসুখে যে কামনা, তাহা "রাগ" হইলেও সকল বিষয়ের অর্জ্জন ও রক্ষণাদি বিষয়ে নিবৃত্তি ও মুক্তির উপায় বিষয়ে প্রবৃত্তিরই কারণ হয়। নচেৎ সেই নিত্যসুখের প্রাপ্তি হইতে পারে না। পরন্তু সেই নিত্যসুখ বিষয়জনিত নহে। সুতরাং বৈষয়িক সমস্ত সুখের ন্যায় উহার বিনাশ হয় না। সুতরাং কোনকালে উহার বিনাশবশতঃ আবার উহা লাভ করিবার জন্য নানাবিধ হিংসাদিকর্ম্মে প্রবৃত্তি এবং তৎপ্রযুক্ত পুনর্জ্জন্মাদিরও আশঙ্কা নাই। অতএব মুমুক্ষুর নিত্যসুখে যে কামনা, তাহা বন্ধনের হেতু না হওয়ায় উহা "বন্ধ" নহে। সুতরাং উহা তাঁহার মুক্তির বিরোধী নহে; পরন্তু উহা মুক্তির অনুকূল। কারণ, ঐ নিত্যসুখে কামনা মুমুক্ষুকে নানাবিধ অতি দুঃসাধ্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে। ইহা স্বীকার না করিলে যাঁহারা কেবল আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিকে মুক্তি বলিয়াছেন, তাঁহাদিগের মতেও মুমুক্ষুর দুঃখে বিদ্বেষ স্বীকার্য্য হওয়ায় মুক্তি হইতে পারে না। কারণ, রাগের ন্যায় দ্বেষও যে বন্ধন, ইহাও সর্ব্বসম্মত। দ্বেষ থাকিলেও মুক্ত বলা যায় না। মুমুক্ষুর দুঃখে উৎকট দ্বেষ না থাকিলে তিনি উহার আত্যন্তিক নিবৃত্তির জন্য অতি দুঃসাধ্য নানাবিধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবেন কেন? যদি বল যে, মুমুক্ষুর দুঃখেও দ্বেষ থাকে না। রাগ ও দ্বেষও সংসারের কারণ, এই জন্য মুমুক্ষু ঐ উভয়ই ত্যাগ করেন। দুঃখে উৎকট দ্বেষই তাঁহার মোক্ষার্থ নানা দুঃসাধ্য কর্ম্মের প্রবর্ত্তক নহে। সর্ব্ববিষয়ে বৈরাগ্য ও আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির ইচ্ছাই তাঁহার ঐ সমস্ত

কর্ম্মের প্রবর্ত্তক। মুমুক্ষু দুঃখকে বিদ্বেষ করেন না। দুঃখনিবৃত্তির ইচ্ছা ও দুঃখে বিদ্বেষ এক পদার্থ নহে। বৈরাগ্য ও বিদ্বেষও এক পদার্থ নহে। এতদুত্তরে রত্নপ্রভাচার্য্য বলিয়াছেন যে, পূর্ব্বোক্ত পক্ষেও তুল্যভাবে ঐরূপ কথা বলা যায়। অর্থাৎ মুমুক্ষুর যেমন দুঃখে দ্বেষ নাই, দ্বেষ না থাকিলেও তিনি উহার আত্যন্তিক নিবৃত্তির জন্য প্রযত্ন করেন, তদ্রূপ তাঁহার নিত্যসুখেও রাগ নাই। নিত্যসুখভোগে তাঁহার ইচ্ছা হইলেও উহা আসক্তিরূপ নহে। সুতরাং উহা তাঁহার বন্ধনের হেতু হয় না। ইচ্ছামাত্রই বন্ধন নহে। অন্যথা সকল মতেই মুক্তিবিষয়ে ইচ্ছাও (মুমুক্ষুত্বও) বন্ধন হইতে পারে।

বস্তুতঃ ভাষ্যকারের পূর্ব্বোক্ত চরম কথার উত্তরে ইহা বলা যায় যে, মুমুক্ষুর নিত্যসুখসম্ভোগে কামনা বিনষ্ট হইলেও আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির ন্যায় তাঁহার নিত্যসুখসম্ভোগও হয়। কারণ, বেদাদি শাস্ত্রে নানা স্থানে যখন মুক্ত পুরুষের সুখসম্ভোগের কথাও আছে, তখন উহা স্বীকার্য্য। সুতরাং মোক্ষজনক তত্ত্বজ্ঞানই যে ঐ সুখসম্ভোগের কারণ, ইহাও স্বীকার্য্য। মুক্তির স্বরূপ বর্ণনায় বেদাদি শাস্ত্রে যে "আনন্দ" ও "সুখ"শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহার মুখ্য অর্থে কোন বাধক না থাকায় দুঃখাভাবরূপ লাক্ষণিক অর্থ গ্রহণের কোন কারণ নাই। অবশ্য "অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ" এই শ্রুতিবাক্যে মুক্ত পুরুষের "প্রিয়" অর্থাৎ সুখেরও অভাব কথিত হইয়াছে। কিন্তু সেখানে "অপ্রিয়"শব্দের সাহচর্য্যবশতঃ "প্রিয়" শব্দের দ্বারা জন্য সুখই বুঝা যায়। সুতরাং উহার দ্বারা মুক্ত পুরুষের যে নিত্যসুখসম্ভোগও হয় না, ইহা প্রতিপন্ন হয় না। পরন্তু "আনন্দ" ও "সুখ"শব্দের লক্ষণার দ্বারা দুঃখাভাব অর্থ গ্রহণ করিলে উহার মুখ্য অর্থ একেবারেই ত্যাগ করিতে হয়। তদপেক্ষায় উক্ত শ্রুতিবাক্যে "প্রিয়"শব্দের দ্বারা জন্য সুখরূপ বিশেষ অর্থ গ্রহণ করাই সমীচীন। তাহা হইলে "ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ" এই শ্রুতিবাক্যের সহিত "আনন্দং ব্রহ্মণো রূপং তচ্চ মোক্ষে প্রতিষ্ঠিতং" এবং "রসং হেবায়ং লব্ধ্বানন্দীভবতি" ইত্যাদি শ্রুতি এবং "সুখমাত্যন্তিকং যত্র" ইত্যাদি স্মৃতির কোন বিরোধ নাই। কারণ, ঐ সমস্ত শাস্ত্রবাক্যে মুক্ত পুরুষের নিত্যসুখই কথিত হইয়াছে। নিত্যসুখের অস্তিত্ব বিষয়েও ঐ সমস্ত শাস্ত্রবাক্যই প্রমাণ। সুতরাং উহাতে কোন প্রমাণ নাই, ইহাও বলা যায় না। এবং মুক্ত পুরুষের নিত্যসুখসম্ভোগ তত্ত্বজ্ঞানজন্য হইলে কোন কালে অবশ্যই উহার বিনাশ হইবে, ইহাও বলা যায় না। কারণ, উহা শাস্ত্রসিদ্ধ হইলে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তির ন্যায় উহাও অবিনাশী, ইহাও শাস্ত্রসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং শাস্ত্রবিরুদ্ধ অনুমানের দ্বারা উহার বিনাশিত্ব সিদ্ধ করা যাইবে না। পরন্তু ধ্বংস যেমন জন্য পদার্থ হইলেও অবিনাশী, ইহা স্বীকৃত হইয়াছে, তদ্রূপ মুক্ত পুরুষের নিত্য-সুখসম্ভোগও অবিনাশী, ইহাও স্বীকার করা যাইবে। পুণ্যসাধ্য স্বর্গের কারণ পুণ্যের বিনাশে স্বর্গ থাকে না, এ বিষয়ে অনেক শাস্ত্রপ্রমাণ ("ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি" ইত্যাদি) আছে। কিন্তু নিত্যসুখসম্ভোগের বিনাশ বিষয়ে সর্ব্বসম্মত কোন প্রমাণ নাই। পরন্তু মুক্ত পুরুষের নিত্যসুখসম্ভোগে কামনা না থাকায় উহা না হইলেও তাঁহার কোন ক্ষতি নাই, ইহা সত্য, কিন্তু উহা শাস্ত্রসিদ্ধ হইলে এবং উহার শাস্ত্রসিদ্ধ কারণ উপস্থিত হইলে উহা যে অবশ্যম্ভাবী, ইহা

স্বীকার্য্য। যেমন দুঃখভোগের কামনা না থাকিলেও উহার কারণ উপস্থিত হইলে সকলেরই দুঃখভোগ জন্মে, তদ্রূপ সুখভোগের কামনা না থাকিলেও উহার কারণ উপস্থিত হইলে অবশ্যই সুখভোগ জন্মে, ইহাও স্বীকার্য্য। ব্রজগোপীদিগের আত্মসুখের কিছুমাত্র কামনা না থাকিলেও প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণের দর্শনে তাঁহাদিগের শ্রীকৃষ্ণের সুখাপেক্ষায় কোটিগুণ সুখ হইত,[১] ইহা সত্য, উহা কবিকল্পিত নহে। প্রেমের স্বরূপ বুঝিলেই ইহা বুঝিতে পারা যায়।

ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন বলিয়াছেন যে, যদি অনাদি কাল হইতেই আত্মাতে নিত্যসুখ বিদ্যমান থাকে এবং উহার অনুভূতিও নিত্য হয়, তাহা হইলে সংসারকালেও আত্মাতে নিত্যসুখের অনুভূতি বিদ্যমান থাকায় তখনও আত্মাকে মুক্ত বলিতে হয়। তাহা হইলে মুক্ত আত্মা ও সংসারী আত্মার কোন বিশেষ থাকে না। এতদুত্তরে ভাসর্ব্বজ্ঞ তাঁহার "ন্যায়সার" গ্রন্থে (আগমপরিচ্ছেদে) বলিয়াছেন যে, যেমন চক্ষুরিন্দ্রিয় ও ঘটাদি দ্রব্য বিদ্যমান থাকিলেও ভিত্তি প্রভৃতি ব্যবধান থাকিলে সেই প্রতিবন্ধকবশতঃ চক্ষুরিন্দ্রিয় ও ঘটাদি দ্রব্যের সংযোগ সম্বন্ধ হয় না, তদ্রূপ আত্মার সংসারাবস্থায় তাহাতে অধর্ম্ম ও দুঃখাদি বিদ্যমান থাকায় তখন তাহাতে বিদ্যমান নিত্যসুখ ও উহার নিত্য অনুভূতির বিষয়বিষয়িভাব সম্বন্ধ হয় না। সুতরাং নিত্যসুখের অনুভূতিকে নিত্য বলিয়া স্বীকার করিলেও কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু আত্মার মুক্তাবস্থায় অধর্ম্ম ও দুঃখাদি না থাকায় তখন প্রতিবন্ধকের অভাববশতঃ তাহাতে নিত্যসুখ ও উহার অনুভূতির বিষয়বিষয়িভাব সম্বন্ধ জন্মে। ঐ সম্বন্ধ জন্য পদার্থ হইলেও ধ্বংস পদার্থের ন্যায় উহার ধ্বংসের কোন কারণ না থাকায় উহার অবিনাশিত্বই সিদ্ধ হয়। ভাসর্ব্বজ্ঞ এই ভাবে ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের পূর্ব্বোক্ত আপত্তির খণ্ডনপূর্ব্বক তাঁহার নিজ মতের সমর্থন করিয়াছেন। উদয়নের "আত্মতত্ত্ববিবেকে"র টীকার শেষ ভাগে নব্যনৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণিও ভাষ্যকার বাৎস্যায়নোক্ত আপত্তির খণ্ডনপূর্ব্বক শ্রুতিপ্রমাণের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত মতের সমর্থন ও প্রশংসা করিয়াছেন এবং তাঁহার পরবর্ত্তী নব্যনৈয়ায়িক গদাধর ভট্টাচার্য্য "মুক্তিবাদ" গ্রন্থে উক্ত মতের সমালোচনা করিয়া, শেষে কেবল কল্পনাগৌরবই উক্ত মতে দোষ বলিয়াছেন, ইহাও পূর্ব্বে বলিয়াছি। সে যাহা হউক, মুক্ত পুরুষের নিত্যসুখের অনুভূতি যদি শ্রুতিসিদ্ধ হয়, তাহা হইলে ভাষ্যকারোক্ত কোন যুক্তির দ্বারাই উহার খণ্ডন হইতে পারে না, ইহা স্বীকার্য্য।

এখানে ইহাও অবশ্য জ্ঞাতব্য যে, ছান্দোগ্য উপনিষদে যেমন "অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ" এই শ্রুতিবাক্য আছে, তদ্রূপ উহার পূর্ব্বে অনেক শ্রুতিবাক্যের দ্বারা মুক্ত পুরুষের অনেক ঐশ্বর্য্যও কথিত হইয়াছে। "স যদি পিতৃলোককামো ভবতি, সংকল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি, তেন পিতৃলোকেন সম্পন্নো মহীয়তে" (ছান্দোগ্য, ৮।২।১) ইত্যাদি অনেক শ্রুতিবাক্যে মুক্ত পুরুষের সংকল্পমাত্রেই কামনাবিশেষের সিদ্ধি কথিত হইয়াছে। আবার "অশরীরং বাব সন্তং"

১। গোপীগণ করে যবে কৃষ্ণদরশন।
সুখবাঞ্ছা নাহি সুখ হয় কোটিগুণ॥
—চৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, চতুর্থ পঃ।

ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের পরেও "এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায়" ইত্যাদি[1] শ্রুতি-বাক্যের দ্বারা কথিত হইয়াছে যে, এই জীব এই শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরম জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়া স্বস্বরূপে অবস্থিত হন। তিনি উত্তম পুরুষ, তিনি সেখানে স্ত্রীসমূহ অথবা যানসমূহ অথবা জ্ঞাতিসমূহের সহিত রমণ করিয়া, ক্রীড়া করিয়া, হাস্য করিয়া বিচরণ করেন। তিনি পূর্ব্বে যে শরীর লাভ করিয়াছিলেন, সেই শরীরকে স্মরণ করেন না। তাহার পরে অন্য শ্রুতি-বাক্যের[2] দ্বারা ইহাও কথিত হইয়াছে যে, মন তাঁহার দৈব চক্ষুঃ, সেই দৈব চক্ষুঃ মনের দ্বারা এই সমস্ত কাম দর্শন করতঃ প্রীত হন। বেদান্তদর্শনের চতুর্থ অধ্যায়ের চতুর্থ পাদে মহর্ষি বাদরায়ণ ঐ সমস্ত শ্রুতিবাক্য এবং আরও অনেক শ্রুতিবাক্য অবলম্বন করিয়া মুক্ত পুরুষেরই ঐরূপ নানাবিধ ঐশ্বর্য্য বা সুখের কথা বলিয়া গিয়াছেন। তিনি "মুক্তঃ প্রতিজ্ঞানাৎ" এবং "আত্মা প্রকরণাৎ" (৪।৪।২।৩) এই দুই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত ছান্দোগ্য-শ্রুতিবাক্যে যে, মুক্ত পুরুষের অবস্থাই কথিত হইয়াছে, ইহা সমর্থন করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত ছান্দোগ্য-শ্রুতিবাক্যে মুক্ত জীব যে স্বস্বরূপে অবস্থিত হন, ইহা কথিত হইয়াছে। ঐ স্বরূপ কি প্রকার? ইহা বলিতে পরে বেদান্তদর্শনে মহর্ষি বাদরায়ণ "ব্রাহ্মেণ জৈমিনিরুপন্যাসাদিভ্যঃ" (৪।৪।৫) এই সূত্রের দ্বারা প্রথমে বলিয়াছেন যে, জৈমিনির মতে উহা ব্রাহ্ম রূপ। অর্থাৎ আচার্য্য জৈমিনি বলেন যে, মুক্ত জীব ব্রহ্মস্বরূপ হন, ব্রহ্ম নিষ্পাপ, সত্যকাম, সত্যসংকল্প, সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বেশ্বর। মুক্ত জীবও তদ্রূপ হন। কারণ, "য আত্মাঽপহতপাপ্মা" ইত্যাদি "সত্যকামঃ সত্যসংকল্পঃ" ইত্যন্ত (ছান্দোগ্য, ৮।৭।১) শ্রুতিবাক্যের দ্বারা মুক্ত জীবের ঐরূপই স্বরূপ কথিত হইয়াছে। বাদরায়ণ পরে "চিতিতন্মাত্রেণ তদাত্মকত্বাদি-ত্যৌড়ুলোমিঃ" (৪।৪।৬) এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, ঔড়ুলোমি নামক আচার্য্যের মতে মুক্ত জীবের বাস্তব সত্যসংকল্পত্বাদি কিছু থাকে না। চৈতন্যই আত্মার স্বরূপ, অতএব মুক্ত জীব কেবল চৈতন্যরূপেই অবস্থিত থাকেন। মুক্ত জীবের স্বরূপ চৈতন্যমাত্রই যুক্তিযুক্ত। মহর্ষি বাদরায়ণ পরে উক্ত উভয় মতের সামঞ্জস্য করিয়া নিজমত বলিয়াছেন,—"এবমপ্যুপন্যাসাৎ পূর্ব্বভাবাদবিরোধং বাদরায়ণঃ" (৪।৪।৭)। অর্থাৎ আত্মা চিন্মাত্র বা চৈতন্যস্বরূপ, ইহা স্বীকার করিলেও তাঁহার নিজমতে পূর্ব্বোক্ত ব্রাহ্মরূপতার কোন বিরোধ নাই। আত্মা চিন্মাত্র হইলেও মুক্তাবস্থায় তাঁহার সত্যসংকল্পত্বাদি অবশ্যই হয়। কারণ, শ্রুতিতে নানা স্থানে মুক্ত পুরুষের ব্রাহ্ম ঐশ্বর্য্য কথিত হইয়াছে। মুক্ত পুরুষের সম্বন্ধেই শ্রুতি বলিয়াছেন,—"আপ্নোতি স্বারাজ্যং" (তৈত্তি, ১।৬।২) "তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি" (ছান্দোগ্য), "সংকল্পাদেবাস্য পিতরঃ সমুত্তিষ্ঠন্তি" (ছান্দোগ্য), "সর্ব্বেঽস্মৈ দেবা বলিমাহরন্তি" (তৈত্তি ১।৫।৩) অর্থাৎ মুক্ত পুরুষ

১। এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে, স উত্তমঃ পুরুষঃ, স তত্র পর্য্যেতি, জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ স্ত্রীভির্ব্বা যানৈর্ব্বা জ্ঞাতিভির্ব্বা নোপজনং স্মরন্নিদং শরীরং"—ছান্দোগ্য ।৮।১২।৩।

২। "মনোঽস্য দৈবং চক্ষুঃ, স বা এষ এতেন দৈবেন চক্ষুষা মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে" :—ছান্দোগ্য, ৮।১২।৫।

স্বারাজ্য লাভ করেন। সমস্ত লোকেই তাঁহার স্বেচ্ছাগতি হয়। তাঁহার সংকল্পমাত্রে পিতৃগণ উপস্থিত হন। সমস্ত দেবগণ তাঁহার উদ্দেশ্যে বলি (পূজোপহার) আহরণ করেন। বাদরায়ণ পরে "সংকল্পাদেব তৎশ্রুতেঃ" এবং "অতএব চানন্যাধিপতিঃ" (৪।৪।৮।৯) এই দুই সূত্রের দ্বারা পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। মুক্তাবস্থায় শরীর থাকে কি না, এই বিষয়ে পরে "অভাবং বাদরিরাহ হ্যেবং" এবং "ভাবং জৈমিনির্ব্বিকল্পামননাৎ"—(৪।৪।১০।১১) এই দুই সূত্রের দ্বারা বাদরায়ণ বলিয়াছেন যে, বাদরি মুনির মতে মুক্তাবস্থায় শরীর থাকে না। জৈমিনি মুনির মতে শরীর থাকে। পরে "দ্বাদশাহবদুভয়বিধং বাদরায়ণোঽতঃ", "তন্বভাবে সন্ধ্যবদুপপত্তেঃ" এবং "ভাবে জাগ্রদ্বৎ"—(৪।৪।১২।১৩।১৪) এই তিন সূত্রের দ্বারা বাদরায়ণ তাঁহার নিজ সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন যে, মুক্ত পুরুষের শরীরবত্তা ও শরীরশূন্যতা তাঁহার সংকল্পানুসারেই হইয়া থাকে। তিনি সত্যসংকল্প, তাঁহার সংকল্পও বিচিত্র। তিনি যখন শরীরী হইবেন বলিয়া সংকল্প করেন, তখন তিনি শরীরী হন। আবার যখন শরীরশূন্য হইবেন বলিয়া সংকল্প করেন, তখন তিনি শরীর-শূন্য হন। "মনসৈতান্ কামান্ পশ্যন্ রমতে"—(ছান্দোগ্য) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা যেমন মুক্ত পুরুষের শরীরশূন্যতা বুঝা যায়, তদ্রূপ "স একধা ভবতি, ত্রিধা ভবতি, পঞ্চধা সপ্তধা নবধা" —(ছান্দোগ্য ৭।২৬।২) ইত্যাদি অনেক শ্রুতিবাক্যের দ্বারা মুক্ত পুরুষের মনের ন্যায় ইন্দ্রিয় সহিত শরীরসৃষ্টিও বুঝা যায়। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত উভয়বোধক শ্রুতি থাকায় মুক্ত পুরুষের স্বেচ্ছানুসারে তাঁহার শরীরবত্তা ও শরীরশূন্যতা, এই উভয়ই সিদ্ধান্ত। কিন্তু মুক্ত পুরুষের শরীর থাকাকালে তাঁহার জাগ্রদ্বৎ ভোগ হয়। শরীরশূন্যতাকালে স্বপ্নবৎ ভোগ হয়। বাদরায়ণ পরে "স একধা ভবতি ত্রিধা ভবতি" ইত্যাদি শ্রুতি অনুসারে "প্রদীপবদাবেশস্তথাহি দর্শয়তি" (৪।৪।১৫) এই সূত্রের দ্বারা ইহাও বলিয়াছেন যে, মুক্ত পুরুষ নিজের ইচ্ছানুসারে কায়ব্যূহ রচনা অর্থাৎ নানা শরীর নির্ম্মাণ করিয়া, সেই সমস্ত শরীরে অনুপ্রবেশ করেন। বাদরায়ণ পরে "জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাদসন্নিহিতত্বাচ্চ" (৪।৪।১৭) এই সূত্রের দ্বারা ইহাও বলিয়াছেন যে, মুক্ত পুরুষ পূর্ব্বোক্ত সমস্ত বিষয়ে স্বাধীন হইয়া স্বরাট্ হন বটে, কিন্তু জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারে তাঁহার কোনই সামর্থ্য বা কর্তৃত্ব হয় না। অর্থাৎ তিনি পরমেশ্বরের ন্যায় জগতের সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করিতে পারেন না। বাদরায়ণ ইহা সমর্থন করিতে পরে "ভোগমাত্রসাম্যলিঙ্গাচ্চ" (৪।৪।২১) এই সূত্রের দ্বারা বলিয়াছেন যে, পরমেশ্বরের সহিত মুক্ত পুরুষের কেবল ভোগমাত্রে সাম্য হয় অর্থাৎ তাঁহার ভোগই কেবল পরমেশ্বরের তুল্য হয়, শক্তি তাঁহার তুল্য হয় না। এ জন্যই মুক্ত পুরুষ পরমেশ্বরের ন্যায় সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার করিতে পারেন না। শ্রুতিতে অনাদিসিদ্ধ পরমেশ্বরই সৃষ্ট্যাদিকর্ত্তা বলিয়া কথিত হইয়াছেন। অবশ্যই আপত্তি হইতে পারে যে, তাহা হইলে মুক্ত পুরুষের ঐশ্বর্য্য পরমেশ্বরের ন্যায় নিরতিশয় না হওয়ায় উহা লৌকিক ঐশ্বর্য্যের ন্যায় কোন কালে অবশ্যই বিনষ্ট হইবে, উহা কখনই চিরস্থায়ী হইতে পারে না। সুতরাং কোন কালে মুক্ত পুরুষেরও পুনরাবৃত্তি স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তাহা হইলে আর তাঁহাকে মুক্ত বলা যায় না। এতদুত্তরে বেদান্তদর্শনের সর্ব্বশেষে বাদরায়ণ সূত্র বলিয়াছেন,—"অনাবৃত্তিঃ শব্দাদনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ"। অর্থাৎ ছান্দোগ্য উপনিষদের সর্ব্বশেষোক্ত "নচ

পুনরাবর্ত্ততে নচ পুনরাবর্ত্ততে" এই শব্দপ্রমাণবশতঃ ব্রহ্মলোকগত সেই মুক্ত পুরুষের পুনরাবৃত্তি হয় না, ইহা সিদ্ধ আছে। সুতরাং ঐরূপ মুক্ত পুরুষের পুনরাবৃত্তির আপত্তি হইতে পারে না। পরে ইহা ব্যক্ত হইবে।

এখন প্রশ্ন এই যে, উপনিষদে নানা স্থানে যখন মুক্ত পুরুষের নানারূপ ঐশ্বর্য্য ও সংকল্পমাত্রেই সুখসম্ভোগের বর্ণন আছে এবং বেদান্তদর্শনের শেষ পাদে ঐ সিদ্ধান্ত সমর্থিত হইয়াছে, তখন মুক্ত পুরুষের সুখ দুঃখ কিছুই থাকে না, তখন তাঁহার কোন বিষয়ে জ্ঞানই থাকে না, এই সিদ্ধান্ত কিরূপে স্বীকার করা যায় ? শ্রুতিপ্রামাণ্যবাদী সমস্ত দর্শনকারই যখন শ্রুতি অনুসারে মুক্ত পুরুষের সুখসম্ভোগাদি স্বীকার করিতে বাধ্য, তখন উক্ত সিদ্ধান্তে তাঁহাদিগের মধ্যে বিবাদই বা কিরূপে হইয়াছে ? ইহাও বলা আবশ্যক। এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, উপনিষদে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত পুরুষদিগের সম্বন্ধেই পূর্ব্বোক্তরূপ ঐশ্বর্য্যাদি কথিত হইয়াছে। "ব্রহ্মলোকান্ গময়তি তে তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরাঃ পরাবতো বসন্তি" (বৃহদারণ্যক—৬।২।১৫) ইত্যাদি শ্রুতি এবং ছান্দোগ্যো-পনিষদের সর্ব্বশেষে "স খল্বেবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে, নচ পুনরাবর্ত্ততে নচ পুনরাবর্ত্ততে" এই শ্রুতিবাক্যের দ্বারা উপনিষদের ঐরূপ তাৎপর্য্য বুঝা যায়। সুতরাং বেদান্ত-দর্শনের শেষ পাদে মহর্ষি বাদরায়ণও উক্ত শ্রুতি অনুসারেই ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত পুরুষের সম্বন্ধেই পূর্ব্বোক্ত ঐশ্বর্য্যাদি সমর্থন করিয়াছেন। এবং যাঁহারা উপাসনাবিশেষের ফলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া, সেখান হইতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া, তাহার ফলে মহাপ্রলয়ে হিরণ্যগর্ভের সহিত বিদেহ-কৈবল্য বা নির্ম্মাণ মুক্তি লাভ করিবেন, তাঁহাদিগের কখনই পুনরাবৃত্তি হইবে না, ইহাই ছান্দোগ্য উপনিষদের সর্ব্বশেষ বাক্যের তাৎপর্য্য। "নারায়ণ" প্রভৃতি উপনিষদে "তে ব্রহ্মলোকে তু পরান্তকালে পরামৃতাৎ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে" এই শ্রুতিবাক্যের দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্ত স্পষ্টই কথিত হইয়াছে। তদনুসারে বেদান্তদর্শনে মহর্ষি বাদরায়ণও পূর্ব্বে 'কার্য্যাত্যয়ে তদধ্যক্ষেণ সহাতঃ পরমভিধানাৎ" (৪।৩।১০) এই সূত্রের দ্বারা উক্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছেন এবং উহার পরে "স্মৃতেশ্চ" এই সূত্রের দ্বারা স্মৃতিশাস্ত্রেও যে উক্ত সিদ্ধান্তই কথিত হইয়াছে, ইহা বলিয়া উক্ত সিদ্ধান্ত সমর্থন করিয়াছেন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণ—"ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে। পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদং—"এই স্মৃতিবচন উদ্ধৃত করিয়া বাদরায়ণের উক্ত সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করিয়াছেন। বাদরায়ণ তাঁহার পূর্ব্বোক্ত শ্রুতি-স্মৃতি-সম্মত সিদ্ধান্তানুসারেই বেদান্তদর্শনের সর্ব্বশেষে "অনাবৃত্তিঃ শব্দাদনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ" এই সূত্রের দ্বারা ব্রহ্মলোক হইতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া, মহাপ্রলয়ে হিরণ্যগর্ভের সহিত নির্ব্বাণপ্রাপ্ত পুরুষেরই আর পুনরাবৃত্তি হয় না, ইহাই বলিয়াছেন। এবং ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত পুরুষবিশেষের কালে নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ অবশ্যম্ভাবী, এই জন্যই তাঁহাদিগকেই প্রথমেও মুক্ত বলিয়া শ্রুতি অনুসারে প্রথমে তাঁহাদিগের নানাবিধ ঐশ্বর্য্যাদি বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিই যে চরম পুরুষার্থ বা প্রকৃত মুক্তি, ইহা তিনি বলেন নাই। তাঁহার পূর্ব্বোক্ত অন্যান্য সূত্রের পর্য্যালোচনা করিলে তাঁহার পূর্ব্বোক্ত-রূপ সিদ্ধান্ত বিষয়ে কোন সংশয় থাকিতে পারে না। কিন্তু ইহাও জানা আবশ্যক যে, ব্রহ্মলোক-

প্রাপ্ত সমস্ত পুরুষেরই যে পুনরাবৃত্তি হয় না, তাঁহারা সকলেই যে সেখান হইতে অবশ্য তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া নির্ব্বাণ লাভ করেন, ইহাও শাস্ত্রসিদ্ধান্ত নহে। কারণ, "আব্রহ্ম ভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জুন। মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥" (গীতা ৮।১৬)—এই ভগবদ্বাক্যে ব্রহ্মলোক হইতেও পুনরাবৃত্তি কথিত হইয়াছে। উপনিষৎ ও উক্ত ভগবদ্‌বাক্য প্রভৃতির সমন্বয় করিয়া উক্ত বিষয়ে পূর্ব্বাচার্য্যগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, যাঁহারা পঞ্চাগ্নিবিদ্যার অনুশীলন ও যজ্ঞাদি নানাবিধ কর্ম্মের ফলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, তাঁহাদিগের ব্রহ্মলোকেও তত্ত্বজ্ঞান জন্মে না, সুতরাং প্রলয়ের পরে তাঁহাদিগের পুনর্জ্জন্ম অবশ্য হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা শাস্ত্রানুসারে ক্রমমুক্তিফলক উপাসনাবিশেষের ফলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন, তাঁহারা ব্রহ্মলোকে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া মহাপ্রলয়ে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার সহিত নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করেন। সুতরাং তাঁহাদিগের আর পুনর্জ্জন্ম হইতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত ভগবদ্‌গীতা-শ্লোকের টীকায় পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামীও এই সিদ্ধান্ত স্পষ্ট প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন[১]।

এখন বুঝা গেল যে, ব্রহ্মলোকস্থ পুরুষের নানাবিধ ঐশ্বর্য্য ও নানা সুখসম্ভোগ শ্রুতিসিদ্ধ হইলেও ব্রহ্মলোক হইতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া বিদেহ কৈবল্য বা নির্ব্বাণ-মুক্তি লাভ করিলে তখন সেই পুরুষের কিরূপ অবস্থা হয়, তখন তাঁহার কোনরূপ সুখসম্ভোগ হয় কি না? এই বিষয়েই দার্শনিক আচার্য্যগণের মধ্যে মতভেদ হইয়াছে ও নানা কারণে তাহা হইতে পারে। উপনিষদে নানা স্থানে নানা ভাবে মুক্ত পুরুষের অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। সেই সমস্ত শ্রুতিবাক্যের ব্যাখ্যাভেদেও মুক্তির স্বরূপবিষয়ে নানা মতভেদ হইয়াছে। কিন্তু সকল মতেই মুক্তি হইলে যে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হয়, পুনর্জ্জন্মের সম্ভাবনা না থাকায় আর কখনও কোনরূপ দুঃখের সম্ভাবনাই থাকে না, ইহা স্বীকৃত সত্য। এ জন্য মহর্ষি গোতম "তদত্যন্তবিমোক্ষোঽপবর্গঃ" (১.১।২২) এই সূত্রের দ্বারা মুক্তির ঐ সর্ব্বসম্মত স্বরূপই বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতের ব্যাখ্যাতা ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন প্রভৃতি নৈয়ায়িকগণ মুক্তি হইলে তখন আত্মার কোনরূপ জ্ঞানই জন্মে না, তখন তাহার কোন সুখসম্ভোগাদিও হয় না, হইতেই পারে না, আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিমাত্রই মুক্তির স্বরূপ, এই মতই বিচারপূর্ব্বক সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের মূলকথা এই যে, জীবাত্মাতে অনাদি কাল হইতে যে নিত্য সুখ বিদ্যমান আছে, এ বিষয়ে কিছুমাত্র প্রমাণ নাই। জীবাত্মার সুখসম্ভোগ হইলে উহা শরীরাদি কারণজন্যই হইবে। কিন্তু নির্ব্বাণ মুক্তি হইলে তখন শরীরাদি কারণ না থাকায় কোন সুখসম্ভোগ বা কোনরূপ জ্ঞানই জন্মিতে পারে না। পরন্তু যদি তখন কোন সুখের উৎপত্তি স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে উহার পূর্ব্বে বা পরে কোন দুঃখের উৎপত্তিও স্বীকার করিতে হইবে। কারণ, সুখমাত্রই দুঃখানুষক্ত। যে সুখের পূর্ব্বে বা পরে কোন দুঃখের উৎপত্তি হয় না, এমন সুখ জগতে নাই। সুখভোগ করিতে হইলে দুঃখভোগ অবশ্যম্ভাবী। দুঃখকে পরিত্যাগ করিয়া নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগ

১। ব্রহ্মলোকস্থাঽপি বিনাশিত্বাৎ তত্রত্যানামনুৎপন্নজ্ঞানানামবশ্যম্ভাবি পুনর্জ্জন্ম। য এবং ক্রমমুক্তিফলাভিরুপাসনাভির্ব্রহ্মলোকং প্রাপ্তাস্তেষামেব তত্রোৎপন্নজ্ঞানানাং ব্রহ্মণা সহ মোক্ষো নান্যেষাং। মামুপেত্য বর্ত্তমানানান্তু পুনর্জ্জন্ম নাস্ত্যেব।—স্বামিটীকা।

অসম্ভব। স্বর্গভোগী দেবগণও অনেক দুঃখ ভোগ করেন। এ জন্যও মুমুক্ষু ব্যক্তিরা স্বর্গকামনা করেন না। তাঁহারা স্বর্গেও হেয়ত্ববুদ্ধিবশতঃ কেবল আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তিরূপ মুক্তিই চাহেন। মুক্তিকালে কোনরূপ দুঃখভোগ হইলে ঐ অবস্থাকে কেহই মুক্তি বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না ও করেন না। পরন্তু ছান্দোগ্য উপনিষদে মুক্ত পুরুষের অনেক সুখভোগের বর্ণন থাকিলেও শেষে যখন "অশরীরং বাব সন্তং ন প্রিয়াপ্রিয়ে স্পৃশতঃ" এই বাক্যের দ্বারা মুক্ত পুরুষের শরীর এবং সুখ ও দুঃখ থাকে না, ইহা স্পষ্ট কথিত হইয়াছে, তখন উহাই তাঁহার নির্ব্বাণাবস্থার বর্ণন বুঝা যায়। অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে শরীর ও বহুবিধ সুখ থাকিলেও ব্রহ্মলোক হইতে নির্ব্বাণ মুক্তিলাভ হইলে তখন আর তাঁহার শরীর ও সুখ দুঃখ কিছুই থাকে না, ইহাই তাৎপর্য্য বুঝা যায়। সুতরাং নির্ব্বাণ মুক্তিপ্রাপ্ত পুরুষের কোনরূপ সুখসম্ভোগই আর কোন প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ হইতে পারে না। পরন্তু মুক্তপুরুষের নিত্যসুখসম্ভোগ স্বীকার করিলে তাহার নিত্যশরীরও স্বীকার করিতে হয়। কারণ, শরীর ব্যতীত কোন সুখসম্ভোগ যুক্তিযুক্ত নহে। উহার সর্ব্বসম্মত কোন দৃষ্টান্ত নাই। কিন্তু নিত্যশরীরের অস্তিত্বে কোন প্রমাণ নাই। যে শরীর মুক্তির পূর্ব্বে থাকে না, তাহার নিত্যত্ব সম্ভবই নহে। নিত্যশরীরের অস্তিত্ব না থাকিলে নিত্যসুখের অস্তিত্বও স্বীকার করা যায় না। সুতরাং শ্রুতি ও স্মৃতিতে মুক্ত পুরুষের আনন্দবোধক যে সমস্ত বাক্য আছে, তাহাতে "আনন্দ" ও "সুখ" শব্দের আত্যন্তিক দুঃখাভাবই লাক্ষণিক অর্থ, ইহাই স্বীকার্য্য। ঐ আত্যন্তিক দুঃখাভাবই পরমপুরুষার্থ। মূর্চ্ছাদি অবস্থায় দুঃখাভাব থাকিলেও পরে চৈতন্যলাভ হইলে পুনর্ব্বার নানাবিধ দুঃখভোগ হওয়ায় উহা আত্যন্তিক দুঃখাভাব নহে। সুতরাং পূর্ব্বোক্তরূপ মোক্ষাবস্থাকে মূর্চ্ছাদি অবস্থার তুল্য বলা যায় না। সুতরাং মূর্চ্ছাদি অবস্থার ন্যায় পূর্ব্বোক্তরূপ মুক্তিলাভে কাহারই প্রবৃত্তি হইতে পারে না, উহা পুরুষার্থই হয় না, এই কথাও বলা যায় না। সুখের ন্যায় দুঃখনিবৃত্তিও যখন একতর প্রয়োজন, তখন কেবল দুঃখনিবৃত্তির জন্যও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিদিগের প্রবৃত্তি হইতে পারে ও হইয়া থাকে। সুতরাং দুঃখনিবৃত্তিমাত্রও পুরুষার্থ, ইহা স্বীকার্য্য। দুঃখনিবৃত্তিমাত্র উদ্দেশ্য করিয়াও অনেকে সময়বিশেষে মূর্চ্ছাদি অবস্থা, এমন কি, অপার দুঃখজনক আত্মহত্যাকার্য্যেও প্রবৃত্ত হইতেছে, ইহাও সত্য। পরন্তু সুখদুঃখাদিশূন্যাবস্থা যে, সকলেরই অপ্রিয় বা বিদ্বিষ্ট, ইহাও বলা যায় না। কারণ, যোগিগণের নির্ব্বিকল্পক সমাধির অবস্থাও সুখদুঃখাদিশূন্যাবস্থা। কিন্তু উহা তাঁহাদিগের নিতান্ত প্রিয় ও কাম্য। তাঁহারা উহার জন্য বহু সাধনা করিয়া থাকেন, এবং মুমুক্ষুর পক্ষে উহার প্রয়োজনও শাস্ত্রসম্মত। ফলকথা, আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি যখন মুমুক্ষু মাত্রেরই কাম্য এবং মুক্তি হইলে যাহা সর্ব্বমতেই স্বীকৃত সত্য, তখন উহা লাভ করিতে হইলে যদি আত্মার সুখদুঃখাদিশূন্য জড়াবস্থাই উপস্থিত হয়, তাহা হইলে উহাই স্বীকার্য্য। বৈশেষিকসম্প্রদায় এবং সাংখ্য ও পাতঞ্জলসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ মুক্তির স্বরূপ বিষয়ে পূর্ব্বোক্তরূপ মতই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বমীমাংসাচার্য্যগণের মধ্যেও অনেকে উক্ত মতই সমর্থন করিয়াছেন। এ বিষয়ে পার্থসারথি মিশ্র প্রভৃতির কথা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, যাঁহারা পূর্ব্বোক্তরূপ সুখবিহীন মুক্তি চাহেন না, পরন্তু উহাকে উপহাস

করিয়া "বরং বৃন্দাবনে রম্যে শৃগালত্বং ব্রজাম্যহং। ন চ বৈশেষিকীং মুক্তিং প্রার্থয়ামি কদাচন॥" ইত্যাদি শ্লোক পাঠ করেন, তাঁহাদিগের সুখভোগে অবশ্যই কামনা আছে। তাঁহারা পূর্ব্বোক্তরূপ মুক্তিকে পুরুষার্থ বলিয়াই বুঝিতে পারেন না। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত মতেও তাঁহাদিগের কামনানুসারে বহু সুখসম্ভোগ-লিপ্সা চরিতার্থ হইতে পারে। কারণ, নির্ব্বাণমুক্তি পূর্ব্বোক্তরূপ হইলেও উহার পূর্ব্বে সাধনাবিশেষের ফলে ব্রহ্মলোকে যাইয়া মহাপ্রলয়কাল পর্য্যন্ত বহু সুখ ভোগ করা যায়, ইহা পূর্ব্বোক্ত মতেও স্বীকৃত। কারণ, উহা শাস্ত্রসম্মত সত্য। ব্রহ্মলোকে মহাপ্রলয়কাল পর্য্যন্ত নানাবিধ সুখসম্ভোগ করিয়াও যাঁহাদিগের তৃপ্তি হইবে না, আরও সুখ-সম্ভোগে কামনা থাকিবে, তাঁহারা পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিয়া, আবার সাধনাবিশেষের দ্বারা পূর্ব্ববৎ ব্রহ্মলোকে যাইয়া, আবার মহাপ্রলয়কাল পর্য্যন্ত নানাবিধ সুখ সম্ভোগ করিবেন। সুখ-সম্ভোগের কামনা থাকিলে সাধনাবিশেষের সাহায্যে শ্রীভগবান্ সেই অধিকারীকে নানাবিধ সুখ প্রদান করেন, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। সাধনা-বিশেষের ফলে বৈকুণ্ঠাদি লোকে যাইয়াও নানাবিধ সুখ সম্ভোগ করা যায়, ইহাও শাস্ত্রসম্মত সত্য। কারণ, "সালোক্য" প্রভৃতি চতুর্ব্বিধ মুক্তিও শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। পঞ্চম মুক্তি "সাযুজ্য"ই নির্ব্বাণ মুক্তি, উহাই চরম মুক্তি বা মুখ্যমুক্তি। প্রাচীন মুক্তিবাদ গ্রন্থে উক্ত পঞ্চবিধ মুক্তি ব্যাখ্যাত হইয়াছে[১]। শ্রীভগবানের সহিত সমান লোকে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে অবস্থানকে (১) "সালোক্য" মুক্তি বলে। শ্রীভগবানের সহিত সমানরূপতা অর্থাৎ শ্রীবৎসাদি চিহ্ন ও চতুর্ভুজ শরীরবত্তাকে (২) "সারূপ্য" মুক্তি বলে। শ্রীভগবানের ঐশ্বর্য্যের তুল্য ঐশ্বর্য্যই (৩) "সার্ষ্টি" মুক্তি। ঐরূপ ঐশ্বর্য্যাদিবিশিষ্ট হইয়া শ্রীভগবানের অতিসমীপে নিয়ত অবস্থানই (৪) "সামীপ্য" মুক্তি। এই চতুর্ব্বিধ মুক্তির কোনকালে বিনাশ অবশ্যম্ভাবী, এ জন্য উহা মুখ্যমুক্তি নহে, উহাতে চিরকালের জন্য আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হয় না। কিন্তু যাঁহাদিগের সুখভোগে কামনা আছে এবং নিজের অধিকার ও রুচি অনুসারে যাঁহারা ঐরূপ সুখসাধন সাধনা-বিশেষের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তাঁহারা সাধনা-বিশেষের ফলে ব্রহ্মলোকে অথবা বৈকুণ্ঠাদি স্থানে যাইয়া অবশ্যই নানা সুখ-সম্ভোগ করিবেন। ঐরূপে পুনঃ পুনঃ মহাপ্রলয়কাল পর্য্যন্ত নানাবিধ সুখ-সম্ভোগ করিয়া যাঁহাদিগের কোন কালে

১। সালোক্যমথ সারূপ্যং সার্ষ্টিং সামীপ্যমেব চ।
সাযুজ্যঞ্চেতি মুনয়ো মুক্তিং পঞ্চবিধাং বিদুঃ॥

তত্র ভগবতা সমমেকস্মিন্ লোকে বৈকুণ্ঠাখ্যেঽবস্থানং "সালোক্যং"। "সারূপ্য"ঞ্চ ভগবতা সহ সমানরূপতা, শ্রীবৎস-বনমালা-লক্ষ্মী-সরস্বতীযুক্ত চতুর্ভুজশরীরাবচ্ছিন্নত্বমিতি যাবৎ। "সালোক্যে"ঽপি চতুর্ভুজাবচ্ছিন্নত্বমস্ত্যেব, বৈকুণ্ঠবাসিনাং সর্ব্বেষামেব চতুর্ভুজত্বাৎ, পরন্তু শ্রীবৎসাদিরূপাশেষবিশেষণবৈশিষ্ট্যং ন তত্রেতি তদপেক্ষয়া তস্যাধিক্যং। "সার্ষ্টি"র্ভগবদৈশ্বর্য্যসমানমৈশ্বর্য্যং, কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা কর্ত্তুং সমর্থত্বাৎ। "সামীপ্য"ঞ্চ তথাবিধৈশ্বর্য্যবিশেষণাদিযুক্তত্বে সতি ভগবতোঽতিসমীপে নিয়তমবস্থানং। "সাযুজ্য"ঞ্চ নির্ব্বাণং। তচ্চ ন্যায়বৈশেষিকমতে অত্যন্তদুঃখনিবৃত্তিঃ। সালোক্যাদিদশায়াং দুঃখনিবৃত্তিসত্ত্বেঽপি নাসাবাত্যন্তিকী, তস্য ক্ষয়িতয়া তদনন্তরমন্ততশ্চরমদুঃখস্যৈবোৎপাদাদিতি ন তদ্দশায়ামতিপ্রসঙ্গঃ। অতঃ সালোক্যাদেঃ স্বতঃ পুরুষার্থত্বাভাবাৎ তদুত্তরং শরীরপরিগ্রহেণ বন্ধসম্ভবাচ্চ তেষাং তুচ্ছতয়া নির্ব্বাণমেবোদ্দেশ্যং। তত্ত্বজ্ঞানে তান্ত্রিকাণাং প্রবৃত্তে নির্ব্বাণমেব অপবর্গপদশক্যং। অন্যেষান্তু গৌণমুক্তিপরপ্রয়োগবিষয়তেতি।—প্রাচীন মুক্তিবাদ।

তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইবে, তাঁহারা তখন নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করিবেন। তখন তাঁহাদিগের সুখ-ভোগে কিছুমাত্র কামনা না থাকায় সুখভোগ বা কোন বিষয়ে কিছুমাত্র জ্ঞান না থাকিলেও কোন ক্ষতি বুঝা যায় না এবং সেইরূপ অবস্থায় তাঁহাদিগের মুক্তিবিষয়েও কোন সন্দেহ করা যায় না। কারণ, আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হইয়া গেলে আর কখনও পুনর্জন্মের সম্ভাবনাই না থাকিলে তখন তাঁহাকে মুক্ত বলিয়া অস্বীকার করা যায় না। ঐরূপ ব্যক্তির মুক্তি বিষয়ে সংশয়ের কোনই কারণ দেখা যায় না। প্রথম অধ্যায়ে ভাষ্যকার বাৎস্যায়নও পূর্ব্বোক্ত নিজ মত সমর্থন করিতে সর্ব্বশেষে ঐরূপ কথাই বলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার যুক্তি পূর্ব্বেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এবং তাঁহার বিরুদ্ধ পক্ষে যাহা বলা যায়, তাহাও ইতঃপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে। উক্ত বিষয়ে মহর্ষি গোতমের প্রকৃত মত কি ছিল, এ বিষয়েও মতভেদের সমর্থন ও সমালোচনা করা হইয়াছে। সুধী পাঠকগণ ঐ সমস্ত কথায় প্রণিধান করিয়া প্রকৃত রহস্য নির্ণয় করিবেন।

পূর্ব্বে যে নির্ব্বাণ মুক্তির কথা বলিয়াছি, উহাই তত্ত্বজ্ঞানের চরম ফল। মুমুক্ষু অধিকারীর পক্ষে উহাই পরম পুরুষার্থ। মহর্ষি গোতম মুমুক্ষু অধিকারীদিগের জন্যই ন্যায়দর্শনে ঐ নির্ব্বাণ মুক্তি লাভেরই উপায় বর্ণন করিয়াছেন। নির্ব্বাণ মুক্তিই ন্যায়দর্শনের মুখ্য প্রয়োজন। কিন্তু যাঁহারা ভগবৎপ্রেমার্থী ভক্ত, তাঁহারা ঐ নির্ব্বাণ মুক্তি চাহেন না। তাঁহারা শ্রীভগবানের সেবাই চাহেন। ভক্ত-চূড়ামণি শ্রীহনূমান্‌ও শ্রীরামচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন যে,[১] "যে মুক্তি হইলে আপনি প্রভু ও আমি দাস, এই ভাব বিলুপ্ত হয়, সেই মুক্তি আমি চাই না"। ভক্তগণ যে শ্রীভগবানের সেবা ব্যতীত "সালোক্য" প্রভৃতি পঞ্চবিধ মুক্তিই দান করিলেও গ্রহণ করেন না, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতেও কথিত হইয়াছে[২]। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের ঐ শ্লোকের দ্বারা ইহাও বুঝা যায় যে, যদি কোন প্রকার মুক্তি হইলেও শ্রীভগবানের সেবা অব্যাহত থাকে, তাহা হইলে তাদৃশ মুক্তি ভক্তগণও গ্রহণ করেন। অর্থাৎ শ্রীভগবানের সেবাশূন্য কোন প্রকার মুক্তিই দান করিলেও তাঁহারা গ্রহণ করেন না। বস্তুতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতে ভগবৎপ্রেমের ফলে বৈকুণ্ঠে শ্রীভগবানের পার্ষদ হইয়া ভক্তগণের যে অনন্তকাল অবস্থান হয়, তাহাকেও "সালোক্য" বা "সামীপ্য" মুক্তিও বলা যাইতে পারে। তবে ঐ অবস্থায় ভক্তগণ সতত শ্রীভগবানের সেবা করেন, ইহাই বিশেষ। মুক্ত পুরুষগণও যে লীলার দ্বারা দেহ ধারণপূর্ব্বক শ্রীভগবানের সেবা করেন, ইহাও গৌড়ীয় বৈষ্ণবা-চার্য্যগণ সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। সে যাহা হউক, এখন তাঁহাদিগের মতে নির্ব্বাণ মুক্তির স্বরূপ কি? নির্ব্বাণ মুক্তি হইলে তখন সেই মুক্ত জীবের কিরূপ অবস্থা হয়, ইহা দেখা আবশ্যক। এ বিষয়ে তাঁহাদিগের নানা গ্রন্থে নানারূপ কথা আছে। ঐ সমস্ত কথার সামঞ্জস্য বিধান করাও আবশ্যক। আমরা প্রথমে দেখিয়াছি, "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" গ্রন্থে কৃষ্ণদাস কবিরাজ

১। ভববন্ধচ্ছিদে তস্মৈ স্পৃহয়ামি ন মুক্তয়ে।
ভবান্ প্রভুরহং দাস ইতি যত্র বিলুপ্যতে॥

২। সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্লন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥ শ্রীমদ্ভাগবত। ৩।২৯।১৩।

মহাশয় লিখিয়াছেন,—"নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সেই কেবল জ্যোতির্ম্ময়। সাযুজ্যের অধিকারী তাহা পায় লয়॥" (আদিলীলা, ৫ম পঃ)। উহার পূর্ব্বে লিখিয়াছেন,—"সাযুজ্য না চায় ভক্ত যাতে ব্রহ্ম ঐক্য" (ঐ, ৩ পঃ)। ইহার দ্বারা সুস্পষ্টই বুঝা যায় যে, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের অস্তিত্ব এবং সাযুজ্য অর্থাৎ নির্ব্বাণ মুক্তি হইলে তখন সেই মুক্ত জীবের ঐ ব্রহ্মের সহিত ঐক্য, ইহা কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয়ের গুরুলব্ধ সিদ্ধান্ত। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রভাষ্যকার শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় ঐ সিদ্ধান্ত স্বীকার করেন নাই। ইহাঁদিগের পূর্ব্বে প্রভুপাদ শ্রীল সনাতন গোস্বামী মহাশয় তাঁহার "বৃহদ্ভাগবতামৃত" গ্রন্থে বহু বিচারপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত বলিয়া গিয়াছেন যে,[১] মুক্তি হইলেও তখনও প্রায় সমস্ত মুক্ত পুরুষেরই ব্রহ্মের সহিত নিত্যসিদ্ধ ভেদ থাকিবেই। তিনি সেখানে তাঁহার ঐ সিদ্ধান্ত সমর্থনের জন্য টীকায় বলিয়াছেন যে, মুক্ত পুরুষের ব্রহ্মের সহিত ভেদ থাকে বলিয়াই "মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং বিরাজন্তি" এই শ্রীশঙ্করাচার্য্য ভগবৎপাদের বাক্য এবং অন্যান্য অনেক মহাপুরাণাদিবাক্য সংগত হয়। অন্যথা যদি মুক্তি হইলে তখন পরব্রহ্মে লয়বশতঃ তাঁহার সহিত ঐক্য বা অভেদই হয়, তাহা হইলে লীলার দ্বারা দেহ ধারণ করিবে কে ? উহা অসম্ভব এবং তখন আবার ভক্তিবশতঃ নারায়ণপরায়ণ হওয়াও অসম্ভব। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত শঙ্করাচার্য্যের বচনে ও পুরাণাদির বচনে যখন মুক্ত পুরুষেরও আবার দেহ ধারণপূর্ব্বক ভগবদ্ভজনের কথা আছে, তখন মুক্তি হইলে ব্রহ্মে লয়প্রাপ্তি ও তাঁহার সহিত যে অভেদ হয়, ইহা সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। আমরা কিন্তু ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য যে "মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা" ইত্যাদি বাক্য কোথায় বলিয়াছেন, তাহা অনুসন্ধান করিয়াও পাই নাই। উহা বলিলেও নির্ব্বাণপ্রাপ্ত মুক্ত পুরুষের সম্বন্ধেও যে তিনি ঐরূপ কথা বলিয়াছেন, ইহা বুঝিবার পক্ষে কোন সাধক নাই। পরন্তু বাধকই আছে। সনাতন গোস্বামী মহাশয় সেখানে পরে আরও বলিয়াছেন যে, পরমেশ্বরে লয় প্রাপ্ত হইলেও নৃদেহ মহামুনির পুনর্ব্বার নারায়ণরূপে প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, ইহা পদ্মপুরাণে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে বর্ণিত আছে। এবং পরমেশ্বরে লয় প্রাপ্ত হইলেও বেশ্যা সহিত ব্রাহ্মণের পুনর্ব্বার ভার্য্যা সহিত প্রহ্লাদরূপে আবির্ভাব হইয়াছিল, ইহাও বৃহন্নারসিংহ পুরাণে নৃসিংহচতুর্দ্দশী ব্রতপ্রসঙ্গে বর্ণিত আছে। এইরূপ আরও অনেক উপাখ্যান প্রভৃতি উক্ত বিষয়ে প্রমাণ জানিবে। সনাতন গোস্বামী মহাশয়ের শেষোক্ত এই সকল কথার সহিত তাঁহার পূর্ব্বোক্ত কথার কিরূপে সামঞ্জস্য হয়, তাহা সুধী পাঠকগণ বিচার করিবেন। পরন্তু তিনি ঐ স্থলে সর্ব্বশেষে লিখিয়াছেন যে, "প্রায় ইতি কদাচিৎ কস্যাপি ভগবদিচ্ছয়া সাযুজ্যাখ্যনির্ব্বাণাভিপ্রায়েণ।" অর্থাৎ তিনি পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে "মুক্তৌ সত্যামপি প্রায়ঃ" এই তৃতীয় চরণে যে "প্রায়স্" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, কদাচিৎ কোন ব্যক্তির ভগবদিচ্ছায় যে সাযুজ্যনামক নির্ব্বাণ মুক্তি হয়, ঐ মুক্তি হইলে তখন তাঁহার ব্রহ্মের সহিত ভেদ থাকে না। তাহা হইলে বুঝা যায় যে, নির্ব্বাণ মুক্তি হইলে জীব ও ব্রহ্মের যে অভেদই হয়, ইহা সনাতন গোস্বামী মহাশয়ও স্বীকার করিয়াছেন।

১। অতস্তস্মাদ্বিভিন্নাস্তে ভিন্না অপি সতাং মতাঃ।
মুক্তৌ সত্যামপি প্রায়ো ভেদস্তিষ্ঠেত্তোহি সঃ ॥—বৃহদ্ভাগবতামৃত, ২য় অঃ, ১৮৬ ॥

তবে তাঁহার মতে তখন ঐ অভেদ কিরূপ, ইহা বিচার্য্য। বস্তুতঃ নির্ব্বাণ মুক্তি হইলে তখন যে, সেই জীবের ব্রহ্মের সহিত একত্ব বা অভেদ হয়, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতেরও সিদ্ধান্ত বলিয়া আমরা বুঝিতে পারি। কারণ, শ্রীমদ্ভাগবতের পূর্ব্বোক্ত "সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত"— ইত্যাদি শ্লোকে পঞ্চম মুক্তি নির্ব্বাণকে "একত্ব"ই বলা হইয়াছে। এবং উহার পূর্ব্বেও "নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচিৎ" ইত্যাদি শ্লোকে নির্ব্বাণ মুক্তিকেই "একাত্মতা" বলা হইয়াছে। (পূর্ব্ববর্ত্তী ১৩৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। পরন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের দশম অধ্যায়ে পুরাণের দশ লক্ষণের বর্ণনায় "মুক্তির্হিত্বাঽন্যথা রূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতিঃ"—এই শ্লোকে নবম লক্ষণ মুক্তির যে স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা অদ্বৈতবাদিসম্মত মুক্তিই যে, শ্রীমদ্ভাগবতে মুক্তি বলিয়া কথিত হইয়াছে এবং টীকাকার পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামীও যে, সেখানে অদ্বৈত মতেরই স্পষ্ট ব্যাখ্যা করিয়াছেন, ইহাও পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে (১৩৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। প্রভুপাদ শ্রীজীব গোস্বামী সেখানে একটু অন্যরূপ ব্যাখ্যা করিলেও তাঁহার পিতৃব্য ও শিক্ষাগুরু বৈষ্ণবাচার্য্য প্রভুপাদ শ্রীল সনাতন গোস্বামী কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের উক্ত শ্লোকোক্ত মুক্তিকে অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকসম্প্রদায়ের মত বলিয়াই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কারণ, তিনি তাঁহার "বৃহদ্ভাগবতামৃত" গ্রন্থে মুক্তির স্বরূপ বিষয়ে যে মতত্রয়ের উল্লেখ করিয়াছেন, তন্মধ্যে শেষোক্ত মত যে বিবর্ত্তবাদী বৈদান্তিকসম্প্রদায়ের মুখ্য মত এবং শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের পূর্ব্বোক্ত শ্লোকেও ঐ মতই কথিত হইয়াছে, ইহা তিনি সেখানে টীকায় স্পষ্ট প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন[১]। পরন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে পূর্ব্বলিখিত "সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য" ইত্যাদি শ্লোকের পরশ্লোকেই[২] আত্যন্তিক ভক্তি-যোগের দ্বারা যে ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হয়, ইহাও "মদ্ভাবায়োপপদ্যতে" এই বাক্যের দ্বারা কথিত হইয়াছে বুঝা যায়। টীকাকার শ্রীধর স্বামীও সেখানে সেইরূপই ব্যাখ্যা করিয়া ব্রহ্মভাব-প্রাপ্তিকে আত্যন্তিক ভক্তিযোগের আনুষঙ্গিক ফল বলিয়া সমাধান করিয়াছেন। কিন্তু আত্যন্তিক ভক্তি-যোগের ফলে ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হইলে তখন সেই ভক্তের চিরবাঞ্ছিত ভগবৎসেবা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে, ইহা তিনি সেখানে কিছু বলেন নাই। আত্যন্তিক ভক্তিযোগের ফলে যে ব্রহ্মভাব-প্রাপ্তি হয়, ইহা শ্রীমদ্‌ভাগবতের ন্যায় শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায়ও কথিত হইয়াছে[৩]। "লঘু-

---

১। সোঽশেষদুঃখধ্বংসো বাঽবিদ্যাকর্ম্মক্ষয়োঽথবা। মায়াকৃতান্যথারূপত্যাগাৎ স্বানুভবোঽপি বা ॥ বৃহদ্ভাগ। ২য় অঃ, ১৭৫ ॥ মায়াকৃতস্য অন্যথারূপস্য সংসারিত্বস্য ভেদস্য বা ত্যাগাৎ স্বস্য আত্মরূপস্য ব্রহ্মণোঽনুভবরূপ এব। এতচ্চ বিবর্ত্তবাদিনাং বেদান্তিনাং মুখ্যং মতং। যথোক্তং দ্বিতীয়স্কন্ধে "মুক্তির্হিত্বাঽন্যথারূপং স্বরূপেণ ব্যবস্থিতি"রিতি। সনাতন গোস্বামিকৃত টীকা ॥

২। স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ। যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥ ৩য় স্কন্ধ—২৯শ অঃ, ১৪শ শ্লোক। ননু ত্রৈগুণ্যং হিত্বা ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তিঃ পরমফলং প্রসিদ্ধং, সত্যং, তত্তু ভক্তাবানুষঙ্গিক-মিত্যাহ। "যেন" ভক্তিযোগেন। "মদ্ভাবায়" ব্রহ্মত্বায়।—স্বামিটীকা ॥

৩। যো মামব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥—গীতা। ১৪।২৬। "লঘুভাগবতামৃত" ১১২—১১৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ॥

ভাগবতামৃত” গ্রন্থে প্রভুপাদ শ্রীল রূপ গোস্বামী মহাশয়ও ভগবদ্গীতার ঐ শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু সেখানে টীকাকার গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় “ব্রহ্ম ভূয়” শব্দের যথাশ্রুতার্থ বা মুখ্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মের সাদৃশ্য অর্থেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং “নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি” এই শ্রুতি ও “পরমাত্মাত্মনোর্যোগঃ” ইত্যাদি বিষ্ণুপুরাণের (২।১৪।২৭) বচনের দ্বারা তাঁহার ঐ ব্যাখ্যা সমর্থন করিয়াছেন। এবং তিনি যুক্তিও বলিয়াছেন যে, অণু দ্রব্য বিভু হইতে পারে না। অর্থাৎ জীব অণু, ব্রহ্ম বিশ্বব্যাপী, সুতরাং জীব কখনই ব্রহ্ম হইতে পারে না, উহা অসম্ভব। সুতরাং মুক্ত জীবের যে ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি কথিত হইয়াছে, উহার অর্থ ব্রহ্মের সাদৃশ্যপ্রাপ্তি। অর্থাৎ মুক্ত জীব ব্রহ্ম হন না, ব্রহ্মের সদৃশ হন। ব্রহ্মের সহিত তাঁহার নিত্যসিদ্ধ ঐকান্তিক ভেদ চিরকালই আছে ও চিরকালই থাকিবে। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় ‘তত্ত্বসন্দর্ভে’র টীকা ও “সিদ্ধান্তরত্ন” প্রভৃতি গ্রন্থেও মধ্বাচার্য্যের মতানুসারে জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ ভেদবাদই সমর্থন করিয়া গিয়াছেন, ইহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে (১১৫—১১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) পরন্তু তাঁহার “প্রমেয়রত্নাবলী” গ্রন্থ দেখিলে তিনি যে শ্রীচৈতন্যসম্প্রদায়কেও মধ্বাচার্য্যের মতানুসারে জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপতঃ ঐকান্তিক ভেদবাদী বলিয়া গুরুপরম্পরাপ্রাপ্ত উক্ত মতেরই প্রচার করিয়া গিয়াছেন, এ বিষয়ে কোন সংশয় হইতে পারে না। অনুসন্ধিৎসু পাঠক উক্ত গ্রন্থ অবশ্য পাঠ করিবেন। অবশ্য শ্রীচৈতন্যদেব মধ্বাচার্য্যের সমস্ত মত গ্রহণ করেন নাই। তিনি মধ্বাচার্য্যের কোন কোন মতের প্রতিবাদও করিয়াছিলেন, ইহাও শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে (মধ্যলীলা, নবম পরিচ্ছেদে) বর্ণিত আছে। কিন্তু তিনি যে, মধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত, মধ্বাচার্য্যই যে তাঁহার সম্প্রদায়ের পূর্ব্বাচার্য্য,—ইহা বুঝিবার অনেক কারণ আছে। উক্ত বিষয়ে শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের উক্তিই বলবৎ প্রমাণরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। তাঁহার “প্রমেয়রত্নাবলী” প্রভৃতি গ্রন্থকে গোপন করা যাইবে না। তাঁহাকে শ্রীচৈতন্যসম্প্রদায়ের আচার্য্য বলিয়াও অস্বীকার করা যাইবে না।

শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের পরে শান্তিপুরের অদ্বৈতবংশাবতংস সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ মহামনীষী রাধামোহন গোস্বামিভট্টাচার্য্য মহাশয় শ্রীজীব গোস্বামিপাদের “তত্ত্বসন্দর্ভে”র যে অপূর্ব্ব টীকা করিয়া গিয়াছেন তাহাতে কোন স্থলে তিনি নিজমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন যে, অদ্বৈতবাদিসম্প্রদায় দ্বিবিধ—ভাগবত এবং স্মার্ত্ত। তন্মধ্যে শ্রীধর স্বামী ভাগবতসম্প্রদায়ের অন্তর্গত, অর্থাৎ তিনি প্রথমোক্ত “ভাগবত” অদ্বৈতবাদী। শ্রীধর স্বামিপাদ প্রভৃতির মতসমূহের মধ্যে যে যে মত যুক্তি ও শাস্ত্রদ্বারা নির্ণীত, সেই সমস্ত মতই সংকলন করিয়া শ্রীজীব গোস্বামিপাদ নিজমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তিনি শ্রীধর স্বামিপাদ প্রভৃতি কাহারও সম্প্রদায়ের অন্তর্গত নহেন। তিনি তাঁহার নিজসম্মত ভক্তিশাস্ত্রের বিরুদ্ধ বলিয়া শ্রীশঙ্করাচার্য্যের মতকে উপেক্ষা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু শ্রীশঙ্করাচার্য্যের যে ভাগবত মত নিগূঢ়ভাবে হৃদ্গত ছিল, ইহা তাঁহার গোপীবস্ত্রহরণ বর্ণনাদির দ্বারা নির্ণয় করিয়া, পরে তাঁহার শিষ্যপরম্পরার মধ্যে ভক্তিপ্রধান মত আশ্রয় করিয়া সম্প্রদায়-ভেদ হইয়াছে। এই জন্যই অদ্বৈতবাদিসম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীধর

স্বামী ভাগবতসম্প্রদায়ভুক্ত "ভাগবত" অদ্বৈতবাদী। শ্রীজীব গোস্বামিপাদ তাঁহার "ভাগবত-সন্দর্ভে" বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী বৈষ্ণবাচার্য্য রামানুজের সকল মত গ্রহণ না করিলেও তাঁহার মতানুসারে মায়াবাদ নিরাস এবং জীব ও জগতের সত্যত্বাদি অনেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া নিজের ব্যাখ্যার পুষ্টি বা সমর্থন করিয়াছেন। মধ্বাচার্য্য দ্বৈতবাদী হইলেও তিনি তাঁহার সকল মত গ্রহণ করেন নাই। কিন্তু মধ্বাচার্য্যের সম্মত শ্রীভগবানের সগুণত্ব, নিত্য প্রকৃতি এবং তাহার পরিণাম জগৎ সত্য ও ব্রহ্মের তটস্থ অংশ জীবসমূহ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, ইত্যাদি মত তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। তবে মধ্বাচার্য্য প্রকৃতিকে ব্রহ্মের স্বরূপশক্তি বলিয়া স্বীকার না করায় তাঁহার মত হইতে শ্রীজীব গোস্বামিপাদের মত বিশিষ্ট। কিন্তু দ্বৈতাদ্বৈতবাদী ভাস্করাচার্য্যের মতে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি ব্রহ্মের স্বরূপশক্তি, জগৎ ব্রহ্মের সেই স্বরূপশক্তির পরিণাম, উক্ত মতই শ্রীজীব গোস্বামিপাদের অনুমত বুঝা যায়। গোস্বামী ভট্টাচার্য্য এই সকল কথা বলিয়া, শেষে ইহাও বলিয়াছেন যে, ঐ সমস্ত মতই সাধু, কোন মতই অগ্রাহ্য নহে। কারণ, শাস্ত্র বলিয়াছেন,—"বহ্বাচার্য্যবিভেদেন ভগবন্ত-মুপাসতে"। তবে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের মত সকল মতের সারসংগ্রহরূপ বলিয়া সকল মত হইতে মহৎ। পরন্তু যেমন শ্রীমান্ মধ্বাচার্য্য ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের সম্প্রদায় হইয়াও পরে ব্রহ্মসম্প্রদায় আশ্রয় করিয়া, ব্রহ্মসূত্রভাষ্যাদি নির্ম্মাণপূর্ব্বক স্বতন্ত্রভাবে সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক হইয়াছিলেন, তদ্রূপ শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং ভগবানের অবতার হইয়াও কোন গুরুর আশ্রয়ের আবশ্যকতা স্বীকার করিয়া, মধ্বাচার্য্যের সম্প্রদায়ভুক্ততা স্বীকারপূর্ব্বক তাঁহার নিজ স্বরূপ অদ্বৈতাচার্য্য প্রভৃতির দ্বারা নিজমতেরই প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। অর্থাৎ শ্রীচৈতন্যদেব পৃথক্ ভাবে নিজ-মতেরই প্রবর্ত্তক, তিনি অন্য কোন সম্প্রদায়ের মতপ্রচারক আচার্য্যবিশেষ নহেন। তবে তিনি গুর্ব্বাশ্রয়ের আবশ্যকতা বোধে অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত কোন সম্প্রদায় গ্রহণের আবশ্যকতাবশতঃ নিজেকে মধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন।

এখানে বক্তব্য এই যে, গোস্বামিভট্টাচার্য্যের টীকার ব্যাখ্যা করিয়া "তত্ত্বসন্দর্ভে"র অনুবাদ পুস্তকে অন্যরূপ মন্তব্য লিখিত হইলেও (নিত্যস্বরূপ ব্রহ্মচারি সম্পাদিত তত্ত্বসন্দর্ভ, ১১৪-১৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) ইহা প্রণিধানপূর্ব্বক বুঝা আবশ্যক যে, গোস্বামিভট্টাচার্য্যও শ্রীচৈতন্যদেবকে মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া গিয়াছেন। তিনিও শ্রীচৈতন্যদেবকে পঞ্চম বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক বলেন নাই। কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেব নিজেকে মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্গত বলিয়া স্বীকার করিয়াই তাঁহার নিজমতের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, ইহাই তিনি বলিয়াছেন। বস্তুতঃ পদ্মপুরাণে কলিযুগে চতুর্ব্বিধ বৈষ্ণবসম্প্রদায়েরই উল্লেখ আছে। পঞ্চম কোন বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের উল্লেখ নাই। পরন্তু কোন সম্প্রদায়ভুক্ত না হইলে গুরুবিহীন সাধনা হইতে পারে না। সম্প্রদায়বিহীন মন্ত্র ফলপ্রদও হয় না। শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের গোবিন্দভাষ্যের টীকার প্রারম্ভে ঐ সমস্ত বিষয়ে শাস্ত্রপ্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং শ্রীচৈতন্যদেব মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্গত ঈশ্বর পুরীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া সাধন) ও নিজমতের প্রচার করিয়াছিলেন। মধ্বাচার্য্যের মতের সহিত তাঁহার মতের কোন কোন অংশে ভেদ থাকিলেও অনেক অংশে ঐক্য থাকায় তিনি মধ্ব-

সম্প্রদায়েরই শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি রামানুজ বা নিম্বার্ক প্রভৃতি সম্প্রদায়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন নাই কেন? ইহাও চিন্তা করা আবশ্যক। পরন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের সম্প্রদায়রক্ষক গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয় শ্রীচৈতন্যদেবের মতের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া "প্রমেয়রত্নাবলী" গ্রন্থে মধ্বমতানুসারেই প্রমেয়বিভাগ ও তত্ত্ব ব্যাখ্যা কেন করিয়াছেন? ইহাও চিন্তা করা আবশ্যক। তিনি তাঁহার অন্য গ্রন্থেও শ্রীচৈতন্যদেবের মতের ব্যাখ্যা করিতে মধ্বাচার্য্যের প্রতি বিশিষ্ট ভক্তি প্রকাশ করিয়া মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন কেন, ইহাও চিন্তা করা আবশ্যক। ফলকথা, পূর্ব্বোক্ত গোস্বামিভট্টাচার্য্যের টীকার দ্বারাও শ্রীচৈতন্যদেব যে মাধ্ব-সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়াই নিজমত প্রচার করিয়া গিয়াছেন, ইহাই তাঁহার মত বুঝা যায়। তাঁহার পর হইতেও এতদ্দেশীয় পণ্ডিতগণ শ্রীচৈতন্যদেবকে কোন পৃথক্ সম্প্রদায় বা পঞ্চম বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক বলেন নাই। পরন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের সম্প্রদায়রক্ষক বঙ্গের নিত্যানন্দ প্রভৃতি বংশজাত গোস্বামিপাদগণ যে, "মাধ্বানুযায়ী" অর্থাৎ মূলে মাধ্বসম্প্রদায়েরই অন্তর্গত, ইহা প্রাচীন পণ্ডিতগণেরও পরম্পরাপ্রাপ্ত সিদ্ধান্ত বুঝা যায়। শব্দকল্পদ্রুমের পরিশিষ্ট খণ্ডের প্রারম্ভে লিখিত উনবিংশতি মঙ্গলাচরণ-শ্লোকের মধ্যে কোন শ্লোকের[১] দ্বারাও ইহা আমরা বুঝিতে পারি।

পরন্তু এখানে ইহাও বক্তব্য যে, শ্রীজীব গোস্বামিপাদ "তত্ত্বসন্দর্ভে" মধ্বাচার্য্যের সমস্ত মত গ্রহণ না করিলেও অনেক মতের ন্যায় ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের তটস্থ অংশ বা শক্তিরূপ জীবসমূহ যে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, এই মত স্বীকার করিয়াছেন, ইহা পূর্ব্বোক্ত "তত্ত্বসন্দর্ভে"র টীকায় গোস্বামি-ভট্টাচার্য্যও লিখিয়াছেন। পরে তিনি সেখানে ইহাও লিখিয়াছেন যে, দ্বৈতাদ্বৈতবাদী ভাস্করাচার্য্যের মতে ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি ব্রহ্মের স্বরূপশক্তি। জগৎ সেই স্বরূপশক্তির পরিণাম। উক্ত মত শ্রীজীব গোস্বামিপাদের অনুমত বুঝা যায়। গোস্বামিভট্টাচার্য্যের ঐ কথার দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে, ভাস্করাচার্য্যের সম্মত ব্রহ্ম ও জগতের যে দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বা ভেদাভেদবাদ, উহাই শ্রীজীব গোস্বামিপাদ অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ নামে স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীজীব গোস্বামিপাদ তাঁহার "সর্ব্বসংবাদিনী" গ্রন্থে এক স্থানে যে লিখিয়াছেন,—"স্বমতে ত্বচিন্ত্য-ভেদাভেদাবেব", তাহা ব্রহ্ম ও জগতের সম্বন্ধে। অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বরূপশক্তির পরিণাম জগতে ব্রহ্মের ভেদ ও অভেদ, উভয়ই স্বীকার্য্য। ঐ উভয়ই অচিন্ত্য, অর্থাৎ উভয় পক্ষেই নানা তর্কের নিবৃত্তি না হওয়ায় উহা চিন্তা করিতে পারা যায় না; তথাপি উহা তর্কের অগোচর বলিয়া অবশ্য স্বীকার্য্য। ব্রহ্ম অচিন্ত্যশক্তিময়, সুতরাং তাঁহাতে ঐরূপ ভেদ ও অভেদ অসম্ভব হয় না। সেখানে শ্রীজীব গোস্বামিপাদের "অভেদং সাধয়ন্তঃ",......"ভেদমপি সাধয়ন্তোঽচিন্ত্যভেদাভেদবাদং স্বীকুর্ব্বন্তি"—এই সন্দর্ভের দ্বারা অচিন্ত্যভেদাভেদবাদিগণ যে, পূর্ব্বোক্ত ভেদ ও অভেদ, এই উভয়কেই স্বীকার করিয়াছেন, ইহাই স্পষ্ট বুঝা যায়। সুতরাং ভেদও নাই, অভেদও নাই, ইহাই "অচিন্ত্য-

---

১। শ্রীমন্মাধ্বানুযায়িশ্রীনিত্যানন্দাদিবংশজাঃ।
গোস্বামিনো নন্দসূনুং শ্রীকৃষ্ণং প্রবদন্তি যং॥

ভেদাভেদবাদে"র অর্থ বলিয়া এখন কেহ কেহ যে ব্যাখ্যা করিতেছেন, তাহা একেবারেই কল্পনাপ্রসূত অমূলক। ঐরূপ মত হইলে উহার নাম বলিতে হয়—অচিন্ত্যভেদাভেদাভববাদ,— ইহাও প্রণিধানপূর্ব্বক বুঝা আবশ্যক। শ্রীজীব গোস্বামিপাদ প্রভৃতিও কোন স্থানে উক্ত মতের ঐরূপ ব্যাখ্যা করেন নাই। শ্রীজীব গোস্বামিপাদের "সর্ব্বসংবাদিনী" গ্রন্থের সন্দর্ভ পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে (পূর্ব্ববর্ত্তী ১১৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। এবং তিনি যে সেখানে ব্রহ্ম ও জগতের ভেদাভেদ প্রভৃতি নানা মতের উল্লেখ করিতেই ঐ সমস্ত কথা লিখিয়াছেন, ইহাও পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। তিনি সেখানে ব্রহ্ম ও জীবের অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ বলেন নাই। পরন্তু উক্ত গ্রন্থে তৎসম্বন্ধে বিচার করিয়া "তস্মাদ্ব্রহ্মণো ভিন্নান্যেব জীবচৈতন্যানি" এবং "সর্ব্বথা ভেদ এব জীবপরয়োঃ"—ইত্যাদি অনেক সন্দর্ভের দ্বারা মাধ্বমতানুসারে জীব ও ব্রহ্মের ঐকান্তিক ভেদবাদই সিদ্ধান্তরূপে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত সন্দর্ভে "ভিন্নান্যেব" এবং "ভেদ এব" এই দুই স্থলে তিনি "এব" শব্দের প্রয়োগ করিয়া স্বরূপতঃ অভেদেরই ব্যবচ্ছেদ করিয়াছেন। ফলকথা, জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপতঃ ঐকান্তিক ভেদবাদ বা দ্বৈতবাদ যাহা মধ্বাচার্য্যের সম্মত, তাহা শ্রীজীব গোস্বামিপাদ "সর্ব্বসংবাদিনী" গ্রন্থে সমর্থনপূর্ব্বক নিজসিদ্ধান্তরূপে স্বীকার করিয়াছেন এবং ভাস্করাচার্য্যের সম্মত ব্রহ্ম ও জগতের দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বা ভেদাভেদবাদই তিনি "অচিন্ত্য-ভেদাভেদ" নামে নিজ সিদ্ধান্তরূপে স্বীকার করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত গোস্বামিভট্টাচার্য্যের টীকার দ্বারাও[1] ইহা নিঃসন্দেহে বুঝা যায়। সুতরাং উক্ত বিষয়ে এখন আর আধুনিক অন্য কাহারও ব্যাখ্যা বা মত গ্রহণ করা যায় না।

অবশ্য আমরা দেখিয়াছি, শ্রীজীব গোস্বামিপাদ তাঁহার ভাগবতসন্দর্ভে কোন কোন স্থানে জীব ও ব্রহ্মের অভেদও বলিয়াছেন। বৃহদ্ভাগবতামৃত গ্রন্থে শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদও লিখিয়াছেন,—"অতস্তস্মাদভিন্নাস্তে ভিন্না অপি সতাং মতাঃ" (২য় অঃ, ১৮৬)। কিন্তু তিনি নিজেই সেখানে টীকায় লিখিয়াছেন,—"তস্মাৎ পরব্রহ্মণোঽভিন্নাঃ সচ্চিদানন্দত্বাদিব্রহ্মসাধর্ম্ম্য-বত্ত্বাৎ"। অর্থাৎ পরব্রহ্মের সাধর্ম্ম্যবিশেষ বা সাদৃশ্যবিশেষপ্রযুক্তই জীবসমূহকে পরব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলা হইয়াছে। তাহা হইলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তিনি জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপতঃ অভেদ গ্রহণ করিয়া ঐ কথা বলেন নাই। সুতরাং তিনি পরে যে, "অস্মিন্ হি ভেদাভেদাখ্যে সিদ্ধান্তেঽস্মৎ-সুসম্মতে" (২য় অঃ, ১৯৬) এই বাক্যের দ্বারা ভেদাভেদাখ্য সিদ্ধান্ত বলিয়াছেন, তাহাতেও জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপতঃ অভেদ অর্থাৎ ব্যক্তিগত বাস্তব অভেদ গ্রহণ করেন নাই, ইহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। সনাতন গোস্বামিপাদ উক্ত শ্লোকের টীকায় যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন, তদ্দ্বারাও তাঁহার নিজমতে যে জীব ও ব্রহ্মের তত্ত্বতঃ অভেদ নহে, কেবল ভেদই সিদ্ধান্ত, ইহাই বুঝা যায়।

১। পরন্তু তন্মতসিদ্ধং ভগবতঃ সগুণত্বং, নিত্যা প্রকৃতিস্তৎপরিণামো জগৎ সত্যং, ব্রহ্মতটস্থাংশা জীবাস্ততো ভিন্নাঃ, ইত্যাদিকং মতং গৃহীতং। প্রকৃতের্ব্রহ্মস্বরূপতা তেন নাঙ্গীকৃতা ইতি স্বমতাদ্বিশেষঃ। কিন্তু দ্বৈতাদ্বৈতবাদি-ভাস্করীয়মতং "ব্রহ্মস্বরূপশক্ত্যাত্মনা পরিণামো জগৎ, সা চ শক্তিস্ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি"রিতি তদেব স্বাস্মমতমিতি লভ্যতে"। তত্ত্বসন্দর্ভের গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত টীকা। পূর্ব্বোক্ত "তত্ত্বসন্দর্ভ" পুস্তকের ১১৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

পরন্তু তিনিও পূর্ব্বে সূর্য্যের তেজ যেমন সূর্য্যের অংশ, তদ্রূপ জীবসমূহ ব্রহ্মের অংশ, এই কথা বলিয়া, পরশ্লোকে তত্ত্ববাদিমধ্বমতানুসারে সূর্য্যের কিরণকে সূর্য্য হইতে, অগ্নির স্ফুলিঙ্গকে অগ্নি হইতে এবং সমুদ্রের তরঙ্গকে সমুদ্র হইতে তত্ত্বতঃ ভিন্ন বলিয়াই স্বীকার করিয়া, ঐ সমস্ত দৃষ্টান্তের দ্বারা নিত্যসিদ্ধ জীবসমূহকে ব্রহ্ম হইতে তত্ত্বতঃ ভিন্ন বলিয়াই সমর্থন করিয়াছেন[১]। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, অংশ দ্বিবিধ—স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ। তন্মধ্যে জীবসমূহ যে ব্রহ্মের স্বাংশ নহে, বিভিন্নাংশ, ইহা মধ্বাচার্য্যের মতানুসারে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণও স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্মের অংশ বলিয়া জীবসমূহে যে ব্রহ্মের তত্ত্বতঃ অভেদও আছে, ইহা স্বীকার করিবার কোন কারণ নাই। কারণ, যাহা বিভিন্নাংশ, তাহা অংশী হইতে তত্ত্বতঃ বা স্বরূপতঃ ঐকান্তিক ভিন্ন। শ্রীজীব গোস্বামিপাদের তত্ত্বসন্দর্ভের উক্তির ব্যাখ্যায় টীকাকার শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও উপসংহারে লিখিয়াছেন,—"তথা চাত্র ঈশজীবয়োঃ স্বরূপাভেদো নাস্তীতি সিদ্ধং"। সেখানে দ্বিতীয় টীকাকার মহামনীষী গোস্বামিভট্টাচার্য্যও উপসংহারে লিখিয়াছেন,—"তথাচ ক্বচিচ্চেতনত্বেন ঐক্যবিবক্ষয়া ক্বচিচ্চ ধর্ম্মধর্ম্মিণোরভেদবিবক্ষয়া অভেদবচনানি ব্যাখ্যেয়ানীতি ভাবঃ।" (পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বসন্দর্ভ পুস্তক, ১৭১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) অর্থাৎ শাস্ত্রে জীব ও ব্রহ্মের অভেদবোধক যে সমস্ত বাক্য আছে, তাহা কোন স্থলে চেতনত্বরূপে ঐ উভয়ের ঐক্য বিবক্ষা করিয়া, কোন স্থলে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর অভেদ বিবক্ষা করিয়া কথিত হইয়াছে, ইহাই বুঝিতে হইবে। ইঁহাদিগের মতে জীব ব্রহ্মের শক্তিবিশেষ। সুতরাং ব্রহ্মের সহিত সতত সংশ্লিষ্ট ঐ জীব ব্রহ্মের ধর্ম্মবিশেষ। শাস্ত্রে অনেক স্থানে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীর অভেদ কথিত হইয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ পরিচ্ছিন্ন জীব ও অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মের তত্ত্বতঃ অভেদ সম্ভব হয় না। সুতরাং ঐ উভয়ের স্বরূপতঃ অভেদ শাস্ত্রসিদ্ধান্ত হইতে পারে না। বস্তুতঃ শাস্ত্রে নানা স্থানে জীবকে যে ব্রহ্মের অংশ বলা হইয়াছে এবং ঐ উভয়ের যে একত্বও বলা হইয়াছে, তদ্দ্বারা গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ঐ উভয়ের তত্ত্বতঃ অভেদ ব্যাখ্যা করেন নাই। শ্রীজীব গোস্বামিপাদের "তত্ত্বসন্দর্ভে"র টীকায় মহামনীষী রাধামোহন গোস্বামিভট্টাচার্য্য ঐ "অংশে"র যেরূপ ব্যাখ্যা[২] করিয়াছেন, তদ্দ্বারা মধ্বসম্মত দ্বৈতবাদই সমর্থিত হইয়াছে। পরন্তু নির্ব্বাণ মুক্তিতে ঐ মুক্ত পুরুষ ব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মই হইলে তখন জীব ও ব্রহ্মের

১। তথাপি জীবতত্ত্বানি তস্যাংশা এব সম্মতাঃ।
ঘনতেজঃসমূহস্য তেজোজালং যথা রবেঃ॥
নিত্যসিদ্ধাস্ততো জীবা ভিন্না এব যথা রবেঃ।
অংশবো বিস্ফুলিঙ্গাশ্চ বহ্নের্ভঙ্গাশ্চ বারিধেঃ॥—বৃহদ্ভাগ।—২য় অঃ. ১৮৩.৮৪।

তত্ত্ববাদিমতানুসারেণ ততঃ পরব্রহ্মণঃ সকাশাৎ জীবা জীবতত্ত্বানি নিত্যসিদ্ধাঃ নিত্যমংশতয়া সিদ্ধাঃ, নতু মায়য়া ভ্রমেণোৎপাদিতাঃ। অতএব ভিন্নাস্ততো ভেদং প্রাপ্তাঃ। অত্র দৃষ্টান্তাঃ, যথা রবেরংশবস্তৎসমবেতা অপি ভিন্নত্বেন নিত্যং সিদ্ধাঃ, এবমেব। যথাচ বহ্নের্বিস্ফুলিঙ্গাঃ। যথাচ বারিধের্ভঙ্গাস্তথা॥—সনাতন গোস্বামিকৃত টীকা।

২। তদংশত্বং তন্নিষ্ঠভেদপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাণুত্বং। তথাচ ব্রহ্মনিষ্ঠভেদপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাণুত্বে সতি চেতনত্বমত্র সমানাকারত্বং সাদৃশ্যপর্য্যবসিতং।—গোস্বামিভট্টাচার্য্যকৃত টীকা। পূর্ব্বোক্ত তত্ত্বসন্দর্ভ পুস্তক, ১৯৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

অভেদ স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু স্বরূপতঃ অভেদ না থাকিলে তখন ভেদ নষ্ট করিয়া অভেদ উৎপন্ন হইবে কিরূপে? এই বিষয়ে গোস্বামিভট্টাচার্য্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, তখনও মুক্ত পুরুষের ব্রহ্মের সহিত বাস্তব অভেদ হয় না। যেমন জলে জল মিশ্রিত হইলে ঐ জল সেই পূর্ব্বস্থ জলই হয় না, কিন্তু মিশ্রিত হইয়া তাদৃশ জলই হয়, এ জন্য ঐ উভয়ের অভেদ প্রতীতি হইয়া থাকে। তদ্রূপ মুক্ত জীব ব্রহ্মে লীন হইলেও ব্রহ্মের সহিত মিশ্রতারূপ তাদাত্ম্য লাভ করেন। কিন্তু ব্রহ্মই হন না। গোস্বামিভট্টাচার্য্য প্রভৃতি উক্ত বিষয়ে শাস্ত্রপ্রমাণও প্রদর্শন করিয়াছেন[১]। ফলকথা, ভগবদিচ্ছায় কোন অধিকারিবিশেষের নির্ব্বাণ মুক্তি হইলে তখনও তাঁহার ব্রহ্মের সহিত বাস্তব অভেদ হয় না। শাস্ত্রে যে "একত্ব" ও "ঐকাত্ম্য" কথিত হইয়াছে, উহা স্বরূপতঃ বাস্তব অভেদ নহে—উহা জলে মিশ্রিত অন্য জলের ন্যায় মিশ্রতারূপ তাদাত্ম্য, ইহাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত। কিন্তু পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামী জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপতঃ অভেদ স্বীকার করিতেন। তাই তিনি মুক্তির ব্যাখ্যায় অদ্বৈত সিদ্ধান্তই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। অন্যত্রও তিনি অদ্বৈত মতে তত্ত্বব্যাখ্যা করিয়াছেন। তথাপি শ্রীচৈতন্যদেব বল্লভ ভট্টের নিকটে শ্রীধর স্বামীর যেরূপ মহত্ত্ব ও মান্যতার কীর্ত্তন করিয়াছিলেন[২], তাহাতে বল্লভ ভট্টের গর্ব্ব খণ্ডন ও শ্রীধর স্বামীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক নিজদৈন্য প্রকাশই উদ্দেশ্য বুঝা যায়। সে যাহা হউক, মূলকথা, গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের পূর্ব্বোক্ত সমস্ত গ্রন্থ পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে, তাঁহারা মধ্বমতানুসারে জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপতঃ ভেদমাত্রবাদী, অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী নহেন। সর্ব্বসংবাদিনী গ্রন্থে শ্রীজীব গোস্বামিপাদ ব্রহ্ম ও জগতের অচিন্ত্যভেদাভেদ স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপতঃ কেবল দ্বৈতবাদই সমর্থন করিয়াছেন। জীব ও ব্রহ্মের একজাতীয়ত্বাদিরূপে যে অভেদ তাঁহারা বলিয়াছেন, উহা গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে ভেদাভেদবাদী বলা যায় না। কারণ, মধ্বাচার্য্যের মতেও ঐরূপ জীব ও ব্রহ্মের অভেদ আছে। দ্বৈতবাদী নৈয়ায়িকসম্প্রদায়ের মতেও চেতনত্ব বা আত্মত্বাদিরূপে জীব ও ব্রহ্মের অভেদ আছে। কিন্তু ঐরূপ অভেদ গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগকে কেহ জীব ও ব্রহ্মের ভেদাভেদবাদী বলেন না কেন? ইহা প্রণিধানপূর্ব্বক চিন্তা করা আবশ্যক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ভক্তগণ নির্ব্বাণমুক্তি চাহেন না। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ

১। তথাচ শ্রুতিঃ—"যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং তাদৃগেব ভবতি" (কঠ, ৪—১৫) ইতি। স্কান্দে চ "উদকে তুদকং সিক্তং মিশ্রমেব যথা ভবেৎ। ন চৈতদেব ভবতি যতো বৃদ্ধিঃ প্রদৃশ্যতে। এবমেব হি জীবোঽপি তাদাত্ম্যং পরমাত্মনা। প্রাপ্নোতি নাসৌ ভবতি স্বাতন্ত্র্যাদিবিশেষণাৎ"। ইতি। তাদাত্ম্যং মিশ্রতাং। নাসৌ ভবতীতি ন পরমাত্মা ভবতি। স্বাতন্ত্র্যাদীতি আদিনা নির্ব্বিকারত্বাদিপরিগ্রহস্তেন তয়োর্শ্মিলনেন পদার্থান্তরতাপত্তিরপীতি। গোস্বামিভট্টাচার্য্য টীকা। ঐ পুস্তক, ১৬৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২। প্রভু হাসি কহে "স্বামী না মানে যেই জন।
বেশ্যার ভিতরে তারে করিয়ে গণন॥
শ্রীধর স্বামী প্রসাদেতে ভাগবত জানি।
জগদ্‌গুরু শ্রীধর স্বামী গুরু করি মানি"॥ ইত্যাদি —চৈঃ চঃ অন্ত্যলীলা, ৭ম পঃ॥

অধিকারিবিশেষের পক্ষে নির্ব্বাণমুক্তিকে পরম পুরুষার্থ বলিয়া স্বীকার করিলেও উহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তাঁহাদিগের মতে সাধ্যভক্তি-প্রেমই পরমপুরুষার্থ। উহা পঞ্চম পুরুষার্থ বলিয়াও কথিত হইয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ মুক্তি হইতেও ঐ ভক্তির শ্রেষ্ঠতা সমর্থন করিয়াছেন। শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ তাঁহার বৃহদ্ভাগবতামৃত গ্রন্থে বিশেষ বিচারপূর্ব্বক বুঝাইয়াছেন যে, মুক্তিতে ব্রহ্মানন্দের অনুভব হইলেও ভক্তিতে উহা হইতেও অধিক অর্থাৎ অসীম আনন্দ ভোগ হয়। মুক্তির আনন্দ সসীম। ভক্তির আনন্দ অসীম। তিনি মুক্তি হইতেও ভক্তির শ্রেষ্ঠতা সমর্থন করিতে বলিয়াছেন,—"সুখস্য তু পরাকাষ্ঠা ভক্তাবেব স্বতো ভবেৎ।" (২য় অঃ, ১৯১)। শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ বলিয়া গিয়াছেন যে, যে কাল পর্য্যন্ত ভোগস্পৃহা ও মুক্তিস্পৃহারূপ পিশাচী হৃদয়ে বিদ্যমান থাকে, সেই কাল পর্য্যন্ত ভক্তি-সুখের অভ্যুদয় কিরূপে হইবে?[১] অর্থাৎ নির্ব্বাণ মুক্তিস্পৃহা ভোগস্পৃহার ন্যায় ভক্তি-সুখভোগের অন্তরায়। অবশ্য যাঁহারা মুমুক্ষু, তাঁহাদিগের পক্ষে ঐ মুক্তিস্পৃহা পিশাচী নহে, কিন্তু দেবী। ঐ দেবীর কৃপা ব্যতীত তাঁহাদিগের মুক্তি লাভে অধিকারই জন্মে না। কারণ, ঐ মুক্তিস্পৃহা তাঁহাদিগের অধিকার-সম্পাদক সাধনচতুষ্টয়ের অন্যতম। কিন্তু যাঁহারা ভক্তিসুখলিপ্সু, যাঁহারা অনন্তকাল ভগবানের সেবাই চাহেন, তাঁহারা উহার অন্তরায় নির্ব্বাণ মুক্তি চাহেন না। তাঁহাদিগের সম্বন্ধেই শ্রীরূপ গোস্বামিপাদ মুক্তিস্পৃহাকে পিশাচী বলিয়াছেন। ভক্তিশাস্ত্রের তত্ত্বব্যাখ্যাতা গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সাধ্যভক্তি-প্রেমের সেবা করিয়া, নানা প্রকারে উহার স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ ঐ প্রেমের স্বরূপ অনির্ব্বচনীয়। বাক্যের দ্বারা উহা ব্যক্ত করা যায় না। মূক ব্যক্তি যেমন কোন রসের আস্বাদ করিয়াও তাহা ব্যক্ত করিতে পারে না, তদ্রূপ ঐ প্রেমও ব্যক্ত করা যায় না। তাই ঐ প্রেমের ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া পরমপ্রেমিক ঋষিও শেষে বলিয়া গিয়াছেন,—"অনির্ব্বচনীয়ং প্রেমস্বরূপং"। "মূকাস্বাদনবৎ"। (নারদভক্তিসূত্র, ৫১।৫২)। সুতরাং যাহা আস্বাদ করিয়াও ব্যক্ত করা যায় না, তাহার নামমাত্র শুনিয়া কিরূপে তাহার ব্যাখ্যা করিব? ভক্তিহীন আমি ভক্তিশাস্ত্রোক্ত ভক্তিলক্ষণেরই বা কিরূপে ব্যাখ্যা করিব? কিন্তু শাস্ত্র সাহায্যে ইহা অবশ্য বলা যায় যে, যাঁহারা ভক্তিশাস্ত্রোক্ত সাধনার ফলে প্রেমলাভ করিয়াছেন, তাঁহারাও মুক্তই। তাঁহাদিগেরও আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি হইয়াছে। তাঁহাদিগেরও আর কখনও পুনর্জ্জন্মের সম্ভাবনাই নাই। সুতরাং তাঁহাদিগের পক্ষে সেই সাধ্যভক্তিই এক প্রকার মুক্তি। তাই তাঁহাদিগের পক্ষে স্কন্দপুরাণে নিশ্চল ভক্তিকেই মুক্তি বলা হইয়াছে এবং ভক্তগণকেও মুক্তই বলা হইয়াছে[২]। অর্থাৎ ভক্তি-

---

১। ভুক্তি-মুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ।—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

২। নিশ্চলা ত্বয়ি ভক্তির্যা সৈব মুক্তির্জ্জনার্দ্দন।
মুক্তা এবহি ভক্তাস্তে তব বিষ্ণোর্যতো হরে।
—"হরিভক্তিবিলাসে"র দশম বিলাসে উদ্ধৃত (১৩ম) বচন।

লিপ্সু অধিকারীদিগের পক্ষে চরম ভক্তিই মুক্তি। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে আবার শাস্ত্র সিদ্ধান্তের সামঞ্জস্য করিয়া বলা হইয়াছে যে[১], মুক্তি দ্বিবিধ,—নির্ব্বাণ ও হরিভক্তি। তন্মধ্যে বৈষ্ণবগণ হরিভক্তিরূপ মুক্তি প্রার্থনা করেন। অন্য সাধুগণ নির্ব্বাণরূপ মুক্তি প্রার্থনা করেন। সেখানে নির্ব্বাণার্থীদিগকেও সাধু বলা হইয়াছে, ইহা লক্ষ্য করা আবশ্যক। পূর্ব্বোক্ত নির্ব্বাণ মুক্তিই ন্যায়-দর্শনের মুখ্য প্রয়োজন। তাই ঐ নির্ব্বাণার্থী অধিকারীদিগের জন্য নির্ব্বাণ মুক্তিরই কারণাদি কথিত ও সমর্থিত হইয়াছে। দ্বিতীয় আহ্নিকে ঐ মুক্তির কারণাদি বিচার পাওয়া যাইবে ॥ ৬৭ ॥

অপবর্গ-পরীক্ষা-প্রকরণ সমাপ্ত ॥ ১৪ ॥

এই আহ্নিকের প্রথমে দুই সূত্রে (১) প্রবৃত্তিদোষ-সামান্য-পরীক্ষা-প্রকরণ। তাহার পরে ৭ সূত্রে (২) দোষত্রৈরাশ্য-প্রকরণ। তাহার পরে ৪ সূত্রে (৩) প্রেত্যভাব-পরীক্ষা-প্রকরণ। তাহার পরে ৫ সূত্রে (৪) শূন্যতোপাদান-প্রকরণ। তাহার পরে ৩ সূত্রে (৫) কেবলেশ্বরকারণতা-নিরাকরণ-প্রকরণ (মতান্তরে ঈশ্বরোপাদানতা-প্রকরণ)। তাহার পরে ৩ সূত্রে (৬) আকস্মিকত্ব নিরাকরণ প্রকরণ। তাহার পরে ৪ সূত্রে (৭) সর্ব্বানিত্যত্বনিরাকরণ-প্রকরণ। তাহার পরে ৫ সূত্রে (৮) সর্ব্বনিত্যত্ব নিরাকরণ-প্রকরণ। তাহার পরে ৩ সূত্রে (৯) সর্ব্বপৃথক্ত্ব নিরাকরণ-প্রকরণ। তাহার পরে ৪ সূত্রে (১০) সর্ব্বশূন্যতা নিরাকরণ-প্রকরণ। তাহার পরে ৩ সূত্রে (১১) সংখ্যৈকান্তবাদ-নিরাকরণ-প্রকরণ। তাহার পরে ১০ সূত্রে (১২) ফলপরীক্ষা-প্রকরণ। তাহার পরে ৪ সূত্রে (১৩) দুঃখপরীক্ষা-প্রকরণ। তাহার পরে ১০ সূত্রে (১৪) অপবর্গ-পরীক্ষা-প্রকরণ।

৬৭ সূত্র ও ১৪ প্রকরণে চতুর্থ অধ্যায়ের
প্রথম আহ্নিক সমাপ্ত।

১। মুক্তিস্তু দ্বিবিধা সাধ্বি শ্রুত্যুক্তা সর্ব্বসম্মতা।
নির্ব্বাণপদদাত্রী চ হরিভক্তিপ্রদা নৃণাং ॥
হরিভক্তিস্বরূপাঞ্চ মুক্তিং বাঞ্ছন্তি বৈষ্ণবাঃ।
অন্যে নির্ব্বাণরূপাঞ্চ মুক্তিমিচ্ছন্তি সাধবঃ ॥
—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, প্রকৃতিখণ্ড, ২২শ অঃ।
("শব্দকল্পদ্রুমে" মুক্তি শব্দ দ্রষ্টব্য)

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠাঙ্ক	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	"প্রবৃত্তির"র	"প্রবৃত্তি"র
৬	সেই দেষের	সেই দোষের
৭	লিয়াছেন	লিখিয়াছেন
৮	কপির্ণ্যও	কার্পণ্যও
	উদ্দ্যোতকরে	উদ্দ্যোতকরের
	করিয়ও	করিয়াও
১০	রসাদ	রসাদি
১১	অথ্যাৎ	অর্থাৎ
২৫	মর্হিষ	মহর্ষি
	নঞর্থ	নঞর্থ
৩৫	অঙ্কুরাথী	অঙ্কুরার্থী
৩৬	হহা	ইহা
৩৭	সর্ব্বশক্তমান্	সর্ব্বশক্তিমান্
৪১	নিস্পতিং ॥	লিস্পতি ॥
৫১	তাং যমধো	তং যমধো
৫৩	পরস্ত	পরস্ত
৬১	মশ্বের্য্যং	মৈশ্বর্য্যং
৬৩	জীবাত্মা	জীবাত্মা
	আত্মজাতীয়	আত্মজাতীয়।
৬৪	এই বিবিধ	এই দ্বিবিধ
৬৯	শাস্ত্রবাকের	শাস্ত্রবাক্যের
৭১	সিসাধয়িষতা	সিসাধয়িষিতা
৭৮	বিশ্বস্ততুল্য	বিশ্বস্ততুল্য বা সুহৃত্তুল্য।
	কিরাতার্জ্জনীয়	কিরাতার্জ্জুনীয়।
৮০	গ্রহ করিয়া	গ্রহণ করিয়া
৮১	ক্রীড়ার জন্য	ক্রীড়ার দ্বারা

পৃষ্ঠাঙ্ক	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৮৪	হরিনৈব	হরির্নৈব
	মর্ত্তস্য	মত্তস্য
৮৭	"বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্য	"বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে
৮৯	মহামনীষা	মহামনীষী
৯২	সিদ্ধ হয়,	সিদ্ধ হওয়ায়
	উদয়নকৃত্য	উদয়নকৃত
৯৩	২।২৯)	২।২।৯)
১০২	জ্ঞাজ্ঞো	জ্ঞাজ্ঞৌ
১০৬	ব্যাখ্যা পাওয়ায়	ব্যাখ্যা পাওয়া যায়
১০৭	তস্য ত্বমিতিবা	তস্য ত্বমিতিবা
	জীবেনাত্মানা	জীবেনাত্মনা
	বাক্যশেষা ইত্যাদি।	বাক্যশেষাৎ" ইত্যাদি।
১১১	নিম্বার্কভাষ্য-ভূমিকায়	নিম্বার্কভাষ্যব্যাখ্যার ৩৬৫ পৃষ্ঠায়
১১৬	অভেদশাস্ত্রান্যুভয়ো	অভেদশাস্ত্রাণ্যুভয়ো
১১৭	ঐকাত্মদর্শন	ঐকাত্ম্যদর্শন
১২৭	ন্যায়মতের সমর্থনের জন্য	ন্যায়মতের সমর্থনের জন্যও
	সাধকের কোন্ অবস্থায়	সাধকের কোন অবস্থায়
১২৯	মনোযোগ্ করি	মনোযোগ করিয়া
	ভিন্ন সিদ্ধান্তেরই	ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্তেরই
১৩২	সাধর্ম্ম্যকেই তিনি	সাধর্ম্ম্যকেই
	ইহা উহার দ্বারা	ইহাও উহার দ্বারা
১৪৮	জেজ্জট	জেজ্ঝট
১৮৩	একন্যানুপ	একস্যানুপ
১৯০	প্রতিজ্ঞাবাক্য	প্রতিজ্ঞাবাক্যে
১৯৯	ভাববেধাক	ভাববোধক
২২৬	পুত্রপুষ্পাদি	পত্রপুষ্পাদি
২৩০	তত্ত্বে ত্বদ্ধ	তত্ত্বে ত্বদ্ধা
২৪৫	ফর্ম্মফলের	কর্ম্মফলের
২৪৬	জাভি অর্থ	জাতি অর্থ
২৫৯	করিতেছে।	করিতেছে,
	বিনিগ্রহে	বিনিগ্রহো

পৃষ্ঠাঙ্ক	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২৬১	তুথমেব	দুঃখমেব
২৬২	প্রহণ করিতে	গ্রহণ করিতে
২৬৩	ব্রহ্মচারীবাসী	ব্রহ্মচারিবাসী
২৬৫	সিদ্ধ করা যায় না,	সিদ্ধ করা যায়,
২৭০	জর্থাৎ	অর্থাৎ
২৭১	ঋণবাক্যাতুর্দ্ধি	ঋণবাক্যাদুর্দ্ধি
২৭৮	ইত্যাতি	ইত্যাদি
২৮০	তদ্ধতং	তদ্ধুতং
২৮৪	অবশিষ্টস্বনুক্তঃ	অবশিষ্টস্বনুক্তঃ
২৯১	যস্থাত্ম	দস্থাত্ম
২৯৮	প্রথম শ্রুতি	প্রথম শ্রুতির
২৯৯	পাত্রচয়ান্তং	পাত্রচয়ান্তত্বং
৩০২	নিশ্বনাথ	বিশ্বনাথ
৩০৩	"জ্ঞানাগ্নিঃ	(জ্ঞানাগ্নিঃ
৩১০	স্মৃতশীলে	স্মৃতিশীলে
৩১৩	লোক্ষ	মোক্ষ
৩১৮	বলিয়াছেন যে, না।	বলিয়াছেন যে,
	জাত্যায়ুর্ভোগঃ।	জাত্যায়ুর্ভোগাঃ।
৩২৬	না থাকিলেও	না থাকিলে
৩৩৪	মুক্ষীয়	মুক্ষীয়ং
৩৪২	ৈ শেষিকোক্তমোক্ষান্ত	বৈশেষিকোক্তমোক্ষান্ত,
৩৪৫	করিম্নাছেন	করিয়াছেন
৩৪৭	উপহাস করার	উপহাস করায়
৩৫৬	স্মারন্নিদং	স্মরন্নিদং

—০—